ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৪, সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 10th Issue 24th, Sept., 2023

সম্পাদক
আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 10th Issue 24th, 25th Sept., 2023, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১০ ম বর্ষ ও ২৪ তম সংখ্যা
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ : অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

দারিদ্র্য : শৈবাল মিত্রের গল্পে

উৎপল মণ্ডল ১৫

গুরুসদয় দত্ত ও ব্রতচারী আন্দোলনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব

অসীম বিশ্বাস ২৬

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্প-সমুন্নতি

খোকন বর্মন ৩৭

অবতারি চৈতন্যদেব ও তাঁর মানবধর্ম

বাপি মাজি ৪৮

অপত্যের ধর্মশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ

দীপঙ্কর পাত্র ৫৪

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তা-মালা' গ্রন্থে হাসির আড়ালে ব্যঙ্গ

দেবাশিস মণ্ডল ৬৩

অরুণ মিত্রের কবিতার ভাষা

সৌরভ চক্রবর্তী ৮০

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন (১৯০৬)

উমা দে (নন্দী) ৮৯

ঔপনিবেশিক বাংলায় কয়লার বাণিজ্যিক পরিবহণের
বিকাশে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ভূমিকা : প্রসঙ্গ আসানসোল
রাণীগঞ্জ কোলিয়ারি অঞ্চল

সুমন ভৌমিক ৯৭

বৃত্তি ও তার বিবর্তন : প্রসঙ্গ রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

জয়া ধীবর ১০৬

বিজ্ঞাপনে নারী ও বিজ্ঞাপিত নারী : নারীবাদী পটভূমিতে একটি আলোচনা

প্রণব ঘোষ ১১৬

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস : ইতিহাসের আবহে
প্রেম-হিংসা-রাজনীতি-বন্ধুত্বের চতুর্মুখী দ্বন্দ্বের আখ্যান

শ্রুতকীর্তি সরকার ১২৭

নাট্যগতিতে ক্ষুদ্র চরিত্রের ভূমিকা : প্রসঙ্গ স্বপ্নবাসবদত্তম্,
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ও মৃচ্ছকটিকম্
অঞ্জলি বিশ্বাস ১৩৫
অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'রতন মাস্টারের পাঠশালা' : জাতীয় সাক্ষরতা
অভিযানের বর্ণমালা
প্রহ্লাদ রায় ১৪৫
সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য দোষ বিচার
হরিপদ মহাপাত্র ১৫৫
কাঁকড় পথ থামবে দরজায় : অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা
সুরজিৎ প্রামাণিক ১৬০
সমাজকল্যাণে সারদাদেবীর ভূমিকা-একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
রাজেশ বিশ্বাস ১৬৮
মুক্তামাছ : প্রজন্মপাড়ের কৈবর্ত সম্প্রদায়
সনুপ খাঁ ১৭৪
বাংলা অনুগল্প ও সাম্প্রতিক জীবন : পারস্পরিক সম্পর্কের
এক সাহিত্যিক পর্যালোচনা
পৌলমী সরকার ১৮৪
নজরুলের 'বিদ্রোহী'- এক বীরের আত্মজাগরণের ইতিকথা
ফতেমা খাতুন ১৯১
উদ্বাস্তু কথা : প্রসঙ্গ নদিয়া জেলা
রবীন সরকার ২০০
উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক
সোনালী দেবনাথ ২০৬
নৃত্যকলা যখন জাতীয়তাবাদের ভাষা
পায়েল দাস ২১২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প – প্রসঙ্গ : শোষিত
শ্রেণির সংগ্রামী চেতনা
আশিস কুমার সাহু ২২১
ঋষি অরবিন্দের 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে 'আন্তরিক
স্বাধীনতা'র স্বরূপ
মানিক সরকার ২২৮

ঘর ভাঙার কাহিনি : সিঁদুরে কাজলে
বিপ্লব ব্যানার্জ্জী ২৩৩
পড়োশী মুখে ওড়িশা কথা
শিশির বেহেরা ২৪০
মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও সমকালীন রাজনীতি
কৌশিক দাস ২৫৬
নদিয়ার উলা-র উলাইচণ্ডী মেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য :
একটি পর্যালোচনা
নারায়ণ নন্দী ২৬২
উত্তরাধুনিকতার দৃষ্টিতে নারীবাদের প্রসঙ্গ
চয়ন কর্মকার ২৬৯
ছদ্মবেশী রবীন্দ্রনাথ
মলি মিত্র ২৭৫
বাংলা ছোটগল্পে রামকুমার মুখোপাধ্যায়–একটি পর্যালোচনা
রিমি বাছাড় ২৮০
অতীতগমনের স্বরূপ-সন্ধানে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের
'ধনপতির সিংহলযাত্রা'
প্রদীপ্তা ঘোষ ২৮৪
১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ,বাঙালী উদ্বাস্তু ও জনস্বাস্থ্য – একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
বিভাস বিশ্বাস ২৯০
লোকসংস্কারের সন্ধানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প (নির্বাচিত)
বাপ্পী বর্মন ২৯৭
মৈমনসিংহ গীতিকা : পালাগানের আধারে প্রেম-সংগ্রামের ইতিকথা
মলি পাকড়ে ৩০২
উৎপল দত্তের পথনাটক স্পেশাল ট্রেন : প্রাসঙ্গিকতা
মিঠু সরকার ৩০৮
আনসারউদ্দিনের নির্বাচিত ছোটগল্প : প্রেক্ষিত লোকসাংস্কৃতিক উপাদান
সুদেব বিশ্বাস ৩১৭
সঞ্জয় ঘোষের 'যামিনী কলকাতা সংলাপ' : এক চিত্রশিল্পীর
উত্থান ও নিজস্বতা অর্জনের আখ্যান
আদেশ লেট ৩২৬

মৈমনসিংহ-গীতিকায় নির্বাচিত পালায় আত্মহত্যার মনস্তত্ত্ব
স্বপ্ননীল সরকার ৩৩৫
বি. আর. আম্বেদকর ও দলিত আন্দোলন : ফিরে দেখা
দীপক হাজরা ৩৪৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিটেমাটি' : এক প্রাণের স্পন্দন
প্রবীর দাস ৩৫২
অরণ্য মানব
গৌতম চন্দ্র বাড়ৈ ৩৫৯
অগ্নিকন্যা কমলা দাশগুপ্ত
কোয়েল রানা ৩৬৩
রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল': বন্দিনী নারীসত্তার বন্ধন মুক্তির আনন্দ
ফটিক চন্দ্র অধিকারী ৩৭১
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রসঙ্গ
সুব্রত চ্যাটার্জী ৩৮০
ধান্যসংস্কৃতি : উৎপত্তি, বিবর্তন, সমাজ ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে
সাম্প্রতিক পর্যালোচনা
অজয় কুমার দাস ৩৯০
মধ্যবিত্তের সংকট ও স্বরূপ উন্মোচন ও সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প
সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী ৪০৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যকৌতুক নাটকে ছোটদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ
রিয়া পাল ৪১৮
বর্তমানে যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রা : ভারতবর্ষের
এক নিষিদ্ধ অধ্যায়
লোপামুদ্রা গাঙ্গুলী
শুভদীপ মন্ডল
শিউলি মন্ডল ৪২৬
ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক মুঠো আকাশ' : মধ্যবিত্তের জীবন
জিজ্ঞাসা ও ব্যর্থ জীবনের আলেখ্য
প্রিয়াংকা রায় ৪৩৪

'বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন রেখা' : শম্ভু মিত্রের
বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত
লিপিকা সরকার ৪৪০
সাহিত্যে অস্তিবাদের ভাবনা
তাপস দে ৪৪৭
মহাভারতের ভিন্ন পাঠ : প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে'
অঙ্কিতা ঠাকুর ৪৫৮
সুবালা : এক সমাজ বর্জিতার উপাখ্যান
চৈতালি ভৌমিক ৪৭২
নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত শিল্প উন্নয়নে
মহিলাদের ভূমিকা
আমিনুল ইসলাম ৪৮২
শংকরের 'জন-অরণ্য' উপন্যাস : যুবসমস্যার এক চিরন্তন দলিল
রুবিয়া বানু ৪৮৮
জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতীক : 'শনিবারের ছড়া'
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা ৪৯৫
মিলন মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প বায়োস্কোপ :
একটি আলোচনার প্রেক্ষিতে
সুদেষ্ণা সরকার ৫০৫
মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে
বিস্মৃত দুই লোক-সংস্কৃতি- পটশিল্প ও ঢপ কীর্তন
নম্রতা দত্ত ৫১২
রঙ্গালয়ে 'প্লে রাইটার' গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সফিকুল ইসলাম ৫২০
জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব অনিস্বীকার্য
মধুরিমা ভৌমিক ৫২৬
বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক
গোলক সরকার ৫৩৪
রবীন্দ্র নাটকে সাহিত্যগুণ : রক্তকরবী
প্রিয়াঙ্কা পাল ৫৪১

জীবনের বহুমাত্রিক বর্ণমালায় যাযাবর সম্প্রদায় এবং
কয়েকটি বাংলা উপন্যাস
তনিমা দত্ত ৫৪৭
দেশ বিভাগোত্তর বরেন্দ্র অঞ্চলের উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা প্রসঙ্গ রাজশাহী
সলোক হোসেন ৫৫৫
উদ্ভ্রান্ত সময় ও সত্যসন্ধানী আদর্শের 'ঘূর্ণি'
অঙ্কিতা মুখার্জী ৫৬৭
Kant's philosophical system and the idea of peace
Paramita Datta ৫৭৬
Women Negotiating Facets of Patriarchy and Political
Violence in Easterine Kire's novel : *A Terrible Matriarchy*
Jahira Hossain
Sharmistha Chatterjee ৫৮১
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAMMES IN
SERAMPUR SUBDIVISION-A GEOGRAPHICAL REVIEW
Sourav Das ৫৯০
Significance of the Myths of Folk Deities in
N.D. Rajkumar's Selected Poems
Sudhakar Sardar ৫৯৮
Humanism in *ShrimadBhagavatGita*
Debasree Sadhu ৬০৬
Local Roots of Revolutionary Terrorism in India:
A Case Study of Simla Bayam Samity (1926 - 1947)
Avirup Sinha ৬১১
LEARNING STYLES OF COLLEGE STUDENTS; AN
ENQUIRY TOWARDS INDIVIDUAL PREFERENCE
Kazi Masud Hossain
Anujit Patra
Swami Divyagunananda ৬১৭

Discrimination against women's Rights in India: A critical analysis
Jyoti Mitra ৬২৯

Land Devolution and Demographic Changes of Darjeeling-Terai Region in Colonial Period : A Historical Review
Rudrani Bhattacharya ৬৪৪

India-Israel Relations : Exploring Opportunities and Complexities in a Changing Global Landscape
Albert Mondal ৬৫৩

Effect of Social Media towards Political Campaign and Public Motivation : A Review
Mithun Biswas ৬৬২

সম্পাদকীয়

হাজারো ভাবনায় গ্রন্থিত হতে থাকে ছোট ছোট সূত্র। প্রয়োজন উপলব্ধির। শানিত উপলব্ধি দুর্বলতাকে শিথিল করে। যতটা হোঁচট খাওয়া যায় ততটাই শানিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। সূত্রেরা মজবুত হয় আপনার শানিত ভাবনায়। যতটা বিস্তারিত হবে যুক্তিজাল ততটাই মধুরতা ছড়াবে। আক্ষেপ আর অপেক্ষাও নতুনতর ভাবনায় উদ্বেলিত করে তুলবে। হাজারো ভাবনা মিলে হয় এক। একের সন্ধানেই এবারের ‘এবং প্রান্তিক’।

দারিদ্র্য : শৈবাল মিত্রের গল্পে

উৎপল মণ্ডল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয় একই সঙ্গে ঘটে চলেছে সেই খণ্ড সময়ের বুকে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বা অন্যান্য যাই হোক না কেন সেই বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে, আবার নাও হতে পারে। আর সেই সময়ের বিষয়ের মধ্যে সমকালীন বা পরবর্তী কোনো চিন্তাশীল মানুষ ঠিক কোন বিষয়টাকে দেখবেন এবং কীভাবেই বা দেখবেন তা অবশ্যই ব্যক্তির মানসিকতার নির্ভরশীল। কিন্তু যদি এভাবে বলি যে— কোন বিষয় সেই ব্যক্তির চিন্তাকে প্রভাবিত করলো তাহলে বিষয়ের সত্যতা, গভীরতা এবং তার প্রকাশ্য প্রভৃতি দিকগুলিও গুরুত্ব পেয়ে যায়।

'দারিদ্র্য' এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই নতুন কিছু নয়। সেই চর্যাপদে 'হাঁড়িত ভাত নাহি' থেকে শুরু করে মধ্যযুগ শেষ হয়েছে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-তে এসে। তারপর ব্রিটিশ আমলে তার মাত্রা আরো চড়ে শাসন-শোষণের কারণে। বিশেষত উত্তাল চল্লিশের সেই অমানবিক দিনগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখারই সাদা পাতাগুলি ভরিয়ে দিয়েছে কালো অক্ষরে। তাই স্বাধীনতার পর মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল— অন্যতর এক স্বপ্ন।

কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এসে গেলেই তা দেশবাসীর মনে বহু প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল। সমাজ-মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই দেশবাসী স্বপ্ন দেখেছিল শোষণ-বঞ্চনাহীন একটি সোনালী দেশের । একটি সুখী দেশ আর সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্ন। প্রায় গোটা পঞ্চাশ জুড়ে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়িত রূপ দেখার আগ্রহে ছিল দেশবাসী। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আসে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতীয় অর্থনীতি কোনো প্রভাব ফেলেনি, বলতে গেলে ব্যর্থই হয়। না কৃষি, না ভিন্ন কিছু কোনো কিছুরই উন্নতি হয়নি। মানুষের মধ্যে ঘনীভূত হতে থাকে হতাশা, বেদনা, ক্ষোভ—

> "স্বাধীনতার দশ বছর যেতে না যেতেই সেই সব শূন্য গর্ভ, অলীক প্রতিশ্রুতির তকমা ফেলে দিয়ে ছিন্নমস্তা, রক্তভূক চেহারার দেশবরেণ্যরা নতুন বঙ্গভূমিতে হাজির হলো। কী ভয় দেখানো বীভৎস মূর্তি! ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ ধোঁকা খেয়ে অতল নৈরাশ্যে ডুবে গেল।"

['সত্তর দশক'/তৃতীয় খণ্ড/ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন/পৃ. ৩৪] অনিল আচার্য

ছাত্র সমাজ তখন ব্যাপকভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বামপন্থী রাজনীতি ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করে। আর পরিবার বড় হয়ে উঠলে তো ভাই-এ ভাই-এ মতবিরোধ স্বাভাবিক। পার্টির মধ্যেও নানা মত - ভাঙন – সে অন্য ইতিহাস। এই পরিস্থিতির মধ্যে একটি ভাবনা সঞ্চারিত হতে থাকে— 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'।

দেশে তখন তীব্র সংকট খাদ্যের। সরকার এর মোকাবিলা করার চেষ্টা যে একেবারেই করেনি, তা নয়। সরকারি হিসেবে অনুযায়ী পনের লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করে তার সঙ্গে পি.এল. ৪৮০ গম মিলিয়ে চেষ্টা চলেছিল এই সংকটের মোকাবিলা করার। কিন্তু ওই যে - পৃথিবীর উঁচু লোকেদের দাবী এসে সবই নেই - সব সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে! ফলত এ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয় না - খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের এই নীতি আপাতভাবে যতই বৈপ্লবিক মনে হোক, বড় চাষিদের থেকে লেভি নেওয়ার পরিকল্পনা যতই অভিনব মনে হোক, শেষ পর্যন্ত তাও আসলে হয়ে ওঠে প্রহসনেরই নামান্তর!

> "গ্রামাঞ্চলে বড় বড় জোরদারেরা সরকারি লেভির চাল ফাঁকি দিয়ে তা মজুত ও অধিক দামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগলো। আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষ রইল অর্ধাহারে, অনাহারে, লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ মাত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হল সরকার।"
>
> ['লাল' তমসুক, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন'/গাঙচিল/পৃ. ৩৫] অমর ভট্টাচার্য

শুরু হয় খাদ্য আন্দোলন। রাজনৈতিক কর্মীদের বিনা বিচারে গ্রেপ্তার। বসিরহাটে জনতা-পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষ। আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে। স্কুল-কলেজ নির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলেও, আন্দোলন চলে। কেননা এ তো শুধু খাদ্য আন্দোলনই নয়, একই সঙ্গে শাসক শ্রেণির প্রতি ক্ষিপ্ত সাধারণ মানুষের জেহাদ।

জীবনধারার স্বাভাবিক নিয়মে একসময় স্তিমিত হয় আন্দোলন। সরকার রাজনৈতিক কারণে বন্দী এবং ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেন ঠিকই, কিন্তু খাদ্য সমস্যার সমাধান হয় না। বলতে গেলে, সমস্ত দাবী প্রায় অমীমাংসিত থেকে যায়।

এদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শের চাপান-উতোর চলে। বামপন্থী নেতাদের বিভাজন ঘটে। এইসব ডামাডোলের মধ্যেও ১৯৬৭ সালে বামপন্থীদেরই এক অংশের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে তরাই অঞ্চলে শুরু হয় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন নকশাল আন্দোলন। স্বাধীনতা পরবর্তী দুই দশকে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ হয়। হতাশা এবং সাধারণ মানুষের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হওয়ার ইতিহাস আসলে নতুন ভাবে দেখা দিলেও তার মূল ভিত্তি ছিল সেই চিরাচরিত শোষণ। স্বাধীনতা পরবর্তী এই প্রথম কুড়ি বছর সম্পর্কে অরুণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

"স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ বিশ বছরেও (১৯৪৭-৬৭) স্বপ্নের আদর্শের ভারতবর্ষ হয়ে উঠতে পারেনি, যেতে পারেনি তার কাছাকাছি। গরীব আরো গরীব হয়েছে, ধনী আরো ধনী; ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বজ্রমুষ্টির চাপে নিষ্পেষিত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ, গ্রামাঞ্চলে মুষ্টিমেয় ধনী চাষি সব চাষযোগ্য জমির মালিক হয়েছে, আর শিল্প-বাণিজ্যের মালিক হয়েছে পঁচাত্তরটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে।"

['কালের প্রতিমা'/২০১০/পৃ. ২৭৮]

সাধারণ বাঙালির ও বাংলার এই করুণ দুর্বিপাকের মধ্যেই শৈবাল মিত্রের বেড়ে ওঠা। ছাত্র জীবন ছাত্র রাজনীতি থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং একসময় রাজনীতি ছেড়ে লেখক হয়ে ওঠা, তবে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসেননি আমৃত্যু। তাঁর জীবন পর্যবেক্ষণ-অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়-মনন-চিন্তন, এক কথায় মানসিক গঠন তৈরি হয়ে ওঠে এই সময়েই।

সতের বছর বয়সে ১৯৬০ সালে স্কটিশচার্চ কলেজেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন শৈবাল মিত্র। তারপর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। ১৯৬৫ সালে ভারত রক্ষা আইনে কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৬৬-তে খাদ্য আন্দোলনের পর মুক্তি পান। ১৯৬৭ সালে যখন কৃষক আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটে তখন সামিল হন সেই আন্দোলনে যাকে তিনি যুব আন্দোলন বলেছেন। কৃষকদের দুর্দশা অনুভব করে তাদের মুক্তির জন্যই চারু মজুমদারের ডাকে তিনি ওই আত্মত্যাগের সংগ্রামে যুক্ত হন। কিন্তু যে সংবেদনশীলতার জন্য যোগদান, মনে হয় সেই সংবেদনশীলতার জন্যই, শ্রেণিশত্রু খতমের এই রাজনীতি যখন ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে পরিণত হয় তখন রাজনীতির আঙিনা থেকে চলে যান প্রত্যক্ষভাবে।

১৯৭৭-এই তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতি শেষ। যদিও এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন। ৭৭-এর পর থেকে তিনি আশ্রয় নেন সাহিত্যে। বিক্ষুব্ধ এই সময়ের বুকে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন। শৈবাল মিত্র দরিদ্র কৃষকদের অমানবিক দারিদ্র্যকে অনুভব করেছেন বলেই তাঁর গল্পে বারবার উঠে আসে এইসব মানুষের কথা— সাধারণ বাঙালি কৃষকদের দারিদ্র্যের ছবি। 'ক্ষুব্ধ স্বদেশ', 'আতর আলির রাজসজ্জা' (১৯৮৩), 'মা বলিয়া ডাক' (১৯৮৭), 'ঈশরো আল্লা' (২০০৪) প্রভৃতি গ্রন্থ সে সাক্ষ্য দেয়।

আর একটি কথা, শুধু গল্প নিয়ে নয়, শৈবাল মিত্রের উপন্যাস সম্পর্কেও তা সত্য— এইসব লেখনীগুলির নানান ডাইমেনশন আছে। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে আলোচনার দাবী রাখে তাঁর গল্প বা উপন্যাস সবই। এই প্রবন্ধে আমার অন্বেষণ শুধু দারিদ্র্যের কথা। এবং তাও শুধু গল্পগুলিকে কেন্দ্র করে।

একটু আগেই আমরা দেখলাম— শৈবাল মিত্র ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সর্বহারাদের পক্ষে গিয়েছেন, রাজনীতির সূত্রেই দেখেছেন এদের আবার একটা সময় আদর্শ থেকে না সরলেও রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। তারপর? ঠিক তারপরই আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যের কাছে। কেন এমন হল? শৈবাল মিত্র আরো অনেক কিছুই করেছেন— অধ্যাপনা করেছেন, তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ১৯৭৭-এ রাজনীতি থেকে সরে এসে সাহিত্যই তাঁর মূল আশ্রয় বলে আমার মনে হয়েছে। কেন সাহিত্য, কেন এই লেখা সে সম্পর্কে তিনি নিজেই, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি'-তে জানিয়েছিলেন যে পৃথিবী এবং মানুষের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েই নাকি তাঁর কলম বিষোদ্গার করেছে— যদিও সে ক্রোধ আসলে ভালোবাসারই নামান্তর— বিকল্প ভালোবাসা। শুধু তাই নয়, আরো জানান যে কারো হিত বা অহিত করার জন্য নয়, তিনি লেখেন নিজের সঙ্গে নিজের মতো করে কথা বলতে। ঠিক এই পয়েন্টে আমি আসতে চাইছিলাম। এইবার আমরা দেখব কীভাবে তিনি অনুভব করেছেন রাজনীতিকে, মানুষকে, দারিদ্র্যকে।

'সংগ্রামপুর যাত্রা' গল্পের পিছুরুদ্দি শামুকপোতা গ্রামের ভূমিহীন কৃষক। গল্পের নায়ক। হ্যাঁ, নায়কই বটে, কেননা পার্টির দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেল কমিটি তৈরি হবে তারই নেতৃত্বে। ক্ষেতমজুর আর ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠন। কিন্তু এই রোগা লম্বা, তোবড়ানো গাল, কাঁচা-পাকা দাড়ি— যার নিজেরই ঠায় ঠিকানা নেই তেমনভাবে, নেই অন্নের সংস্থান, লেখাপড়ার অবস্থা তো কল্পনার অতীত— অভাবেরও ওপর দিয়ে যায়। তাহলে এই পিছুরুদ্দি কেন নেতৃত্বে?

কারণ ভারতীয় বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনার বীজ তখন ছড়িয়েছে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামের ঝড় উঠেছে। সেটা তো বটেই। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা—

> "শহুরে ভদ্রজন বুঝতে শুরু করেছে যে, গ্রামই হলো ভারতবর্ষের শ্রেণি সংগ্রামের মূল আখড়া এবং গ্রামের জোয়ারে শহর ভেসে যাবে।"
>
> ['আতর আলির রাজসজ্জা'/'সংগ্রামপুর যাত্রা'/কবিপত্র প্রকাশ/পৃ. ৪৯]

আর তাই শহরের কমরেড অমিয়দার চোখে পিছুরুদ্দির মতো এমন 'কমরেড' আর হয় না। কারণ পিছুরুদ্দির গ্রামের অবস্থা এতই ভয়ংকর যে তা চিন্তাশীল পাঠককে মনে করিয়ে দেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পের কথা।

কেমন সে ভয়ংকর অবস্থা? শৈবাল মিত্রের চোখ দিয়ে আমরাও দেখি। এই পিছুরুদ্দির মতো মানুষেরা একদিন দু'বেলা খেতে পারতো। কিন্তু এখন একেবারেই 'ভূখা' মানুষের শ্রেণিতে পরিণত। গোটা গ্রাম। তারা আজ সকলেই ভূমিহীন। আর গাঁয়ের এইসব মানুষেরা— যাদের 'গাত্রবর্ণ থাকে না, ময়লা, গোলাপী লুঙ্গির উপর ততোধিক ময়লা ছেঁড়া হাফ হাতা গেঞ্জি' —তারা শহরের ফর্সা মানুষদের বিশ্বাস করতে

পারেনা। উচ্চবিত্তদের দ্বারা প্রতারিত হতে হতে বিশ্বাস ব্যাপারটাই তাদের উড়ে গেছে— সন্দেহ করা তাদের একটা বাই হয়েছে। তাহলে তো পিছুরুদ্দিকেই নেতৃত্বে আনা দরকার। তাই না?

কিন্তু; এই শ্রেণি সম্পর্কে যে পাঠকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা এই শ্রেণি থেকে উঠেছেন কিংবা সরাসরি দেখেছেন— মানে অনুভব করেছেন এই অবস্থাকে, তাঁরা আমার সঙ্গে একটি বিষয়ে একমত হবে বলে আমার প্রত্যাশা। তা হল এই যে, এই তথাকথিত শহরে বাবুদের প্রতি তাঁদের যতই সন্দেহ হোক, কোথাও অবচেতনের কোনো গভীর তলদেশে একটা দুর্বলতাও থেকে যায়। মনের চরিত্রের এ এক অনির্দেশ্য রহস্য। তাই পিছুরুদ্দিও চায়— অমিয়দার মতো শহুরে নেতাকে গ্রামে নিয়ে যেতে। তাই, আমিয়দার মতো 'প্রায়ই ঘি-ভাত খাওয়া' লোকেদের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিছুরুদ্দি দিনরাত বলে থাকে পার্টি অফিসে। যে ঘি-ভাতের সম্পর্কে লেখক কৌশলে জানিয়েছেন যে— দশ-বারো বছর বয়সে গ্রামের মহান চ্যাটাজ্জীর মেজো মেয়ের বিয়েতে এই পিছুরুদ্দি খিদের জ্বালায়, সকলের নজর এড়িয়ে হাঁড়ি ভর্তি ঘি-ভাত থেকে একটু খেতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং শাস্তি হিসেবে তার চোখ গেলে দেওয়া হয়। সে কথা মনে পড়লে আজও তার মুখ কুঁচকে যায়— যন্ত্রণায়! তবু বলে থাকে পার্টি অফিসে।

অথচ হরিহরদার মতো বড়লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে সক্কলে গেলেও পিছুরুদ্দিকে কেউ ডাকে না। সারারাত উপোষ করেই থাকে পিছুরুদ্দি। হ্যাঁ, চরিত্রের শ্রেণিগত অবস্থানের সাপেক্ষে মনস্তত্ত্বগত এক ভিন্ন পাঠ হতেই পারে। কিন্তু, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। কারণ, উপোষ করা পিছুরুদ্দির অভ্যাস আছে। গোটা পরিবারের অভ্যাস আছে। বংশানুক্রমে পিছুরুদ্দির বাপ-ঠাকুরদাও উপোষ করেছে— একথা যখন লেখক জানিয়েছেন তখন শ্রেণিগত মনস্তত্ত্বে চাপা পড়ে যায় বংশানুক্রমিক দারিদ্র্যের কাছে— যা আমার প্রতিপাদ্য।

এ গল্পে দেখি, অবশেষে অমিয়দারা আসেন পিছুরুদ্দির গ্রামে— 'শ্মশানের মতো' গ্রামে। এসে দাঁড়ায়— 'নাক নেই, চোখ নেই, স্রেফ চামড়া জড়ানো একটা হাড়ের' দেহের সামনে। পিছুরুদ্দির মা! শেষ নয়, আরো আছে— পিছুরুদ্দির হাতের আলু, আটা আর ভেলিগুড় দেখে—

> ''খুশিতে আর আবেগে বুড়ির মুখের অদৃশ্য ঠোঁট, চোখ, কান, নাক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে থাকলো। দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকা পিছুরুদ্দির সন্তানরাও খলবল করে উঠলো।''
>
> ['সংগ্রামপুর যাত্রা'/সমগ্রন্থ/পৃ. ৫৭]

'মান্য মাইতির আইন অমান্য' গল্পেও একইরকম অভাব ও দারিদ্র্যের কথা পাচ্ছি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে, যদিও গল্পের শেষে গিয়ে বার্তা কিছুটা বদল হয়ে যায়—

দুটি চরিত্রের অবস্থানগত পার্থক্যের মনস্তাত্ত্বিক চাপ এবং শেষ পর্যন্ত তার বিস্ফোরণ। খুবই গরীব মান্য মাইতি আইন অমান্য করার অপরাধে লকআপে থাকবে বলে ননীবাবুর সঙ্গে থানায় এসে বসে আছে। ননীবাবু বয়সে ছোট হলেও পার্টির ওপরতলার নেতা, আর মান্য মাইতি বয়স্ক হলেও সামান্য পার্টিকর্মী। কিন্তু লকআপে জায়গা নেই! তাই বড়বাবুর অপেক্ষায় বসে। খিদে আর ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুজে আসে মান্যর। হাই ওঠে। খিদে তো পাবেই, এতটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছে— যদিও উপোষী ছেলেমেয়ে আর বউয়ের সামনেই; ঘরে চলে বাড়ন্ত থাকলেও সে ভাত আর ডাল খেয়ে এসেছে। কেন খেয়েছে? এখানে একের পর এক বেরিয়ে আসে মান্যের অবস্থার কথা। দ্বিতীয় পক্ষের নতুন বউ বিমলার মুখের দিকে চেয়েই ভাত খেয়েছে মান্য—

> ''বাইশ বছরের যুবতীর তাজা বুকের আবেগের চেয়ে দারিদ্র্য বা পাকা চুল তো আর বেশি শক্তিশালী নয়। মান্য তাই হামলে পড়ে ডাল ভাত খেয়েছিল। আধপেটা চার ছেলেমেয়ে আর নতুন বৌ-এর কথা ভাবেনি।''
>
> ['শ্রেষ্ঠ গল্প'/'মান্য মাইতির আইন অমান্য'/দে'জ/১৯৯৯/পৃ. ৪৫]

আগেই বলেছি, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতও এ গল্পে একটা বড় দিক। এখানেও তা আসতেই পারে। কিন্তু তাতে মান্য মাইতিদের অমানবিক দারিদ্র্য সত্ত্বেও অন্য মানবিক গুণই ফুটে ওঠে। মান্যর দ্বিতীয় স্ত্রী বাইশ বছরের। কেন? আবার লেখকের কলমের দু-একটি আঁচড়ে উঠে আসে মান্যর অর্থনৈতিক অবস্থান। মান্যর প্রথম স্ত্রী লক্ষমণি মাঝরাতে বুক ধড়ফড় করে মারা যায়। আর তাতে মান্যর অনুতাপ খুব কম এজন্যই যে— মাঝরাতে মারা যাওয়ায় ডাক্তার বা ওষুধের খরচার হাত থেকে সে বেঁচে গেছে। সে সাধ্য তো মান্যর নেই। গরীব হওয়ার সুবাদে জীবনের নির্মম সত্যকে সে উপলব্ধি করেছে— 'আর্থিক সাধ্য, সংগতি না থাকলে শুধু ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যায় না'।

আরো মারাত্মক উপলব্ধি— জীবন জিজ্ঞাসার কথা উঠে আসে মান্যর চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে। মান্যর খিদে পায়— অস্থির হয়ে ওঠে; কিন্তু মান্য দেখে ননীলালের খিদে পায় না। ননীলাল শিক্ষিত, স্কুল মাস্টার। ওপর তলার নেতা, আর মান্য ক্যাডার, চাষা, মুখ্যু মানুষ। মান্য অবাক হয়, নানান কথা মনে হয় তার—

> ''লেখাপড়া জানা লোকেদের খুব একটা ক্ষিদে পায় না হয়তো বিদ্যের ভারে ক্ষিদে মরে যায়। মান্যর মনে তাই একটা আফশোষ আছে। লেখাপড়া শিখলে হয়তো এই ক্ষিদের হাত থেকে বেঁচে যেতো।''
>
> [ঐ, পৃ. ৪৩]

কি বলবেন একে? উপলব্ধি, ব্যঙ্গ-শ্লেষ, নাকি খিদের জ্বালায় অশিক্ষিত সরল সাদা মানুষের খিদে-মুক্তির অভিলাষ চিন্তা!

অর্থনৈতিক অবস্থা আর ইজ্জত রক্ষার দ্বন্দ্ব সাহিত্যের আসরে তেমন কোনো নতুন ইস্যু নয়। কিন্তু এই বিষয় নিয়েই শৈবাল মিত্রের 'খয়ের খাঁর ইন্তেকাল' গল্পটির গতিপ্রকৃতি ভালোভাবে লক্ষ করলে পাঠক চমকে উঠবেন, কোনো সন্দেহ নেই। ধন্বন্তরি পীর পয়গম্বর খয়ের খাঁ সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী হোচেন খাঁ সাহেবের ইন্তেকালের কথা গ্রামের সবাইকে জানিয়ে দেয়। লোকসমাগম-খাওয়া দাওয়া উৎসবের পর্যায়ে। খয়ের খাঁ ওষুধে সেরে ওঠায় দাশু হালদারও এসেছে, যে দাশু হালদার একটু উচ্চশ্রেণির, মানে অর্থনৈতিক দিক থেকে। এই দাশুর সূত্রেই মূল গল্প।

প্রায় ছ'মাস আগে চিনিবিবি আত্মহত্যা করেছিল যে চিনিবিবির স্বামী ইদ্রিশ মাঝি সুন্দরবনে কাঠ আনতে গিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেলে হোচেন তাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায়। হোচেন তাকে সত্যি ভালোবাসলেও চিনিবিবি নারীসুলভ লজ্জায় কিছুই বলে না— পেট চালানোর জন্য থানার বড়বাবু দাশু হালদারের ঢেঁকিশালে কাজ করে সে; প্রায় দেড় বছর। একসময় কাজটি চলে যায়। হোচেন তা জানতে পারে আমতলার হাটে এবং কাজ যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে লজ্জায় মাথার কাপড় সামলে চিনি জানায়— 'কর্তা চায়। মুই বাজারে ঘর নে থাকি। তোমার সঙ্গে নিকের খবরে উনি চটেছেন'। চিনির শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে হোচেন একটি কাপড় কিনে দেয় তাকে। আর, সাতদিন পরেই নিকে করবে বলে গ্রাম ছেড়ে শহরের কলে কাজ করতে যায় হোচেন।

ঠিক সাত দিন পরেই ফিরে হোচেন দেখে জয়ন্ত হালদারের পুকুর পাড়ের লিচু গাছে চিনিবিবির ঝুলন্ত দেহ। চারদিকে খবর রটে যায় চিনিবিবির পেটে নাকি বাচ্চা এবং তা হোচেনের। এক মাসের জন্য হাজতবাসও হয় হোচেনের। কিন্তু মুখ্যুসুখ্যু। হোচেন বুঝে পায় না এই আত্মহত্যার কারণ কি?

পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন আত্মহত্যার কারণ! জনপ্রিয় গল্পকারের সুখপাঠ্য গল্পের প্রচলিত যে ফর্মুলা, তা অতি সহজেই সেই ইঙ্গিত দেয় আমাদের। কিন্তু না। তাহলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনায় এ গল্প আসতো না!

একমাস পরে জেল থেকে ফিরে হোচেন জানতে পারে, চিনিবিবির পেটে পাওয়া গিয়েছিল 'শুধু আধসেদ্ধ কলমি শাক আর জল'। হ্যাঁ, ইজ্জত রক্ষা আর দারিদ্র্যের যুদ্ধ তো বটেই! ঢেঁকিশালের কাজটি তো সেজন্যই চলে যায়। হাসিমুখে দারিদ্র্যকেই বরণ করে নেয় চিনিবিবি। কিন্তু সে দারিদ্র্য এতই অমানবিক যে 'খিদের জ্বালায়, পাঁচ দিন উপোষ করে সে গলায় দড়ি দেয়'। দারিদ্র্যের সেই অমানবিকতার সাক্ষ্য বহন করে হোচেনের দেওয়া সেই শাড়িটি, যা দু'টুকরো করে— অর্ধেকটা কোমরে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে, আর অর্ধেকটা দিয়ে গলায় ফাঁস দেয় চিনিবিবি!

এইরকম অনেক গল্পেই শৈবাল মিত্র তুলে ধরেছেন এইসব অন্তেবাসী মানুষদের দারিদ্র্যের কথা। 'কমলি তুই ঘরে যা', 'ইলিশের রাত', 'আতর আলির

রাজসজ্জা', 'লাশ জেগে ওঠে' প্রভৃতি আরো বহু গল্পেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে আসে স্বাধীনতা পরবর্তী নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনের কথা।

'আতর আলির রাজসজ্জা'-তে দেখা যাবে, এরা প্রায় তিন মাস মতো খাওয়া-দাওয়া পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ঐ যখন ধান ওঠে আর কি। তারপর 'শুকনো প্যাঁকাটি মার্কা'। চেহারা, বছরের বাকি সময়। তাই বলে কি এদের সখ-আহ্লাদ থাকতে নেই? মানুষ তো। তাই আতর আলিকে দেখি, ড্রেস এবং ডেকোরেটিং ব্যবস্থার মালিক— মেজোকত্তার কাছ থেকে ভাড়ার রাজপোষক নিয়ে বিয়ে করতে যেতে।

তবে 'লাশ জেগে ওঠে' গল্পের তীব্রতা, আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষিতে অনেক বেশি। মালোপাড়ার গল্প। চুরি-ডাকাতি, খুন-যখন, ছিনতাই-রাহাজানি প্রায় লেগেই থাকে। দাগি আসামী এবং দরিদ্র তো বটেই, - কালু মালো তার বউকে একদিন খুন করে ফেলে। এটা তেমন কিছু না, এজন্যই যে— 'সংসারে ক্ষিদে অভাব থাকলে এরকম ঝগড়া, দু'একটা খুন হতেই পারে'। কিন্তু কালুর মতো দাগী আসামী খুব ক্যাজুয়ালি তা স্বীকারও করে। কালুর সত্যবাদীতায় আইনজীবীরা তাজ্জব বনে যায়। শুধু তাই নয় কালুর আইনজীবী কিছুতেই তাকে বলাতে পারে না যে সে খুন করেনি। ফলে কালুর যাবজ্জীবন জেল হয়।

কেন এমন? কালুর আত্মগ্লানি? কর্মফল ভোগের মাধ্যমে অনুতপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা খোঁজা? না, এসব নয়—

> "জেলের ভেতর বুক চিতিয়ে কালু এমনভাবে হেঁটে চলে গল্প করে বেড়াতো সে, তাকে দেখে মনে হ'ত, সে কোন শৈল শহরে হাওয়া খেতে এসেছে। শরীরের রোগ ভোগ সেরে কালু সুস্থ হয়ে উঠলো, তার ওজনও হু হু করে বেড়ে গেল। রুগ্ন, ভাঙাচোরা শরীর কালুকে দেখে এতদিন আধবুড়ো বলে মনে হতো, এখন বোঝা গেল যে, সে চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ বছরের তাজা তাগড়, ফুর্তিবাজ জোয়ান।"
>
> ['জেগে ওঠে লাশ'/'মা বলিয়া ডাক'/কবিপত্র প্রকাশন/১৯৮৭/পৃ. ৯৭]

জেলখানার খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া কালুর জীবনধারণের আর কোনো পথ ছিল না। হ্যাঁ, সেরকম পরিবারেই কালুর জন্ম, অর্থাৎ এই অভাব যে পুরুষানুক্রমিক তাও জানা যায় অন্য বন্দীদের কাছে কালু যখন তার জীবনকথা বলে। কালুর মা ফুল্লরা একদিন গভীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে কালুর জন্ম দেয়। এবং সদ্যজাত শিশুকে গাছতলায় রেখে, আগে কাঠের বোঝাটি বাড়িতে রেখে আসে। কারণ—

> "গাছতলায় ছেলেটাকে রেখে গেলে কেউ ছোঁবে না, কিন্তু এত বড় একটা কাঠের বোঝা বেওয়ারিশ পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই লোপাট হয়ে যাবে। পেটের বাচ্চার চেয়ে মেহনতের কাঠ অনেক বেশী দামি।"
>
> [ঐ, পৃ. ৯৯]

শৈবাল মিত্র লেখার জগতে এসেছিলেন রাজনীতি ছাড়ার পর, অর্থাৎ ১৯৭৭-এর পর। যদিও গল্পের সময় অর্থাৎ প্রেক্ষাপট কোন কোন ক্ষেত্রে ষাট দশক বা তারও পূর্ববর্তী। কিন্তু বেশির ভাগই আশি-নব্বইয়ের সময়ের গল্প। তখনও এত অভাব মানুষের। নিচুতলার মানুষের। লেখকের আবেগাশ্রিত 'সাহিত্যের বাস্তব' নয় তো! কেননা, ১৯৭৫ সালে তো ভারতবর্ষের রেকর্ড পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে তিনি আমৃত্যু মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী লেখক, যাঁরা কখনোই কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী নয়। আর রেকর্ড পরিমাণ শস্য উৎপাদন হলেও কেন এই অবস্থা দেশের, সে কৈফিয়ৎও তিনি দিয়েছেন এবং তা গল্পের মধ্যেই। 'মা বলিয়া ডাক' গল্পে এর চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যদিও গল্পটির আবেদন একেবারে ভিন্ন - পুলিশের অত্যাচার।

এ গল্পে নক্কিরাণীর স্বামী গর্ভবতী নক্কিরাণীকে রেখে চলে যায় পাতাল রেল কাজ করতে। পাতাল রেল— মানে এই দুটো শব্দেই গল্পের সময়কাল চিহ্নিত। আর সংসারের অক্টোপাশে জর্জরিত নক্কির আলাপ হয়ে যায় চোরাচালানকারী গন্ধকালীর সঙ্গে, যে গন্ধকালীর প্রথম পক্ষের স্বামী আবার এই কাজ করতে গিয়েই পুলিশের হামলায় মৃত্যুবরণ করে। তারপর গন্ধকালী জগাই-এর রক্ষিতা, যে জগাই চোরাচালানের মূল পাণ্ডা। আর এই জগাই-এর সূত্রেই বেরিয়ে আসে রেকর্ড পরিমাণ শস্য উৎপাদন সত্ত্বেও কেন খাদ্যের এত অভাব—

> "রেকর্ড খাদ্য উৎপাদন মানেই দেশজুড়িয়া রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য সংকট। অভাব, অনাহার, কালোবাজার এবং অজন্মা হইলেই খাদ্য সংকট কম হয়। কেননা, যাহারা কালো টাকার মালিক, অল্পস্বল্প উৎপাদন হইলে তাহারা টাকা লাগাইতে উৎসাহ বোধ করে না। বিপুল পরিমাণ কালো টাকাকে সক্রিয় রাখিতে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন এবং দেশজোড়া বাজারের দরকার হয়। জগাই বুঝিল, যে এ বৎসর তাহাদের রমরমা ব্যবসা হইবে।"
>
> ['মা বলিয়া ডাক'/'মা বলিয়া ডাক'/কবিপত্র/১৯৮৭/পৃ. ৫৪]

তাহলে আর সন্দেহ থাকে না, এই অকল্পনীয় দারিদ্র্যের বাস্তবতা সম্পর্কে। উল্লেখ্য, মহাশ্বেতা দেবীও এই সময়েই লিখছেন, এই সময়ের কথাই লিখছেন এবং এদের কথাই লিখছেন।

শুধু এই দারিদ্র্য আর এইসব অভাবগ্রস্ত মানুষের কথাই বলেননি শৈবাল মিত্র। এই অভাবী মানুষদের কীভাবে কাজে লাগায় রাজনৈতিক নেতারা এবং কাজ ফুরোলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়; সে কোথাও দেখিয়েছেন— যা এই একুশ শতকেও চোখ খোলা রাখলে আমরা দেখতে পাই প্রতিবার ভোটের সময়। এরকমই একটি মর্মান্তিক গল্প 'ভোটার বৈরাগীচরণ'।

দরিদ্র মানুষের খিদের জ্বালাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতার লড়াইয়ে জিততে চাওয়া রাজনৈতিক নেতারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে ভোটারদের। একশো দুই বছরের পঙ্গু ভোটার বৈরাগীচরণকেও তাই ডুলি করে নিয়ে আসে। যদিও অন্য একজনকে আনতে গিয়ে, তাকে না পেয়ে এই শতায়ু ভোটারকেই লুচি আর বোঁদে, খাওয়ানোর আশ্বাস দিয়ে নিয়ে আসে ভোটকেন্দ্রে। অথচ এই বৈরাগীচরণ— ভোট কি, তাই জানে না! এইসব অবহেলিত, অভুক্ত দুর্বল মানুষের হীনমন্যতার মনস্তত্ত্বকে ঠিক যেভাবে গ্যাসবেলুনে পরিণত করা হয় আজও, ঠিক সেই ভঙ্গিতে পার্টির চামচারা বোঝায় বৈরাগীকে— 'ভোট একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কারা দেশ শাসন করবে। সেটা তুমি ঠিক করে দেবে'।

তবে দরিদ্রের থেকেও দরিদ্র এই ভোটারের কাছে অবশ্য লুচি বোঁদেটাই বড় ব্যাপার। তাই ক্লান্ত অবস্থায় বৈরাগীচরণ ডুলির ভিতর বসে যখন পৌঁছয় ভোট-উৎসবের ভোজবাড়ি— বুথের কাছে, তার তন্দ্রাভাব কেটে যায়—

> "ডুলির বাইরে ঘাড় বার করে মুগ্ধ, বিহ্বল চোখে জিলিপি আর বোঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। এতো জিলিপি! এতো বোঁদে! ভোঁতা হয়ে যাওয়া— ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়ে একটা জোরালো নিঃশ্বাস টানে সে। পুরোনো এক স্বপ্ন আর স্মৃতিতে সে যেন বুঁদ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।"
>
> ['ভোটার বৈরাগীচরণ'/'শ্রেষ্ঠ গল্প'/'দে'জ/১৯৯৯/পৃ. ৬৪]

বৈরাগী তাই ভাবে, প্রতিবছর সে ভোট দিতে আসতে চায়, লুচি বোঁদে খেতে চায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটপুজোর সমাপ্তি হলে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে বারবার হস্তান্তরিত হতে হতে বৈরাগীচরণকে আর লুচি বোঁদে খাওয়ানোর লোক পাওয়া যায় না; পৌঁছে দেওয়া তো অলীক স্বপ্ন। বটতলার বাঁধানো চাতালে ক্লান্ত অবসন্ন বৈরাগীকে শায়িত দেখে ভিখিরি মনে হয় ভোট গ্রহণ কর্মীদের। সবাই চলে যায়। আর খিদের জ্বালায় বৈরাগী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তবু—

> "ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বৈরাগীচরণ স্বপ্ন দেখছে, তার সামনে পেছনে লুচি বোঁদের পাহাড়। হাওয়ায় ভুর ভুর করছে লুচি বোঁদের গন্ধ। বৈরাগীচরণ জানেনা, একপাল উপোষী শিয়াল ধীরে ধীরে তার পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে।"
>
> [ঐ, পৃ. ৭০]

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে একজন শিক্ষিত এবং অনুভূতিশীল তরুণের স্বপ্ন— যেমন হবার কথা, হয়েও ছিল আমাদের বাংলায় হাজার হাজার তরুণের; শৈবাল মিত্রের ক্ষেত্রেও তাই সত্য। স্কুল জীবন থেকেই হৃদযন্ত্রের সমস্যা দিয়েও তাই রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছেন গ্রাম-গ্রামান্তরে স্বপ্ন দেখেছেন এক উন্নত ভারতের। নিজেই জানান—

"জোড়াতালি দেওয়া হৃদযন্ত্র নিয়ে উত্তাল সময়ের কর্মসূচিতে নেমে পড়লাম। ...মুক্তির দশক তৈরির কাজে যতটা সম্ভব ডুবে থেকেছি। পৃথিবী জোড়া যুববিদ্রোহের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করতে চেয়েছি।"

['শৈবাল মিত্র- 'আজ আছি'/আরুণি পাবলিকেশন/২০০৩/পৃ. ৮৩]

কিন্তু সেসব যখন আর হয়নি, হওয়া সম্ভব নয় বুঝেছেন তখন তিনি আশ্রয় নেন লেখার মধ্যে। আর আগেই একবার বলেছি যে পৃথিবী এবং মানুষের প্রতি এক ক্রোধ— যা আসলে বিকল্প ভালোবাসা, তাই-ই গতিদান করেছে তাঁর কলমকে। আবার 'কেন লিখি' থেকে একথা জানা যায় যে তিনি কারো হিত বা অহিত করার জন্য নয়, লেখেন নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্য। মানুষের প্রতি এই 'ক্রোধ/বিকল্প ভালবাসা'-ই দারিদ্র্যের নগ্নচিত্রকে তুলে এনেছে তাঁর গল্পে। আর যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, তা তো পূরণ হয়নি আজও! সেই জন্যই লেখালেখি তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের মতো করে কথা। তবে তা একই হয়ে ওঠে আমাদেরও কথা— আমাদেরও নিজের সঙ্গে কথা।

গুরুসদয় দত্ত ও ব্রতচারী আন্দোলনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ : গুরুসদয় দত্ত একজন সরকারি কর্মচারী, লোকসাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি ১৯৩০-এর দশকে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বেঙ্গল ক্যাডারে আই. সি. এস. হিসাবে স্বাতন্ত্র্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন, যা ১৯০৫ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কলকাতায় আসার আগে তিনি আরাহ, হুগলি, পাবনা, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া ও ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অপরদিকে ব্যবস্থাপক পরিচালক, শিল্প সচিব, স্থানীয় স্বশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সরকারি চিফ হুইপও ছিলেন। ১৯৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্য পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন। গুরুসদয় দত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তা অনুভূত হয়েছিল। তাঁর নিজের জীবন দর্শন ও ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল।আমি আমার গবেষণাপত্রে গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর ব্রতচারী আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

মূল শব্দ : গুরুসদয় দত্ত, আইসিএস, মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, ব্রতচারী আন্দোলন, জেলাশাসক, প্রাদেশিক পরিষদ, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, জাতিসত্ত্বা, জাতিবাদ, ছন্দবাদ, লোকসংস্কৃতিবিদ।

মূল আলোচনা:

ব্রতচারী আন্দোলন হচ্ছে ১৯৩২ সালে গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের আন্দোলন। ১৯৩২ সালে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও নাগরিকত্ববোধ তৈরি করা ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি'র মাধ্যমে এই আন্দোলনের কার্যক্রম প্রচারিত হতো। সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল কলকাতার ১২ নং লাউডন স্ট্রিটে। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন এলাকায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে 'ফরিদপুর ব্রতচারী সমিতি'র মুখপাত্র হিসেবে 'বার্ত্তা'

নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলার ব্রতচারী সমিতির উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে 'বাংলার শক্তি' নামে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ইউরোপেএ আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায়। ইংরেজ সরকারেরও এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল। ব্রতচারী আন্দোলনের তিনটি উক্তি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হলো- 'আমি বাংলাকে ভালবাসি, আমি বাংলার সেবা করব এবং আমি বাংলার ব্রতচারী'। অতঃপর পঞ্চব্রত, ব্রতচারী প্রতিজ্ঞা, ব্রতচারীর ষোলপণ, ষোলপণের অতিরিক্ত এক পণ, ব্রতচারীর সতেরো মানা (নিষেধাজ্ঞা), ব্রতচারী বৃত্ত ইত্যাদি আবৃত্তি করে এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। ব্রতচারী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি ব্রতচারীদেরকে জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দের সাথে জীবন যাপনের পথদর্শন করা। ব্রতচারীদের সত্যনিষ্ঠা, সংযম, অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরতা, মাতৃভাষার প্রতি অগাধ গুরুত্ব, স্বাস্থ্যজ্ঞান ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই আদর্শগুলি বেশিরভাগই মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বা শ্রীচৈতন্যধর্মের অনুসরণেই ব্রতচারী আন্দোলনে গ্রহণ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ তৎকালীন সময়ের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ গুরুসদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রতচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ফলে চৈতন্যধর্মের প্রভাব এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। ঐক্যবদ্ধভাবে লোকনৃত্য ও লোকসংগীত চর্চার মাধ্যমে মানসিক ও আত্মিক বিকাশ লাভ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বমানব হবার লক্ষ্যে শাশ্বত বাঙালি হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত বাঙালির অন্তরের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, যেমনটি শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বমানবতার আহবানের ক্ষেত্র হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বৈষ্ণব পতাকাতলে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১]

গুরুসদয় দত্ত (১০মে, ১৮৮২-২৫জুন, ১৯৪১) ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী, লোকসাহিত্য গবেষক এবং লেখক। তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ সালের ১০ মে অবিভক্ত বাংলার সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার (অধুনা জকিগঞ্জ উপজেলা) কুশিয়ারা নদীর তীরে বিরশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বাংলায় ইংরেজ শাসনের ১২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ধূর্ত, দাম্ভিক মেকলের ১৮৩৫ সালের পরিকল্পনা অনুসারে শহরে, গ্রামেগঞ্জে গড়ে উঠেছে ব্রিটিশের সেবাদাস 'বাবু' সম্প্রদায়। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট নব্য জমিদারদের এবং মহাজন, আমলা, নীলকর, বেনিয়াদের দৌরাত্ম্যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামাঞ্চলে গভীর হতাশার পাশাপাশি ঘটছে নানা বিক্ষোভ বিদ্রোহ। মাতৃভাষা ও লোকসংস্কৃতিকে তখন অবজ্ঞার চোখে দেখা হত। এরই মধ্যে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর যে নবজাগরণের ঢেউ গড়ে তোলেন তাতে অংশগ্রহণ করেন গুরুসদয় দত্ত। তাঁর পিতা রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী ছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাঁর মায়ের নাম আনন্দময়ী দেবী। তাঁদের পরিবার ছিল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।[২] তাই মূলধরার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়েছিল

তাঁর সারাজীবনব্যাপী কাজের মধ্যে। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে চৌদ্দ বছর বয়সে মাকেও হারান তিনি। বাবা মায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যাঠামশাই -এর কাছেই তিনি বড় হন। তাঁর জ্যাঠামশাইও ছিলেন গ্রামের জমিদার। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতিপ্রেমী গুরুসদয় দত্ত বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালানো, শিকার করায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অনাথ গুরুসদয়ের প্রতি জ্যাঠামশাইয়ের কোনরূপ স্নেহ-মায়া-মমতা ছিল না, নিতান্ত অনাদরেই তিনি বড় হয়েছেন। কিন্তু তখন গ্রামের আরেক বয়স্ক ব্যক্তি তারকচন্দ্র রায় তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তারকচন্দ্রের প্রেরণাতেই গ্রামের সেবামূলক কাজে যুক্ত হন গুরুসদয়। কখনো আগুন লাগলে উদ্ধারকার্য, কখনো আবার বন্যার সময় গ্রামবাসীদের ঔষধ পৌছে দেওয়ার সব কাজেই গুরুসদয় দত্তের উৎসাহ ছিল প্রবল। গুরুসদয় দত্ত ইংরেজদের দেওয়া নিজ পারিবারিক উপাধি 'চৌধুরী’ ব্যবহার করতেন না।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় সিলেট জেলার বীরশ্রী গ্রামের মাইনর স্কুলে। তারপর তিনি সিলেট শহরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৮ সালে এই স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই স্কুল থেকে ১৮৯৯ সালে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। ১৬ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পুরো জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। সমগ্র গ্রামের মধ্যে গুরুসদয়ের এই সাফল্য গর্বের বিষয় হয়ে ওঠে। এরপরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর জ্যাঠামশাই দিতে অস্বীকার করলে, শ্রীহট্ট সম্মিলনী’ নামে একটি স্থানীয় সমাজ সেবামূলক সংস্থা গুরুসদয়ের পড়াশোনার ভার নেয়। তবে তাদের শর্ত ছিল যে এফ. এ পরীক্ষায় গুরুসদয়কে প্রথম হতে হবে। ১৯০১ সালে তিনি এফ. এ পরীক্ষা দেন এবং মেধানুসারে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এই সময়েই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরমে ওঠে এবং কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো মহান জাতীয়তাবাদী নেতাদের বক্তৃতা শুনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন গুরুসদয় দত্ত। ফলে একজন তরুণ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করেন তিনি। এফ.এপরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি পেয়েছিলেন ‘ইন্ডিয়া স্বর্ণপদক' এবং পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীহট্ট সম্মিলনীর আর্থিক সহায়তায় ইউরোপের কেমব্রিজ ইমানুয়েল কলেজে পড়ার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন গুরুসদয়। যথারীতি তিনি বিলাত এসে পৌঁছান। ১৯০৪ সালে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপরের বার পরীক্ষাতেও প্রথম হলে 'অনারেবল সোসাইটি অফ গ্রে’স ইন’ তাঁকে ডেকে পাঠায়। লন্ডনে থাকাকালীনই তিনি নিজের পদবী থেকে 'চৌধুরী’ শব্দটি বাতিল করেন।

দেশে যখন ফিরে এলেন, সে সময় লর্ড কার্জন কর্তৃক দেশভাগে স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে।[৩] মহকুমা শাসকের কাজের মধ্য দিয়ে এই সময় তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। একজন দক্ষ আইসিএস অফিসার হিসেবে তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মহকুমা শাসকের পদে আসীন হয়ে চাকরির বেতন থেকে তিনি শুধু শ্রীহট্ট সম্মিলনীর বৃত্তির টাকা ফেরত দিয়েছিলেন তাই নয়, নিজের উদ্যোগে শ্রীহট্টে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা একটি তহবিল গড়ে তোলেন। আইসিএস অফিসার হিসাবে গ্রাম উন্নয়নের কাজে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং ১৯১৮ সালে বীরভূমে তিনি 'গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প' শুরু করেন যার মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামে গ্রামে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। পরে এই প্রকল্প বাঁকুড়া, হাওড়া ও ময়মনসিংহ জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু একসময় ব্রিটিশ সরকার এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রত্যেকে গুরুসদয় দত্তকে পরস্পরে গুপ্তচর বলে মনে করেন। ১৯২৮ সালে 'বামুনগাছি রেলওয়ে ওয়ার্কশপে'র কর্মচারী এবং শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদে তিনি সরব হন এবং তাঁর এই প্রতিবাদের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে লন্ডনের লর্ডস হাউসেও। ১৯২৯ সালে গান্ধীবাদী প্রতিবাদীদের ওপর পরোয়ানা জারি করার প্রশাসনিক হুকুম মানতে না পারায় বীরভূমে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়। হাওড়া, হুগলি, পাবনা, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, কলকাতা, বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় তাঁর কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২২ সালে তিনি বাঁকুড়ায় 'সমবায় সেচ প্রকল্প' চালু করেন যা পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ এবং বীরভূমে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে রোমে 'আন্তর্জাতিক কৃষি প্রতিষ্ঠানে' ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। তাঁর স্ত্রী সরোজনলিনীর দত্তের মৃত্যুর পরে স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে গুরুসদয় দত্ত স্থাপন করেন 'সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন'।[৪] যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মহিলাদের প্রথাগত পড়াশোনা ও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।সময়টাও ১৯২৫ সাল।এই বছরেই 'বঙ্গলক্ষী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন গুরুসদয়।১৯২৯ সালে একইভাবে 'গ্রামের ডাক' নামে আরেকটি পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। ময়মনসিংহে তিনি জারি গান ও জারি নৃত্যকে পুনরুদ্ধার করে 'লোকনৃত্য পুনরুদ্ধার সমিতি' গড়ে তোলেন। লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩০ সালে বীরভূমের রায়বেঁশে নাচকে তিনি নতুন করে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৯৩১ সালে গুরুসদ দত্তের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'। ১৯৩২ সালে গুরুসদয় দত্তের নেতৃত্বে সমগ্র অখন্ড বাংলা জুড়ে শুরু হয় 'ব্রতচারী আন্দোলন'। ১৯৩৩ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলে দিল্লিতে ব্রতচারী নাম পাল্টে তিনি সংগঠনের নাম দেন 'সর্বভারতীয় লোকনৃত্য ও লোকগীতি সমিতি'।পরে আবার ১৯৩৪ সালে এই নাম বদলে রাখা হয় 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি'। পঞ্চব্রত ও ছন্দাত্মক সাধনার মধ্য দিয়ে বাংলার ব্রতচারীকে তিনি বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে

তোলেন। এই পঞ্চব্রত হল ব্রতচারী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ- এই পাঁচটি ব্রত মেনে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক হতে হবে। এছাড়াও ব্রতচারীদের মধ্যে জ্ঞানের সীমা প্রসারণ, নারীর মুক্তি আন্দোলন, শ্রমের মর্যাদা বর্ধন ইত্যাদি মোট ১৬টি পণ যুক্ত করেন গুরুসদয়। বাঙালি সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয় হিসেবে তিনি তুলে ধরতে চাইলেন এই ব্রতচারীকে।[৫]

এসবের বাইরেও দীর্ঘ বারো বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে নকশি কাঁথা, পট, মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, সরা, হাতপাখা, বিনুনি বাঁধার দড়ি ইত্যাদি নানাবিদ লোকজ শিল্প উপকরণ সংগ্রহ করেছেন গুরুসদয় দত্ত। এগুলি সবই বর্তমানে 'গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা'য় সংরক্ষিত আছে। ভূমিবাদ আর ছন্দবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর বাঙালি জাতিসত্ত্বার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন তিনি। এছাড়াও গুরুসদয় দত্ত বিভিন্ন সময় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলি বর্তমানে দুর্লভ। তাঁর মৃত্যুর পরেও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি হল- Agricultural Organization and Rural Reconstruction in Bengal (১৯২২), ভজার বাঁশি (১৯২৬), গ্রামের কাজের ক খ গ (১৮২৮), সরোজনলিনী (১৯২৮), পল্লী সংস্কার ও সংগঠন (১৯২৮), পাগলামির পুঁথি (১৯২৮), পুরীর মাহাত্ম্য (১৯২৮), A Woman of India (Biography of Sarojnalini Dutt, 1928), গানের সাজি (১৯৩১), বাংলার সামরিক ক্রীড়া (১৯৩১), Folk Song and Folk dance in Indian School (১৯৩১), পটুয়া (১৯৩২), চাঁদের বুড়ি (ছড়া, ১৯৩৩), ব্রতচারী সখা (গানের বই, ১৯৩৩), The Indian Folk Dance and Folk Song Movement (১৯৩৩), ব্রতচারীর মর্মকথা (১৯৩৭), Bratachari it's aim meaning (১৯৪২), The Folk Dance of Bengal (১৯৫৪), পল্লী সংগীত, শ্রীহট্টের লোকসংগীত (১৯৬৬), Folk Art and Crafts of Bengal (১৯৯০), বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে (১৯৯৪), Art of Kantha (Album, 1995) প্রভৃতি। তাঁরসম্পাদনায় 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতো 'ব্রতচারী বার্তা' নামে একটি পত্রিকা। গুরুসদয় ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং দুরারোগ্য কর্কট রোগের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। ১৯৪১ সালের ২৫ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬]

ব্রতচারী আন্দোলনের উদগাতা এবং লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতির এক অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গুরুসদয় দত্ত পেশায় একজন দক্ষ আইসিএস অফিসার হলেও তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে মূলধারা স্রোতে ফিরিয়ে আনা। বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর ব্রতচারী এক বিশেষ অবদান রেখেছে। তিনিই প্রথম সমবায় প্রথায় কৃষি কাজের প্রবর্তন করেন। বামনগাছিতে রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার ওগুলিবর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে তাঁর সরব ব্রিটিশ-বিরোধী ঐতিহাসিক রায় ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল। 'বঙ্গীয়

পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি,' 'হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকারী সমিতি' সব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে বীরভূমের রায়বেঁশে নৃত্যকে পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি নানা জেলায় ঘুরে ঘুরে সেখানকার লোকজ শিল্প সংগ্রহ করেছেন গুরুসদয় দত্ত। ভূমিবাদ আর ছন্দবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরবাঙালি জাতিসত্ত্বার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখাতে এগুলি তুলে ধরেছেন।

ব্রতচারী আন্দোলন একটি আত্মিক ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বীরভূম জেলায় কর্মরত অবস্থায় গুরুসদয় দত্ত পরিচালিত 'শিক্ষা শিবিরের' পথ ধরে ১৯৩২ সালে এর সূচনা হয়। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ,স্ত্রী-পুরুষ ও বয়স নির্বিশেষে সব দেশের মানুষের মধ্যে একটা বিশ্ব-নাগরিকত্ববোধ ও জাতীয় চেতনা প্রতিষ্ঠা করা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাতীয় ও লোকসংস্কৃতি বিশেষত লোকনৃত্য ও লোকসংগীত চর্চার মাধ্যমে শরীর, মন ও আত্মাকে বিকশিত করা এবং দেশ ও মানব সেবায় সহপ্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করা ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে গুরুসদয় দত্ত 'বাংলা ব্রতচারী সমিতি' গঠন করেন।[৭] তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশসহ অনেক স্থানে এ আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও, বিশেষত ইউরোপে এ আন্দোলন বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় এবং সেখানকার অনেকেই এতে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের সূত্রে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্রতচারীগণকে পঞ্চব্রত পালন করতে হয়। পাশাপাশি ব্রতচারী সাধনা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। চরিত্র, কৃত্য, সংঘ ও নৃত্য। ব্রতচারী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তবেই এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়।অখন্ড বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রতচারী সমিতি গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে হুগলি জেলার ব্রতচারী সমিতি, কালীঘাট উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ব্রতচারী সংঘ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সাউথ ইন্ডিয়া ব্রতচারী সোসাইটি' এবং 'সর্বভারতীয় ব্রতচারী সমাজ'। পূর্ববঙ্গে ব্রতচারী আন্দোলন বাস্তবায়নের জন্য যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে 'ফরিদপুর ব্রতচারী সমিতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো কয়েকটি সংগঠন যেগুলি ব্রতচারী আন্দোলনকে সক্রিয় করেছিল, সেগুলি হল- কুমিল্লা ব্রতচারী সমিতি, মাদারিপুর উচ্চ ইংরেজি ব্রতচারী সংঘ, পাংশা ব্রতচারী সংঘ, খুলনা জেলা ব্রতচারী, ঢাকা জেলা ব্রতচারী, ভাঙ্গা ব্রতচারী সংঘ, গোপালগঞ্জ মথুরালয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ব্রতচারী সংঘ, শিবচর নন্দকুমার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ব্রতচারী সংঘ, সিরাজগঞ্জ সাব ডিভিশন ব্রতচারী প্রভৃতি। সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন শিক্ষা শিবিরে অংশ নিতে এবং তাদের মান নিরূপণের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। ফরিদপুর ব্রতচারী সমিতির মুখপত্র হিসেবে 'ব্রতচারী বার্ত্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে। এটি ছিল ব্রতচারী আন্দোলন সম্বন্ধীয় একমাত্র পত্রিকা। এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন খানসাহেব মৌলভী

দলিলউদ্দিন আহমেদ। ১৯৪১ সালে গুরুসদয় দত্তের মৃত্যুর পর ব্রতচারী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়।[৮]

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতিসত্ত্বার বিকাশে যে সকল মনীষীরা তাঁদের সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গুরুসদয় দত্ত। তাঁর সব থেকে বড় অবদান, তিনি বাঙালি জাতিসত্ত্বার আন্দোলনকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলা নিজস্ব নৃত্য, গীত, শিল্প-সংস্কৃতিকে গৌরবের আসনে বসিয়েছিলেন এবং এগুলি নিরন্তর চর্চার জন্য গঠন করেছিলেন 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি'। উনিশ শতকীয় বাংলার প্রেক্ষাপটে রামমোহন, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে নবজাগরণের ঢেউ গড়ে তোলেন,তাতে সংযুক্ত হলেন গুরুসদয় দত্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুকে।১৯০৫ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি যখন বিলেত থেকে একইসঙ্গে কৃতিত্বের সঙ্গে আই সি এস এবং ব্যারিস্টারি পাশকরে ফিরলেন, তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গান গেয়ে পথে নেমেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমস্ত কিছুই তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর পাশাপাশিবৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে বড় হওয়া তাঁর জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের উপর পড়েছিল।শ্রীচৈতন্যদেব যেমন চেয়েছিলেন, সমস্ত মানুষের মঙ্গল এবং উন্নয়ন, তেমনি গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির আত্মসত্তার পরিচয়কে বিশ্ব নাগরিকবৃন্দের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রশাসনিক কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি এক বিন্দু সময়ও নষ্ট করেননি, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শারীরিক বলবান হওয়ার কৌশল, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি কার্য তিনি বিরামহীনভাবে করে গেছেন। তিনি সরকারি প্রশাসক হিসেবে বাংলার বাইরে কাজ করেছেন বিহারের আরা ও গয়া জেলায়। তারপর বিচার বিভাগীয় কাজে গিয়েছেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি জেলায় এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় জেলাশাসক, শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, স্বশাসিত প্রাদেশিক সরকারের সচিব, কেন্দ্রীয় আইনসভার মনোনীত সদস্য প্রভৃতি নানা পদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক নানা সভা ও সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গ্রাম বাংলার নানা প্রান্তে নিবিড়ভাবে কাজ করার সময় তিনি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন গ্রামীণ অতুলনীয় সম্পদ-বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকনৃত্য, লোকগীতি ও লোকশিল্পের সঙ্গে। তিনি উপলব্ধি করেন, “আমাদের জাতীয়তার পরিণতি ও পরিচয় হবে বাংলার সংস্কৃতির নিবিড় প্রকাশে, একমাত্র তাতে করেই আমরা ভারত-মানবতার ও বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে আমাদের বৈশিষ্ট্যকে দান করতে পারব। নতুবা আমাদের জীবন হবে অর্থহীনও মূল্যহীন”।[৯]

এরকমই প্রেক্ষাপটে তিনি গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী সম্পদগুলি সংগ্রহ ও প্রচারে ব্রতী হলেন। এইভাবে একে একে সংগৃহীত হল বাউল, জারি, সারি,কীর্তন, ভাটিয়ালি, কাঠি, মুর্শিদি, ব্রত, ঝুমুর, যশোরের যুদ্ধ নৃত্য ঢালী, ঘাটওলানো, ফরিদপুরের বিবাহ নৃত্য ও গীত প্রভৃতি। সংগ্রহ করলেন পট, আলপনা, কাঠ ও পাথরের মূর্তি, দেওয়াল চিত্র, আসন, পোড়ামাটির কাজ, নকশি কাঁথা সহ অসংখ্য প্রত্ন নিদর্শন। "মানুষহ,মানুষ হ, আবার তোরা মানুষ হ/অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙ্গালী হওয়া/ শিখে নে দেশ-বিদেশের জ্ঞান, তবু হারাস না মা'র মান/ ...বাঙ্গলা ভাষার বুলি বলে, বাঙ্গলাভাবে নেচে-খেলে ষোলআনা বাঙ্গালি হ/সম্পূর্ণ বাঙ্গালিহ- বিশ্ব-মানব হবি যদি, শাশ্বত বাঙ্গালি হ"।।[১০] ময়মনসিংহে জেলাশাসক থাকাকালীন তিনি নেত্রকোনার বাউল এবং আন্ধার বাড়ির ইমাম বক্সের জারি দলকে আমন্ত্রণ করে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। খালি গায়ে নাচলেনতাঁদের সঙ্গে।গ্রামের লোকদের সঙ্গে নিজে কোদাল, কুড়ুল, ঝুড়ি নিয়ে নামলেন জঙ্গল সাফাই, পানা পরিষ্কার, নর্দমার পাঁক তোলার কাজে। সাধারণ মানুষ চিনে নিলেন, এ আমাদেরই লোক। উন্নাসিকরা বলল, 'পাগল'।

বাঙালি জাতিসত্ত্বা আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি গুরুসদয় দত্ত বা গুরুজি বাঙালি জাতিসত্তার আন্দোলনকে যে তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন, তা হল- ভূমিবাদ এবং ছন্দবাদ। ভূমিবাদকে তুলনা করা যায়, চারাগাছের বেড়ে ওঠার সঙ্গে। যার শিকড় মাটিতে ছড়িয়ে থাকে। সেখান থেকে রস সংগ্রহ করে বেড়ে ওঠে। তার ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে। সেখানকার আলো বাতাস তাকে পুষ্ট করে। এই মাটি জল আলো বাতাস না পেলে সে বাঁচতে পারেনা। মানুষও বিশেষ এলাকায় জন্মায়। মা-বাবা আত্মীয় পরিজনের যত্ন ছাড়া সে বড় হতে পারে না। তার সামাজিকীকরণ হয় এদের সঙ্গে মিলেমিশে, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মধ্য দিয়ে।এদের প্রতি দায়বদ্ধ না থাকলে সে সমাজকে কিছু দিতে পারেনা। গুরুজির ব্যাখ্যা অনুসারে, "প্রত্যেক প্রাকৃতিক দেশ একটা বিশিষ্ট ভূমি।সেই ভূমির আকাশে বাতাসে জলে স্থলে নদীতে একটি ছন্দ-স্রোতের ধারা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে সেই দেশের মানুষকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে; তাদের চরিত্রে, তাদের ভাষায়, তাদের সাহিত্যে, তাদের গতিভঙ্গিতে, তাদের কণ্ঠের সুরে, তাদের নৃত্যে সঙ্গীতে একটা বিশিষ্টময় ভাবদান করে"। গানের মাধ্যমে তিনি বলেছেন, "আমরা বাঙ্গালি সবাই বাংলামা'র সন্তান/বাঙ্গলা ভূমির জল হাওয়ায় তৈরি মোদের প্রাণ/মোদের দেহ মোদের ভাষা মোদের নাচ আর গান/ বাঙ্গলাভূমির মাটি হওয়া জলেতে নির্মাণ/বাঙ্গলাভূমির প্রেমে মোদের ধর্ম্ম আর ইমান/ বাঙ্গলাভূমি মোদের কাছে স্বর্গ-সমস্থান"। আবার ছন্দবাদের মর্মবাণী হলো-মানুষের হৃদয়ের মধ্যে স্বত-প্রবাহিত সুর ও ছন্দ নিয়ে আনন্দ ও ঐক্যের ধারা গড়ে তোলা। তাঁর ব্যাখ্যা,বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্ত্বা; অবিরাম গতিশীল ও ছন্দশীল। নদীর স্রোত, সাগরের ঢেউ, দেহের রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস সবকিছুই ছন্দে বাঁধা। এই বিশ্বের এবং আমাদের ভাষা, নৃত্য ও গীতের

ছন্দকে আয়ত্ত্ব করতে পারলেই আমরাখুঁজে পাব মানবতার আসল রূপ।তিনি লিখেছেন, “আমেরিকার কাছে অতি-আধুনিকতার সাজে, কারণ তার নিজস্ব ধারা কিছু ছিল না। তার অন্তরের শূন্যতা ও নিশ্চয় তাকে ঢাকতে গিয়ে সে এই অতি-আধুনিকতার সৃষ্টি করেছে।কিন্তু বাংলা সহ এ দেশের প্রতিটি অঞ্চলেরইতো সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্পদ আছে।সেই তো তার প্রকৃত পরিচয়।বাংলার প্রত্যেক লোক যদি বাঙালি হিসাবে বাঙালিও বাংলার আত্মার বৈশিষ্ট্য হারিয়েভিতরের ও বাহিরের ভাবেও ছন্দে একটা অন্য জাতির নকল স্বরূপ হয়ে যায়, তাহলে সে যদি বাহ্য স্বাধীনতাও পায়, সেই স্বাধীনতাকে বাঙালির স্ব-স্বাধীনতাবা বাংলার স্বাধীনতা বলা যাবে না।কারণ বাংলারস্ব-ছন্দবা স্ব-ধারা যদি বাঙালি হারায়, তাহলে বিশ্বে দান করার মতো তার অবদান কিছু থাকবে না।গুরুসদয়ের এই প্রয়াসকে কেউ কেউ 'প্রাদেশিকতা’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন।[১১]তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “তারা যাকে প্রাদেশিকতা মনে করেন, সেটাই আসল জাতীয়তা।...আমাদের জাতীয়তার পরিণতি ও পরিচয় হবে বাংলার সংস্কৃতির নিবিড় প্রকাশে;একমাত্র তাতে করেই আমরা ভারত-মানবতারও বিশ্ব-অবতার ক্ষেত্রে আমাদের বৈশিষ্ট্যের দান করতে পারব।নতুবা আমাদের জীবন মূল্যহীন” ।গুরুসদয় তাঁর ভাবনাকে আন্দোলনের আকারে গড়ে তোলার জন্য গঠন করলেন 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি’।এর সূচনা হয় সিউড়িতে ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি একটি লোকনৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ শিবিরে।ব্রতচারী সাধনা শুরু হয় ‘জ-সো-বা’ অর্থাৎ 'জয় সোনার বাংলা' ধ্বনি দিয়ে।ব্রতচারীর প্রধান দুই উপকরণ- পঞ্চব্রত ও ছন্দাত্মক সাধনা।জ্ঞানব্রত, শ্রমব্রত, সত্যব্রত,ঐক্যব্রতও আনন্দ ব্রত।গুরুজি শ্রমব্রতকে দাঁড় করালেন, 'বাবু' সংস্কৃতির পাল্টা হিসাবে।আহ্বান করলেন, “লাগো কাজে কোমর বেঁধে, খুলে দেখ জ্ঞানের চোখ, কোদাল হাতে খাটে যারা, তারাই আসল ভদ্রলোক” ।তিনি সম্ভাষণ, অভিবাদন ইত্যাদিতে প্রবর্তন করলেন চমৎকার বাঙালিয়ানা।তিনি জানালেন, “বাংলার ব্রতচারী সমিতি চায়, বাঙালিকে নিবিড়ভাবে আত্ম-প্রবুদ্ধ,আত্ম-গৌরব সচেতন ও আত্মনির্ভর করে” গড়ে তুলতে।ব্রতচারীর আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন ষোলটি পণ।এগুলির মধ্যে আছে- “জ্ঞানের সীমা প্রসারণ/শ্রমের মর্যাদা বর্ধন.. নারীর মুক্তি সংশোধন” ইত্যাদি।এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন ১৭ টি মানা।এগুলির মধ্যে আছে- “খিচুড়ি ভাষায় বলিব না.. দৈবে ভরসা রাখিবনা” ইত্যাদি।লিখলেন তরুণদের বীরত্ব ব্যঞ্জক গান 'বাঙ্গলা মা’র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল/ শান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, সংকটে অটল”।...গুরুসদয়ের সুপরিকল্পনা ও সুপরিচালনায় সারা বাংলার নানা প্রান্তে, বহির্বঙ্গে,এমনকি বিদেশেও ব্রতচারী সমিতির শাখা গড়ে উঠলো।[১২] সমষ্টিগতভাবে শারীরিক ব্যায়াম, নৃত্য-গীত প্রতিটি ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবিরকে আকর্ষণীয় করে তুলল।এরই সঙ্গে চলতে লাগলো বাংলার সম্পদ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের নানা গবেষণামূলক রচনা, পত্রিকা প্রকাশ।

প্রায় ৩৫০০ প্রদর্শনযোগ্য বস্তু নিয়ে ১৯৩২ সালে কলকাতার 'সোসাইটি অফ আর্ট' ভবনে তিনি বাংলার লোকশিল্পের প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন।বিস্মিত হলেন দর্শকরা।ধন্য ধন্য করলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনিতি চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ গুণীজনেরা।পরবর্তীকালে এগুলি নিয়ে ঠাকুর পুকুরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'ব্রতচারী গ্রাম'-এগড়ে ওঠে ভারতের পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ লোকশিল্প প্রদর্শন কেন্দ্র,এখন যার নাম 'গুরুসদয় সংগ্রহশালা'।শান্তিনিকেতন থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৫ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গুরুসদয় দত্তকে লিখলেন, "ব্রতচারী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা করি।এই ব্রতচর্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিত সাধনের উৎসাহদেশে বল লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই"।[১৩]

ব্রতচারীর কর্ম প্রয়াসকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বোস, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মহাত্মা গান্ধী, বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক,দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,প্রমুখ।গুরুসদয় তাঁর নিপুনভাবে প্রশিক্ষিত ব্রতচারী দল নিয়ে ভারতের নানা প্রদেশে এবং বিদেশে কয়েকটি প্রদর্শনী করে বিপুল সাড়া পেয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে বঙ্গদেশে তৎকালীন শারীর শিক্ষা অধিকর্তা মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমেব্রতচারীর নৃত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন।ফলে বঙ্গদেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ব্রতচারী চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু শিশু-কিশোরদের সংঘ, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাবও ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে।স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ব্রতচারী চর্চা বেশ কিছুকাল যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। কিন্তু পরে শিক্ষা দপ্তর একে অনেকাংশে লঘু করে দেয়। 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি' ছাড়াও গুরুজি ১৯২৫ সালে তাঁর প্রয়াত সহধর্মিণীর নামে নারী শক্তির জাগরণের জন্য গড়ে তোলেন 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'।শহর ও গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্যে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য আর্থিক সহায়তা করেন 'বঙ্গীয় হিতসাধন মন্ডলী (বিএসএসএল), বিশ্বভারতীর 'পল্লী সংস্কার বিভাগ' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে।পরবর্তীকালেকলকাতার বেথুনকলেজের পাঠক্রমে ব্রতচারীঅন্তর্ভুক্তকরা হয়েছে।বাংলায় জনশিক্ষার বহুমুখী কর্মকান্ড গড়ে তোলার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে ঠাকুরপুকুরে কেনেন ১০১ বিঘার এক বিশাল ক্ষেত্র। এই কর্মকান্ডে পূর্ণ সময় নিয়োগ করার জন্য তিনি চাকরি ত্যাগ করেন ১৯৪০ সালের ১১ ডিসেম্বর। কিন্তু কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে, ১৯৪১ সালের ২৫ মে তিনি প্রয়াত হয়েছেন।[১৪]

বাংলা ভাষাও বাঙালি জাতিসত্ত্বার জন্য আজও যারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করে যাচ্ছেন, তাঁদের কাছে গুরুসদয় দত্ত একজন মহান পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্বদাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আসলে, মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তাঁর উপর ছোটবেলা থেকেই পড়েছিল,তাই তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবীয় আদর্শ; তাঁর কর্মদ্যোম জীবনকে

সক্রিয় করে তুলেছিল। বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে, তিনি একটি ক্ষুদ্র গ্রামীণ এলাকা থেকেবিশ্বমানবে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তাছাড়া একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, তিনি এবং শ্রীচৈতন্য একই জেলার মানুষ ছিলেন।তাঁর পারিবারিক বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল এবং শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মবাদ তাঁর জীবনদর্শনে বহুমুখী কাজের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার মতো কার্য তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।সেই কারণে তিনি চৈতন্যের মতনই একজন আন্তর্জাতিক মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের কথা সারা বিশ্বের মানুষ স্মরণে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১. আসগর, সৈকত, গুরুসদয় দত্ত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম সং, ২০০৭, পৃ.৫২।
২. তদেব, পৃ.৬৭।
৩. তদেব,পৃ.৬৮।
৪. Web Link: banglapedia.org
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ, গুরুসদয় দত্ত: জীবন ও রচনাবলী, গুরুসদয় সংগ্রহশালা, ব্রতচারীগ্রাম, জোকা:গুরুসদয় দত্ত ফোক আর্ট সোসাইটি, কলকাতা, ১ম সং, ২০১৩, পৃ.১২-১৩।
৬. তদেব।
৭. Web Link: http://en.wikipedia.org/wiki/gurusadaydutt
৮. আসগর, সৈকত, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪।
৯. তদেব,পৃ.১৭-১৮।
১০. তদেব, পৃ.২৩-২৪।
১১. বাংলাপিডিয়া, গুরুসদয় দত্ত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১।
১২. Web Link: https://en.m.wikipedia.org>wiki
১৩. আসগর, সৈকত, পূর্বোক্ত।
১৪. Dasgupta, Tapati, Social Thought of Rabindranath Tagore: A Historical Analysis, Abhinav Publications, Calcutta, 1993, pp.98-99.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্প-সমুন্নতি

খোকন বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বহুপ্রজ স্রষ্টা; তাঁর অযুত সৃষ্টি সে কথাই প্রমাণ করে। সৃষ্টির বহুমুখিনতা অনেক সময় স্রষ্টাকে দিয়ে অনেক কিছু লিখিয়ে নেয়। তবে তার জন্য থাকতে হয় লেখকের কব্জির জোর; সেই জোর সুনীলের ছিল। তাই তাঁর সৃষ্টি সংখ্যা সমকালীন অন্যান্য লেখকের তুলনায় অনেক বেশি। তাঁর প্রথম পরিচয় যদিও একজন কবির; অনেকের মতে তাঁর প্রধান পরিচয় কথাশিল্পীর অর্থাৎ উপন্যাস রচয়িতার। আপাতত আমরা সেই বিতর্কে জড়াবো না; বরং জানতে চাইবো কবিতা এবং উপন্যাসের পাশাপাশি সুনীল অনেক ছোট গল্প লিখেছেন; সংখ্যায় প্রায় ত্রিশতাধিক— যার বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্প-সমুন্নতি অন্য এক সুনীল আকাশকে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। এই আলোচনায় আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কিছু গল্পের বিষয়গত বৈচিত্র্য ও শিল্পগত সার্থকতার কিছু কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব। যদিও জানি যে, তা হবে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।
সূচক শব্দ : ছোটগল্প, গল্পকার সুনীল, জীবনাভিজ্ঞতা, বিষয়-বৈচিত্র্য, শিল্প-সমুন্নতি, অনন্যতা।

মূল আলোচনা:

"ছোটগল্পের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই। যেকোন বিষয় হোক না কেন, গুণীর হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে তা জীবন্ত হয়ে ওঠে।" একথা সত্যি। আকাশের তারা থেকে ধরণের ধূলি— যেকোন বিষয় নিয়েই সার্থক ও রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প লেখা যায়। তার জন্য দরকার পড়ে গল্পকারের একটি নিটোল হৃদয়-অনুভব এবং তাকে শিল্প-সম্মত ভাবে প্রকাশ করার উপযুক্ত করণ-কৌশল। এই নিটোল হৃদয়-অনুভব ছোটগল্পকে কবিতার নিকট-আত্মীয় করে তোলে। সে কারণে যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা ছোটগল্পকে শিল্পিত করে তুলতে কিছু সুবিধা পান। রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিরুদ্ধ উদাহরণের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। সবকটি প্রসঙ্গ এই আলোচনায় স্থান দেওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং আলোচনা অপূর্ন হতে বাধ্য। গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনীল তাঁর একটি গল্প সংকলনের ভূমিকায় জানিয়েছেন—"গল্পের বিষয়বস্তু পাওয়া যায় নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে। কখনো কখনো কোনো

দৃশ্য, কোন নাম কিংবা একটিমাত্র শব্দ থেকেও ঝলসে ওঠে কাহিনি। এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন ‘প্রথম মানবী’, ‘দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি’, ‘বাহুলাড়া’ এবং ‘চুড়ামণি আখ্যান’ শীর্ষক চারটি গল্পের কথা। আমরা আলোচনা শুরু করছি আকারে কিছু দীর্ঘায়তন ‘দেবদূত অথবা বারোহাটের কানা কড়ি’ নামের ছোটগল্পটিকে দিয়ে। এই গল্পের পশ্চাৎপট হিসেবে গল্পকার সুনীল জানিয়েছেন,—

> “আমি মাঝে-মাঝেই শহর থেকে অনেক দূরে কোন সাধারণ গ্রামে গিয়ে থেকেছি। ...সেই রকমই একবার গিয়েছিলাম ফিরোজ চৌধুরীর গ্রামে। টানা সাতদিন ছিলাম সে গ্রামে। ...একদিন দুপুরে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছি, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু’তিনটি মেয়ে ধান ঝাড়ছে উঠোনে। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে ফিরোজদের বাড়িতে পার্ট টাইম কাজ করে, তার নাম হাসিনা। স্বামী মারা গেছে, অভাবে পড়েছে। ...উঠোনে কাজ করতে করতে তিনটি মেয়ে কল কল করে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। এক সময় হাসিনা দৌড়ে এলো আমার ঘরের জানালার কাছে, গরাদ ধরে ছলছল চোখে বলল, দাদা, আপনারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনি কন তো, কোন ছেলেমেয়ের যদি মা বেঁচে থাকে, তাহলে কি তাদের অনাথ কওয়া যায়।”

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সুনীল যে কথাগুলি আমাদের শোনালেন, তার শেষ লাইনে আছে একটি আস্ত গল্পের ইঙ্গিত এবং সে গল্পের বিষয়-চুম্বক অবশ্যই মাতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র হাসিনার মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে সুনীল লিখেছেন আলোচ্য গল্পটি।

হাসিনার যখন ষোল বছর বয়স তখন একটি লম্বা-চওড়া ছেলের সঙ্গে সে পালায়। কিন্তু যার সঙ্গে সে পালিয়ে যায়, হঠাৎ সাত দিনের জ্বরে সে মারা যায়। রেখে যায় তিন সন্তান সহ হাসিনাকে। মেয়ে যদি হাসনাবাদের বাজারে গিয়ে নাম লেখায়, তাহলে সবাই বলবে ‘দ্যাখো লাল মিঞার মেয়ে রেন্ডী হয়েছে।’ তাই বাপ লাল মিয়া মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেও মুখ বেঁকিয়ে বলে, ‘ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে কোথায় নিয়ে যাবি, ওদের এখানে রেখে যা।’ “হাসিনা বাপের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে হাপুসনয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আচ্ছা আমি ওদের কোথায় ফেলে যাব; আমি ওদের পেটে ধরেছি। ওদের আর কে আছে।” বাচ্চাসমেত হাসিনার বাড়িতে জায়গা হলো না। পেয়ারা গাছের তলার বাড়িতে আলাদা থাকল তারা। লাল মিঞা কেবল হাসিনার খোরাকি দেয়, বাচ্চাদের না। একসময় লাল মিঞা হাসিনার বিয়ে ঠিক করে বাজিতপুরের রজত আলীর ছেলে সামসেরের সঙ্গে। সামসের খুব বুঝদার মানুষ, লরির ব্যবসা আছে ইত্যাদি। কিন্তু কেউ-ই তিনটে বাচ্চা সমেত বউ বাড়িতে আনতে চায় না। তাই বাপ লাল মিয়া হাসিনাকে বোঝায়, বাড়িতে বেড়ালের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চা বেশি হলে যেমন লোকে দূরে পার করে দিয়ে আসে, তেমনি সেও অতিরিক্ত এই তিনটিকে শিয়ালদা স্টেশনে ফেলে আসতে চায়।

অন্যদিকে সবাই হাসিনার অসহায়তার সুযোগ নিতে ভুল করে না। কেউবা (গিয়াস) তার বুকে হাত বুলিয়ে নেয় ভালো করে, কেউবা (পিতৃতুল্য গণিচাচা) নির্জন আমবাগানে তার পৌরুষ পরীক্ষা করে নেয়। আর জ্ঞানীগুণী শহুরে ভদ্রলোক মিজানুরও বিয়ের লোভ দেখিয়ে এক আধ-বার...। অবশেষে রহমান সাহেবের হিন্দু বন্ধু সুখেন্দু বাবু হাসিনার বিয়ের একটা রাস্তা বাতলে দেয়। বাচ্চাগুলোকে যদি অনাথ আশ্রমে দেওয়া যায়— সেখানে খাওয়া-দাওয়া পাবে, লেখাপড়া শিখবে। রহমান কিছুইতস্ততঃ করে জানতে চাইল যে, সেখানে মুসলমান ছেলেমেয়েদের নেয় কিনা, তখন সুখেন্দবাবু প্রচন্ড মাতালের হাসি হেসে বলে—

"আরে অনাথের আবার হিন্দু-মুসলমান কী? অনাথ মানে যার কেউ নেই। হে-হে-হে-হে-হে।"

এবং ঘোলাটে চোখের চেটে নেয় হাসিনার লোভনীয় যৌবন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসিনা রাজি হয়। কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল, হাসিনা আলুথালু চুলে প্রায় পাগলিনীর মতো হাজির হয় অনাথ আশ্রমে। চিৎকার করে বলে—"ওগো বাবু, ওদের ছেড়ে দাও। ওরা অনাথ নয়। আমি ওদের মা। যাদের মা থাকে, তারা কি অনাথ হয়?" গল্প এখানে শেষ হতে পারত। কিন্তু গল্প শেষ হয় আর একটু এগিয়ে। পাঠক জানতে পারে যে, হাসিনা আবার গর্ভবতী হয়েছে, 'আর একটা শত্তুর এসেছে তার পেটে।' যদিও পরক্ষণে সে জিভ কেটে বলে, 'ছিঃ এমন কথা বলতে নেই। পেটের সন্তান সে কে? সে কি কোন স্বর্গীয় দূত না বারোহাটের কানাকড়ি?' হাসিনা কিন্তু 'কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ডানায় ভর দিয়ে বাতাস কেটে নেমে আসছেন দেবদূত।' আর হাসিনা চকিতে আমাদের মাতা মেরীকে স্মরণ করায়।

"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী...।" সর্বতোভাবে বাহুল্যবর্জিত এক সাহিত্য সংরূপ। যদিও আলোচ্য গল্পটি আয়তনে কিছু বড় এবং কাহিনী বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত তবুও একটি মাত্র প্রতীতি-ই এই গল্পের প্রাণভোমরা, সে হলো হাসিনার মাতৃত্ব।

'চুড়ামণি উপাখ্যান' লৌকিকে-অলৌকিকে মিশ্রিত একটি গল্প। গল্পকার জানিয়েছেন,—

"বাংলাদেশে সালামবালা নামে এক সাধকের আশ্রমে গিয়েছিলাম কয়েকজন লেখক বন্ধুর সঙ্গে। সেখানকার অভিজ্ঞতা মনে বেশ দাগ কেটেছিল। 'চূড়ামণি উপাখ্যান'-এ সেটাই কাজে লেগে যায়।"

এডগার অ্যালান পো' মনে করতেন, ছোট গল্প শুরু হয় 'from the very initial sentence'। এবং যেকোনো লাইন দিয়ে শুরু করা যায় ছোটগল্প। ঘটনার আকস্মিকতা ছোটগল্পে অনেক সময় একটা ভিন্ন রকম আস্বাদ এনে দেয়। যেমন 'চূড়ামণি উপাখ্যান' শুরু হয় একটি সাসপেন্সকে অন্তরে নিয়ে,—

"ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা আসে, শেষ রাত্তিরের দিকে। কোথা থেকে আসে আর কোথা চলে যায়, কেউ জানে না।" তারা কারা? তারা একটি ডাকাতের দল। লুটপাট, ঘরে আগুন, মেয়ে চুরি, হত্যা প্রভৃতি ঘটনাসহযোগে এই ডাকাতদলটি আশেপাশের আপামর মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ। যদিও তেঁতুলছড়ি গ্রামে এখনো তাদের পায়ের ধুলো পড়েনি। তাই এবার বোধহয় তেঁতুলছড়ির পালা—অন্তত গ্রামবাসীরা তাই মনে করে আর কেঁপে কেঁপে ওঠে। এমন বিপদের দিনে বাতাসীর মা কাঁদুনি কাঁদতে কাঁদতে বলে,—"আজ যদি থাকত চূড়ামণি... আজ যদি থাকত চূড়ামণি....?" চূড়ামণি নামটায় যেন একটা যাদু আছে। কিন্তু কেন এই চূড়ামণি?

> "শুধু এই তেঁতুলছড়ি গ্রাম নয়, আশপাশের পাঁচ-দশখানা গ্রামের নয়নমনি ছিল ওই চূড়ামণি। যেমন ছিল তার হাসিমাখা সুন্দর মুখ, তেমনই ছিল তার বুকের পাটা। যেকোন লোকের বিপদ-আপদের কথা শুনলে সে দৌড়ে গিয়ে বুক পেতে দিত। একবার এ গ্রামের এক শিশুকে কুমিরের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, চূড়ামণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে শিশুটিকে উদ্ধার করে। কুমিরটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে দিয়েছিল সে।"

যদিও এ ঘটনায় কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা তা জানার উপায় নেই। তবু সকলে মনে করে 'আজ যদি চূড়ামণি থাকত, তাহলে দুঃখ থাকতো না।' পরে জানা যায় চূড়ামণি ঠাকুর মারাও পড়েনি কিংবা নিরুদ্দেশেও যায়নি। সে এখন পিয়ালী নদীর বাঁকে কানা ফকিরের আখড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তাকে এখন আর চেনা যায় না। সে এখন বুড়ো, নেশাখোর, আত্মবিস্তৃত। সবসময় কাঁদে। কেবল নিজের নামটা শুনে জেগে জেগে ওঠে। গ্রামের সকল মানুষের বিপদের বৃত্তান্ত শুনে গুরু কানাফকির চূড়ামণিকে আদেশ করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু 'দড়ি পাকানো চেহারার বুড়োটি এই আদেশ শুনে কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ ভেউ করে।' কাঁদা দেখে গ্রামবাসীরা দমে যায়। কিন্তু কানা ফকিরের চূড়ান্ত আদেশে চূড়ামণিকে গ্রামে ফিরতে হয়।

মাঝপথে চূড়ামণি গান ধরে 'যে দেশে ভালোবাসা নাই, সে দেশে বাসা নেই আমার।' আমি তেঁতুলছড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কেন জানিস? সেখানে কেউ কারুকে ভালোবাসে না।' চূড়ামণি আরো বলে, তার শরীরের তাগদ অনেক কমে গেছে। তবে 'তোরা একটু ভালোবাসা দিলে যদি শক্তি ফিরে পাই! দিবি? তোরা ভালোবাসা দিবি?' বাতাসী বলে, 'আমার বুকে যত ভালোবাসা আছে সব তোমায় দেব।' অন্যান্যরাও সমস্বরে বলে,'হ্যাঁ দেব, হ্যাঁ দেব।' চূড়ামণি একটা বাঁশ ঝাড়ের সামনে গিয়ে একটা বাঁশ উপড়াতে গিয়ে শরীরের বলের ঘাটতি স্পষ্ট টের পায়। বলে, 'বুড়ো হয়ে গেছি, হাড় ঝুনো হয়ে গেছে, শরীরে বল নাই, তোরা ভালোবাসা দে যদি মনের বল ফিরে পাই! তোরা আমার গায়ে হাত বুলা। 'সবাই তখন চুড়ামণিকে ঘিরে ধরে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। বাতাসী মুখখানা ঘষতে লাগল তার পিঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে চুড়ামণির মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে থাকল,—

"তার শরীর ঋজু হয়ে উঠল, চুলের জট খুলে গেল, হাতের শিরা-উপশিরাগুলো চাপা পড়ে গেল। সর্বোপরি চোখে ফুটে উঠলো এক আশ্চর্য জ্যোতি।"

তারপর সে একটানে পট করে তুলে ফেলল একটা বাঁশ। সবাই অবাক হল। বাতাসী, গঙ্গাধর, কামালরা কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে। কারণ,—

"তাদের ভালোবাসার যে এত জোর তা তারা নিজেরাই জানতো না এতদিন।"

অবশেষে ডাকাতদল চূড়ামণির চরণে নিজেদের সমর্পণ করল— যদিও এই অলৌকিক ব্যাপার দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে; তবু পৃথিবীর যাবতীয় জোরের থেকে ভালোবাসার শক্তি যে কোন অংশে ন্যূন নয়, গল্পকার সুনীল তা সুন্দর করে দেখিয়েছেন এই গল্পে। গল্পটি পাঠের শেষে কাহিনীর অলৌকিকতা আমাদের মন থেকে উধাও হয়, মন কেবল বলতে থাকে, 'ভালোবাসা থাকলে সব হয়।' এমন শাশ্বত সত্য উচ্চারণেই গল্পটির আশ্চর্য শিল্প সার্থকতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় নরনারীর প্রেম। এ প্রসঙ্গে 'আগামীকাল', 'নারী', 'মনীষার দুই প্রেমিক' প্রভৃতি গল্প স্মরণীয়। সুনীল তাঁর কবিতায় লিখেছেন, 'আমার ভালোবাসার কোন জন্ম হয় না। মৃত্যু হয় না..."। এবং প্রায় ক্ষেত্রে সুনীলের ভালোবাসা শরীরকে আশ্রয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠতে চায়। সুবর্ণা, রনজয় আর তপনের গল্প হল 'আগামীকাল'। এই গল্পে সুনীলের নিজস্ব ভালোবাসার দর্শনের কথা আছে। এই গল্পে নারী এক, পুরুষ দুই। তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং পরস্পর খুব ভালো বন্ধু। সুবর্ণা— রণজয় ও তপন দুজনকেই ভালোবাসে। তবে সে রণজয়কে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারপরেও সে তপনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তার ফ্ল্যাটে। একাকী। মা এবং কাজের লোকের অনুপস্থিতিতে তারা ঘনিষ্ঠ হয়। তখনের কথা রাখতে 'সুবর্ণা মুঠো করে ধরল তপনের চুল, আর একটা হাত রাখল ওর কাঁধে, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।' যদিও তারপরে সুবর্ণা জানতে চায় তপনের কাছে 'এটা কি পাপ নয়?' তপন উত্তরে জানায়,—
"দু'জন মানুষ যদি কোন একটা কাজ করে আনন্দ পায় এবং তাতে অন্য কারুর কোন ক্ষতি না হয় তাহলে সেটা পাপ হতে পারে না।"
প্রেম ভালোবাসার এহেন আনন্দবাদী দর্শন সকলের কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণে যখন তপন বলে,—

> "ভালোবাসলেই কি একেবারে নিজের দখলে রাখতে হবে? তুমি অন্য কারো স্ত্রী হয়ে গেলেও কি তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি না? কারুর বাড়ির সুন্দর বাগান দেখে যদি আমার খুব ভালো লাগে তাহলেই কি আমি বাগানটা দখল করে নেবার চেষ্টা করব।"

তখন 'ভালোবাসা' শব্দটি একটি বন্ধনহীন বৃহতের দ্যোতনা নিয়ে আসে। একদিকে তপনের ভালোবাসার একটা আকর্ষণ অনুভব করে সুবর্ণা। আবার তপনের বুকে মাথা রেখে সে দ্বিধাহীন ভাবে বলে, 'আমি কিন্তু রনজয়কে খুবই ভালোবাসি।' সঙ্গে সঙ্গে

তখন বলে,—“কে বারণ করেছে ভালোবাসতে? আয় না আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি।” এই লাইনটি সমগ্র গল্পের ‘key-line’। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—“গল্পের নাম এমন দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা... গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নাবিকগিরি করতে না পাঠায়।” অর্থাৎ নামকরণ যেন গল্পে তৃতীয় মাত্রা যোগ করে এই ছিল রবীন্দ্র অভিপ্রায়। আর তখনই আসে ব্যঞ্জনাধর্মিতার কথা। বলাবাহুল্য ব্যঞ্জনার দ্যোতনা ‘আগামীকাল’ গল্পের নামকরণকে অনিবার্যভাবে শিল্প-সার্থক করে তুলেছে।

সমাজচেতনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের একটি অন্যতম দিক। এই পর্যায়ের গল্পগুলি রচনার ক্ষেত্রে সুনীল অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, জগদীশ গুপ্ত বা মতি নন্দীর মতো জীবনের সত্য বর্ণনে নিষ্ঠুর রকমের সৎ। সুনীলের বেশ কিছু গল্প গড়ে উঠেছে অভাব, দারিদ্র এবং খিদেকে কেন্দ্র করে। যেমন ‘মাংস’, ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প’ প্রভৃতি। মারী-মড়ক আর মন্বন্তরের দেশ এই বাংলা। দেশ-স্বাধীন হবার পর না-খেতে-পাওয়া মানুষগুলো ভেবেছিল, এবার অন্তত দু’বেলা দু’মুঠো খেতে পাবে তারা। কিন্তু অবস্থা কিছু বদলায় না। তথৈবচ। দীন-দুঃখী-গরীব-অভাবী মানুষেরা দেশের স্বাধীনতার আলোয় বেশি করে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। এরকম পট-প্রেক্ষিতে সুনীলের এ-জাতীয় গল্পগুলি রচিত।

প্রসঙ্গ ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প’। পরিবারের মুখে দু’মুঠো অন্ন তুলে দিতে ব্যর্থ নিবারণ। বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা। নিবারণ পিতার মৃত্যু কামনা করে। তাহলে পরিবারে খাবার লোক অন্তত একটা কমে। হাতে একটা কানাকড়ি পর্যন্ত নেই। অথচ সুরেন্দ্র বলেছিল একটা ভূত ধরে দিতে পারলে একশো টাকা নগদ। তাই বুড়ো বাপ যখন প্রচন্ড ক্ষুধায় ভাতের কথা বলে চেঁচায়, তখন নিবারণ ডাক্তারের দেওয়া ঔষধের বোতলটা তার দিকে ছুঁয়ে দেয়। আর পবন সবকটা ক্যাপসুলই মুখে পুরে চিবোতে থাকে এবং এই পরস্পর বলাবলি করে,—

“— বাবা, তুমি ভূত দেখেছো কখনও। সত্যি করে কও তো।

— হ্যাঁ, দেখেছি। অনেকবার দেখেছি।

— কারা মলে ভূত হয়? সকলেই মরে ভূত হয়?

— যারা অপঘাতে মরে, মরার পরেও যাদের আহিঙ্কে থেকে যায়।”

হঠাৎ নিবারণ বলে, ‘বাবা তুমি মলে...’

পবন বলে, ‘হ্যাঁ আমি ভূত হব নিশ্চয়ই। সে কি আর তোকে বলতে হবে... নাতি-নাতনি দুটোর মুখ চেয়েও... সুরেন্দ্রকে ডেকে আনিস... আমি বোতলে ঢুকে যাব, তুই একশো টাকা...”

ইতোমধ্যে ঔষধের বিষক্রিয়া শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে পবনের বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবলতর হতে থাকে—

"ও বাবা নেবারণ, আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, আমি দুটো দিন... একটু গরম গরম ভাত দিস... দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই... এক ছিলিম তামাক... ও বাবা নেবারণ তোর পায়ে পড়ি... আর দুটো দিন... একটু গরম ভাত... তোর পায়ে পড়ি... ও বাবা নেবারণ, আর দুটো দিন..."

একদিকে পিতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পুত্র নিবারণের বেঁচে থাকার চেষ্টা অন্যদিকে বৃদ্ধ পিতার, যে পুত্র তার মৃত্যু কামনা করে প্রতিনিয়ত, তাকে অবলম্বন করে দু'দিনের জন্য গরম ভাতে বেঁচে ওঠার অদম্য ইচ্ছা– এই দুই বিপরীত আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে লেখক যে জীবন-সত্যকে এখানে উদঘাটিত করেছেন এক কথায় তা অ-বাক্ করার মতো।

সংলাপধর্মিতা কথাসাহিত্যে যেমন নাটকীয়তার সঞ্চার করে, তেমনি গল্পের কাহিনীকে গতি দেয়। কারণ চরিত্রের সংলাপের মাঝখানে গল্পকারের কোনকিছু বলার সুযোগ থাকেনা। সুনীল এই সংলাপধর্মিতাকে কাজে লাগিয়ে আলোচ্য গল্পে নাটকীয়তার পাশাপাশি কাহিনীর মধ্যে একটা গতিশীলতা সঞ্চার করেছেন। ফলে গল্প যে কখন ফুরিয়ে যায় তা সব সময় পাঠকের খেয়াল থাকে না। সুনীলের গল্প রচনার এ এক বিশেষ রীতি।

'লোভী' গল্পটি বিষয়ের দিক থেকে কিছু ভিন্নতা দাবি করে। লোভ মানুষের সহজাত। কেউ সেই লোভকে জয় করতে চায় সংযম ও সাধনা দিয়ে, কেউবা সেই লোভকে চরিতার্থ করতে চায় যেনতেন প্রকারে। 'লোভী' গল্পের হারাধন দ্বিতীয় প্রকৃতির। সে লোভী। জীবন যাতে 'ব্রেথা' না যায় সে বিষয়ে সে অত্যন্ত চিন্তিত। যেকোন মানুষের মতো জীবনের বহুউপভোগ্যতার স্বাদ সে পেতে চায়। তাই সে ভুলে যায় তার আত্মপরিচয়। সে যে অন্যের আশ্রিত, তাও সে বেমালুম বিস্মৃত হয়।

ছোটকাকার চুরুটের অভ্যাস। চুরুট দেখে হারাধন জানতে চায়, 'ওটা কি?' ছোট কাকা বলে, 'এটা চুরুট। তুই কখনো চুরুট দেখিস নি?'

'আইজ্ঞে না। বাবু আমারে একখানা দেবেন? একবার টেনে দ্যাখব? জীবনটা ব্রেথা যাবে? দ্যাননা!'

ছোটকাকা হুংকার দিয়ে বলে, 'একটা লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো। বেশি বেশি আবদার পেয়েছিস তাই না?' হারাধন হি হি করে হেসে বলে,–

'মারেন, মারেন মত জোরে ইচ্ছা মারেন। লাথি আমি অনেক খাইছি। তাতে আমার বেশি লাগে না। কিন্তু ওই লম্বা তামুক কখনও খাই নাই। জীবনে একবার খাইয়া দেখব না! দ্যান ছোটবাবু, একবার দ্যান।'

নিভে যাওয়া উনুনের ওপর আধভর্তি দুধের কড়াইটা বসানো। একটা পাতলা সর পড়েছে তাতে। দেখা গেল–

'একটা মস্ত বড় হুলো বেড়ালের মতন উপুড় হয়ে হারাধন সেই কড়াই থেকে চুমুক মারছে দুধে।'

যদিও ধরা পড়ে সে লজ্জা পায়। বলে—

"দশ বারো বছর দুধ খাই নাই। কেমন লাগে ভুলেই গেছিলাম। তাই একটু ইচ্ছে হল... বড় ভালো সোয়াদ। আর একটুখাব ও দিদিমণি?"

হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা হারাধনকে আবিষ্কার করা গেল একেবারে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর শোবার খাটে। মায়ের চিৎকারে সবাই একসঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখল—

"খাটের উপর ঠিক পাখার নিচে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে হারাধন। খাটের গদিতে সে একটু একটু করে দোলবার চেষ্টা করছে।"

তারপর চললো লাথি ঘুসি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, ওকে বনগাঁয় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু কেন সে এমন কাজ করল, তার উত্তরে হারাধন বলে—

"কোনদিন গদির বিছানায় শুই নাই, মাথার উপর পাখা ঘোরে। গদির বিছানা, তাই ভাবলাম, জীবনটা ব্রেথা যাবে, কোনওদিন শোব না? তাই একটু বড় বাবুর মতন... হে হে হে, বড় ভালো লাগছে! একটু মার খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে, বড় ভালো গো বাবু!"

হারাধন চরিত্রটি গল্পকারের অনবদ্য সৃষ্টি। যদিও হারাধন একই সঙ্গে সহানুভূতির এবং ঘৃণার পাত্র। সে পরিনাম সচেতন, তবুও একের পর এক কান্ড ঘটায়, মার খায়, আবার অপপটে স্বীকারও করে।'জীবনটা যাতে ব্রেথা না যায়' এই ভাবনাই তার সমস্ত কাণ্ডের মূলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্প সংক্রান্ত যে মূল্যবান কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন তার শেষতম লাইন ছিল 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'। অর্থাৎ ছোটগল্প পাঠক মনে একটা অতৃপ্তির রেশ জাগিয়ে শেষ হবে। তাই গল্পকার যেখানে গল্প থামান, সেখান থেকেই পাঠকের মনের গল্প শুরু হয়ে যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লোভী' গল্পটি পাঠের শেষে পাঠক মনে এ ভাবনা জেগে ওঠা স্বাভাবিক যে, হারাধনের মতো মানুষেরা জীবনের যাবতীয় পাওয়া থেকে কেন বঞ্চিত হয়। কাদের আগ্রাসী লোভ হারাধনের মতো মানুষকে সামান্য সাধারণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে? তখন প্রকৃত লোভী কে বা কারা? এই জিজ্ঞাসা বদলে যায়। গল্পটি লাভ করে বহুমুখীণতা এবং শিল্প সার্থকতা।

'ছোটগল্পে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রেক্ষাপট, চরিত্র এবং অনুভব।' গল্পকার সুনীলের বেশ কিছু গল্পে দেখা যায়, গল্পের পটভূমি এবং পরিণাম আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তারা আশ্চর্যসুন্দরভাবে মিশে গেছে এক বিন্দুতে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'ইরফান আলি দু'নম্বর' গল্পটির কথা।

“প্রত্যেকদিন ভোরবেলা দেখা যায় কাতারে কাতারে মানুষ ছুটছে হাতিপোতা বাঁধের দিকে। মাঠ ভেঙে আলের পথে সারবন্দী মানুষ। এ ওর আগে গিয়ে পৌঁছতে চায়।”

কারণ বাঁধের জন্য মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছে। তাই কাজহীন মানুষগুলো একটু কাজের আশায় ছুটে ছুটে আসে।

> “প্রত্যেকদিন শ’দেড়েক লোককে নেওয়া হয়। হিসেব বড় জটিল। হাজার খানেক লোকের মধ্যে শ’দেড়েক লোক বেছে নেওয়া। অথচ সবাইকেই সুযোগ দেওয়া দরকার। তাই মস্তবড় একটা খাতায় সবার নাম লেখা আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাম ডাকা হয়। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনা— কোনদিন কার ডাক পড়বে। তাই আশায় আশায় প্রত্যেকদিন আসে সবাই।”

এই দলে আছে রোগা, দুর্বল ইরফান আলি। অনেক অপেক্ষায়, অনেক কষ্টে একদিন কাজের সুযোগ পায় সে। সে ভাগচাষী। অর্ধেক বছর কাজ থাকে না। আয়-উপার্জনহীন কাঠবেকার।

> “গ্রামের সিদ্দিকি সাহেবের ছেলে ইরফান তারই সমবয়সী। বরং একটু ছোটই হবে। কিন্তু সে গাট্টা গোট্টা জোয়ান, গলার আওয়াজটা বাজখাঁই। ভোটের সময় সে গলায় রুমাল বেঁধে সারা গাঁ হামলে বেড়ায়। ঝগড়া কাজিয়ার সময়েও সে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেইজন্যই সবাই তার নাম দিয়েছে এক নম্বর। ইরফান আলিদু’নম্বরকে কেউ মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না।”

দুর্বল শরীরে রোদ্দুরে পরিশ্রম করতে গিয়ে ইরফান আলি দুই জ্ঞান হারায়। অজ্ঞান হবার আগে সে ভেবেছিল—

> “...তার জীবনে যা যা পাওয়ার কথা ছিল সবই ওই এক নম্বরটা নিয়ে নিয়েছে। ওর তাগড়াই স্বাস্থ্য, ওর বিবি চনমনে। ও বাবুদের নেক নজরে পড়ে। জীবনে যা কিছু পাবার আছে, এক নম্বরই আগে থেকে পেয়ে যাবে। দু’ নম্বরের জন্য আর কিছু থাকবে না। ঘোষবাবু ঠিকই বলেছিলেন, এ কোনদিনই এক নম্বর হতে পারবেনা।”

একসময় ইরফান আলি দুই-এর জ্ঞান ফেরে। সে ঘোলাটে চোখে ইরফান আলি এক-এর দিকে তাকায়—

“হঠাৎ অন্ধরাগে সে হাতের কোদালটা বসিয়ে দিল সেই বড়শালী লোকটির মাথায়। দেখা যাক, এবার সে এক নম্বর হতে পারে কিনা।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বলাই’ গল্পের শুরুতে একটি প্রাসঙ্গিক কথা লিখেছিলেন—

“বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে।”

তাই আপাত নিরীহ মানুষের মধ্যেও একটা হিংস্রতা কিছু আত্মগোপন করে থাকে, কখনো কখনো সে ধ্বংসাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান গল্পটিতে রোগা দুর্বল ইরফান আলী দুই বঞ্চনা আর অপমান সহ্য করতে পারেনি। তার ভিতরের পশুশক্তি জেগে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের দুখিরাম, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর ও আলোচ্য গল্পের ইরফান আলিদুই-কে তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী করা যায় কি?

'পলাতক ও অনুসরণকারী' সুনীলের অনন্য তাৎপর্যময় একটি ছোটগল্প। আবেদনে বহুস্তরীয়, বহুঅর্থময় কবিতার সঙ্গে তুলনীয় এ গল্প। যদিও এজাতীয় গল্প সুনীল বেশি লেখেননি। গল্পটিকে নানা পার্সপেক্টিভে পড়া যায়, বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন রাজনৈতিক দলাদলি বা জাতিদাঙ্গার সূত্রেও ব্যাখ্যা চলে গল্পটির। গল্পটির শুরু একটি চাপা সাসপেন্স দিয়ে—

"তুমি?

রবি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ। চকিতে একবার পেছন ফিরে তাকাল।"

কে এই রবি? গল্পের কাহিনী এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলে না। তা অনুভববেদ্য। শুধু এটুকু বলে যে, সে একজন পলাতক। তাকে অনুসরণ করছে তিনজন লোক। ১নম্বর, ২নম্বর এবং ৩ নম্বর। নম্বর ধারী এরা কারা, তাও জানা যায় না। তারা কেবল রবিকে তাড়া করে ফেরে। সমালোচক ডেভিড সিসিল বলেছিলেন, ছোটগল্পের ভাষায় থাকে 'electrical imagination current'। সুনীলের এই গল্পে তার সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

> "রবি ছুটতে ছুটতে একজন অচেনা লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করল, স্টেশনটা কোনদিকে?
>
> লোকটি বলল, এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কেন? ওই তো ওই দিকে রাস্তা।
>
> — মাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়া যাবে না?
>
> — যাওয়া যেতে পারে আপনি রাস্তা চিনবেন না।
>
> রবি ধমক দিয়ে বলল, ঠিক চিনতে পারব। কোন দিকটা দেখিয়ে দিন না।
>
> ধমক খেয়ে দমে না গিয়ে লোকটি বলল, আপনি যখন অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে চান— তখন নিজেই রাস্তা খুঁজে নিন।

ছুটতে ছুটতে রবি সামনের একটা দেয়ালে ধাক্কা খায়। দেয়াল নয়, সেই তিনজন অনুসরণকারী। তারা নিপুন হাতে রবিকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল করে দিল এবং সেইসঙ্গে ছুরি চালাবার কাজটাও নিঃশব্দে সারে তারা। এখন আর রবির পৃথিবীর বাতাসের কোন প্রয়োজন নেই। হঠাৎ আট দশ জন ব্যক্তিকে এই দিকেই ছুটে আসতে দেখা যায়। পালাবার সুবিধার জন্য আগের তিনজন তিন দিকে ছুটতে লাগলো অর্থাৎ একটু আগে যে বা যারা ছিল অনুসরণকারী এখন সে বা তারা পলাতক। এইভাবেই মানুষ

পারস্পরিক হিংসা বা দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ে। হিংসার রাজনীতি বা দলাদলি সুনীল কখনো সমর্থন করেননি এ গল্পে আছে এসবের বিরুদ্ধে তার অন্তরচারী প্রতিবাদ।

ভাষা নিয়ে সুনীল বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাননি। কোলকাতা-কেন্দ্রিক মান্যচলিত ভাষা তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবিতার ভাষা ও গদ্যের ভাষার মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে, কিন্তু যাঁরা কবি তাঁদের গদ্যে অনেক সময় কবি ধর্মের ছোঁয়াচ লাগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসুর গদ্য তার প্রমাণ। কিন্তু সুনীলের বন্ধু, একসময়কার প্রখ্যাত কবি আনন্দ বাগচী এ বিষয়ে জানিয়েছেন—

"সুনীলের গদ্য রচনার একটি বিশেষ চরিত্র আছে। সে গদ্য কবিতার ছায়াপথ মুক্ত এবং একেবারেই বাস্তবিক রকমের সরল ক্ষিপ্র এবং লক্ষ্যভেদী।"

বাস্তবিক সুনীলের গদ্য সরল, প্রাঞ্জল। শব্দের প্রয়োগগত জটিলতা এবং অন্বয়গত জটিলতাকে যারপরনাই বর্জন করেছেন সুনীল। সেই সঙ্গে ছোট ছোট সরল বাক্যের অবলম্বন তাঁর গদ্যকে বিশেষ স্বাদুতা দিয়েছে। যদিও আমরা দেখি যে, কিছু কিছু গল্পে সুনীল চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন 'লোভী' গল্পের হারাধন কিংবা 'দেবদূত অথবা বারো হাটের কানাকড়ি' গল্পে হাসিনার চরিত্রের মুখের ভাষা চরিত্র অনুযায়ী বদল ঘটেছে। যদিও সে ভাষা সুনীলের নিজস্ব নির্মাণ। মহাশ্বেতা দেবীর মত ভাষার বৈচিত্র্যময় ব্যবহার আমরা সুনীলের গল্পে পাইনা। ফলে পাঠকের সঙ্গে সুনীলের গল্পের ভাষাগত দূরত্ব তৈরি হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, সুনীল বহুমুখী প্রতিভা। তিনি কবি, উপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক সবই। কিন্তু আমরা যখন তাঁর গল্প পড়ি, তখন কবি সুনীল কিংবা উপন্যাসিক সুনীলকে আমাদের মনে পড়ে না। তখন একমাত্র গল্পকার সুনীলই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। বলে যান একের পর এক গল্প। সে গল্প কখনো একই কাহিনীর চর্বিত চর্বন করে না। প্রত্যেকটি গল্প নতুনত্বের আস্বাদ আনে— নতুনের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়— এখানেই গল্পকার সুনীলের সার্থকতা।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ, ২০১১।
২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চাশটি প্রিয়গল্প, সাহিত্যম্, ২০০৯।
৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীলের সেরা ১০১, পত্র ভারতী, ২০১০।
৪. উজ্জ্বল কুমার দাস (সম্পা.), শত মুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যম্, ২০১৩।
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
৬. মঞ্জুভাষ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য, প্রতিভাস, ২০১৩।
৭. বইয়ের দেশ, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা।

অবতারি চৈতন্যদেব ও তাঁর মানবধর্ম

বাপি মাজি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: "বাঙালীর হিয়া অমিয় মাখিয়া নিমাই ধরেছে কায়া" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সচ্চিদানন্দ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অবতারি । গোলক অধিপতি ধর্মস্থাপনায় স্বয়ং অনিত্য কায়া ধারণ করে বঙ্গদেশের ধূলিকে পবিত্র করেছেন। প্রচার করেছেন নিরাকার ব্রহ্মের ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সরল নাম কীর্তন। দ্বিজচণ্ডাল যবনের মধ্যে নামপ্রেম বিলিয়ে দিয়ে মধ্যযুগের অস্থির বঙ্গ তথা পূর্ণভারতভূমির সামাজিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন মানব সমাজের অন্তরে।

সূচক শব্দ: ব্রহ্ম, শ্রীচৈতন্যদেব, মানবধর্ম, মধূররস, নামকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণ, অবতারি, বঙ্গদেশ, সামাজিক মেলবন্ধন, প্রেমধন, দ্বারকালীলা, ব্রজলীলা, যোনিজ, প্রিতিজ, বিদ্যাজ।

বিষয়বস্তু:

ভগবান যখন নিত্যধাম থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন তিনি অনিত্য মাটির বন্ধনকে স্বীকার করেন। সকল অবতার পুরুষ সম্পর্কে এই উক্তি সত্য। মাটির বন্ধন মানে মানব সম্পর্কের বন্ধন, লোক মর্যাদার বন্ধন, শ্রী রামচন্দ্র ভগবান বুদ্ধ সকলেই মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের প্রিয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যান। মানুষের মতোই জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন।

তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন রামাদি অবতার ভগবানের অংশবতার, কিন্তু দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ অবতার ভগত্তার পূর্ণ অবতরণ, কৃষ্ণেস্তু ভগবান স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, অবতার অংশ অবতারী পূর্ণ বা আংশী। অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবতংশ।। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ র্স্ব অবতংশ।। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বশ্রয়।। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ র্স্ব শাস্ত্রে কয়।। (চৈতন্য চরিতামৃতম আদি—২)

শ্রী কৃষ্ণ নব বপুগ্রহন করে লোকচরিত্রের অনুকরণ গো গোপ গোপীদের নিয়ে লীলা করেছিলেন। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন। কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরুপ। (চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্য—২১) স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে লোকেত্তর পুরুষোত্তম। মানুষী তনু আশ্রীতি হলেও তিনি পরতত্ত্ব, পরমমহত্ত্ব। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে তাকেই তৎকালীন শ্রেষ্ট মানবরূপে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়েছিল। নরবপুতেও তিনি পুর্ণ সর্বশ্রেষ্ট। তিনি মানব সম্পর্কে ধরা দিয়ে ব্রজ মথুরা ও দ্বারকালীলা করেছেন। প্রতিটি লীলার ভিতরেই তিনি মানব সম্পর্কে হৃদ্য রূপকে প্রকাশ

করেছেন। ব্রজলীলায় তিনি গোকুলের সন্তান, সুখা দয়িত, মথুরালয়ে তিনি দুষ্ট দলন হলেও জনক জননীর প্রতি কর্তব্য পরায়ণ বিনয় নম্র বচনে তিনি মাতা-পিতাকে অম্ব তাত বলে সম্বোধন করেছেন। প্রশ্রয়াবশত গ্রীনন্নাব তাতেতি সান্দরম দ্বারকালীলায় তিনি ছিলেন যদুকুলের প্রাণ। পুরোবাসীরা বলতেন হে বিশ্বভাবন, তুনিই আমাদের মাতা, পিতা, পতিও সহৃদ—"ত্বমেব মাতাথ সুহৃদ গতির পিতা। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তারা সূর্যালোকের অভাবে অন্ধের মতো অবস্থান করতেন। আবার তাঁর দর্শন পেয়ে আনন্দে মুদিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণও তাদের আত্মীয়-স্বজনের মতো মনে করতেন। পিতৃস্বসা কুন্তি ও পঞ্চপাণ্ডবের সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সজাগ। কৃষ্ণ চীর স্বজন বৎসল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় পূণ্যতম পূণ্যতর ও পূর্ণ এই তিন রূপকে প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ণতম রূপেই তাঁর অখিল মাধুর্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ। নিত্য গোলকে তিনি পূর্ণতম, আর মর্ত্য লীলায় গোকুলাক্ষ ব্রজধামে তিনি পূর্ণতম। মথুরা ও দ্বারকায় তিনি যথাক্রমে পূর্ণতর ও পূর্ণ। "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু।।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু) মাধুর্যের পূর্ণরূপেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম রূপ। এই মাধুর্যের সঙ্গে যতই ঐশ্বর্যের মিশ্রণ ঘটেছে ততই তিনি পূর্ণতমতা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। মর্ত্যলীলায় কৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রজধামে। এখানে চিরমধুর ও আনন্দঘন মূর্তিতে প্রকট, এখানেও তাঁর কিছুটা বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ আছে। কিন্তু সে বৈভব বা ঐশ্বর্য মধুর ঐশ্বর্য। ব্রজধামের কৃষ্ণ মধুরং মধুরং মধুরম। সে মাধুর্য মানবীয়ভাবে পূর্ণ। মাধুর্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে তা মধ্যাকর্ষনের মতো তত্ত্বকে ধলাই ধূসর নন্দকিশোর পরিণত করে ভগবানের ভগবত্তাকে আবৃত করে রাখে। মাটির মধুর যোগ রসামৃতম সিন্ধুর উর্মিলাকে আরো সুন্দর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলে। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যবাঁশি হয়ে বাজে। নরবপুতে দেবলীলার এই মাধুর্ম স্বাদু স্বাদু পদে পদে। ভারতভূমির মহাসৌভাগ্য দ্বাপরের সেই পূর্ণতম কৃষ্ণ নদিয়ার নগরীতে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান। তিনি বঙ্গের নবদ্বীপ ধামে জগন্নাথ মিত্রের ঘরে শচীদেবীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। সম্পুর্ণ প্রতিম ওদের দিব্যদূতি ও মহাপুরুষ লক্ষণ দেখে মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী ভবিষ্যদ বাণী করেছিলেন, সর্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ পোষণ" (চৈতন্যচরিতামৃতম আদি—১৪)। করেছিলেন তাই তাঁর আটচল্লিশ বছর জীবৎকাল পূর্ণ ভগবত্তারই পরিচয়। ধাম বেদে তাঁর কৃষ্ণস্বরূপতার ঈষৎ প্রভাব ঘটেছিল। নবদ্বীপ মণ্ডলের মতে তিনি সাধুগণের পরিত্রাতা, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ কর্তা, যুগধর্মের প্রতিষ্টাতা শ্রীকৃষ্ণ। এই মণ্ডলের অন্য মতে ইনি ব্রজনগর শ্রীকৃষ্ণের মতো নদিয়া নগর আবার নীলাচল মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের মতে ইনি রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ। ধাম ভেদেও ভক্তগণের রূচিভেদ চৈতন্যবতারের সিদ্ধান্ত যাই হোক সর্বত্রই তিনি ভৌম্য সম্পর্কের মাধুর্যকেই প্রকাশ করেছেন।

পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেন সহস্র মূল দুর্বাদলের মতো। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে জাতি সম্বন্ধ নির্বোয় অধ্যায়ে (১০ম অধ্যায়) এই সম্পর্কের বহু প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে সেখানে সাধারণত জগতে তিন প্রকারের সম্পর্ক গড়ে উঠে—যোনিজ, বিদ্যাজ ও প্রীতিজ—

"সম্বদ্ধাস্ত্রিবিধা পুং সাংকথিত জগতীতলে।
ব্বিদ্যাজো যোনিজশ্চৈব প্রীতিজশ্চ প্রকীর্তিতশ্চ।।"

জন্মগত সম্বন্ধগুলি যোনিজ। মাতা, পিতা, পুত্রাদির সম্পর্ক এই শ্রেণির বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেগুলি বিদ্যাজ। গুরু শিষ্য ও সহপাঠীদের সম্পর্ক বিদ্যাজ। প্রীতিজ সম্পর্ক জাতিগতভাবে নিঃর্সম্পর্কীয় হলেও জগতে সুখপদ ও সুদর্লভ। পরিজন প্রতিবেশী সুহৃদ সুখা বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রাদির সম্পর্ক প্রীতিজ। এছাড়াও আরো নানাভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাম সম্পর্কে সমাজ নিন্দিত অথচ অতি মধুর হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অরি সম্পর্ক ও সম্পর্ক। তবে সমাজে জন্মজ প্রীতিজ ও বিদ্যাজ সম্পর্ক গুলিই মধুর ও সমাজ বন্ধনের সূত্র। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবৎকাল আটচল্লিশ বছর। চরিতকারেরা বলেন তাঁর প্রথম চব্বিশ বছর কেটেছিল নদিয়ায় গৃহজীবনে পরিজন পরিবেশে। শেষের চব্বিশ বছর মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজীবন। তখনও তিনি লোকজীবনের সম্পর্কচ্যুত হননি। উভয় জীবনেই মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাঁর মধুর ও প্রীতির সম্পর্ক। যোনিজ, বিদ্যাজ, প্রীতিজ সম্বন্ধ যাই হোক সকলের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ আত্মীয় এমনকি বিজাতীয় মুসলমানদেরও তিনি প্রিয় ছিলেন। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস বলেন—'সর্ব মিষ্ট চৈতন্য গোসাঞিঃ, (চৈতন্যভাগবত আদি—৫)

গৃহজীবনে মানুষের প্রথম বন্ধন মাতৃস্নেহে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনে এই স্নেহ তাঁর মর্মমূলে প্রথিত ছিল। মাকে তিনি কোনদিনই ভূলতে পারেননি। বাল্য ও কৈশরকালে তিনি গৃহের কত দ্রব্য ক্রয় করেছিলেন, ইচ্ছামতো মালা চন্দন না পেলে তিনি গৃহের মূল্যবান জিনিসপত্তর ভেঙে চুরে তছনছ করেছেন। আবদার অনুযোগ যাকিছু মায়ের কাছেই, স্বর্বৎসহা পৃথিবীর মতো মাতা শচীদেবী পুত্রের সব উপদ্রব সহ্য করেছেন। গৃহের অপচয় দেখেও তিনি নিমাইয়ের প্রতি ক্ষুব্ধ হননি, দুঃখ করেননি। "এই মত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা। সহিলেন তনুক্ষণ শচী জগমাতা।" (চৈতন্যভাগবত আদি) বিশুদ্ধ বাৎসল্যের প্রতিরূপ শচীদেবীর মতো জননী চিত্র শুধু বাস্তবে নয় সাহিত্যে জগতে দুর্লভ। লালন পোষণ একান্ত স্নেহময়ী শচীদেবী দুঃখের অভিঘাতে আরো করুণ ও সজীব। এক পুত্র মায়ের মতো শঙ্কাতুরা এই জননী বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী হয়েছিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের হেতুরূপে তিনি অদ্বৈত মহাপ্রভুকে দায়ী করে বলেছিলেন কে বলে অদ্বৈত দ্বৈত বড়এ গোসাঞিঃ। কিন্তু এই অনুযোগে তাঁর মাতৃস্নেহের গভীরতাকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে অসহনীয় দুঃখ পেয়েও তিনি বলেছেন—"আপনার সুখ দুখ নাহি গুনি। তাঁর সেই সুখে সেই নিজ

করি মানি।” (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য খণ্ড) এই স্নেহের বন্ধনকে চৈতন্যদেবও যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। সন্ন্যাসের কঠিন নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি ঘোষণা করেছেন পরমার্থ যতেক তোমার। “সকল আঘাতে লাগি মোর ভার। বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বরাবর। তোমার সকল ভার আমার আমার।” (চৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড) এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছেন। সন্ন্যাস নিয়েও তিনি মায়ের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হননি। প্রতি বছর পুরীর থেকে মায়ের জন্য বস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন, মাঝে মাঝেই মায়ের তত্ব নিয়েছেন। নবদ্বীপের সহপাঠীদের সঙ্গেও গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ প্রীতির সম্পর্ক। ফাকি জিজ্ঞাসার ফাকে ফাকে সখ্যের মধুর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। মরালি মুকুন্দ কমলাকান্ত কেউ বা বয়সে বড় কেউ বা সমবয়সী। এঁদের নিয়ে নবদ্বীপের গঙ্গাতরঙ্গে সন্তরণের উল্লাস লীলার মতো এঁদের সহৃদ যেন নদী তরঙ্গের মতো অশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। মহাপ্রভু তাঁদের কাউকে ভুলতে পারেননি। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে এঁরা প্রায় প্রত্যেক বছরের শেষে প্রত্যেকেই নীলাচলে যেতেন। এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চৈতন্যদেবের বন্ধু বাৎসল্য চিত্ত যেন চন্দ্রদয় সাগরের মতো স্ফীত হয়ে উঠত। নদিয়া বান্ধবেরা ভুলিয়ে দিতেন সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীর ধর্ম। নির্মম সন্ন্যাসী এঁদের সান্নিধ্যে বিচলিত হতেন, নীলাচলে নদিয়া বান্ধবদের সঙ্গে বর্ষে বর্ষে মহাপ্রভুর মিলন যেন রসচ্ছল নাটকের মতো স্বাদ্য। তাতে কত রঙ্গরসিকতা, কত উল্লাস, কত হর্ষ দৈন্য বিষাদ, প্রিয় সম্ভাষণে, প্রেম আলিঙ্গনে, প্রেম বসে নৃত্য ও গানে সে যেন অপূর্ব রসমধুর এক আর্যগীত। চৈতন্যদেবের এই মর্ত্য ও মানবপ্রীতির আরো স্বাদ্য ও হৃদয় গ্রাহী হয়ে উঠেছে অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগী। পণ্ডিত কৌলীন্য ঐশ্বর্যতাকে আকর্ষণ করেননি। যে সকল বিষয় ও অহংকারকে উদ্দীপ্ত করে প্রাণের বন্ধনকে শিথিল করে মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর দুর্লঘ্য করে তুলে চৈতন্যদেব সেইসকল সম্পর্ককে যথাসম্ভব পরিহার করেছে। তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে সেসকল মানুষ যারা চিরদরিদ্র, চির অবহেলিত চিরকালের মূঢ়, তিনি লক্ষ করেছেন এঁদের মধ্যে রয়েছে প্রাণের অন্তরঙ্গতার মাধুর্যের ছাপ। মহাপ্রভুর মানব প্রীতির এক বৈশিষ্ট্য—তৃনের চেয়েও সুনীচ যারা, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু যারা, যারা অমানি ও মানদ তারাই শতমূলিত তৃনের মতো চৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়কে জড়িয়ে ধরেছে। মর্যাদা হয়ে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে মহাপ্রভুর প্রীতির সম্পর্কে প্রসারিত হয়েছে। সেখানেও মানুষ ব্যবসায়ী হয়ে স্বার্থ বুদ্ধির ওপরে উপরে গিয়েছে সংসারে বেশি স্বার্থ পরায়ণ ও আত্মকেন্দ্রিক হয় ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। শ্রী গীতায় বলেন, ব্যবসায়াকিতা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে’, এই বুদ্ধি সামাজিক প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারে না। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও মহাপ্রভুর প্রীতির বন্ধনে সমাহিত হয়েছে, সার্থযোগ নিসার্থ প্রীতির যোগে বাধা পড়েছে মহাপ্রভুর সম্পর্কে “দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ। বন্দি প্রায় হয়ে যেন পরে প্রেম ফাঁস।। (চৈতন্যভাগত আদি ৮) চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে দেখা যায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যা আরোহনের উদ্দেশ্যে নিমাই পণ্ডিত নগর ভ্রমণে বের

হতেন। সকলকে ডেকে তিনি এমনভাবে সম্ভাষণ করতেন যে সাধারণ মানুষ হাতে হাতে দেবের দুর্লভ বস্তু পেয়ে ধন্য হত। তারা ভুলে যেতো লাভ ক্ষতির কথা, তন্তুবায় তাকে উত্তম বস্ত্র এনে দিয়েছে গোপগণ বিনামূল্যে দিয়েছে দুগ্ধ ঘৃত দধি সর সুন্দর নবনী। মালাকার রঙ্গ করে প্রভুকে মাল্যে ভুষিত করেছে তাম্বুল বিনা কড়িতে দিয়েছে তাম্বুল। সকলের মুখে এক কথা—পাছে কড়ি দিহ না দিলেও দায় নাঞি।। সবচেয়ে কৌতুকর গৌরঙ্গ গন্ধবণিকের সংবাদ, গন্ধবণিকের ঘরে গিয়ে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন—"আরে ভাই ভালো গন্ধ আন। কী মূল্য লইবা বলে শ্রী শচী নন্দন। বণিক বলায়ে তুমি জান মহাশয়। তোমা স্থানে মূল্য কী বলিতে যুক্তি হয়। আজু গন্ধ পরি ঘরে গন্ধ নাহি ছাড়ে। তবে কড়ি দিহ মোরে যেদি চিত্ত পড়ে এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব অঙ্গে। গন্ধ দেয় বণিক না জানি কুন রঙ্গে।" (চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮) এমনি গৌরাঙ্গের আকর্ষণ। নির্মল প্রীতির আকর্ষণে সর্বভূত হৃদয় আকর্ষণে সব মন তেমনি আবার তিনি নিজে আকৃষ্ট হয়েছিলেন মানুষের অহৈতুক নিসার্থক প্রীতিতে। প্রীতির প্রকাশ বিচিত্র্য প্রীতিতে ভয় থাকে অভিমান থাকে, থাকে নিরপেক্ষ শাসন সর্বত্রই প্রিয়ের হীত কামনা। চৈতন্য মানব সম্পর্কে যাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাদের সকলের ভেতর প্রেমের এই মুদ্রা দেখেছিলেন, তন্তুবায়, মালাকার, গন্ধবণিক, খোলাবেচা, শ্রীধর গৌরাঙ্গকে ভালোবাসা দিয়ে সার্থক হয়েছে। ব্যবসায়ী হয়েও বিনিময় প্রতিদান তারা চাননি। প্রেম প্রেমপত্রের অকল্যাণ ভয়ে ভীতে, গয়া থেকে ফিরে আসার পর নিমাই পণ্ডিতের অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখে অদ্বৈত মহাপ্রভু পাদ্য অর্ঘ্য অচমনীয় গন্ধ পুষ্প ধুপ প্রদীপ নিবেদন করে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁকে 'নমো ব্রাম্মন্য দেবায় মন্ত্রে নমষ্কার করলে গদাধর পণ্ডিত শঙ্কিত হয়ে অদ্বৈত প্রভুকে বলেছিলেন, বালকের গোসাঞি এমন না জুয়ায়' (চৈতন্যভাগবত মধ্য ২) অনুরাগের লক্ষন এই বিধি নাহি মানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গৌর প্রেম সম্পর্কে এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। (চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত ১০) সেবক গোবিন্দের দাস্যপ্রেম সম্পর্কের এই উক্তি প্রযোজ্য। চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদ সম্ভাষণ করতে গিয়ে তিনি নিদ্রিত প্রভুকে ডিঙ্গিয়ে যেতেও দ্বিধা করেননি। তিনি বলতেন—"সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গনি, সব নিমিত্ত অপরাধ আভাষে ভয় মানি।।" (চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত ১০) মোটের উপর চৈতন্য ধর্মের তথা গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভিশান্ত মূমর্ম মূলতঃ মহাপ্রভুর নিজস্ব মধুর মানব সম্পর্ক কেন্দ্রিত জীবন প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্টিত। বহু মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে যুক্ত হয়ে প্রীতির যে স্বরুপ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কৃষ্ণ কথাশ্রয়ী পুরাণ ও ভক্তি শাস্ত্রে তাঁর সমর্থন রয়েছে। চৈতন্য ধর্মের পঞ্চভাব ও পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত গণপ্রীতির ফল। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন—'সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি। কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি? রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তাঁর উত্তর—এই প্রেমগীতি হার গাথা হয় নরনারীর মিলন মেলায়, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রেম মাধুরী মধুর মানব সম্পর্কের মেলা থেকে সমাহিত। দাস্যভাবের আদর্শ ভৃত্য

গোবিন্দ, সখ্যভাবের প্রতিরূপ মুরারী, মুকুন্দান্দি সহপাঠী, বাৎসল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি স্বয়ং শচীদেবী এবং মধুর ভাবের প্রতীক লক্ষ্মী দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, জগানন্দ, গদাধর, নরহরি এঁরা সকলেই সাধ্য ভক্তির পরকাষ্টা, শুধু ভক্তির দিক থেকে নয় চৈতন্য ধর্মের বৈষ্ণবীয় চরিত্র নীতির আদর্শ—চৈতন্য ভক্ত পরিজন দৈন্য ও নম্রতায় সনাতন গোস্বামী, সহিষ্ণুতায় হরিদাস অমানিভাবে শাস্ত্রজ্ঞ রামানন্দ, মানদভাবে প্রতিটি চৈতন্যপরিজন মহাপ্রভুর তৃনাদপি সুনীচেন শ্লোকের ভিত্তি রচনা করেছে, মানব সম্পর্কে ও মানব চরিত্র মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল প্রেরণা।

তথ্যসূত্র :

১। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত—বসুমতি সাহিত্য মন্দির, বেণীমাধব শীল সম্পাদিত, কলকাতা- ০০১, ১৯৯৭

২। শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত—বসুমতি সাহিত্য মন্দির, বেণী মাধব শীল সম্পাদিত, কলকাতা-০১, ১৯৯৭

৩। সোনার তরী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা- ০৯, ২০১৫

৪। চৈতন্যচরিতামৃত, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা- ০৯, ২০১২

অপত্যের ধর্মশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ

দীপঙ্কর পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় অনুশাসনই ছিল সমাজ, সংসার, আইন। মূলতঃ ধর্মীয় দর্শন ও ধর্মীয় সামাজিক অনুশাসনের প্রকৃতি আলাদা। দেশভেদে কালভেদে অনুষ্ঠানের রীতি-নীতিতে উত্থান-পতনের একতার স্পন্দন, শান্তির বার্তা সকল বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের আর্তিই চিরকালের 'ধর্ম' পদবাচ্য। আর বিদ্যাবিশেষ বিষয়ক গ্রন্থ মাত্রই 'শাস্ত্র' পদবাচ্য। বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে দিক পরিবর্তীত হয়ে ধর্মশাস্ত্রীয় শংসাপত্রের আধারে সন্তান দত্তকলাভ আধুনিক সমাজে চিরভাস্বর। প্রকৃতিগত কারণে সত্যের সম্মুখীন হয়ে, মানবসমাজ প্রাচীন মানসিকতাকে সাথী করে স্বীয় জীবনকে ব্যর্থ মনে না করে জীবনের স্বার্থে, হৃদয়ের স্বার্থে, ভালোবাসার স্বার্থে, বন্ধুত্বের স্বার্থে, জীবনের স্বাদ-আস্বাদন করে নর-নারী সুন্দর হতে চায়, যেখানে অভিমান থাকবে, অজুহাত থাকবেনা। বিবাদ থাকবে, দূরত্ব থাকবেনা। অফুরন্ত ভালবাসা থাকবে সেখানে কোনো জড়তার আশ্রয় যেন না থাকে।
সূচক শব্দ : ধর্ম, শাস্ত্র, বৈদিক, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, দত্তক।

ভূমিকা:

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় অনুশাসনই ছিল সামাজিক নীতি ও আইন। ধর্মীয় অনুশাসনেই পরিচালিত হয়েছে সমাজ ও সংসার। মূলতঃ ধর্মীয় দর্শন ও ধর্মের সামাজিক অনুশাসনের প্রকৃতি আলাদা। প্রথমটি হল কল্পনা ও তত্ত্বপ্রধান আর দ্বিতীয়টি হল সামাজিক অনুশাসন প্রধান। ফলে সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে তারই প্রভাব প্রতিফলিত হয়। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থরূপে স্বীকৃত 'বেদ' আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত। তবে পন্ডিতগণ মনে করেন প্রাচীনতম ঋগ্বেদ খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের শেষভাগ বা নবম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে রচিত হয়ে ছিল। তারপর বেদাঙ্গের যুগ, অর্থাৎ বেদাঙ্গের অন্তর্গত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শূল্বসূত্র সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত হয়। বৈদিকযুগের শেষভাগে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' রচিত হয় (মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের কাল ৩২০-৩১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।

বেদমূলকত্বহেতু ধর্মশাস্ত্রগুলি বেদেরই ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ। আর আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হল স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের যুগ। শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ মনে করেন যে লুপ্ত বেদশাখার কথা স্মরণ করেই ধর্মশাস্ত্রাদি

রচিত হয়েছিল । এই কারণেই মনুর উক্তি হল - " শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতি: "। আবার ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতিও বলা হয়-'স্মর্যতে বেদার্থোঽনয়া ইতি', এই সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর আগ্রাসন ও বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে এক সংকটকাল উপস্থিত হলে সমাজকে পুনরুজ্জীবনের মার্গে আনয়নের উদ্দেশ্যে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র প্রভৃতি সূত্র সংকলন করে ' মানবধর্মশাস্ত্র' রচনা করা হয় । উক্ত মানবধর্মশাস্ত্রই মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি নামে পরিচিত । ধর্ম ও সংস্কৃতি - এই দুটি প্রায় সমার্থক শব্দরূপে সমাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । আর মনুই স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রে স্তম্ভস্বরূপ। তবে ধর্মশাস্ত্রকারগণের সংখ্যাও স্বল্প নয় । ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক বলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সংহিতায় মনু, অত্রী, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনস, অঙ্গীরস্, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ- ২০ জনের নাম উল্লেখ করেছেন ।

প্রয়োজনীয়তা:

ভারত ইতিহাসের এক সুবর্ণময় যুগে জন্মগ্রহণ করে, ক্রমে ক্রমে কালের গণ্ডী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। তাঁরই দুয়ারে সমাজে অপত্যের ধারণাতে আধুনিকীকরণ বিষয়ে আলোচনা করতে উপনীত হতে হয়েছে জীবনের তাগিদে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের অগ্রসরতার জীবনীশক্তি প্রদান করে থাকে অপত্য বা সন্তান, তারাই ভবিষ্যতের সমাজ- সংস্কৃতি-সভ্যতার ধারক-বাহক। তাদেই সামাজিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ক্রমে কালের মূলস্রোতে বাসযোগ্য সমাজের অগ্রসরতার মার্গের এক পথিকের ভূমিকায় আমার এই প্রবন্ধ।

মূল আলোচনা:

ধর্ম

ভারতীয় পরম্পরায় 'ধর্ম' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয় । আর 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল ধারণ, পোষণ, পালন। ফলে ধর্ম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল যে ধারণ করে থাকে ,স্বীয় অবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না, আবার অভিধানানুসারে ধর্ম শব্দটি - অনুশাসন (Ordinance), ব্যবহারিক বিধি (Vsage), কর্তব্য (Duty), অধিকার (Right), ন্যায়বিচার (Justice), নৈতিকতা (Morality), সদ্ গুণ (Virtu), সৎকর্ম (Good work), অনুষ্ঠান (Function) ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristic)। আবার আমরা Religion অর্থটি ধর্ম শব্দে প্রযুক্ত হতেও দেখি, তবে Religion অপেক্ষা ধর্ম শব্দের অর্থের পরিধি বিশাল ও সুদূরপ্রসারী । অমরকোষ এর কালোবর্গে (১ |২১৪) ধর্ম শব্দের অর্থ হলো - পুণ্য, শ্রেয়স, সুকৃত (ক্লীব), বৃষ (পুং)- " স্যাদ্ ধর্মঃ স্ত্রিয়াং পুণ্যশ্রেয়সী সুকৃতং বৃষঃ "। আবার নানার্থবর্গে (৩|৪২৯) উক্ত হয়েছে -" ধর্মাঃ পুণ্যযমন্যায়স্বভাবাচারসোমপাঃ" অর্থাৎ পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও সোমপ 'ধর্ম' শব্দের অর্থে প্রয়োগ হয়েছে । তবে ধর্ম শব্দের উক্ত অর্থের স্পষ্টিকরণ করলে এই

দাঁড়ায় যে **পুণ্য** হল উপবাস ব্রতাদিজাত সুকৃত, **যম** অর্থাৎ শরীর সাধনা পেক্ষ কর্ম বা সংযম, **ন্যায়** হলো যথোচিত মার্গ থেকে বিচ্যুত না হওয়া, **স্বভাব** অর্থাৎ প্রকৃতি, **আচার** হলো ধর্ম শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং **সোমপ** অর্থাৎ সম্পানযাগকেই বুঝিয়ে থাকে । কিন্তু 'ধর্ম' শব্দটি কখনও বিশেষ্য রূপে আবার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে ধর্ম শব্দের ব্যবহার প্রধানত ধারক ও বাহক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে -'পিতুং নু স্তোষং মহোধর্মাণং তবিষীম্' (১/১৮৭/১) এবং ' ইমমঞ্জস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মাণমগ্নিং বিদথস্য সাধনম্' (১০/৯২/২)। বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম শব্দটি ধর্মীয় অনুশাসন, ব্রতাদি কর্তব্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে । ভাগবতপুরাণে (১/১৭/২২)সত্যযুগে বৃষ রূপ ধর্মের চারটি চরণ, তপঃ শৌচ ,দয়া ও সত্য বলে ব্যক্ত হয়েছে -তপ: শৌচং দযা সত্যমিতি পাদা: কৃতে কৃতা:'। চতুর্বর্গের অন্যতম হলো 'ধর্ম' এমনকি মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭৩ - ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) তাঁর প্রথম মুখ্য গিরি অনুশাসনে 'ধম্মলিপি' উল্লেখ করেছেন,যা সংস্কৃতে ধর্মলিপি বলে অভিহিত। উক্ত ধর্ম শব্দটি তিনি প্রজাবর্গের কর্তব্যবোধকেই (Law of duty) বুঝিয়েছেন। ধর্ম হল গতির সহায়ক বা নিয়ামক, তা হলো একটি অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় কারণ যা গতিকে সম্ভব করে তোলে, সক্রিয়কারণ নয় । যেমন জল মাছকে চলাফেরায় বাধ্য করে না, যদি মাছ গমন করতে চায় তবে জল তার গতির জন্য অনিবার্য সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।ফলে ধর্মের উপস্থিতি ব্যতীত তারা গতিশীল হতে পারে না। বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে 'ধর্ম' শব্দটির মূল হল - ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপস্যা, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, অদ্রোহ, অলোভ, অনসূয়া, দম, ভূতদয়া, ধৃতি, অস্তেয়, সুশান্তি ইত্যাদি। দেশভেদে- কালভেদে আচার -অনুষ্ঠানের রীতিনীতিতে উত্থান-পতনের মধ্যে একতার স্পন্দন, শান্তির বার্তা, সকল বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের আর্তিই চিরকালের 'ধর্ম'পদবাচ্য।

শাস্ত্র

'ধর্ম' ব্যতীত 'শাস্ত্র ' - এই বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে , শাস্ত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো -√ শাস্ +ষ্ট্রন্, যার অর্থ হিতানুশাসন গ্রন্থ বা any sacred treatise। অমরকোষে বলা হয়েছে "নির্দেশগ্রন্থযো: শাস্ত্রম্" অর্থাৎ আজ্ঞাব্যাকরণাদি গ্রন্থ হল 'শাস্ত্র '। আবার উক্ত গ্রন্থের টীকায় ব্যক্ত হয়েছে যে 'শাসন- সাধন' ব্যাকরণাদি গ্রন্থ হল শাস্ত্র।মেদিনী কোষে আগম বলে অভিহিত করা হয়েছে। রামায়ণের টীকায় বলা হয়েছে যে সাংখ্যযোগতর্কপূর্বোত্তরম মীমাংসা, স্মৃতি, কামন্দকাদিনীতি গ্রন্থ, ব্যাকরণই 'শাস্ত্র'। শ্রীধর -এর মতে শাস্ত্র হলো শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি গ্রন্থ । বিষ্ণু শর্মার মতে শাসন গ্রন্থ বা নীতি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থই শাস্ত্র । বিদ্যা বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থ মাত্রই 'শাস্ত্র'পদবাচ্য।

অপত্য

অপত্য বলতে যার দ্বারা বংশ লোপ হয় না, সন্তান, পুত্রকন্যাকে বোঝায় । ন + পত- যৎ= অপত্য(ক্লীব) নিষ্পন্ন । অপত্যের সমার্থক শব্দ **সন্তান** শব্দটি সম্-তন(করণ) +ঘঞ্ নিষ্পন্ন । যার অর্থ বংশ, পুত্রকন্যা, অপত্য অর্থেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আবার ভাববাচ্যে ঘঞ্ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় বিস্তার বা অবিচ্ছেদ । আবার **পুত্র** শব্দটি পুৎ+ √ ত্রৈ +

অ(ক)- ক হ্রস্ব নিষ্পন্ন । পুৎ- নামক নরক থেকে পিতার ত্রাতা, স্ববংশ শুদ্ধিকারক, সুত, তনয় ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । তাই বৃহদারণ্যকোপনিষদে(১/৫/১৭) উক্ত হয়েছে-"সঃ (পিতা) যদ্বনেন কিঞ্চিদক্ষয়াऽকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎ্ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ্ পুত্রো নাম।" বিষ্ণুপুরাণে(১৫/৪৩), মহাভারতে (১/৭৪/৩৯), মনুসংহিতায়(৯/১৩৮) ব্যক্ত হতে দেখা যায়---

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ্ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ্ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্বতঃ।।"

ঋগ্বেদে(১০/১৩/১) আবার উক্ত হয়েছে -' শৃণন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। আর **কন্যা** শব্দটি কন্ + যৎ স্বার্থে স্ত্রীয়াং টাপ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন । মহাভারতের(৩/৩৬/১৩) উক্ত হয়েছে -'সর্বান্ কাময়তে যস্মাৎ্ (তস্মাৎ্) কন্যা'। পরাশরসংহিতায়(৭/৬) ব্যক্ত হয়েছে -'দশবর্ষা ভবেৎ্ কন্যা'।

বৈদিক

সমাজে ধর্মশাস্ত্রের আলোকে অপত্য আধুনিকীকরণ বিষয়ে আলোচনায় প্রথমে আমাদের প্রাচীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। বৈদিক যুগের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে সমাজে তথা তৎকালীন যুগে বিশেষত দত্তকপুত্র গ্রহণে প্রচলন ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দত্তক পুত্রের বয়ঃবৃদ্ধি হলে স্বীয় পিতা-মাতার আশ্রয়ে চলে যেত। ফলে এই প্রথা দত্ত পিতা-মাতার কাছে খুব একটা সুখকর ছিল না। এই বিষয়ে ঋগ্বেদে (৭/৪/৭-৮) ব্যক্ত হয়েছে -

"পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেক্ ণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।
ন শেষঃ অগ্নেঃ অন্যজাতমস্ত্যচেতানস্য মাং পথো বি দুঃখক্ষয়ঃ।।"

অর্থাৎ ঋষিগণের প্রার্থনা ছিল যে অপত্য যেন অন্য জাত না হয় | আবার উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী মন্ত্রে বিষয়টি আরো পরিষ্কৃত হল -

"নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোऽন্যোদর্যো মনসা মন্তব্যঃ উত।
আধা চিদোকঃ পুনরিৎস ত্রত্যা নো বাজ্যভীষালেতু নব্যঃ।।"

অর্থাৎ অন্য জাতক পুত্র সুখকর হলেও তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে অথবা মনে করতে পারা যায় না । আর সে পুনরায় আপন স্থানে আশ্রয় নেয় । সুতরাং তাদের আহ্বান অন্নবান শত্রুনাশক নবজাতক পুত্র তাদের নিকট আসুক ।

কিন্তু বেদের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য -এর সময়ে তার চিত্র পরিষ্কার হল । ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মনুসংহিতায় মনু (৯/১৫৯-১৭৮) শ্লোকগুলিতে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের নাম উল্লেখ করে বলেন-

"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢোৎপন্নোऽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবশ্চ ষট্।।"

ঔরস - সবর্ণা বিবাহিতা পত্নীতে স্বীয় স্বামীর ঔরসে জাত পুত্র । **ক্ষেত্রজ** - অপুত্র স্বামীর স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষ কর্তৃক নিয়ম প্রথার মাধ্যমে উৎপাদিত পুত্র । **দত্তক** - পিতা-মাতা কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে অন্যের দ্বারা গৃহীত পুত্র। **কৃত্রিম** - মাতা-পিতার হীন বালক যে কারো দ্বারা অর্থ-সম্পত্তির লোভে পুত্ররূপে গৃহীত। **গূঢ়োৎপন্ন** - স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র । **অপবিদ্ধ** - যে সন্তান মাতা- পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও অন্যের দ্বারা পুত্ররূপে গৃহীত ।উক্ত ছয় প্রকার গোত্রদায়াদ ও বান্ধব বলে খ্যাত।
আরও ছয় প্রকার সন্তান বিষয়ে উক্ত হয়েছে -

"कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा।
स्वयंदत्तस्य शौद्रश्च षडदायादवान्धवा।।"

কানীন - অবিবাহিতা রমণীর পুত্র। **সহোঢ়**- বিবাহের পূর্বে যে নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়, সে যে পুত্রকে বিবাহের সময়ে সঙ্গে নিয়ে আসে । **ক্রীত** - যে সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে ক্রয় করে সন্তানরূপে গৃহীত । **পৌনর্ভব** -পুনর্ভ বা পুনর্বিবাহিত স্ত্রীলোকের সন্তান । **শ্রৌদ্র** - দ্বিজের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান । উক্ত ছয় প্রকার সন্তান গোত্র-দায়াদ নয়, কেবল বান্ধব অর্থাৎ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদির অধিকারী হয় মাত্র ।

দত্তক শব্দটির সঙ্গে পিতা-মাতা কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে অন্যের দ্বারা পুত্ররূপে গৃহীত, যিনি Adopted Son বা Daughter নামে বর্তমানে অভিহিত হয়ে থাকে। 'দত্তক' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাই, দা ধাতুর সঙ্গে ক্ত প্রত্যয় যোগে স্বার্থে ক প্রয়োগে নিষ্পন্ন । দত্ত অর্থ টি হলো - ত্যক্ত, বিসৃষ্ট, সমর্পিত, রক্ষিত, প্রেরিত ।

আর দত্তক হল যে সমর্পিত, রক্ষিত বা প্রেরিত হয়েছে । তবে এরমধ্যে দাতা ও গ্রহীতা সম্পর্ক জড়িত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার (২/৩৩) শ্লোকেও দত্তক ও দত্তক পুত্র হিসেবে ' দত্রিম ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যার অর্থ দান নিমিত্ত, দান জনিত, অর্থাৎ প্রতি গ্রহীতার পুত্রা ভাব নিমিত্ত আপৎকালে পিতা-মাতা কর্তৃক প্রীতি পূর্বক যথাবিধি দত্তপুত্র । এ বিষয়ে মনুর (৯/১৬৮) মত হল -

"माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयः दत्रिमः सुतः।।"

এখানে 'সদৃশ' শব্দটি গুরুত্ব রয়েছে - তাদের মতে "জাতিতে সদৃশ"নয়, কিন্তু স্বীয় বংশের অনুরূপ গুণযুক্ত, অর্থাৎ গুন সদৃশ হতে হবে। ক্ষত্রিয়া জাত পুত্ররাও ব্রাহ্মণের 'দত্তক 'হতে পারে।দত্তকের ক্ষেত্রে দাতা প্রীতি যুক্তভাবে দান করবেন। সেইসঙ্গে গ্রহীতাকে ও প্রীতি যুক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।কোন প্রকার লোভাদিবসত দান করা পুত্রকে দত্তক বলা যাবে না বা তা সুখকর হবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে জাতিগত সাদৃশ্য বিবক্ষিত নয়, এখানে গুণগত সাদৃশ্যই বক্তব্য। আর গুণগত মানের বিচার করতে হলে লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে বলে মনে করা যেতে

পারে। সুতরাং তৎকালীন সমাজে দত্তকের বয়সের ধারণা সুনির্দিষ্ট না থাকায় আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

আবার যাজ্ঞবল্ক্য তার গ্রন্থে (১০০খৃষ্টাব্দ-৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত) ব্যবহার অধ্যায়ের দায়ভাগ প্রকরণে (১২৯-১৩২) দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করেছেন, সেই তালিকা হলো - ঔরস, ক্ষেত্রজ, পুত্রিকা পুত্র, কানীন, সহোঢ় বা সহোঢ়জ, গূঢ়োৎপন্ন , পৌনর্ভব, অপবিদ্ধ, দত্তক(দত্রিম),ক্রীত পুত্র, স্বয়ং কৃত বা কৃত পুত্র ও স্বয়ং দত্ত। তবে পূর্বের মনুর বর্ণিত পুত্রের মধ্যে তিন প্রকার পুত্রের রূপ পৃথকভাবে এখানে পাই, **পুত্রিকাপুত্র** - অপুত্রক ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদানের সময়ে জামাতার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সে আমার শ্রাদ্ধ ও পিন্ডের অধিকারী হবে - এইভাবে পিতা বিবাহ দেন । ঐ কন্যাকে পুত্রিকা আর তার জাত পুত্র হল পুত্রিকাপুত্র । **স্বয়ংকৃত** - নিজে থেকেই যাকে গুনাদি বিচার করে পুত্ররূপে গ্রহণ করা হয় তাকে স্বয়ংকৃত বা কৃতপুত্র বা ধরমপুত্র বলা হয় । **স্বয়ংদত্ত** - পিতৃমাতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃ পরিত্যক্ত কোনো সন্তান স্বেচ্ছায় অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলে সে গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র বলে বিবেচিত হয়।

তবে দত্তক শব্দটিকে এখানে এইভাবে বলা হয়েছে যে - পিতা-মাতা দান করলে গ্রহীতা যে পুত্র প্রাপ্ত হয় তাকে 'দত্তক পুত্র' বলে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদি আপদকালে অথবা গ্রহীতার পুত্র ভাবত্বরূপ আপদে পিতা-মাতা জ্যেষ্ঠপুত্র ভিন্ন অন্য যে কোন পুত্রকে প্রীতি পূর্বক জল হস্তে দান বিধি অনুসারে সবর্ণ পুত্রকে দান করলে সে পুত্রকে দত্তক বা দত্রিম পুত্র বলে। জ্যেষ্ঠপুত্রের ন্যায় একমাত্র পুত্রকেও দান করা যাবে না বা গ্রহণ করা যাবে না (বশিষ্ট১৫/৩) জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মমাত্রই মানুষ পুত্রবান হয় এবং ওই জ্যেষ্ঠ পুত্রই পুত্র কর্মের প্রধান অধিকারী। দত্ত গ্রহণ বিষয়ে বৈশিষ্ট্যের আরো বিধি হল যে দত্তক গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাক্তি আত্মীয়-বন্ধুগণের আমন্ত্রিত করে রাজাকে যথারীতি নিবেদন করে গৃহমধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক মহাব্যাহৃতি হোম করে দেশ ও ভাষা ইত্যাদিতে বহু দূরবর্তী নয় এমন যে পুত্র তাকেই গ্রহণ করবে। দত্ত গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জাত হলে যদি দত্তক অধিক গুনবান হয় তবে সে ঔরস পুত্রের ষষ্ঠাংশ পাবে। দত্তক পুত্র জন্মদাতার গোত্র ও ধনলাভ করতে পারবে না। এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের(২/১৩০) মত হলো -"দদ্যান্ মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেত্"। অর্থাৎ মাতা পিতা যদি কোন পুত্রকে সবর্ণ ব্যক্তির হস্তে প্রদান করেন তবে সেই পুত্র দত্তকপুত্র রূপে পরিচিত হয়। মাতা স্বামীর অনুমতি নিয়ে বা স্বামী বিদেশে গমন করলে বা মৃত্যু হলে পুত্রকে দান করতে পারেন। পিতা একাও পুত্রকে দান করতে পারেন। আবার মাতা-পিতা উভয়ে সহমত হয়ে যখন কোন সবর্ণ ব্যক্তির হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করেন সেই পুত্রকেও বলা হয় দত্তকপুত্র।

আর্যগণের প্রতিষ্ঠিত পিতৃতন্ত্রে ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও রক্ষাকর্তা হিসেবে পুত্রের প্রয়োজন ছিল অসীম আর ভার্যা ছাড়া পুত্র প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তাই পুত্রার্থে ভার্যা

গ্রহণ করার রীতির কথা বলা হয়েছিল - 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা'। নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু পুত্রের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয় তাই কন্যাকে জন্ম দিতে হয়। পুত্র কামনা মানুষের চিত্তে গভীরভাবে প্রোথিত করার অভিলাষে শাস্ত্রকারগণ কল্পনার স্বর্গ-নরক নির্মাণ করে পুত্রের পিতাই স্বর্গে স্থান লাভ করেন আর পুত্রহীনের স্থান নরক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুপুরুষের বংশ-পরম্পরা রক্ষার জন্য শুধু পুত্র হলেই চলে না, অন্তত প্রপৌত্র পর্যন্ত নিম্নতর তিন পুরুষের পাকা বন্দোবস্ত থাকা চাই । কিন্তু আশ্চর্যের এই যে মাতৃ দেহজাত পুত্র পিতাকেই অমরত্ব দান করে, তাকে সে অমরত্ব দিতে পারে না। মাতৃ ঋণ বা মাতার অমরত্বের কথা বলা হলো না শাস্ত্রে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে সর্বত্র পুত্রের জন্য প্রার্থনা করা হলেও কেবলমাত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬/৪/১৭) উল্লিখিত রয়েছে যে পিতা-মাতা যদি পন্ডিত কন্যা পেতে চান তাদের করণীয় বিধি সম্বন্ধে।

আবার মনু(৯/৯৫,৮১) বলেছেন "প্রজোনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টা"-প্রজনন এর জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রী বন্ধা হলে বা আট বছর পর্যন্ত মৃতবৎসা হলে বা দশ বছর পর্যন্ত শুধু কন্যা সন্তানের জন্ম হলে স্বামী পুত্রার্থে দ্বিতীয় বিবাহ করবেন।বৈদিক যুগ থেকেই দম্পতির সন্তান হীনতার দায়-দায়িত্বের স্ত্রীকেই দায়ী করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের শাস্ত্র ভিত্তিক সমাজে একদিকে সন্তানহীনতার জন্য স্ত্রীকে দায়ী করা, অপরদিকে সন্তানের জন্মের হেতু বলে পিতার ভূমিকার প্রাধান্য প্রদান করা। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পিতা-মাতা কন্যার দ্বারা ইহলোক বা পরলোকে কোনভাবেই উপকৃত হন না। ধর্মীয় বিধানে প্রাচীনকাল থেকেই অনাকাঙ্খিতা কন্যা একবার জাতা হলে তাকে পালন করা হতো প্রধানত পুত্র উৎপাদন করার স্বার্থে। কিন্তু কোন প্রজাতি কে রক্ষা করতে হলে পুরুষের অপেক্ষা নারীর প্রয়োজন বেশি। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ দিতে বা মহামারীতে লোকক্ষয় দেখা দিলে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী জাতির সংখ্যা বেশি থাকলেই মনুষ্য প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়গণ অল্প কয়েকজন ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নারীরা সব জীবিত ছিল বলেই ক্ষত্রিয়গণের বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল।সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীত্বের উপর সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে পুরুষের পিতৃতন্ত্রকেই হাতিয়ার করা হয়েছে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে শুরু করে সকল শাস্ত্রকার গণের নারী ক্রোমোজোমের পুরুষ সন্তান প্রজননের ক্ষমতার কথা না হয় জানা ছিল না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় - পুরুষের জনন কোষে XY নামে দুটি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম থাকে, আর স্ত্রীর জনন কোষে XX নামে দুটি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম থাকে ফলে পুরুষের X ক্রোমোজোমের সঙ্গে স্ত্রীর Xক্রোমোজোম মিলিত হলে কন্যা(XX) সন্তানের জন্ম হয়। আর পুরুষের Y ক্রোমোজোমের সঙ্গে স্ত্রীর X ক্রোমোজোম মিলিত হলে পুত্র (XY) সন্তানের জন্ম হয়। আবার Y ক্রোমোজোম অপেক্ষা X ক্রোমোজোম বেশি শক্তিশালী ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। তাই প্রকৃতিগত কারণেই কন্যা সন্তানের জন্মের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই সত্যের সম্মুখীন

হয়েও বর্তমান সমাজ প্রাচীন মানসিকতা পোষণ করে চলেছে।পুত্র সন্তানের জন্ম না দিতে পেরে যেমন নারী সমাজে অবহেলিত হচ্ছে তেমনি নিঃসন্তান নারী এখনো হীনমন্যতায়, নিঃসঙ্গতায়, একাকীত্বে,গুরুত্বহীনতায় স্বীয় জীবনকে ব্যর্থ মনে করে চলেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে মনুর (২/১৪৫) মাতৃ গৌরবের কথা-

"उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्य्याणां शतं पिता।
सहस्रस्तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते।।"

অর্থাৎ দশ জন উপাধ্যায় (ব্রাহ্মণ) অপেক্ষা একজন আচার্যের গৌরব অধিক, একশত আচার্যের গৌবর অপেক্ষা পিতার গৌরব অধিকতর ,সর্বোপরি সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিকতর ।

উপসংহার:

শাস্ত্রীয় পরম্পরা আমাদের শিখিয়েছে -' চরৈবেতি চরৈবেতি'। আর এই অগ্রগতির বাধক হলো সামাজিক ' অবসাদ '। অবসাদ মুক্ত জীবন বহন করে 'সাফল্য', আর কারো সাফল্যে বাস করে অপরের 'বিদ্বেষ'।

তাই পিতৃত্ব- মাতৃত্ব স্বাদে পূর্ণ জীবন লাভের আমরা আর মনোরোগবিদ্ গণের শরণাপন্ন হবো না। কারণ সন্তান বা অপত্য হলো আমাদের জীবন, সমাজের ভবিষ্যত। আর 'জীবন' হল বাঁচার জন্য, 'মন ' হল দেওয়ার জন্য,' ভালোবাসা ' হল সারা জীবন পাশে থাকার জন্য, 'বন্ধুত্ব' হল জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য, সন্তান পালনের বন্ধুত্বের চাণক্যের মত হল -

"लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्।
प्राप्तेषु षोडश वर्षे पात्रमित्रवत् आचरेत्।।"

কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যে 'আরো ভালোর' খোঁজে আমরা 'ভাল'কেই হারিয়ে ফেলি। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভালোবাসা একই জিনিস। ' জ্ঞান ' আর 'ভালোবাসা 'র মাধ্যমেই লক্ষ্যকে পূরণ করা যেতে পারে, তাই এখানে ভালোবাসা নামক পথটি বা মার্গটি বেশি সহজ। সুখী গৃহ বা সুস্থ সমাজ সম্পর্ক দিয়ে নির্মিত করতে হয়। যেখানে অভিমান থাকবে, কিন্তু অজুহাত থাকবে না; বিবাদ থাকবে, কিন্তু দূরত্ব থাকবে না।

তথ্যসূচী :

১. অমরসিংহ, অমরকোষ; শ্রীমৎ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ১৪০৮ বা।

২. ঋগ্বেদসংহিতা; রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত, নিমাই চন্দ্র পাল সম্পাদিত, সদেশ, কলিকাতা, ২০০৭।

৩. কুবেরভট্ট, দত্তকচন্দ্রিকা; ড. কমলনয়ন শর্মা সম্পাদিত, জগদীশ সংস্কৃত পুস্তকালয়, জয়পুর, ২০০৮।

৪. নন্দপন্ডিত, দত্তকমীমাংসা; আচার্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ পান্ডের সম্পাদিত, বনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসী, ১৯৮০।

৫. বিষ্ণুপুরাণ; এইচ. এইচ. উইলসন সম্পাদিত, নাগ পাবলিশার্স, দিল্লি, ১৯৬১।

৬. ভাগবতপুরাণ; পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৩৮ব।

৭. মনুসংহিতা; মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮।

৮. মহাভারত; পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮২৬।

৯. যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি; খিস্তে নারায়ণ শাস্ত্রী ও হোশিঙ্গজগন্নাথশাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারানসী, ১৮৮৬।

১০. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্তৃক অনূদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ২০০১।

১১. Hopkins, E.W.; Indian Inheritance, Bombay, 1955-56.

১২. Kane, P. V.; History of Dharmashastra, vol.I-V, BORI, 1930-58.

১৩. Oldenberg, H.; Ancient India: It's Language and Religion, Chicago, 1898.

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘মুক্তা-মালা’ গ্রন্থে হাসির আড়ালে ব্যঙ্গ

দেবাশিস মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

বাংলা সাহিত্যের ‘হাস্যরস’ নামক একটি বিশেষ জনপ্রিয় শাখায় দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। মানুষকে নির্ভেজাল হাসিতে মাতিয়ে রেখেছেন বেশ অনেকটা সময় ধরে। তাঁর গল্পে যেমন আছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ তেমনি আছে নিছক হাসি। মানুষ চিরকাল এই হাসিতে লুটোপুটি খেয়েছে। সেই অর্থে বাংলা সাহিত্যে তিনিই হাসির স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথও ত্রৈলোক্যনাথের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন এতদিন পর বাঙ্গালায় এমন একজন লেখকের সন্ধান পাওয়া গেলো যার লেখা বালক-বালিকাদের সাথে সাথে তাদের পিতামাতাকেও মনরঞ্জন করতে পারে। তিনি ‘কঙ্কাবতী’ নামক কালজয়ী উপন্যাসের পাশাপাশি অনেক গল্পও লিখেছিলেন। আমার এই আলোচনায় আমি প্রধানত তাঁর একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ ‘মুক্তা-মালা’র গল্পগুলিতে হাসির আড়ালে ব্যঙ্গ কীভাবে ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবো।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ ‘মুক্তা-মালা’। গ্রন্থটিতে সুবলচন্দ্র গড়গড়ি মহাশয়ের আত্মকথা ছাড়া আরও এগারোটি গল্প আছে। গ্রন্থটির পরিকল্পনায় ত্রৈলোক্যনাথ আরব্য উপন্যাসের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। লেখক নিজেও এই আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে ঘনশ্যামের মুখেই বলেছেন– “এ একটি গল্প নয়। আরব্য উপন্যাসের মতো অনেকগুলি গল্প।”[১] শুধু আরব্য উপন্যাস নয় সংস্কৃত হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও এই টেকনিক দেখা যায়। গ্রন্থটির প্রথমেই সুবল গড়গড়ির আত্মকথা পরপর সাতটি রজনীতে বিভক্ত করে বলা হয়েছে। এবং শেষে উপসংহার দেখানো হয়েছে। মাঝের যে এগারোটি গল্প সুবল মুণ্ডমালা রূপী বেতালদের কাছে বলেছে সেগুলো এক একটি স্বতন্ত্র গল্প।

এই গ্রন্থটিতে যে ধরনের হাসি-ব্যঙ্গ আছে তা অতি প্রচ্ছন্ন। তাকে ঠিক যেন ব্যঙ্গ মনে হয় না। তবুও তা যে ব্যঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেই ব্যঙ্গের আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যে হৃদয়হীন আচরণ তাকেই রূপ দিয়েছেন লেখক সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের গল্পে (প্রথম রজনী)। সুবল গড়গড়ি সৎ মানুষ তার মধ্যে আছে সৎ বুদ্ধি, সৎ প্রেরণা ও আন্তরিক ভালোবাসা। ছোট ভাই অক্রুর তার সাথে যতই নীচ ব্যবহার করুক না কেন তাকে সে ক্ষমা না করে পারে না। অক্রুর হৃদয়হীন, অসৎ সঙ্গকারী, মিথ্যাভাষী, মদ্যপায়ী এজন্যই সে দেবতার

মতো বড় ভাইকে অপমান, অত্যাচার, যাতনা দিয়ে অজ্ঞান করেছে। অবশ্য তার একাজে সহায়তা করেছে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা। তাদের মধ্যে গুরুদেব, ডাক্তার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অক্রুর সাথে চক্রান্তে জড়িত নীচ হৃদয়হীন মানুষগুলিকে লেখক তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন গল্পটিতে, যা খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়িয়ে আছে।

নির্মম গুরুদেব ব্রাহ্মণ গোলক চক্রবর্তীকে নিয়েও একটি দৃশ্য রচিত হয়েছে (দ্বিতীয় রজনী)। সুবল গড়গড়ির কুলগুরু যে কী ধরনের নিষ্ঠুর মানুষ তা তার কার্যকলাপে প্রকাশ পায়। অর্থের বিনিময়ে সে যে কোনো পাপ কাজই করতে পারে। ধর্মহীন, হৃদয়হীন, নীতিহীন এই গুরুর যে কি জঘন্য স্বভাব তার পরিচয় দেওয়া হল- সুবল গড়গড়ি গুরুদেবের সাথে দেখা করে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে এবং গুরুদেব তার স্থূল পাদপদ্মটি তার মস্তকে তুলে দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ যে সব পাষণ্ড পর্যায়ের চরিত্র এঁকেছেন এই গুরুদেব তাদের মধ্যে অন্যতম। সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অথচ কশাইয়ের ব্যবসা করে, আবার নিজের ব্রাহ্মণ্যত্ব সম্বন্ধে গৌরবও করে। এই ধরনের চরিত্রের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের এক প্রকার বিতৃষ্ণা আছে। ব্রাহ্মণ নামধারী এই সম্প্রদায়কে লেখক সব সময়ই ব্যঙ্গের পাত্র করে তুলেছেন, উচ্চবর্ণে জন্ম গ্রহণ করে তার গরিমায় এরা সমাজে নানান অশোভন আচরণ শুরু করে যা ঘৃণার যোগ্য।

গুরুদেব কশাইবৃত্তি করে সুতরাং দয়ামায়া করলে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। সে জায়গার অভাবে একটা খোঁয়াড়েই অনেক ছাগল এক সাথে রাখে। ছাগলগুলোর ক্ষুধা-তৃষ্ণা দেখেও গোলক চক্রবর্তীর দয়া-মায়া নেই। প্রথম প্রথম দু-একদিন জল দিত কিন্তু তৃষ্ণাকুল ছাগলেরা গোলমাল করে বলে আর জলও সে দেয় না। সবই তার অমানবিকতার পরিচয় বহন করে। লোককে সে পাঁঠা বলে পাঁঠির মাংস দিয়ে ঠকায়। তার স্বভাবের নৃশংসতার চূড়ান্ত পরিচয় পাই জীবন্ত পাঁঠার চামড়া ছাড়ানোর ঘটনাটিতে। জীবন্ত পাঁঠার চামড়া ছাড়াবার কারণ প্রসঙ্গে সে বলেছে– "জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রিত হয়।"[২] গুরুদেব এই দু-আনা বেশি লাভ করার জন্যই নিষ্ঠুরতার চরম দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে নানা জায়গায় জীবজন্তুর প্রতি মমতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। গুরুদেবের নির্দয়তাকে তিনি যে কীভাবে অন্তরে অনুভব করেছিলেন তা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়– "আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম! সেই চক্ষু দুটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল– আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপর ভগবান কি নাই!"[৩] লেখকের এই অনুভব স্পষ্টই যেন জগতের এই গুরুদেব রূপী কশাই শ্রেণির নিষ্ঠুর লোকগুলোকে ব্যঙ্গ করে।

আর একটি ঘটনা। একদিন গড়গড়ি মহাশয় একটি কলেরা রোগাক্রান্ত রোগীকে মাঠ থেকে এনে সেবা-শুশ্রূষা করে। যদিও রোগীটি অবশেষে মারা যায়। এর জন্য তাকে এক ঘরে হতে হয়, আর একাজে যে প্রধান ছিল সে গোলক চক্রবর্তী। গড়গড়ি মহাশয় কারোর দোষ না দিয়েই নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে বলে- "গ্রামের লোক যে নিতান্ত অন্যায় কথা বলিল, তাহা নহে। বরং আমি নিজেই যে অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিব! সেই অনাথ লোকটিকে সে অবস্থায় মাঠের মাঝখানে ফেলিয়া আসিতে পারি নাই।"[৪] এই কথাগুলো থেকে আমরা লেখকের অন্তর মনের পরিচয় পাই। আমরা যাতে বিপদে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াই সে শিক্ষাই যেন লেখক এখানে দিতে চেয়েছেন। এর পাশাপাশি লেখক এখানে তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার প্রতি ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন।

মানুষ একবার যখন নিচে নামতে থাকে তখন কোনো পাপকেই পাপ বলে মনে করে না, কোনো অন্যায়কেই অন্যায় বলে ভাবে না। তখন তারা অন্ধ মাতাল নেশায় ছুটে চলে। এরা তখন সম্পূর্ণ ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে যায়। এই কারণেই অক্রুর ও তার বন্ধুবর্গ এবং গ্রামের সেই হাতুড়ে ডাক্তারটি ব্যঙ্গের পাত্র। মানুষ মাত্রেই ভুল করে, তাই ভুল করাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে পারি না। কিন্তু কোনো ভুল যখন পরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় তখন তা ঘৃণ্যের হয়, হয় তা ব্যঙ্গের। অক্রুর, গুরুদেব ও ডাক্তার- এদের সকলেরই কাজকর্ম ঘৃণার যোগ্য। এরা সবাই এদের পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছিল। অক্রুর জীবনে কখনও সুখী হতে পারেনি। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়। স্ত্রীর সাথে কলহ হলে অক্রুর স্ত্রী তার কাষ্ঠ নির্মিত পা দু'খানি লুকিয়ে রাখত। তখন বহু সাধ্য-সাধনা চলত কাষ্ঠ নির্মিত পা দু'খানি নেওয়ার জন্য, সে দৃশ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুক দুই-ই পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দু দর্শন মতানুসারে আমরা জানি যে হিন্দু জীবাত্মার ক্রমশ ঊর্ধ্বগতি হয়। লেখক এখানে যেন এই মতবাদকে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। গড়গড়ি মহাশয়ের আত্মকথনে দেখা যায় কখনও সে দেখেছে অসহায়ভাবে গির্জার মাথায় ঘুরছে। সকলকে ডাকছে কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না, তারপর ঘুড়ির সাথে ওড়া, সমুদ্রের মধ্যে ঝিনুকের সাহায্যে ভেসে চলা, বিজন অরণ্যে বাঘের সম্মুখীন হওয়া, আত্মরক্ষার্থে গাছের উপর আশ্রয় নেওয়া, আবার কখনও দেখছে নারকেলমুখী তাকে বিবাহ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে আর সেই ভয়ানক স্বভাব ও আকৃতির ডাকিনীর ভয়ে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ডাকিনীকে বিবাহ করার ভয়টি খুব হাস্যের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। নারকেলমুখী রূপী ভয়ানক রমণীকে বিবাহ করার ভীত-বিহ্বল ভাবটি গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই ভয় বিহ্বলতাকে লেখক কতকটা হাসির ছলে ব্যঙ্গ করেছেন। গড়গড়ি মহাশয় মৃত্যুকেও সহজে আপন করে নিতে পারে কিন্তু কদাকার ডাকিনীকে বিবাহ করতে সে কিছুতেই রাজি নয়। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন যত

বিদ্যা, বুদ্ধি তার জানা থাকে সবই প্রয়োগ করে। গড়গড়ি মহাশয়ও সবই প্রয়োগ করে, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন সে মুণ্ডদের আদেশ-ই পালন করতে লাগল, সে একের পর এক গল্প বলতে লাগল এবং গল্প শোনার পর মুণ্ডগুলি এক একটি রক্ত মুক্তা ধারণ করতে লাগল। গড়গড়ি মহাশয় যে গল্পগুলি মুণ্ডদেরকে বলেছিল, সেখানে নির্ভেজাল হাসি আছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

মায়ের গলার মুণ্ডমালাকে লক্ষ্য করে সুবল গড়গড়ি মহাশয় যে গল্পগুলি বলেছিল তার প্রথমটি হল 'আদুরী ও আরসী', গল্পের প্রথমেই আদুরীর দিদিমা যে অতি সাহসী মহিলা তার পরিচয় পাই। সে নিজের প্রাণের কথা চিন্তা না করে এক বিদেশী সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেছে। আমরা সব সময়ই নিজেরটা নিয়েই ভাবি লোকের কথা ভাবি না, বিপদের সময় তো মোটেই না। আমাদের লোকের বিপদে পিছিয়ে আসা, আমাদের ভীরুতা আদুরীর দিদিমার সাহসের কাছে হাসির আড়ালে ব্যঙ্গের উদ্রেক করে। এখানে লেখক আদুরীর দিদিমার সাহসের পাশাপাশি তার দুঃখকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহেব যখন আদুরীর দিদিমাকে তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য তার সাথে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে তখন আদুরীর দিদিমা বলে- "তোমার সহিত সহরে যাইলে, ডাক্তারের ঔষধ খাইলে, আমার জাতি যাইবে। আমি ঘরে লোহা পোড়াইয়া দিব, কলার ভিতর করিয়া সুলতান বনাত খাইব; তাহা করিলেই আমি ভাল হইয়া যাইব। আমি বৃদ্ধা বিধবা; আমাদের সহজে মৃত্যু হয় না।"[৫] আমাদের পল্লীজীবনের বৈধব্য জ্বালা ও অজ্ঞতা দুই-ই এখানে আছে। বিধবাদের প্রতি সর্বসাধারণের কঠিন বিধানকেই লেখক এখানে হাসির আড়ালে ব্যঙ্গ করেছেন।

সাহেব আদুরীর দিদিমার সাহসিকতার জন্য তাকে তার যে চামড়ার থলিটি দিয়েছিল, তাতে একশো টাকার নোট ও কয়েকটি টাকা ছিল। এই নোটখানি তাদের গরিবের সংসারে যে অবাক ও বিস্ময়ের সূচনা করেছিল তা রঙ্গ-ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ। লেখক নোটখানি ও আদুরীদের আচরণকে কেন্দ্র করে হাস্যরস সৃষ্টি করতে চাইলেও এখানে যেন দারিদ্র্যের প্রতি এক করুণ কটাক্ষ আছে। আদুরীর দিদিমা সেই নোটটাকে খুব সাবধানে যত্ন করে রেখেছিল। কিন্তু যাকে এত প্রয়োজনীয় বলে খুব যত্নে রাখা হল, তা যে কি করে একেবারে দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে রইল তা ভাবলে আমাদের হাসি পায় ।

আদুরীর দিদিমার অতি সাবধানতার জন্য একটা মূল্যবান জিনিস হাতের কাছে থেকেও আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। মানুষের এই অতি সাবধনতা দেখে তাই যেন লেখক দূরে দাঁড়িয়ে হাসেন। নোটখানির জন্য আদুরীর মা যখন আতিপাতি করে সবকিছু খুঁজে বেড়ায় ও কাঁদে তখন লেখক যেন ভাগ্যের এই পরিহাসে কোথাও ব্যঙ্গের ছোঁয়া লক্ষ করতে থাকেন। মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আর এক। মানুষের ভাবনা ও ভাগ্যের লুকোচুরি খেলা প্রতিনিয়তই চলেছে।

এই গল্পের পরবর্তী অংশেও হাসি-ব্যঙ্গের সুর লক্ষ করা যায়। আদুরী সাজতে গিয়ে তার দিদিমা কৈশোর, যৌবনকালের পরিপূর্ণতা যে আরসীতে দেখেছিল, তার মাও দেখেছিল, আজ আদুরীও তার মুখের ও মনের রূপখানি শেষবারের মতো নিখুঁত করে দেখতে গিয়ে সেটি ভেঙে ফেলে। এরপর আদুরীর ভাবনা, ভয়, স্বামীকে সন্দেহ করে ঘাটে বসে কান্না এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে গৃহে ফিরে আসা ইত্যাদিতে শুধুই হতাশা ছিল। কিন্তু মানুষের হতাশাগুলো সবসময়ই ব্যর্থ হয় না। আদুরী কি জানত তার এই দুঃখই সুখের কারণ হবে। তার হাত দিয়ে আরসী ভেঙেছে অতি সাবধানে রাখা নোটখানি প্রাপ্তির জন্যই। আমরা যে কার্যকে একান্ত অমঙ্গলের মনে করি তারই পরিণাম হয়তো নিহিত থাকে মঙ্গলের মধ্যেই। কিন্তু মানুষ তার পাওয়া না পাওয়া, সুখ-দুঃখ– দুটোতেই এত বেশি অধীর হয়ে পড়ে যে তা কিছুটা ব্যঙ্গের বলে মনে হয়।

মুণ্ডমালাদের কাছে কথিত গড়গড়ি মহাশয়ের দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'ভূতের বাড়ী'। গল্পটি একটি ভৌতিক বাড়িকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। টম সাহেব তার চাকর ও অতি-প্রিয় কুকুরটিকে সঙ্গে করে পোড়ো বাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে যে ভয়ঙ্কর ভৌতিক উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন তারই কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের এই গল্পটি কোনো ইংরাজি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। কারণ বেতালদের কাছে গল্প বলার সময় সুবল নিজেই বলেছে– "মহাশয়! গল্প আমি জানি। তবে দুই একখানি পুস্তকে ও সংবাদপত্রে গুটিকতক গল্প আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে গল্প কি আপনার ভাল লাগিবে?"[৬] এছাড়াও 'ভূতের বাড়ী' গল্পটির ভূমিকাতে বলা হয়েছে- "এবারে আমি আপনার নিকট এক ভূতের গল্প করিব এ বিলাতী ভূত, দেশীভূত নহে, এ ঘটনাটি বিলাতে ঘটিয়াছিল।"[৭] এর থেকে অনুমান করা যায় গল্পটিতে ইংরাজি গল্পের সংসর্গ থাকা বিচিত্র নয়।

গল্পটি টম সাহেবের মুখে বিবৃত হয়েছে। অনেক দুর্বল স্বভাবের মানুষ আছে যারা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গেলেই তারা যে কত দুর্বল তা ধরা পড়ে, আর তখনই তারা আমাদের হাস্যের খোরাক হয়ে ওঠে। টম সাহেবের চাকর চরিত্রটি এমনই এক হাস্যকর চরিত্র। এই বীরপুরুষ চাকরটি তার মালিককে উৎসাহিত করে বলে- "ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে? আমি ভূতের বাবা! দেখি, কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়। ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।"[৮] আবার অন্যত্র সে বলে- "ভয়! আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতা পুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই, আনন্দ হইবে, ভয়ের লেশ মাত্র মনে উদয় হইবে না।"[৯] অথচ গল্প কিছুটা অগ্রসর হলে দেখি যে তার, "চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে; মুখে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। 'মহাশয় পলায়ন করুন, মহাশয় পলায়ন করুন!' এ স্থানে আর তিলার্দ্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপরে, ধরিল রে মা রে!"[১০] গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে যখন

আমরা দেখি টম সাহেবের চাকরটি ভূতের ভয়েই ইংল্যান্ড ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে চলে যায়, তখন আমরা আর হাসি থামাতে পারিনা।

টম সাহেবের মনেও ভূতের বাড়িকে কেন্দ্র করে বেশ ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি ভয়ে যেন কেমন সংজ্ঞাহারা হয়ে যান। ভৌতিক পরিবেশ তার মনে একপ্রকার ভয়ের সঞ্চার করে। অনেক সময় আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, কিন্তু লোকলজ্জায় আমরা তা প্রকাশ করতে পারি না। টম সাহেবের চাকর যখন ইংল্যান্ড ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া পালাল তখন টম সাহেবেরও চাকরের সাথে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারেন নি। কারণ- "বন্ধু-বান্ধব সকলে হাসিবে বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি পড়িতে বসিলাম।"[১১] আমরা অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ভয় পেলেও সাহস দেখানোর জন্য ভয়কে উপেক্ষা করার চেষ্টা করি– এই ধরনের আচরণের প্রতি ব্যঙ্গ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য।

গড়গড়ি মহাশয় একে একে মুণ্ডমালাদের নিকট গল্প করতে লাগল। এক একটি গল্প শেষ হয় আর মুণ্ডমালাগুলি রক্ত-মুক্তা হয়ে যায়। এইভাবেই গড়গড়ি মহাশয় মুণ্ডমালার কাছে এগারোটি গল্প করে। মুণ্ডমালার কাছে কথিত গড়গড়ি মহাশয়ের তৃতীয় গল্পটি 'পুরাতন কূপ'। সিপাহী বিদ্রোহের সময় অরাজকতার জন্য চারিদিকে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল তারই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে গল্পটিতে। বাঙালিরা যেহেতু ইংরেজদের সহায়ক তাই সিপাহীরা ইংরেজদের সাথে সাথে বাঙালিদের উপরও অত্যাচার শুরু করে। এই গল্পের কাহিনি অংশে হাস্যরসের আভাস খুব একটা পাওয় যায় না। তবে সামগ্রিক গল্পে কোথাও যেন সামান্য একটু ব্যথাকে কাঁটার মতো ফুটে থাকতে লক্ষ করা যায়। লেখক সেই ব্যথাটুকু লক্ষ করেই পাঁড়েনীর মুখে বলিয়েছেন– "এই কথা শুনিয়া, আপনার পারিতোষিক লইয়া বিরস বদনে পাঁড়েনী চলিয়া গেল।"[১২] এখানে 'পারিতোষিক' শব্দটি অবশ্যই ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বিপদের সময় এক দিন যে লব-কুশিকে অত্যন্ত ভারী বোঝা মনে হয়েছিল, যাদের নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় লব- কুশিকে পাঁড়েনী তার সমস্ত আদর-যত্ন, মায়া-মমতা দিয়ে রক্ষা করেছিল, আজ প্রয়োজনের অবসানে তার ভালোবাসাটুকু অবহেলিত হল। এসবের ফলে পাঁড়েনীর মাতৃ হৃদয় কাঁদতে থাকে। একারণেই সে অপরিচিত বাবুদের কাছে তার অন্তরের চেয়ে প্রিয় লব-কুশির সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। কেমন করে বা কীভাবে যে বাবুগণ তার লব-কুশির সংবাদ দেবেন এ প্রশ্ন তার মনে আসে না, কেমন যেন অবুঝ আত্মার বিশ্বাস নিয়ে বলে- "কিন্তু বাবু! ছেলে দুইটির জন্য এখনও আমার প্রাণ কাঁদে। সেই পর্যন্ত লব-কুশির আমি কোন সংবাদ পাই নাই। তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে বলিতে পারেন?"[১৩] পাঁড়েনীর মতো স্নেহপরায়ণাদের এই কান্নাকে গোবিন্দবাবুর মতো প্রাণহীন-হৃদয়হীন মানুষেরা বুঝতে চায় না।

পরের উপকার করা মহৎ কাজ। এটা জেনে শুনেও কখনও পরের উপকার করতে আমরা এগিয়ে আসি না বরং অবহেলাই করি। ‘শম্ভু ঘোষের কন্যা’ গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ যেন একথাই ব্যঙ্গচ্ছলে বলতে চেয়েছেন যে, আমরা যেন একটু পরোপকারী হই। এই পরের উপকারের সুফল কখনও কখনও লোকের উপর না গিয়ে নিজের উপরেও আসতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ গল্পটির অন্যতম প্রধান চরিত্র শম্ভু ঘোষ। অনেকেই আমরা হয়তো পরের উপকার করতে যাই, কিন্তু সেটা নিঃস্বার্থভাবে নয় কখনও নিজেদের শক্তি ও সাহস প্রকাশ করতে, কখনও নিজেদের অহংকার ও পিতৃনামকে বজায় রাখতে। এই গল্পটিতে শম্ভু ঘোষও ক্রন্দনরত শিশুকে বাঁচাতে গিয়েছিল তার সাহস ও পিতৃনামকে অটুট রাখতে। সে মনে মনে চিন্তা করল- “সত্য সত্যই যদি কোন ছেলে এই মাঠের মধ্যে, এই রাত্রিকালে, এই দুর্যোগে, এই শীতে, একা পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে শম্ভু ঘোষ, তুমি কি বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ? তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই? তুমি না যাদব ঘোষের বেটা? ছি। শম্ভু ঘোষ! তোমার এরূপ করা উচিত নয়।”[১৪] এরকম চিন্তাভাবনা করেই শম্ভু ঘোষ মাঠের মাঝখান থেকে একটি শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। যদিও শম্ভু ঘোষ তখন জানত না যে সেটা তারই মেয়ে হরিদাসী। শম্ভু ঘোষের নিজের মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে এবং কোলে করেও চিনতে না পারার ব্যাপারটি বোধ হয় বাস্তব সঙ্গত হয়নি। এখানে কাহিনির উপস্থানা পদ্ধতিতে ত্রৈলোক্যনাথের একটু ত্রুটি থেকে গেছে। যাই হোক এই সময় শম্ভু ঘোষ পরের উপকারের আনন্দেই মেতে ওঠে। শম্ভু ঘোষের পরের উপকারের ইচ্ছা ছিল বলেই নিজের অজান্তেই বিপদে পড়া নিজের মেয়েকেই উদ্ধর করেছে। পরের উপকারের ইচ্ছা যদি তার মধ্যে না থাকত তাহলে তার জীবনের চরমতম সর্বনাশ ঘটে যেত। এটা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে জীবের প্রতি দয়া-মায়া ছিল বলেই- “যে জীবে দয়া করে, ভগবান তাহার প্রতি কৃপা করেন।”[১৫] সে যদি চিৎকার শুনে অগ্রাহ্য করে চলে আসত তাহলে তার প্রাণ প্রিয় মেয়ে হরিদাসীকে আর ফিরে পেত না। দুর্যোগের মধ্যে চিৎকার শুনে শম্ভু ঘোষের নানারকম ভয়ও হয়েছিল বটে কিন্তু সে ভয় স্থায়ী হয়নি, পরক্ষণে সে বিবেকের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে গিয়েছিল বলেই ভগবান তার প্রতি কৃপা করেছেন।

শম্ভু ঘোষের এতবড় ক্ষতি হতে গিয়েও হল না তার পরোপকার করার ক্ষীণ ইচ্ছা থাকার জন্য। এই গল্পের কাহিনিটি যাতে মানুষের মনে একটু দয়ামায়ার উদ্রেক করে তাই-ই লেখকের আশা। আমরা সব সময় নিজের স্বার্থটুকু নিয়েই যেন মেতে না উঠি এই ধারণার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করাই যেন লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে।

‘ললিত ও লাবণ্য’– ‘মুক্তা-মালা’র একটি করুণ কাহিনি মূলক ছোটগল্প। গল্পটিতে অসহায় মা তার শিশু-পুত্রকে নিয়ে আত্মহত্যা করে কীভাবে সংসারের জ্বালা

থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে তারই করুণ চিত্র অঙ্কণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলার প্রতিটি ঘরের দায়িত্বহীন পিতার উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ব্যবহারের প্রতি গল্পটিতে কটাক্ষ করেছেন লেখক।

ললিত-লাবণ্যর পিতা যা কিছু সম্পত্তি ছিল সবই মদ খেয়ে ও অসৎ উপায়ে উড়িয়ে দেয়, ফলে তাদের সংসারে সর্বদা অভাব লেগেই থাকে। ললিতের মা সবকিছুই নীরবে সহ্য করে। ললিতের কাকা তাদের সংসার চালানোর জন্য যে টাকা পাঠায় তাও ললিতের বাবা গোপনে খরচ করে। ললিতের বাবার সাথে তার কাকার একবার ঝগড়াও হয়। ললিতের কাকা রাগ করলেও, ঝগড়ার পরেও নিয়মিত প্রতিমাসেই টাকা পাঠায় অথচ ললিতের বাবা টাকা পাঠায়নি বলে তা খরচ করে ফেলে। এমনকি ললিতের প্রাইজের বই, লাবণ্যের হাতের বালার বিনিময়েও মদ খেতে তার বাধে না। পরবর্তী পর্যায়ে ললিতের বাবা নিজের ভুল বুঝতে পারে ও অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে শোধরাবার কোনো পথ না দেখে স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে মারা যায়। ললিতের বাবার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে লেখক এই শ্রেণির মানুষের প্রতি কটাক্ষ তো করেছেনই সাথে সাথে এরকম অশুভ চিন্তাধারী মানুষের পরিণতি কি হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ললিতের মা বাড়িওয়ালার বারবার তাগাদায় ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কোনোরকম উপায় না দেখে ললিতের মা তার পিতার জ্ঞাতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। ব্রাহ্মণ সাহায্যের পরিবর্তে জানিয়েছে- “তোমাদের এখন অশৌচ অবস্থা। আমার ঘর-দ্বার অধিক নাই। আমাকে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, পূজা-অর্চ্চনা করিতে হয়, শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, তাহার উপর আমার স্ত্রীর শুচিবাই। তোমার ছেলে পিলে আমার পূজার দ্রব্যাদি ছুঁইয়া ফেলিবে। আমার এখানে বাছা, স্থান হইবে না।”[১৬] এই অজুহাতে ব্রাহ্মণ তাদেরকে আশ্রয় না দিয়ে বিদেয় করেছে। এই শ্রেণির ব্রাহ্মণের কাছে মানুষ অপেক্ষা মূল্যহীন ধর্মীয় আচরণটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। লেখক এদেরকেই এখানে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। যে ধর্মের কাছে মানুষের কাতরতা, ব্যথা, ভিক্ষার কোনো স্থান নেই, যা মানুষকে নির্মম, নিষ্ঠুর, অমানবিক করে তোলে তাকে ধর্ম না বলে ধর্মের নামে ভণ্ডামি বলাই শ্রেয়। আশ্রয়ের অভাবে ললিত-লাবণ্য ও তার মায়ের মতো অসংখ্য মানুষ মারা যায়, যার হিসাব এই সুন্দর পৃথিবী কোনো মতেই রাখে না। যে যার নিজের মতলবে ডুবে থাকে। মানুষের এই নির্দয় আচরণে লেখক দুঃখ পান, ব্যঙ্গ না করে পারেন না।

‘মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প’ গল্পটি একটি হাস্যরসাত্মক গল্প। গল্পটি যে একটু অদ্ভুত ধরনের তার আভাসও লেখক গল্পটির সূচনা অংশে স্বীকার করেছেন। তিনু-বাবুর মুখ দিয়ে- “একে তো পাষণ্ডগণ আমাকে গ্যাঁজাখোর বলে। তাহার উপর গল্পগুলি কিছু অদ্ভুত। পাছে আপনারা বিশ্বাস না করেন সেই ভয়।”[১৭] গল্পটিতে একই

সাথে রঙ্গ-ব্যঙ্গের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তিনুবাবু গল্পের আসরে সাপকে নিয়ে যে মোট পাঁচটি গল্প বলেছেন সেখানে নিছক নিছক হাসি বা রঙ্গ রসের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম গল্পে একটি কৃষ্ণসর্প তিনুর মেয়েকে গলায় জড়িয়ে জল থেকে ডাঙায় তুলে জলে ডোবা থেকে রক্ষা করে এবং সেই সাপটিই রোজ তিনুর বাড়িতে এসে তার মেয়ের সাথে 'কুড় কুড় কুড় কুড়' করে মুড়ি খায়। দ্বিতীয় গল্পটিতে তিনুর আটমাসের এক শিশু ছেলের কান্না বন্ধ করতে চন্দ্রবোড়া সাপ তার লেজটি শিশুর হাতে পুরে দেয় এবং শিশু সেই সাপের লেজ হাতে পেয়ে মায়ের স্তন মনে করে সন্তোষের সহিত চুষতে থাকে। একবার ওই সাপটি অসুস্থ হলে অন্য একটি সাপকে 'এক্‌টিনী' করতে পাঠায়। তৃতীয় গল্পটিতে দেখি গরু বাধার জন্য তিনুর দড়ি কিনতে হয় না দাঁড়াশ সাপ নিজেই দড়ির কাজ করে দেয়। চতুর্থ গল্পে তিনুর মেয়ের মাথার চুল বাঁধার জন্য যে ফিতের প্রয়োজন হয় তার চাহিদা মেটানোর জন্য লাউডগা সাপ তার মেয়ের মাথার ফিতের কাজ করে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ গল্পে দেখি শঙ্খচূড় সাপ ছেলের অঙ্ক করে দেয় এবং তিনুর বাড়ির হিসাব রাখে। মাঝেমাঝে তিনু শঙ্খচূর সাপকে জমিদারি সেরস্তায় হিসেবপত্র দেখার জন্য ভাড়া দিয়ে রোজগারও করে। এসমস্ত গল্প পড়ে স্বাভাবিকভাবেই আমরা হেসে উঠি। আবার প্রতিটি গল্প বলার পর তিনু তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সবাইকে (গল্পের শ্রোতাগণকে) তার বাড়ি যাওয়ার কথা বলে। তার বাড়ি যে অতি নিকটে সে সম্বন্ধে তিনু বলে "অতি নিকটে। একদিন রেলে যাইতে হয়; তাহার পর দুই দিন জাহাজে যাইতে হয়; তাহার পর, তিন দিন হাঁটিয়া যাইতে হয়"[১৮] এখানেও ত্রৈলোক্যনাথ মজা করতে ছাড়েন নি।

আপাত দৃষ্টিতে গল্পটিতে কোনো ব্যঙ্গ নেই মনে হতে পারে কিন্তু ব্যঙ্গ শিল্পী কি শুধু শুধুই একটা অর্থহীন কাহিনি আমাদের কাছে নিবেদন করলেন এরকম প্রশ্নও আমাদের মনে আসে। গল্পের নামকরণটিই যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক অর্থাৎ 'মূল্যবান' ও 'জ্ঞানবান' দুটি শব্দই ব্যঙ্গপূর্ণ। এখানে লেখকের উদ্দেশ্য যারা আজগুবি গল্প বলে ও যারা সেই আজগুবি গল্প শোনে উভয়কেই ব্যঙ্গ করা। তিনু বাবুর মতো লোক নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করে। এদের বুদ্ধি আছে কিন্তু সে বুদ্ধি সত্য কাজে ব্যয়িত হয় না, ব্যয়িত হয় মিথ্যা কাজে। এরা লোকের ভালো তো করেই না, বরং মন্দ করে, ঠকায়।

এক শ্রেণির লোক আছে যারা তিনুবাবুর মতো মন্দ লোকেদের সহজেই চেনে, তবু তারা বিশ্বাস করে। আড্ডাধারী মশায়ও অতি চতুর ব্যক্তি। তিনি সবই প্রায় বুঝতে পারেন। আড্ডাধারী মশায় তিনু-বাবুর উপর দিয়ে চলেন, তিনি বলেন, "আমি একখানি নভেল লিখিব মনে করিয়াছি। ভূতের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি; বাঘের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সাপের গল্প পাইলেই আমার পুস্তকখানি পূর্ণ হয়। কেহ যদি ভালো ভালো, অথচ সম্পূর্ণ সত্য, সাপের গল্প জান তো বল দেখি, শুনি ভাই।"[১৯] এখানে ত্রৈলোক্যনাথ

আমাদের বাংলার নভেল লেখক ও নভেল পাঠক উভয়কেই কটাক্ষ করতে চেয়েছেন। যা হোক একটা কিছু লিখলেই হল। মিথ্যা করে হোক, আর চুরি করেই হোক। পাঠক তাই-ই গ্রহণ করবে।

'মুক্তা-মালা'র অন্তর্গত 'সেকালের মোহর' গল্পটি গিরিশ নামক যুবকের জীবন-বিপর্যয়ের করুণ কাহিনি। এরকম করুণ কাহিনি থাকলেও গিরিশ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা থাকার পরও ক্ষমা করার মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা যেন ঈশ্বর বিমুখ না হই, আমরা যেন সত্যভ্রষ্ট না হই, এটাই যেন লেখকের একমাত্র কামনা-বাসনা। গিরিশ নিরপরাধ। সে কখনও জীবনে অন্যায় কাজ করেনি। শত কষ্টের পর যখন তার সাংসারিক জীবনে সুখ এল তখন গোপী বাবুর অভিযোগে সে সুখ যেন উধাও হয়ে গেল। তার জীবনের চরম আনন্দের মুহূর্তে এক কঠিনতম শাস্তির বোঝা বহন করে চলতে হল। অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল তাকে। মরার সময় সংসারের জন্য, স্ত্রী-কন্যার জন্য গিরিশের মনে কোথাও যেন চাপা কান্না থেকে গেছে, আবার তাদের সুখের জন্যই সে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে। চেষ্টা করলে হয়তো আরো কিছু দিন বাঁচত সে, তবুও সংসারের দিকে তাকিয়ে জীবনের সাথে চিরতরে আড়ি পাতিয়ে নিয়েছে গিরিশ।

গোপী ধর্মবুদ্ধি শূন্য, অবিশ্বাসী, স্বার্থপর মানুষ। তার হীন-মানসিকতাই তাকে গিরিশ বিমুখ করে তুলেছে। গোপী অন্যায় দোষারোপে নিরীহ গিরিশকে চোর বলে ঘোষণা করেছে, তাকে দেহ মনে জর্জরিত করেছে। গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে গিরিশকে গোপী বাবুই মৃত্যুমুখী করে তুলেছে। কারণ অত্যাধিক পরিশ্রমের পাশাপাশি গোপী বাবুর চাকরদের হাতে মার খাওয়ার পর থেকে গিরিশের বুকে এক প্রকার যন্ত্রণা হয়। আর সেই বুকের যন্ত্রণা থেকেই গিরিশের যক্ষ্মা হয়। সুতরাং গিরিশের অকাল মৃত্যুতে গোপী বাবুর অমানবিক নিপীড়নই দায়ী। এই অন্যায়ের জন্য অবশ্য গোপী বাবুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। গোপী বাবু যে মোহরের জন্য গিরিশকে দায়ী করেছিল, তাকে অপমান করেছিল, সেই মোহরই যখন অনেকদিন পরে চটের মধ্যে থেকে পাওয়া গেল তখন গোপী নিজের ভুল বুঝতে পারে। এই ভুলের জন্য গোপী বাবুর অনুশোচনারও শেষ থাকে না। তাইতো গোপী বাবু তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয় নিয়ে ছুটে এসেছে গিরিশের কাছে আর আকুলভাবে বলেছে – "গিরিশ, আমি অতি পাপিষ্ঠ; আমি অতি নরাধাম। বিনা দোষে আমি তোমার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। তোমার এ রোগের কারণ আমি। ক্ষমার পাত্র আমি নই বটে, কিন্তু তোমার হাত ধরিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"[২০] এসব কথা বলার পর আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে গোপী বাবুর পাপার্ত হৃদয় আজ অনুতাপে দগ্ধ, আর সেই জ্বালাই তাকে গিরিশের কাছে টেনে এনেছে। এখন হৃদয়ের দিক দিয়ে গিরিশ হল রাজা আর গোপী বাবু হল ভিখারি। গোপী বাবুর এরকম পরিণতির মধ্যে দিয়ে লেখক যেন এরকম

নির্বোধ, নিষ্ঠুর, আত্মঅহঙ্কারী ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করেছেন। তাইতো গিরিশের জয় গোপী বাবুর মতো মানুষের পরাজয়কে গোপনে ব্যঙ্গ করে।

'ভয়ানক আংটী' গল্পটি আরব্য উপন্যাসের আদর্শে রচিত প্রণয়ের উপাখ্যান। যদিও গল্পটিতে অলৌকিকতার আশ্রয় আছে, তবুও সত্যও যে এখানে একেবারে নেই তা বলা চলে না। বরং বলা ভালো সত্য ও অলৌকিকতার আশ্রয়ে গল্পটি আমাদের কাছে যেন এক পরম বিস্ময়রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। গল্পটির সমগ্র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে সন্ন্যাসী প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন একটি আংটিকে কেন্দ্র করে। গল্পটিতে লেখক আংটি বীরের ভয়ঙ্কর প্রভাব, আরসীতে নানা দৃশ্যের নানান গতিবিধি, কামনা-বাসনার সত্যরূপকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। গল্পটি যে একটি প্রেম বিষয়ক ব্যঙ্গরচনা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কম বয়সী তরুণ-তরুণীর মধ্যে আমরা যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা লক্ষ করি তারই এক বিকৃত প্রকাশ যেন পাই হারাধন ও বিমলার প্রেম কাহিনির মধ্যে। উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক হারাধন, সে আরব্য উপন্যাসের কাহিনি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রে সে যে স্বয়ম্বর সভার স্বপ্ন দেখবে এবং এক সুন্দরী কন্যার মুখচ্ছবি যে তার মানসপটে সুচিহ্নিত হয়ে যাবে সে বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গল্পটিতে স্বয়ম্বর সভার যে চিত্র অঙ্কিত তা খুব হাস্যজনক- "কন্যা অন্য কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, হারাধনের নিকটে আসিয়া, তাঁহারই গলায় মাল্য প্রদান করিল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ন্যায় রাজগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া তাঁহারা হারাধনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। হারাধন যুদ্ধ করিলেন না, তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মুষল মুখবিশিষ্ট কদাকার এক রাজা আসিয়া সবলে তাঁহার কান মলিয়া দিল। সেই কানমলার চোটে হারাধনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।"[২১] অংশটিতে কানমলার প্রসঙ্গ বেশ হাসির। এখানে দুর্বল-ভীরু প্রেমের এক হাস্যকর চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। হারাধনের মধ্য দিয়ে এখানে বাঙালির সাহসহীনতা, দুর্বলতার প্রতিও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হারাধনের কল্পিত নারী তাকে তিন বছর ধরে যেমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে তা যেমন অবাস্তব তেমনি হাস্যকর। ঘটনাক্রমে বিমলাকে চলন্ত গাড়ি থেকে রক্ষা করা, কন্যার হাতের সন্ন্যাসী প্রদত্ত আংটি হারাধনের হাতে এসে যাওয়া এবং হারাধনের যে যাতনার সূচনা- সমগ্র বিষয়টিতে লেখক যেন ব্যঙ্গের সুর রেখেছেন। যে নারীর জন্য হারাধন এতদিন পাগল ছিল, তারই আংটি হারাধনের হাতে আসায় হারাধনের অসুখ আরও শতগুণ বেড়ে গেল, এটা বেশ ব্যঙ্গকর। আসলে আমরা অনেক সময় অধরাকে ধরতে চাই এবং তার ফলস্বরূপ অনেক যন্ত্রণাও পাই। যাকে সুখ বলে ভাবি তা আসলে সুখ নয় দুঃখ।

গল্পটির শেষে লেখক বিমলার সাথে হারাধনের শুভকার্য সম্পন্ন করিয়েছেন, পাশাপাশি জ্ঞানপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণকে কটাক্ষ করেছেন।

হারাধনকে দেখে চিকিৎসক তাকে মৃত বলেন, যদিও তাকে মৃত বলার পরও তার শরীরে জীবিত শরীরের মতো উত্তাপ ছিল। অবশ্য ডাক্তার বললেন, "কোন কোন মৃতদেহে এরূপ উত্তাপ থাকে।"[২২] একথা বলে ডাক্তার ভিজিট নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় হারাধন জীবিত। সুতরাং এ ধরনের ডাক্তার বা চিকিৎসক নিন্দারই যোগ্য।

'মুক্ত-মালা'র অন্তর্গত 'কেন এত নির্দয় হলে' গল্পটি একটি ভৌতিক গল্প। গল্পটিতে ভৌতিক কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে একটি রহস্য করুণ প্রণয়ের ঘটনাও আছে। একটি গানের কলির মধ্য দিয়েই এই গল্পের মূল সুরটি প্রকাশিত, সেজন্য সমস্ত গল্পটিতে নামকরণ সহ গানের কলিটি বারবার যেন ঘুরে ঘুরে, আর্তনাদ করে বেড়িয়েছে। এখানে লেখকের মনে এক প্রশ্ন জেগেছে, মানুষ কেন এত নির্দয়? নবীন তার পরমা রূপবতী পত্নীকে যেভাবে খুন করেছিল তাতে আমাদের তাই-ই মনে হয়। নবীনের চরিত্রে কোনো ভালোগুণ নেই তাইতো সে শালীকে বিবাহ করতে চেয়েছে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন এ জাতীয় লোকেদের বাঁচার কোনো অধিকার নেই তাই তো নবীনের দুষ্কর্মই তাকে তাড়া করে নিয়ে খুন করেছিল তাতে আমাদের তাই-ই মনে হয়। নবীনের চরিত্রে কোনো ভালোগুণ নেই তাইতো সে শালীকে বিবাহ করতে চেয়েছে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন এ জাতীয় লোকেদের বাঁচার কোনো অধিকার নেই তাইতো নবীনের দুষ্কর্মই তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে অসহায়ভাবে মেরে ফেলে। এরকম দুষ্ট লোকের যেমন বাঁচার অধিকার নেই তেমনি যে অতিরিক্ত সৎ, ভালো তারও বাঁচার উপায় নেই। কারণ জগতে যে কোনো চরমের জায়গা খুব অল্প । গল্পটিতে অতি সৎ ও মহৎ হল বাগানের মালী চরিত্রটি। তার মহৎ হৃদয় মা-লক্ষ্মীর মৃত্যুকালের প্রার্থনাকে ভুলতে পারে না। তার হৃদয় এক সময়ে দ্বিধান্বিত হয়ে যায়। তাইতো নবীনকে পুলের থেকে জলে পড়ে যেতে দেখেও সে চুপ থাকে। নবীন যখন বলে– "জগু! আমি সাঁতার জানি না। আমার প্রাণরক্ষা কর। তোরে অনেক টাকা দিব।"[২৩] কিন্তু অনেক সময় টাকা দিয়েও জগতের অনেক জিনিস কেনা যায় না। এরকম কঠোর সত্য নবীনের মতো পিশাচ মানুষ বোঝে না। তারা টাকা দিয়েই সবকিছু কিনতে চায়। লেখক এরকম মানুষকেই এখানে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। নবীনের মতো চরিত্রের পাশাপাশি লেখক মালীর মতো আদর্শবান চরিত্রগুলোকে ব্যঙ্গ করেছেন, কারণ যে মালী এতদিন পর্যন্ত নবীনকে মারার জন্য প্রস্তুত ছিল আজ হঠাৎ পূর্বের এক প্রতিজ্ঞার জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেই নবীনকেই জলে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচাতে গেল, পরিণতি হল তার মৃত্যু, আসলে মালীর অতি সাধুতাই তার মৃত্যুর কারণ হল।

অপর দিকে পৃথিবীর স্বভাবে নটবরের চরিত্র গঠিত। সে খুব ভালোও নয় আবার খুব মন্দও নয়। সে সাধারণ মানুষ। সেজন্য যে কোনো অবস্থাতেই সে অধীর হয় না। যদিও সে যে কখনও অসম্ভব কথা বলে না এমনটি নয়– "নটবর মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিলেন যে, যদি ইহাকে পাই, তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব, না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন দিব।[২৪] এ ধরনের বীরত্বসূচক প্রতিজ্ঞায় বেশ অসঙ্গতি আছে। সে যাই হোক না কেন নটবরই এই পৃথিবীর যোগ্য লোক। তাই নবীনের মতো সে পাপে লিপ্ত হয় না আবার মালীর মতো অতি সাধুতার পরিচয়ও দেয় না। তাইতো অবশেষে তার জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসে। সে মনের মতো পত্নীও লাভ করে। যদিও পত্নী পছন্দমতো পাওয়ার জন্য সে তার নিজস্ব ক্রিয়া-কলাপের পরিবর্তে ভূতের কৃপাকেই মেনে নিয়েছে।

গড়গড়ি মহাশয় মুণ্ডমালাদের কাছে যে গল্পগুলি করেছে তার মধ্যে দশম গল্পটি হল 'বেতাল ষড়বিংশতি'। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঘর নিয়ে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ যেহেতু নতুন আরেকটি বেতালের গল্প বলেছেন তাই গল্পটির নাম দিয়েছেন 'বেতাল ষড়বিংশতি'। গল্পটিতে ত্রৈলোক্যনাথ গৌরীশঙ্করের ধনবান হওয়ার স্বপ্নকে ব্যঙ্গ করেছেন। সে শব সাধনা করে ধনবান হতে চায় কিন্তু সে বেতালের কোপে পড়ে পাগল হয়েছে। কথা বলার শক্তি হারিয়ে শুধু 'থী-বী-সু-দে' ছাড়া অন্যকিছু বলতে পারে না। তার এই অসহয়তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছে একজন প্রকৃত সাধক। তাই ভ্রষ্ট সাধক গৌরীশঙ্করের সাথে এই মহাপুরুষের পার্থক্য বলে প্রকৃত সাধকের গুণগান গেয়েছেন লেখক।

ধনবান হওয়ার বাসনা মানুষ মাত্রই থাকে, কেউ প্রতারণা করে ধনবান হয়, কেউ কষ্ট করে আবার কেউ দৈব উপায়ে ধনবান হয়। গৌরীশঙ্কর দৈব পথ বেছে নিয়ে শব সাধনায় মত্ত হয়েছে। শব সাধনায় গুরুর দরকার হয় কিন্তু গৌরীশঙ্কর কখনও মনে গুরুর স্থান দেয়নি। সে সাধনার আগেই যেভাবে ভবিষ্যতে সুখের কল্পনা করেছে তা বেশ কৌতুককর। অর্থলাভের পর সে কি রকম জমিদারি কিনবে, কীভাবে মহারাজা খেতাব জোগাড় করবে তারপর সুন্দরী দেখে বিয়ে করবে গৌরীশঙ্করের এ সমস্ত কল্পনার কথা মনে করে আমাদের মনে নিছক হাসি জাগ্রত হয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভের আগেই তার এই সকল বাসনা আমাদেরকে হাসতে বাধ্য করে। গৌরীশঙ্কর সাধনার সময় বিভীষিকা দেখে বিচলিত হয়নি অবশ্য ছলনাময়ী সুন্দরী রমণী দেখে বিচলিত হয়েছে। সুন্দরী নারী দেখে অনেকেই বিচলিত হয়, গৌরীশঙ্করও বিচলিত হয়েছে, লেখক এই বিচলিত হওয়াকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

গৌরীশঙ্করের সাধনা বিঘ্নিত হয়েছে থিয়েটারী বীর দেখে। লেখক কলা-কৌশলহীন চিৎকার সর্বস্ব থিয়েটারের অভিনেতাদের এই প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করেছেন। তাদের গলাবাজি এত পীড়াদায়ক যে সাধককেও পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। গৌরীশঙ্কর শ্মশানে সিংহ, বাঘ, ভূত, ডাকিনী ইত্যাদির বিভীষিকা সহ্য করেছে, এমনকি সুন্দরী নারীর মোহও অনেক কষ্টে কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিয়েটারী বীরের জন্য ধ্যান নষ্ট করে পালিয়েছে। সাধনায় অসিদ্ধ হওয়ায় গৌরীশঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গৌরীর মা তাকে সুস্থ করার জন্য অনেক রোজাকে দেখিয়েছেন। অবশ্য এই সকল ভণ্ড

রোজাগণ প্রকৃত গুণের অধিকারী না হওয়ার পরও নিজেদের সম্পর্কে গর্ববোধ করে। আবার যিনি প্রকৃত গুণের অধিকারী, যিনি গুণীলোক তিনি সামান্য লোকের মতোই ব্যবহার করেন, তাকে চেনাও যায় না। গৌরীশঙ্করকে যিনি সুস্থ করেছেন তিনি নিজের খ্যাতি-প্রশংসা কিছুই চান না। আসলে প্রকৃত সাধক চিরকালই নিরহঙ্কার। গৌরীশঙ্কর অহঙ্কার করে সাধক হতে চেয়েছিল বলেই বিপদে পড়েছে। সে মনে করেছে- "একটা মড়ার উপর বসিয়া, কিছুক্ষণ জপ করা বই তো নয়! কেনই বা তা না পারিব?"[২৫] এরকম অহঙ্কারের জন্যই বেতাল তাকে শাস্তি দিয়েছে। এসবের মধ্যে দিয়ে লেখক গৌরীশঙ্করের সাথে সাথে তার মতো লোকেদের অহঙ্কার ও কার্যকলাপকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

মুণ্ডমালাদের কাছে কথিত গড়গড়ি মহাশয়ের শেষ গল্পটি হল 'মদন ঘোষের বদনে হাসি' গল্পটিতে জীবনের নানারকম অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়, যা হাস্যরসের কারণ হয়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক মদন সব সময় ভাবে- "আমি রূপবান, আমি গুণবান, আমি বুদ্ধিমান, আমি সাহসী পুরুষ।"[২৬] তার এই অভিমান বাস্তবের আঘাতে অসার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মদনের নানান অসঙ্গতিপূর্ণ যে সব চিন্তা ভাবনা গল্পটিতে প্রকাশিত তা ব্যঙ্গের। পরে অবশ্য মদনের স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে, সে যখন নির্দোষ মিহিরের দুঃখ, বেচুর আত্মগ্লানি ইত্যাদি বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তখন সে কল্পনার জগৎ পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করেছে।

মদন চরিত্রের দুটো পর্যায় লক্ষ করা যায়, প্রথম পর্যায়ে সে অতি মাত্রায় ভাবপ্রবণ, রাধারাণীর নাম শোনামাত্রই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তাকে ঘিরে নানা রকম কল্পনা করেছে। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দোষের অসহ্য দুঃখ, পাপীর আত্মগ্লানি ইত্যাদি বাস্তব ঘটনা দেখে কল্পনার আকাশ থেকে মর্ত্যের কঠিন মাটিতে নেমে এসেছে। মদনের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদেরই মিথ্যা অহংকারের অনেক ছবি তুলে ধরে ব্যঙ্গ করেছেন। মদন যেভাবে নিজের রূপচর্চা করে তা বেশ কৌতুককর- "প্রতিদিন আমি সাবান মাখিয়া স্নান করি। এখন আর আমার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নাই। নানারূপ সুগন্ধযুক্ত তৈলে সিক্ত করিয়া, চুলগুলি ফিরাইতে প্রতিদিন আমি আধঘণ্টাকাল অতিবাহিত করি।"[২৭] এরকম সভ্য-ভব্য সুন্দর হওয়ার কৌতুককর চিত্র আমরা পেয়েছিলাম ত্রৈলোক্যনাথেরই 'লুল্লু' গল্পে লুল্লুর সভ্য হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে- "দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। বরং অনেক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না।"[২৮]

গল্প মধ্যে রাধারানীকে দেখেই মদন প্রেমে পড়ে গেছে, এ ঘটনাটি ত্রৈলোক্যনাথের কাছে বিদ্রূপের বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি যেন মদনের প্রেমের মধ্য দিয়ে বাঙালি তরুণ সম্প্রদায়ের কল্পনা বিলাস নির্ভর প্রেমকে বিদ্রুপ করেছেন। রাধারানীকে দেখেই মদনের মুণ্ড ঘুরে গেল এবং প্রথমে তার শাকের ঘন্ট না খেয়ে

অম্বলের বড়ি খাওয়া, মিহিরকে রাক্ষস ভেবে অজ্ঞান হওয়া, এরকম অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে। গল্পটির আরম্ভ হাস্যরসে হলেও এর মধ্যে করুণ রসও জড়িয়ে আছে। জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতির চিত্র এখানে লক্ষ করা যায়, যে অসঙ্গতি গুলোকে আমরা বুঝি না সেই অসঙ্গতিগুলোকেই লেখক এখানে দেখিয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প গ্রন্থ 'মুক্তা-মালা'-র সব গল্পগুলোই পাঠাককে হাসিতে মজিয়ে রাখে। এই গল্পে একদিকে যেমন সমাজ বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষের প্রতি বিদ্রূপ আছে, তেমনি গল্পগুলিতে তিনি সংশোধনের উপায়ও বলে দিয়েছেন। একদিকে তিনি যেমন হাস্যরস আশ্রয় করে শোষক শ্রেণিকে বিদ্রূপ করেছেন তেমনি শোষিত শ্রেণির প্রতি করুণভাবও প্রকাশ করতে ভোলেননি। এখানেই তিনি আলাদা, এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী। অসহায়-বিপদে পড়া মানুষের প্রতি তাঁর সমর্থন একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তাঁর গল্পে একাধারে হাসি-বিদ্রূপ উভয়ই বর্তমান। এসবকে অতিক্রম করে তিনি অনেক বেশি অসহায় মানুষের খাতিরে মমতাবোধের শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সম্ভবত প্রথম হাস্যরসকে মমতাবোধের মোড়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। আর সেকারণেই তিনি আলাদা সারির লেখক।

তথ্যসূত্র :

১। সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, কামিনী প্রকাশনায়, পৃ. ৬৭০

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৯

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬

৯। মীরা অধিকারী, পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরচনা, প্রথম সংস্করণ ১৩ আশ্বিন ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০, সাহিত্য প্রকাশ (পরিবেশক), পৃ. ১৫৬

১০। সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, কামিনী প্রকাশনায়, পৃ. ৭০৯

১১। মীরা অধিকারী, পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরচনা, প্রথম সংস্করণ ১৩ আশ্বিন ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০, সাহিত্য প্রকাশ (পরিবেশক), পৃ. ১৫৬

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

১৩। সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, কামিনী প্রকাশনায়, পৃ. ৭২০

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৩

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৮

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩১

১৮। দেবনারায়ণ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৯০

১৯। সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, কামিনী প্রকাশনায়, পৃ. ৭৩১

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৮

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৩

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৪

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৬

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩২

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৩

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অংশুমান চক্রবর্তী, বঙ্গ মনীষীদের রঙ্গ-রসিকতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, বইমেলা ২০১১, আনন্দ প্রকাশন।

২। দেব নারায়ন রায়, ত্রৈলোক্যনাথ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি।

৩। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ: কথাসাহিত্য ভাবনা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা মাঘ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০৫, রত্নাবলী।

৪। মীরা অধিকারী, পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ রচনা, প্রথম সংস্করণ ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০), সাহিত্য প্রকাশ (পরিবেশক)।

৫। সান্ত্বনা চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ-স্বর্ণকুমারী-প্রভাতকুমারের গল্প, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পুস্তক বিপণি।

৬। সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১, কামিনী প্রকাশালয়।

৭। ক্ষেত্রগুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ত্রৈলক্যনাথের শ্রেষ্ঠ কাহিনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পুঁথি প্রকাশনা।

অরুণ মিত্রের কবিতার ভাষা

সৌরভ চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : শিল্প মাত্রই সময়ের ফসল। আর স্রষ্টাকে নির্মাণ করে তাঁর যে ব্যক্তিগত পরিবেশ, সমাজ পরিমণ্ডল তাও কখনও সময় নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই স্রষ্টার জীবনপ্রবাহের ঘটনাক্রমের উপর নির্ভর করেই তাঁর সৃষ্টির প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নির্মিত হয়।

আমরা এখানে অরুণ মিত্রের কবিতার ভাষা নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখব সময় এবং প্রতিবেশের প্রভাবের দ্বারা তাঁর কবিতার ভাষা কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে। শুধু শব্দ নির্বাচনে অভিনবত্ব নয়, তাঁর কবিতায় প্রতিদিনের ব্যবহৃত কেজো শব্দও কীভাবে চলে আসছে কিংবা সাধু-চলিত এর মিশ্রণে কবিতার ভাষা কীভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে; – তা আমরা এখানে অনুসন্ধান করতে চাইছি।

আবার শুধু শব্দ নির্বাচন নয়, শব্দ সজ্জার কোন্ অভিনবত্বে গদ্যভাষা আর কবিতার ভাষা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, প্রচলিত ছন্দকে বাদ দিয়ে কীভাবে গদ্যছন্দে কবিতার ভাবমুক্তি ঘটছে – সেইসব প্রসঙ্গই আলোচিত হবে এখানে।

আসলে জ্ঞাপনের সহজ রাস্তা প্রকাশের জন্য সবসময়েই বিপজ্জনক। অথচ অরুণ মিত্র বিচ্যুতির পাশাপাশি, বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক ক্রমকে বজায় রেখেও কী অনায়াসে জ্ঞাপনের form কে প্রকাশের জন্য আশ্রয় করেন এবং পাথরের ভার, শব্দ প্রয়োগের কোন জাদুতে পালকের কথামালা হয়ে ওঠে;- তাও আমরা ছুঁয়ে দেখতে চাই এখানে।

সূচক শব্দ : অরুণ মিত্র, কবিতা, শৈলী, ভাষা, ব্যঞ্জনা, তৎসম শব্দ, আটপৌরে শব্দ, নিরীহ শব্দ, অতর্কিত আক্রমণ।

মূল আলোচনা

সালটা ১৯৪৩ । প্রকাশ পেল অরুণ মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'। যদিও এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪-'৩৫ থেকে ১৯৪৩ –এর মধ্যে। এই সময়পর্বের দিকে তাকালে আমরা দেখি ভারতে চলছে পরশাসন। অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিজম্–এর গভীর অসুখ। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। ১৯৩৮-এ তিনি কলকাতার প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। আর ১৯৪২-এ অরুন মিত্র আনন্দবাজার ছেড়ে অরণিতে স্থায়ীভাবে চলে এলেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই কবির একটি সাক্ষাৎকারের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করতে চাই -

"সাম্যবাদে বিশ্বাস থেকেই রাজনীতিতে এসেছিলাম। আমার ভাবনা-চিন্তায় ছিল মানবমুক্তি। তবে, চলতি অর্থে যাকে রাজনীতি বলে সেই অর্থে কোনোদিন রাজনীতি করিনি। ...আমি আশা করি সব মানুষের মুক্তি, আমি চাই সব মানুষের মুক্তি, আমি চাই সব মানুষের সমান অধিকার।"[১]

স্বাভাবিকভাবেই সাম্যবাদে বিশ্বাসী মানুষ যখন দেখবেন ফ্যাসিজম্-এর নাগপাশের আবেষ্টনীতে সভ্যতা বিপন্ন তখন তো তাঁর কলম কুঠারেই পরিণত হবে —

"উপোসি হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;
দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমত;
মানুষেরা হুঁশিয়ার
লাল অক্ষরে লটকানো আছে দেখো
নতুন ইস্তাহার।"[২]

কিংবা,

"বসন্তে আহ্বান এল : অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরোধ করো,
তড়িতে আঘাত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ সন্ধানে হানো দেখি।

...

বসন্ত-বাণীতে জ্বালা। ধ্বংসের প্রাচীন অধিকারে
একাত্ম অস্ত্রের শাণে শেষের অধ্যায় গাঁথা আছে" [৩]

১৯৪৮-এ অরুণ মিত্র ফরাসি ভাষায় ফরাসি কাব্য নিয়ে গবেষণা করতে, ফরাসি সরকারের বৃত্তিতে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। তিন বছরের মধ্যেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে ভারতে ফিরে আসছেন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। আর ১৯৫২-তে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিচ্ছেন। ১৯৫৫-এর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে'।

এই 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের বাইশটি কবিতা বাদে বাকি কবিতাগুলি ফ্রান্সপর্বে এবং দেশে ফিরে এসে লেখা। এই কাব্যগ্রন্থ তাঁর কাব্যশৈলীর turning point। 'উৎসের দিকে'র প্রায় শুরুর দিকে তিনি লিখেছেন—

"তোমার সঙ্গে উঠেছি নতুন চরে
আমরা দুজনে স্বপ্নের দেশ মাড়াই।
পক্ষাঘাতের শিলা গেল খসে,
বাহুপদ – ঝংকার
সুবর্ণ প্রান্তরে
ছাপায় শূন্য, আমরা অঙ্গ মেলি
যোজন, যোজন, অলঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়াই।" (৪)

আবার এই কাব্যগ্রন্থের ৩৬ সংখ্যক কবিতা 'অমরতার কথা' –তে প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন—

> *"বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তাঁর ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।*
>
> ...
>
> *কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হয়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার ঝিলমিল মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি। তবু সূর্য ডুবলে আমার চোখে বার বার ঘনিয়ে আসে বন।*
>
> ...
>
> *সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি যেখানে পোড়ামাটি*—ইটের ভিতরে রস ছিল অমৃতের *মতো।"* [৫]

আমরা আলোচনার এই পর্যায় পর্যন্ত এসে দেখতে পাচ্ছি তাঁর কবিতার শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি পাল্টে যাচ্ছে কবিতার form। আগের মতন করে আর বলছেন না অরুন মিত্র। 'উদ্যত', 'ক্রোধ', 'তীক্ষ্ণ', 'অস্ত্র', 'ঝংকার'–এর বদলে 'বাসন', 'জলতরঙ্গ', 'ঢেউ', 'বন', 'কচিপাতা', 'ঝিলমিল',-এ তাঁর কবিতাও নতুন করে অঙ্কুরিত হচ্ছে। 'অমরতার কথা'–তে তো সেই "ধ্বংসের প্রাচীন অধিকার" শেষে চির নবীনের আবাহনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই। বাসনগুলো পড়ে এখানে ঝংকার তোলে না; জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে। এখানেও হাহাকার আছে। তবে আরও যা আছে তা হল হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন। আর এই গুঞ্জনের অনুরণনেই স্নাত হয়ে শব্দগুলি অনিবার্য ভবিতব্যতায় অনবদ্য হয়ে ওঠে। ফর্মের দিক থেকেও দেখি প্রচলিত ছন্দের বদলে গদ্যছন্দকে তিনি তাঁর বলার ভার দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন তাঁর যোগ্য কারণ তিনি নিজেই নির্দেশ করেছেন—

> *"কবিতা লিখতে গিয়ে আমি চেষ্টা করব নিজের অনুভূত বিষয়কে, নিজের ভিতরের ও বাইরের অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব অব্যাহতভাবে প্রকাশ করতে। স্বতঃসিদ্ধের মতো কোনো প্রথাগত ছককে মেনে নিলে তা সম্ভব নয়। এই ব্যক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে গদ্যপদ্যের প্রশ্ন আমার কাছে অবান্তর।"* [৬]

এখানে আর একটা বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতেই হবে; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকালের তফাৎ প্রায় বারো বছরের। এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যেই ফ্রান্সপর্ব অতিবাহিত হয়েছে। ফরাসী সাহিত্যের সাথে পরিচয়ের সূত্রে কবিতার ফর্ম সম্পর্কিত নিজস্ব ভাবনার সমর্থন পাচ্ছেন। ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে তাঁর নিজস্ব স্বর;— যা সম্বল করেই আগামীর পথ হাঁটবেন অরুণ মিত্র। বস্তুত 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের কবিতাতেই তিনি নিজস্ব ভাষা-রীতি খুঁজে পাচ্ছেন;-

যা ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। তাইতো কবি তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' এসে বলতে পারেন—

"প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে বলো"[৭]

যদিও অন্ধের মতো ছুঁতে গিয়ে তিনি অন্ধ হয়ে সমকালের, গনগনে আগুনে দিনগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে সচেতন দূরত্ব রেখেছিলেন এমন নয়; বরং শব্দগুলিকে এমন বহুত্বের অভিমুখ দিয়ে ভাবকে Encode করেন যাতে দীক্ষিত পাঠক যখন তা Decode করেন, তখন শব্দের শক্তির প্রাচুর্যে বা অরুণ মিত্রের শব্দ ব্যবহারের দক্ষতায় পাঠকেও রোমাঞ্চিত করে। নিছকই আটপৌরে শব্দের মধ্যেও তিনি সঞ্চারিত করতে পারেন বিপ্লবের বারুদ। তাই অগ্নিগর্ভ সমকালকে ধরতে আর আগুনে অক্ষর কিংবা উচ্চকিত কণ্ঠ কিছুরই প্রয়োজন হয় না। বরং নিতান্ত নিরীহ শব্দ দিয়ে তিনি কবিতার মধ্যে তৈরি করেন লাভার অন্তঃস্রোত।

চল্লিশের আর কোনো কবিই কবিতার বয়নে এমন নিরীহ শব্দ দিয়ে আগুনের ফল্গুস্রোত বওয়াতে পারেননি। অনেকেই হয়তো তা চানওনি। যেমন রাম বসু লেখেন—

"ভ্যান থেকে নামিয়ে বললে, যা
সে বিশ্বাস করেনি প্রথমে
মাঠের সবুজ দেখে ভোরের নরমে
কী যে মনে হল তার
ছাড়া-পাওয়া বাছুরের মতো যেই ছুটে গেল
একটা গুলির শব্দ
আলোড়িত সবুজে সে গড়াগড়ি খেয়ে তিনবার, স্তব্ধ
সাবাস সাবাস বীর গণতন্ত্র রাহুমুক্ত হল।"[৮]

(দিনলিপি থেকে)

মঙ্গলাচরণ লিখলেন -

"আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারছে অদৃশ্য একজন।
কেবলই পিছমোড়া দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে
একেকবার ঠেলে দিচ্ছে রোমাঞ্চে পাতালে
একেকবার বরফ-জলে
পরক্ষণে গন্‌গনে চুল্লিতে
মাথায় গজাল ঠুকে মাটিতে আছড়িয়ে
পা-দুটো কুকুর দিয়ে খাওয়াচ্ছে তখ্‌খুনি।
ছটফট-ছটফট করি, এপাশ-ওপাশ
দু-হাতে ছাড়াতে চাই গোটাকয় যন্ত্রণার বিছে,
জল-জল করি : আর আগাগোড়া শুরু করে ফের।"[৯]

(হাসপাতালে)

রাম বসু বা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়রা যখন সেই অস্থির সময়ের সরাসরি ছবি আঁকছেন অরুণ মিত্রের কবিতার অন্তরালে তখন বইছে গনগনে লাভার স্রোত। শব্দের উপরিতল থেকে যা টের পাওয়া সম্ভব নয়—

"অলিগলি ঘুরে রোজ প্রকাণ্ড চিমনিটার সামনে। দোকানের ঝলমল পেছনে ফেলে, মেয়েদের বুকের চমক পেরিয়ে এসে। কালো চোঙটার কোথাও একটু ঝিলিক নেই, স্পন্দন নেই। তবু তার ভিতরের লড়াই যেন আমাদের স্নায়ুতে শিরশির করে। হিংস্র থাবা বুঝি লোহার দেয়ালে রক্তের ফিনকি উঠিয়ে দেয়। অথচ ওপরে শুধু ধোঁয়া। ধোঁয়ার মধ্যে গাঢ় আকাশ বা তারা, কখনো-কখনো ঝড়ের ভ্রূকুটি। পাখিদের ঝাঁক ডানা ঝাপটে আমাদের মুখে ঢেউ লাগিয়ে যায় সিঁদুর রোদের, অন্ধকারের, প্রবল হাওয়ার। আমি বরং আরও অনেকে ঘুরন্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর প্রেমিক নায়ক হতে ইচ্ছে করি সকালবেলার শিশুরা তখন ইতিহাসের কাহিনি। তাদের ছোটো ছোটো আঙুলের দাগ মাটিতে লেগে আছে। তারা মস্ত নর্দমার ধারে জঞ্জালের গাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। খুঁজে খুঁজে পোড়া কয়লা টিনের কৌটো ন্যাকড়া জড়ো করে মাথায় তুলেছিল। তারপর চিমনির আড়ালে রাত্তিরের পথে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।" [১০]

(অলিগলি ঘুরে)

আসলে গনগনে আগুনকে তিনি সম্যকভাবে প্রকাশ করতে চান গুনগুন স্বরে, পাথরের ভারকে তিনি বহন করেন পালকের কোমলতায়। আর এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েই তিনি তৈরি করেন কাঙ্ক্ষিত ব্যঞ্জনা, যা তাঁর কবিতার শব্দ নির্মাণের প্রধান আলম্বন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অতিপরিচিত শব্দ দিয়ে লেখা অরুণ মিত্রের কবিতাগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে অনেকক্ষেত্রেই অধরা থেকে যায়। আসলে কবি শব্দকে সচেতনভাবে Encode করে শব্দের উন্মোচন ঘটান। এইভাবেই আভিধানিক অর্থের ছোট্ট গণ্ডী থেকে শব্দকে তিনি ওড়ান সম্ভাবনার অসীম আকাশে। সেই কারণেই বোধ হয় রাম বসু ও তাঁর 'অরুণ দা' কবিতায় উচ্চারণ করেন –

"প্রান্তরেখা নেমে নম্র পায়ে
খুঁজতে খুঁজতে এতদূর এসে, অরুণ দা
সন্ধান পেলেন আপনার উৎস মুখ
যা ছিল বোধের লাভায়, পুষ্পিত নির্জনে,
নিজেকে আড়াল করে
নিজেকেই ভাঙা বারবার
এ তো মারাত্মক খেলা
যা শুধু কবিরাই পারে। "

(অরুণ দা)

আবার ফিরে দেখা যাক অরুণ মিত্রের কবিতার ভাষার বিবর্তনের রূপরেখাটির দিকে। 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'-এ এসে দেখি তাঁর কবিতার ভাষায় লৌকিক, মৌখিক

শব্দগুলিও কী দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যে বসে আছে ! বস্তুত অকৃত্তিম বিশ্বাস থেকেই অনায়াসেই অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর কবিতায় এসে বসে 'বালবাচ্চা এন্ডে-গেন্ডি', 'ল্যাটা মাছের কিলিবিলি', 'খচমচ করে হাড়মজ্জায় ইস্ক্রুপ আঁটা ছবি', 'দানাপানির মারদাঙ্গা'। এখানে আমরা তাঁর কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করতে চাই—

"বালবাচ্চা এন্ডিগেন্ডি ভালোবাসা থেকেই এসেছে" [১১]

"তবু সেইখানে মানুষজনের আনাগোনা
দানাপানির মারদাঙ্গায়," [১২]

"...ল্যাটা মাছের
কিলকিলিতে আর কালিমাখা লণ্ঠনের দপদপানিতে গোটা কয়েক মুহূর্ত চেঁচিয়ে
উঠতে গিয়ে লোপাট হয়ে যায়।" [১৩]

এই ধরনের শব্দ ব্যবহারে সমকালীন কবিদের মধ্যে নিশ্চয় সবচেয়ে এগিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আসলে সুভাষের কবিতায় এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের আধিক্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে context-এর ভূমিকায় তাঁরই একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করতে পারি –

"দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।
মুখুজ্যে, তুমি লেখো।।" [১৪]

(মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ, ৪)

আখ্যানের আত্মকথন রীতির মত, লোকেরা ভিতরে এসে তাঁদের শব্দগুলি যেন সুভাষের কবিতায় বসিয়ে দিয়ে যায়। সে দিক থেকে অরুণের কবিতার লৌকিক শব্দরা যেন ভূমিকানুগ কথনের মতোই কবিতায় এসে বসে। অন্যদিকে চেনা আটপৌরে শব্দগুলিই সুভাষের কবিতার ঐশ্বর্য। কিন্তু সেই শব্দের সম্ভাবনা উন্মোচনে সুভাষ যত না সচেষ্ট তার চেয়ে তাঁর ঢের বেশি মনোযোগ Syntagmatic Relation-এর সম্পর্কে সম্পর্কিত অবিচ্ছেদ্য শব্দগুলির সঞ্চারণের আক্রমণে। চেনা শব্দের অপ্রত্যাশিত অর্থের অতর্কিত আক্রমণই পাঠকের সবটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়।

আসলে মানুষের কথা বলতে গেলে, তাঁর অন্তরকে ছুঁতে হলে এইভাবেই শব্দ খুঁড়তে হয়। নিতান্তই কেজো এই অত্যন্ত পরিচিত ভাষাকে কাব্যোপযোগী করে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। কারন— 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'।

এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর কবিতার শব্দ খোঁড়ার আয়োজনের কিছু পরিচয় নিতে পারি। 'Best order' –এ 'Best words' না বসলে তো তা কবিতা হতে পারে না। যেমন 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' তিনি লেখেন—

"কাছেই এক নদী রয়েছে বহতা স্মৃতি
পলিমাটি বীজ বোনার ঋতু" [১৫]

(গভীর শহরে, শুধু রাতের শব্দ নয়)

এবার আমরা যদি উদ্ধৃত পংক্তির কয়েকটি শব্দ পালটে সমার্থক শব্দ বসাই; যেমন— 'কাছেই' –এর পরিবর্তে 'নিকটে', 'নদীর' স্থলে 'তটিনী' আর বোনার জায়গায় 'বপনের', তাহলে পংক্তিটি হবে —

নিকটে এক তটিনী রয়েছে বহতা স্মৃতি
পলিমাটি বীজ বপনের ঋতু

এক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন হয়নি, এমনকি 'কাছেই' –এর স্থলে 'নিকটে' আসার ফলে 'ট' –এর অনুপ্রাস তৈরি হয়েছে। তবুও ধ্বনিগত পরিবর্তনে পূর্ববর্তী নির্ভার পংক্তি, পরবর্তীতে ঠোক্কর খেতে খেতে টলমল পায়ে হাঁটে।

কখনও আবার কবিতার শরীরে সাধু-চলিতের (শব্দ) সহাবস্থান ঘটেছে। যেমন —

"কটি-মেখলায় বৃথা বাজিয়াছে বিলম্বিত তাল,
তরঙ্গের করতালি ভুলে যাও।" [১৬]

(সৈকত, প্রান্তরেখা)

এখানে তৎসম শব্দ বহুল পরিবেশে 'বাজিয়াছে' ক্রিয়াপদ বেশতো মানানসই। হঠাৎ 'ভুলিয়া'-র বদলে 'ভুলে' বসে পড়ে কেমন ছন্দপতন ঘটাল যেন ! কিন্তু না; 'বেজেছে'-র বদলে 'বাজিয়াছে' বসেছে, আসলে 'বিলম্বিত তাল'-কে প্রলম্বিত করতে। অন্যদিকে 'ভুলে'-র বদলে 'ভুলিয়া' বসিয়ে তাকে দীর্ঘায়িত করলে কাঙ্ক্ষিত আকস্মিকতার নৈঃশব্দ্য তৈরি হত না। যদিও আমরা দেখেছি অরুণ মিত্র ক্রমশ এই তৎসম শব্দ বহুলতার ভার থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে চাইছেন। তাইতো তিনি 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' এসে বলতে পারেন —

"কথাগুলোর একেবারে ভার নেই। পাতার মর্মর মিশে যেতে পারে। অথচ তারা কল্লোল নিয়ে আসে। অথচ তারা বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসে। অথচ তারা ফুলফলকে নিঃশ্বাসের কাছে ধরে দেয়। পালকের মতো কথা। তাঁর মধ্যে পৃথিবীর নড়াচড়ার শব্দ।।" [১৭]

(দুই বছর, মঞ্চের বাইরের মাটিতে)

বস্তুত কবিতার কাছে তো গদ্যের সুঠাম শরীর অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই পাথরের মতো গুরুগম্ভীর ভাবের ভারকেও 'পালকের মতো' হালকা করে বলতে না পারলে, কবিতার তা বহন করার শক্তি নেই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ভাষা তো ভাব প্রকাশের অন্যতম দুর্বল মাধ্যম। ভাষা দিয়ে অনুভূতির কী সম্যক প্রকাশ ঘটানো সম্ভব? তাই জ্ঞাপনের ভাষা ছেড়ে প্রকাশের পথ ছাড়া উপায় কি? অরুণ মিত্রও এই পথের যাত্রী। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছন্ন সময়ের সুখ দুঃখ ঘিরে'-তে তাঁর বলার ভঙ্গি আরও বেশি অন্তরঙ্গ হয়েছে। কবিতার মধ্যে দিয়ে কারোর সাথে এখানে তিনি communicate

করছেন না; বরং নিজের মুখোমুখি বসেছেন। এবার যেন তাঁর নিজেকে কবিতা শোনানোর পালা;—

> *"সামনে একটা লাইন পাতা আছে, তাঁর ওপর দিয়েই আমার চলা, বলা যায় আমার*
> *জীবন পর্যটন। কিন্তু কোন দিকে আমি যাচ্ছি ঠাহর করতে পারি না। বারবার নিজেকে*
> *জিজ্ঞাসা করি কোথায় চলেছি আমি, আমার গন্তব্য তো এদিকে নয়। আমি সময়ের যে*
> *স্বপ্নের জায়গাটা ছুঁতে চাই তা আমার নাগালের বাইরেই থেকে যায়।"* [১৮]

(সামনের লাইন নিয়ে ভাবনা, উচ্ছন্ন সময়ের সুখ দুঃখ ঘিরে)

শুধু কবি কেন, কোনো শিল্পীই কী পারেন তাঁর 'স্বপ্নের জায়গাটা ছুঁতে'? না, পারেন না। কিন্তু তাঁরা পারেন ইন্দ্রজাল তৈরি করতে। তাই হয়ত রেনে গী কাদু বলেন—

> *"যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির নিজস্ব ঘরে, সে জানে না*
> *এ ঘরের প্রতিটি আসবাব তাকে জাদু করতে পারে"*

এই জাদুঘরে শুধুমাত্র দীক্ষিত পাঠক-ই hypnotized হন না, এখানে থাকতে থাকতে কবিও সম্মোহিত হন। তখন কবির কবিসত্বা আর পাঠকসত্বাকে কী সত্যি আলাদা করা সম্ভব? হয়ত তাই এই ভেদ-অভেদও অনিবার্য ভাবেই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে অচিন্ত্যনীয়—

> *"শব্দ আর অক্ষরদের আর চেনা যাচ্ছে না*
> *তাদের সর্বাঙ্গে ধুলো, কোনও মানে বোঝা যাচ্ছে না,*
> *সমস্ত একাকার।*
> *আর কি, এখন আমিও ধুলো হয়ে ধুলোয় মিশে যাই!"* [১৯]

তথ্যসূত্র :

১. সেন, ডঃ জয়ন্ত, ১৪০৪ : আবর্ত (সম্পাঃ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী), কবির দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৩৮ ।

২. মিত্র, অরুণ, ২০১০, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৩৪ ।

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৩৮ ।

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৮ ।

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৯১ ।

৬. মিত্র, অরুণ, ২০১৪ : প্রবন্ধ সংগ্রহ ২ অরুণ মিত্র (সম্পাঃ চিন্ময় গুহ), লেখকের জবানবন্দি, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ১৫০ ।

৭. মিত্র, অরুণ, ২০১০, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা –১৪২ ।

৮. বসু, রাম, ২০05, রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৯৭-৯৮ ।
৯. চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, ২০০৬, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ২৫০ ।
১০. মিত্র, অরুণ, ২০১০, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা –২০১ ।
১১. মিত্র, অরুণ, ২০১০, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা–২৮৭ ।
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২৮৪ ।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২৮২ ।
১৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ২০১৮, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৭৩ ।
১৫. মিত্র, অরুণ, ২০১০, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা–২১২ ।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২২ ।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৮৩ ।
১৮. মিত্র, অরুণ, ১৯৯৯, উচ্ছন্ন সময়ের সুখদুঃখ ঘিরে, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৩১ ।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৯ ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন (১৯০৬)

উমা দে (নন্দী)
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ : বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫) স্বদেশী, স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। কুখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলার'-এর প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয় এবং গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (১৯০৬, মার্চ)। পরিষদের পরিচালনায় গঠিত হয় 'Bengal National College and School' (১৯০৬, ১৪ই আগষ্ট)। এই কলেজকে কেন্দ্র করে জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষা পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়। পাঠ্যসূচিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু বহুবিধ ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে এই কর্মসূচীর দীর্ঘমেয়াদী সার্থক রূপায়ন ঘটে নি।

বিষয়সূচক শব্দ : বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, জাতীয় শিক্ষানীতি, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ।

১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা এবং ১৬ই অক্টোবর তা কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যা রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং আরও একধাপ এগিয়ে তা জাতীয় জাগরণে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের চারটি দিক লক্ষ্যনীয়- স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজ। এই আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল জাতীয় জীবনের সামাজিক পুনর্গঠন এবং সেই পুনর্গঠন সাধিত হয়েছিল স্বদেশী, স্বরাজ ও জাতীয় শিক্ষার নতুন ধ্যান ধারণায় এবং এর হাতিয়ার ছিল বয়কট। দেশে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার অসারতা ও ব্যর্থতা দীর্ঘদিন ধরেই দেশবাসীর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতৃত্বে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ সেই অসন্তোষের অবসান ঘটিয়ে জনসাধারণকে নতুন আলোর পথ দেখাতে উদ্যোগী হয়েছিল। ছাত্রদের বৃত্তিসমূহের স্ফূরণ ঘটানো এবং পূর্ণতা দানের প্রচেষ্টা পরিষদের কর্মসূচীতে গৃহিত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা, বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১১ই মার্চ, ১৯০৬) এবং পরিষদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের পরিচালনায় যে

বাস্তবোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা বর্তমানকালেও প্রাসঙ্গিক। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল - কোন প্রেক্ষাপটে এবং কিভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল; জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলি কিরূপ ছিল; বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের নেতৃত্বে কোন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল ইত্যাদি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নবোদিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মূলে কঠোর আঘাত করে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে মুসলমান শ্রেণীকে নিজেদের স্বপক্ষে আনার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশের বিভাজন নীতিতে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা, সভা-সমিতি, হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। ‘গঠনমূলক স্বদেশী’র মাধ্যমে ‘আত্মশক্তি’ বিকাশের উদ্যোগ স্বদেশী শিল্প, শিক্ষা এবং গ্রাম সংগঠন ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯০-১৮৯৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ‘আত্মশক্তি' অর্জনের মানসিকতার উপর জোর দেন এবং ‘গঠনমূলক স্বদেশী’র ধারণাকে রাজনীতিক হাতিয়ার হিসাবে তুলে ধরেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে গঠনমূলক স্বদেশীর উদ্দেশ্য ছিল “নিস্ফল ও আত্ম-অবমাননাকর ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতি বর্জন করে, স্বদেশী শিল্প, জাতীয় শিক্ষা আর গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তা।”[১] স্বদেশীর পরিপূরক হিসাবে আসে বয়কট। ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার আহ্বানে বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ বয়কট বলতে শুধু ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন নয়, বিদেশী শিক্ষা, চাকরি, খেতাব, আইন সব কিছু বর্জন বুঝিয়েছেন। বিদেশী শোষণ ও শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে এবং সর্বাত্মক বয়কটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের উত্তরণ ঘটে স্বদেশী থেকে স্বরাজে।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ২২শে অক্টোবর, ১৯০৫ জারি করে কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার। এই সার্কুলারের মাধ্যমে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্কুল কলেজের ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি, অনুদান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়। দেশপ্রেমী ছাত্রদের স্কুল কলেজ থেকে বহিষ্কার এবং গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশী লাঠি ও অত্যাচার চলে নির্মমভাবে তবুও সংগ্রামী ছাত্ররা পিছু হটে নি। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে শচীন্দ্র প্রসাদ বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি (৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫)। সোসাইটি সৃষ্টি হয়েছিল মূলত রাষ্ট্রিক কারণে, সরকারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। অল্পদিনের মধ্যে এর কর্মধারা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে। এই সোসাইটির নেতৃত্বে বিদেশী

শিক্ষার বিরুদ্ধে ঘোষিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম বাস্তবায়ন হল রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয়।

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মুখার্জী এবং তাঁর ডন সোসাইটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তিনি জাতির মানসিক এবং নৈতিক শক্তিকে সংগঠিত করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনিই ছিলেন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ এবং প্রধান উদ্যোক্তা। জাতীয় শিক্ষায় সতীশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে বিনয় কুমার সরকার লিখেছেন, "১৯০৫ সালের ১৫ই নভেম্বর (আশুতোষ চৌধুরীর ঘোষণা) থেকে ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট (বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা) পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন হল সতীশচন্দ্র মুখার্জীর জীবনচরিত (biography)। এই নতুন আদর্শকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন।"[২] ১৯০২, জুলাই থেকে ১৯০৫, জুলাই পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক যুবক এই সোসাইটিতে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল এবং নতুন নতুন চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল। এখানে ছাত্রদের শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো হয় নি; ছাত্রদের দৈহিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সুস্থ্য ও সুসামঞ্জস্য চর্চার দ্বারা তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, ডন সোসাইটি চেয়েছিল স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে আরো কিছু বিষয়ের সংযোগ ঘটাতে – নৈতিক, ধর্মীয়, কারিগরি এবং সাহিত্যিক দিকের। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যাবলীর ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল ডন সোসাইটি। "১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সৃষ্টি করে ডন সোসাইটি গৌরবময় মৃত্যু বরণ করে (hara-kiri) এবং ১৯০৭ সালে সোসাইটির পৃথক অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে।"[৩]

ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র অনুযায়ী বাংলার বিশিষ্টজনেরা ১৬ই নভেম্বর, ১৯০৫, বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশানের সভায় মিলিত হন। সভাপতিত্ব করেন রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জী। দীর্ঘ আলোচনার পর এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করে পরিষদ গঠনের বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। ১০ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় সভায় জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ও পাঠ্যসূচীর বিশদ প্রতিবেদন তৈরীর জন্য 'Ways and Means Committee' গঠন করা হয়। Provisional Education Committee এবং Ways and Means Committee –র রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করে বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় সভায় ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ গড়ে ওঠে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (N.C.E.) গঠন পরিকল্পনায় দেশের ৯২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল। এইভাবে ১৯০৫ সালের ১৪ই

নভেম্বর আশুতোষ চৌধুরীর ঘোষণাপত্রের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট) ইতিবাচক, গঠনমূলক দিক হিসাবে জাতীয় পরিষদ চিহ্নিত।

তবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পথ চলার শুরুতেই রাজনৈতিক মতপার্থক্য (নরমপন্থী ও চরমপন্থী) পরিলক্ষিত হয়। নরমপন্থীরা জাতীয় পরিচালনায় কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য স্থাপন করে 'কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি' (Society for the Promotion of Technical Education)। এই সোসাইটির পরিচালনায় গড়ে ওঠে 'Bengal Technical Institute' (25th July, 1906), ৯২, আপার সার্কুলার রোডে তারকনাথ পালিতের বাড়িতে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা ছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলরতন সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রমুখ। অন্যদিকে চরমপন্থী দলের মত ছিল – একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা। শিক্ষা পরিচালিত হবে ত্রিমুখী ধারায় – সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কারিগরি; এই শিক্ষা পরিচালিত হবে জাতীয় ভাবে এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই মতের সমর্থকেরা হলেন – গুরুদাস ব্যানার্জী, সতীশচন্দ্র মুখার্জী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ। এদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। পরিষদের পরিচালনাধীনে গঠিত হয় 'Bengal National College and School' (14th August, 1906)। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অসংখ্য দেশপ্রেমী, যাদের সর্বাঙ্গীন আত্মত্যাগ ছাড়া এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালের নভেম্বরে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য দেশের মধ্যে যখন প্রবল জনমত গড়ে ওঠে তখন কলকাতার সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এবং ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীনে যে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তার মূল বিষয় হল জাতীয় স্বার্থে ও জাতীয় কর্তৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা – "To impart Education-Literary as well as Scientific and Technical - on National Lines and exclusively under National Control ...".[৪] এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে সরকারের কোন বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না – সাংস্কৃতিক স্বরাজের কর্মকেন্দ্র হিসাবে এর জন্ম।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক বিভাগ থেকে ম্যাট্রিকের সমান ক্লাস পর্যন্ত (5th Standard Class) কারিগরি শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছিল। কলেজ বিভাগে কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল।

তৃতীয়ত, স্কুল বিভাগে ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়গুলি সব শ্রেণীতে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য হত।

চতুর্থত, কলেজ বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যে শিক্ষাদান ও গবেষণার বন্দোবস্ত।

পঞ্চমত, স্কুল বিভাগের প্রাথমিক পর্ব থেকে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ছিল বাধ্যতামূলক ও সার্বজনিক বাহন। দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা ছিল ইংরেজী।

ষষ্ঠত, স্কুল ও কলেজ বিভাগে সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষা এবং কলেজ বিভাগে পালি, হিন্দি ও মারাঠী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

এছাড়াও এই শিক্ষানীতিতে শারীর শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। নীতি শিক্ষা ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের জীবনী ও উপদেশাবলী পড়ান হত।

জাতীয় শিক্ষানীতির উপরোক্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, পরিষদের উদ্যোক্তারা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে 'ক্ষয়িষ্ণু এবং অনুন্নত অধিবিদ্যা'-র উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নি বা সেকেলে ধর্ম বা ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রবর্তন করেন নি। তাঁরা প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা যেমন করেন নি, তেমনি পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারণাকেও অবহেলা করেন নি। তাঁরা জাতির অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণে যেমন যত্নবান ছিলেন, একই রকমভাবে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসারেও সমান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরা শিক্ষাকে জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত করেছেন। শিক্ষার্থীর শিখণ প্রণালীতে ব্যবহারভিত্তিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা ও অন্যান্য দেশী ভাষা, ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষা, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির অন্যান্য দিক সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাগুলি উদ্যোক্তাদের প্রগতিশীল এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। এছাড়া ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্বিকভাবে জাতীয় শিক্ষার মূলকথা ছিল "ছাত্রদের সত্যকার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, তাদের মনে জ্ঞান-স্পৃহা সঞ্চার এবং জাতীয় চেতনার পূর্ণ বিকাশ"।[৫]

পরিষদের পাঠক্রমকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় – প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজিয়েট। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ৬ বৎসর বয়সে ভর্তি হত। শিক্ষার সময়সীমা ৩ বৎসর। এই স্তরে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হত – বিষয়ভিত্তিকভাবে (object-lesson) এবং Kindergarten পদ্ধতিতে। ছাত্রদের মাতৃভাষা পড়া, গল্প বলা, ভূগোল ও ইংরেজী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, গণিত, অঙ্কন, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই পর্বে দেওয়া হত। তবে এই স্তরে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই

মৌখিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। সাধারণ যন্ত্রপাতি, মাটির তৈরী বিভিন্ন জিনিস, কাগজ কাটা, কঞ্চির তৈরী জিনিস এবং কার্ডবোর্ডের তৈরী সাধারণ দ্রব্যের মাধ্যমে ছাত্রদের শেখান হত।

মাধ্যমিক স্তরে ছাত্ররা ৯ বৎসর বয়সে ভর্তি হত। এখানে শিক্ষার সময়সীমা ছিল ৭ বৎসর। মাধ্যমিক স্তরের দুটি ভাগ – ৫ম স্তরের কোর্স (5^{th} Standard) এবং ৭ম স্তরের কোর্স (7^{th} Standard)। ৫ম স্তরের কোর্সে ছাত্রদের সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হত যাতে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। ছাত্রদের কর্মশালায় অনুশীলন করান হত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা – পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত। এই স্তরে পড়ান হত সংস্কৃত বা আরবী বা পারসী, মাতৃভাষায় গদ্য ও পদ্য, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, ভৌত বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং অঙ্কন। এই কোর্স ম্যাট্রিকুলেশানের সমতুল্য ছিল। এই কোর্সের উল্লেখযোগ্য দিক হল – ৫ম বর্ষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সকল বিষয় পড়ান হত হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে, পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছিল। মাধ্যমিক স্তরের ৭ম বছরের কোর্সে শিক্ষার সময়সীমা ছিল ২ বছর। ৫ম বছরের কোর্সের পরবর্তীকালে ছাত্রদের সাহিত্য বা বিজ্ঞান বা কারিগরি বিভাগ – যে কোনটিকে বেছে নিতে হত। কিন্তু প্রতিটি বিভাগের পাঠক্রমই মিশ্রভাবে গঠিত হয়েছিল। এই কোর্স পর্যন্ত স্কুল বিভাগের অধীন ছিল। এই কোর্সের সাহিত্য বিভাগে ছিল মাতৃভাষা, ইংরেজী, যুক্তিবিদ্যা এবং প্রাথমিকভাবে ভৌত ও রসায়ন বিদ্যা। এছাড়া ইতিহাস, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, পালি, হিন্দি, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যবিষয় ছিল – মাতৃভাষা, ইংরেজী, যুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনীতির প্রাথমিক ধারণা। কারিগরি বিভাগের পঠন পাঠনের সময় ছিল ৩ বৎসর। এখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও অঙ্কন বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা ছাত্রদের দেওয়া হত। এছাড়া বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত Machine Drawing, Machanics, Steam-engines, Boilers and Prime Movers, Hand and Machine Tools, Pattern-making, Brass-moulding, Smithy, Turning, Fitting.

কলেজিয়েট স্তরে পঠন-পাঠনের সময়কাল ছিল চার বৎসর। এই পর্যায়ের পাঠক্রমের চারটি দিক ছিল – সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দ্রব্যাদি নির্মাণ। সাহিত্য বিভাগে ছিল প্রাচ্যের ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য; ইতিহাস – ভারত ও অন্যান্য সভ্যতা; ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রসমূহ; বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, মুসলিম ধর্মের প্রসার প্রভৃতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এছাড়া অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিখতে হত। বিজ্ঞান বিভাগে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন – যে কোন একটি মুখ্য বিষয় এবং অন্য দুটি মিশ্র বিষয় হিসাবে গণ্য হত। কারিগরি বিভাগে কৃষি, বন সংরক্ষণ, দ্রব্যাদি নির্মাণ, খনি খনন প্রভৃতি বিষয়

এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এছাড়া চিকিৎসা, যন্ত্রবিদ্যা, আইন প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যাবলী শুধু কলকাতাতেই নয়, বিভিন্ন মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল এবং এই বিদ্যালয়গুলি পরিষদের কার্যপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যে সব অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সেগুলি হল- দিনাজপুর চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, মাজপাড়া, সিলেট, মালদা, খুলনা, যশোর, শান্তিপুর, নোয়াখালি, জলপাইগুড়ি, কামারগ্রাম প্রভৃতি। বহু সংখ্যক বিদ্যালয়কে আর্থিক সঙ্কটের কারণে পরিষদের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বাংলার বাইরে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বেরার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে জাতীয় শিক্ষা নীতি গৃহীত হয় এবং জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

১৯০৫ সালে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ১৯১০ সালে তা তলানিতে এসে পৌছেছিল। বিভিন্ন ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও কেন এই কর্মসূচীর দীর্ঘমেয়াদী সার্থক রূপায়ণ ঘটে নি তা আলোচনা সাপেক্ষ। বিষয়টি আশ্চর্যজনক মনে হলেও এর পিছনে একাধিক কারণ কাজ করেছিল। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, "প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং অবক্ষয়ের নিদর্শনগুলি প্রথম থেকেই লক্ষনীয় ছিল।'[৬]

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে শিক্ষার আঙ্গিক যতটা না ছিল তার থেকে রাজনৈতিক আবেগ বেশি কাজ করেছিল। উপরন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি শিক্ষা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সাহায্য করে।

জাতীয় পরিষদ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের গুণগত মান থাকা সত্ত্বেও তারা কোন সরকারী বা ইউরোপীয় কোম্পানীতে চাকরীর সুযোগ পেত না। "ছাত্রসম্প্রদায়ের বড় অংশকে জাতীয় শিক্ষা আকর্ষণ করতে পারে নি, কারণ তাতে চাকরির সম্ভবনা ছিল নগণ্য।"[৭]

পরিষদের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক সংকট। পরিষদের অধীনে অনুমোদনপ্রাপ্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং অনুমোদনের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় আবেদন জানাতে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় সেই আবেদনে সাড়া দিতে পারে নি। সরকারী সাহায্য ছাড়া বিপুল ব্যয়ের বোঝা বহন করা সম্ভব ছিল না।

১৯০৮ সালে সতীশচন্দ্র মুখার্জী এবং অরবিন্দ ঘোষ অবসর গ্রহণ করায় পরিষদের ভিত অনেকটাই আলগা হয়ে যায়, নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি দেখা দেয়। ১৯০৯-১০ সালের মধ্যে অনেক অধ্যাপক ও গুণীজন কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন, ফলে পরিষদের ভিত দুর্বল হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও নিপীড়ন এই কর্মকান্ডকে বানচাল করে দেয়। সরকারী সাহায্য ছাড়া এই ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। একদিকে আর্থিক অনটন, অন্যদিকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জাতীয় পরিষদকে সবসময় সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। একটা সার্বিক ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র জাতীয় উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করা আদৌ কি সম্ভব?

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী শিক্ষাচিন্তায় নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯০৫-০৬ সালের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের কোথাও ছিল না। স্বাধীন ভারতের জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে শিক্ষা (প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত) ব্যবস্থা প্রণয়নে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর কর্মকর্তাদের দূরদর্শীতা স্মরণ করা যেতে পারে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জগতে যে পরিবর্তন এসেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিকল্পনা সাহায্য করবে।

সূত্রনির্দেশ :

1. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.৯৫।
2. Sarkar, B. K., *Education for Industrialization*, Calcutta, 1946, p.76.
3. Mukherjee, Haridas and Mukherje, Uma, *The Origins of the National Education Movement*, Jadavpur University, 1957, p.42.
4. *Calendar of the National Council of Education for 1906-08,* (Appendix A), p.17.
5. মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ও মুখোপাধ্যায় উমা, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.৫৩।
6. Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-08*, New Delhi, 1973, p.169.
7. সরকার, সুমিত, ঐ, পৃ.৯৯।

ঔপনিবেশিক বাংলায় কয়লার বাণিজ্যিক পরিবহণের বিকাশে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ভূমিকা : প্রসঙ্গ আসানসোল রাণীগঞ্জ কোলিয়ারি অঞ্চল

সুমন ভৌমিক
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

সারসংক্ষেপ : ১৭৭৪ সালে বাংলায় প্রথম কয়লার ভান্ডারের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় প্রথম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে কয়লাশিল্পে বাণিজ্যে বিপ্লব ঘটে। এশিয়ার অন্যান্যদেশে বা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কয়লা রপ্তানির জন্য, আসানসোল-রানীগঞ্জ কলিয়ারি থেকে কয়লা কলকাতা বন্দরে পাঠানো হত।ভারত তথাএশিয়ার অন্যান্য দেশে বাজারেবাংলার কয়লার চাহিদা তৈরি হয়েছিল। ১৮৮০-র দশকে বাংলার কয়লা রপ্তানি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। এর মূল কারণ ছিল, ১৮৫৫ সালে হাওড়াথেকেআসানসোল-রানীগঞ্জপর্যন্ত রেলপথ প্রতিষ্ঠা, যা কয়লা পরিবহণকে এক লাভজনক বাণিজ্য পরিণত করেছিল।উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বাংলার কয়লার চাহিদা ছিল বেশি। আসানসোল-রানীগঞ্জের বিভিন্ন খনি থেকে বঙ্গোপসাগরের তীরে দ্রুত কয়লা পরিবহনের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভবছিল। বাংলার কয়লা বাণিজ্যের উন্নয়নে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
সূচক শব্দ : কয়লা, আসানসোল-রাণীগঞ্জ,ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, পরিবহণ।

বাষ্প চালিত রেল ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর, শিল্প ওপরিবহনে বাষ্প চালিত রেল ইঞ্জিনের ব্যবহারবাণিজ্যে ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। এই বাষ্প-চালিত রেল গাড়ির সুবিধাগুলি বুঝতে ব্রিটিশ সরকারেরখুব বেশি সময় লাগেনি। তাই ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাই দেখা যায়, ১৮৪৯সালে লর্ড ডালহৌসি ভারতের গভর্নর হওয়ার পর রেলপথ বিস্তারেরবিষয়টির উপর বিশেষভাবে নজর দেন। ১৮৫৩ সালের ১৬ইএপ্রিল 'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানির'উদ্যোগে ভারতে প্রথম বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত রেলপথের সূচন হয়।[i]এরপর বাংলায়প্রথম পরীক্ষামূলক 'ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি' এর উদ্যোগে রেল ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত,যা সমগ্র পূর্ব ভারতকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। দুই সপ্তাহের মধ্যে, রেল পান্ডুয়াপর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং ছয়

মাসের মধ্যেবর্ধমান, রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল। ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ের প্রথম উদ্বোধনী যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে যাত্রীবাহী এবং মালবাহী ট্রেনগুলি পুরোদমে চলতে শুরু করেছিল।হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত ১২১ মাইল রেলপথ পূর্ব ভারত ও বাংলার বাণিজ্যিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।[ii]পরবর্তীকালে,কয়লা বাণিজ্যকে আরও লাভজনক করে তুলতে রেলপথ সম্প্রসারিত করা হয়েছিলএবং১৮৬৩ সালের মধ্যে আসানসোলপর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়ছিল।এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসানসোল-রানীগঞ্জ কলিয়ারি এলাকার বিভিন্ন স্থানে রেলপথ স্থাপন করা হয়।[iii]বাংলার কয়লার ভারতে এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বাজারে চাহিদা তৈরি হয়। বাংলার কয়লা পরিবহণ বাণিজ্যের উন্নয়নে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকরেছিল।

১৭৭৪ সালে বাংলায় কয়লার অস্তিত্বের কথা প্রথম জানতে পারেন দুই ইংরেজ অফিসারSuetoniusHeatlyও John Sumnerএবং ঐবছরইওয়ারেন হেস্টিংসের একটি লাইসেন্সের মাধ্যমেতাঁদের কয়লা খনিতে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।[iv] কিন্তু সেখান থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ সংগঠিত রূপে শুরু হতে লেগেছিল আরো কয়েকটাবছর।১৮২০ সালে 'আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোং' এজেন্সি হাউসের তত্ত্বাবধানে সংগঠিতভাবে প্রথম কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে'আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানি' ব্যর্থ হয় এবং ১৮৩৭ সালে রানীগঞ্জেরসমস্ত খনি অঞ্চলপ্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে চলে যায়।[v] এরপর ১৮৪৩সালেনাগাদ'Carr Tagore & Company', 'Gilmore Hombray& Company'ও'উইলিয়ামপ্রিন্সেপ্ কোম্পানির'যৌথ উদ্যোগেপ্রতিষ্ঠিত হয়'দ্য বেঙ্গল কোল কোম্পানি'।[vi]উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আসানসোল-রানীগঞ্জ ছিল ভারতের বৃহত্তম কয়লা উৎপাদন অঞ্চল।

কয়লা বাণিজ্যের প্রধান সমস্যা ছিল সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে আসানসোল-রানীগঞ্জ কলিয়ারি থেকে কয়লা পরিবহন খুব বেশি লাভজনক ছিল না।অথচ দামোদর নদী পথে নৌকায় কয়লা পরিবহণ ছিল যথেষ্টঝুঁকিপূর্ণ। সে সময় খনি থেকে গরুর গাড়িতে করে কয়লা বহন করে, দামোদর নদীর তীরে আনা হত, সেখান থেকে নদীপথে কয়লা কলকাতা বন্দরে পৌঁছাত।বেঙ্গল কোল কোম্পানি অতিরিক্ত কয়লা উত্তলন করলেও, তা খনির বাইরেই পড়ে থাকত। কারণ, পরিবহণের অভাবে কলকাতায় কয়লা নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছিল না।[vii] কখনও ভারী বৃষ্টির কারণে বা কখনও বৃষ্টির অভাবে নদীতে জল না থাকায়, নদী পথে কয়লা পরিবহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। কয়লা ব্যবসায় ক্ষতির প্রধান কারণ ছিল নৌকা ডুবি।[viii]সাধারণত বর্ষায় নৌকাডুবির ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হত।১৮৪৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট কয়লা পরিবহনের ২০% কয়লা দামোদর নদীতে ডুবে গিয়েছিল।এতেক্ষতিরপরিমাণছিলঅনেকবেশি, কারণ হিসেব করে দেখা গেছে বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর এগারো ভাগের তিনভাগ কয়লা রাস্তাতেই নষ্ট হয়ে যেত,।[ix] এই

কারণে পরিবহণ খরচ এতটাই বেশীছিল, যেখানে খনিতে কয়লার দাম ছিল১/২ আনা, সেখানে কলকাতায় কয়লা পৌঁছানোর পর দাম হত ৪ আনা।[x] সে সময় অজয় নদীর মধ্য দিয়ে ভাগীরথী হয়ে কলকাতা বন্দরে কয়লা পৌঁছাত। কিন্তু সেখানেও এই একই ধরনের সমস্যাগুলি মুখোমুখি হতে হত।[xi] তাই বলা যায় যে, রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার আগেও কয়লা পরিবহণের জন্য কোনো প্রকার সস্তা এবং সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না।আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল থেকে কয়লা উৎপাদক কোম্পানিগুলি সহজেই কয়লা ব্যবসা করতে পারত না। তাই দেখা যাচ্ছে যে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'খনি থেকে অতিরিক্ত কয়লা খনন করছিল, কিন্তু পরিবহনের অভাবে কলকাতা বা অন্যান্য বন্দরে আনা যায়নি বলে এটি খনির বাইরে পড়েছিল।[xii]এই সময়েই কয়লা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

অবশেষে ১৮৫৫ সালে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ প্রতিষ্ঠা হলে, কোলিয়ারিগুলিথেকেকলকাতায় দ্রুত কয়লাপরিবহণসম্ভব হয়। শুধু কলকাতার গৃহস্থলীর কয়লার চাহিদাই নয়, স্টিম ইঞ্জিন পরিচালিত যে কোন যন্ত্রে এই কয়লা ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অর্থাৎ এই কয়লার উপর নির্ভর করে স্টিম চালিত নৌকা, জাহাজ চলাচল শুরু করে। এই রেলপথ স্থাপন শুধু মাত্র কয়লা পরিবহণ সুবিধা করে দেয়নি নতুন কিছু চাহিদা গোষ্ঠীকে তুলে ধরেছিল, এছাড়াকলকাতায় কয়লা সহজলভ্য হওয়ায় কয়লার ব্যবহার ও প্রচলনও বেড়ে যায়। যার ফলে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গা নদীর দুই তীরবর্তী রিষড়া, শ্রীরামপুরেরমতো অঞ্চল গুলিতে বিভিন্ন কল-কারখানা গড়ে ওঠে।[xiii]রানিগঞ্জপর্যন্তরেলওয়েপ্রতিষ্ঠারপরকয়লারপরিবহণঅনেকবেড়েগিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে এই সময় কলকাতায় কয়লার চাহিদা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে রেলের পক্ষে সেই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও দূরবর্তী খনি অঞ্চল গুলিকে সঠিক পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্য নতুন রেলপথ প্রতিষ্ঠার দিকে মন দেয়।এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ইঞ্জিনিয়ার্স জার্নালে, সেখানে লেখা হয়েছিল-

"There is no doubt that, as Railways open throughout India, the demand for coal will be considerably in-creased, and that speculations in coal are about the most promising speculations of the day. Simply because coal is wanted, it must be had; and hitherto, for want of Railways, the coal-supplying resources of India have remained undeveloped. The activity at the Raneegunge collieries is now very great, the demand being very extensive—in fact sometimes considerably above the supplying powers. We have known extensive orders refused by one Company, simply from their inability to meet them within

a given time, being unable to send down coal fast enough to supply their regular customers. The opening of the Barrakur and Singharron Valley branches of the East Indian Railway will completely alter this state of things, as they will open up new districts, and thus break up the monopoly in the advantages for supplying coal possessed by one Company. The Bengal Coal Company at present have the Railway up to their pits' mouth, while the East India Coal Company, the Beerbhoom, and another Native Company are virtually deprived of the advantages of Railway communication. Before long, however, these Companies will enjoy the privilege of having the Railway almost up to their pits' mouths, and their outturns and supplying capacities will be vastly augmented. If really good coal can be found at Raneegunge, the day will come when, in place of having some two or three coal ingstaiths at Howrah, at least a dozen will be required to meet the requirements of the traffic.'[xiv]

সুতরাং নিঃসন্দেহে সেই সময়ের সূত্র থেকে বলাযেতেপারে যে, রেলওয়ের হাত ধরে সে সময় কয়লা বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

ওল্ডহ্যাম তার একটি প্রতিবেদনে বলেছেন যে,বাংলায়রেলপথ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বাজারে বাংলার কয়লার ক্রমবর্ধমান চাহিদা লক্ষ্য করা গেছে। তিনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায়বর্ধমানের কয়লারচাহিদা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল:

Table 1
Burdwan coal field was increasing steadily[xv]

Year.	Estimated of coal tread.	Receipts from the coal tread.
1855	100,000 Tons.	£ 1949
1859	325,000 Tons.	£ 71,736

সুতরাং এটি দেখায় যে রেলপথ চালু হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছরে মধ্যে বাংলার কয়লার চাহিদা কিভাবে প্রায় তিন গুনেরও বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বাজারে বাংলার কয়লার ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটি বড় কারণ হল, বাংলার কয়লারদাম ইংল্যান্ডে কয়লা তুলনায় অনেক সস্তা এবং অনেক সহজলভ্য ছিল। যদিও

প্রথমে রেল ইঞ্জিন চালানোর জন্য ইংল্যান্ড থেকে কয়লা আমদানি করা হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে, যখন বাংলার কয়লা দিয়ে রেল ইঞ্জিন চলতে শুরু করে, তখন রেল পরিচালনার খরচ অনেক কমে যায়। ফলস্বরূপ, ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলপথের পরিবহন খরচ প্রায় ছয়গুণ কমে গিয়েছিল।[xvi]এইভাবে, ১৮৭৮-৭৯ সালে, পূর্ব ভারতীয় রেলকে কেন্দ্র করে কয়লা বাণিজ্যএক অভূতপূর্ব উন্নয়নঘটেছিল। তাই J.E.O Connor কয়লা বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন -

> *"The commencement of the East Indian Railway line, which was laid to run through the coal bearing region of the Damudar basin, gave an impetus to the mining industry and new pits were opened in large number."*[xvii]

রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পরের ১৫ বছরে মধ্যে বাংলার কয়লার চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। বাংলার কয়লার ব্যবহার শুধু রেলওয়ে ইঞ্জিন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নয়, অন্যান্য উদ্দেশ্যে এবং শিল্পেও লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে বাংলায় কয়লার বাজার ছিল কলকাতা, কিন্তু পরবর্তীতে এটি বোম্বে এবং রেঙ্গুনের মতো দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার বাজারগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে রানিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লা পৌঁছে গিয়েছিল।[xviii]এমনকি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি নৌকা ও স্টিমার চালানোর জন্য এই কয়লা ব্যবহার শুরু করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ওয়েলশ (যুক্তরাজ্য) থেকে কলকাতায় কয়লা আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮৮৫ সালে ৪৫,০০০ টন, ১৮৮৯ সালে কয়লা আমদানির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১,০০০ টনে।[xix]অতএব, দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাজারগুলিতে ইংল্যান্ডের কয়লার চাহিদা অনেক কমেগিয়েছিল।

রেলপথে হাওড়ায় কয়লা আসার পর, সেই কয়লা যে রাস্তা ধরে খিদিরপুর বন্দরে নিয়ে যাওয়া হত, সেই রাস্তাটি ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ, তাই প্রায়সই দুর্ঘটনা লেগেই থাকত।এই সমস্যার সমাধান এবং রেল পরিবহনের উন্নতির জন্য রেলওয়ে বিকল্প পথের কথা ভাবতে শুরু করে এবং এর বিকল্প পথ হিসাবে হুগলি নদীর উপর জুবিলী ব্রিজ নির্মান করা হয় যাতে আসানসোল-রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা বোঝাই মালগাড়ি গুলো হাওড়া না গিয়ে সরাসরি বন্দরে আসতে পারে। এর ফলস্বরূপ, ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কয়লা পরিবহণ বাণিজ্যকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্য এক চরম উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছিল। সেই তথ্য নিচে দেওয়া হল:

Table 2
Total Traffic Crossing the Jubilee Bridge[xx]

Year.	Coal.	Ordinary Merchandise.	Total.
1897	1,532,557 tons.	458,129 tons.	2,040,686 tons.
1901	2,995,600 tons.	617,851 tons.	3,613,451 tons.

কয়লাগুলিকে খনি থেকে স্টেশনে আনার পর টার্মিনাল চার্জ নেওয়া হত, যেমন রানিগঞ্জ-আসানসোল, ঝরিয়া এবং ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অন্যান্য কলিয়ারি স্টেশনে 0.40 রুপি এবং হাওড়া, শিয়ালদহ, খিদিরপুর ডক ইত্যাদিতে আনলোডিং চার্জ ছিল 0.20 রুপি। খিদিরপুর বন্দর দিয়ে কয়লাগুলি জলপথেঅন্য অঞ্চলগুলিতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে আনা হত।[xxi]

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, কলকাতা থেকে কয়লা রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধি সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল:

Table 3
Rapid Growth of Coal Traffic[xxii]

Year.	Total coal traffic. Tons.	Exported. Tons.	Total earnings. Rs.
1889	1,404,711	--------	64,26,925
1891	---------	137,000	---------
1893	---------	250,000	---------
1894	2,144,382	297,000	79,51,427
1896	---------	574,000	---------
1899	3,897,596	1,136,000	135,29,685
1901	--------	1,995,000	---------
1905	6,142,284	2,767,000	202,44,250

এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা বলতে পারি যে কয়লা পরিবহন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় পরিণতহয়েছিল। তারা ভারত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা পৌঁছে দিতেও সহায়তা করেছিল।

Table 4
Coal export businesses from Calcutta to Asian Market in 1895[xxiii] (in Tons.)

Colombo	31,020
Singapore	11,899
Burma and Chittagong	89,566
Other foreign places	5,236
Bombay	94,357
Madras coast	20,945

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে তাদের নিজস্ব কলিয়ারি স্টেশন থেকে কলকাতার বন্দরে কয়লা পরিবহন করে এবং বন্দরে অবতরণের বিল জারি করে।তারপরকয়লাসমুদ্রগামী জাহাজে লোড করে বিদেশে রপ্তানি করা হত। সে সময় বাংলা থেকে কয়লা বিদেশে রপ্তানির জন্য পূর্ব ভারতীয় রেলপথ এবং তারপর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মাধ্যমে বিশাখাপত্তনম বন্দর দিয়ে পরিবহন করা হত। রানিগঞ্জ-আসানসোল থেকে প্রচুর পরিমান কয়লা বার্মায় রপ্তানি করা হত এবংসেখান থেকে বাংলার এই কয়লা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।[xxiv]রানীগঞ্জ-আসানসোল কয়লার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল পারস্য এবং আফগানিস্তান। এক্ষেত্রে বাংলার কয়লা রেলপথে নাশিকের মাধ্যমে পরিবহন করা হতো।.[xxv]

Table 5
Export of Indian Coal in South East Asian Country, 1897–1904 (in Tons.)[xxvi]

	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
Ceylon	104,524	214,986	180,909	368,031	335,651	274,010	257,251	374,754
Burma	203,232	169,979	188,619	200,469	242,777	261,213	264,344	287,397
Straits	85,280	93,462	86,951	65,715	89,592	89,567	142,256	143,729
Sumatra	-------	-------	3,531	10,863	10,690	14,655	13,975	30,802

এইভাবে আমরা সহজেই বুঝতে পারি উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারত তথা এশিয়ার বাজারে বাংলার রাণীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা এবং এই কয়লা বাণিজ্যের উন্নয়নে পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তথ্যসূত্র :

i. Srinivasa, R., Tiwari, M. & Silas, S. (ed.), (2006) *Our Indian Railway; Themes in India'sRailway History,* Foundation Books, p. xiv.

ii. Mukherjee, H., (1994), *The Early History of the East Indian Railway 1845-1879*, Calcutta Firma KLM private Limited, p.13.

iii. Eastern Railway website, Asansol Division, Access on 12/12/22, (https://er.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,6,443)

iv. Peterson, J.C.K., Bengal District Gazetteers Burdwan, Bengal Secretariat Book Depot, 1910, p.130.

v. Ibid.

vi. Ibid.

vii. Friend of India, May 25, 1854

viii. Report of the managing director of East Indian Railway Company to chairman in April 8, 1846.

ix. Macdonald Stephenson R., (1845), Report upon the practicability and advantages of the introduction of railways into British India, Printed By Kelly & Co. 19 & 20 Old Boswell Court Temple Bar, London, p.53.

x. Mukherjee, H., (1994), *The Early History of the East Indian Railway 1845-1879*, Calcutta Firma KLM private Limited, p.77.

xi. Report of the Committee for Investigating the Coal and Mineral Resources for the year 1838.

xii. Friends of India, May 25, 1854.

Xiii. Sen. S. P, (1973), Modern Bengal A Socio-Economic Survey, Institute of Historical Studies, Calcutta 17, P.43.

xiv. Engineers Journal February 1, 1861.

xv. Report on Coal Resources and Production of India by T. Oldham, 1867, App. III, p. XXIV, Sel. Government of India. No. 64.

xvi. Rendel and Turnbull to Noad. 23 July 1855, Rly. Home Corrsespondence, App. Vol. IX. 1 Report to the Sec. of State for India in Counc. on Rlys. in India.

xvii. J.E.O Connor in Review of the Trade in India 1878-79.

xviii. Huddleston, G., (1906), *History Of The First Indian Railway,* Thacker, Spink& Co. Calcutta, pp.160-161.

xix. Ibid.

xx. Ibid. p.175.

xxi. East Indian Railway Coal Tariff, No.41, East Indian Railway Press, Calcutta, 1938, p.22.

xxii. Huddleston, G., (1906), *History Of The First Indian Railway,* Thacker, Spink& Co. Calcutta.p.166.

xxiii. Report of the Labour Enquiry Commission for the year 1896.

xxiv. East Indian Railway Coal Tariff, No.41, East Indian Railway Press, Calcutta, 1938, pp.29-30.

xxv. Ibid.p.53.

xxvi. Holland, T. H. (1905) *Review of the Mineral Production of India during the Years 1898 to 1903*, Records of Geological Survey of India, Vol. 32, Part I, Calcutta.p.26.

বৃত্তি ও তার বিবর্তন : প্রসঙ্গ রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

জয়া ধীবর
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

'ঋকবেদে'র সময়কাল থেকেই ভারতবর্ষে সমাজের যে শ্রেণিবিন্যাস সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি জাতির ভিত্তিতে সমাজ বিভক্ত ছিল। সমাজের শ্রেণী ব্যবস্থায় সর্বোপরি স্থানে ছিল ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় এবং তার পরবর্তী ধাপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়, সর্বশেষে স্থান ছিল দরিদ্র অসহায় শূদ্র সম্প্রদায়। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসে সমাজ ব্যবস্থার এই ভিতে আঘাত দেয় । শুধু সামাজিক পরিবর্তন নয়,ব্রিটিশদের আগমনে ভারত তথা বাংলায় অর্থনৈতিক বিকাশ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য মানুষকে উপার্জনের পথকে বেছে নিতে হয় এবং এক্ষেত্রে বংশপরম্পরায় চলে আসা বৃত্তিকে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। কিন্তু ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনে এই ঐতিহ্যবাহী ধারাতে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে ভাঙ্গন ঘটতে শুরু করে। ব্রিটিশদের কাছে ভারতবর্ষ উৎপাদক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় -"একটি শস্য উৎপাদনের অর্থাৎ কাঁচা মালের কেন্দ্র — এই মাল বিলাতি জাহাজে বোঝাই করে ব্রিটিশ দালালেরা তাদের দেশে নিয়ে যায়। আর দক্ষতা ও মূলধনের সাহায্যে শিল্পজাত পণ্যে রূপান্তরিত করে ফেরত পাঠায় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশে, বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে।" [১] আর্থব্যবস্থার এই পরিবর্তন গ্রাম্য সমাজের শ্রেণিব্যবস্থার উপর ধাক্কা দেয়, বংশপরম্পরায় কৌলিকবৃত্তি পালনকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা নিজস্ব গণ্ডি ত্যাগ করে বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। পূর্বে ব্রাহ্মণরা কুলবৃত্তির প্রভাবে সর্বাগ্রগণ্য হলেও বর্তমান সমাজে বিত্তগতদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু গ্রামে এই পরিবর্তনের স্রোত ধীর পদক্ষেপে যেহেতু সঞ্চারিত হয় তাই গ্রামীণ সমাজের ভিতকে পুরোপুরি ধূলিসাৎ করতে তখনও পারেনি--- "ব্রিটিশ আমলে গ্রাম্য সমাজের এই নিরেট পিরামিডের মূলে আঘাত লেগেছিল – রাজস্ববৃদ্ধির নানা রকমের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে। গ্রাম্য সমাজের শ্রেণিগত রূপের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল, পিরামিডটা একটু টলে উঠেছিল, কিন্তু সেটা ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি অথবা গ্রাম্য সমাজের কোনও মৌল রূপান্তর হয়নি। অথচ গ্রামসমাজ জীবনে বিত্ত প্রাধান্যের জন্য পরস্পরবিরোধী অনেক স্রোত সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং তার ফলে ঘূর্ণাবর্তেরও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন পুরাতন ও নতুন স্রোতের টানাটানির মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।" [২] বর্তমান যুগের বিনিময়প্রধান

অর্থনীতি দেশীয় শিল্পকে বিনষ্ট করে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি ঝোঁককে বাড়িয়ে দেয়। পূর্বের মতো ঢাকাতে তাঁতিরা মসলিন প্রস্তুত করে না, বিদেশ থেকে বস্ত্র আমদানি হয়, তাঁতিরা অন্ন সংস্থানের জন্য চটের কলে যোগদান করে। "তাঁত, চরকা ও কৃষিকাজ ছিল এই পরিবারনির্ভর সমাজের স্তম্ভ এবং পরস্পরনির্ভর গৃহশিল্প ও কৃষিকাজ থেকে তার আর্থনীতিক প্রয়োজন মিটে যেত। এই সুস্থির সমাজজীবনে হস্তক্ষেপ করে ইংরেজরা হয় সুতাকটিনিকে নিয়ে গেলেন ল্যাঙ্কাশায়ারে, আর তাঁতিকে রাখলেন বাংলাদেশে, না হয় তাঁতি ও কাটনি উভয়কেই ধ্বংস করে ছোট ছোট স্বাবলম্বী সমাজকেন্দ্রগুলির আর্থিক ভিত ভেঙে দিলেন।"[৩] স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে সরকার ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন, অপারেশন বর্গা, বেনামী জমি উদ্ধার ও বন্টন,শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, কাজের সময়সীমা ৮ ঘণ্টা নির্দিষ্টকরণ, সাক্ষরতার অভিযান সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন ১৯৫৪ সালে ১৫ এপ্রিল প্রবর্তিত হলে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে, কিন্তু জমি বন্টনের কাজটি সঠিকভাবে পর্যবসিত হয় না। জমির পাট্টা অধিক পরিমাণে কোনো কৃষক অধিকার করে আবার অনেক কৃষক জমি বন্টনে অংশীদার না হওয়ায় শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৯ - ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৩-৭৪ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাব দেওয়া হয়, অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে উন্নয়নের গতিবেগকে ত্বরান্বিত করা হবে ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে হ্রাস করে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে সুযোগ সুবিধাকে সম্প্রসারিত করতে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগকে বৃদ্ধি করা হবে। রাজ্য সরকার তাঁত শিল্প,পাট শিল্প, চা শিল্প, রেশম শিল্প প্রভৃতি প্রযুক্তির অভাবে বিলুপ্তির পথে চলে যাওয়া শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একইসাথে উদারনীতিবাদ গ্রহণ করে বহুমুখী জীবিকার পথকে প্রশস্ত করা হয় এবং কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য ভিন্ন জীবিকাকে আশ্রয় করে। এইসময় থেকে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমতে থাকে, শহরের স্পর্শে গ্রামের গতানুগতিক চেহারা পাল্টে যায়, গ্রামীণ পণ্যে বেসরকারী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সাধারণীকরণ হয়, পঞ্চায়েতী কাঠামোতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক পালাবদলে পরিবর্তিত গ্রাম্য সমাজ, পাল্টে যাওয়া গ্রামীণ মানুষদের জীবন যাত্রার রূপরেখা, গ্রাম্যসংস্কৃতিতে শহুরে আদব কায়দার প্রভাব— এইসমস্ত কিছুই সাহিত্যের বিষয় হয়ে ছোটগল্পে স্থান করে নেয় বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই। "প্রাক্-সত্তরে নকশাল আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্ন হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু কোনো আন্দোলন ছাড়াই বাংলা গল্পের সীমানা প্রসারিত হয়ে যেতে থাকে গ্রামীণ মৃত্তিকায়। সাত ও আটের দশকে বাংলা ছোটোগল্পের চালিকাশক্তি যে গ্রাম সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। পরবর্তীকালে আরো নতুন বিষয় নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু গ্রামজীবন একভাবে সেখানেও রয়ে গেছে।"[৪] এই প্রবন্ধে

কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬-) পরিবর্তিত গ্রামজীবনে বৃত্তি ও বৃত্তের সংকটকে তাঁর গল্পে কীভাবে চিত্রিত করেছেন তা আলোচনা করা হবে।

কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬-) প্রতিক্ষণে প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলনের ভূমিকাতে বলেছিলেন, তিনি বাঁকুড়ার জেলার গেলিয়া গ্রামের রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি তুষুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তনের মধ্যে কেটেছে। "আসলে বাঁকুড়ার এক গ্রামের ছেলে আমি। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের আরম্ভও অনেকখানি কেটেছে গ্রামে। আমাদের গ্রামসমাজে আমার শৈশব থেকেই রাজনীতির ছায়া পড়া দেখেছি। ধরুন ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে স্থিতাবস্থা ভাঙতে শুরু করে, জমির ভাগচাষি ধানের জমি, সরকারি খাস জমি, জোতদারের উদ্বৃত্ত জমি দখল করে নেয় ভূমিহীনরা। সেসব নিয়ে কত কথা। এসবের ভিতরেই বেড়ে উঠেছি। আর এইসব আবেগই সঞ্চারিত হয়েছে। মিশে গেছে আমার গল্পের গভীরে।"[৫] কৈশোরে সহপাঠীর বাবাকে লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া বা গ্রামের যে লোকটি কীর্তন করেন তাকে পুলিশ আটক করা, জমির জন্য পুলিশের ভাগচাষীদের হত্যা করা বা যে কালি সাধক রক্ত বস্ত্র পরে সাধনা করতো রক্তবস্ত্র খুলে লাঠির মাথায় সেই রক্তবস্ত্র বেঁধে লাল পতাকা করা-এসব ঘটনা লেখককে রাজনীতি শিখিয়েছে। গ্রামের নিরন্ন মানুষের হাহাকার, অসহায়তাকে তিনি কাছ থেকে দেখে দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি খেতমজুর কেষ্ট মেটের কাঁধে চড়ে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছেন, ছোলার বীজ কেমন করে জমিতে ছড়াতে হয় তা শিখেছেন। কিন্তু ভাদ্র মাসের অনাহারে জর্জরিত সেই কিষ্ট মেটেকে অন্নের জোগানের জন্য ডাকাতি করতে দেখেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার জগৎ তাঁর সাহিত্যের জগৎ হয়ে উঠেছে। কিন্তু গল্পকার অভাবে জর্জরিত মানুষগুলির দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে থেমে যেতে চাননি, তাই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন, জীবনের লড়াইয়ে তারা পরাজয় স্বীকার করেনি এবং মৃত্যুকে নয় জীবনকে বেছে নিয়েছে। 'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, মানুষ কিংবা ঘুঘু' গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে একজন অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তির সাঁওতালডিহির হাই ভোল্টেজ তারে হাত ছুঁয়ে আত্মহত্যা। গল্পকার যখন এই বাস্তব ঘটনাটি গল্পের রূপ দিলেন সেখানে সুচাঁদ আত্মহত্যা করতে গেলেও ইলেকট্রিক তারের উপরে বসা একজোড়া ঘুঘুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। "বিদ্যুতের বিপরীত টানে জোড়া ঘুঘু ছিটকে মাটিতে পড়ে, সে মানুষটি মৃত্যুর দিকে জোড়া পায়ে উঠেছিল সে নেমে এসে জোড়া ঘুঘু নিয়ে যাবে ফেরে।...গল্পের ভেতরেও মৃত্যু রয়েছে—দুটি পাখির, কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একজন জীবনে ফিরে এসেছে"[৬] মানুষ যখনই সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তখন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পুরোনো জীবিকাকে নতুন ছাঁচে ফেলে বর্তমান সময় অনুযায়ী করে নিয়েছে। যেমন 'পিকনিক' (১৯৭৫) গল্পে দেখা যায় গঙ্গীর বাবা পূর্বে মুনিষ খাটতো কিন্তু এখন সেদিন গত হয়েছে, বর্তমানে ধান পাকা গমপাকা কুমড়ো পাকার সময় মাঠ

পাহারা দেয় এবং গঙ্গির মাকে সঙ্গে নিয়ে ধান কাটে। 'হাভাতে' (১৯৭৯) গল্পে রামকুমার মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বামুন বাড়তে থাকায় যজমানরা চাল কমিয়ে দেয়, পরিণামস্বরূপ জীবিকায় সংখ্যাধিক্য হওয়ায় টেলু ঠাকুরকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অন্য জীবিকা গ্রহণের কথা ভাবতে হয়। সামর্থ্য না থাকায় টেলু ঠাকুর মেয়ের গাঁঘরে বিয়ে দিতে পারেনি, তার কাছে রেডিও ঘড়ি বাইক অঙ্গুরি নগদ টাকা না থাকার মূল্য ছিল নিজের মেয়েকে দূরদেশে বিদায় দেওয়া। টেলু ঠাকুর কঠিন পরিস্থিতিতে রুক্ষ মেজাজের হয়ে গেলেও তার অন্তরে পিতৃত্বের ক্ষরণ হতে দেখি ছেলে ডিংলেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার যাত্রাপথে – "এমনিতেই লোকের কাছে ছেলে রেখে আসতে মনটা কেমন গুমরোয়... সূর্য যত মাথা থেকে যত ঢল পড়ে তত মুষড়ে পড়ে টেলু ঠাকুরের মনটা।" [৭] ডিংলে আগামীদিনের হাভাতদের প্রতিনিধি হয়ে আবেগকে নিয়ে নয়, অস্তিত্বের লড়াইকে গ্রহণ করেছিল, তাই তার পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতায় হাজার হাভাতেদের সাথে মিশে গিয়েছে। শুধু ডিংলে নয়, বাঁচার তাগিদে কেউ শহরে পাড়ি দিয়েছে আবার গ্রামে থেকে কেউ অন্য জীবিকা গ্রহণ করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

'পেয়ারাবুড়ো পান্তা বুড়ি' (১৯৭৯) গল্পে পেয়ারাবুড়ো পাঁচনয়া দশনয়া করে পেয়ারা বিক্রি করে এবং পান্তা বুড়ি গুগলি শামুক কুড়োনো,কখনো লোকের ঘরে কাজ আবার কখনো ধানের শিষ কুড়িয়ে দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতো। কিন্তু এই বৃত্তি নিয়ে সারাবছর পেট চলতো না, তাই মাঘ মাস পেরোলেই দুজনেরই মাঙ্গা ভাতের পেট। যেখানে কীর্তন পেয়ারা বুড়ো পান্তা বুড়ি জামবাটি হাতে নিয়ে পৌঁছে যেত। বয়সজনিত কারণে অসহায় মানুষগুলির অন্য বৃত্তিকে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না কিন্তু এই মাঙ্গা ভাতের পেট নিয়ে তারা স্বপ্ন দেখতো গ্রামের পুকুর, জমি জমা, গাছ পাতাতে অন্যদের মতো তাদেরও অধিকার আছে। এই স্বপ্ন অবলম্বনহীন মানুষগুলির মধ্যে সানন্দে বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে জাগিয়ে রাখে। 'সম্প্রসারণবাদ' (১৯৮০) গল্পে নিতাই তার পিতার বংশপরম্পরায় চলে আসা কৃষিকর্ম ত্যাগ করে সিমেন্টের ব্যবসা শুরু করেছে, একটা নার্সিংহোমও খুলবে। নিতাই জানে যুগোপযোগী বৃত্তি ধারণ না করলে হারিয়ে যেতে হয়। তাই গ্রামের সকলে তার নার্সিংহোম খোলার পরিকল্পনাতে হাসাহাসি করলেও সে জানে দুদিন পর তারাই চিকিৎসার জন্য ঠিকই আসবে এবং তার মুনাফাও হবে। অন্যদিকে কালাচাঁদকে গাঁয়ে খাকি জামা পেটে তকমা এঁটে হাতে লাঠি নিয়ে রাত্রে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে হয় এবং দিনের বেলায় চাষের কাজ মাঠের কাজ করে। কিন্তু বর্তমান দিনে কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই তাই কালাচাঁদ যখন সারা বছর কাজের কথা শুনে আনন্দে ভেতরটা তার নেচে উঠে। 'দায়বদ্ধ' গল্পের নেতাইয়ের মনও আনন্দিত, সে ব্যাংকের কাছে ধার নিয়ে বলদ কিনেছে। এতদিন সে লোকের হালে জমি চাষ করতো, এখন নিজের বলদ আছে, সে স্বপ্ন দেখে—"গোরু থেকে হাল- হাল থেকে জমি- জমি থেকে মরাই-মরাই থেকে বস্তা বস্তা ধান আর ধান থেকে বউয়ের

রঙের কাপড়, ফুলুম তেল, বাস সাবান আর যশুরে খরখরে চিরুনি।"[৮] সমাজে কুলবৃত্তির প্রভাব প্রতিপত্তি বর্তমান দিনে কীভাবে হ্রাস হয়েছে তা দেখা যায় 'সম্পর্ক' নামক ছোটোগল্পটিতে। সেখানে বিপলে ঠাকুর অভাবে তাড়নায় মাটি কাটতে গেলে তাকে তেলেরা ঠাকুর মাড়োতে উঠতে দেয়নি। অন্য জীবিকা ধারণ করার জন্য সমাজ তথাকথিত উচ্চপদ থেকে বহিষ্কৃত করেছে। সমাজে কুলবৃত্তিগত প্রভাব যেমন হ্রাস পেয়েছে অপরদিকে অর্থনৈতিক বিত্তশালিদের প্রতিপত্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষরা সাধারণ মানুষদের জীবিকার উপরে থাবা বসিয়েছে বা কখনও বৃত্তিজনিত সংকট তৈরি করে সাধারণ মানুষকে সর্বদা তটস্থ রেখেছে। পুলিশ বাহিনীকেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করতে দেখি 'মডেল' (১৯৯৬) নামক ছোটোগল্পে। পুলিশের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে আন্না ফুল ব্যবসা ছেড়ে মিলিটারিতে যোগদান করেছিল। আন্না যে অতীতের কথা পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি দলকে শুনিয়েছে, সেখান থেকে জানা যায় – তার যখন পাঁচ ছয় বছর বয়স সেইসময় খরার জন্য হাল গোরু বিক্রি করে তার বাবা পরিবার নিয়ে শহরে পাড়ি দেয় এবং শহরে কাঁচ কারখানাতে কাজ করে দিনপাত করতেন। কারখানা বন্ধ হতে তার বাবাকে আবার জীবিকার পরিবর্তন আনতে হয় এবং গ্রামে ফিরে এসে কাঁচা আনাজের ব্যবসা শুরু করে।

বর্তমান সময়ে পাল্টে যাওয়া জীবনযাত্রা জীবিকাতে কীভাবে সংকট তৈরি করেছে তা দেখা যায় 'জ্যোতিষী' (১৯৮১) গল্পে। সাধুচরণ তার পিতার কাছ থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দীক্ষা নিয়েছিল বর্তমানে মাদুলির কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন ওঠায় গ্রামের মানুষজন শহরের ডাক্তারের দিকে ঝুঁকেছে। আগে মানুষ তার দাদুকে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করতো, তার বাবাকে ধার দেনা হলে কথা শোনাতো কিন্তু তার বেলায় তো কাপড় খুলতে দ্বিধা করছে না। তাই শেষ পর্যন্ত সাধু মাদুলির ব্যবসাকে পরিবর্তন করে স্টোনের নতুন দোকান খুলতে বাধ্য হয়। 'রঙ' (১৯৯৪) গল্পেও দেখি অজিত কামারের তৈরি মাদুলির বর্তমান দিনে কদর না থাকায় তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অজিত তার পৈতৃকসূত্রে পাওয়া জীবিকাকে ধরে রেখেছে, একইসাথে সে তেলিপাড়াতে জন খেটেছে, বিজন ছুতোরের ঘরে ঠাকুর গড়েছে, গোরুর চাকা করেছে। শেষে রঙের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যকে চিনে নিয়ে প্রতিমা গড়ে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে। একই পরিবারে প্রজন্ম অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করতে দেখি 'মৌজা ডোমপাটি' (১৯৯৩) গল্পে। বিনোদ ডোম কুড়ঁচির মালা ঘরে গেঁথে বিক্রি করে, তার ছেলে যাত্রা দলে ফুলুট বাজায়, দুই নাতি দিনের বেলা জমিতে খাটে ও রাত্রে লোকজনের মাথায় লাঠি তুলে ছিনতাই করে। বিনোদ একসময় বিয়ে, পইতে, মুখেভাত, যাত্রা, গাজনে ফ্লুট বাজাতো। দশ-পনেরো বছর আগে পর্যন্ত বিনোদের নাম ডাক ছিল কিন্তু বর্তমান দিনে মাইক, ভিডিও, বক্স গানের চাহিদা বিনোদের জীবিকা ও শিল্পসত্তাকে সংকটের সম্মুখীন

করে। ফলস্বরূপ বেঁচে থাকতে বিনোদ বৃত্তি পরিবর্তন করে এবং জামকুঁড়ির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে বিভিন্ন পেশাধারী সাধারণ মানুষদের কথা শুনিয়েছেন, 'কর্ণ' (১৯৮৭) গল্পে দেখি স্বল্প পরিসরে একজন ভিখারির জীবনের একটি ছোট অধ্যায়কে ব্যক্ত করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র কেনো উপলব্ধি করে দিনে দিনে ভিক্ষার প্রতিযোগিতা বাড়ছে। অন্ধ, খোঁড়া, বুড়ো, পোড়া, বোবা সবাইকেই সামাল দিতে হয়, আবার সাথে ঢুকেছে শনিপুজো, বাউল, বাপ-মা মরা, গোরুমরা। রাস্তার উপর ছবি আঁকা ভিখারি, শিবের গাজন,তারকেশ্বরের ভিখিরি শুধু নয়, উত্তরপ্রদেশ বিহার থেকে আসা ভিখিরিরা কলকাতার হাভাতেদের সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করে। কেনো তাই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, তাই সে পসার বৃদ্ধি করতে উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিন কলকাতাতে পাড়ি দিয়েছে। কলকাতা শহর তার সীমানা ছড়াচ্ছে তাই সে বেঁচে থাকতে যেখানে প্রতিযোগিতা কম কিন্তু পয়সা বেশি সেই এলাকাতে পৌঁছে গিয়েছে ও শহুরে আদব কায়দাকে গ্রহণ করে ইংরেজি বুলি বলে মাসে দুশো টাকা রোজগার করেছে। জীবন সংগ্রামে আর্থিক ও মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়া মানুষগুলিকে গল্পকার পুনরায় নতুনভাবে জগত ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নবজন্ম ঘটিয়ে কিভাবে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তা দেখা যায়, 'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা' (১৯৮৫)গল্পে। বনমালী ইহজগত থেকে অনেকখানি উপরে তালগাছে উঠে জীবনের পার করে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করেছে, দু-মুঠো ভাতের জোগাড় করতে চাষের কাজ করেছে, শীতে খেজুর গাছে রস দিয়েছে, মহল্লা করেছে, খিচুড়ি বানিয়েছে, লোকের গোরু আবাদ করিয়েছে, তুলসীর মালা পরে হরিনামে খোল বাজিয়েছে এমনকি চুরিও করেছে , জুয়া খেলে বড়োলোক হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু তার ভাগ্য ফেরেনি। হাত দুটো ছেড়ে দিলেই সব কিছু থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা দমকা হওয়া বইতেই বনমালী বেল্লোটাকে শক্ত করে ধরে নেয়, সে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। বনমালী বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে এবং তালপাতা গুলো ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যায়। লড়াই যে জীবনের প্রতিনিয়ত সঙ্গী, বেঁচে থাকতে হলে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে চারপাশের জগত ও মানুষগুলোর সাথে জীবনকে উপভোগ করতে হবে তাই অবলম্বনহীন মানুষগুলো নিজের অসহায়তাকে স্বীকার করে নিয়ে আনন্দে সমাজে প্রচলিত রীতি নীতিগুলি মেনে চলে, মেয়ের পিতা কন্যাপণের দায়ে মাইক, গান, বাজনা, উলু, দই, মিষ্টি, হাসি ঠাট্টা হুল্লোড়ের মধ্যে 'পরিবর্তনকামী সর্বহারা থেকে পরিবর্তিত গরিবে' পরিণত হয়। 'হস্তান্তর' (১৯৯১) গল্পে তাই শেষ পর্যন্ত সুবলও তার জমিকে বিক্রি করে মদনের সাথে তার মেয়ের বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করে ফেলে। পুনরায় সে নিঃশব্দে জমি হারিয়ে ফেলে, যে জমির জন্য জেল খেটেছে সেই জমিকে সে তুলে দেয় মদন নন্দীর হাতে। কিন্তু জমি নিয়ে হাঙ্গামা হারিয়ে দেয় সুবলের শিল্পীসত্তাকে। আগে সে কিষ্টযাত্রার, মনসার ভাসান, গাজন,

পিচযাত্রার গান বাঁধত, গানের সাথে নাচত, সঙ সাজতো। সন্ধ্যের সময় সুবলের বেহুলার গানের সুরে উত্তরপাড়ের দিঘি গাঙ্গুড় হয়ে উঠতো। কোর্টের অর্ডার সুবলকে জমি থেকে উচ্ছেদ রদ করে কিন্তু সবকিছুই বদলে দেয়। 'শরীরের ভাঙ্গা-গড়া' (১৯৯৪) ছোটোগল্পে দেখা যায়, যে সন্ন্যাসী বেলাড়া সিনেমা হলের গেটকিপার ছিল, গায়ে খাকি পোশাক চাপালেই গ্রামের লোকজন চৌকিদারের আগমনে ভয়ে তটস্থ থাকতো, বর্তমানে 'খাকির দাম' একেবারেই না থাকায় পঞ্চায়েতে চা বওয়া আর বাড়ি-ঘরের ট্যাক্স আদায়ের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। সূর্য ডুবলে গাঁয়ের 'কুচো' ছেলেগুলোর মুখে শব্দ থাকতো না, সন্ন্যাসী দফাদারের নাম শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো হতো, কিন্তু এখন গ্রামে টিভি আসার পর ছেলেদের ঘুম উড়ে গেছে, চৌকিদারের লাঠিকে ভয় পাই না।

স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতার বিষবীজ যে শুধুই শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, গ্রামগুলিতেও ধীরে ধীরে গ্রোথিত হওয়ায় পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছে, গ্রামগুলি পরিণত হয়েছে একেকটি পাড়াতে। 'আমাদের গ্রাম' (১৯৯৬) নামক গল্পে দেখা যায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখন আর একসাথে খেলে না, পাঠশালায় যায় না। এমনকি আম গাছ জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় আত্মীয়ের মত মিলেমিশে থাকে না। গ্রামের ছোট ছোট ঘর এখন অনেক পাড়াতে রূপান্তরিত হয়েছে, বামুন পাড়া, তেলি, কামার, কুমোর পাড়া এবং হাঁড়ি, বাগদি, ধোপা, ডোম পাড়া। বামুনপাড়ার মানুষ আলুভাজা, বেগুন ভাজা, মুগের ডাল মাখা ভাত, আবার তেলি পাড়ার মানুষ লাউঘন্ট, পুঁটি মাছের ঝাল, শোলের অম্বল দিয়ে উদরপূর্তি করে তখন মুচিপাড়ার মানুষরা চালের আকালে অনাহারে দিন কাটায়। মানুষদের চেনা পরিসর যত বৃহৎ হয়েছে, ততই মনের সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'দেবস্থল' (১৯৯৪) ছোটোগল্পে দেখা যায়, পূর্ববর্তী মহন্ত রামনারায়ণ গ্রামের মানুষদের সুখ-দুঃখের কাহিনি শুনতো, ঘর সংসারের খবর নিত, কিন্তু পরবর্তী মহন্ত অযোধ্যানারায়ণকে ব্যবসায়িক ভোগবাদী মানসিকতা গ্রাস করেছে। রাস্তা জুড়ে মিঠুন সহ বোম্বের নায়ক-নায়িকাদের পোস্টার, উড়ন্ত বেলুন, ফানুস, অরুন গ্রোভিলের ভঙ্গিমাতে জগু সর্দারের ছেলে মাধোর কাঁধের উপর খড়্গ তুলে ঘুরে বেড়ানো, কারো কারো রাতে রোদ চশমা ব্যবহার– গ্রাম্য জীবনে শহুরে আদব কায়দাকে অনুকরণ করার প্রয়াসকে চিহ্নিত করছে। 'দিনে দিনে গাঁয়ের স্বর' বদলে যাওয়া রূপকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পের পরিসরে বারেবারে নিয়ে এসেছেন এবং পাঠক কাহিনির বুননে পরিবর্তিত গ্রামবাংলার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হয়েছে। পূর্বে গ্রামবাংলার মানুষের পৌষের ধান কাটা শেষ হলে আষাঢ় পর্যন্ত কোন কাজ ছিল না। বউরা আগে শুধু ছেলে লালন-পালন করতো, আবার ছেলের সংখ্যা কম ছিল না, বর্তমানে দুটি ছেলে হলেই কর্তারা 'হাত জোড়া' বলে দিচ্ছে। ঘরের মেয়েরা ধান সিদ্ধ করে, সেই ধান থেকে চাল করে বিষ্ণুপুর আরামবাগে রাহা কোম্পানির বাসের মাথায় চেপে চালান হচ্ছে। যে টাকা আসছে সেই টাকা 'ম্যাচলেস সেভিং কোম্পানি' চারবছরে ডবল করে দিচ্ছে। "মাঠে শ্যালোর ভচর-ভচর, রাস্তায় মোটর

বাইকের ভটর-ভটর, বাস রাস্তার মোড়ের গুমটিতে টেপ-এর ঝমাঝম।... তুলসীর মালা ছেড়ে ছোকরারা গলায় সব গোল্ড ওয়াশের আড়কাঠ ঝোলাচ্ছে।" [৯] সময়ের সাথে গ্রামবাংলার এই পরিবর্তন গ্রাম্য মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করেছিল। 'লাঙ্গলী'(১৯৯৩) ছোটোগল্পে কিষ্ট বৈরাগী, জনার্দন হাজারী, ভূষণ, মুসলমান গেঁড়া - সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী চরিত্রগুলির জীবন আধুনিকতার স্পর্শে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে গল্পকার তা তুলে ধরেছেন। জনার্দন হাজারী গ্রাম ত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছে বোম্বাই, পাঁচগুণ টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে সিল্কের পাইকারি ব্যবসায় নেমে পড়ে। কীর্তন গাওয়া, নবদ্বীপ-মায়াপুর-তারাপীঠ-পুরীতে তীর্থ করতে নিয়ে যাওয়া, বিয়ে- শ্রাদ্ধে বাজারের মিষ্টি দোকানে ভিয়েন করা প্রভৃতি কাজগুলো নিয়ে এতদিন কিষ্ট বৈরাগী দিনযাপন করেছে, এরপর সে ছেলের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎের কথা ভেবে বোষ্টম হয়েও চাষি হয়েছে। সে নিজে লাঙ্গলের বোঁটা ধরতে পারবে না, তাই সে ভূষণ ও গেঁড়াকে নিয়ে কাজে নামে। কিন্তু তারা একটা সময় কাজ করতে অস্বীকার করলে কিষ্ট নিজে লাঙ্গল হাতে নিয়ে মাঠে নামে। 'গাঁয়ের ঐতিহাসিক জাতিভিত্তিক বিন্যাসটি বদলে দেওয়া বড়ো কঠিন কাজ' হলেও গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক টানাপোড়ন সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালকে শিথিল করেছে। দিন বদল জনার্দন হাজারী, ভূষণ, কিষ্ট বৈরাগীর জীবনকে শুধু প্রভাবিত করেনি, 'সখিনা' (১৯৯৩)গল্পে দেখি, গৃহস্থ বধূদের জীবনেও এসেছিল 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'। সখিনা আর মজিদ মালা গেঁথে সংসারের হাল ধরেছে, আই আর ডি পি-র থেকে বারাশো টাকা লোনের ব্যবস্থা করেছে, বিষ্ণুপুরের ব্যবসাদাররা গাঁয়ে এসে মালা নিয়ে যায়। শুধু সখিনা নয়, সখিনার কাছ থেকে শিখে গাঁয়ের পঁচিশ- তিরিশ ঘর বেলখোলার কাজ করে। সখিনা মজিদের জন্য হলুদ টেরিকটের পাঞ্জাবি, গ্যাস লাইটার এনে দিয়েছে। সংসারের খরচও চালায় সখিনা, একদিন মজিদ খাটতে না গেলে ভাত জোটার চিন্তা করতে হয় না। কিছুদিন পর সরকারি, ব্যক্তিগত বেলখোলাতে টান পড়লে মহিলারা কাজ থামিয়ে দেয়নি, তাদের কর্মোদ্যম শেষ হয়ে যাইনি। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছ থেকে লোন নিয়ে কলকাতা থেকে মাল আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কলকাতা থেকে বস্তা বস্তা বেল-খোলা আসে, বিশ- তিরিশ সংসারের মেয়েদের যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়।

উল্লেখিত ছোটোগল্পগুলি ছাড়াও তাঁর গল্পসমগ্রের 'বউ,মেয়ে,অ্যালসেশিয়ান ও পাইপ','গোষ্ঠ', 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি', 'নিত্যগোপালের প্রত্যাবর্তন', 'সাক্ষীগোপাল', 'ঝুলঝাড়ু' সহ অনেক গল্পের মধ্যে সাধারণ মানুষের বৃত্তিজনিত সংকট ও পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া গ্রামজীবনের কথা উঠে এসেছে। কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে যে ছবি এঁকেছেন তা আমাদের পরিচিত গ্রাম বাংলার দৈনন্দিনতার ছবি। তারপরেও বলতে হয় "চেনা জগতে চেনা মানুষে আর কী বিস্ময়, চেনা জীবনেও বিস্ময় কোথায়, কিন্তু রামকুমার এক পরিশ্রমী গ্রামীণ পরিবারের তিনপুরুষের আখ্যান

যে ভাবে রচনা করেন, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়। মনে হয় অচেনা এক পৃথিবীর গল্প বলতে বসেছেন রামকুমার।”[১০] এই চেনা মানুষগুলির জীবন সংগ্রামকে তাঁর সাহিত্যে সহানুভূতির জন্য স্থান দিয়েছেন এমনটা নয়, লেখক বিশ্বাস করতেন, পুঁজিবাদ সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে তা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হবে না। গাঁয়ের দিবাকর বাঁড়ুজ্জের কথা স্মরণ করে লেখক জানিয়েছেন যে ‘বন্দুক হাতে নিয়ে দুপ্রহর রাতে রাস্তার দিকে তাক করে বসে থাকত, সে মানুষটার বন্দুক দেওয়ালে দাঁড়িয়ে কিন্তু মানুষটি খাটের নিচে গড়িয়ে গেছে। এমনভাবেই একদিন পুঁজিবাদও গড়িয়ে খাটের তলায় চলে যাবে। এই লড়াইয়ে টিকে থাকবে সেই মানুষগুলো যারা শোক আর আনন্দ, সুখ আর দুঃখকে সামাল দিতে জানে। ‘সভ্যতার ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত মধুসূদন বিশ্বাস, মটরমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাসের ছাদে বৃন্দাবনে মজে থাকা পরযায়ী ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্রমিক, প্রান্তিক চাষিদের কথাই লেখা থাকবে। কারণ তারাই জানে এ জীবন লইয়া কী করিব, এ জীবন লইয়া কী করিতে হয়।’[১১]

তথ্যসূত্র :

১। চন্দ্র, বিপান, *অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কে পি বাগচী কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫।

২। ঘোষ, বিনয়,*বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ অক্টোবর ২০২০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩।

৩। ঘোষ, বিনয়, *বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ অক্টোবর ২০২০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১।

৪। পাল, শ্রাবণী, *পরিবর্তমান গ্রামসমাজ: গল্পকারদের ভাবনা(১৯৭৭-২০০৭),* প্রাককথন, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩।

৫। পাল, শ্রাবণী, *পরিবর্তমান গ্রামসমাজ: গল্পকারদের ভাবনা ১৯৭৭-২০০৭,* রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩।

৬। পাল, শ্রাবণী, *পরিবর্তমান গ্রামসমাজ: গল্পকারদের ভাবনা ১৯৭৭-২০০৭,* রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪।

৭। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, হাভাতে, *গল্পসমগ্র,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪।

৮। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, দায়বদ্ধ*, গল্পসমগ্র,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪।

৯। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, লাঙ্গলী, *গল্পসমগ্র,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৫।

১০। মিত্র, অমর, নিরন্তর পরিক্রমা, *রামকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯।

১১। মল্লিক, দীপঙ্কর, ও মল্লিক, দেবারতি, *রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কথাযাত্রার তিন দশক,* দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৭।

বিজ্ঞাপনে নারী ও বিজ্ঞাপিত নারী : নারীবাদী পটভূমিতে একটি আলোচনা

প্রণব ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার: নারীবাদ জ্ঞানচর্চার জগতে একটি বিতর্কিত ও বহু চর্চিত বিষয়।এটি নারীর সমানাধিকার অর্জনের জন্য পুরুষতন্ত্রের মোড়কে লালিত-পালিত হয়ে আসা পুরুষদের আধিপত্য থেকে নারীদেরকে মুক্ত করতে চাই।এক্ষেত্রে নারীগণ চর্চার কেন্দ্রেতে থাকলেও সমাজের মূল স্রোত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি ভিন্নতার ভিত্তিতে নারীরা বিভিন্ন পরিসরে বঞ্চিত ও অবদমিত। নারীদের প্রতি বঞ্চনা ও অবদমনের পরিসরগুলির ভিন্নতা হেতু, এর থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় গুলিও ভিন্ন ভিন্ন। নারীদের সমাজের মূল স্রোতে প্রবেশ করানোর জন্য নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন। সেই কর্মসূচির অন্যতম হলো লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো। গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল বিজ্ঞাপন। লিঙ্গবৈষম্যের প্রতি সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য গণমধ্যমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদী বিশ্বে লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য সূচিতে পরিণত হলেও বিজ্ঞাপনে নারী পুরুষের পৃথক বিপরীত ধর্মী নেতিবাচক উপস্থাপনের ফলে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টি আরও বেশি সুদৃঢ় হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন হলো বিজ্ঞাপনে লিঙ্গভিত্তিক সমতার ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদি কাঠামোবদ্ধ ধারণা থেকে বেরিয়ে সচেতন সমাজ গড়ে তোলা।

মূলশব্দ: নারীবাদ, পুরুষতন্ত্র, সমতা, লিঙ্গবৈষম্য, গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, পুঁজিবাদ।

মূল আলোচনা:

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জ্ঞানচর্চার জগতে একটি বিতর্কিত ও বহু চর্চিত বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে, যেটি নারীবাদ নামে পরিচিত। নারীবাদ বলতে বোঝায় এমন এক আন্দোলনকে যেখানে নারীর সমানাধিকার অর্জনের জন্য পুরুষতন্ত্রের মোড়কে লালিত-পালিত হয়ে আসা পুরুষদের আধিপত্য থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে চাই।এক্ষেত্রে নারীগণ চর্চার কেন্দ্রেতে থাকলেও সমাজের মূল স্রোত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত করে সমাজের মূল স্রোতে নারীদের ফিরিয়ে আনতে নারীবাদের উদ্ভব ঘটে। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক লিঙ্গ বৈষম্যহীন

সমাজ তৈরি করা, যে সমাজে নারীরা তাদের একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি ভিন্নতার ভিত্তিতে নারীরা বিভিন্ন পরিসরে বঞ্চিত ও অবদমিত। নারীদের প্রতি বঞ্চনা ও অবদমনের পরিসরগুলির ভিন্নতা হেতু, এর থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় গুলিও ভিন্ন ভিন্ন। সে কারণে বিভিন্ন প্রকারের, যথা- উদারপন্থী, আমূল পরিবর্তনকামী,মার্কসীয়,সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি নারীবাদের উদ্ভব ঘটে। যদিও সকল নারীবাদী ধারা গুলির মূল লক্ষ্য হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। তবে এই সাম্য প্রতিষ্ঠার অর্থ পুরুষতন্ত্র থেকে নারীতন্ত্রের উত্তরণ নয়, বরং এদের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানবতায় উত্তোরন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় শিক্ষা, কর্ম, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। এছাড়াও পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইনগত ব্যবস্থা এবং অবশ্যই গণমাধ্যম।

পুরুষতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক কাঠামোর এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে নারী পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, নিপীড়িত হয় এবং শোষিত হয়। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর '*The Origin of the Family, Private Property and the State*' গ্রন্থে। তাঁর ভাষায়, 'পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় সেদিনই ঘটে যেদিন মাতৃসত্তা হেরে যায়। পুরুষের হাতে চলে যায় গৃহস্থালির কর্তৃত্ব; ক্ষুন্ন হয় নারীর মর্যাদা এবং সূচনা হয় নারীর দাসত্বের।' পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর গৃহস্থালি কর্মগুলির ক্ষেত্রে সমগ্র শ্রম পারিশ্রমিকহীন হয়ে থাকে। আবার এই গৃহস্থালীর কর্মই যখন অর্থনৈতিক লেনদেনের ভিত্তিতে, যথা: লন্ড্রি, রেস্তোরাঁ প্রভৃতির সামাজিক মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সাথে যুক্ত হয় তখন তা পুরুষের আধিপত্যের মধ্যে চলে আসে। এইভাবে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে এবং বাইরের জগতে উভয় ক্ষেত্রেই নারীর কর্মের প্রান্তিকীকরণ ঘটে। এই প্রসঙ্গে সিলভিয়া ওয়ালবি বলেছেন,

> "I shall define patriarchy as a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women... patriarchy needs to be conceptualized at different levels of abstraction... At a less abstract level patriarchy is composed of six structures: the patriarchal mode of production, patriarchal relation in paid work, patriarchal relations in the state, male violence, patriarchal relations in sexuality and patriarchal relation in cultural institutions."

নারীদের প্রান্তিকীকরণের ক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে সমাজের মূল স্রোতে প্রবেশ করানোর জন্য নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন। সেই কর্মসূচির অন্যতম হলো লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান। লিঙ্গ বৈষম্য হলো এমন একটি

সামাজিক ঘটনা যেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হয় না। বরং এখানে একটি লিঙ্গ অপর একটি লিঙ্গের চেয়ে উচ্চমানের এই ধারণা পোষণ করা হয়; যেটি নিয়মিতভাবে নারী ও মেয়েদের প্রভাবিত করে। পুরুষতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে সমাজ নির্মিত এই লিঙ্গ বৈষম্য, যা নারী ও পুরুষের কাছ থেকে পৃথক পৃথক আচরণ প্রত্যাশা করে। এই আচরণের ভিত্তিতে পুরুষের বিপরীত গুণগুলি নারীর চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুকূলে মেয়েলি করে গড়ে তোলে, যা তাকে প্রান্তিক করে রেখে দেয়। এই প্রান্তিকীকরণের অবসান ঘটিয়ে তাকে মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য মুল স্রোতের মধ্যেই বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যার অন্যতম হলো সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। মেরি উলস্টনক্রাফট- এর *'A Vindication of the Rights of Women'* (1792) গ্রন্থটিতে ভোটাধিকার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার চিন্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এখানে দেখা যায় নারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের প্রতি হওয়া বঞ্চনা ও অবদমনকে মেনে নিতে আর রাজি হয়নি। তাই জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন,

> 'But, it will be said, the rule of men over women differs from all these others is not being a rule of force: it is accepted voluntarily; women make no complaint, and are consenting parties to it. In the first place, a great number of women do not accept it. Ever since there have been women able to make their sentiments known by their writings..., an increasing number of them have recorded protests against their present social condition and recently many thousands of them...'

নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে শ্বেতাঙ্গ, শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত নারীদের সমস্যাগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করলেও কৃষ্ণাঙ্গ, নিম্নবিত্ত নারীদের সমস্যাগুলি নারীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সার্বজনীন নারীসত্তার পরিচিতির পরিবর্তে নারী অভিজ্ঞতা ও সমস্যা গুলির স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীবাদী আন্দোলন পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে দেখা যায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারীর সমস্যাগুলি ভিন্ন ভিন্ন। আর এই ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার জন্য সব সমস্যার সমাধানের একটিই পথ গ্রহণযোগ্য নয়। সেই কারণে নারীবাদী আন্দোলনে দেখা দিল বহুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা। এর ফলে নারীবাদী প্রতিবাদগুলি বর্ণভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক ইত্যাদি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের নারীর নিজস্ব বঞ্চনার অভিজ্ঞতায় নারীবাদ সমৃদ্ধ হতে লাগলো। এই প্রসঙ্গে বলা যায়,

> 'This is to say that it traverses the classifications of second web feminism that are so prominently present in mainstream gender studies teaching practices as well as the post-feminism that was featured in the academy and popular culture in the 1990s... A third wave feminist theory is neither an equality feminism not a difference feminism not it is a deconstructive feminism. It is neither feminist empiricism nor a feminist standpoint theory nor a feminist postmodernism. Third wave feminist theory extends across these classes by affirming their existence (not negating them), while simultaneously shifting them.'

বিজ্ঞাপন বা ইংরেজি প্রতিশব্দ 'advertising' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'adverter' থেকে এসেছে যার অর্থ হল আবর্তিত বা ঘোরানো। আবার অনেকে বলেন এটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ 'advertir', যেটির বাংলা তরজমা করলে পাই, 'দেখানো' থেকে মধ্যযুগীয় ইংরেজি 'advertisen' হয়ে 'advertising' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞাপন শব্দটির বাহ্যিক রূপের মধ্যেই তার স্পষ্ট অর্থ নিহিত, যেখানে একটি বিপণন কৌশলের মাধ্যমে যেকোনো পণ্য বা পরিসেবাকে গ্রাহকের নিকট সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন বা জ্ঞাপন করার কৌশল নিহিত থাকে। সাধারণভাবে বলা যায়, পণ্য বা পরিসেবার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বিজ্ঞাপন পরিবেশিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই পরিবেশন বা জ্ঞাপন করবে কে?

জ্ঞাপন বা পরিবেশন শব্দটির সাথে নারীর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে এই পরিবেশনে নারীর ভূমিকা কি? তাঁর রূপের মধ্যেই কী এটি সীমাবদ্ধ? এবং বিজ্ঞাপনে নারীর সুসজ্জিত হওয়ার ইতিহাসের সূত্রপাত কোথায়? যে ইতিহাসের চর্চা করতে তথাকথিত বাঙালী সমাজ তথা সমগ্র ভারতবাসী উদগ্রীব। ১৮৩৫ সালে মেকেলের শিল্প প্রস্তাবের পর ভারতের জনজীবনের উপর ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যার ফলে উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনার আবহমান ধারায় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এবং সেই আলোকে আলোকিত হয়ে তথাকথিত সমাজ মনে করে যে সে শিল্পমনস্ক।

বিজ্ঞাপন যে আজ মূল কলা শিক্ষার অংশীদার তার মূল কারণ হলো শিল্প। এই শিল্পের সূচনা হয়েছিল ইংরেজদের হাত ধরে। এই ইংরেজদের জন্যই বিজ্ঞাপন তার সূচনা লগ্ন থেকে আজ অব্দি জনসমক্ষে আসতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষে এই ইংরেজদের হাত ধরেই সূচনা হয়েছিল মেকানিক ইনস্টিটিউট-এর। জাগতিককালে নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে সেটি আজ রূপান্তরিত হয়েছে 'গভমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট' (Govt College of Art and Craft) অর্থাৎ সরকারি চারু ও কারুকলা

মহাবিদ্যালয় নামে।এই মহাবিদ্যালয়ের হাত ধরেই আজ বিজ্ঞাপন চর্চা মূল শিল্পের অঙ্গ হিসাবে চর্চিত। শুধুমাত্র এই মূল শিল্পচর্চায় নয়, এই শিল্প ইতিহাসটি বিজ্ঞাপন ও নারী সত্তার সঙ্গে একই সূত্রে মালা হয়ে অবস্থান করছে।

বিজ্ঞাপন জগতে নারীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ১৮৮০ দশকে সেই সময় বিজ্ঞাপনগুলি হতো অক্ষর (text) ভিত্তিক, যেখানে নারীর কোন প্রতিচ্ছবি ব্যবহারিত হতো না। বিজ্ঞাপিত সামগ্রীটির একটি গঠন চিত্র অঙ্কিত থাকতো এবং সেই সমস্ত বিজ্ঞাপনগুলি হতো নারীদের সৌন্দর্যের সামগ্রী বিষয়ক, যেমন- সুগন্ধি আতর, সাবান, জবা কুসুম তেল ইত্যাদি। পরবর্তীতে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হলে বিজ্ঞাপনের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায় ১৮৯০ এর দশকে যদিও এই সময় ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনে ক্যামেরার প্রচলন ছিল না। বরং ১৯১০ সাল থেকে মহিলাদের ছবি লক্ষণীয় হয়। কেবলমাত্র বাজার ধরার জন্যই মহিলাদের ছবির চিন্তিত করা হতে থাকে। হাউস এন্ড গার্ডেন, লেডিস হোমস জার্নাল প্রভৃতি বিজ্ঞাপনে নারীকে ঘরকুনো হিসেবে দেখানো হয়।বিজ্ঞাপন দ্বারাই নির্ধারিত হতে থাকে নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থান। বিজ্ঞাপনে নারীকে উপস্থাপন করা হতে থাকে পণ্য, যৌন উদ্দীপক, ঘরকুনো, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদির প্রতীক হিসাবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর দেহসর্বস্ব শরীরকেই মুখ্য হিসেবে উপস্থাপনা করা হয়। যেমন বর্তমান সময়ে একটি 'নিরোধ' বিজ্ঞাপনে একজন যৌনকর্মী অভিনেত্রীকে অভিনয় করতে দেখা যায়। এই নিরোধ কিন্তু নারীকে ভোগ করতে এবং পুরুষের মনোরঞ্জনের সহায়ক। যদি আমরা বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব বর্তমান এই একবিংশ শতাব্দীতেও পুরুষের ভোগ্যবস্তু সেই নারী। অতএব সমাজ তথা বিশেষত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নারীকে কেবলমাত্র দ্রব্যের উপস্থাপক হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পুরুষকে উপস্থাপন করা হয় কর্মঠ, স্বাধীন, শক্তিশালী ও সফল মানুষ হিসাবে। তাদের শারীরিক ভঙ্গি থাকে নিয়ন্ত্রণমূলক। শুধু তাই নয় নারী চিরন্তন যুবতী হোক এটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাম্য, যদিও নির্ভরশীল থাকবে তারই উপর।

প্রাচীন কাল থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেদিন থেকে ব্যক্তিগত সম্পদের উদ্ভব হয়েছে সেই দিন থেকেই নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করেছে এবং সমাজে পরাশ্রয়ী হিসেবে পরিচিত হতে থেকেছে। বর্তমান সময়েও সেই পরাধীনতার অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা বস্তু বা পণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বেটি ফাইড্রান তাঁর '*The Feminine Mystique*' গ্রন্থে বলেছেন পুঁজিবাদী সমাজে নারী শুধু পণ্যই নয়, পণ্যের প্রধান বক্তা ও বটে আরো ভালোভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞাপনে নারীরা শুধুমাত্র পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছেন না।পর্নোগ্রাফির মাধ্যমেও নারী দেহকে পণ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে ফলে বিজ্ঞাপনে নারীদের নেতিবাচক প্রচারের সাথে সাথে বর্তমান যুগের সহজলভ্য ইন্টারনেট যুগে পর্নোগ্রাফি সুলভ ডিজিটালাইজেশনের ফলে নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্য বস্তুরূপে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিফলিত করছে। ফলে একজন কিশোরের মনে অবচেতনভাবে

নারী সম্পর্কে হেয় মনোভাব গড়ে উঠছে। যেটি তার পরবর্তী সারাজীবনে কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

এখন প্রশ্ন হল গণমাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে লিঙ্গগত বৈষম্য এল কেন? এর উত্তরে বলা যায় এই লিঙ্গগত বৈষম্য আসার পেছনে যেগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে সেগুলি হল পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্র। গণমাধ্যমের মাধ্যমে মানুষ চিনে নেয় নিজের চারপাশের বাস্তবতাকে। এই গণমাধ্যম এখন জনসাধারণের ভাবাবেগের কথা বাদ দিয়ে পুঁজির কথা শুনে। আর বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের নিকট পৌঁছানোর অন্যতম শক্তিশালী ও অপরিহার্য মাধ্যম হলো বিজ্ঞাপন। এই পুঁজির স্বার্থে গণমাধ্যম নারীকে পণ্য বানিয়ে উপস্থাপন করে এবং পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। কখনো তারা নারীকে নির্মাণ করে মমতাময়ী মা রূপে, কর্তব্যপরায়ন স্ত্রী ও সুন্দরী প্রেমিকা রূপে। আবার এরাই নারীকে নিয়ে তৈরি করে মর্যাদাহীন যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও পর্নোগ্রাফির প্রচার। আমরা বর্তমান সময়ে এমন এক জগতে বিরাজ করছি যেখানে সবকিছুই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, পুঁজিতন্ত্রের মুনাফার উদ্দেশ্যে। এই পুঁজিবাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বেশি পরিমাণে মুনাফা অর্জন। অন্যদিকে পুরুষতন্ত্র নির্ণয় করে দেয় সমাজ নারীকে কিভাবে দেখবে? কিভাবে শিশুদের মূল্যবোধ গঠিত হবে? বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞাপনে নারীকে প্রতিনিয়ত প্রতিবিম্বিত হতে হয় নানা ধরনের নেতিবাচক ও গৎ বাঁধা চিত্রে। জিন কিলবর্নে বলেছেন,

> ‘Advertising sells not only products, but also values, imaged, concepts of love and sexuality, romance, success and normalcy’

সভ্যতার জন্ম লগ্ন থেকেই লিঙ্গ বৈষম্য সমাজ একটি সুপরিচিত রূপ।লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ, নারীবাদীরা বলে থাকেন, সমাজে নারীদেরকে সক্ষমভাবে গড়ে তোলার সাথে সাথে নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাকে সুনিশ্চিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর সাথে সাথে গণমাধ্যমে নারীর সমুচিত ভূমিকাকে তুলে ধরা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সমান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীদের জন্য বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি বিষয়গুলি সঠিকভাবে উপস্থাপন করার কথা বলেছেন। জগত সংসারের আবর্তে উপরোক্ত বিষয়গুলি যখন ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে আসছে আর তখনই পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে বৈষম্যের নতুন মোড়কে বাজারজাত করতে অনেকাংশে সফল হয়েছে। ইলেকট্রিক মিডিয়া হোক কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া হোক প্রতিটি পরিসরে, প্রতিটি আয়োজনে নারীকে বাজারজাত করেছে মুনাফার উদ্দেশ্যে।প্রতিটি বিজ্ঞাপনে যেমন: সাবান, তেল, ক্রিম, গৃহ দ্রব্যাদি কাপড় কাচার পাউডার, নরম পানীয় কিংবা এনার্জি ড্রিংকস প্রভৃতিতে নারীকে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয় মনে হয় সেখানে নারীকে যেন হতে হবে রূপে গুণে অপরূপা। একটু গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গৃহস্থলীর বিষয়গুলিতে যথা-

লবণ, গুঁড়ো মসলা, ডিটারজেন্ট, সাজগোজের সামগ্রি প্রভৃতিতে নারী মডেলদের আধিক্য।অথচ যখনই কোন পেশী বহুল বিষয় যথা- টিএমটি রডের বিজ্ঞাপন, সিমেন্টের বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে কোন জাদু বলে নারী মডেলের অংশগ্রহণ শূন্য। সেখানে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে সব পুরুষ মডেলদের মুখ।ফলস্বরূপ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাজের কাছে বার্তা স্পষ্ট, নারীরা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার জন্ম কেবল গৃহস্থালী কাজকর্ম করার জন্য। অপর দিকে পুরুষ হবে বহির্মুখী, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতা, স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতি হল পুরুষের জগত। আবার যে সমস্ত অল্প সংখ্যক সুগন্ধি বা ক্রিমের বিজ্ঞাপনে ছেলেদের মডেল হিসেবে ব্যবহৃত করা হচ্ছে সেখানেও নারীকে লাস্যময়ী, আবেদনময়ী ও খোলামেলা পোশাকে দেখানো হচ্ছে। ফলে বলা যায় বিজ্ঞাপনগুলিতে নারীকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে এইভাবে যে, সে হচ্ছে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও অধস্তন। নারীর এই যে চিত্রায়ন তা তাকে হেয় রূপে প্রতিপন্ন করে। যা নারী জাতির জন্য অবমাননা কর। কমলা ভাসিন বলেছেন ,

> 'The word gender is now being used sociologically or as a conceptual category, and it has been given a very specific meaning. In its new incarnation gender refers to the socio-cultural definition of men and women and assign them social roles.'

পুরুষতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে নারীকে অবদমনের মাধ্যমে। অন্যদিকে পুঁজিতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো নারী জাতিকে বিকাশের সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে দিয়ে পণ্যের বিপণনের কাজে ব্যবহার করা। বিপণন শাস্ত্র বলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও বাসনাকে সূক্ষভাবে নাড়া দিতে পারলেই সফল বিজ্ঞাপন নির্মাণ সম্ভব। তাই এই সমস্ত কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তি গুলিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাড়া দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয় এবং এটি করতে গিয়ে নারীমুখ ও নারীদেহ ব্যবহারের মত সর্বোৎকৃষ্ট উপায় আর কী হতে পারে! বহুল প্রচারিত কয়েকটি বিজ্ঞাপনকে যদি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে সেখানে পুরুষ শ্রোতৃমন্ডলীকে আকৃষ্ট করার জন্য নারীদেহ, বিশেষ করে নারীর শরীরকে আবেদনময়ী ও লাস্যময়ীরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

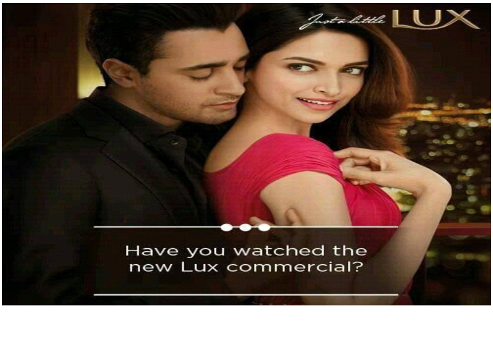

২০১৪ সালের শুরুতে টেলিভিশনের পর্দায় লাক্স সাবান বিজ্ঞাপনটির মূল আধেয় ছিল, 'মোহময়তাই শোভাসিত এমন কোমল ত্বক এগিয়ে দাও যাকে না ছুঁয়ে থাকা দূরহ ব্যাপার।' বিজ্ঞাপনটি যদি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে বিজ্ঞাপনের ছবিতে এবং কণ্ঠস্বর জ্ঞাপনে লিঙ্গ সংবেদনশীলতার সামঞ্জস্য নেই বরং সেখানে সমাজ নির্মিত পুরুষালী (masculinity) গুণাবলী ও স্ত্রী স্বভাবের (femineity) গুণাবলী গুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই প্রসাধনী ব্যবহার করলেও বিজ্ঞাপনে একজন নারী নিজেকে পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করার জন্যই প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন এবং সেটি করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকতা ব্যতিরেকে যৌনতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের লিঙ্গ কাঠামোগত নির্যাস হল, নারী হল পুরুষ নির্ভর সত্তা, প্রসাধনপ্রিয়, যৌনভাবে সহজলভ্য এবং লাস্যময়ী উপস্থাপন। এক কথায় তার সৌন্দর্যনের মূল উদ্দেশ্য হলো পুরুষ মানুষকে আকর্ষিত করা।

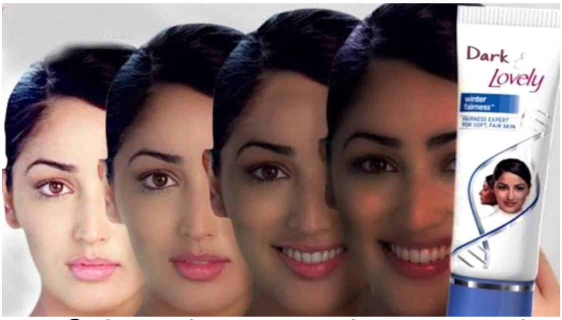

ফেয়ার এন্ড লাভলী বিজ্ঞাপনটির মূল আধেয়টি শুরু হয় একটি স্বপ্নজগতের বিচরণের মাধ্যমে। যেখানে নারীদের রূপচর্চার ব্যবস্থা প্রণালী নিয়ে স্বপ্ন দেখার কথা বলা হয়। সেখানে বলা হয় এই ক্রিমটি নারী ত্বকের পাঁচটি স্তর গভীরে গিয়ে তাদেরকে উপস্থাপন করবে একদম নতুনের মত, যা তাদেরকে রাত্রি বেলাতেও দেবে অপূর্ব রূপ। তারপর শেষে বলা হচ্ছে, 'আমার স্বপ্ন তো পূরণ হলো! এবার আপনার স্বপ্ন দেখার পালা।'

এই বিজ্ঞাপনটিতে বর্ণবৈষম্যের মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এখানে কালো বা শ্যামলা বর্ণের প্রতি কটাক্ষ করে এটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কালো কখনো সুন্দরের প্রতীক হতে পারে না, সাদা বর্ণই হচ্ছে সৌন্দর্যের পতাকা বাহি।ফলে এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা সমাজে নারী সম্পর্কে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, নারীকে হতে হবে অবশ্যই ফর্সা, যদি সে জন্মগতভাবে কালো রঙের আধিকারিনি হয় তবুও। অথচ মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য যে তার অন্তরের মধ্যে অন্তর্নিহিত, শরীরের বর্ণে নয় এই ধ্রুব সত্যটি কোনোভাবেই বিজ্ঞাপনে আনা হয় না। বরং শ্রোতাবর্গের সামনে নিয়ে আসা হয় নারীর সৌন্দর্যায়নের নারী দেহের বাহ্যিক

চেহারার একটি আদর্শ রূপ। সুতরাং এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে নারীদের যদি অপূর্ব সুন্দর হতে হয়, তবে তাকে ফেয়ার এন্ড লাভলী ক্রিম ব্যবহার করতে হবে ।

বিভিন্ন সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখানো হয় নারীদের দীর্ঘ কালো চুলের উচ্ছল বিচ্ছুরণ, যেদিকে চোখ পড়তে পুরুষেরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। বার্তাটি স্পষ্ট, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে পুরুষকে বাঁধতে পারলেই, তার মন এমনিতেই বাঁধা পড়বে। এই সমস্ত বিজ্ঞাপনগুলিতে নারীকে দেখানো হয় সে পুরুষের সেবা, মনোরঞ্জন এবং বাসায় নিষ্ক্রিয় থেকে তার রূপচর্চাতেই সারাদিন ব্যস্ত। এছাড়া আর যেন কোনো কাজ থাকতে নেই তাদের।অন্যদিকে পুরুষ তার কাজ নিয়ে সবসময় ব্যস্ত কত দায়িত্ব তার কাঁধে-- অফিসে, বাড়িতে, গুরুজনদের প্রতি ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপনগুলিতে লিঙ্গগত সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নারী পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে বা কর্মগত বৈষম্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।ফলে দর্শক শ্রোতা বর্গের কাছে কাজের যে চিত্র পরিবেশিত হয়, সেটি সমাজের প্রকৃত চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করেনা বরং চিরাচরিত ভুল ধারণাকে উপস্থাপিত করা হয়।

NIRMA-washing powder nirma Advertisement Jingle

কাপড় কাচার পাউডারের বিজ্ঞাপনটিতে আপাত দৃষ্টিতে এখানে নারী গুলিকে ক্ষমতায়িত হিসেবে উপস্থাপিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা প্রতিফলিত হয়নি। বরং

যেটি প্রতিফলিত হয়েছে সেটি হল, নারীর যুদ্ধ এখানে কাপড়ের দাগ ময়লার সাথে। নারীদের এত পরিশ্রমের কারণ হলো কাপড়ের দাগ ময়লা পরিষ্কার করে তা ঝকঝকে করার জন্য। সুতরাং বলা যায় বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থিতি আবশ্যিক হলেও সেখানে তার ভূমিকা আবশ্যক নয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞাপন গুলিতে বিনা পারিশ্রমে গৃহকর্মে নিপুন নারীর সম্পৃক্ততাকে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করা হলেও কিছু বিষয় সুক্ষভাবে সরিয়ে রাখা হয়, যেমন- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক বিনা পারিশ্রমিকে ও বিনা স্বীকৃতিতে গৃহস্থালি কাজকর্মের অতিরিক্ত ভার তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। আবার গৃহস্থালি কর্মের দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র নারী পালন করবে এমন নয় বরং যৌক্তিক বন্টনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েরই সামলানোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল বিজ্ঞাপন।লিঙ্গবৈষম্যের প্রতি সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পুঁজিবাদী বিশ্বে লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য সূচিতে পরিণত হলেও বিজ্ঞাপনে নারী পুরুষের পৃথক বিপরীত ধর্মী নেতিবাচক উপস্থাপনের ফলে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টি আগেই সুদৃঢ় হয়েছে। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞাপনগুলিতে নারীদের স্মার্ট ও আধুনিকভাবে উপস্থাপিত হতে দেখে ধারণা জন্ম জন্মাতে পারে যে নারীদেরকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে নারী পুরুষতন্ত্রের খাঁচায় বন্দি এমনকি ছোটখাটো সিদ্ধান্ত নিতেও সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় প্রয়োজন হলো বিজ্ঞাপনে লিঙ্গভিত্তিক সমতার ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদি কাঠামোবদ্ধ ধারণা থেকে বেরিয়ে সচেতন সমাজ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সরকারি দিক থেকে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় লিঙ্গ ভিত্তিক সংবেদনশীলতা নীতিমালা ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে এরূপ সম্ভব হলে বিজ্ঞাপনগুলির অপ-রূপায়নের হ্রাস ঘটবে এবং সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্ধারিত হবে।

তথ্যসূত্র:

১. রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (.সম্পা). ,*প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা* ,উর্বী প্রকাশন , ।৩৯ .পৃ ,২০০৮ ,১৪-কলকাতা

২. F. Engels., *The Origin of the Family, Private Property and the State,* Chicago, Charles H. Kerr & Company Co-operative,1902, p.36.

৩. Sylvia Walley., *Theorizing Patriarchy*, Basil Blackwell, Cambridge,1990, p.20.

৪. J. S Mill., *The Subjection of Women*, London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1869,p.24.

৫. Danida Gronold, Brigitte Hipfl and Linda Lund Pedersen (Ed.).,*Teaching with the Third Wave,* ATHENAB Advanced Thematic Network in Women's Studies in Europe, University of Utrecht and Centre for Gender Studies, Stockholm University, 2009, p.27-28.

৬. Arun Chaudhary, Indian Advertising:1780-1950, McGraw Hill Education Publication ,2006 ,p.65.

৭. পশ্চিমবঙ্গ ,২০১৬সেপ্টেম্বর -জুলাই ,৪৯-বর্ষ ,রাজ্য সরকারের মুখপাত্র ,তন্মধ্যে বিজ্ঞাপনে নারী২২৩.পৃ ,

৮. J. Kilbourne., Still killing us softly: Advertising and the obsession with thinness. In Patricia Fallon etal. (eds.), *Feminist perspectives on eating disorders*, New York: Guilford Press, 2007, p. 396.

৯. Kamala Bhasin., Understanding Gender, Women Unlimited Publisher, 2004, p.126.

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস : ইতিহাসের আবহে প্রেম-হিংসা-রাজনীতি-বন্ধুত্বের চতুর্মুখী দ্বন্দ্বের আখ্যান

শ্রুতকীর্তি সরকার
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সংরূপ উপন্যাস। পাশ্চাত্য অনুসারী আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস মূলত ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী এবং যার সার্থক পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে এই জাতীয় উপন্যাস নির্মাণ করেন রমেশচন্দ্র মজুমদার,প্রতাপচন্দ্র ঘোষ,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখক বৃন্দ। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব,রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত,আবেগ, বন্ধুত্বের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাহিনী সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহ এই উপন্যাসদ্বয়ে যথাক্রমে রাজপুত জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী ব্যঞ্জিত হলেও প্রেম, বন্ধুত্ব, প্রতিহিংসা, রাজনীতি, বিশ্বাসঘাতকতা বারংবার আবর্তিত হয়েছে চক্রাকারে। 'মিবাররাজ' উপন্যাসে কমলাবতী, সত্যবতী, মন্দালিকের ন্যায় স্নেহশীল চরিত্রের পাশাপাশি সহাবস্থান করে মন্দালিক পুত্রের ন্যায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী ঈর্ষাপ্রবণ চরিত্র । যার জন্য গ্রহাদিত্যকে ধারণ করতে হয় গুরুহত্যার মত মিথ্যা কলঙ্কের মুকুট। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বহুকালাবধি বঞ্চিত ভীলদের দ্বেষ,অসন্তোষ,নিপীড়নের কাহিনী যা প্রজ্জ্বলিত করেছিল বিদ্রোহের অগ্নিকুণ্ড। আর সেই অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হয় নাগাদিত্য,রাণী সেমতী,নিষ্পাপ সুহারমতীর জীবন। 'ফুলেরমালা' উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে মুসলমান সাম্রাজ্যে এক হিন্দু রাজার বঙ্গাধিপতি হওয়ার আখ্যান। কিন্তু সেখানেও শক্তিময়ীর প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়, গণেশদেবের মানসিক সংকট, গায়সুদ্দিনের নির্মমতার অদ্ভুত ও তাৎপর্যমণ্ডিত সংমিশ্রণে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। সর্বতোভাবে বলাই যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর চরিত্রগত আদর্শবাদ তাঁর উপন্যাস শিল্পকে করে তুলেছে ব্যতিক্রমী ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

সূচক শব্দ : আধুনিক কাল, স্বর্ণকুমারী দেবী, মিবাররাজ, বিদ্রোহ, সুহারমতী, ফুলেরমালা, গণেশদেব, সমাজবদ্ধ মানুষ।

মূল প্রবন্ধ :

'অতীতের মানুষ যে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের জীব,আমাদের মত তাহাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা-জড়িত বাস্তব জীবন ছিল,তাহারা যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে নিমগ্ন

থাকিয়া স্বপ্নময় জীবন অতিবাহিত করিত না, আমাদেরই মত তাহাদের জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধী ভাবের আলোড়ন ছিল...'।[১]

আধুনিক কালের সাহিত্যশিল্পের প্রধান ও শক্তিশালী সংরূপ উপন্যাস। উপন্যাস সর্বগ্রাহী, জীবনচক্রের অতৃপ্ত পিপাসার তৃপ্তি সাধনের কারণেই জন্ম উপন্যাসের। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃত অনুসারী বাঙালির সাহিত্যবৃক্ষে প্রস্ফুটিত হয় উপন্যাস পুষ্প। প্রথম পর্বে বাংলা উপন্যাসের আখ্যান ছিল মূলত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লেখকের কল্পনাধর্মী ভাবালুতায় ও রোমান্সে পরিপূর্ণ । যদিও ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাস প্রথম রচিত হয় পাশ্চাত্যে। লুকাচ(Lukacks) এর 'The Historical Novel' এর মতে উনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্যায় অর্থ্যাৎ নেপোলিয়নের পতনের পরবর্তী বছরগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মলগ্ন । পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক বলা হয় স্যার ওয়াল্টার স্কটকে। আর 'বাংলার স্কট' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যদিও তিনি ব্যতীত আরও অনেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন যেমন রমেশচন্দ্র মজুমদার,প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবশ্যই উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বর্ণকুমারী দেবী জন্মসূত্রে ঠাকুরবাড়ির কন্যা, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫৭ সালে ভাদ্রমাসে কলিকাতা মহানগরীতে তাঁর জন্ম। এগারো বৎসর বয়সে বিবাহ হয় জনকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। সুযোগ্য স্বামীর সাহচর্য শিক্ষালাভের পাশাপাশি সুযোগ করে দিয়েছিল প্রতিভার সম্যক বিকাশেও। স্বর্ণকুমারী আমাদের নিকট পরিচিত সাহিত্যিক হিসেবে।তিনি বাংলাভাষার প্রথম সার্থক মহিলা উপন্যাসিক তদুপরি ভারতী পত্রিকার সম্পাদক(১২৯১-১৩০১ ও ১৩১৫-১৩২১ বঙ্গাব্দ) । তিনি উপন্যাস,কৌতুক নাট্য, বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন আর প্রতিক্ষেত্রেই তাঁর সার্বিক প্রতিভার সুপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিরচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হল 'দীপনির্মাণ'(১৮৭৬), 'মিবাররাজ'(১৮৮৭), হুগলী ইমামবাড়ি(১৮৮৮), 'বিদ্রোহ'(১৮৯০), 'ফুলের মালা'(১৮৯৫) প্রভৃতি। আমি আমার বিষয় আলোচনার জন্য 'মিবাররাজ','বিদ্রোহ' , 'ফুলের মালা' – এই তিনটি উপন্যাসকে নির্বাচন করেছি। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আখ্যান ইতিহাস নির্ভর হলেও তারসাথে সমন্বিত হয়েছে মানবমনের সংকট, প্রেম,ঈর্ষা, তৎকালীন রক্তাক্ত রাজনীতি ও নির্মল বন্ধুত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। যে কারণেই উপন্যাসগুলি অনুপম সাহিত্যশিল্পে উন্নীত হয়েছে।

'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহ' এই উপন্যাসদ্বয়ে দুই প্রজন্মের ভীল ও রাজপুত এর জাতিগত সংঘর্ষের কাহিনী ব্যঞ্জিত হয়েছে। মিবাররাজ উপন্যাসের পটভূমি রাজস্থান। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশকালে 'মিবাররাজ' উপন্যাসের নাম ছিল 'কলঙ্ক'। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'কলঙ্ক' নাম রূপান্তরিত করে রাখা হয় 'মিবাররাজ'। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গুহাদিত্য বা গ্রহাদিত্য। জেমস টডের বই এ('Annals and Antiquities of Rajasthan') যে 'Cave born or Goha' র কথা উল্লেখিত হয়েছে তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই আখ্যানে। গুহা অনাথ; সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা

শিলাদিত্য ও রাণী পুষ্পবতীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মন রমণী কমলাবতীর দ্বারা পালিত হয় গুহা। মাতা কমলাবতী ও ভগিনী সত্যবতীর স্নেহ-বর্ষণে গ্রহাদিত্যের হৃদয়-ক্ষেত সর্বদা পরিপূর্ণ ছিল অকৃত্রিম প্রেম-ফসলে। 'বলিতে গেলে,মা ও বোন ছাড়া তাহার আপনার লোকই নাই'।[২] ব্রাহ্মণ গৃহে পালিত হলেও গ্রহের রাজরক্ত শাস্ত্রশিক্ষা নয় অস্ত্রশিক্ষার দিকে তাকে ধাবিত করে। গুরু হিসাবে গ্রহণ করে ভীল-সর্দার মন্দালিককে। পিতৃমাতৃহীন গ্রহাদিত্যকে পুত্রস্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে মন্দালিক। যেখানে স্নেহ সেখানেই ঈর্ষা, যেখানেই প্রেম সেখানেই সংশয়। মন্দালিক-গ্রহাদিত্যের স্নেহের বন্ধন যত দৃঢ় হয় তত ঈর্ষান্বিত হয় মন্দালিক পুত্র। সে ভীল সর্দারের পুত্র, নিয়মানুসারে পরবর্তী ইদরের জঙ্গল-রাজ , অথচ বহিরাগত গ্রহাদিত্য সহজেই অধিকৃত করে সেই পদ। মনের অদ্ভুত দ্বন্দ্বে প্রতিহিংসা পরায়ণ মন্দালিক পুত্র আহবান করে যুদ্ধের। তার মতে '......ঐ কথাতে সে পিতার ভালবাসার ভাবই দেখিতে পাইত,কিন্তু এখন এইগুলিতে তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ হইল,গর্ব্বে আঘাত লাগিল......... , তাহার পর স্থির করিল, যুবক তাহার শত্রু'।[৩] সময় সাক্ষী আছে রাজত্ব লাভের সংঘর্ষ , বীরত্ব প্রকাশের আস্ফালন, সিংহাসন দখলের লড়াই এ বারংবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ইতিহাসের পাতা। মন্দালিক পুত্র ও গ্রহাদিত্যের যুদ্ধে অসাবধান বশত প্রাণ যায় মন্দালিকের। মৃত্যু হয় স্নেহের, বিশ্বাসের, বন্ধুত্বের। গুরুহত্যার মিথ্যা কলঙ্কের মুকুট ধারণ করে গ্রহাদিত্য ইদরের সিংহাসনে আসীন হয় এবং পরবর্তীকালে মেবারাধিপতি বা মিবারের রাজা রূপে পরিচিতি লাভ করেন। সুতরাং বলা যেতেই পারে 'কলঙ্ক' ও 'মিবাররাজ' এই দুই নামকরণ যুক্তিসম্মত এবং সার্থক। আকারগত দিক দিয়ে 'মিবাররাজ' ঠিক উপন্যাস নয় বড় গল্প। তবুও রাজনৈতিক অধিকার লড়াই এর গল্প পরিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভা সত্যই প্রশংসনীয়।

'মিবাররাজ' উপন্যাসের পরবর্তী অনুক্রমিক উপন্যাস বিদ্রোহ। গ্রহাদিত্যের উত্তরপুরুষ ও আশাদিত্যের প্রপৌত্র নাগাদিত্যের কাহিনী বিবৃতি হয়েছে এই উপন্যাসে। 'মিবাররাজ' যদি রাজপুত সাম্রাজ্যের উত্থানের আখ্যান হয় তাহলে অবশ্যই 'বিদ্রোহ' উপন্যাস রাজপুত সাম্রাজ্যের পতনের আখ্যান। একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য ইদরে রাজপুতদের পরাজিত করে ভীলরা নিজ সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। আট পুরুষের বৃহৎ সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র-প্রেম-হিংসা-সন্দেহ-বন্ধুত্বের পারস্পরিক সংঘর্ষে। বড় ইমারত একদিনে ধ্বংস হয় না; ঘুণপোকার অদৃশ্য কামড়ে ভঙ্গুর হয়ে যায় আসল ভিত, তারপর অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হয় সেই ইমারত। বংশ পরম্পরয়ায় বঞ্চিত, হতভাগা, পীড়িত ভীলদের ধৈর্যচ্যুতি জন্ম দেয় এই বিদ্রোহের। উপন্যাসের প্রাথমিক অংশে আমরা রাজা ও রাজপুতদের শিকারে যাওয়ার আভাস পায়, তবে একথা সত্যই রাজপুতরা পশুশিকারের থেকে বেশি আনন্দলাভ করে ভীলদের সুখ,শান্তি,স্বাধীনতা শিকারে। কল্লুর কথায় ' ......জানুস্‌রে ভাইডা রাজাডা শিকার আউলে মুদের আর পরাণ বাঁচে না। সব দলবলরে তুষ্ট করুতে মুদের গম চাল কুছু

থাকে না'।[৪] মন্দালিক পুত্রের পরাজয় গ্রহাদিত্যের রাজা হওয়ার পথ কন্টকহীন করলেও এক প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকে মন্দালিকের উত্তরপুরুষরা। ভীল সর্দার চিন্তনের পৌত্র জঙ্গু প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকলেও বারংবার বাধা দেয় তার আপনজনেরা। প্রথমে পিতা যে রাজার অনুগ্রাহী সেনাপতি ছিল এবং পরে পুত্র জুমিয়া, যে নাগাদিত্যের বিশ্বস্ত অনুচর। প্রেম বা ভালোবাসার বিপরীতে অবস্থান পরশ্রীকাতরতা,ঘৃণা, প্রতিশোধ। এই উপন্যাসে এমন মানসিক দ্বন্দ্বের কাহিনী ব্যঞ্জিত হয়েছে, যে দ্বন্দ্ব প্রেমের সঙ্গে বিশ্বাসের, জাত্যাভিমানের ,বন্ধুত্বের। পিতা জঙ্গুর প্ররোচনায় জুমিয়া নাগাদিত্যকে হত্যার পরিকল্পনা করলেও শেষ পর্যন্ত সে পরাজিত হয় নির্ভেজাল বন্ধুত্বের কাছে...... '......সে যে আজ তাঁহাকে মারিতে আসিয়াছে। সে ডাকে আজ তাহার পা সরিল না – কে যেন তাহাকে ধরিয়া পাষাণের মত অচল করিয়া রাখিল, মহারাজ চলিয়া গেলেন; সে কেবল সে দিকে চাহিয়া রহিল'।[৫] জুমিয়া ও রাজার বন্ধুত্ব অটুট থাকলেও প্রশমিত হয়না ভীলদের আজন্ম লালিত ক্ষোভ। আগুন সর্বগ্রাসী আর প্রতিশোধের আগুন সর্বনাশী। আর সেই বিদ্রোহের অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির মত কার্য করে রাজা ও ভীলকন্যা সুহারমতীর নীতিবহির্ভূত প্রেম।

সুহারমতী ভীল সর্দার জুমিয়ার পালিতা কন্যা। ভীল সমাজে বড় হওয়ার কারণে অনান্য ভীল কন্যার মত সে বিশ্বাস করতো- শিকারের নিমিত্তে বনে হারিয়ে যাওয়া রাজা পর্ণ কুটিরের কন্যাকে বিবাহ করে; এই রূপকথার গল্পে বিশ্বাসী বালিকা সুহারমতী সরল হৃদয়ে রাজাকে বলে ওঠে ' তুমি বর?'[৬] বালিকার অবুঝ প্রেম আরো তীব্রতর কৈশোরকালে; যখন রূপমুগ্ধ রাজা তাকে দেখে বলে ' জুমিয়া তোমার মেয়ে এত সুন্দরী... সত্য ! ও হাতে পদ্মগুলিও যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে'।[৭] সুহার ভীলকন্যা হলেও আপন স্বাতন্ত্র্যে সে স্বতন্ত্র। ভীল নিয়মানুসারে ভীল যুবক ক্ষেতিয়া নয় বরং ভীল সম্প্রদায়ের চিরশত্রু রাজপুত সম্রাট নাগাদিত্য আজ তার হৃদয়ের রাজা। হৃদয়ের সঞ্চিত প্রেমের প্রকাশ হয় সঙ্গীতে.........

'মধুর বসন্ত সখিরে—
যৌবন আকুল-ফুল্ল কুসুম কুল
উলসিত ঢল ঢল শশীকর মাখি রে!'[৮]

এই গানের মাধুর্য তরঙ্গ রাজার হৃদয়-নদীতে যে জোয়ারের সৃজন হয়েছিল তাতে প্লাবিত হয় রাজা নাগাদিত্য ও রাণী সেমতীর সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক। ভীলদের প্রতি রাজার মহানুভবতা, বন্ধুত্ব চক্ষুশূল ছিল রাজপুত মন্ত্রীদের। কিন্তু রাজার সঙ্গে সুহারমতীর নব্যসখ্যতা রাজপুতদের মধ্যে সৃষ্টি করে তীব্র অসন্তোষ। আর এই অসন্তোষেই অন্ত্যেষ্টি হয় রাজা ও সেমতীর সম্পর্ক। প্রথমে রাজার হৃদয়ে সুহারের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও ভালোবাসা ছিল না কিন্তু রাণীর ক্রমাগত অভিযোগ ও অবিশ্বাস নাগাদিত্যকে সুহারের প্রতি সচেতন করেছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন... 'সুহারের প্রতি আকর্ষণে প্রথম প্রথম দূষণীয় কিছু ছিল না; কিন্তু জনাপবাদের পঙ্কিল

স্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে ক্লেদাক্ত করিয়া দিল। চারিদিকের বিরুদ্ধতায় এই নির্দোষ আকর্ষণে ক্রমশঃ প্রেমের আবেশময় রাগ সঞ্চারিত হইল'।[৯] রাজা স্বয়ং নিয়ম তৈরী করে আবার নিজেই সেই নিয়মকে ভেঙ্গে দেয়। রাজা নাগাদিত্য ভীল কন্যা সুহারমতীকে বিবাহের ইচ্ছার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের চিরায়ত নিয়মকে নাকচ করে। কিন্তু বিধি বাম, জুমিয়া এই বিবাহে রাজি হলেও প্রতিবাদ করে রাজগুরু হরিতাচার্য। কারণ জন্মসূত্রে সুহার ব্রাহ্মণ কন্যা, হরিতাচার্যের ভাতুস্পুত্রী। নাগাদিত্য ও সুহারের অসমাপ্ত বিবাহ বিদ্রোহের অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি-শলাকার কাজ করে। মুহূর্তের মধ্যে শুভ-বিবাহের যজ্ঞ রূপান্তরিত হয় বিদ্রোহের যজ্ঞে। আর সেই যজ্ঞে বলি হয় রাজা নাগাদিত্য ও রাণী সেমতী '...... রাজার তরবারি চালিত হইতে না হইতে বর্শা সজোরে রাণীর হৃদয় ভেদ করিয়া মহারাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল – উভয়ে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন'।[১০] মহান বন্ধু জুমিয়া নাগাদিত্যের শপথ রাখতে ভীলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। পরাজিত হয় সে, রাজপুতদের পরাভূত করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় ভীলরা। ইদরে ভীল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, সফল হয় বৃদ্ধ জঙ্গুর তপস্যা। নাগাদিত্য- সুহারের প্রেম, ক্ষেতিয়ার ঈর্ষা, রাজা-রাণীর দাম্পত্য টানাপোড়েন, জঙ্গুর প্রতিশোধ, জুমিয়ার বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনার আকর্ষণ-বিকর্ষণে নির্মিত ইতিহাসের পাতার রহস্যাবৃত অচেনা কাহিনী যেন জীবন্ত হয়ে জয় করেছে সকল পাঠক হৃদয়।

'ফুলেরমালা' উপন্যাসের পটভূমি বঙ্গদেশ। চতুর্দশ শতকে বঙ্গ রাজনীতির ঘটনা বহুল ইতিহাস এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে সেকেন্দার শাহ বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইসময় দিনাজপুরের রাজবংশের সঙ্গে বঙ্গেশ্বরের যুদ্ধ এবং সুলতানের পরিবারে পিতা-পুত্রের মতবিরোধ - এই দ্বৈত ঐতিহাসিক সংঘর্ষের সমন্বয় কাহিনীকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। উপন্যাস মানব জীবনের কথা বিবৃত করে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেইজন্য ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি সহাবস্থান করে লেখক সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র এবং সেই চরিত্র কেন্দ্রিক আখ্যান। এই উপন্যাসে ব্যঞ্জিত হয়েছে শক্তি-গণেশদেব-নিরুপমার ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। বঙ্গ রাজনীতির তরঙ্গে প্রেমের নৌকা বারংবার দিকভ্রষ্ট হলেও দক্ষ নাবিকের মত লেখিকা তাকে সঠিক গন্তব্যে পৌছে দিয়েছেন। শক্তি, নিরুপমা ও গণেশদেবের প্রেম কাহিনীর সূচনা বাল্যকালে, একটি ফুলেরমালাকে কেন্দ্র করে। বাল্যকালে খেলাচ্ছলে গণেশদেব শক্তিকে ফুলেরমালা পরিয়ে রাণী রূপে তাকে নির্বাচন করে- "...... রাজকুমার তাহা উঠাইয়া শক্তির গলায় দিয়া বলিলেন, 'এই দেখ!' "[১১] প্রত্যাখ্যাত নিরুপমা অভিমান বশত তাদের সেবায় ব্রতী হওয়ার সঙ্কল্প নেয়। কিন্তু বাল্যকালের অনুরাগে সজ্জিত সুখনীড়ের স্বপ্ন এক লহমায় হয়ে যায় মিথ্যা। শক্তির পিতুঃস্বসা সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিনী । সমাজচ্যুত পরিবারের কন্যা শক্তিকে সেই দায়ে কৈশোরেই গ্রহন করতে হয় যোগিনীর জীবন। বহুবছর পর অস্ত্রমেলায় পুনরায় সাক্ষাৎ হয় বাল্যকালের সখা-সখী, শক্তি ও গণেশদেবের। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে ততদিনে;

আজ গণেশদেব বিবাহিত, নিরুপমার স্বামী ও এক সন্তানের পিতা। প্রেমের দুই রূপ ত্যাগ ও ভোগ। ভোগে অপারগ শক্তি ত্যাগকে নির্বাচন করেনি বরং তার প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে তীব্র ঘৃণায়। সে হিংসক হয়ে ওঠে গণেশদেবের প্রতি... '...আমি প্রতিশোধ চাই। সে যদি আমার হয় তবেই তাহার দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত, নহিলে ভগবানের কালীরূপিণী বজ্রশক্তির আরাধনায়-'।[১২] আর প্রতিহিংসা পূরণের তুরুপের তাস তারই রূপমুগ্ধ সুলতান পুত্র গায়সুদ্দিন। প্রতিশোধ স্পৃহার সংকল্পে শক্তি বিবাহ করে গায়সুদ্দিনকে।

এই উপন্যাসের সবথেকে চর্চিত ও আকর্ষণীয় বিষয় মুসলিম অধ্যুষিত বঙ্গ সাম্রাজ্যে এক হিন্দু রাজার সিংহাসন আরোহণ। একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য সুলতান আমলে এক হিন্দু রাজার আবির্ভাব হয়েছিল। সেই হিন্দু রাজা আপন বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব, কূটনীতির সহায়তায় অধিকৃত করেছিল বঙ্গ সিংহাসন, সুলতানের হৃদয় তথা বঙ্গদেশের মানুষের হৃদয়। আলিয়াস সাহ পুত্র সেকেন্দের শাহ ও পৌত্র গায়সুদ্দিন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। প্রবীণ পিতার লালসার থেকে রক্ষা হেতু পিতা কর্তৃক মনোনীত শক্তিময়ীকে বিবাহ করে গায়সুদ্দিন বিরাগভাজন হন পিতার। সেকেন্দের শাহর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে গায়সুদ্দিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্যদিকে দিনাজপুরের সামন্ত গণেশদেব এবং আজিম খাঁ সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করে। স্নেহের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং বন্ধুত্বের সঙ্গে বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের পরিণাম হয় ভয়ানক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নিহত হন সুলতান। পিতা, ভ্রাতা হন্তারক গায়সুদ্দিন হয় বঙ্গাধিপতি। কিন্তু রক্তাক্ষয়ী এই সংগ্রামে বেঁচে যায় গায়সুদ্দিন ভাইপো সাহেবুদ্দিন। মানব দরদী গণেশ আশ্রয় দেয় সাহেবুদ্দিনকে-'গনেশদেবের স্থির বিশ্বাস সাহেবুদ্দিনকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি ন্যায়কার্য্য করিয়াছেন'।[১৩] রাজা গণেশদেবের এই সাহসী কার্য বঙ্গাধিপতির অহংসত্তা কে আঘাত করে। সে শাস্তি দিতে উদ্যত হয় গণেশদেবকে। বঙ্গরাণী তথা শক্তি এই কার্যে সমর্থন করে সুলতান গায়সুদ্দিনকে। কারণ প্রতিহিংসা পরায়ণ শক্তিও আজ শাস্তি দিতে প্রস্তুত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তার একদা বাল্য প্রেমিক গণেশদেবকে।

গণেশদেবের মনঃকষ্ট উপভোগ করতে কারাগারে শক্তি গণেশকে দেখতে এলে মোহভঙ্গ হয় তার। হিংসা,দ্বেষ,যুদ্ধ হল সাময়িক সুখের আধার কিন্তু প্রকৃত প্রেম সে তো চিরন্তন। আর ভোগ নয় বরং ত্যাগকে নির্বাচন করে শক্তি । গণেশদেবের পলায়নে সাহায্য করে সে। আর কারাগারের প্রেমিকের বিছানায় শয়ন করে অনুভব করে পুরাতন প্রেমের সুখানুভূতি -----

'আনন্দ সঙ্গীত-গাহি!- আর কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!'[১৪]

সুলতানের আজ্ঞাবাহী কুতুব অন্ধকারে গণেশদেব ভেবে শক্তির মুণ্ডচ্ছেদন করে। এরপর আবার যুদ্ধ , গায়সুদ্দিন পরাজিত হয় , গণেশদেব জয়ী হয়ে দখল করে বঙ্গ

সিংহাসন। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে শক্তিকে দিতে হয় আত্মাহুতি, রাজনীতি-প্রতিহিংসার পারস্পরিক ষড়যন্ত্রে হেরে যায় সে। আর রেখে যায় তার অস্তিত্বের প্রতিরূপ কন্যা গুলবাহারকে। উপন্যাসের শেষাংশে পুনরায় এক বাল্য প্রণয়ের আভাস পাই। গণেশদেব পুত্র যাদব ফুলের মালা পরিয়ে দেয় শক্তি কন্যা গুলবাহারকে। এইভাবেই শুষ্ক ফুলেরমালা সতেজ হয়ে উপন্যাসের নামকরণকে করেছে তাৎপর্যমণ্ডিত।

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনবাখ্যানই ইতিহাস। সেই কারণেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান উপাদান ইতিহাসের বিশাল পটভূমি, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, আবেগ আলোড়ন এবং ইতিহাসাশ্রিত ও কাল্পনিক চরিত্রের সমন্বয়। উপন্যাসে যেকোন চরিত্রের বিনির্মাণ হয় তাদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত,আবেগ উল্লাস,আর্তনাদের সংমিশ্রণে। স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বঙ্কিম অনুসারী হলেও তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির জীবন বা আদর্শগত সংঘাত সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কন্যা হিরন্ময়ী দেবী বলেছিলেন ‘ আমার মাতার সকলই প্রশংসনীয়,কেবল বুদ্ধি বিদ্যাতেই আমরা তাহাঁকে বড় বলে মনে করি না,তাঁহার স্নেহ-প্রবণ সুকোমল হৃদয়,তাঁহার উদার করুণা, তাঁহার আত্মলোপী ধৈর্য্য—এ সমস্তেই তিনি আমাদিগের নিকট আদর্শ রমণী’।[১৫] তাঁর এই আদর্শবাদের স্ফুরণ উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হয়। আর এই কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র লেখিকা।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়,শ্রীকুমার, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’,মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনমুর্দ্রণ,২০০৬-২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৮

২। মুখোপাধ্যায়, অরুণ(সম্পাদিত), ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসসমগ্র’(১), দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০২০, পৃষ্ঠা- ৩০৫

৩। ঐ, পৃষ্ঠা – ৩০১

৪। ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৪৯

৫। ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৬১

৬। ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৪৫

৭। ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৮১-৪৮২

৮। ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৮৫

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়,শ্রীকুমার, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’,মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনমুর্দ্রণ,২০০৬-২০০৭, পৃষ্ঠা- ২৮৫

১০। মুখোপাধ্যায়, অরুণ(সম্পাদিত), ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসসমগ্র’(১), দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০২০, পৃষ্ঠা – ৫৪০

১১। মুখোপাধ্যায়, অরুণ(সম্পাদিত), ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসসমগ্র’(২), দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০২০, পৃষ্ঠা – ৭৪২
১২। ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৫৯
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৯৪
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা – ৮১০
১৫। মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন(সম্পাদিত), ‘বঙ্গভাষার লেখক’(প্রথম ভাগ), বঙ্গবাসী অফিস,কলিকাতা, ১৩১১, পৃষ্ঠা – ৮০০

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য(সম্পাদিত), ‘স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী’, পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ,২০০০
২। অরুণ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসসমগ্র’(১), দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০২০,
৩। অরুণ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসসমগ্র’(২), দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০২০,
৪। পশুপতি শাশমল, ‘স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য’, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৭৮(বঙ্গাব্দ)
৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, , ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’,মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ,২০০৬-২০০৭,
৬। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), ‘বঙ্গভাষার লেখক’(প্রথম ভাগ), বঙ্গবাসী অফিস, কলিকাতা, ১৩১১

নাট্যগতিতে ক্ষুদ্র চরিত্রের ভূমিকা : প্রসঙ্গ স্বপ্নবাসবদত্তম্, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ও মৃচ্ছকটিকম্

অঞ্জলি বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আলোচ্য প্রবন্ধে নাটক ও প্রকরণের যে ছোট ছোট চরিত্রগুলি গ্রন্থের বিষয়বস্তু, প্রধান চরিত্র, ঘটনার সৌন্দর্য্য এই সবকিছুকে আরো কতোটা বেশী সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্ এবং মৃচ্ছকটিকম্-এর কয়েকটি ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যা নাট্যগতিকে ত্বরান্বিত করতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। স্বপ্নবাসবদত্তম্-এর প্রথম অঙ্কের ব্রহ্মচারী চরিত্র ও পঞ্চম অঙ্কের স্বপ্নদৃশ্য এই দুটি ঘটনা স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর চতুর্থ অঙ্কের দুর্বাসার শাপ এবং পঞ্চম অঙ্কের হংসপদিকার সঙ্গীতের উপস্থাপন এই নাটকে যে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের মাতলি চরিত্রটির নিমিত্তই যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন সম্ভবপর হয়েছিল একথা সর্বজনবিদিত। মৃচ্ছকটিকম্-এর সংবাহক ওরফে বৌদ্ধভিক্ষু এবং চন্দনক ও বীরকের চরিত্রও নাট্যগতিকে এবং চারুদত্ত ও বসন্তসেনার পুনর্জীবন লাভে এবং তাদের মিলনের অন্তিম সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুকের উপস্থিতি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই চরিত্রগুলির উপস্থিতি ভিন্ন নাটকগুলির পরিণতি কখনোই সম্ভবপর নয়। বর্তমান প্রবন্ধে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ক্ষণোপযোগী চরিত্রগুলির উল্লেখযোগ্য ঘটনা গাঁথাই আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: নাট্যগতি, ক্ষুদ্রচরিত্র, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, মৃচ্ছকটিকম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্, ব্রহ্মচারী, বৌদ্ধভিক্ষু, স্বপ্নদৃশ্য, মাতলি

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'রূপক' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। রূপকের নাটক এবং প্রকরণে আমরা যে ছোট ছোট চরিত্রগুলি দেখতে পাই সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও নাট্যগতিতে তাঁদের ভূমিকা উপেক্ষনীয় নয়। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হলো 'নাট্যগতিতে ক্ষুদ্র চরিত্রের ভূমিকা' যা নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করতে, নাটককে সজীব ও সরস করতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। নাট্যকারেরা যাতে নাটকের বিষয়বস্তুকে পাঠক সমাজের কাছে আরো বেশী চমকপ্রদ করে উপস্থাপন করতে পারেন সেই কারনবশতই ছোট ছোট ক্ষণোপযোগী চরিত্র গুলি চিত্রিত করেছেন। এই প্রবন্ধে নাট্যকার ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' এবং নাট্যকার শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নামক গ্রন্থগুলি থেকে ছোট

ছোট কতোগুলি স্বল্পসময়ের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, এই চরিত্র গুলি নাটকের বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করতে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নাটকের সুন্দর সমাপণের জন্যে কতোটা অসামান্য ভূমিকা পালন করে- এই উপলক্ষ্য নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রসঙ্গত আলোচ্যনীয়, সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্য দর্পণে 'ধ্বনি' ও 'গুণীভূতব্যঙ্গ্য' – এই দুইভাগে কাব্যকে বিভক্ত করার পশ্চাতে পুণরায় বলেছেন – "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্।।"[১] অর্থাৎ তিনি আবার কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দুভাগে ভাগ করেছেন। দৃশ্যকাব্যকে তিনি রূপক নামে আখ্যায়িত করেছেন- কারণ রূপের আরোপ হয় বলে বিশ্বনাথ তাকে 'রূপক' বলেছেন। এই রূপককে আবার দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন-

"নাটকমথ প্রকরণং ভানব্যয়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাংকবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকানি দশ।।"[২]

রূপককে এই দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার পশ্চাতে তিনি নাটক, প্রকরণের প্রত্যেকটি ভাগের নির্দিষ্ট লক্ষণ রচনা করেছেন- এইভাবে বা এই নিয়মে নাটক, প্রকরণ রচনা করলে নাটক, প্রকরণ সঠিক ভাবে রচিত হবে।এই নিয়মে সীমাবদ্ধ থেকেই নাট্যকারেরা নাটক, প্রকরণ রচনা করতেন। নাটক, প্রকরণ রচনায় যাতে পরিপুষ্টির কোন অভাব না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্বনাথ কবিরাজ নাটক ও প্রকরণের লক্ষণ রচনা করেছিলেন। নাটকের লক্ষণ হলো -

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ।।
সুখদুঃখসমুদ্ভুতি-নানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাংকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণোবান্নায়কো মতঃ।।
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যো নির্বহণেঽদ্ভুতঃ।।
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্।।"[৩]

অর্থাৎ নাটকের বৃত্তান্ত বিখ্যাত ও পঞ্চসন্ধি-সংযুক্ত হবে; নাটকে বিলাস, ঋদ্ধি প্রভৃতি গুণ থাকবে এবং নাটক নানাবিভূতিযুক্ত হবে। এখানে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি প্রদর্শিত হবে এবং নাটক নানারসে পরিপূর্ণ হবে। নাটকে পাঁচ থেকে দশ পর্য্যন্ত অংক থাকবে। এর নায়ক হবেন কোন বিখ্যাত বংশজাত ব্যক্তি, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বা প্রতাপশালী ব্যক্তি; দিব্য বা দিব্যাদিব্য– এইরূপ গুণবান ব্যক্তি। নাটকে শৃঙ্গার বা বীর– যেকোন একটি রস অঙ্গীরস ও অন্য রসসমূহ অঙ্গরস হিসাবে থাকবে; নির্বহণ

সন্ধিতে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ করতে হবে, কার্য্যসাধনে চার পাঁচজন প্রধান পুরুষ থাকবেন। এর বন্ধন গোপুচ্ছাগ্রভাগের মত হবে।

দশরূপককার ধনঞ্জয় তাঁর দশরূপকে প্রকরণের লক্ষণ করেছেন। প্রকরণের লক্ষণ হলো –

"অথ প্রকরণে বৃত্তমুৎপাদ্যং লোকসংশ্রয়ম্।
অমাত্যবিপ্রবনিজানমেকং কুর্বাচ্চ নায়কম্।।
ধীরপ্রশান্তং সাপায়ং ধর্মকামার্থতৎপরম্।
শেষং নাটকবৎসন্ধিপ্রবেশকরসাদিকম্।।
নায়িকা তু দ্বিধা নেতুঃ কুলস্ত্রী গনিকা তথা।
ক্বচিদেকৈব কুলজা বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।।
কুলজাভ্যন্তরা, বাহ্যা বেশ্যা নাতিক্রমোহনয়োঃ।
আভিঃ প্রকরণং ত্রেধা, সঙ্কীর্ণং ধূর্তসঙ্কুলম্"[৪]

অর্থাৎ প্রকরণের কাহিনী কবিকল্পিত অথবা লোকাশ্রিত হবে। মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বনিক- এঁদের মধ্যে একজনকে নায়ক করতে হবে। নায়ক হবে ধীর প্রশান্ত। তাঁর কাজের সফলতা বিঘ্নযুক্ত হবে। নায়ক ধর্ম, অর্থ, ও কাম (ত্রিবর্গ) বিষয়ে তৎপর হবে। প্রবেশক তথা রসাদিসমাবেশ ঠিক নাটকের মতো হবে। প্রকরণে নায়িকা দুধরনের হতে পারে– কুলস্ত্রী, গণিকা। কোন প্রকরণে একা কুলস্ত্রী নায়িকা, কোন প্রকরণে একা গণিকা নায়িকা। কোন প্রকরণে দুজনে একসঙ্গেই নায়িকা হতে পারে। কুলস্ত্রী আভ্যন্তর নায়িকা, গণিকা বাহ্যিক নায়িকা। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই প্রকরণ তিন প্রকার হয়- কুলজানিষ্ঠ, গণিকানিষ্ঠ, উভয়ানিষ্ঠ। যে প্রকরণে ধূর্ত, বিট, শকারের সমাবেশ হয় সেই প্রকরণ সঙ্কীর্ণ।

রূপককে জম-জমাটি করে রচনা করার কোন কসরত কবিরা ছাড়েননি। এতকিছু নাটক, প্রকরণে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নাট্যকারকে সঠিক ও সুন্দরভাবে নাটকের পরিণতি টানতে ভাবতে হয়েছে। তিনি যেমন চাইছেন ততোটা মনের মতো করে নাটকের পরিণতি টানতে পারছেন না। সাহিত্য দর্পণকারের মতানুযায়ী নাটকের লক্ষণে বলা হয় নাটক হতে গেলে কম করে পাঁচটি অঙ্ক হতেই হবে– আর সাত–আটের মধ্যে অঙ্ক হতে হবে। প্রকরণে দশটি অঙ্কের সমন্বয় থাকতে হবে। নাটক, প্রকরণের লক্ষণ অনুযায়ী এতকিছু থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নাটক, প্রকরণের পরিণতির পূর্বে নাট্যগতিতে শ্লথ ভাব চলে আসে, তখন নাট্যকারের পক্ষে রচনার গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই কারণবশত নাট্যগতিকে চেনা ছন্দে ফেরানোর জন্যে নাট্যকার অনেক ছোট ছোট চরিত্র ও ঘটনার সৃষ্টি করেন, যাতে নাটকটি সুন্দরভাবে ও সুষ্ঠুভাবে সমাপণ করা যায়।

নাট্যগতিতে ক্ষুদ্র চরিত্রের ভূমিকা– এই বিষয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে দু-তিনটি গ্রন্থ থেকে গুটিকতক এমন ছোট ছোট অনবদ্য চরিত্র তুলে ধরার

চেষ্টা করা হয়েছে, যে চরিত্র গুলি নাট্যগতিকে সজীব করে তোলার জন্যে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন– নাট্যকার ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের প্রথমাঙ্কের ব্রহ্মচারী চরিত্রটি, পঞ্চমাঙ্কের স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনা। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের বৌদ্ধসন্ন্যাসী চরিত্র, চন্দনক ও বীরক চরিত্র এবং মহাকবি কালিদাসের-'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ বেশ কয়েকটি এমন ছোট ছোট চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন– দুর্বাসা চরিত্রটি, হংসপদিকা চরিত্রটি, ধীবর বৃত্তান্ত, নিঃসন্তান বণিক ধনমিত্র চরিত্র এবং মাতলি চরিত্রটিও এমন একটি চরিত্র যা নাটকীয় গতিকে আরো প্রাণচঞ্চল করে তোলে। এই চরিত্রগুলি কি প্রকারে নাটকীয় গতিকে ত্বরন্বিত করেছে তা আলোচনীয় –

নাট্যকার ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের প্রথমাঙ্কে ব্রহ্মচারীর প্রবেশমূলক অপ্রধান ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মগধরাজ্যের প্রান্তবর্তী তপোবনের আশ্রমে হঠাৎ নাট্যকার ভাস ব্রহ্মচারীর চরিত্রটি চিত্রিত করেন তাঁর নাটকের কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। প্রথমাঙ্ক ব্যতীত এই ব্রহ্মচারী চরিত্রটি স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে দ্বিতীয়বার দেখা যায়নি। ব্রহ্মচারী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের নিমিত্ত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিশ্রাম স্থান অন্বেষণ করছিলেন, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুধাবন করলেন তিনি তপোবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন কেননা–

বিশ্রদ্ধং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশগতপ্রত্যয়া
বৃক্ষাঃ পুষ্পফলৈঃ সমৃদ্ধবিভবাঃ সর্বৈ দয়ারক্ষিতাঃ।
ভূয়িষ্ঠং কপিলানি গোকুলধনান্যক্ষেত্র বত্যোদিশো
নিঃসন্দিগ্ধমিদং তপোবনময়ং ধূমো হি বহ্বাশ্রয়ং।।[৫]

এই তপোবনেই ব্রহ্মচারীর সহিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের প্রধান দুই ছদ্মবেশধারী চরিত্র ব্রাহ্মণবেশধারী যৌগন্ধরায়ণ ও অবন্তিকাবেশধারী বাসবদত্তা এবং মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হয়। ব্রহ্মচারীকে দেখামাত্রই যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন– "ভোঃ কুত আগম্যত্যে? ক্ব গন্তব্যম্ ক্বাধিষ্ঠানমর্যস্য?"[৬] ব্রহ্মচারী কে প্রশ্ন করতেই তিনি জানান– আমি লাবাণক গ্রাম থেকে আসছি, লাবাণক গ্রামে রাণী বাসবদত্তা অগ্নিদগ্ধা হয়ে মারা গেছেন এবং বাসবদত্তার শোকে উদয়নের কাতরতার কথাও। ব্রহ্মচারীর আগমন এবং যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে তাঁর কথপোকথনের মাধ্যমে দর্শকবৃন্দ নাটকের নেপথ্যবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়।

শোকবিহ্বল উদয়নকে প্রকৃতস্থ করার ভার অন্যান্য অমাত্যগণের উপর বিশেষ করে রৈবতকের উপরে দিয়ে যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা ছদ্মবেশধারণ করে লাবাণক থেকে নির্গত হয়ে মগধরাজ্যের প্রান্তবর্তী তপোবনে প্রবেশ করলেন তখন মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীও ঐ তপোবনে এসেছিলেন তপোবন মাতাকে দর্শনের নিমিত্ত। ধর্মপ্রিয়া রাজকুমারী যখন আশ্রমস্থ তপস্বীগণকে তাদের অভীষ্টবস্তু প্রার্থনাকরার জন্যে অনুরোধ করছিলেন তখনই ছদ্মবেশী যৌগন্ধরায়ণ সুযোগ বুঝে বাসবদত্তাকে ভগিনী পরিচয়ে কিছুদিনের জন্য পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত রাখবার জন্যে প্রার্থনা করলেন। পদ্মাবতী ও

আপন বাক্যের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশধারী যৌগন্ধরায়ণের প্রার্থনা স্বীকার করে নিলেন, ঠিক সেই সময়ে আশ্রমে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্রহ্মচারীর প্রবেশ ঘটিয়ে নাট্যকার ভাস নাট্যগতিতে এক অন্যমাত্রা যোগ করেছেন। তাছাড়া যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা ব্রহ্মচারীর কথা শুনে অনুধাবন করলেন যে কারণে ছদ্মবেশ ধারণ করে গুজব রটিয়ে তপোবনে এসে পদ্মবতীর কাছে আশ্রয় নিয়েছে সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের আরেকটি ছোট্ট ঘটনা যা এই নাটকের গতিকে মসৃন রাখতে সাহায্য করেছে। পঞ্চমাঙ্কে যা স্বপ্নদৃশ্য বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই ঘটনার উপরে ভিত্তি করেই নাটকের নামকরণ হয়েছে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'। পদ্মাবতী শিরবেদনায় কাতর হয়ে সমুদ্রগৃহে গেছেন জানতে পেরে বিদূষককে নিয়ে রাজা উদয়নসমুদ্রগৃহে উপস্থিত হন কিন্তু সেখানে পদ্মাবতীকে না পেয়ে অপেক্ষা করতে করতে তিনি সেই শয্যায় নিদ্রা যান। অপরদিকে বাসবদত্তা যেহেতু পদ্মাবতীর ভগিনীরূপে এখানেই অবস্থান করছেন সেইহেতু তিনি পদ্মাবতীকে সমুদ্রগৃহে দেখতে আসেন এসে বিছানায় শয়িত উদয়নকে পদ্মাবতী ভেবে বাসবদত্তা তাঁর পাশেই নিদ্রা যান। এদিকে উদয়ন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে বাসবদত্তা বাসবদত্তা বলে চিৎকার করে উঠলে বাসবদত্তা চমকিত হয়ে তৎক্ষনাৎ শয্যা ত্যাগ করেন। পর মূহূর্তেই তিনি বুঝতে পারেন রাজা স্বপ্ন দেখছিলেন এবং সেখান থেকে চলে যাবার সময় লক্ষ্য করেন রাজা উদয়নের হাত শয্যা থেকে ঝুলে পড়েছে, উদয়নের হাত শয্যায় তুলে দেবার ইচ্ছেটা বাসবদত্তা অবদমন করতে পারলেন না। সেই স্পর্শেই রাজা অনুভব করেন এ স্পর্শ বাসবদত্তার স্পর্শ ব্যতীত অন্য কারোর হতে পারেনা বাসবদত্তা অবশ্যই জীবিত আছেন। কিন্তু নিশ্চিত না হওয়ায় তিনি বলতে থাকেন এটা যদি স্বপ্ন হয় তাহলে আমার নিদ্রা ভাঙলো কেনো এই বলে তিনি নিজেকে দোষারোপ করতে থাকলেন-

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্।।"[৭]

যদিও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না তথাপি তিনি বিদূষককে বারবার বোঝাতে চাইছিলেন যে তিনি জাগরিত হয়ে বিরহব্রতধারিণী বাসবদত্তাকেই দেখেছেন।

"স্বপ্নস্যান্তে বিবুদ্ধেন নেত্রবিপ্রোষিতাঞ্জনম্।
চারিত্রমপি রক্ষ্যন্ত্যা দৃষ্টং দীর্ঘালকং মুখম্।।"[৮]

নাটকের শেষ পর্যায়ে নাট্যকার ভাস স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র উপস্থাপন করে দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন এবং নাট্যগতিকেও সরস করে তুলেছে এই স্বপ্নদৃশ্য।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' – নাটকেও এমন অনেক গুলো ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা চরিত্র আছে যা নাট্যগতিকে সজীব ও সরস করেছে। যেমন, দুর্বাসার শাপ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে দুর্বাসা মুনি শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারে অবহেলা ও পতিচিন্তায় নিমগ্ন থাকার কারণে অভিশাপ দিয়েছিলেন যা সংস্কৃত সাহিত্যে 'দুর্বাসার

শাপ' নামে খ্যাত। দুর্বাসার শাপ একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা যা পাঠক সমাজকে আগ্রহী করে। শকুন্তলাকে দুর্বাসা মুনি যে শাপ দিয়েছিলেন তা হল –

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"[৯]

দুর্বাসার অভিশাপ না থাকলে নাটকটি আরো কতগুলি গতানুগতিক মিলনান্ত নাটকে পরিণত হত কিন্তু কালিদাস দুর্বাসার শাপ সংযোজন করে সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে প্রথম নাটক হিসাবে অভিজ্ঞান-শকুন্তলাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাট্য প্রযোজনার দিক থেকেও শাপ বৃতান্তের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ঘটনার যে গতি ছিল, তদানুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে পত্নীগ্রহণ ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাত্রার ব্যাপারটি শাপের ফলে শেষে প্রত্যাখ্যান ও বিরহে পর্যবসিত হয়ে নতুন ঘটনার সমাবেশে নাটকের মধ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাঙ্কের সন্নিবিষ্ট হবার অবকাশ করে দিল এবং নাটকের গতিকে চরমে পৌঁছে দিল।

চতুর্থাঙ্কের প্রথমেই মাত্র দু-মিনিটের একটি নেপথ্য কাহিনী হল – দুর্বাসার শাপ। তার প্রভাব সমগ্র নাটকে অনুভব করা যায়। এই অভিশাপ নাটকের গতানুগতিক ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে ওলট-পালট করে দিয়ে সামগ্রিক ঘটনাকে পরিচালনা করেছে। নাট্যগতিকে কখনো শ্লথ হতে দেয়নি। পাঠক সমাজের মধ্যে একটা উৎসুক্য, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে রেখেছে এর পরে কি ঘটবে এই জিজ্ঞাসার। অতএব ছোট্ট একটি নেপথ্য কাহিনী নাট্যগতিতে রস সঞ্চয়ে অনবদ্য একথা বলাই যায়।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'- নাটকের আরেকটি ছোট্ট ঘটনা 'হংসপদিকার সঙ্গীত'। নাটকীয় বিষয় বিন্যাসে হংসপদিকার সঙ্গীতের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। চতুর্থাঙ্কে পতি চিন্তায় নিমগ্ন শকুন্তলা সুলভকোপ দুর্বাসা মুনিকে অতিথিসৎকারে অবহেলা করায় দুর্বাসা মুনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। শকুন্তলার দুই প্রিয় সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুর্বাসা মুনিকে অনেক অনুনয় বিনয় করে শকুন্তলাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন। পতি চিন্তায় বিভোর বিষন্নমনা শকুন্তলা তপোবনের সকলের স্নেহসান্নিধ্য ত্যাগ করে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও মাতা গৌতমীর সাথে পতিগৃহে যাত্রাকালে সখিদ্বয় তাঁকে দুর্বাসার শাপ ও শাপ থেকে মুক্তির উপায় জানায়, এইভাবে চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত হয়। অপরদিকে পঞ্চমাঙ্কের শুরুতেই অত্যন্ত মধুর সুকরুণ সঙ্গীতের সুর শুনতে পাওয়া যায়। একসময় যিনি মহারাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন, তিনি (হংসপদিকা) গানটি গাইছিলেন। সঙ্গীতটি হল -

"অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতঽসি এনাং কথম্।।"[১০]

অর্থাৎ হে মধুকর! তুমি সবসময় নতুন মধুর আস্বাদ পেতে চাও। তাই সহকার মঞ্জরীকে ঐভাবে চুম্বন করে এসে এখন পদ্মের মধুতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ভুলে গেছো। এই সঙ্গীতের মাধ্যমে হংসপদিকা তাঁর অভিমানের কথা ব্যক্ত করেছেন। রাজা তাঁকে

একদা ভালোবাসলেও এখন হংসপদিকা অবহেলিতা, লাঞ্ছিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হংসপদিকার সঙ্গীতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন– "কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করে দেখানো হইয়াছে তাহাই প্রাকৃতিক।"[১১] কালিদাস দুর্বাশার শাপের অবতারণা করে নায়ক দুষ্যন্তকে রাজার মতো রাজা বানিয়ে ফেললেও অত্যন্ত কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন নায়ক দুষ্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কিছু বেশী রিপুপরবশ ছিলেন। হংসপদিকার সঙ্গীতের মাধ্যমে রাজার রিপুপরবশতার চিত্র তুলে না ধরলে শুধুমাত্র শকুন্তলার অপরাধে দুষ্যন্তের মর্মান্তিক যাতনাভোগের বর্ণনা অকারণ মনে হতো।

দ্বিতীয় কারণ হলো মহারাজা দুষ্যন্ত যদি বিদূষককে হংসপদিকার অভিমান শান্ত করার জন্যে অন্তঃপুরে না পাঠাতেন তাহলে পঞ্চমাঙ্কেই বিদূষক রাজাকে মনে করিয়ে দিতেন আর এখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটত, কিন্তু হংসপদিকার সঙ্গীতের নিমিত্ত বিদূষকের রাজসভায় অনুপস্থিতি নাটকের স্বার্থ এবং গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। মাত্র দুমিনিটের নেপথ্য সঙ্গীত, স্বল্প সময়ে জন্যে শ্রুত এই নেপথ্য সঙ্গীত যার রেশ বহন করেছে সমগ্র নাটক। নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে আরো দুটি বিরাট অঙ্ক উপহার দিয়েছে এই সঙ্গীত। নাটকের গতিকে সজীব ও সরস করতে হংসপদিকার সঙ্গীতের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে মাতলি একটি ছোট্ট চরিত্র যাকে আমরা ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে এবং সপ্তমাঙ্কে দেখতে পাই। ষষ্ঠাঙ্কে দেখাযায় মহারাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে পরিত্যাগের কারণে অনুতাপে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছেন। তিনি রাজকার্য প্রায় ত্যাগই করেছেন বলা যায়। শকুন্তলার সঙ্গে মিলনের আশা প্রায় নেই বললেই চলে, শকুন্তলার বিরহে উন্মত্তপ্রায়, তিনি নিজের মধ্যেই নেই কিরূপে রাজকার্য পরিচালনা করবেন। এইরকম অবস্থা থেকে রাজাকে স্বতেজ দৃপ্ত করতে মহাকবি কালিদাস মাতলি চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র দানববিনাশের নিমিত্ত দুষ্যন্তের সাহায্য প্রার্থনা করে মাতলি দুষ্যন্তের এইরূপ মানষিক পরিস্থিতি দেখে তাঁকে পুনরায় স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনার নিমিত্ত মাতলি তাঁর বিদূষককে আক্রমন করেন। বিদূষককে আক্রমন করেন। বিদূষক সাহায্যের জন্যে আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকেন। অবিলম্বে রাজা সেই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে বানযোজনা করলে ইন্দ্রের সারথি মাতলি আত্মপ্রকাশ করলেন এবং ইন্দ্রের সংবাদ নিবেদন করেন। রাজা মাতলিকে, বিদূষককে অক্রমনের কারণ জানতে চাইলে মাতলি বলেন– "কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসংতাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি। কুতঃ –

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে।
প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপাদ্যতে হি জনঃ।।"[১২]

অর্থাৎ- আমি এসে দেখলাম কোন কারণে মনের কষ্টে আপনি খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। তখন আপনাকে ক্রুদ্ধ করার জন্যে আমি ঐরকম করেছি। কেননা– আগুন নিভে এলে তাকে একটু খুঁচিয়ে দিলে তা আবার জ্বলে ওঠে, সাপকে যখন কেউ আঘাত করে তখনই সাপ ফনা তুলে আক্রমন করে। মানুষ সাধারণতঃ ক্রুদ্ধ হলেই নিজের তেজ প্রকাশ করেন।

দানববিনাশ করে ফেরার পথে মারীচাশ্রম পড়ায় তা দর্শন করে পুন্য অর্জনের বাসনা প্রকাশ করলে মহারাজা দুষ্যন্তকে মাতলি মারীচ আশ্রমে নিয়ে যান এবং সেখানেই সর্বদমন ও শকুন্তলার সাথে রাজার সাক্ষাৎ হয়। দুষ্যন্ত স্ত্রী পুত্র সহযোগে মারীচ এবং অদিতির আশীর্বাদ গ্রহণ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহলে বলাই যায় যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ এই নাটকের ‘মধুরেন সমাপয়েৎ’ – এর জন্যে কালিদাসের ছোট্ট চরিত্র ‘মাতলি’ – এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মাতলিই দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুণরায় মিলনে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন। রাজাকে রাজমহিমায় উত্তীর্ণ করেছেন এই মাতলি চরিত্রই, অতএব নাটকের মূল গতিকে তরান্বিত করতেও এই চরিত্রের অবদান অতুলনীয়।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণেও অনেক ছোট ছোট চরিত্র আছে যা মৃচ্ছকটিক প্রকরণের ঘটনা বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করে আছে। যেমন–মৃচ্ছকটিকের বৌদ্ধভিক্ষু সংবাহক চরিত্রটি ক্ষুদ্র হলেও এই প্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে চিত্রায়িত। অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র সংবাহক। প্রথম জীবনে তিনি চারুদত্তের পাদুকা মর্দনের কাজ করতেন। সংবাহক শব্দের অর্থও পাদুকা মর্দন করা। ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে কর্মচ্যূতি হলে তিনি জীবিকার জন্য জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়েন। জুয়া যখন সংবাহককে সর্বান্তকরণে নিঃশেষ করে দেয় ঠিক তখনই বসন্তসেনা তাঁকে নতুন জীবন দান করেন। বৌদ্ধভিক্ষু কিন্তু উপকারীর উপকার ভুলে যাননি। শকার বসন্তসেনাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং মৃত মনে করে উদ্যানের শুকনো পাতা দিয়ে মৃত দেহটি ঢেকে আবৃত করে দিলেও বসন্তসেনা প্রকৃতপক্ষে তখনও মারা যাননি শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন মাত্র। ইত্যাবসরে পূর্বে অত্যাচারিত বৌদ্ধভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হয় এবং শুকনো পাতার স্তূপের উপরে ভিজে কৌপিন মেলে দিতে এসে পাতার মধ্যে অকস্মাৎ গহনা পরিহিত স্ত্রীলোকের হাত দেখতে পান এবং স্বগোক্তি করে ওঠে “হা হা শুদ্ধালংকারভূষিতঃ স্ত্রীহস্তো নিষ্ক্রামতি। কথং দ্বিতীয়োঽপি হস্তঃ? প্রত্যভিজানামীব এতং হস্তম্। অথবা, সত্যং স এব হস্তঃ, যেন মে অভয়ং দত্তম্। ভবতু, প্রেক্ষিষ্যে। সৈব বুদ্ধোপাসিকা।”[১৩] অনন্তর পাতা সরিয়ে সে বসন্তসেনাকে সেখানে আবিষ্কার করে এবং তিনিই যে তাঁর পূর্ব উপকারী সেটা বুঝতে পারেন। চরম বিপন্ন অবস্থায় তিনি বসন্তসেনাকে উদ্ধার করেন এবং পরম যত্নে তাঁর সেবা করে ক্রমশ তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। বসন্তসেনা সুস্থ হয়ে উঠলে ঐ বৌদ্ধভিক্ষুই তাঁকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যান। নাটকের শেষ অঙ্কে দেখা যায় সংবাহকই

বসন্তসেনাকে নিয়ে রাজপথে উপস্থিত হয় সত্য উন্মোচনের নিমিত্ত। কারন চারুদত্তকে এই বসন্তসেনা হত্যা করার অপরাধে শাস্তি স্বরূপ ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হচ্ছিল। একদিকে যেমন সংবাহকের প্রথম জীবনের জীবিকা বহনকারী শ্রদ্ধেয় প্রভু চারুদত্ত জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাঁর জুয়াড়ী জীবন থেকে মুক্ত করে সত্যের দিশা দেখানো উপকারীর প্রণয় বিপন্ন, কি করে সংবাহক তাঁর জীবনের এরকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মিলন না ঘটিয়ে থাকতে পারেন। তাই তিনি বসন্তসেনাকে নিয়ে রাজপথে হাজির হয়েছেন চারুদত্তের জীবন রক্ষার নিমিত্ত। বাসন্তসেনার এই রাজপথে উপস্থিতির ফলে নাটকীয় ঘটনার সব সমীকরন গুলো পাল্টে গেছে। বৌদ্ধভিক্ষুকের জন্যেই চারুদত্ত ফাঁসি থেকে মুক্তি পান, বসন্তসেনার জীবন রক্ষা হয়, আর্যক রাজা হন, বসন্তসেনা ও চারুদত্তের মিলন হয়। এর থেকে অনুধাবন করা যায় নাট্যগতিতে সংবাহক ও নামান্তরে বৌদ্ধভিক্ষুকের ভূমিকা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের মুল বিষয়বস্তু হলো চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রণয় কাহিনী, তাঁর পাশাপাশি রাজা পালক সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে যে অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন সেই মাৎস্যন্যায় থেকে প্রজাগণকে রক্ষা করার নিমিত্ত পালককে সিংহাসনচ্যুত করে আর্যককে সিংহাসনে উপবেশন করানো। অপরদিকে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো– নাটকের মধ্যে অল্প সময়ের জন্যে যে ছোট ছোট চরিত্রগুলি নাট্যকার চিত্রিত করেছেন সেই চরিত্রগুলি নাট্যগতিকে ত্বরান্বিত করতে কতোটা উপযুক্ত, এই প্রসঙ্গে মৃচ্ছকটিক নাটকের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চন্দনক ও বীরক নামক দুটি চরিত্র উপস্থাপন করা হলো। যখন শকার বসন্তসেনাকে হত্যা করে চারুদত্তের উপরে হত্যার দোষারোপ চাপিয়ে দেয় এবং চারুদত্তকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় ঠিক তখনই এই চাপান উতরের মধ্যে রাজা পালক শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার কারণে হুলিয়া জারি করেন আর্য্যককে যেখানেই পাবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করার। সমস্ত রাজকর্মচারীরা আর্য্যকের অনুসন্ধানে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন, কিন্তু চন্দনক রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও আর্য্যকের সঙ্গে পূর্ব বন্ধুত্বের কারণে, মাৎস্যন্যায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, আর্য্যক রাজা হলে একটু শান্তিতে জীবন জাপন করতে পারবেন এই আশায়, এবং সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হওয়ার কারনে নিজের প্রবহনে করে আর্য্যককে পলায়ন করতে সাহায্য করেছেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে তরবারি হাতে নিয়ে সহকর্মীর সাথে লড়াই করে আর্য্যককে রক্ষা করেছেন। তাঁর সহকর্মী বীরক চন্দনকের প্রবহন অন্বেষণ করতে চাইলে বীরককে তিনি বাধা দিয়েছেন এবং হাতাহাতি পর্যন্ত করেছেন যদিও তিনি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন আর্য্যক রাজা নাহলে তাঁর জীবিকাটাই হয়তো থাকবেনা। চন্দনক এবং বীরকের এই যে কথোপকথন, মারামারি, চন্দনকের সমগ্র সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, বন্ধুত্বের প্রতি দায়বদ্ধতার নিদর্শন এবং বীরকের প্রভু ভক্তি ও কর্মের প্রতি নিষ্ঠা নাট্যগতিকে সরস করেছে।

'নাট্যগতিতে ক্ষুদ্র চরিত্রের ভূমিকা' নামক প্রবন্ধে নাটক ও প্রকরণের বিষয়বস্তুকে আরো বেশী পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার নিমিত্ত নাট্যকারেরা অনেক ছোট ছোট চরিত্র চিত্রিত করেন। আপাত দৃষ্টিতে চরিত্রগুলির গুরুত্ব অনুভব করা না গেলেও প্রধান চরিত্রগুলির সহযোগী এবং বিষয়বস্তুকে আকর্ষক করে রচনার শ্লথভাব কাটাতে অত্যন্ত উপযোগী এই চরিত্রগুলি। নাটকের বিষয়বস্তুর পরিণতি প্রাপ্তিতে এই চরিত্রগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই প্রবন্ধে নাট্যকার ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' এবং নাট্যকার শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করে এই চরিত্রগুলির গুরুত্ব নাটক ও প্রকরণে যে অসামান্য তা দেখানো হয়েছে এবং চরিত্রগুলির ভূমিকা নাটক ও প্রকরণে যে অত্যন্ত স্থানোপযোগী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত সাহিত্যদর্পণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৩৮
২. তদেব
৩. তদেব, পৃ. ২৪০
৪. অবিনাশ চন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত (সম্পাদিত), শূদ্রক-বিরচিতম্ মৃচ্ছকটিকম্, সংস্কৃতপুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৪১৩, পৃ. ১০
৫. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভাস প্রণীতম্ স্বপ্নবাসবদত্তম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১১, পৃ. ৮৫
৬. তদেব, পৃ. ৮৭
৭. তদেব, পৃ. ১৭৯
৮. তদেব, পৃ. ১৮১
৯. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কালিদাস প্রণীতম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, অষ্টম সংস্করণ, কোলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৩৬
১০. তদেব, পৃ. ৩০৪
১১. তদেব, পৃ. ১৩২
১২. তদেব, পৃ. ৪৭০
১৩. উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), শূদ্রক বিরচিতম্ মৃচ্ছকটিকম্, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪০৯

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'রতন মাস্টারের পাঠশালা' : জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের বর্ণমালা

প্রহ্লাদ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ : যাবতীয় অজ্ঞানতা ও অন্ধকার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়— শিক্ষা। যার আলোকে আলোকিত হয়ে মানবজীবন পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। সচেতন হয়ে ওঠে নিজেদের অধিকার কিংবা বাক্‌স্বাধীনতার সপক্ষে। কিন্তু আমাদের দেশের সাক্ষরতার সুষ্ঠুরূপের স্থানাঙ্ক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে না থাকায় প্রতিনিয়ত গৃহীত হয়েছে শিক্ষার মানোন্নয়ন মূলক বিবিধ প্রকল্প। যার মধ্যে অন্যতম— জাতীয় সাক্ষারতা অভিযান। অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম শিক্ষার জন্য এরূপ পদক্ষেপ সকালীন সমাজ ও প্রকল্প-সম্পৃক্ত সাহিত্যিকদের মনে বিশেষ অভিঘাতের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ সাহিত্যের পাতাতেও সাক্ষরতা অভিযানের প্রসঙ্গ রূপায়িত হতে থাকে। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোটোগল্প অনিতা অগ্নিহোত্রীর— 'রতন মাস্টারের পাঠশালা'। জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য রূপায়ণের পাশাপাশি এই প্রকল্প প্রান্তিক মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ও হাতে কলম ধরানোর প্রক্রিয়া লেখকের লেখনীতে নৈপুণ্যের সঙ্গে কীভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তা আমাদের এই নিবন্ধের অন্বিষ্ট।
সূচক শব্দ : সাক্ষরতা অভিযান, বাক্‌স্বাধীনতা, শিক্ষার সার্বজনিকীকরণ, আত্মপরিচয়, উন্নয়ন, শিক্ষকতা, শিক্ষক।

মূল আলোচনা :

১.

> 'আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব।'[১]

দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাবে দেশের অধিকাংশ মানুষ 'নির্বাক' হয়ে থাকে। ক্রমশ ভুলে যেতে থাকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে; ন্যায় অন্যায়ের বিচার-বিশ্লেষণ করতে, কখনো নিজেদের উন্নতিকল্পে কিছু ভাবতে। সেকারণে মৃত্তিকাসংলগ্ন সাধারণ মানুষদের 'সীমাবদ্ধ' দুনিয়ায় শিক্ষার আলো ফেলতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের দ্বারা বারংবার গৃহীত হয়েছে শিক্ষা-মানোন্নয়ন মূলক বিবিধ প্রকল্প। যার মধ্যে অন্যতম— 'জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান'। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন ভারত সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর শিক্ষার প্রসারকল্পে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' নামক যে শিক্ষা-দলিল গড়ে তুলেছিল তাতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ৫-মে 'জাতীয় সাক্ষরতা মিশন' (National Literacy Mission) প্রতিষ্ঠার পর সাক্ষরতা আন্দোলনের

গতি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গোটা দেশের প্রায় ২২৩টি জেলা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের ন্যূনতম শিক্ষার জন্য সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের পদযাত্রায় সামিল হয়। কারণ মানুষ শিক্ষিত হলেই জাতীয় সংহতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শীত হয়। এবং দারিদ্র্যকে প্রতিহত করে দেশ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক সমৃদ্ধি সম্ভব।

২.

'তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল...'[২]

সময়টা ১৯৯০। ইংল্যান্ডের ইস্ট অ্যাঙ্গোলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়নশীল অর্থনীতির পাঠ সমাপন করে ১৯৮০-র ব্যাচের দক্ষ প্রশাসক ও সৃজনশীল লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রী ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার পুরনো দায়িত্বে যুক্ত হননি। একবার চার্জ হ্যান্ডওভার রিপোর্টে সই হয়ে গেলে তিনি 'নেই' হয়ে যান। ফলস্বরূপ বাস্তববোধসম্পন্ন ওড়িশা সরকার মাত্র একটি জেলার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ না রেখে বিকল্প হিসেবে প্রদান করেন সারা রাজ্যের গণশিক্ষার ভার। বর্তমান সময়ে স্বচ্ছভারত মিশন কিংবা তার কিছু পূর্বে নির্মল গ্রাম ঘোষণার জন্য যেমন তৎপরতা তেমনি তখনও সারা দেশে জেলাগুলিকে 'পূর্ণ সাক্ষর' ঘোষণা করার জন্য ব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।[৩] কারণ 'পূর্ণ সাক্ষর' হলেই সেই রাজ্যের কিংবা জেলার মুকুটে সংযোজিত হবে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরের বিবিধ সম্মান। তবে, সম্মান অর্জনের অভিপ্রায় থাকলেও সাক্ষরতা আসলে প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়ন, সচেতনতা ও সক্ষমতা অর্জনের অন্যতম প্রতীক। সেকারণে তাদের জন্য নির্মিত বইগুলি কেবল বর্ণ-শব্দ-বাক্য শেখার বই হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে শিখতে শিখতে নতুন চেতনার জগতে পৌঁছনোর চাবিকাঠি। আত্মবিশ্বাস জাগরণের মহাঔষধ। সেও তো এক ধরণের সামাজিক পরিবর্তন।

এই সময়পর্বে লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রী পুরো রাজ্যে ঘোরার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রাম গঞ্জ পঞ্চায়েত ব্লক সর্বত্র। প্রকৃতির বিপুলতা এবং সেই প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক আদিবাসী মানুষের জীবন যাপনের বিপুল সংগ্রাম কাছ থেকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য অভিভূত করেছিল লেখক-মনকে। তাই তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো সমস্যাকে সরাসরি সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মী ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে তা সমাধানে কিংবা তাদের সুবিধা বোঝার জন্য তৎপর হয়েছেন। এপ্রসঙ্গে লেখকের স্বগতোক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— 'দেখলাম, কী কঠিন মানুষের জীবন। সারাদিন নিজের বা অন্যের খেতে কিংবা কলকারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি, সন্ধেবেলা গ্রামের কোনও পঞ্চায়েত ঘর বা মন্দিরের বারান্দায় বসে অচেনা অক্ষর শেখা, আঁক কষা কিংবা হাতের লেখা করা। তবু তাদের কী বিপুল আগ্রহ; যেন অচেনা দুনিয়ার চাবিকাঠিটি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ার অপেক্ষা। এদের অধিকাংশই হতদরিদ্র, দুবেলা ভালো করে খাওয়া জোটে না। এরাই নিজের পয়সা গুনে গুনে খরচ করে রাতে পড়ার কেরোসিন তেলের খরচ জুগিয়ে যাচ্ছে।'[৪] মৃত্তিকাসংলগ্ন

মানুষগুলি বিশ্বাস করেছিল সাক্ষরতা অর্জন করলে তাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে। সেকারণে দারিদ্র্য সহ নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সযত্নে অর্জিত সাক্ষরতার হাত ধরে চিরঅন্ধকারে রাখা অক্ষরজ্ঞানহীনতার করালগ্রাসকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। প্রবল কর্মীষ্ঠ, অভিমানী নবসাক্ষর আদিবাসী মানুষগুলির পড়াশুনোর গুণমান দেখতে তথাকথিত যেসব প্রান্তিক অঞ্চলে পৌঁছতে হয়েছে লেখককে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা রূপায়িত হয়েছে তাঁর— 'রতন মাস্টারের পাঠশালা' গল্পটিতে। গণশিক্ষা তথা সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রবলস্রোত গল্পটির প্রতিটি শব্দবন্ধে কীভাবে যুক্ত হয়ে আছে তার অন্বেষণই এই নিবন্ধের অন্বিষ্ট। তবে তার পূর্বে স্বয়ং লেখকের মুখেই শোনা যাক গল্পটির নির্মাণ, প্রকাশ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি—

> কেওনঝর জেলার... আদিম উপজাতি জুয়াংগরা। সাক্ষরতার হার এত কম, যে, কয়েকটি গ্রামে কোনও স্বেচ্ছাসেবক পাওয়াই গেল না, বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষর কেউ নেই। একটি গ্রামে ছোট এক স্কুলের ছাত্র দায়িত্ব নিয়েছিল বড়দের পড়ানোর। তার বাবা-মা দুজনেই তার ছাত্র। এছাড়া আরও সব বয়স্ক মানুষ।... তাকে নিয়ে লিখেছিলাম মজার এক গল্প রতন মাস্টারের পাঠশালা। বাংলায় তখন লেখক সাহিত্যিকদের ডাক পাঠানো হয়েছে নবসাক্ষরদের জন্য বই লিখতে।... আমার লেখা জুয়াংগ ছেলের গল্পও সেই স্রোতে মিশে গেল। কলেজস্ট্রিটের এক অফবিট প্রকাশকের ছাপা এই বই বিক্রি হয়েছিল হাজার দশকেরও বেশি। আমার সর্বাধিক বিক্রীত বই। গণশিক্ষা আন্দোলন এভাবেই মিলিয়েছিল দেশান্তর-গ্রামান্তরকে।[৫]

৩.

'এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'[৬]

'রতন মাস্টারের পাঠশালা' গল্পটি কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। লেখকের 'সুখবাসী' উপন্যাসের মতো সরাসরি গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কলকাতার কলেজস্ট্রিট বইপাড়ার স্বল্পপরিচিত প্রকাশনী 'ক্যাম্প' থেকে। ১৯৯৯ সালে। গল্পের পটভূমি পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা ওড়িশার একটি প্রান্তিক জেলা— কেওনঝর। নবসাক্ষর পড়ুয়াদের জন্য লিখিত এই বইয়ের প্রধান চরিত্র সানঝোরা গ্রামের এগারো-বারো বছরের এক আদিবাসী ছেলে। নাম— রতন জুয়াংগ। প্রায় সাক্ষরহীন প্রান্তিক আদিবাসী অঞ্চলে সেই হল লেখকের— রতন মাস্টার। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সংগঠিত সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অন্যতম প্রধান শরিক— 'রতন জুয়াংগ আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিল। রতনের বয়স এগারো-বারো, মাথায় কদম ফুল-ছাঁট চুল। গলায় মাদুলি, হাতে তাবিজ। গায়ে জামা নেই। পরনে একটা ময়লা খাকি-প্যান্ট। বাঁ-কাধের

ঝোলায় বইপত্র, শ্লেট। চকখড়ি। ডান হাতে গম্ভার কাঠের একটি লাঠি। সাঁঝবেলায় বনের পথে চলতে গেলে সঙ্গে রাখা ভালো।'[৭]

৪.

> 'বড়োরা সব পড়বে— এইরকম ঠিক হবার পর সানঝোরা আর টুইয়ানডা, দুই গাঁয়ে বড়োসড়ো হল্লা উঠলো।'[৮]

অক্ষরজ্ঞানহীনতা আমাদের অজ্ঞতার প্রতীক। ক্রমশ আমাদের নিয়ে চলে অন্ধকারের দিকে। দারিদ্র্য কিংবা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রান্তিক মানুষকে 'অশিক্ষা' নামক অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য, মোটামুটিভাবে যারা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেনি তাদের শিক্ষার কথা ভেবেছে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন। কারণ সাক্ষরতার স্থানাঙ্ক বৃদ্ধি আসলে দেশের উন্নয়নকেই ব্যঞ্জিত করে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিক্ষিত ব্যক্তির অভাবে প্রান্তিক অঞ্চলের কোন স্কুল পড়ুয়ায় হয়ে ওঠে— শিক্ষক। এই গল্পের জুয়াংগ আদিবাসী-পুত্র রতন তাদের মধ্যে একজন। সে-ই নিজের হাতে সানঝোরা ও টুয়ানডা নামক দুই গ্রামের বয়স্কদের ন্যূনতম সাক্ষর করে তোলার ভার নিয়েছে। সবাই নিজের স্বরে কথা বলতে চায়, কিন্তু অশিক্ষা তাদের এই ইচ্ছা পূরণের মাঝে বড় অন্তরায়। তাই নিজেদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার জন্য 'নির্বাক' মানুষগুলি ভাঙা ঘর মেরামত করে, কখনো শাল, মহুয়া, করঞ্জ বীজ জমিয়ে কিনে আনে সাঁঝস্কুলের জন্য কেরোসিন তেল— 'সাঁঝ-ইস্কুলের ঘরখানা আবার সানঝোরায় নয়, দুই গাঁয়ের সীমানা বরাবর যে-মাঠ, তারই মাঝখানে। কবে পঞ্চায়েত বড়ো ঘরখানা বানিয়েছিল, টালির ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ত, চালের কাঠ পচে এসেছিল। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছিল।... ছেলে-মেয়ে-বউরা এসে দেওয়াল নিকোলো। চাঁদা করে মেরামত হল টালি, পঞ্চায়েত কাঠ দিল।... হ্যারিকেনের লণ্ঠন পাওয়া গিয়েছে কয়েকখানা, কেরোসিন তেলের অবশ্য আকাল। রেশনে তেল পাওয়াই যায় না বলতে গেলে, খোলা বাজারে কেরোসিনের দাম তিনগুণ। পড়ুয়ারা সবাই মিলে আলাদা আলাদা ঝাঁপিতে জমাচ্ছে শালবীজ, মহুয়া, করঞ্জবীজ। মুঠো ভরে এনে জমা দাও সপ্তাহে সপ্তাহে, ওই বেচে তেল কেনা হবে।'[৯]

রতনের ছাত্ররা কেউ চাষ করে, কেউ তাঁত বোনে, কেউ খেতমজুর, কেউবা জেলে। সবারই রোজগারের একটি পথ আছে। সেকারণে দিবালোকে কাজের সময়ের পরে সন্ধ্যাবেলায় তারা স্কুলে আসে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কার্যসূচিতেও এই রকম (সান্ধ্যকালীন) শিক্ষা-প্রণালীর বিস্তৃত বয়ান বর্তমান। সান্ধ্যকালীন স্কুলের পড়ুয়াদের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন— 'সানঝোরা-টুয়ানডা এই দুই গ্রামের সব মিলিয়ে বাহান্ন জন পড়ুয়া। আসে কোনোদিন তিরিশ, কোনোদিন সাঁইত্রিশ, কালেভদ্রে হাটবারে তাদের সংখ্যা চল্লিশ পেরোয়। পড়ুয়াদের বয়স খাতার হিসাবে হবার কথা আঠারো থেকে চল্লিশের মধ্যে— যারা পড়তে জানে না, লিখতে জানে না, নামও সই করতে জানে না, এমন সব পড়ুয়া।... মায়েদের সঙ্গে ছেলেপুলেরাও এসে জোটে কখনো-সখনো।'[১০]

৫.

'দু-মাস পড়া চলবে, তিনটে বই আছে। ছবি দেওয়া।'[১১]

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কত সময়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত হবে তার নির্ধারিত একটি পাঠ্যক্রম থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মতো বয়স্ক শিক্ষার জন্য উদ্ভূত জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান প্রকল্পেও সচেতনভাবে নির্মিত একটি পাঠ্যসূচির কথা সর্বজন বিদিত। জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের পদযাত্রায় যাঁরা সম্মিলিত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ ছোটো নয়। তারা লিখতে পড়তে জানে না ঠিকই, তবে অবোধ নয়। সমাজে কাজের মধ্য দিয়ে তাদের টিকে থাকার শক্তি বর্তমান। তাই আলোচ্য গল্পের রতন মাস্টার সুপরিকল্পিতভাবে তার বয়স্ক-পড়ুয়াদের সাক্ষরতার কথা ভেবে এগিয়ে গেছে। পাঠ্যক্রমে পড়ার গল্প যেমন আছে, তেমনি আছে অঙ্ক ও লেখা প্র্যাকটিস করার জায়গা। রতন সেই পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করে পড়ায়। প্রথম বইটি খুব সহজ, তবে পরের বই দুটি ছাত্রদের পক্ষে বেশ কষ্টের হলেও খুদে-শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সাক্ষর করে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর। কারণ শিক্ষিত হলেই তারা মাথা উঁচু করে নাম লিখবে, হিসেব বুঝবে, নিজেদের কথা বলবে, এমনকী মহাজনী শোষণের বলগা ভেঙে বেরিয়ে আসবে মুক্তির আলোয়। অনিতা তাঁর কর্মজীবনে প্রান্তিক জীবনের বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও ছোটো ছোটো শিক্ষকদের যে দৃঢ় চিন্তার স্ফূরণ লক্ষ্য করেছিলেন তা সহজ-সরল বাক্যবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন রতনের মধ্য দিয়ে। সরতুয়া জুয়াংগ তাই বলতে পারে—

> ধরমদেও যদি চান, আমাদের অন্ধকারও যাবে। জংলি জানবরের মতন থাকি। না-বুঝি হিসাব, না-পারি পড়তে। সাঁঝ হলে ডিবরি লিভাই, ঘুমিয়ে যাই। সূর্য না-উঠলে আমাদের দিন আরম্ভ হয় না। হাঁ, পড়াও আমাদের। আমরা পড়ব, লিখব।[১২]

৬.

> 'পড়ে কী হবে মানিক আমার, এই বয়সে? আমি কী আর সায়েব-মালিক হব? আপিস যাব?'[১৩]

প্রশ্নকর্তা— রতনের মা। জঙ্গলে ঘুরে কাঠকুটো, বাঁশপাতা, মহুয়া ফুল, শাল ও করঞ্জের বীজ, কেন্দুপাতা কুড়িয়ে যার সংসার চলে সম্বৎসর; তার শিক্ষাটাকে বিলাসিতা বলে মনে হওয়ায় স্বাভাবিক। রতনের অবচেতন মনে সেই ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়— 'বাবা-মায়ের সারাটা দিনই এটা-ওটা কুড়িয়ে, বেছে, শুকিয়ে, রোদে দিয়ে... চারটে পেট চালানোর জন্য দিন-রাত পরিশ্রম। এর মধ্যে আবার পড়াশোনা?'[১৪] কিন্তু লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রী সহজ-সরল গদ্যে রতনের মুখে সেই প্রশ্নের উত্তর বসিয়েছেন সুবিন্যস্তভাবে। জমিদার, আড়ৎদারদের কাছে অক্ষরজ্ঞানহীন, হিসেববোধহীন প্রান্তিকজীবন সর্বদা শোষিত। তারা নিজেদের পরিশ্রমের, উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না। 'ঠকে'

চলে অবিরত। এপ্রসঙ্গে আলোচ্য গল্পে রতনের নিরক্ষর মার কেন্দুয়াপাতা বিক্রয় করতে গিয়ে আড়ৎদারের কাছে ঠকে যাওয়ার কাহিনি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—

> শাল বীজের পাইকার মাকে ওজনে ঠকায়, দেখেছে রতন। এই তো সেদিন কেন্দুর আড়তে মা-র পাতার গাঁটরি খুলে ওদের মুন্সি কেমন করে যেন গুনল, কী যেন হাত-সাফাই করল, তিরিশ আঁটি পাতা হয়ে গেল বিশ আঁটি। বিশ আঁটির দাম নিয়েই ফিরতে হল মাকে।[১৫]

কখনোবা পাশবিকভাবে ঠিকাদাররা রাস্তার মাটি কাটার কাজের টাকা কমিয়ে দেয় টিপ ছাপ নিয়ে। চারিদিকে তথাকথিত ‘পড়া-লিখা’ করা, হিসেবে পাকা ‘হুশিয়ার’ অসৎ মানুষেরা অসাক্ষরদের ‘বেওকুফ’ ভেবে খাটিয়ে নেয় স্বল্প মজুরিতে। এই শোষণ ও নির্যাতনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যই অন্যান্য পড়ুয়াদের মত রতনের মা-বাবাও সাঁঝ-স্কুলে আসে। কারণ শিক্ষিত হলেই তারা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে সক্ষম হবে, নিজ মুখে বলতে পারবে সুবিধে অসুবিধের কথা। মাথা উঁচু করে লিখতে পারবে নিজের নাম, ন্যাহ্য টাকা গুনে নেবে আড়ৎ থেকে। পোস্ট অফিসে খাতা খুলবে। সওয়াল করবে, মজুরি কম দিলে। বদলাবে নিরক্ষর চুপ করে থাকা দুনিয়ার চেহারা। কথকের ভাষ্যে তার সমর্থন মেল— ‘পড়লে লিখলে মানুষের আত্মসম্মান বাড়ে, সে আর দশটা মানুষের সঙ্গে কথা কয়। এ-গ্রাম, ও-গ্রামে যায়। নিজের মনের কথা বলার জন্য তার ইচ্ছে তৈরি হতে থাকে।’[১৬]

শিক্ষা বাক্‌স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করে এক বিশেষ Identity বা পরিচয়। যে পরিচয়ের সূত্র ধরে স্বাধীনচেতা মনে জাগ্রত হয় নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও অপার সাহস। সেই সাহসের বলেই নাকে সোনার নথ, চুলে বন্যফুল, জমকালো শাড়ি পরিহিত নবসাক্ষর পরজা আদিবাসী মেয়ে ওড়িশা রাজ্যের সাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিতা অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে করমর্দনের জন্য মঞ্চে উঠে এসে পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টকে বলতে পারে— ‘তুমি একটু ওপাশে সরো তো বাবু, ম্যাডামের পাশে আমরা বসবো।’[১৭] এই ঘটনায় তেমন কিছু প্রকাশিত হয় না ঠিকই, তবে এভাবেই আরম্ভ হতে পারে এক্কেবারে ‘নির্বাক’ মানুষগুলিকে নিজেদের অস্তিত্ব ও সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করার অমোঘ পণ।

৭.

‘যে বানানগুলো করতে দিয়েছিলাম, সেগুলো... হয়নি নিশ্চয়?’[১৮]

শিক্ষকের কাজ মহৎ— শিক্ষকতা মহান ব্রত।[১৯] অপরিসীম কর্মনৈপুণ্যতার মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হয়ে ওঠে ছাত্র-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। যাবতীয় অজ্ঞানতা ও অন্ধকার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে শিক্ষক ছাত্র পরম্পরার সৃষ্টি। যে পরম্পরা বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা সামাজিক পরিবর্তনশীল বিবিধ শিক্ষা-প্রকল্পের মধ্যেও নিহিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্রতের অন্যতম শরিক জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও রয়েছে ছাত্র ও শিক্ষকের একটি বিশেষ কাঠামো। যে কাঠামো

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মতো নয় ঠিকই, তবে সেখানেও বর্তমান বিশেষ বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত কৌশলে সাক্ষর করে তোলার অপার প্রচেষ্টা। আলোচ্য গল্পের মাস্টারমশাই রতনও তার পাঠশালায় নিজের কর্তব্য পালনে তৎপর। ছাত্রদের পড়াশোনা বিমুখ মনকে ঠিক পথে আনার জন্য সচেষ্ট। বয়স্ক মাকে সে যেমন পড়াশোনার গুরুত্ব বুঝিয়ে সাঁঝ-বেলার স্কুলে এনেছে সাক্ষর করার জন্য, তেমনি আপাতভাবে পড়াশোনায় অনিচ্ছুক নাথুকাকাকে গম্ভীর গলায় শাসন-পূর্বক নিয়ে গেছে সাঁঝ-পাঠশালায়— 'আরে, নাথুকাকা? কী ব্যাপার, ক্লাসে যাচ্ছ না?... কই, বই-খাতা-স্লেট... কিছু তো হাতে নেই!... বুঝেছি তোমার মতলব। চলো আমার সঙ্গে ক্লাসে বসবে।'[২০] শিক্ষক তো এমনই হওয়া উচিত, যিনি ছাত্রের উন্নতিকল্পে কখনো কঠোর হবেন, কখনোবা নমনীয় হয়ে ভালবাসবেন। ছোট্ট রতন মাস্টারও সেই পথের পথিক।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা পালন ও শিক্ষার সার্বজনিকীকরণের বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি— শিক্ষার্থীদের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রসঙ্গ। কারণ, গুণবান ছাত্র গড়ে ওঠে গুণবান শিক্ষকের সাহচর্যে—

> Of all the factors that influence the quality of Education... the quality, competence and character of teachers are undoubtedly the most significant.[২১]

সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়— DIET (District Institute of Education and Training)। যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-শিক্ষণ তথা শিক্ষকদের তালিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের দিকেও নজর দেবে। 'রতন মাস্টারের পাঠশালা' গল্পেও DIET-এর অনুসরণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষক তালিম-সভা। কারণ, সাক্ষরতা অভিযানের আওতায় আগত শিক্ষার্থীদের মানসিক জগৎ ছোটো পড়ুয়ারাদের থেকে একেবারে আলাদা। লেখক খুব কৌশলে গল্পের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়াসকেও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গল্প-কথকের ভাষ্যে তা বিশ্লেষিত—

> এ পঞ্চায়েতের সব মাস্টারমশাইদের জন্য একটা তালিম-শিবির হয়েছিল একেবারে গোড়ায়। পঞ্চায়েত-ঘরে থাকা, ডাল-ভাত রেঁধে খাওয়া মজা করে। দিনের বেলা তালিম। সেখানে হেডমাস্টার ওঝামশাই-ও ছিলেন। ওদের শেখানো হয়েছিল— বড়ো পড়ুয়ারা ছোটো পড়ুয়াদের থেকে একেবারে আলাদা। তারা হয়তো লিখতে-পড়তে জানে না, কিন্তু অবোধ নয় তারা।[২২]

সত্যিই শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন ও উপযুক্ত প্রণালীতে উন্নত শিক্ষা প্রদানের জন্য এরূপ প্রশিক্ষণ-কর্মশালা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রতন মাস্টারের পাঠশালায় পড়ুয়ার সংখ্যা— বাহান্ন জন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তারা অবগত। নইলে কি এতদিন খেটে খেতে পারত? তাদের যদি শুধু 'অ-আ' থেকে শেখানো আরম্ভ হয়, সেটা মোটেই ঠিক হবে না ভেবে রতন পড়ুয়াদের জীবনযাত্রা থেকে ছবি, কথা, বাক্য নিয়ে বৌদ্ধিকভাবে সচেতন ও সাক্ষর করতে থাকে। সঙ্গে থাকে অঙ্ক ও অক্ষরজ্ঞানের পাঠও। কখনোবা আমাদের খুদে-মাস্টারমশাই প্রথাবদ্ধ শিক্ষণরীতির পথে না হেঁটে গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠদানকে প্রাধান্য দেয়। এপ্রসঙ্গে এক গরিব আদিবাসীর মহাজন সাহুকারের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার গল্প উল্লেখযোগ্য। ধূর্ত-মহাজনের আলমারিতে ঋণ-গ্রহীতা প্রদত্ত পাথরের বেড়ে ওঠা আসলে ধার নেওয়া টাকার অঙ্কের বৃদ্ধির প্রতীক— এমন মন্তব্যকে নস্যাৎ করে রতন শিক্ষার্থীদের বোঝাতে থাকে— 'না। পাথর বাড়ে না। দুষ্টু মহজনের ওটা হল ছল। যা ইচ্ছে সুদ নেবার ফিকির।... কেউ কেউ সারাজীবন সুদ দিয়ে চলে, জমি-বেচে দেয়।'[২৩] এমনই শিক্ষক তো আমাদের প্রান্তিক-সমাজে প্রয়োজন, যিনি মহাজনী শোষণকে বয়কট করে ঋণের জন্য ব্যাঙ্কে যেতে বলবেন। যেখানে সুদের হার কম। স্বচ্ছতা আছে। অনিতা অগ্নিহোত্রী কর্মসূত্রে প্রান্তিক মানুষদের ওপর মহাজনী বর্বরতাকে অবলোকন করেছিলেন বলেই তা নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, রতন মাস্টারের হাত ধরে সেই মহাজনী শোষণ-ফাঁদ থেকে নিষ্ক্রমণের পথও দেখিয়েছেন।

ভুলের মধ্যদিয়েই ছাত্ররা শেখে। ছোটো ছোটো অঙ্কগুলি সহজ সত্ত্বেও পাঠশালার বয়স্ক পড়ুয়ারা তা ভুল করলে রতন অভিনব প্রক্রিয়ায় সেই ভুলের সূত্র ধরে এগিয়ে গেছে সত্যের তথা সমাধানের দিকে। উদাহরণ দিয়েছে মানুষগুলির প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের বিবিধ অনুষঙ্গ থেকে— 'আমাদের গাছে বাইশটা কাঁঠাল ফলেছে। পাঁচটা নিয়ে গেলাম হাটে বেচতে। তিনটে খেলাম সবাই মিলে। ক-টা কাঁঠাল রইল?... কই দেখি দাও খাতাটা।... কতকগুলো পাথরকে কাঁঠাল বানিয়ে, রতন ওদের বোঝাতে আরম্ভ করল।'[২৪] যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি শিক্ষক ছাত্র সমাজে সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন না; পড়াতে কীভাবে হয় সেটা তাঁদের অনেকেরই অজানা। কারণ, শ্রেণিকক্ষে সব ছাত্রই সমমেধার নয়। লেখক সেটি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই রতনের শিক্ষকতার মধ্যে এরূপ আকর্ষণীয় শিক্ষণ-প্রণালী প্রয়োগ করে তাকে শিক্ষার্থী ও পাঠকের কাছে প্রশংসনীয় ও প্রিয় করে তুলেছেন।

৮.

‘শিখতে চাই শিখতে চাই
শিক্ষা ছাড়া মুক্তি নাই।’[২৫]

‘রতন মাস্টারের পাঠশালা’ আপাতভাবে কৃষি এবং জঙ্গলকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠা একটি পরিবারের গল্প। পরিবারের খুদে-সদস্য রতন দারিদ্র্যের কারণে যেমন ভোরের বেলা সানঝোরা গ্রামের সীমানায় ঝুপসি বাঁশ-জঙ্গলের লাগোয়া মাঠে ছাগল চড়াতে যায়; তেমনি এ অঞ্চলে ক্যানেল না থাকায়, বর্ষায় পাথুরে মাটির বুক ভিজে উঠলে বাবার সঙ্গে মাঠে যায়। মাটিতে লাঙল পড়ে, বোনা হয় ছোটো ধান। শরতের গোড়ায় এ-ধানের ফসল ওঠে। তবে, প্রত্যহ সে পায়ে হেঁটে স্কুল যাওয়া-আসা করে, এ পঞ্চায়েতে একটাই স্কুল। তিন দশকেরও অধিক প্রশাসক-জীবনে প্রান্তিক জীবনের এরূপ বাস্তবজগৎ-কে ক্ষণে ক্ষণে লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রী দেখেছেন। দেখেছেন বর্ণিল অথবা বিবর্ণ জীবনের বেঁচে থাকার লড়াই। রতন তাই দারিদ্র্য নামক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই-এ সদা প্রস্তুত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পটি আর একটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। হয়ে উঠেছে জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গী হয়ে ক্লাস ফাইভের পড়ুয়া এক ছোট্ট-শিক্ষকের সমাজের উন্নয়নকল্পে ‘চুপ’ করে থাকা প্রান্তিক মানুষদের নিজস্ব পরিচয় প্রদান কিংবা মুখে স্বাধীন-ভাষা যোগানোর বর্ণমালা। আলোচ্য গল্পে রাজ্যের গণশিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রী নির্মেদ-গদ্যে অপরূপভাবে সেই বর্ণমালাকে লেখ্যরূপ দিয়ে পাঠকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এবং লাভ করেছেন নবসাক্ষরদের আঁকাবাঁকা হাতের লেখা অজস্র চিঠি, অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা—‘যেখানেই যেতাম, নতুন পড়ুয়াদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতাম, নতুন লিখতে শিখে প্রথম চিঠি কাকে লিখবে? তোমাকে, তোমাকে। তখন তাদের কাছে রেখে আসতাম আমার নাম ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ড। নবসাক্ষরদের আঁকাবাঁকা অক্ষর লেখা চিঠিতে উপছে উঠত আমার বাড়ির আলমারির মাথা। আজও এত বছর পর কোনও পোস্টকার্ড হঠাৎ বেরিয়ে আসে কাগজপত্রের ভাঁজ থেকে।’[২৬] লেখককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। পাঠক আপনাকে নমস্কার।

উল্লেখপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪২৭, পৃ. ১২৯

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪২৪, পৃ. ৭৬

৩. অনিতা অগ্নিহোত্রী, রোদ বাতাসের পথ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ৮১

৪. তদেব, পৃ. ৮২

৫. তদেব, পৃ. ৮৫
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৭
৭. অনিতা অগ্নিহোত্রী, ছোটোদের গল্পসমগ্র, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১২, পৃ. ১৯৪
৮. তদেব, পৃ. ১৯৫
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব, পৃ. ১৯৮
১২ তদেব, পৃ. ১৯৬
১৩. তদেব, পৃ. ১৯৮
১৪. তদেব, পৃ. ১৯৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৯৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৯৯
১৭. অনিতা অগ্নিহোত্রী, পূর্বোক্ত রোদ বাতাসের পথ, পৃ. ৮৩
১৮. অনিতা অগ্নিহোত্রী, পূর্বোক্ত ছোটোদের গল্পসমগ্র, পৃ. ২০০
১৯. ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা-পূর্ব বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষা, শিক্ষকতা ও শিক্ষক; ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৪২০, পৃ. ৫
২০. অনিতা অগ্নিহোত্রী, পূর্বোক্ত ছোটোদের গল্পসমগ্র, পৃ. ২০০-০১
২১. মানিকচন্দ্র দোলই, শিক্ষা পরিক্রমায় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৩৯৪
২২. অনিতা অগ্নিহোত্রী, পূর্বোক্ত ছোটোদের গল্পসমগ্র, পৃ. ১৯৮
২৩. তদেব, পৃ. ২০২
২৪. তদেব, পৃ. ২০৩
২৫. অজিত মণ্ডল (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি সংখ্যা, বর্ষ ৩৪ - সংখ্যা ৪৮, ৪৯, ৫০ : জুন ২০০১, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৩২৬
২৬. অনিতা অগ্নিহোত্রী, পূর্বোক্ত রোদ বাতাসের পথ, পৃ. ৮৪

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য দোষ বিচার

হরিপদ মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: জগৎ স্রষ্টা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে যেমন শব্দময় ও অর্থময় এই দ্বিবিধ ও সৃষ্ট পদার্থ পরিলক্ষিত হয়; সেই রূপ কাব্যজগতের নির্মাতা যে কবি, তার রচনাতে ও শব্দ এবং অর্থ এই দ্বিবিধ উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে। তাই অলংকার শাস্ত্রের প্রাচীনতম আলংকারিকগণ তাদের গ্রন্থা দিতে শব্দ ও অর্থ-“ শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্” এই উভয়বিধ কাব্যের উপাদান বলে মনে করেছেন। শব্দ অর্থ উভয়েই যখন কাব্যের উপাদান তখন যিনি এই উপদেশ উপাদানযোগে কাব্যনির্মাণ করবেন, তাঁকে সাবধানতা উপাদান, দ্বয়ের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে হবে। উপাদান যেমন হবে উপাদানের দ্বারা আরব্ধকার্য ও তদনুরূপ হবে।শব্দ এবং অর্থ যদি উৎকৃষ্ট হয় তাহলে সেইরূপ শব্দ ও অর্থের দ্বারা নির্মিত কাব্য উৎকৃষ্ট হবে। অন্যদিকে যদি উপাদানগত অশুদ্ধি কিছু থাকে তাহলে কাব্য অপকৃষ্ট হবে। এইরূপ বিচার প্রণালীকে অবলম্বন করেই প্রাচীন আচার্য গন কাব্যের উপাদান সংগ্রহে গুণ ও দোষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে অলংকার শাস্ত্রের সেই আদি যুগে শাস্ত্র কেবল কাব্যের শরীর ভূত শব্দ এবং অর্থের উৎকর্ষ বিষয়ই আলোচনা করেছেন। কিন্তু শব্দার্থ অতিরিক্ত কাব্যের আত্মভূত অপর কোন বস্তু যে থাকতে পারে সে বিষয়ে তাদের কোন কৌতূহল ছিল না।।

মূল শব্দ: সাহিত্য, কাব্য, দোষ, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট কাব্য।

মূল প্রবন্ধ:

কাব্যতত্ত্বের মুখ্য বিষয় হল কাব্য বা সাহিত্য। অলংকারীকরা প্রথমেই কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। মানুষের সাদৃশ্যক কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করে তারা বলেন শব্দ ও অর্থ উভয় মিলে কাব্যের শরীর, শব্দ ও অর্থের গুনগুলি শৌর্য বীর্য ইত্যাদির মত গৌড়ীয় বৈধভী ইত্যাদি রীতি বা হাত-পা চোখ মুখ প্রভৃতি অবয়বের সুষম সমন্বয়ের মতো, রচনা লাবণ্যের মতো রস আত্মার তুল্য। কাব্যের দোষ গুলি কাব্যসৌন্দর্যের হানিকর, মানুষের শারীরিক বা মানসিক ত্রুটির মত। তাই আলংকারিক বিশ্বনাথ তার সাহিত্য দর্পণে বলেছেন:” কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্,রসাদিশ্চাত্মা,গুণা: শৌর্য্যাদিবত্ দোষা: কাণত্বাদিবৎ ,রীতয়: অবয়বসংস্থান বিশেষ বৎ, অলঙ্কারা: কটককুন্ডলাদিবৎ ইতি”**১** । সুতরাং দোষগুন মিলিয়ে যেমন মানুষ এবং দোষের আতিশয্য ঘটলে তাকে অমানুষ বলা হয় তেমনি কাব্যে গুন দোষ উভয়ই থাকে। শব্দ অর্থ এবং সামগ্রিক রচনায় দোষ

বর্জনীয় , লক্ষণীয় দোষ থাকলে কাব্য দুষ্ট বা অকাব্য হয়, আবার কোন দোষ অত্যধিকভাবে রসের অপকর্ষকও হয় আর কোনটি বা স্বল্প মাত্রায় কাব্য কে দূষিত করে। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন: “নহিকীটানুবেধাদয়ো রত্নস্যরত্নত্বংব্যাহন্তমীশা:, কিন্তু উপাদদেয়তারতম্যমেব কর্তুম্, তদ্বদত্রাপি শ্রুতিদুষ্টাদয়: কাব্যস্য।“ “দুষ্যতে অনেন ইতি দোষ::" দোষ’(দুষ্+ঘঞ্)

পদটির ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ অনুসরণ করলে যার উপস্থিতি কাব্যের অনিষ্ঠজনক তাই দোষ।

ভরত:

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র গুলির মধ্যে প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ আচার্য ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র। ৩৬ টি অধ্যায় সমন্বিত নাট্যশাস্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায়ে দোষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে গূঢ়ার্থ, অর্থান্তর, অর্থহীন, ভিন্নার্থ, একার্থ, অভিপ্লুতার্থ,ন্যায়াদপেত,বিষয়, বিসন্ধি এবং শব্দচ্যুত—দশটি কাব্য দোষের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভামহ :

ভরত মুনির পরবর্তী প্রসিদ্ধ আলংকারিকদের মধ্যে ভামহ হলেন অন্যতম। ভামহ রচিত 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে -নেয়ার্থ, ক্লিষ্ট, অন্যার্থ, অবাকোখ্য, অযুক্তিমৎ, গুঢ়শব্দাভিধান, শ্রুতিদুষ্ট, অর্থদুষ্ট, কল্পনাদুষ্ট ও শ্রুতিদুষ্ট--- এই সর্বমোট ১০ টি কাব্য দোষের উল্লেখ করেছেন।

মন্মট:

কাব্য দোষএর বিবর্তনের ইতিহাসে মন্মটের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাব্য রচনা দোষা ভাবের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে মন্মটের কাব্য লক্ষণে সর্বাগ্রে 'অদৌষ' এই বিশেষণটি উল্লেখ করেছেন তিনি দোষের শব্দ, অর্থ এই দ্বিবিধ ভেদ স্বীকার করেছেন। শব্দ দোষ আবার তিন প্রকার পদ দোষ , পদৈকদোষ এবং বাক্য দোষ। তার মতে পদ দোষ ষোড়শ প্রকার।২

বিশ্বনাথ:

মন্মটের পরবর্তী প্রখ্যাত আলংকারিক হিসেবে যাঁর নাম আছে তিনি হলেন সাহিত্য দর্প্যকার প্রকার বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ তার এই গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রথমে দোষের লক্ষণ নিরুপণ করেছেন। তার মতে দোষ পাঁচ প্রকার- পদ, পদ্যাংশ, বাক্য, অর্থ এবং রস। অর্থাৎ----

“তে পুনঃ:পঞ্চধা মতাঃ"

পদে তদংশে বাক্যেহর্থে সম্ভবণিত রসেহপিযৎ।।“৩

১. পদদোষ: অসাধু, অ প্রযুক্ত, কষ্ট ,অনর্থক, অন্যার্থক, অসমর্থ, অপ্রতীত, ক্লিষ্ট, সন্দিগ্ধ, অপ্রয়োজক, দেশ্য, গ্রাম্যতা ইত্যাদি

২. বাক্য দোষ: শব্দহীন, অপক্রম, ভিন্নবৃত্তি, সংকীর্ণ ,অশরীর, ভিন্ন লিঙ্গ , ভিন্নবচন ইত্যাদি

৩. বাক্যার্থ দোষ: অপার্থ ব্যর্থ, একার্থ, অসংশ্য, অপক্রম, নিরলংকার, অশ্লীল, বিরুদ্ধ খিন্ন ইত্যাদি।

এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দোষের লক্ষণ সহ উদাহরণ হল-------

১. **অসাধু দোষ:**

যে পদ শব্দ স্মৃতিবিরুদ্ধ অর্থাৎ ব্যাকরণানুশাসন বিরোধী তা অসাধু দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে। তাই বামন বলেছেন “শব্দ স্মৃতিবিরুদ্ধম সাধু:”।৪ এর উদাহরণে বলা হয়েছে যে “অন্য কারক বৈয়র্থ্যম্” কারণ” এই পদটি। 'কিন্তু' অন্যৎকারকবৈয়র্থ্যম্ এইরুপ প্রয়োগই ব্যাকরন শাস্ত্রসম্মত। কারন 'অষষ্ঠ্যতৃতীয়া স্থস্যান্যস্য দুগাশীরাশাস্থাস্থিতোৎ - সুকোতিকারকরাগচ্ছেষু' (অষ্টাধ্যায়ী-৬/৩/৯৯/ এই সূত্রের দ্বারা 'কারক' পদপরে থাকায় অন্যশব্দান্তে ৩-কারের আগম হবে। তাই এখানে প্রকৃত স্থলে ৩-কারাগম হয়নি বলে, প্রয়োগ টি অসাধু দোষে দুষ্ট হয়েছে।

২. অনর্থক দোষ:

যেখানে কেবলমাত্র পাদ পূরণের জন্যই যার প্রয়োগ কিন্তু অর্থ প্রতীতি বিষয়ে কিছু মাত্র প্রয়োজন নেই, সেই রকম পদগুলি অনর্থক দোষে দুষ্ট বলে বিবেচিত। তাই বামনের মতে “পূরণার্থমনর্থকম্”৫

চ,তু, কিন্তু,খলু,তাবৎ ইত্যাদি অব্যয়গুলি কেবল পাদ পূরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়।এর উদাহরণ হল:” উদিতস্তু

হানিকবিনীলময়ং তিমির নিপীয়ঃ কিরনৈ:সবিতা" ৬। অর্থাৎ স্বীয় কিরণ জালে গজ বৃন্দের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ অন্ধকার কে নিঃশেষে পান করে সূর্য উদিত হয়েছে এখানে প্রথম পদে “তু” শব্দটি কেবল পাদ পূরণের জন্যই প্রযুক্ত। এর দ্বারা কোন অর্থ দ্যোতিত না হওয়ায় এই অব্যয়টি অনর্থক দোষে দুষ্ট।

৩. ক্লিষ্ট দোষ:

যেখানে প্রযুক্ত পদ থেকে অভিপ্রেতার্থের প্রতীতি ব্যবহৃত বা অন্তরিত হয় সেখানে ঐ পদবিশেষ ক্লিষ্ট দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে তাই বামন বলেছেন ব্যবহিতার্থ প্রত্যয়ং ক্লিষ্টম্। কারণ হলো জ্যোৎস্নাবিধ চন্দ্রকান্ত বেদিকার উপর জলকন্যা সমূহ চঞ্চলভাবে পতিত হচ্ছে। এই পদ্যাংশটির বিবক্ষিত অর্থ চন্দ্রকান্ত কিন্তু এই অর্থটি সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃতার্থ বোধে বিলম্ব ঘটায় এটি ক্লিষ্ট দোষে দুষ্ট হয়েছে।

৪. গ্রাম্য দোষ:

যা কেবলমাত্র লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ তাই হল গ্রাম্য দোষ। তাই মন্মট বলেছেন ---“গ্রাম্যং যৎ কেবলে লোকে স্থিতম্”। কোন দেশ বিদেশের লোকেরা সকলেই পন্ডিত

মূর্খ নির্বিশেষে যে দেশে যে পদ থেকে যে অর্থ বোঝেন সেই পদ সেই অর্থ বোঝাতে এদেশীয় গণের নিকট গ্রাম্য বলে বিবেচিত হবে।

৫. বিসন্ধি দোষ:

বিবক্ষাবশত, শ্লোকান্তগত দ্বয়ে যে সন্ধির অভাব ঘটে তাকে বিসন্ধি দোষ বলে। তাই দন্ডী বলেছেন-----

"ন সংহিতাং বিবক্ষামীত্যাসন্ধানং পদেষু যৎ।
তদ্বিসন্ধীতি নির্দিষ্টং ন প্রগৃহ্যাদিহেতুকম্।।৮

তাৎপর্য এই যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বাক্য মধ্যে পদদ্বয়ে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য নয় তা সত্ত্বেও সন্ধি করলে শ্রুতি মধুর হয় বলে শ্লোকে সন্ধি ইষ্ট হয় এবং এই জন্যই শ্লোক মধ্যে সন্ধির অভাব নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। উদাহরণ-

"মেঘানিলেন চলতা অঙ্গনাগন্ডমন্ডলে।
লুপ্তমুদ্ভেদি ঘর্মাম্ভো নভস্যস্মদ্বপুষ্যপি।।"

এখানে প্রথম পদান্তে আকারের সঙ্গে দ্বিতীয় পাদগত আদ্য আকারের সন্ধ্য ভাব নিবন্ধন হওয়ার এটি বিসন্ধি দোষে দুষ্ট হয়েছে।

৬. অপক্রম দোষ:

যে বাক্যের অর্থটি ক্রমহীন তাই হল অপক্রম দোষ। তাই স্বরূপ প্রসঙ্গে বামন বলেছেন—"ক্রমহীনার্থমপক্রমম্" ।৯

তাৎপর্য এই যে বাক্যে প্রথমে তার উল্লেখ না করলে যে ক্রমা ভাব হয় তাই। উদাহরণ হল----"তুরঙ্গমথ মাতঙ্গং

প্রযচ্ছাস্মৈ মদালসম্"-এখানে তুরঙ্গ অপেক্ষা মাতঙ্গই অধিক স্পৃহনীয় বলে মাতঙ্গম পদটির প্রথমে উল্লেখ উচিত ছিল,
কিন্তু নির্ধারিত ক্রমের লংঘন করায় এটি অপক্রম দোষে দুষ্ট হয়েছে।

সুতরাং কাব্য সাহিত্যে দোষ বিষয়ে আমরা যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা দেখতে পাই ,তার লক্ষ মহাশক্তি সম্পন্ন মহাকবি গনের রচনা নয়। যে সকল কবিগণের শক্তি পরিমিত যারা ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন তাদের রচনাগুলি মুখ্যত :এর লক্ষ্য। মূল বক্তব্য এই যে কুশলী কবি যেভাবে কাব্য নির্মাণ করেন তাতে তাদের রচনায় অল্পস্বল্প দোষ বা অসংগতি থাকলে ও অনেক অনেক গুণের সমাবেশে তা ঢাকা পড়ে যায় যেমন চাঁদের কলঙ্ক থাকলে ও অমল জোৎস্না ধারায় তা লঘু হয়ে যায় তেমনি কাব্যেও সাধারণ দোষ দুচারটি থাকলে ও তাতে কাব্যের কাব্যত্বহানি ঘটে না।

তথ্যসূত্র :

১. সাহিত্য দর্পন, বিশ্বনাথ, ১- পৃ:১৪
২. কাব্য প্রকাশ ৭/৫০ -৫১

৩. কাব্যলঙ্কার সূত্র বৃত্তি ২/১/৫
৪. কাব্যলঙ্কার সূত্র বৃত্তি ২/১/৯
৫. কাব্যলঙ্কারসূত্র বৃত্তি ২/১/৯
৬. কাব্যলঙ্কার সূত্র বৃত্তি ২/১/৯
৭. কাব্যলঙ্কারসূত্র বৃত্তি ২/১/২১
৮. কাব্যাদর্শ ৩/১৫৯
৯. কাব্যলঙ্কারসূত্র বৃত্তি ২/২/২২

গ্রন্থসূচী :

১. ঝালকিকর (সম্পা) মন্মটপ্রনীত কাব্যপ্রকাশ,বোম্বে,১৯০১ খ্রী:
২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিমলাকান্ত (সম্পা) বিশ্বনাথ প্রনীত সাহিত্য দর্পণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার কলকাতা ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।
৩. ভট্ট রত্নগোপাল(সম্পা) বামনপ্রনীত , কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি:, বারানসি সংস্কৃত গ্রন্থমালা বারানসী ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।
৪. শাস্ত্রী নাগ নাথ(সম্পা), ভামহ প্রণীত কাব্যালংকার বারানসী সংস্কৃত গ্রন্থমালা বারানসী ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
৫. শর্মা, উমাশংকর সংস্কৃত সাহিত্য ইতিহাস চৌখম্বা ভারতীয় একাডেমী বারানসী ২০১৯।
৬. ত্রিপাঠি রাধাবল্লভ, সংস্কৃত সাহিত্য অভিনব ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন , বারাণসী ২০১৩।

কাঁকড় পথ থামবে দরজায় : অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

সুরজিৎ প্রামাণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ : বাংলা কবিতার ঐতিহ্যময় স্রোতের চির প্রবহমান ধারায়, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা নিশ্চিতভাবেই স্মরণীয়। বিদেশের মাটিতে বসেই সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যান্য কবিদের মতো কবি অমিয় চক্রবর্তীও বাঙালি কবিতা পাঠককে ঐশ্বর্যলোকের সন্ধানে মগ্ন করতে পেরেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রায় দু'দশক আগেই এ পৃথিবীর মস্তিষ্ক ঝাঁকিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেল, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণ-ডঙ্কা বেজে ওঠার একেবারেই প্রাক-মুহূর্তে প্রকাশিত হল অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কাজেই তাঁর কবিতার ভাষায় বিশ্ব-পরিস্থিতির উন্মত্ত বিমূঢ়তার ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠল স্বাভাবিকভাবেই। তবে শুধুমাত্র তাই নয়, এ সবকিছুর মধ্যেও প্রবাস জীবনের সীমা পরিসীমা জুরে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে জমে ওঠা নির্জন প্রকৃতি, জল মাটি হাওয়ায় সিক্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, আর প্রবাস থেকে নিজ বাসভূমে ফেরার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার রঙ নিজের মর্মে মর্মে যেমন অনুভব করেছেন অমিয় চক্রবর্তী, তেমনি তাঁর কাব্যবোধের অভিমুখেও সেই ভাবনার ছাপ পরিস্ফুট। তবে একজন কবির সৃষ্টি বৈভব স্বাভাবিকভাবেই যেমন একাধিক মাত্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে, একইভাবে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাও কোনো অংশে সেই ধারণার ব্যতিক্রম নয়। সর্বোপরি কাব্যবোধের নিগূঢ় নির্যাসে একজন বাঙালি কবি বিদেশের মাটিতে নিত্য বসবাসের কালে, কীভাবে স্বদেশে প্রত্যাগমনের স্বপ্নে অহর্নিশি বিভোর থেকেছেন, সেই বিষয়টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই বর্তমান আলোচনার প্রধানতম কেন্দ্রবিন্দু। তাই তাঁর কবিতায় জারুলের বেড়ার ধারে কাঁকড়ের পথ এসে থামে দরজায়। যে দরজার প্রান্তদেশে অপেক্ষারত সংসার তাঁর সত্তাকে দুলিয়ে দিয়ে যায় অহরহ। তাঁর চোখের তৃষ্ণায় উঁকি মারে মনের স্মৃতি-চিহ্নেরা। এভাবেই প্রবাস জীবনের দীর্ঘ আস্তিন কাটিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় ক্লান্তির অবকাশে সহসা মুক্তির স্বাদ এনে দেওয়া বাস্তুভিটে অথবা জন্মভূমির ইশারায় নিরন্তর উন্মুখ থেকেছেন এই কবি এবং ভিনদেশের ইজিচেয়ারে বসেই স্বদেশের ফুল ফল শস্যখেতের রামধনুময় ছবি প্রশস্ত করেছেন অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতার ক্যানভাসে। তাই তাঁর কবিতা, অনিবারণীয় তৃষ্ণা জেগে থাকা বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে অনিবার্য সম্পদ হয়ে উঠল অনায়াসেই।

সূচক শব্দ : অমিয় চক্রবর্তী, বিদেশ-স্বদেশ, আকুলতা, আকাঙ্ক্ষা, বাংলার প্রান্তর, স্নিগ্ধ প্রকৃতি।

মূল আলোচনা :

'মানুষের প্রাণে তবু অনন্ত ফাল্গুনী----
তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি।'[১]

('চিরদিন')

প্রতিটি মানুষেরই প্রাণের গভীরে অনন্ত ফাল্গুনী স্পন্দিত হয় কোনো না কোনো ভাবে। আর কথারা নিত্য প্রবাহিত হয় ভাবনার অবকাশে। না বলা কথা অথবা বলে ফেলা কথার পথ ধরে, কবিতা আসে কাব্য-সাধকের আঙিনায়। তারপর শিল্পের পরিব্যাপ্ত কাঠামো জুড়ে জীবনবোধের ভাষ্য রচনা করে চলেন শিল্পী তাঁর ভাবনা-বিশ্বের বিস্তৃতিতে। অমিয় চক্রবর্তী তেমনি একজন শিল্পী, যিনি ঘরে ফেরার প্রতিধ্বনি নিয়ে জীবন-বোধেরই এক অবিমিশ্র ধারাপাত লিখে গেছেন প্রকৃতির নিঃশব্দ বাতায়নে, প্রবাসের ঠিকানায়। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রজ্জ্বলিত দীপ্তি যখন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যগগনে উৎফুল্লমণ্ডিত, তখন যে সকল কবি কবিতার দিগন্তে স্বতন্ত্র স্বর ও সুরের নব দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হলেন, কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্যের কালে অমিয় চক্রবর্তী উদিত হয়েও, সাহিত্য সচিব রূপে রবীন্দ্রনাথের অতি নিকট সান্নিধ্য পেয়েও, তিনি কিন্তু কাব্যিক বোধে রাবীন্দ্রিক মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন না। নিজস্ব কাব্য-প্রতিভার স্বকীয় প্রভায়, বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে একটি চির-স্মরণীয় আসনের অধিকারী হলেন, কবি অমিয় চক্রবর্তী।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে সরাসরি রবীন্দ্র বিরোধের উন্মোচন না থাকলেও, সৃষ্টির একনিষ্ঠতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনা থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এর পিছনে একাধিক কারনও রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারন বোধ হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর নিবিড় পাঠের দক্ষতা এবং প্রবাস জীবন। কাজেই আলোচনা শুরুর প্রাড়ম্ভে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের গতিমুখটি দেখে নেওয়া যাক। ১৯২১ সালে হাজারিবাগ থেকে বি.এ. পাস করে, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অনুশীলন-ছাত্র ও শিক্ষক রূপে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন অমিয় চক্রবর্তী। এরপর বিশ্বকবির সচিব হয়ে ওঠেন ১৯২৪ সালে। ১৯২৬ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সফর সঙ্গী হন। পরে অক্সফোর্ডে যান এবং রবীন্দ্রনাথের সচিব পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪০-এ বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন পুনরায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি বহাল থাকেন এই চাকরিতে। পরবর্তীতে আবার সপরিবারে তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ফলে অমিয় চক্রবর্তীর জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, তিনি জীবনের সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশের মাটিতে কাটিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র অমিয় চক্রবর্তী নন, যে কোনো

কবির কাব্যিক অনুভূতির অন্তরঙ্গ ব্যাপ্তি অনুধাবনের জন্য তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রকৃতি ও পরিধিকে বোঝা ভীষন দরকার। এক্ষেত্রে আবার অমিয় চক্রবর্তী বা পরবর্তীকালের অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখের মতো কবিরা, যাঁরা জীবনের প্রভূত সময় বিদেশের ঝাঁ-চকচকে বৈভব দেখে কাটালেন, আবার তাঁরাই যখন কবিতার অক্ষরে বাংলার জল-মাটি-হাওয়ায় পুষ্ট শস্যপ্রতিমা নির্মাণ করলেন, তা তো নির্ঘাৎ বিস্ময় হয়ে দাঁড়ায় বাংলা কবিতার পাঠক সমীপে। স্বাভাবিক ভাবে অমিয় চক্রবর্তী বিদেশের মাটিতে জীবনের সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেও, তাঁর কাব্য-বোধের সুক্ষ তুলিতে বিদেশের বৈভব প্রদর্শন হওয়ার পরিবর্তে বরং ঘরে ফেরার প্রতিধ্বনি কিংবা ফিরতে না পারার আক্ষেপ অনেক বেশি মাত্রায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যা একথায় কবির জন্মভিটে বা জন্মভূমির কোলে ফিরে আসার প্রবল আকুতিই বলা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে হয়তো তিরিশের অন্যতম কবি জীবনানন্দ দাশের কথাও আমাদের মনে পড়বে। 'সুচেতনা' কবিতায় জীবনানন্দ লিখছেন,----

'মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়----
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।'[২]

----('সুচেতনা' : জীবনানন্দ দাশ)

আসলে মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে আসার সংকেতে কবি বোঝাতে চান, যে জীবন ফড়িংয়ের-দোয়েলের সেই জীবনকে মানুষের সাথে দেখা করাতে হবে। অর্থাৎ শস্য-শ্যামল বাংলার শ্যামলিমায় যে অনাবিল সৌন্দর্য আছে তা পাশ্চাত্যে বিরল। কিংবা 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়' এখানেও কবি বাংলা মায়ের কোলে, বাংলার প্রকৃতির কোলে পুনরায় ফিরে আসার গভীরতর আবেদন জানান। কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও আমরা দেখি প্রবাস জীবনে, দেশে ফেরার বাসনা প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। একইভাবে কবি বিষ্ণু দে-ও তাঁর 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের 'গান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন,----

'পরবাসে রবে কে এ পরবাসে
আজীবন দীর্ঘ পরবাস----'[৩]

----('গান' : বিষ্ণু দে)

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য আলোচনায় আমরা দেখি, তাঁর সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর কাব্যিক জীবনে, একের পর এক যে সমস্ত কবিতা তিনি বাঙালি কবিতা পাঠককে দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠকের মনে দোলা দিয়ে যায় এবং পাঠককে

গভীরভাবে ভাবায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসরা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এরপর একাধিক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের তিনি প্রণেতা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তীতে যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ তিনি বাংলা কবিতার আকাশে নক্ষত্রের মতো গেঁথে গেছেন, সেগুলি যথাক্রমে---- 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরযানী' (১৯৪৪), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'শ্রাবণ' (১৯৫৩), 'পালা-বদল' (১৯৫৫), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড', (১৯৬৬), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭), 'অমরাবতী' (১৯৭২), 'অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৩), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬), 'নতুন গল্প কবিতা' (১৯৮০) ইত্যাদি। 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পান ১৯৬৩ সালে।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' যখন প্রকাশ পায় (১৯৩৮), তখন তিনি অক্সফোর্ডে রয়েছেন। নিজের পড়াশোনা বা গবেষণার কাজে অক্সফোর্ডে থাকলেও, 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে উঠে এল গ্রাম বাংলার সবুজ সতেজ জীবন, গ্রামের শ্যামল প্রকৃতি, বাংলাদেশের বিশুদ্ধ জল ও মুক্ত হাওয়ার কথা। অমিয় চক্রবর্তীর উপলব্ধিতে ফুটে উঠল বাংলার মাটির জীবন্ত সত্তা। যে সত্তা আকাশের জলে পুষ্ট হয়ে, লাঙলের ফলায় শস্য বোনার উপযোগী হয়ে ওঠে। শস্য বোনে গ্রাম্য বধূ-রমণী কিংবা যুবক, তার নিপুন হাতের কারুকার্যে। মাঠে মাঠে আল দেওয়া রৌদ্র বলয় শোভিত হয়ে ওঠে সোনার থালার মতো। সোনার পাকা ধানে মাঠ ভরে গেলে, কিংবা সর্ষের হলুদ আভায় মাঠ হলুদ হয়ে গেলে, মানুষের হাতে কাজ থাকে। থাকে জীবিকার আহ্বান। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে এগিয়ে চলে বাংলার জনজীবন- সংসার। কবি তখন সারাদুপুর ব্যস্ত থাকেন যুগের কর্ম-প্রচেষ্টার রূপ ফুটিয়ে তুলতে। যে মাটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম; যে মাটি পৃথিবীর সর্বাধিক উর্বর; যে মাটিতে নক্ষত্রের যাবতীয় সঞ্চয় লুকানো আছে; যে মাটির গভীরে সোনা, হীরে, অঙ্গার, আগুন বয়ে যায়, আর উপরে প্রবাহিত হয় অনন্ত স্রোতস্বিনী নদী-নর্মদা, সেই মাটির কাছাকাছি নিজেকে নিয়ে যেতে গিয়ে কবির মনে হয় একটা জীবন বড্ড বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। তবু কবির প্রকাণ্ড বুকে সেই মাটির ঐশ্বর্য লুকিয়ে থাকে। আর তা থাকে বলেই তিনি বলতে পারেন,----

'এই মাটি। বাংলার; ভারতীয়; পূর্ব খন্ড; পৃথিবীর;
গ্রহমণ্ডলের মাটি। এক জীবনে বাঁধা।
তলে হীরে, সোনা, অঙ্গার, আগুন; জীবের
সম্ভব-ভরা উপরের স্তরে সবুজ প্রবাহিণী নর্মদা।
রাত্রি মাঠ। তারা জ্বালা, প্রদীপ-জ্বালানো পথ, ঘর।
মেলাবার দৈব, এই মাটি জুড়ে আমার বুকে
সত্তার আঁধারে জানাও তুমি একবার,

কোন মিল মৃত্যুর, মাটির, ভবিষ্যতে? ভোরের জীবন-লোকে?'৪

----('যৌগিক')

সুতরাং কবি অমিয় চক্রবর্তীর নাড়ির টান যে স্বদেশের প্রতি এটা বুঝতে পাঠকের আর বাকি থাকে না। স্বদেশের কলকারখানার লক্ষ লক্ষ মরচে পড়া চাকার শব্দের ভিড়ে পুরোনো ফ্যাক্টরি চলে। গতির তাণ্ডবে আরেকটু গতির লাগে জোয়ার। আর বাড়ি ফেরার পথে দরজার সামনে কাঁকড়ের পথ আর জারুলের বেড়া চোখের তৃষ্ণায় তৃপ্তি এনে দেয় অমিয় চক্রবর্তীর। যা প্রকারান্তরে বাংলা কবিতার পাঠককেই পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু কবি তো তখন অনেক দূরে-দূরতর কোনো এক দ্বীপে অবস্থান করেন। তাঁর মনের স্মৃতির ঢিবিতে উঁকি দেয় সংসার। বাড়ি ফেরার ভাবুকতায়, চেনা কচি গলার আওয়াজ তাঁকে ভরিয়ে তোলে আহ্লাদে। সন্ধ্যা হলে, আলো হাতে স্থির দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে কাতর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়জন। পাথরের সভ্যতায় উজ্জ্বল মোরক থাকলেও, কবি তবু সময় কাটাতে চান সেই শিবতলার গঙ্গার পাড়ে- ভাঙা ঘাটে। কারণ আমরা চেনা পরিবেশের কাছে বারবার ফিরে যেতে চাই। এ তো বিশ্ব-সংসারের পটভূমিকায় মানব-মনের অতি স্বাভাবিক প্রবনতা। অমিয় চক্রবর্তীও তাই, যে প্রকৃতির কোলে তাঁর বেড়ে ওঠা তা তিনি কীভাবে ভুলে যাবেন! গঙ্গার পাড়ে চোখ রাখলে যেখানে মাছ জলে খেলা করে, পাখি উড়ে যায় দিগন্তের দিকে, সঙ্গী-সাথীরা ভেঁপু বাঁশি বাজায় 'পথের পাঁচালী'-র অপু-দূর্গার মতো, সেখান থেকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে গেলে, কবির কি চেতনার স্রোত বদলায়! প্রতিটি গরিব বাঙালির মতো তিনিও তাই ছেঁড়া চটি পড়ে চলে যান 'আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে'। তাই এ কথা বলা যায় যে, অমিয় চক্রবর্তী তাঁর আন্তর্জাতিক অবস্থানের মধ্যেও, শিকড় আঁকড়ে থাকেন বাংলার। যা নিঃসন্দেহে প্রসংশাযোগ্য। 'সংলাপ' কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর সেই সংলাপ নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে পাঠকের,----

'আশ্বিনে সানাই বাজে, শোনো দূর শ্রুতি।
আজ আমার বুক ভরা, সবাইকে শ্রদ্ধা করে বলি:
সুন্দর স্বাগত দিলে, দেখো ছুটি অর্জেছি
দুই তীরে,
আন্তর্জাতিক মন শিকড়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে
যে-মাটি এ-বুকে আজো বাংলা পার্থিব,
যদি ফোটে মেঠো ফুল, তাই নাও সেই মাটি থেকে
যাত্রী-অর্ঘ্য নব বৎসরের।।'[৫]

----('সংলাপ')

অন্যত্র আবার 'বৃষ্টি' কবিতায় তিনি শহরের পথে অন্ধকার নামার চিত্র ফুটিয়ে তোলেন, বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতির শোভায়। যে শহর বৃষ্টিতে মুখরিত হতে পারে, সে শহর

থেকে বহু দূরে অবস্থান করলে, অসম্ভব কান্নাকাটিতেও সেই বৃষ্টিভেজা শহরের বিচিত্র শোভা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন এক গভীর হতাশা বা সুন্দরকে না পাওয়ার চরমতম আর্তি। জলে ভেজা রাস্তার দু'পাশে পাথর ভিজে যাওয়া অথবা আকাশে বর্শার ফলার মতো জ্বলে ওঠা বিদ্যুৎ-রেখা দেখে বয়সের ভারে বড়ো হয়ে ওঠা যে জীবন, সে জীবন অচেনা দেশের পথে যাত্রা চালালে, একবুক আর্তনাদ আর ক্রন্দন ঝরে পড়ে ঝর-ঝর করে শুকনো পাতার মতো। আর অনন্ত প্রকৃতির কোলে বর্ষার তটরেখায় প্রথম যে ঝংকার সৃষ্টি হয়, সেই ধ্বনিটির প্রতিধ্বনি থেকেই যেন অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য-প্রতিভার সত্তায় লাগে দোলা। তাঁর সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টি দিলে মাটিতে দাঁড়ানো গাছের বিহ্বল প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। প্রিয় মানুষ তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে কাতর দৃষ্টির ডালা পথে সাজিয়ে রেখে। অথচ প্রবাসী কবির চোখে প্রবাসের জীবনে প্রিয়জনের সে দৃষ্টির সন্ধান মেলে না। কাজেই চৈতন্যের নিবিড় অন্বেষণে অমিয় চক্রবর্তী ফিরে আসেন নিজের চেনা শহরের প্রান্তে অথবা গ্রামের মেঘে ঢাকা বটবৃক্ষের ছায়ায়। তাই 'বৃষ্টি' কবিতায় লেখেন,----

'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।
ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।'[৬]

----('বৃষ্টি')

অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে পরবর্তী একাধিক কাব্যগ্রন্থের অজস্র কবিতায় তাঁর এই স্মৃতি কাতরতার ছবি স্পষ্ট। একাধিক কবিতায় তিনি ঘরে ফেরার প্রতি প্রবল ঔৎসুক্য জানান। যে ঘরে তাঁর সংসার পাতা আছে মাটির বারান্দায়। নিকানো উঠোনে মাটির পিঁড়িতে বসে ভাত রাঁধেন মা। আর গ্রাম্য বধূর সুশীতল যাত্রাপথে পড়ে থাকে দৃষ্টির সুক্ষ অবয়ব। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এভাবেই যে বঙ্গ-প্রকৃতির গভীরতর আবেগ ফুটে উঠেছে, সংগত কারণেই তা ভাবা যায়। তাই কাজের টানে বা কর্মের আহ্বানে তিনি বিদেশে গেলেও, শান্তিনিকেতনের স্মৃতি তাঁর ভাবুকতা এড়িয়ে যায় না। তিনি যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু রেখে গেছেন ওই শান্তিনিকেতনেই। অক্সফোর্ডে বসেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন,---- 'আশ্রম কে চিরদিনের জন্য ছেড়ে এলাম। আমার জন্ম, আমার মৃত্যু ওখানে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ওখানে রয়ে গেল।'[৭] ফলে, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য-কৃতিতে যে বাংলার স্বপ্ন ও বঙ্গ

প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা ভরা দৃষ্টিকোণ বারবার উঠে এসেছে, তা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের 'সান্টা মারিয়া দ্বীপে' কবিতাটিকে তিনি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করলেন এবং গাঁয়ের দুজন লোক, বিধবা বোন, বিদেশি পথিক বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর জবানিতে তাদের বৈচিত্র্যময় অভিমত ব্যক্ত করতে চাইলেন তিনি। আসলে তা যেন একপ্রকার নিজেরই ব্যক্তি-জীবনের ভাবনা লিরিক্স। কাজেই কবির অনুসন্ধিৎসু মন ভাবতে থাকে, অ্যান্টনি যদি সবুজ ভিজে মাটির তলায় গির্জার কাছে দেহ রাখে, তার দেহের উপরে যদি পাথরের সড়কে নিজের নাম খোদাই করা হয়, আর সে যদি মাটির অতলে গিয়ে বুকে পাথর চাপিয়ে স্বর্গধাম পায়, তাতে কি সে শান্তি পাবে! সেখানে শান্তি নেই কারণ মাটির গভীরে উইলো গাছের ঝর-ঝর শব্দ শোনা যায় না। তাই সকলের একত্রিত কণ্ঠস্বরে কবি শোনান----

'(সকলে)
''অ্যান্টনি, ভুলিনি আমরা, গির্জে ছেড়ে চলি যদি ঘরে;
পরে শেষ-ঘরে যাওয়া, তফাৎ কেবল আগে-পরে।।''[৮]

----('সান্টা মারিয়া দ্বীপে')

অন্যদিকে 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থের 'ঘর' কবিতাতেও কবি সেই ঘরের নির্নিমেষ প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন,----

'বাড়ি ফিরেছি।
জারুলের বেড়া; কাঁকর পথ থামবে দরজায়;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।
অনেক দেশ
চোখের তৃষ্ণায় ঘিরেছি।
অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
মনের স্মৃতির ঢিবি'[৯]

----('ঘর')

অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ('খসরা') পাঠ করার পর কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিত্ব শক্তির কথা প্রকাশ করলেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। যে কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে সাধারণ কবিতা পাঠককেও বিস্মিত হতে হয়। নিতান্তই মারপ্যাঁচহীন, সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় কবি, প্রকৃতির অমোঘ সত্তার কাছে যেভাবে মিলিত হতে চেয়েছেন, তা দেখে পাঠকের মনে চমক তো লাগবেই। কাজেই অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলে একজন সাধারন কবিতা পাঠক যে অনায়াসেই তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক হয়ে যান, এ কথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়। বুদ্ধদেব বসুর কথায়,----

'বিস্ময়কর বই; খুলে পড়তে বসলে পাতায় পাতায় মন চমকে ওঠে। বাংলা কবিতার পাঠকের কানের ও মনের যতগুলো অভ্যাস আছে; তার একটাও প্রশ্রয় পায় না, বরং প্রহৃত হয়। . . . দু-চারটি কবিতা পড়তে পড়তে উপহাসের ঝোঁকটা লজ্জিত ও পরাস্ত হয়; বিস্মিত মন সানন্দে স্বীকার করে যে এখানে প্রকৃত কবিত্বশক্তির সাক্ষাৎ পেলুম।'[১০]

----(কবিতা পত্র : বুদ্ধদেব বসু)

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী, অমিয়; শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ : মে ২০১৯, পৃষ্ঠা-৫০

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ; (সম্পাদিত) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃষ্ঠা-৯৩

৩। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৫২

৪। চক্রবর্তী, অমিয়; শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ : মে ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৩

৫। তদেব; পৃষ্ঠা-৫৫

৬। তদেব; পৃষ্ঠা-৫০

৭। মুখোপাধ্যায়, তরুণ; বাংলা কবিতা অনেক আকাশ; প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: বইমেলা ২০১২, পৃষ্ঠা-২১০

৮। চক্রবর্তী, অমিয়; শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ : মে ২০১৯, পৃষ্ঠা-৭০

৯। তদেব; পৃষ্ঠা-১৪

১০। মিশ্র, ড.অশোককুমার; আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: অক্টোবর ২০২০, পৃষ্ঠা-২১৯

সমাজকল্যাণে সারদাদেবীর ভূমিকা-একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

রাজেশ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ (অটোনোমাস)

সারসংক্ষেপ : রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ মা সারদা দেবীকে জগজ্জননী হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকেন। বাস্তবিকই তিনি করুণাময়ী মা। সমাজ কল্যাণে তার ভূমিকা অপরিসীম। সামাজিক একতা, আধ্যাত্মিকতা ও নারীর ক্ষমতায়নের তিনিই প্রকৃত প্রতিনিধি। তাঁর ত্যাগ, সেবা, সকলকে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা তাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বালিকা বেলা থেকেই তিনি সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। রামকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী হিসেবে তিনি ঠাকুরের ভক্তদের সেবা করেছেন। তবে তাঁর প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশিত হয় রামকৃষ্ণদেবের দেহ রাখার পর। তিনি প্রথমে সংঘ জননী রূপে চিহ্নিত হন এবং ক্রমেই জগৎ জননী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই চারিত্রিক বিবর্তন চরম আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সমস্ত শক্তির তিনি আধার হতে সক্ষম হয়েছিলেন নিজ গুনে। নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা বিষয়ক আলোচনায় তাই তিনি সত্যিই প্রাসঙ্গিক। এই সমতা নারী পুরুষের সমতা, হিন্দু মুসলমানের সমতা, গৃহী সন্ন্যাসীর সমতা। সমাজ কল্যাণে হাতে খড়ি তাঁর কখন হলো? রামকৃষ্ণদেবের পত্নী হিসেবে ভক্তদের সেবা তিনি কিভাবে করেছেন? কিভাবে তিনি সংঘ জননী হয়ে উঠলেন? কেন তাকে বিশ্ব জননী বলা হয়? আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে। একজন গ্রাম্য সাধারন নারী ক্রমশ অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। সকলেই তাঁর কাছে সমান ছিলেন। দুর্বল, সবল, হিন্দু, অহিন্দু, সকলের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই বিশেষ দৃষ্টির জন্যই তিনি বিশেষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ক্রমশই হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের শক্তি। ভারতীয় নারীর মহান আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর মধ্যে।
মূল শব্দ - ত্যাগ, সেবা, আধ্যাত্মিকতা, সমাজকল্যাণ, সমতা, জননী

ভূমিকা

সেই দূর অতীত থেকেই ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীত্ব এবং নারীদের বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে; এপ্রসঙ্গে ঋকবৈদিক যুগীয় সমাজে নারীদের বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে অন্যদিকে পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে একেবারে মধ্যযুগ পর্যন্ত কালপর্বে বিকশিত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যরাজিতে, সমাজে এই নারীদের অবস্থান ও মর্যাদার ক্রমবনতির দিকটা প্রত্যক্ষ

করা যায়। বস্তুত এই কালপর্বে সমাজে নারীরা আগে যে স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তা তাদের কাছ থেকে হরণ করা হলো এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর দরুণ তারা সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অবহেলিত হল। আর এরই ফলস্বরূপ শিক্ষার দীপশিখার বদলে তারা ক্রমশ কুসংস্কার এর আঁধারে তলিয়ে যেতে লাগল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় ইতিহাস নারীসমাজের এই অধঃপতিত রূপই প্রত্যক্ষ করল।

তবে সব আঁধার নিশার অবসান ঘটেই একদিন না একদিন। নতুন ভোরের আগমন ঘটে; আর ঠিক তদ্রূপ ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আবহে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও গান্ধীজীর সামাজিক আন্দোলনকে পাথেয় করে নারীরা ধীরে ধীরে পুনরায় সমাজে তাদের হৃতমর্যাদা ফিরে পেতে শুরু করে। বস্তুত ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ও নারীদের যথাপূর্বক সম্মান প্রদর্শনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আবার অন্যদিকে গান্ধীজী ভারতমাতার মুক্তি আন্দোলনে বহু নারীদের সামিল করে তাদের সমাজের মূলস্রোতে সংযুক্ত করেন। আর এভাবেই ধীরে ধীরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারীদের বন্ধনমুক্তির প্রক্রিয়া সূচিত হয় এবং তারা ক্রমে শ্রী শ্রী ঠাকুর ও স্বামীজি প্রদত্ত আদর্শ জীবনের শিক্ষাকে সোপান করে আধুনিকতার যাত্রা পথে ধাবিত হয়। এপ্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বর্তমানকালে নারী স্বশক্তিকরণ, নারী বিদ্যা, লিঙ্গ সাম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সাম্প্রতিককালের সামাজিক আন্দোলন, নব্য সামাজিক আন্দোলন বর্তমানে 'নারীকে' বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। আর এই প্রসঙ্গেই তাই এখন জগজ্জননী শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর অনন্য দিব্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বস্তুত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে শ্রী শ্রী মায়ের প্রথম পরিচয় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিনী তথা লীলাসঙ্গিনী। তবে তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হল তিনি রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের 'সংঘ জননী'। বস্তুত, শ্রী শ্রী ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর তিনিই ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে অঙ্কুর থেকে বৃক্ষে পরিণত করবার মানসিক শক্তি প্রদান করে নিজেকে প্রকৃত সংঘ জননী রূপে অধিষ্ঠিত করেন। আর সেই শুরু থেকে শুরু করে এযাবৎকাল পর্যন্ত তিনিই রামকৃষ্ণ সংঘের সমস্ত সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ তথা সমস্ত জগৎবাসীর হৃদয়ে সকল অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সদা বিরাজমান রয়েছেন।

সকলের সেবায় মা সারদা দেবী

শ্রী শ্রী মায়ের পুন্যাবির্ভাব বাঁকুড়া জেলার অভ্যন্তরস্থ জয়রামবাটি গ্রামে, যেখান থেকে তিনি তার মানবমুখী সমাজসেবার কার্য সূচিত করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনীর প্রধান সেবায়েত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর কিছুকাল পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী স্বরূপ দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ক্রমে তাঁর অপার করুণা সুধা বর্ষণ করে ভক্তদের কাছে হয়ে ওঠেন প্রকৃত 'গুরু মা'। বস্তুত, এই সময় থেকেই একজন তথাকথিত গ্রাম্য, নিরক্ষর

শ্রীমা ঠাকুরের ভক্তদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বস্তুত, তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, মমতাময়ী, কল্যাণময়ী রূপ এবং গভীর ভগবদ্ভক্তিই তাঁকে লোকপ্রিয় করে তোলে। এর সাথে সাথেই তাঁর অনন্য অসীম ব্যক্তিত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে এক উদারনৈতিক পরিবেশ সৃজিত করে। আর এতেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন তৎকালীন বাংলার মহৎ হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা। আর এভাবেই তিনি কোনোরকম তথাকথিত আন্দোলন বা রাজনীতি ব্যতিরেকেই হয়ে ওঠেন রামকৃষ্ণ সংঘের মূল কেন্দ্র স্বরূপ। "আমি যেমন দুষ্টের মা, তেমনি আমি সদাচারীদের মা। কখনো ভয় পেয়ো না। যখনই তুমি কষ্ট পাও, তখন শুধু নিজেকে বল 'আমার একজন'মা আছে।'" ১ বস্তুত, তাঁর এই বাণীই তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও পরম মমতার সর্বোত্তম উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমা জানতেন কীভাবে ভালোবাসতে হয় আর তার জন্যই ভক্তরা কোনোরকম ভয়ভীতি ছাড়াই মাকে স্বীকার করেন।

স্নেহময়ী মা সারদা দেবী

শ্রীমায়ের ভালোবাসার পরম শক্তিকে কোনো তত্ত্বের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এ ভালোবাসা স্বার্থ প্রসূত জাগতিক নয় এ ত্যাগপ্রসূত পারমার্থিক। বস্তুত, সকল প্রকার সন্তানের প্রতিই তাঁর অপার করুণা এবং স্নেহ সুধাই তাঁকে 'বিশ্বজননী'- তে পরিণত করেছে। সন্তানের দুঃখ-দুর্দশা ঘোঁচাতে তথা তাঁর সৎ অসৎ সকল সন্তানকে প্রকৃত জীবন যাপনের পথনির্দেশ দিতে তিনি তাঁর পবিত্র জীবনকে উৎসর্গ করেন। আর এই কারণেই তিনি হয়ে ওঠেন 'সকলের' মা। বস্তুত তাঁর পবিত্র জীবনী অনুধাবন করলে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ মিলবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনও তাকে 'সংঘ জননী' হিসেবে গ্রহণ করেছিল তাঁর এই মহানুভবতা ও পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যেই। বস্তুত, ভক্তদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনিই ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা। ঠাকুরের ভাবাদর্শে গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সূচনালগ্ন থেকেই স্বাধীনতা, বাস্তবিকতা, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও উদারনৈতিকতায় বিশ্বাসী। আর মিশনের এই বৈশিষ্ট্যই শ্রী শ্রীমাকে বিশ্বজননী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর শাশ্বত উপদেশ, " কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে সূঁচ ফুটবে.....।"২

পবিত্রতার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রী শ্রী মা -ই ছিলেন রামকৃষ্ণ আন্দোলনের পশ্চাতে সদা অবস্থানরত অনন্ত শক্তি। শ্রী মা সারদার দেবীর কথায়, "কেউ যদি উন্নত কিছু লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে সচেতনভাবে পরিশ্রমী ও দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। যখন আমি নহবতের ঘরে থাকতাম, তখন এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে গঙ্গার জলে প্রতিফলিত চাঁদকে দেখে কেঁদে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, 'চাঁদের গায়ে পর্যন্ত কলঙ্ক রয়েছে কিন্তু আমার মন যেন সম্পূর্ণ কলঙ্ক মুক্ত থাকে। '" ৩ মা সারদা তার জীবনের প্রারম্ভিক লগ্নে তাঁর মা এবং ভাইদের দেখাশোনা করেছেন। তাছাড়া শৈশবেই তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ মা সারদা তাঁর জীবনের সূচনা

থেকেই মানব সেবার মহান কার্যে ব্রতী হয়েছেন। ৪ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা ঠাকুরের ভক্তদের নিজের সন্তানের মতো আপন করে যত্ন সহকারে আদর আপ্যায়ন করতেন। তিনি তাঁদেরকে পরম স্নেহের রেঁধে বেড়ে সেবা করতেন - সে নিজের যত কষ্টই হোক। এমনকী ঠাকুরের কোনো ভক্তকে তিনি যাতায়াত খরচ বাবদ অর্থ প্রদান করতেন। ৫ এভাবেই ক্রমে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার গাথা লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন সকলের মা। ঠাকুরের কাছে যেসমস্ত মহিলা ভক্ত সমস্যাপীড়িত হয়ে আসতেন মা তাঁদেরকে নিজের নহবতের ঘরে আশ্রয় দিতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এঁরা সকলেই তাঁর সন্তান এবং তিনি তাঁদের সকলের মা। ৬ বস্তুত তিনি কখনোই ঠাকুরের ভক্তদের যত্ন আপ্যায়ন করতে ক্লান্তি অনুভব করতেন না এবং তাঁর এই ক্লান্তিহীনতা ও স্নেহ-মমতামিশ্রিত ভালোবাসাই তাঁকে করে তুলেছিল বিশ্বজনীন মাতৃসম। উল্লেখ্য যে, শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তাঁর এই মাতৃরূপের জয়যাত্রা শুরু। আর এভাবেই তিনি ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন বেশ কিছু বরেণ্য সন্তান যেমন নরেন,রাখাল,মাস্টার,লাটু,বলরাম - এর মা। তবে শ্রীমা শুধুমাত্র তাঁর এই মহৎ সন্তানদের নিয়ে খুশি থাকতে চাননি। এঁদের পাশাপাশি যারা আপামর,অশিক্ষিত, বুদ্ধি ভ্রষ্ট তথা বিপথে চালিত ৭ তাদের সঠিক পথের দিশা দেখাতেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর এইজন্যই তিনি একজন প্রকৃত মায়ের জীবন্ত বিগ্রহ।৮ প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, ঠাকুরের ভক্তদের আহার করানোর পর তিনি নিজের হাতে তাদের এঁটো পরিষ্কার করতেন - কারণ মায়ের কাছে তাঁর সকল সন্তানই সমান। বস্তুত, তিনি সমাজে কুসংস্কারের বীজস্বরূপ জাতপাত, শ্রেণি বিভাজনে সমাজ বিভাজনের ধার ধারতেন না। বস্তুত, তাঁর কাছে সবার উপরে ছিল মানবধর্ম - সে মানুষ ভালোই হোক বা মন্দই হোক। একজন প্রকৃত মা হিসেবে তাঁর কাছে ভালো-মন্দ সকলেই ছিল তাঁর সন্তানসম।৯ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শরত মহারাজ ছিলেন সন্ন্যাসী আর আমজাদ ছিলেন ডাকাত।শরত মহারাজ ছিলেন হিন্দু আর আমজাদ ছিলেন মুসলমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা দুজনেই ছিলেন মায়ের কাছে সমান।১০ গ্রাম্য, শহুরে ,মফস্বল সব জায়গার মানুষেরাই ছিলেন তাঁর কাছে সমান। তাঁর অপর একটি চিরন্তন বাণী, " কাজ করা চাই বইকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদন্ড কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।" ১১

সহানুভূতিশীলা মা সারদা দেবী

শ্রীমা সারদা ছিলেন বাস্তবিকই করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁর শ্রীমুখের বাণী অনুসারে, "সকলের প্রতি তোমার কর্তব্য করে যাও কিন্তু মনটি রেখো ভগবৎচরণে। অপরকে ভালোবাসলে দুঃখ পেতে হয় বইকি।" ১২ মায়ের এরূপ বৈশিষ্ট্যাবলীই তাঁকে সর্বজনের জননী হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, মা ছিলেন আদতে তথাকথিত রেনেসাঁ পর্বের নারী। আর আমরা জানি যে, তৎকালীন বঙ্গবাসী যুক্তি ব্যতিরেকে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করতেন না। অথচ শ্রী শ্রী মা তাঁর শুধুমাত্র করুণাঘন

আবেশ ও পরম মমতার হৃদয়ভেদী বানী নিক্ষেপ করেই কোনোরকম আন্দোলন ছাড়াই হয়ে উঠলেন জগজ্জননী। তাঁর কথায় "ভালোবাসায় সবকিছু হয়, জোর করে কায়দায় ফেলে কাউকে নিয়ে কিছু করানো যায় না।" ১৩ প্রকৃতপক্ষে শ্রী শ্রী মা তাঁর জীবন দিয়ে এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন প্রকৃত সমাজপ্রেমী। বস্তুত তাঁর সারা জীবন ধরে তাঁর মধ্যে পরম মাতৃভাব বিদ্যমান ছিল। আদতে মা ছিলেন একজন সুদৃঢ় উচ্চ আদর্শের ধারক। আর তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'মেয়েদের আসল অলংকার হল তাদের বিনম্রতা' ১৪ মূলত এভাবেই একজন গ্রাম্য, তথাকথিত শিক্ষার পাঠ না নেওয়া শ্রীমা সমাজে স্বীকৃত ও বন্দিত হলেন। এছাড়াও তিনি একজন প্রকৃত সংঘ জননী স্বরূপ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র গুলির কার্যকলাপের নিয়মিত খোঁজ নিতেন, সম্ভব হলে সেগুলি পরিদর্শন করে সন্ন্যাসীবৃন্দের মনোবল বাড়াতেন - যাতে করে ঠাকুরের উদ্ভাবিত 'শিবজ্ঞানে জীব সেবার' আদর্শ জগৎজুড়ে প্রসারিত হয়। ১৫ এভাবেই তাঁর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শ্রীমা ক্রমে 'মা' শব্দের প্রকৃত অর্থের সমার্থক হয়ে গেলেন; উল্লেখ্য যে, এই মা শুধু আমার নয়, আপনার নয় বরং আমাদের সবার - 'বিশ্ব জননী'। সারদা দেবী হলেন প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নবীন আদর্শের অগ্রদূত।[১৬] তপস্যা ও নীরব প্রার্থনাময় জীবন তাঁর।[১৭] নব যুগাদর্শ হলো সেবা ধর্ম তিনি তা বাস্তবিকই বুঝেছিলেন এবং তা-ই তিনি করে গেছেন।[১৮] তিনি সত্যিই শক্তিরূপিনী, সমস্ত শক্তির আধার। সারদা দেবীর জীবনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নারীর মহান আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যিই তিনি করুণাময়ী মা। তাঁর সান্নিধ্যে সকলেই শান্তি পায় - তাইতো তিনি শান্তিরূপিনী। তিনিই তো সকলের চিরন্তনী মা।

উপসংহার

পরিশেষে বলা আবশ্যক শ্রীমা সারদা ছিলেন অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক তথা করুণাঘন দৈবীসত্তায় পরিপূর্ণ। এইজন্য তিনি সকলকেই খুব সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই নীরবে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের পিছনে শক্তির আধার রূপে অবস্থান করে রামকৃষ্ণ আন্দোলন সংগঠিত করবার মূল কান্ডারী স্বরূপ রামকৃষ্ণ সংঘকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই জন্য রামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান সৈনিক স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শ্রী শ্রী মায়ের অধিষ্ঠান ছিল সর্বোত্তম আসনে। আসলে শ্রী শ্রী মা মাতৃত্বের এমন এক অমোঘ, অমর সংজ্ঞায় নিজের পবিত্র জীবনকে উন্নীত করেন যে, তাঁর মাতৃসত্তা জগৎজুড়ে প্রচারিত হয় আদর্শ হিসেবে। বস্তুত তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে শিশুসারল্য ভাব নিয়ে জগৎবাসীকে আদর্শ ভালোবাসার শিক্ষা, স্বাধীনতার শিক্ষা, ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণের শিক্ষা এবং জীবসেবার শিক্ষা প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর জগৎবাসীকে শিক্ষাপ্রদানের এই যে অসামান্য পদ্ধতি তা বর্তমানকালের হিংসাশ্রয়ী জগতে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সবশেষে বলা যায় সত্য সত্যই তিনি পবিত্রতার মাতৃবিগ্রহ। সারল্য এবং অপার করুণাই তাঁর প্রধান শক্তি এবং বাস্তবিকই তিনি সকলের

'স্নেহময়ী, জগজ্জননী মা'। আর সমাজ কল্যাণের জন্যে ত্যাগ, সেবা ও সহানুভূতি তাঁকে বর্তমানেও সমান প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Swami Atmasthananda: Sri Sarada Devi the mother of All, (Advaita Ashrama, Kolkata,2008) p 90

২. Sri Maa Saradadevi Sayings with Portrait, (Sri Sri Sarada Devi's 150th Birth Anniversary, Ramakrishna Mission Lokasiksha Parishad, Narendrapur, Kolkata-700103) p 13

৩. Ibid p 17

৪. প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা: লোকজননী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত): শতরূপে সারদা, (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, ১৯৮৫) পৃঃ ৩০৯

৫. তদেব পৃঃ ৩০৯

৬. তদেব পৃঃ ৩০৯ - ৩১০

৭. তদেব পৃঃ ৩১০-৩১১

৮. স্বামী গম্ভীরানন্দ : শ্রীমা সারদা দেবী, (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৪) পৃঃ ১৪০

৯. স্বামী সরদেশানন্দ : শ্রীশ্রী মায়ের সৃতি কথা (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৯) পৃঃ ৬১ - ৬২

১০. দুর্গাপুরী দেবী : সারদা রামকৃষ্ণ, (শ্রী শ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৩৬৮) পৃঃ ২০৯- ২১

১১. Sri Maa Saradadevi Sayings with Portrait, (Sri Sri Sarada Devi's 150th Birth Anniversary, Ramakrishna Mission Lokasiksha Parishad, Narendrapur, Kolkata-700103) p 18

১২. Ibid p 20

১৩. Swami Pavitrananda: A Short Life of The Holy Mother, (Advaita Ashrama, Kolkata,2023) p 93

১৪. The Message of Holy Mother (Advaita Ashrama, Kolkata, 2018) p 1

১৫. Swami Atmasthananda: Sri Sarada Devi the Mother of All, (Advaita Ashrama, Kolkata,2008) p 43

১৬. স্বামী মুমুক্ষানন্দঃ শ্রী শ্রী মাঃ প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নবীন আদর্শের অগ্রদূত ,স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত): শতরূপে সারদা, (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, ১৯৮৫) পৃঃ ৫৮৭

১৭. তদেব পৃঃ ৫৯৩

১৮. তদেব পৃঃ ৫৯৮

মুক্তামাছ : প্রজন্মপাড়ের কৈবর্ত সম্প্রদায়

সনুপ খাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কৈবর্ত সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আসতেই সবচেয়ে প্রথমে মনে আসে পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে দিব্যকের নেতৃত্বে কৈবর্তদের বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত। একইসঙ্গে প্রজাতিটির বিদ্রোহী সত্তাকে বাদ দিয়ে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথাও মনে আসে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থ এই বিদ্রোহের একমাত্র প্রামাণিক তথ্য হলেও, কৈবর্ত সমাজের বিভিন্ন প্রামাণিক নিদর্শন, (যেমন ভীমের জাঙ্গাল, দিব্যকের সামন্তপ্রভুত্ব ইত্যাদি) সমাজটির অন্দরমহলের পরিচয়কে ক্রমশ প্রকাশ্য করে দিয়েছে। অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী', মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্তকথা', সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' ইত্যাদি উপন্যাসের বিবরণের মধ্যে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজের গৃহস্থালিগত ক্রিয়াকলাপের পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে।

তবে খ্রিস্টীয় দশম দ্বাদশ শতকের সময়কালের কৈবর্ত সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতিরেকে আধুনিক সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিটির অন্তঃসত্ত্বার অনুসন্ধান করলেন দুই-বঙ্গীয় বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক। সম্প্রদায়টির সঙ্গে যুক্ত হল নদী, কখনোবা সমুদ্র। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'অবগাহন', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ', সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ', প্রফুল্ল রায়ের 'সসাগরা', হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র', 'দহনকাল' ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে এই জল-কৈবর্তদের জীবন প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসগুলোর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল— প্রতিটা উপন্যাসের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে জল মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। কোথাও নদী কোথাও সমুদ্র কৈবর্ত সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। আমার আলোচনায় সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ' উপন্যাসে সমুদ্র নির্ভর কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মেছোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, জীবন সম্পর্কে বিচিত্র সকল অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ও সংস্কার কিভাবে বেড়াখানা মৌজার কৈবর্তদের জীবনের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে তা উঠে এসেছে। উঠে এসেছে—কৈবর্ত বৃদ্ধার সাবেকি চিন্তাভাবনা, আদিকালের বিভিন্ন লোকগল্পের বর্ণনা, অলৌকিক সংস্কারের

সঙ্গে নিজেদের জীবনকে মিলিয়ে ফেলার মতো বিচিত্র জীবনাচরণের ইতিহাস এই উপন্যাস। তথাকথিত সভ্য সমাজের বাইরে সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে যেমন তাদের বাসস্থান, তেমনই তথাকথিত সভ্য সমাজের চিন্তাভাবনার বাইরে যেন পুরাকালের ধ্যানধারণাকে সঙ্গে নিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলেছে তাদের জীবন। ক্ষিদের জ্বালা তাদের মধ্যে থেকে আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, তারা আজন্মকাল থেকে প্রজন্মপাড়ের সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে জীবনধারণ করে চলেছে।

সূচকশব্দ : প্রজন্মপার, সাবেকি, লোকগল্প, অনিশ্চিতজীবন, ক্ষিদেরজ্বালা, নিরন্তর পরিশ্রম, বন্যপ্রায় জীবন, জলের যাযাবর।

মূল প্রবন্ধ :

সভ্যতা যেখানে গতিময়, যন্ত্র সভ্যতা যেখানে আকাশ ছোঁয়ার আনন্দে মেতে উঠেছে, তারই একপাশে তথাকথিত অসভ্য এক প্রজাতির গোষ্ঠী কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা, অলীক স্বপ্ন-সেইসঙ্গে দু'মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রামের আলেখ্য সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ'। মানুষের জীবন ধারণে অর্থের ভূমিকা কীরূপ তা বলবার আবশ্যকতা নেই। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান আধুনিক সভ্য সমাজে যেখানে অপ্রতুল, সেখানে বেড়াখানা মৌজা এলাকায় দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য প্রাণপাত। কিন্তু, জেলের ঘরে কেন খাবারের অভাব? সভ্যতা তো অনেক এগিয়েছে, ফসলের উৎপাদনও উনবিংশ শতকের আগের ও বিংশ শতকের প্রারম্ভের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু কৈবর্ত ঘরে দুর্ভিক্ষের থাবা যায় না কেন? তবে কি সাগর পাড়ের মাছমারারা আধুনিক সমাজের মানুষ নয়? তাদের ঘরে ঘরে অভাবের কি কোনো কৃত্তিম কারণ আছে? একাধিক প্রশ্নের উত্তর সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ'।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'মুক্তামাছ' উপন্যাসের 'লেখকের কথা'(শুভ মহালয়া ১৪০২) অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"কাহিনির রচনাকাল ১৯৭৮(জুলাই-নভেম্বর)। চরিত্রগুলো প্রজন্মপারের। বাইরের দুনিয়ায় কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে এক চিলতে বালিরচর সম্বল করে যারা, মোহানার জোয়ার-ভাঁটি আঁকড়ে বাঁচতে শেখে, আচরণে তারা স্বভাবতই রুক্ষ; কথাবার্তায় কর্কশ। [১]

এরই উত্তরের অন্বেষণে এ উপন্যাসের অবতারণা।

জলধা মোহনার মনোরম সৈকত অর্থাৎ মৎস্যবন্দর থেকে শংকরপুরের দিকে মাইল চারেক পূর্ব দিকের এলাকা, বেড়াখানা মৌজা, কাহিনির পটভূমি। শিরোনামে উল্লিখিত 'প্রজন্মপাড়ের' শব্দটি ঔপন্যাসিকের 'লেখকের কথা' অংশ থেকে নেওয়া হলেও— কাহিনির মধ্যেকার বিবরণ এবং চরিত্রগুলোর আনাগোনার মধ্যে শব্দটির

প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে করি। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে বেড়াখানা মৌজার জেলেপাড়াগুলোর সংগ্রাম অবিরাম। ঔপন্যাসিক একেবারে গোড়া থেকে বর্ণনা করেছেন এ কাহিনি। বাদ যায়নি বিভিন্ন রকম মাছ ধরবার বিভিন্ন রকমের জালের নামও। সারানি জাল যা সমুদ্রের ভিতের তথা ধারের দিকের মাছ ধরবার উপযোগী জাল।

"সমুদ্রের ভিতায় সারানি জাল ছেড়ে সুবল মাঝির এবার সাবাড় জালে ভাগ নেওয়ার কারণ ওই একটাই – টাকা।" [২]

জালের পরিচয় জানার সঙ্গে এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় যে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজনে সুবল মাঝি অগহীন সমুদ্র থেকে নির্বাসন নিতে চেয়েছে। বোঝা যায়, ঘরে ভাতের অভাব সারানি জালে মিটছে না। অর্থাৎ সমুদ্রে মাছের আধিক্য গভীর জলে। এ প্রসঙ্গে সাবাড় জালের পরিচয়টাও দেওয়া আবশ্যক বলে মনে হয়—

"ষাট জন ভাগীদারের ষাট টুকরা জাল জোড়া দিয়ে খাড়া করলে বের দাঁড়াবে যোজন প্রমাণ। গোটা দরিয়া ঘিরে ফেলা যাবে তাতে।" [৩]

উপন্যাসে লখা পালের সাবাড় জাল অভিযানে সুবল কাজ নিয়েছে। সেই কারণেই নিজের সারানি জাল আপাতত নির্বাসিত। সাবাড় জালের যোজন প্রমাণ আকারের কথা মনে করেই অনুমান করা যায় সুবলদের অভিযান গহীন সমুদ্রের পথে। সুবল মাঝির মতে সারানি জালের চেয়ে সাবাড় জালে পরিশ্রম কম, কারণ এই জাল বাওয়ার জন্য শ্রমিকের সংখ্যা থাকে বেশি। সাবাড় জাল বাওয়ার ক্ষেত্রে নৌ-অভিযানে রাত্রিনিবাস হবে প্রায় মাসব্যাপী অথবা তারও বেশি সময় ধরে। একইসঙ্গে সে মনে করে—

"শংকরপুরের মধু মঙ্গল লাখ টাকা পেটালো এক খেইতে।" [৪]

অর্থাৎ কিনা, টাকার চিন্তায় পরিশ্রম লাঘব। ব্যাপারটা অনেকটা 'ট্যাঁক ভারী তো মন হালকা' ধরণের।

পেটের তাগিদে জেলে মাঝিদের জীবনে স্থিরতা নেই বললেই চলে। জীবিকা তাদের কখন কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। তারা যেন জলের যাযাবর। স্থানানুসারে মাছের স্বল্পতা বা আধিক্যের তারতম্যে তাদের এই যাযাবরপ্রায় জীবন। জলজীবনের দিনগুলি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের শরিক হয়। কিন্তু রাত্রিবাসের ক্ষেত্রে স্থানানুসারে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সারাদিনের বিরামহীন পরিশ্রমের পর রাতে নৌকা নোঙর করবার জায়গা নির্বাচন নিয়ে জেলেদের যথেষ্ট সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। কারণ জলবাস হলেও অঞ্চলভেদে তার ভয়াবহতার পার্থক্য থাকেই। যেমন, যদি বলা হয় সুন্দরবন অঞ্চলের সমুদ্রের মোহনা বা কোনো নদীর খালের মধ্যে নৌকো নোঙর ততটা নিরাপদ নয় যতটা ওই অঞ্চলের বাইরের কোনো নদী তীরবর্তী এলাকা।

এ প্রসঙ্গে এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ—'সুবল: সারানি থেকে সাবাড় জাল' অধ্যায়ে সুবলের স্মৃতিতে ভেসে আসা আহ্লাদি ঠাকুরমার কাছে শোনা দাদু ঘনশ্যাম

মাঝির মাছ শিকারের গল্পের বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়। ঘনশ্যাম মাঝির যুবক বয়সে মাছের সন্ধানে সারাদিন ঘোরার পর অনেক সময় বেলার হিসাব থাকত না। ফলে প্রায়শই রাত্রি হয়ে যেত। তখন তেবাকি খালের মোহনার কাছে নৌকো নোঙর করত। রাত্রি বাসের সুবিধার্তে তারা ডাঙার বালিতে দরমা দিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তবুও নিশ্চিন্তে রাত্রিবাস তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ শেয়ালের গোঙানির শব্দে তারা বুঝতে পারত বোড়া সাপ শেয়াল ধরেছে। অর্থাৎ বোড়া সাপ বাসায় যে আসবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতএব—

"ঝুপড়ির একধারে টিমটিম করে জ্বলত একটা লম্ফ। পালা করে এক-একজন রাত জাগত কাঁটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে। বাদবাকিরা ঘুমাতো।" [৫]

একদিকে উপার্জনের জন্য লড়াই, অন্যদিকে জীবন বাঁচানোর লড়াই। সভ্যতার আদিম লগ্নে যখন মানুষ উলঙ্গপ্রায় জীবনযাপন করতো— লতাপাতা, গাছের ছাল ছিল পরিধেয় বস্ত্র, তখনকার কথা স্মরণ করলেও দেখি মানুষের সঙ্গে হিংস্র পশুদের যুদ্ধ। বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ। তাদের বাসস্থান বলতে গুহাবাসের কথা আমরা সকলেই জানি। তবে বন্য মানুষদের মতো বেড়াখানা মৌজার কৈবর্তরা গুহাবাস করে না ঠিকই, কিন্তু 'প্রতিকূলতা'র সঙ্গে সঙ্গতি থাকার কারণে জেলেদের 'জলবাস' আদিম মানুষের চেয়ে গুহাবাসী জীবনের খুব কম ভয়াবহ জীবনধারণের দৃষ্টান্ত যে নয়, তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্যই জলের মাছ তদের খোরাকী জোগানোর প্রধান সহায়ক। এই বিষয়ে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বসত এলাকা নিয়ে কিছু বলবার আবশ্যিকতা রয়েছে। জেলে জীবনের জীবিকা নির্বাহের প্রধান সহায়ক নৌকো, জাল এবং মাছ। নৌকো, যাকে বাহন করে তাদের জলজীবন নির্বাহিত হয়ে থাকে। তবে নৌকো শুধুমাত্র মাছ ধরবার কাজেই ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু নয়। মাছ ধরে জলপথে বাজারে পৌঁছে দেওয়ায় নৌকোর ভূমিকাই প্রধান বলা যায়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জেলে বসতিগুলি সমুদ্র তীরবর্তী এমন একটি অঞ্চলে যেখান থেকে সদর বাজারের সঙ্গে সরকপথে যোগাযোগের সুবিধা তেমন একটা নেই বললেই চলে। আবার মাছমারারা স্থলভাগ থেকে দূর সমুদ্রে মাছ শিকারে গিয়ে মাছ শিকারের পর, সেই মাছ বাজারজাত করবার জন্যও একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে জলপথই সম্বল। বোঝা যায় মাছমারাদের জীবিকার খোরাকী সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মাছ বিক্রির উপযুক্ত স্থান। সে কোনো বাজার বা হাটও হতে পারে আবার মাছ কিনবার মতো কোনো অবস্থাপন্ন গ্রাম। 'মুক্তামাছ' উপন্যাসে বেড়াখানা বিলের মিঠা জলকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রথম বসতি গড়ার চিন্তা আসে সুবল মাঝির ঠাকুরদা ঘনশ্যাম মাঝির। কারণ—

"বাঁধের ওধারে পশ্চিমের লাগোয়া গ্রামগুলোয় সকালের মাছ সকাল-সকাল গতিয়ে দিয়ে আসা যাবে।" [৬]

নিয়ত সংগ্রামশীল জীবন ও জীবিকার পরাকাষ্ঠা জেলে জীবনের আর্থিক খোরাকী আমদানির সুবিধার্থে বসত গড়ে তোলবার স্থান নির্বাচনে বিচক্ষণতার

পাশাপাশি উপন্যাসে ভূপ্রকৃতিগত দিক থেকেও বসত গড়ার বিচক্ষণতা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ বসত অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক সুরক্ষা কতটা তা বিচার না করে বসতি বানালে বসত অঞ্চলের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান হতে হয়। ঘনশ্যাম মাঝির বিচক্ষণতা এ প্রসঙ্গে প্রশংসনীয়—

"মোহানার এই জায়গাটাকে তিন দিক থেকেই ঘিরে রেখেছে সিডাইকের বড় বাঁধ।...ভর জোয়ারে যতই ফুলুক না কেন সমুদ্রের জল, যাবে আসবে না।" [৭]

তখন থেকেই বেড়াখানা অঞ্চলে বসত গড়ে ওঠা শুরু হয়—

"তাই একদিন সাঁজের প্রদীপ জ্বলল এই জংলা জায়গাটায়।" [৮]

বলা যায় সৃজনশীলতার নতুন অধ্যায় রচনায় মাছমারাদের অবদান অপরিসীম। দীর্ঘকালব্যাপী যে স্থান জঙ্গলময় জলা জমি, যেখানে বিবিধ জন্তু জানোয়ারের আবাস্থল, যেখানে না আছে চাষের উপযুক্ত জমি, না আছে সদর বসতির সঙ্গে পরিমিত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তেমনি একটা বসবাসের অনুপযোগী স্থানকে জীবিকার তাগিদে হলেও এই জেলেরাই মানুষের জীবন নির্বাহের উপযুক্ত করে তোলে। শুরু হয় সুবল মাঝি, তারিণী খুড়ো, লখা পাল, কেতু বউ-এর মতো মানুষের আনাগোনা। এ প্রসঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ময়না দ্বীপের কথা মনে পড়ে যায়।

একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে— কৈবর্তরা তথাকথিত ভদ্র সমাজের চোখে হীন জনগোষ্ঠী। কিন্তু কি সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', কি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', কি ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'চরপূর্ণিমা' প্রায় প্রতিটা উপন্যাসেই দেখি জল-জঙ্গল তথা প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষ বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে এই জেলে-মালোদের ভূমিকাই প্রধান। অথচ এই হীন জনগোষ্ঠীর কায়িক শ্রমের ফসলে ভাগ বসিয়েছে তথাকথিত ভদ্র সমাজের মানুষেরা। আলোচ্য 'মুক্তামাছ' উপন্যাসের মধ্যেও এরকম একজন চরিত্রকে দেখা যায়। লখা পাল, যে কি না জাতিতে কায়স্থ, অথচ জেলেপাড়ায় পাকা বাড়ির মালিক। অথচ পাড়াটির গোড়াপত্তনে কৈবর্তদেরই কায়িক শ্রম নিবেদিত হয়েছিল একসময়। সমুদ্র তীরের বালিতে কেয়া গাছের ঝাড়ের মধ্যে পাড়াটির প্রথম গোড়াপত্তন। বন্য পশু বিশেষত বাঘের ভয়ের কথাও উপন্যাসের মধ্যে শোনা যায়—

"এই অঞ্চলটার সবটাই জুড়ে কেয়াজঙ্গল ছিল। দিনের বেলায় শেয়াল ডাকত। বাঘও নাকি থাকত। আর থাকত ময়াল সাপের মতন মোটা বোড়া সাপ। বাগে পেলে আস্ত এক-একটা শেয়ালকেও নাকি গিলে খেত। পাকের পোড় পাক কষিয়ে হাড়-গোড় ভেঙে মাংসের তাল পাকিয়ে ছাড়ত।" [৯]

সুবল মাঝির ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা এ গল্প। কিন্তু গতিময় এই সভ্যতায় যারা এই বসতি স্থাপন করলো তাদের বাসস্থান, ঘর-বাড়ির কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। গোঁজা তালি মারা ছিটে বেড়া ধরণের বসতবাড়ির মধ্যেই পুরুষানুক্রমে জীবনপাত ঘটে চলেছে।

'মুক্তামাছে'র দরিদ্র জেলে পরিবারের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া প্রয়োজন।–

"জালে মাছ উঠল তো উনানে হাঁড়ি চাপল। নয় তো না।" [১০]

জেলে পরিবারের এ হল ভবিতব্য। অর্থাৎ, 'টেনে বুনতে কুলোয় না'। মাছ যাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিয়ে থাকে, সেই মাছই যদি জালে ধরা না পরে তাহলে হাঁড়ি না চাপাটাই স্বাভাবিক। তবে প্রশ্ন আসতে পারে— জালে এক দিনের মাছের অনুপস্থিতিও কি সংসারের মানুষের উপবাসের কারণ হতে পারে? এ প্রসঙ্গে মনোজ বসুর 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের রাধেশ্যাম মাঝির পরিবারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। সেখানে দেখা যায়, রাধেশ্যাম বিভিন্ন ঘেরি থেকে রাতের বেলায় মাছ চুরি করে থাকে এবং সেই মাছ গগন দাসের আলায় (আড়ত) বিক্রি করে। মাছ বিক্রির প্রাপ্ত অর্থ তার স্ত্রী অন্নদাসীর হেফাজতে চলে যায়। রোজকার প্রাপ্ত মাছের পরিমাণ সমান হয় না, তাই বিক্রিজাত মাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণও প্রতিদিন সমান হয় না। সুতরাং যেদিন মাছের পরিমাণ বেশী হয় সেদিন অন্নদাসীর সংসারের খরচও বেড়ে যায়। অর্থাৎ কয়েকদিনের স্বল্পান্নে অভ্যস্ত পেটকে পরিপূর্ণ করে ভরণ-পোষণ দেওয়ার ইচ্ছে(অন্নদাসীর একটি পুত্র)। তার সঙ্গে নারী হিসাবে সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছে। এসব করতে গিয়ে একদিনেই বিক্রিত মাছের অর্থের নিষ্পত্তি ঘটে। অতএব পরের দিন রাধেশ্যামের জালে না যাওয়া উপবাসের কারণ হবে এটাই স্বাভাবিক। 'মুক্তামাছে'ও দেখি ঘনশ্যাম মাঝি সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

"মাছের তল্লাসে নায়ে নায়ে কাটত সারাটা দিন সমুদ্রের ওপর। কখন যে বেলা গড়িয়ে সাঁজ পেরিয়ে রাত নামত, হুঁশ রইত না।" [১১]

অর্থাৎ এখানে বলবার বিষয়টি হল, রোজকার স্বল্প উপার্জনে একদিনের বিরামেও অন্নপূর্ণা বিমুখ হন। তখন শুরু হয় আর এক নতুন পালা। অর্থাৎ চাল ধার নেওয়ার পালা। আলোচ্য 'মুক্তামাছ' উপন্যাসে সুবলকে সেই ভূমিকায় দেখি, দেখি— সে কেতুবউ-এর কাছে চাল ধার নেবার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। কিন্তু তাতেও বা কতদিন চলে। অবশেষে সুবলের স্ত্রী ফুলির কর্মকাণ্ডে জেলে বাড়ির দীনতা আরও প্রকটরূপে দেখতে পাওয়া যায়—

"বিল-আড়ি থেকে কিছু গিরে শাক তুলে এনে দুপুরে সেদ্ধ করেছিল ফুলি। কুমড়াকুচি আর খানিকটা খুদ মিশিয়ে। সেই খেয়ে পেটের জ্বালা জুড়িয়েছে।" [১২]

এর পরিণতি যে কতটা করুণ তা বাড়ি বাড়ি চাল ধার চাইতে গিয়ে নিরাশ সুবল মাঝির ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। স্ত্রী-কন্যার ভরণ-পোষণে অক্ষম সুবল মাঝি বাড়ি ফিরতে চায় না, কারণ বাড়িতে অভুক্ত কন্যা-পুত্রসহ স্ত্রী-ফুলি তার ব্যর্থতার কথা না বুঝে হয়তো গালমন্দ করে বসবে। অভুক্ত সুবলও হয়তো তা সহ্য করতে না পেরে ফুলির গায়ে হাত তুলে বসবে। গায়ে হাত তোলার কথা মনে হতেই স্ত্রী'র শরীরের বর্তমান গড়ন মনে পরে যায় সুবলের—

"হাড়গিলা পাখির মতনই সরু-সরু ডাঁটি-ডাঁটি পা-হাত। জিরজিরে শরীর। তা থেকে উটকো একটা পরজীবী(কোলের সন্তান) জোঁকের মতো রক্ত শুষছে(স্তন্যপান) এবং ফুলছে মাসে মাসে। ফুলি তাতেই চিপসে যাচ্ছে ক্রমশ। তার গায়ে হাত তুলতে পারা যায় না।" [১৩]

জেলে কৈবর্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনাচরণের যে চিত্র এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে, তা থেকে বলা যেতেই পারে— তথাকথিত ভদ্র সমাজের তথা সমাজের মুলস্রোতের বাইরের জীবনযাপনেই অভ্যস্ত এরা। সভ্য সমাজের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা যেখানে বইয়ের পাতায় অথবা নাচ, গান, আবৃত্তি অথবা বাবা-মার উপার্জনে ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে, কৈবর্ত পল্লীর কৈশোরের ছবি সেখানে ভিন্ন—

"সাত-আট বছরের হলেই এখানকার ছেলে-মেয়েরা কোনো-না-কোনো একটা কাজে লাগে।" [১৪]

'মুক্তামাছে'র কৈবর্ত কচিকাঁচাদের সম্পর্কে এই বিষয়টি ঔপন্যাসিকের নজর এড়ায়নি । এখানে দেখা যায় কেউ যায় ছাগল চরাতে, কেউ বা বাবার সঙ্গে মাছ কুড়োতে যায়, আবার কোনো কোনো ছেলে-মেয়েদের জাল নিয়ে মাছ ধরতে যেতেও দেখা যায়। অর্থাৎ খুব অল্প বয়স থেকেই জল-জাল-মাছের সঙ্গে পরিচিতি এই সমস্ত ছেলে-মেয়েদের। পরিশ্রম তাদের নিত্য সঙ্গী, সেখানে বয়সের ভেদাভেদ খুবই কম। অক্লান্ত পরিশ্রমের জেরেই জেলে নারী এবং পুরুষের শারীরিক বলিষ্ঠতাও প্রকট হয়ে ওঠে। জেলে যুবকদের শারীরিক বলিষ্ঠতার পরিচয় ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

"জেলেপাড়ার জোয়ান মরদের ছাতি নয় যেন, নৌকার পাটাতন, বাহু নয় যেন গরান কাঠের দাঁড়, রক্ত নয় যেন কড়াইতে চাপানো মাছ ছাঁকার টকটকে লাল তেল।"[১৫]

কিন্তু পরিবেশ ও প্রকৃতির শক্তির কাছে গরম 'টকটকে লাল তেল'ও ঠাণ্ডা হয়ে যায় সহজেই। কৈবর্ত পাড়ার পরম সঙ্গী কলেরা কিংবা বসন্ত অথবা ম্যালেরিয়া। যারা মড়কের আকার নিলে জেলেপাড়ার জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। সামুদ্রিক জেলে জীবনকেন্দ্রিক প্রথম আখ্যান 'মুক্তামাছ' উপন্যাসে সন্তোষ কর জেলেকৈবর্ত পাড়ার অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে কলেরা এবং বসন্ত নামক এই দুটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।–

"কেয়া জঙ্গল সাফ হয় না, সাফ হয়ে যায় জেলেপাড়া। অল্প কয়েকটা ঘরেই বাস করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না তখন।

এই রকম এক মড়কে সুবলের মা গেছে। একই কারণে দলুইবুড়ো বিপত্নীক হয়েছে দ্বিতীয়বার। সরমাবুড়ি বিধবা হয়েছে। মির্দাদের বংশ লোপাট হয়ে গেছে। এবং রানিও হারিয়েছে তার মা। বলা বাহুল্য সবকটা মৃত্যু একই বছরে হয়নি।" [১৬]

বছর বছর জীবন নাশের বিভীষিকার শিকার বেড়াখানা মৌজার কৈবর্তপাড়া। প্রকৃতি ও পরিবেশ যেন সবদিক থেকে কৈবর্ত পল্লীর মানুষজনের বেঁচে থাকার পরীক্ষা নিচ্ছে।

"সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে জেলেপাড়ার দিন-রাত্রি সম্পর্ক ততটা নেই যতটা রয়েছে সমুদ্রের জোয়ারভাটির সঙ্গে।" [১৭]

জলের মাছ যাদের বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান, অর্থাৎ মাছই যাদের অন্ন-বস্ত্রের জোগান দেয় তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের এমত মন্তব্য যথার্থতার দাবি রাখে। ঔপন্যাসিক বলেছেন__

"রাত দুপুরে জোয়ার এলেও তখন সকাল। তখন জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে বিছানা ছাড়ার তাগিদ।" [১৮]

অর্থাৎ, চাঁদ-সূর্যের উদয়াস্ত তাদেরকে দিন-রাত্রির জানান দেয় না, দেয় চাঁদ-সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রজলের দোলাচলতার তীব্রতা।

জেলেপরিবারে কদর তারই বেশী যে অধিক পরিশ্রমে সক্ষম। সেইসঙ্গে জেলে পরিবার একসন্তানে অবিশ্বাসী। কারণ নদী বা সমুদ্র অভিযানে বাধ্য ও অভ্যস্ত জেলেদের জীবনে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। সামুদ্রিক ঝড় প্রায়শই জলপুত্রদের জীবন নিয়ে থাকে। এমত পরিস্থিতিকে চিন্তা করে পরিবারে একাধিক সন্তান নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। জেলেদের এই চিন্তার ফল কিন্তু অনেকগুলো। যেমন এক সন্তানের অবর্তমানে অন্য আরেক সন্তান দ্বারা বৃদ্ধ জরাজীর্ন জেলেরা সংসার চালাতে সক্ষম হয়। আবার একাধিক কর্মঠ যুবকের উপস্থিতি সংসারের উপার্জন বৃদ্ধিতে কার্যকর। উপন্যাসে বেড়াখানা জেলেপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে এমনি এক ব্যতিক্রমী পরিবার ধীরেন মাঝির। যাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন—

"ধীরেন মাঝিরা সাত ভাই। সবাই দারু কাঠের মতন শক্ত জোয়ান। সবাই জালে যায়।" [১৯]

পরিবারে ও জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ানোর বিকল্প কোনো উপায় তারা খুঁজে পায়না, খুঁজে পায় শুধু— কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবে' ধরণের চিন্তাভাবনাকে। কষ্ট করাকে যে তারা ভয় পায়, এমনটা নয়। আহ্লাদি ঠাকুমার সাবেকি মন্তব্যকে এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"আহ্লাদি ঠাকুমার দৃষ্টি সেই সাবেকি। জেলের ছেলে জেলে হবে। বড় হয়ে জাল টানতে কি দাঁড় বাইতে যাবে। বৃষ্টিতে ভিজবে, রোদে পুড়বে, জল চিনবে, আকাশ চিনবে, জোয়ারভাটির মর্ম বুঝবে।" [২০]

জীবনপাতের গল্প বোধ হয় এখান থেকেই শুরু। জেলের ছেলে জলপুত্র হতে গিয়ে শেষমেস চিরকালের জন্য সমুদ্রের পেয়ে আশ্রয় নিতে হয়। তবু, ঘরে চালের শূণ্য

কলসি ভর্তি করার মানসে ছুটে যেতে হয় আবার। কখনও চিরকালের জন্য যায়, কখনও বা নির্দিষ্ট সময়ের দু-চারদিন পরে ঠিক ফিরে আসে।

এরকমই ভাঙা জীবনের ইতিহাস সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ'। ঔপন্যাসিক তাঁর চরিত্রদেরকে 'প্রজন্মপাড়ে'র বলেছেন ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে উপন্যাসে দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে পাঠশালা যাওয়ার তৃষ্ণা। যদিও জেলেপাড়ায় কোনো পাঠশালা নেই বলেই জানিয়েছেন লেখক। আহ্লাদি ঠাকুমার চিন্তা সাবেকি হলেও হারাধন মাঝির মতো সুদূর প্রসারী চিন্তার মানুষের দেখাও মেলে, যারা তাদের সন্তানকে সভ্য সমাজের অংশী করতে চায়। উপন্যাসের মধ্যে যেমন স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টি মাছের গায়ে পড়লে সেই মাছ মুক্তামাছ হয় জাতীয় অলীক গল্পের হদিস মেলে তেমনি কৈবর্ত পল্লীর লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গেও নতুন করে পরিচিত হতে হয়। জীবনের সূচনা লগ্ন থেকে যাদেরকে প্রকৃতি, লখা পালের মতো মহাজন, পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড়ো হতে হয়, তাদের জীবনে বিনোদনকে মহামূল্যবান রত্নের সঙ্গে তুলনা করলেও অবাক হতে হয় না। বছরে একাধিক মৃত্যুশোক, আপনজন বিয়োগ, রক্ত জল করা পরিশ্রম সবকিছুর মধ্যে তাদের লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি হারিয়ে যায়নি। লোকগান, লোকছড়া, লৌকিক আচার, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পুজো ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তাদের আনন্দময় জীবনের ছবিও উপন্যাসে ধরা পড়েছে। বেড়াখানা মৌজার কৈবর্তদের প্রজন্মপাড়ের সংস্কৃতি এ উপন্যাসে কঠোর পরিশ্রমী ও সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর জীবনের রসদ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুবল মাঝিকে উপকরণ হিসাবে বেছে নিয়ে লৌকিক কাহিনির ভাবাবেগে আচ্ছন্ন কৈবর্ত পুরুষের স্বপ্নসন্ধানের এক অমোঘ কাহিনি এ উপন্যাস। তার চিন্তার মধ্যে মুক্তামাছ শিকারের বাসনা এবং সেই বাসনা চরিতার্থ করতে লখা পালের সাবাড় জালের শ্রমিক হিসেবে আত্মনিয়োগ এবং অবশেষে মহাকালের রোষের শিকার হয়ে সমুদ্রের বুকে চিরকালের জন্য আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নবিলাসী কৈবর্ত পুরুষের অন্তিম পরিণতির করুণ আখ্যান এ উপন্যাস।

সহায়কপঞ্জি:

১) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। চরপূর্ণিমা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১

২) মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার(রজত খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ। জুন ১৯৬০

৩) মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মানদীর মাঝি। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। আটত্রিশতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৫, এপ্রিল ২০০৮

৪) সুরঞ্জন মিদ্দে। সম্পাদক। সন্তোষ করের মুক্তামাছ। দিঘলপত্র, শুভ মহালয়া, ১৪০২। কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

৫) স্বপনকুমার মণ্ডল। আঠারোভাটির ইতিকথা (১ম খণ্ড) আবাদ পর্ব। কলকাতা: অনন্যা প্রকাশনী। ১ম সংস্করণ ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।

তথ্যসূত্র:

১)	সুরঞ্জন মিদ্দে। সম্পাদক। সন্তোষ করের মুক্তামাছ। দিঘলপত্র, শুভ মহালয়া, ১৪০২। কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর। লেখকের কথা।
২)	সুরঞ্জন মিদ্দে, সম্পাদনা। সন্তোষ করের মুক্তামাছ। দিঘলপত্র, শুভ মহালয়া, ১৪০২। কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর। পৃ. ২৬
৩)	ঐ। পৃ. ২৬
৪)	ঐ। পৃ. ২৬
৫)	ঐ। পৃ. ২৯
৬)	ঐ। পৃ. ৩০
৭)	ঐ। পৃ. ৩০
৮)	ঐ। পৃ. ৩০
৯)	ঐ। পৃ. ২৯
১০)	ঐ। পৃ. ৩৩
১১)	ঐ। পৃ. ২৯
১২)	ঐ। পৃ. ৩২
১৩)	ঐ। পৃ. ৫২-৫৩
১৪)	ঐ। পৃ. ৪৪
১৫)	ঐ। পৃ. ৪৬
১৬)	ঐ। পৃ. ৫৭
১৭)	ঐ। পৃ. ৬৮
১৮)	ঐ। পৃ. ৬৮
১৯)	ঐ। পৃ. ৫০
২০)	ঐ। পৃ. ৭০

বাংলা অনুগল্প ও সাম্প্রতিক জীবন : পারস্পরিক সম্পর্কের এক সাহিত্যিক পর্যালোচনা

পৌলমী সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অনুগল্প বা ফ্ল্যাশফিকশন সম্প্রতি সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা হয়ে উঠেছে । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনুগল্পের প্রধানতম লেখক হলেন বনফুল। বর্তমান বিশ্বে অনুগল্প লিখে "ম্যান অব বুকার" পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন লেখক লিডিয়া ডেভিস। উল্লেখ্য যে, অনুগল্প সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে আমেরিকায়। সেখানে অনুগল্প এখন ছোটগল্প থেকে কিছুটা সরে এসে সাহিত্যের সতন্ত্র বিভাগ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। অণুগল্পে বেধেঁ দেওয়া কোনো আকার না থাকলেও কেউ কেউ মনে করেন এটি ১০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে, আবার কেউ কেউ এক হাজার শব্দের নীচে যে কোনো গল্পকে অনুগল্প বলে মনে করেন। অনুগল্পে অল্পকথনের ভেতর দিয়ে অনুভবের বিষয়টি উঠিয়ে আনা হয়। সাম্প্রতিক যুগে মানুষের জীবন ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। তাই গল্পকে অতি ক্ষুদ্র করে পরিবেশন করা হয় পাঠকের সামনে, যাতে সময় অল্প লাগে এবং সাহিত্যরসও পাঠক উপভোগ করতে পারে। সম্প্রতি অনুগল্প লিখে হালে পশ্চিম বাংলায় বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। অনুগল্পের কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থের নাম--'অনুগল্পের মোহনায়'-চিন্ময় বিশ্বাস, 'আটটি অনুগল্পের সংকলন'--প্রাড কেসি, 'অনুগল্প সংকলন'--বৈশম্পায়ন শীল,হিল্লোল ভট্ট্যাচার্য,অনুরাধা দাসগুপ্ত প্রমুখ, 'অনুগল্প সংকলন--নিছক গল্প'--নীলরতন চক্রবর্তী। বর্তমান ব্যস্তময় পৃথিবীতে সাহিত্যরস উপভোগের নিতান্তই সহজ মাধ্যম এই অনুগল্প। ফ্ল্যাশফিকশন শরীর গঠনে 'পোকা' সদৃশ হওয়ার কারণে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অতি মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের গল্পে টানটান উত্তেজনা থাকবে। শুরু হতেই শেষ হয়ে যাবে অনুগল্প। অনুগল্পের শেষে মৃদু চমক দেখা যাবে।

শব্দসূচক: বাংলা অনুগল্প, ফ্ল্যাশফিকশন, ব্যস্তময় জীবন, অল্পকথন, রূপক, প্রতীকী, চিত্রকল্পময়।

ছোটগল্প জ্বলে ওঠে না, জ্বালানো হয় অল্প অল্প করে।চট করে নিভে যাওয়ার বিষয়ও থাকবে না অনুগল্পের মতো। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'--এই অনুভূতি ছোটগল্পে যেমন অনিবার্য, একইভাবে অনুভুতিশুন্য করা ব্যাপার শতগুণ অবধারিত থাকবে

অনুগল্পে।'অনুগল্প' শব্দটি জানিয়ে দেয় যে কাহিনীটি আকারে ছোট হবে, কিন্তু সেই আকারটা কত সংক্ষিপ্ত হবে বা বাক্য বৃদ্ধির সীমা কীভাবে ভাঙলে সেটা বড়গল্প হয়ে যাবে, তার আকারগত সীমানা কোথাও বলে দেওয়া নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ', তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন--'সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটগল্প'--কিন্তু তার আয়তন সম্পর্কে কোথাও কিছু বলেননি। **বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পরিমণ্ডল ভেঙে বেরিয়ে আসা ছোটগল্পের বয়স দেড়শো বছরের বেশি নয়,** আর কবে যে সেই ছোটগল্পের আকার ছোটো হতে হতে আজকের পরিভাষায় 'অনুগল্প' হয়ে গেল সেটা সঠিক বলা মুশকিল। বাংলা ছোটোগল্প পাশ্চাত্যের ছোটগল্পের অনুকরণ না হলেও 'অনুগল্প' অনুসরণ বলা যায়। **'Unity of Impression'** টাই বড় কথা। আকারটা বড় কথা নয়। **Emotion**-এর বিস্তৃতি, একতমের প্রতীতি সরু--মোটা দুটো তার জড়িয়ে থাকে ছোটগল্পের গঠনে। কেন্দ্র থেকে পরিধি এবং পরিধি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ছোটগল্পের বিস্তৃতি।বাংলা ছোটগল্পের সূত্রপাত করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৯ সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পর তিনি নতুন গ্রন্থ 'লিপিকা' রচনা করলেন। এই গ্রন্থেই দেখা যায় ছোটগল্প ও অনুগল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 'লিপিকা' গ্রন্থের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল-'তোতাকাহিনী', 'পট', 'নতুন পুতুল', 'সওগাত' ইত্যাদি। 'তোতাকাহিনী' গল্পে রূপক আছে ব্যঞ্জনা আছে।

এরপরেই ছোটগল্পে এলেন বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি খুব সার্থকভাবে ৩০ থেকে ৪০-এর দশক পর্যন্ত অনেক ছোটগল্প লিখলেন। বনফুলের সার্থক বহু চর্চিত গল্প 'হিংলাজ'। এই গল্পে নাটকীয়তা আছে। তিনি অনুগল্পে সার্থকতা পেয়েছেন। নৈর্বক্তিক প্রবৃত্তি আছে বনফুলের অনুগল্পে। এরপর ষাটের দশকে ছোটগল্পে আন্দোলন এল। নতুন রীতি প্রবর্তিত হলো ছোটগল্পে। নতুন রীতির মধ্যে বক্তব্য প্রধান হয়ে উঠল। অতি বাস্তব চিত্র এই নতুন রীতির ছোটগল্পে উঠে এল। বিমল কর ১০ জন গল্পকার নিয়ে নতুন রীতি প্রবর্তন করলেন। আন্দোলনের নাম 'ছাঁচ ভেঙে ফেলো'। খুব ঋজু ছোট বক্তব্য এই নতুন রীতির ছোটগল্পে এসেছে। আবার 'Unity of Intention'-এর প্রবর্তন হলো। সবসময় অতি বাস্তব চিত্র ছোটগল্পে ভালো লাগলো না পাঠকের। কিছু কাল্পনিক লেখা, কাল্পনিক ছোটগল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পেল।যেটা One sitting-এ বসে পড়া যায়। ১৯৩০ সাল থেকে অমৃত ও বসুমতী পত্রিকা থেকে অনুগল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলা অনুগল্পে শ্রেষ্ঠ জায়গা পেয়েছেন বর্তমান সময়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী। বনফুলের ভাষণ মিতভাষণ। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প ছোট নয়, একতমের প্রতীতি, 'Unity of Impression' রক্ষিত হয়েছে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে।অনুগল্পের মূলভাব রক্ষিত হয়েছে আকার ক্রমশ ছোট হওয়ার ফলে, বক্তব্য প্রধান হয়েছে, গভীর গূঢ় কথা প্রকাশ পেয়েছে। ঋজু ও গভীর ভাবনার সংরূপ হল

আজকের এই অনুগল্প। আজকের এই অনুগল্প সমাজের প্রতি বাস্তব ও হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। সাগর চট্টোপাধ্যায় ও স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে সমকালীন সমাজের বাস্তব ছবি উঠে এসেছে। হৃদয়ের গভীর মর্মবেদনা উঠে এসেছে।

ছোটগল্পের শরীরকে আরও টানটান, ক্ষীণতর করেই অনুগল্পের জন্ম। গড়নে ছিপছিপে হলেও অনুগল্প স্বভাবে ছোটগল্পের মতোই। গল্পকার রঞ্জন ঘোষালের মতে, 'অনুগল্প হল গল্প জগতের আইপিএল। প্রতিটি বাক্যে থাকতে হবে চার, ছয় রান কিংবা উইকেট পতনের উত্তেজনা। গল্প পরিণতির দিকে যত গড়াবে, তত বাড়বে স্নায়ুযুদ্ধ'। অনুগল্পকে বলা হয় ছোটগল্পের বনসাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়গল্পকে বনসাই করেই ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। সেই ছোটোগল্পকে আরও ছোট, ছিমছামনিপাট, মেদহীন ও ঠাসবুননে রচনা করলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল। তাই বনফুলকে বাংলা সাহিত্যের অনুগল্পের স্রষ্ঠা বলা হয়। বনফুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লেখা 'নিমগাছ' গল্পটি দিয়ে শুরু হয়েছে বাংলা অনুগল্পের পথচলা। 'নিমগাছ' গল্পটি পড়ার পর নিজের অজান্তেই পাঠকের মনে একটি চাপা দুঃখবোধ বহুক্ষণ জেগে থাকবে।

কোনো সৃজনশীল রচনার বৈশিষ্ট্য থাকে না বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে কোনো সৃজনশীল রচনা রচিত হয় না। আগে সৃজনশীল রচনা রচিত হয়, পরে ব্যাকরণবিদ তার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করেন। সেদিক দিয়ে একটি অনুগল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণা করা যায়। এজাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, 'সংকেতময় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্য বিন্যাস-এর দ্বারা পরিবেশ প্রস্তুত করে উপসংহার বাক্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্যভাবে ভাব সত্যের বিদ্যুৎ বিকাশ এর বৈশিষ্ট্য'।আস্তে আস্তে অনুগল্প রূপ নিল প্রতীকী ভাবধারায়। আমরা মনে করি, বাংলা সাহিত্যে খাঁটি অনুগল্পের জন্মদাতা বনফুল। অনুগল্প সনেটের মতো পরিকল্পিত রচনা। সনেট যেমন নকশিকাঁথার মতো সেলাই করা কারুকার্য, অনুগল্পও তেমনি। অনুগল্পকে রূপক কবিতার সাথেও তুলনা করা হয়। অনুগল্প দুটি বা তিনটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা একটি ক্ষুদ্র কাহিনী যা প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে গল্পের সহজ ভাব রাখে আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে থাকে চমকে যাবার মতো একটি ক্ষুদ্র কাহিনী যা আগের অনুচ্ছেদের সাথে কথায় মিল না থাকলেও রূপকার্থে মিল থাকে। অনুগল্পের পরিধি বা আঙ্গিক ক্ষুদ্র অথচ বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ, তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্তর অর্থপূর্ণ। অনুগল্পের বাক্য কবিতার মতো শক্তিশালী, দৃঢ় ও অলংকার সমন্বিত অর্থাৎ উপমা ও চিত্রকল্প সমন্বিত।

বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পটি পড়লে আপাতচোখে গল্পে ধরা পড়ে নিমগাছের বর্ণনা, এর পাতা, বাকল, ছায়া ইত্যাদির বাহ্যিক উপকারিতা। কবিরাজ তার চিকিৎসার কাজে, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছকে অনবরত ব্যবহার করে থাকে।কিন্তু কেউ এই গাছের সামান্যও যত্ন নেয় না। একজন কবি একদিন নিমগাছের

গুণ ও রূপের প্রশংসা করে। কবি যখন অন্য দশজনের মতো না হয়ে নিমগাছটির প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ঠিক তখনই নিমগাছটি সকাতরে ভালোলাগা কবির সাথে চলে যেতে চাইল কিন্তু পারল না। মাটির গভীরে তার শিকড়। ততদিনে তার শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। নিমগাছটিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখলে বোধে কাজ করে, নিমগাছটিই ওবাড়ির বৌ। নিমগাছ যেমন উপকারী বৌটিও তেমনি উপকারী। নিমগাছকে যেমন ব্যবহার করা হয়, বৌটিকেও ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির প্রতি তার ভালোবাসা-দায়দায়িত্ব গভীর থেকে গভীরতর মাত্রায় পৌঁছে গেছে। গাছটি যেতে পারে না। এই গল্পের ম্যাজিক বাক্য হল শেষটি, যেখানে লেখক পুরে দিয়েছেন সীমাহীন কথার আখ্যান। শেষ বাক্যে নিমগাছের পরিবর্তে যদি বৌটি না আসত তাহলে অনুগল্প হত না। ফুটে উঠত না প্রতীকী বা রূপকভাব, ফুটে উঠত না চিত্রকল্প।গল্পটির বর্ণনা এক আর প্রকাশ পেয়েছে অন্য প্রকৃতির বর্ণনা। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে লেখক বিপুল বক্তব্য উপস্থাপনের যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

অনুগল্প বা ফ্ল্যাশ-ফিকশন সম্প্রতি সাহিত্যের জনপ্রিয় শাখা হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছর ধরে ইংল্যান্ডের সাহিত্য জগতে 'ন্যাশনাল ফ্ল্যাশ-ফিকশন ডে' উদযাপিত হয়ে আসছে।নিউজিল্যান্ড অনুরূপভাবে 'জাতীয় অনুগল্প দিবস' পালিত হয়। স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের বিপ্লব, ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর জনপ্রিয়তায় বর্তমানে গল্পের এই খুদে কাঠামোটি নিয়ে হইচই হলেও এটি একেবারে নতুন কিছু নয়--মুখে মুখে বলা গল্প--ঐতিহ্য ধারানুযায়ী ওরাল ট্র্যাডিশন বহুযুগ থেকে চলে আসছে। রূপকথা (Fairy Tale) থেকে আমরা পেয়েছি অনুকাঠামোর গল্প উপকথা (Fable) এবং কথা রূপক (Parable)। ফেবলের সঙ্গে প্যারাবল এর পার্থক্য হল, ফেবলে সরাসরি মানব চরিত্র থাকে না, কিন্তু প্যারাবেলে থাকে। জার্মানিতে গ্রীন দুই ভাই (জ্যাকব গ্রীন ও উইলহেম গ্রীন), ফ্রান্সে পেরোল, ডেনমার্কে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন, ইতালিতে বেসিল, ইংল্যান্ডে কাইটলি ও ক্রোকার এসব রূপকথা বা ফোক-টেলস সংগ্রহ করে আদি গল্পের কাঠামো সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ জাতকের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, গোপাল ভাঁড়ের গল্প ও ইউরোপে ঈশপের গল্পও আকারে বেশ ছোট ছিল। তবে আধুনিক অনুগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, সেগুলো তা নয়। আধুনিক অনুগল্পের প্রাথমিক কাঠামো সেখান থেকে এসেছে বলে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনুগল্পের প্রধানতম লেখক হলেন বনফুল। বেশ কিছু ভালো উপন্যাস ও নাটক লিখলেও বনফুল আজ অনুগল্পের লেখক হিসেবে বেশি পরিচিত। অনুগল্প লিখে হালে পশ্চিমবাংলায় বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তিনি মূলত ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্য জগতে সুনাম অর্জন করেন।

তবে উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কলাম লিখিয়ে হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ছোট পত্র-পত্রিকাতেই লিখেছেন বেশি। প্রথম গল্প সংকলন 'ভূমিসূত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে। প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র 'পুজো' সংখ্যায় ১৯৯২ সালে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট লেখক রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ পরিবেশ তাঁর গল্পে যথাযথভাবে উপস্থিত হয়েছে। সাহিত্য বলতে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বোঝেন--'প্রত্যাশা, আর্তি, অপেক্ষা, উপেক্ষা, বিষাদ, বেদনা--সবই একেকটা নকশার জন্ম দেয়। অক্ষরে অক্ষরে এসব কথা লিখে রাখার ব্যর্থ চেষ্টার নামই সাহিত্য'। গ্রামীণ সংস্কার-বিশ্বাস অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে , প্রভৃতি গল্পে। মানুষ ও সমাজকে 'ঝড়ে কাক মরে' ,'অষ্টচরণ ষোলো হাটু' ,'স্বস্ত্যয়ন' নামক গল্পে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্ম' তিনি ধর্মের চেয়ে বড়ো করে দেখিয়েছেন বইটিতে অসংখ্য অনুগল্পের সম 'অনুগল্প সংগ্রহ'্ভার প্রকাশ করেছেন। স্বল্প পরিসরে বৃহৎ ভাবনাকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাঁর 'অনুগল্প সংগ্রহ' সেই আবাদভূমি। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর আশ্চর্য কলমে তুলে আনেন 'ভুল কোকিল', 'উন্নয়ন', 'বুলেট', 'সাক্ষরতা', 'শকুন'-এর মতো অসামান্য গল্পগুলি। চারটি খন্ডে বিভক্ত বইটিতে সংকলিত হয়েছে শতাধিক গল্প। প্রতিটি গল্পই ভাষা ও ভাবনার নিজস্বতায় জ্বলতে থাকে কোনো এক অলীক নক্ষত্রের মতো।

বর্তমান বিশ্বে অনুগল্প লিখে 'ম্যান অব বুকার' পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন লেখক লিডিয়া ডেভিস। ডেভিসের গল্পের দৈর্ঘ্য এক লাইন থেকে শুরু করে দু-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর গল্পকে আদর্শ অনুগল্প বা ফ্ল্যাশ ফিকশন বলা যায়। ছোটগল্পের পাশাপাশি অনুগল্প লিখে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন আরেক মার্কিন কথা সাহিত্যিক রবার্ট ওলেন বাটলার। তবে বাটলার ও ডেভিসের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক চর পাশাপাশি অনুগল্প লিখে বিখ্যাত হয়েছেন জাপানের প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। অনুগল্প লিখেছেন কাফকা, কেট শপা, শেখবের মতো প্রখ্যাত চচ্চরাও। উল্লেখ্য যে, অনুগল্প সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে আমেরিকায়। সেখানে অনুগল্প এখন ছোটগল্প থেকে আলাদা হয়ে সাহিত্যের স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনুগল্পে বেঁধে দেওয়া কোনো আকার না থাকলেও কেউ কেউ মনে করেন এটি ১০০ শব্দের মধ্যে শেষ হওয়া চাই, আবার কেউ কেউ এক হাজার শব্দের নীচে যেকোনো গল্পকে অনুগল্প বলে মনে করেন। যেমন--মার্কিন কথাসাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রায় ৯০০ শব্দে 'ক্যাট ইন দ্যা রেইন' অনুগল্পটি লিখেছেন, আবার তিনি একটি অনুগল্প লিখেছেন মাত্র ছয় শব্দেঃ 'For sale: baby shoes, never worn.' অন্যদিকে হন্ডুরাসের লেখক Augusto Monterroso 'সাত শব্দের এপিক' বলে বিখ্যাত 'ডাইনোসর' গল্পটি লিখেছেনঃ "Upon waking, the dinosaur was still there"। প্রখ্যাত মেহিকান

লেখক অ্যাডমান্ড ভালাদেস বারো শব্দে লিখলেন 'দ্য সার্চ' গল্পটি "Those maddened sirens that howl roaming the city in search of Ulysses."একটা অসমাপ্ত বাক্য, কিন্তু গল্প! তবে অনুগল্প নিয়ে যেন একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললেন মেহিকোর লেখক Guillermo Samperio। তিনি 'Fantasma' নামে একটি গল্প লিখলেন , !যেখানে শিরোনামের পর একটিও শব্দ লেখা হয়নি।শিরোনাম আর একটি খালি পৃষ্ঠা ফিকশন 'স্মোক লং' অনুগল্পের এই শব্দ সীমাকে চীনা সাহিত্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এ বলে। অর্থাৎ একটি সিগারেট শেষ করতে যে সময় লাগবে তার ভেতর গল্প শেষ হয়ে যাবে। এটিকে মাইক্রো ফিকশন, পোস্টকার্ড ফিকশন, ন্যানো ফিকশন, সাডেন ফিকশন, সুপার শর্ট ফিকশন কিংবা শর্ট শর্ট স্টোরি নামেও ডাকা হয় বিভিন্ন দেশে।

অনুগল্পে অল্পকথনের ভেতর দিয়ে অনুভবের বিষয়টি উঠিয়ে আনা হয়। প্রখ্যাত ফরাসি কবি বোদলেয়ারের মতো অনেক কবি খুদে গদ্য কবিতা (prose poetry) লিখেছেন, যেগুলিকে অনুগল্প হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। অন্যদিকে হালের জনপ্রিয় মার্কিন কবি-গল্পকার স্টুয়ার্ট ডাইবেকের অনেক অনুগল্প গদ্য কবিতা হিসেবে কবিতার কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কবিতা ও ছোটগল্প দুয়ের বৈশিষ্ট্যই অনুগল্পে বিদ্যমান। অনুগল্পের সঙ্গে ছোটগল্পের মূল পার্থক্যটা হল, ছোটগল্প তৈরি হয় কতগুলো মুহূর্ত নিয়ে; এখানে কতগুলো ঘটনার কতগুলো দৃশ্যকে আশ্রয় করে প্রকাশ ঘটে। আর একটি সার্থক অনুগল্পে একটি বিশেষ মুহূর্ত একক দৃশ্যপটের ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত হয়। কিছু পরিষ্কার করে বলা হবে না, কেবল একটা ইঙ্গিত দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হবে। "ফ্ল্যাশ ফিকশন" শরীর গঠনে 'পোকা' সদৃশ হওয়ার কারণে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অতি মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের গল্পে টানটান উত্তেজনা থাকবে। শুরু হতেই শেষ হয়ে যাবে। ছোটগল্পের শেষে চমক থাকতেও পারে, নাও পারে। তবে অনুগল্পে সেটি মৃদুভাবে থাকলে ভালো হয়। যেমন-মৃদু চমকের ধাক্কাটা তীব্রভাবে এসেছে আর্জেন্টিনার কথাসাহিত্যিক হুলিও কোর্তাসার-এর 'Continuity of the Parks' গল্পে। এখানে এক ব্যস্ত ব্যবসায়ী একটি উপন্যাস পড়ছেন তন্ময় হয়ে। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা উদ্যানে ঝোপের আড়ালে দেখা করছে। আসার সময় গাছের ডালের আঁচড়ে নায়কের মুখ কেটে গেছে।নায়ক বলছে এভাবে আর লুকিয়ে দেখা করতে পারবে না। এবার কিছু একটা করা উচিত। তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় সেদিনই নায়িকার স্বামীকে তারা দুজনে মিলে হত্যা করবে। পরিকল্পনা মতো নায়িকার বাড়ি গেল। দরজায় কুকুর ছিল তাদের দেখে ডাকল না। সামনে হলরুম, তারপর করিডর, তারপর একটা সিঁড়ি। চাকু হাতে প্রেমিক। প্রেমিকার স্বামী তখন চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটি উপন্যাস পড়ছেন।গল্প শেষ। অর্থাৎ শুরুতে যে ব্যবসায়ী পাঠক গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপন্যাস পড়া শুরু করেছিলেন, তিনি

উপন্যাসটি শেষ করতে না করতেই স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমের বলি হচ্ছেন। বাস্তব আর ফিকশন মিশে এক হয়ে গেল। মজাটা এইখানেই।

বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পে বনফুল নিমগাছের উপকারী দিকগুলো এবং মানুষের তার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ সেটি বলতে হঠাৎ করে থেমে গল্পকথক বলে দিলেন, পাশের বাড়ির বৌটিরও একই দশা। গল্প শেষ। অর্থাৎ এটাই মৃদু চমক।

বর্তমান যুগে মানুষের হাতে সময় কমে আসছে। তাই মানুষ আস্তে আস্তে ছোটগল্প, অনুগল্পের দিকে বেশি ঝুঁকছে। মানুষ বরাবরই গল্প, উপন্যাস ভালোবাসে। কিন্তু একটা উপন্যাস শেষ করতে অনেক সময় লাগে, অনেক ধৈর্য লাগে। কিন্তু একটি ছোটগল্প বা অনুগল্প ট্রেনে বা বাসে কিছু সময়ের যাতায়াতেও পড়ে নেওয়া যায়। তাই জন্য সাহিত্যপ্রেমী ও ব্যস্তময় মানুষ হাতের মোবাইলে এখন ছোট্ট অনুগল্পকে বেশি পছন্দ করে। বর্তমানের প্রতিটি অনুগল্পই মানুষের গল্প, মানুষের জীবনের গল্প, দৈনন্দিন জীবনের গল্প যা পড়লে পাঠকের মন আনন্দিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, অনুগল্পের সবচেয়ে বড়গুণ মৌনতায় নিজেকে বলাবলি করে পরিচয় করে নেওয়া। পরিণত এবং বোধ সম্পন্ন ইঙ্গিত একটি বড়গুণ যা পাঠককে ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর লেখাটিতে যেন একটি স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সাবলীল অবয়ব গড়ে ওঠে। লেখাতে বক্তব্যের সমন্বয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কাহিনীর ভেতরে কাহিনী, তার ভেতরে বহুস্বর, উল্লম্ফন, মৌনতা, এক মাত্রায় অনেক আত্ম দর্শন ইত্যাদি স্পষ্ট করে উন্মুখ উপস্থাপনায় ধরা থাকবে।

তবু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা হিসেবে ছোটগল্প ও অনুগল্প যে যার সাহিত্য অবস্থানে চির ভাস্বর।

তথ্যসূত্র :

১. সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী পাবলিকেশন, চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

২. প্রবন্ধ বিচিত্রা, সম্পাদনাঃ ড. দেবেশকুমার আচার্য, প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিকেশন, জুলাই, ২০১৫।

৩. অনুগল্প সংগ্রহ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৪।

৪. পঞ্চাশটি গল্প, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৪।

৫. অনুগল্পের মোহনায়, সম্পাদনাঃ চিন্ময় বিশ্বাস, গল্পাণু, ২০১২।

৬. বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (প্রথম খন্ড), বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৫৫।

নজরুলের ‘বিদ্রোহী’- এক বীরের আত্মজাগরণের ইতিকথা

ফতেমা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর, হুগলী

কাজী নজরুল ইসলামের ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের অন্তর্গত বহুবিখ্যাত ও বিতর্কিত কবিতা ‘বিদ্রোহী’। কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে জানা যায়, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো এক রাতে ৩-৪ সি তালতলা, কলকাতা-১৪ লেনের বাড়ির নিচতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোনের ঘরে বসে শেষ রাতে নিবিড় পরিবেশে তিনি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা করে বন্ধু কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদকে শোনান। এই কবিতার প্রথম শ্রোতা তিনিই। কবিতাটি প্রথম ‘বিজলী’ পত্রিকায় ১৯২২ এর ৬ জানুয়ারি (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২ শে পৌষ) প্রকাশিত হয়। পরে ‘মোসলেম ভারত’ এর ১৩২৮ কার্তিক সংখ্যায় ‘বিদ্রোহী’ মুদ্রিত হয় কিন্তু সে সংখ্যাটি ফাল্গুন মাসের আগে প্রকাশিত হয় নি। ‘বিজলী’ ও ‘মোসলেম ভারত’ ব্যতীত ‘প্রবাসী’ (মাঘ ১৩২৮), ‘সাধনা’ (বৈশাখ ১৩২৯), ‘ধূমকেতু’(২২ আগস্ট, ১৯২২) প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এই কবিতা কাজী নজরুল ইসলামকে খ্যাতির সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে দেয়, কবি বিদ্রোহী কবিরূপে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেন। কবিতাটির প্রকাশকাল নিয়ে সামান্য সংশয় থাকলেও ‘বিজলী’র প্রথম প্রকাশেই রবীন্দ্রনাথের সমাদর লাভ করে নজরুল বিশেষ আপ্লুত হয়েছিলেন। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই কালজয়ী কবিতাটির শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে।

বিদ্রোহী’ কবিতা রচনাকালে কবির বয়স মাত্র একুশ বছর। তারুণ্যের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে টগবগে কবিমন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তখন ভয়ংকর রকমের অশান্ত ও উত্তপ্ত। ঘরে বাইরে আগুন জ্বলছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ (১৯১৮তে বা তার পরে) তখন যুদ্ধবিরোধী বাণী তথা শান্তির বাণী শুনতে অপেক্ষারত। আর ভারতবর্ষে তখন চলছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন। স্বাধীনতার জন্য তখন ঘরে ঘরেও চলছে দুর্দমনীয় আন্দোলন। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য ধর্মমত নির্বিশেষে সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। এমনই এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আধমরা বাঙালিকে ঘা মেরে বাঁচিয়ে তুলতে কবি নজরুল ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কালবৈশাখীর ঝড় তুলে দুর্বার গতিতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আবার এমন

ভাবাও অমূলক নয় যে সেনাবাহিনীর এক তেজোদীপ্ত সৈনিক হিসেবে করাচীতে থাকাকালীন শত্রুকে ধ্বংস করার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিটি মানুষই বীরযোদ্ধা, অসম-সাহস ও শৌর্য–বীর্যের অধিকারী। আত্মসচেতন কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল অদম্য সাহস এবং তখন থেকেই নিপীড়িত-নির্যাতিত-শোষিত-উপেক্ষিত-বঞ্চিত মানুষের ব্যথা-বেদনামুক্ত এক সমাজ প্রতিষ্ঠার চিরস্পৃহা জেগেছিল তাঁর মধ্যে। যে কারণে তিনি মানবসমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ওঠেন নিজে নিজেই। অন্তরাত্মার এই অব্যক্ত অভিপ্রায়ই তাঁকে অসাধারণভাবে আন্দোলিত করেছিল। নজরুল যদিও প্রত্যক্ষভাবে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না তবু একথা কে বলতে পারে যে করাচীতে থাকাকালীন যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুরতার যে ছবি নজরুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেইসব ভয়ংকর উপলব্ধি ও তার সাথে একজন সদ্যজাত বীরের অসংযত কল্পনার মিশ্রণে আসলে নজরুলের আমিত্বেরই উন্মোচন ঘটে গেছে 'বিদ্রোহী' কবিতায়। তাছাড়া নজরুল কিশোর বয়সেই দেখেন বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) আন্দোলন। অর্থাৎ একটি সংগ্রামী সময়ে তাঁর জন্ম (১৮৯৯) ও শৈশব-কৈশোর এবং যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে। বলা ভালো, রাজনৈতিক অস্থিরতার এক উত্তাল আবহাওয়ার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর কালজয়ী রচনা' 'বিদ্রোহী'। বস্তুত এ কবিতার জন্ম বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত সাড়া জাগানো ঘটনা। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা, ব্রিটিশরাজের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী বাঙালি জাতিকে নজরুল এ কবিতার মাধ্যমে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। বিশেষ করে মুক্তিকামী বাঙালি তরুণ সমাজের রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করে হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিল এ কবিতার 'বল বীর বল উন্নত মম শির' এই বজ্রকঠিন আহ্বান। এককথায় সমকালীন পরিস্থিতিতে গণমানুষের চাহিদাপূরণে এই কবিতার ভূমিকা ছিলো অভূতপূর্ব। কবি সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে, মনে হলো- এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করেছিল, এ যেন তারই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।"[১] তবে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল অনেক। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের নেতৃত্বে এক কবি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যারা ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে কবিকে অস্থির করে তোলেন। সজনীকান্ত স্বয়ং বন্ধুজন হয়েও নজরুলকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী'র প্যারোডি 'ব্যাঙ'। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনায় মোহিতলালের 'আমি' নামক

গদ্য রচনা হয়েছে অনুপ্রেরণা। শুধু তাই নয় ,ভাবচুরির অভিযোগও উঠেছে। এটা ঠিক যে, দুটি রচনার মধ্যে কিছু বাহ্যিক মিল হয়তো আছে। মোহিতলালের মতো নজরুলের রচনাতেও বারবার 'আমি'র উল্লেখ আছে। দুটি ক্ষেত্রেই নানা ধরনের বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাবমূলক অনুষঙ্গের পরপর উল্লেখ, নিজেকে বিভিন্ন বিশেষণ- অভিধায় পরিচায়িত করা, উপমা চয়ন ও ভবিষ্যত কার্যাবলীর দিক নির্দেশ এসব বিষয়ে বেশ কিছু মিল আছে। কিন্তু সাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয়ের আদর্শ, মত এমনকি পথও ভিন্ন দিকে গেছে। কবি ও সমালোচক নির্মলেন্দু ভৌমিক এ সম্পর্কে বলেছেন, "মোহিতলালের 'আমি' খুব তত্ত্বপ্রধান রচনা। নানা বিরুদ্ধগুণান্বিত প্রসঙ্গের উল্লেখের মাধ্যমে জগত ও জীবনের একটি পূর্ণতাকে আয়ত্ত করবার প্রয়াস এখানে স্পষ্ট। এই আমির মধ্যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব বেদান্তবাদের এক ভিত্তি স্থানীয় দিক। একটি শান্তির বোধ শেষপর্যন্ত মোহিতলালের রচনার মধ্যে আদ্যন্ত প্রবাহিত।

নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহী-বীর এবং কবির আপন কবিসত্তা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন; উদ্দাম জীবন এবং ভাঙনের দিকটি প্রকাশের পর একসময় তা শান্ত হয়ে এসেছে। নিপীড়িত মানুষের ব্যথা-বেদনায় তিনি সহমর্মী, এটি কবিতায় কিন্তু তাদৃশ্য প্রাধান্য পায় নি এবং মোহিতলালে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ মাত্র নেই।"[২] তাছাড়া নটরাজের থিম কল্পনা 'বিদ্রোহী' কবিতাটির মূল ভিত্তি, যা কবিতাটিকে সামগ্রিকভাবে ধরে রেখেছে। আর মোহিতলালের কবিতায় নটরাজের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকলেও তা প্রাধান্য পায় নি। আসলে, কবি 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে বিদ্রোহ উপস্থাপিত করেছেন এবং 'আমি' বলে যে শক্তিকে মূর্ত করে তুলেছেন তার যথার্থ প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ বিরোধী ব্যাখ্যাই কবিতাটি সম্পর্কে এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণ। নজরুল যদিও প্রত্যক্ষভাবে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না তবু একথা কে বলতে পারে যে করাচীতে থাকাকালীন যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুরতার যে ছবি নজরুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেইসব ভয়ংকর উপলব্ধি ও তার সাথে একজন সদ্যজাত বীরের অসংযত কল্পনার মিশ্রণে আসলে নজরুলের আমিত্বেরই উন্মোচন ঘটে গেছে 'বিদ্রোহী' কবিতায়। বিদ্রোহী কবিতা সে অর্থে কবিরই আত্মজাগরণের ইতিকথা।

লক্ষ্যণীয়, বিদ্রোহী কবিতাটিতে ১৪ টি ছোট বড় স্তবক, ১৪১ টি লাইন বা পঙক্তি এবং 'আমি' শব্দটির ব্যবহার আছে ১৪৫ বার। 'আমি' শব্দের এই পৌনঃপুনিক ব্যবহারের বিশেষত্ব কী? 'আমি' বলতে কবি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা

দরকার। প্রাথমিক ভাবে মনে হতেই পারে যে, আমি বলতে কবি নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু এই পরিচয়কে বাউণ্ডুলে কবির প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত সাধারণ পরিচয় ভাবলে সঠিক বিচার হবে না। প্রত্যেক আত্মসচেতন ব্যক্তির মধ্যে সাধারণত দুটি সমান্তরাল সত্তা বিরাজমান- একটি তার প্রতিদিনকার আটপৌরে পরিচয় বহন করে। অপরটি তার বিরাটত্বের পরিচয় বহন করে। প্রাত্যহিক সত্তার থাকে অহংকার। কিন্তু বৃহত্তম সত্তার থাকে অহংবোধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রথমটি হল 'ক্ষুদ্র আমি' আর দ্বিতীয়টি হল 'বিরাট আমি'। দার্শনিক মতে, এই 'বিরাট আমি' হল এক ধরনের 'ইগো' বা আত্মব্যক্তিত্ব সচেতনতার লক্ষণ। এই অহংবোধ জাগ্রত হলে সে তখন বিরাট মানসিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একদিন এই শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'প্রভাত সংগীত' এর কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। যে শক্তির অসীম উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছিল নজরুল মনের মধ্যে সেই শক্তির প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং নিজের সেই বৃহত্তর সত্তাকে প্রকাশ করেছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' হিসেবে।

কবিতার উপস্থাপন রীতি ও বিন্যাস ভঙ্গিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবিতাটি মূলত সম্বোধনমূলক, দেশ জাতি সমাজের কোনো এক 'বীর'কে উদ্দেশ্য করে রচিত। কবিতাটি সেই তেজোদীপ্ত বীরের আত্ম উদ্বোধনের অগ্নিবাণী। অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'-এও এই ভাবনার প্রতিফলন আছে। সেখানেও দেখি 'নতুনের কেতন উড়িয়ে' যে কালবৈশাখী ঝড় আসছে তারই জন্য কবি বলেছেন 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।' 'বিদ্রোহী'তে এসে নজরুল স্বয়ং কালবৈশাখী ঝড় হয়ে উঠেছেন। কে এই বীর? কবিতাটি পাঠ করলে পাঠক বিনা আয়াসেই বুঝে যাবে এই বীর আসলে কবিরই অন্তরসত্তা; তাঁকে উদ্দেশ্য করেই কবিতাটি রচিত। তাঁর জাগরণ ও কর্ম পরিকল্পনারই ইতিকথা এই কবিতা। কবিতায় দু'দুবার উল্লেখিত 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। কিংবা 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।'[৩] আসলে কবির নিজস্ব কবিসত্তার জাগরণেরই সূচক।

আবার অন্যদিকে 'আমি' বলতে ব্যক্তিকবি শুধু নিজেকে বুঝিয়েছেন এমন মনে করা ঠিক হবে না- এ আমি কোনো বিশেষ 'আমি' নয়, এর পরিচয় আরও বিস্তৃত। কবি এখানে নতুন যুগের মানুষের চিত্তজাগরণের অগ্রদূত। তিনি শুধু নিজের মুক্তিই অনুভব করেন নি- তাঁর মনে প্রাণে জেগেছে নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করার নেশা। কবি কেবলমাত্র নিজে স্বাধীন, একথা উচ্চারণ করেন নি, তিনি

সদ্যজাগ্রত মানুষের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে তাদেরও চিত্তজাগরণের মন্ত্রপাঠ করিয়েছেন। কবিতার প্রথমেই তিনি ওই সব জাগ্রত চেতনার মানুষকে আহ্বান করে বলেছেন- “বল বীর- বল উন্নত মম শির।”[৩]এরপর আমি হিসেবে যেসব কথা তিনি বলেছেন সেগুলি অনুসরণ করলেই পাঠক নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, সে ‘আমি’ কেবল কবি নিজে নন, সে ‘আমি’ আসলে মুক্তি পাগল প্রতিটি মানুষ। কবির সংকল্প প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মানুষেরই সংকল্প।

তাই এখানে যে বিদ্রোহের কথা শুনিয়েছেন তার সঠিক প্রকৃতি অনুধাবন করাও সহজ বিষয় নয়। আমরা দেখছি সমগ্র কবিতাতেই কবি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। আবেগের উচ্ছ্বাসে কখনো তিনি ধ্বংসের কথা বলেছেন, কখনো বলেছেন ত্রাস সঞ্চারের কথা, কখনো পৌরাণিক ঋষির সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন, কখনো বা অন্তরের অন্তঃস্থলে হয়েছেন রোমাঞ্চিত। আমরা যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তাহলে দেখবো কবির বিদ্রোহ ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করেছে- কখনো দৈব-প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে চেষ্টা করেছেন, কখনো তিনি পৃথিবীর সমস্ত নিয়মকানুন ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন, কখনো চেয়েছেন সৃষ্টিকেই উপড়ে ফেলতে। আবার কখনো তাঁর বিদ্রোহ পৃথিবীর ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি, রণদুর্মদ শক্তির প্রতি, যে কোনো অত্যাচারী প্রভূত্বের প্রতি। এই সর্বাত্মক বিদ্রোহের কারণ কী? শুধু কী নিজেকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য? উত্তরে বলা যায়, যে কোনো ধরনের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর এই বিদ্রোহ। মানুষ যে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন তা তো নয়- সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় এসব ক্ষেত্রেও তাকে কোনো না কোনো ভাবে বশীভূত হতে হয়; এমনকি সে অবসাদগ্রস্তও হতে পারে। তাই সর্বপ্রকার অধীনতা ও অবসাদ দূরে সরিয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তোলার জন্যই সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর এই উদার বলিষ্ঠ আহ্বান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের প্রতিনিধি এই কবিতার ‘আমি’ বিদ্রোহের ভাষায় হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন কারও অধীন নয়, বরং আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাতেই মানুষের সার্থকতা। বলাবাহুল্য ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সুচনায় ‘বল বীর- বল উন্নত মম শির’ এই পংক্তিদ্বয় তো শুধু ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূল সুর নয়, ‘অগ্নিবীনা’ কাব্যেরও মূল সুর। “বিদ্রোহী’ হলো সর্ববন্ধনমুক্ত ব্যক্তিমানুষের আত্মজাগরণ। মানুষ যদি নির্ভীক, মুক্ত ও স্বাধীন হতে চায়, তাহলে তাকে এই আত্মজাগরণ ঘটাতে হবে। এ বিদ্রোহ আবার ব্যক্তির খেয়াল মাত্র নয়, এ সমষ্টির মুক্তি আকাঙ্ক্ষারও অভিব্যক্তি।”[৪] এই কবিতায় ব্যক্তির মুক্তি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমষ্টির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ চেতনার

আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এবং সেটা অত্যন্ত ব্যাপক, সার্বজনীন, একটা গভীর সত্যবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহীর সমাজচেতনা শুধুমাত্র বিদ্রোহের আবেগে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধিতে ব্যাপক বিস্তৃত। তাই পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় নির্মূল করার কথা যেমন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলতে পেরেছেন তেমনি একথা বলতেও তাঁর বাধে না- "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!"[৫] কাজেই, বিদ্রোহের প্রকৃতি যথাযথ অনুধাবন করতে পারলে সেই বিদ্রোহের লক্ষ্যবস্তু কী সেটা বোঝাও কঠিন হবে না।

বলা ভালো, মানুষকে যে সব শক্তি অবদমিত করে রেখেছে, উৎপীড়নের চাপে তার স্বাধীন সত্তা বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে- তারই বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা গুঁড়িয়ে দিয়েছে অত্যাচার আর উৎপীড়নের রোলার- পেষণে। তাই কবি সগর্বে বলেছেন-

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত! "[৬]

ধর্মীয় অত্যাচারও মানুষের চিত্তকে অবসাদগ্রস্ত করে রাখে তাই দেবতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছেন তিনি বিশ্ব-বিধাত্রীর বিদ্রোহী সূত-গোলক ভেদ করে তাঁর উন্নত শির মহাকাশের ওপরে গিয়ে পৌঁছবে। শুধু তাই নয়, সামাজিক সংস্কারও যেহেতু মানুষকে পদে পদে শৃঙ্খলিত করে, তাকে অন্ধ করে রাখে তাই যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তাঁর বিদ্রোহ-"আমি দাবানল দাহ দহন করিব বিশ্ব।"[৭] এ যেমন ধ্বংসের বার্তা বহন করছে তেমনি অন্যত্র যখন বলছেন- "আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির/ মহানন্দে।"[৮] এ থেকে স্পষ্ট যে, এই বিদ্রোহী বিদ্রোহ করতে বা পৃথিবীকে দহন করতে চেয়েছেন শুধু ধ্বংসের কারণেই নয়, তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অগ্নিশুদ্ধ করার জন্যও। পৃথিবীকে উৎপাটিত করতে চেয়েছেন নতুন করে সৃষ্টি করার জন্য। সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় জীবনের কঠিন-কঠোর ভূমিতেই শুধু বিচরণ করেন নি। কবিসুলভ চেতনার প্রকাশে, জীবনকে ভালোবেসে তার প্রতিও দায়িত্ব উপেক্ষা করেন নি। প্রেম- প্রকৃতি- নারীকে ঘিরে রোমান্টিক কবিমনের প্রকাশও কবিতায় দুর্লভ নয়। সংগ্রামের ঘোর ঘনঘটার মধ্যেও কবি তাই বিস্মৃত হন নি 'চপল মেয়ের ভালবাসা', ' গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি', 'কাঁকন চুরির কনকন', কিংবা 'বিধবার হা হুতাশ' ইত্যাদি কোমল অনুভূতির কথা। 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার'

ধ্বনি তোলার সাধনা যেমন তাঁর, তেমনি ঘুম চুমু দিয়ে নিখিল বিশ্বকে নিঝঝুম করে রাখার সাধনাও তাঁরই। এই কবিতায় বিদ্রোহীর ভাবনায় অনেক বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা থাকলেও বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তা সম্পর্কে এবং সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে অন্বিত। তাই বিদ্রোহীর ‘একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।’[৯] সে সৃষ্টি, সে ধ্বংস, সে লোকালয় এবং শ্মশানও বটে। কখনো প্রশান্ত আবার কখনো অশান্ত। এ কবিতার অস্থিরতা, উদ্দামতা, আবেগ-আকুল উচ্ছ্বাস সবকিছু শেষপর্যন্ত একটা কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির প্রশান্তি লাভ করে।

আবার রসনিষ্পত্তির বিচারে ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি বীর রসের কবিতা একথা বলার অপেক্ষা রাখে নাঃ “বল বীর/বল উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!/বল বীর/বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি/চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি/ভুল্যোক দ্যুলোক আরশ ছেদিয়া /উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর/ মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজ টীকা দীপ্ত জয়শ্রীর/ বল বীর/আমি চির উন্নত শির।”[১০] এই কবিতায় আমরা দেখছি এক বিদ্রোহী অজেয়কে জয় করার জন্য উচ্চকণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে। সমালোচকের মতে এখানে “বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, আলম্বন বিভাব বিজেতব্য অরি, উদ্দীপন বিভাব সেই বিজেতব্য শত্রুর চেষ্টাদি, অন্বেষণ সহায় প্রভৃতি অনুভাব, ধৃতি –মতি-গর্ব ইত্যাদি সঞ্চারীভাব। বিদ্রোহী তার বিজেতব্যের বিরুদ্ধে উগ্রমতি প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে গর্ব। যথাযথ শব্দ ছন্দের সাহায্যে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তলোকে পূর্বস্থাপিত উৎসাহকে কবি বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবযোগে বীররসে পরিণতি দান করেছেন।”[১১] সুদীর্ঘ এই কবিতার মূল রস বীর হলেও তার অঙ্গীরস হিসেবে মধুর রসের সংযোজন ঘটেছে অবলীলায়। যেমনঃ “আমি অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা ব্যথা সুনিবিড়।/চিত চুম্বন চোর কম্পন আমি থর থর প্রথম পরশ কুমারীর/আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুখন/আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুরির কন্ কন্” [১২] সুতরাং বলা যেতে পারে , নজরুলের জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনায় বিদ্রোহের প্রেরণা মুখ্য হলেও একমাত্র নয়। সে দিক থেকে কবি সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মূল্যায়নে বিদ্রোহী কবিতার সাহিত্যমূল্য যথার্থ সুবিচার পেয়েছে বলে মনে করি। তিনি বলেছেন, “...তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্যসাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান হলেও শুধু ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির বিদ্রোহী সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাসে

নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ – আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত কবিতা আন্দোলনের ঊর্ধ্বেই শিখরের মতো স্থির।”[১৩] অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন, ‘বিদ্রোহী’ কবিতার যত অশান্তি উদ্দামতার আড়ালে নিহিত আছে তাঁর বহু প্রত্যাশিত চির প্রশান্তি। অবশ্য কবিতায় সেই প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি বিশেষ নেই। ‘বিদ্রোহী’তে তিনি ঝঞ্ঝার বেগে নটরাজের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত অশান্তির মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন। এমনকি ঈশ্বর বা বিধাতাকেও অস্বীকার করেছেন। ‘বিদ্রোহী’ কে তাই শুধু ভাঙনের কবিতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু না, এই ভাঙন তথা ধ্বংসের মধ্যেই তিনি সৃষ্টির নববার্তা ঘোষণা করতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে রচিত বহু কবিতায় যেমন ‘দোলনচাঁপা’ কাব্যের অন্যতম ‘আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’তে দেখি নবসৃষ্টির মহানন্দে তিনি মেতে উঠেছেন। কবিতার নামের মধ্যেই সৃষ্টির দিকটিকে কবি তুলে ধরেছেন। শেষ স্তবকে কবি লিখেছেনঃ ‘মোর ডাইনে শিশু সদ্যজাত মরা বাম পাশে।’[১৪] ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাতেও আছে ‘ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন বেদন।’ এইরকম বহু কবিতার উল্লেখ করা যায় যেখানে বিদ্রোহ -প্রশান্তি, ধ্বংস- সৃষ্টি পরস্পর এই বিপরীত ভাবনার পরিচয় প্রকাশিত। কবিসত্তার বিকল্প পুরুষ এই নবাগত বিদ্রোহী। তারুণ্যের প্রাণচঞ্চলতার কারণে সে শিশু বা কিশোর-‘আমি চির শিশু, চির কিশোর!’ এই প্রাণচাঞ্চল্যই কবিতাটিতে প্রতিফলিত, সেই পটভূমিতে বা দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটিকে বিচার করলে কবিতাটির যথার্থ মুল্যায়ন হবে।

তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জরায় জীর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিবেশের মধ্যে নবাগত এই বিদ্রোহী তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের কারণেই আত্মপ্রাধান্যের প্রবল অহংকারে যে ভগবান, দেবতা, খোদাকে অস্বীকার করেছিলেন তাঁদের তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। যে আত্মসত্তাকে অতিপ্রাধান্য দিয়েছিলেন, সেই আত্মসত্তাকেই তিনি বহুজনের সম্মিলিত সত্তায় সমন্বিত করে নিয়ে ছিলেন।

তথ্যসুত্র :

১। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলামঃ কবিমানস ও কবিতা, (নজরুল ইসলামঃ প্রবন্ধ সঙ্কলন/বুদ্ধদেব বসু),রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২১৬

২। দেবকুমার ঘোষ, (সম্পাদক), (প্রবন্ধঃ বিদ্রোহীঃ কবিতাও কবির বিশ্বঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক), শিলালিপি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ৫৪

৩। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কোলকাতা, ১৩২৮, পৃঃ ৬

৪। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলামঃ কবিমানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ১৯১

৫। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কোলকাতা, ১৩২৮, পৃঃ ৬

৬। তদেব

৭। তদেব, পৃঃ ৩

৮। তদেব,পৃঃ ৬

৯। তদেব, পৃঃ ৩

১০। তদেব, পৃঃ ১

১১। রামজীবন আচার্য, নজরুল কবিতাঃ ভাব ও রূপ, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৭২-৭৩

১২। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪

১৩। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ,নজরুল ইসলামঃ কবিমানস ও কবিতা, (প্রবন্ধঃ বিদ্রোহীঃ কবিতা ও কবির বিশ্ব/ নির্মলেন্দু ভৌমিক), রত্নাবলী, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ৫৪

১৪। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮

উদ্বাস্তু কথা : প্রসঙ্গ নদিয়া জেলা

রবীন সরকার
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের ক্ষত অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজভূমি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেই আশ্রিতরা ভারতে এসে 'উদ্বাস্তু' নামক অভিধায় ভূষিত হলেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গার মতো নদিয়ায়ও তাদের একটা বড় অংশ আশ্রয় নেন। সেই উদ্বাস্তুদের শ্রেণিকরণ, জীবন যন্ত্রণারস্বরূপ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।
সূচক শব্দ : উদ্বাস্তু, সীমিত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তু, চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়গ্রস্ত উদ্বাস্তু, নদিয়া।

মূল আলোচনা :
সর্বনাশা দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমানদের অসহনীয় অত্যাচারের জন্য ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানা কারণে তারা সহায়-সম্বলহীনভাবে খালের ধারে, ঝোপের আড়ালে, রেল লাইনের পাশে বসবাস করতে থাকে। নদিয়া জেলার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা নয়। বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে প্রাণে তারা বেঁচে আছে কোনভাবে। বেশিরভাগ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে। নদিয়া এমনই একটি জেলা যার বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে। এইসবউদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় —

(ক) সীমিত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী অভিবাসী বা উদ্বাস্তু
(খ) চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়গ্রস্তউদ্বাস্তু

এই দুই শ্রেণির মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথম শ্রেণিরউদ্বাস্তরা তুলনামূলক কম দুঃখ কষ্টের শিকার হয়েছেন। এরা অন্য শ্রেণির থেকে একটু বেশি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রথম শ্রেণির লোকেরা ছিলেন প্রগতিশীল। সমগ্র পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ই তখন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল ছিল তা বলতে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষিত শ্রেণি একটু বেশি সমাজ সচেতন ছিলেন এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও বটে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যক হিন্দু নিধন কিংবা বরিশালের মুলাদি রায়টের খবর পেয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে চলে আসেন। এদেরকেই কম বিপর্যয়ভোগী অভিবাসিত বা উদ্বাস্তু বলে আমরা চিহ্নিত করছি।

তৃতীয়ত, এরা বুঝেছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যেহেতু দেশভাগ হয়েছে এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, তাই কালে কালে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার বাড়বে বৈ কমবে না; তাই মানে মানে কেটে পড়াই ভালো। এ প্রসঙ্গে নদিয়াবাসী এক অভিবাসীর উপমায় পরিষ্কার বোঝা যায় — শরৎচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় লিখছেন —

"বিলের জল যখন শুকাতে আরম্ভ করে বড় মাছ বুদ্ধিমান, তারা টের পায় বিলে আর জল থাকবে না। জল শুকাবার পূর্বেই তারাও বেরিয়ে অন্য কোথাও গভীর জলে চলে যায় ... তেমনি বর্ণ হিন্দুরা চলে গেল, তাদের নেতারাও দেশ ছাড়ল...।"

বিষয়টি বোধহয় আর ব্যাখ্যা করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। এই বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়কেই কম কষ্টভোগী অভিবাসী বলা হচ্ছে। এই প্রথম শ্রেণির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল— ভারত-পাকিস্তান ভাগের সময় এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যারা সরকারী চাকুরী রত তাদের মধ্যে কে কোন অংশে চাকুরী করতে চান তার হলফনামা জমা করুন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ বর্ণহিন্দুরা ভারতে চাকুরী করার সহমত পোষণ করে ভারতবর্ষে আসার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে করে নেন। তাদের সেই জন্য দেশভাগের চরম ভোগান্তি পেতে হয়নি। ফলে ১৯৪৭-৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রায় সমগ্র বর্ণহিন্দুরা এখানে চলে আসেন।

পঞ্চমত, এই প্রথম শ্রেণির অভিবাসিতদের প্রায় সবই ছিল বর্ণহিন্দু। এদের মধ্যে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যবর্ণের হিন্দুরা বেশি। বিনিময়ের ফলে এরা এপার বাংলায় আসায় এখানে প্রচুর জমিজমা ও অর্থও পেয়েছিলেন যার জন্য তারা শুধু স্থান ত্যাগের ব্যথাই পেলেন, সর্বহারার যন্ত্রণায় তারা বিদ্ধ হননি।

ষষ্ঠত, এই শ্রেণির বর্ণহিন্দুরা পূর্ববাংলায়ই সম্ভ্রান্ত, অর্থশালী ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই প্রায় সরকারী চাকুরী, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক কিংবা স্বচ্ছল ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার মাহিষ্যদের অনেকেরই প্রচুর কৃষিজমি ছিল। নিজ নিজ এলাকায় হিন্দু কিংবা মুসলিম দুই শ্রেণির কাছে প্রভুর মতো ছিলেন। এখানে এসে কোনো না কোনোভাবে অতি সহজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তোলেন; যার জন্য দেশভাগের চরম অবিচার ও অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি; এখানেও অসহনীয় কোন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়নি।

সপ্তমত, নিজস্ব ক্ষমতাবলেই এপার বাংলায় এসে তারা তাদের জায়গা করে নেন। সমাজের মোড়ল,নেতা, বুদ্ধিজীবীদের আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান-সন্ততি সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শিরোমণি হয়ে আছেন।

নদিয়া জেলার দিকে তাকালেও এই একই চিত্র দেখা যাবে। বর্তমান প্রগতিশীল সমাজে যারা বিরাজ করছেন তাদের পূর্ব ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, এই ধরনের অভিবাসনের মাধ্যমেই তারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন। এই জেলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিই ছিল এদের এক সময়কার আশ্রয়স্থলআবার অনেকে ক্যাম্পের সুবিধা নিতে নিতে একসময় নিজেদের অর্থবলে ভালো ভালো জায়গা কিনে নিজস্ব বাড়ি গাড়ি করে ফেলেছেন। অনেকে ব্যবসা করে শিল্পপতি পর্যন্ত হয়ে উঠেছেন।

অপরদিকে এর ঠিক বিপরীত অবস্থানে রয়েছেন চরম ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী অভিবাসিত গোষ্ঠী। এদের জীবনের সংগ্রামের কাহিনি খুবই মর্মান্তিক। এই সম্প্রদায়েরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য এদের অধিক কষ্ট পেতে হয়েছে। যেমন—

দ্বিতীয় শ্রেণির উদ্বাস্তু বা অভিবাসিত জনগোষ্ঠী সচেতনতার অভাবে অধিক দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছেন। এই শ্রেণির মানুষজনের দেশ ও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুবই

গভীর। শত দুঃখ-কষ্টেও তারা নিজের মাতৃসম জন্মভিটে ত্যাগ করতে চাননি। মুখ বুজে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছেন তবু একবারের জন্যও দেশ ত্যাগের চিন্তা করেননি।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এদের মধ্যে প্রায় সবই ছিলেন তথাকথিত অন্ত্যজ, অব্রাহ্মণ,অবৈদিক শ্রেণির মানুষজন। বিশেষ করে নবশূদ্র বা নমশূদ্র শ্রেণিভুক্ত। এদের সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য পিছিয়ে পড়া হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র কৃষক, হতদরিদ্র মজুর শ্রেণির মানুষ। এদের অধিবাস ছিল শহর থেকে অনেক দূরে, বিলের ধারে, চরাভূমিতে কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। একই দেশের মাটিতে একই জলহাওয়া পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, তারা কখনো তাদের শত্রু ভেবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে সে চিন্তা এই সহজ-সরল, নিষ্পাপ মানুষগুলো ভেবেই উঠতে পারেননি। অত্যধিক দুঃখ-কষ্ট ও অসহায়তার মধ্যে পড়তে হয়েছিল এই মানুষগুলোকেই বেশি।

অবশেষে সমগ্র বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) যখন হিন্দুদের উপর অত্যাচার ক্রমাগত বাড়তে থাকে, একটা সময় বাবার সামনে মেয়েকে অত্যাচারিত হতে দেখতে হচ্ছে, নিজের স্ত্রীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন বাধ্য হয়ে মানুষগুলো রাতের অন্ধকারে সেই মাটির টান অগ্রাহ্য করে শূন্য হাতে চোরাপথে ভারতবর্ষে আসতে থাকেন। এদিকের সরকার তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কোনো রকম সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতা ছাড়া স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে যে যেখানে পারে বসবাস করতে থাকেন। কাল কি খাবে তার কোনো সংস্থান ছিল না। গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়ে কোনো প্রকারে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন। যারা পূর্বে ঐ বাংলা থেকে এসেছেন তাদেরও চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন তারা। এদেশীয়দের কাছে অতিরিক্ত বলে এদের নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। সমস্ত রকমের অপমান সহ্য করে, পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে কঠিন সংকল্প নিয়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে বাঁচার লড়াই শুরু করেন; তারাও অনেকে আজ প্রতিষ্ঠিত, তবে এদের কষ্ট দুঃখের সীমারেখা ছিল না।

এই দ্বিতীয় শ্রেণির অভিবাসিতরা শিক্ষা-দীক্ষায় খুবই পিছিয়ে ছিলেন। অনেকে একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন, কৃষিকাজ ছাড়া কোনো কাজে দক্ষতাও ছিল খুবই কম। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পিছিয়ে ছিলেন। গ্রামগঞ্জে অনেকেই পুনরায় পরাধীন হয়ে উচ্চবর্ণীয়দের গৃহকর্মে নিযুক্ত হয়ে জীবিকানির্বাহ করতে শুরু করেন; সেই ধারা এখনও চারিদিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়।

এই দ্বিতীয় শ্রেণির অনেক অভিবাসী প্রিয়জনদের হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই জেলার বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে। ক্যাম্পগুলি— কাল্যাণী চাঁদমারী, রানাঘাট, ধুবুলিয়া, কুপার্স, চামটা প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। জনদরদী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে নদিয়া জেলার বিভিন্ন কলোনী তৈরি করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণির অভিবাসিতদের প্রায় সবাই ছিলেননমঃশূদ্র শ্রেণিভুক্ত।

নদিয়া জেলায় অভিবাসনের নানাবিধ কারণ আছে। প্রথমত,পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা দেশত্যাগের পর বাংলা ভাষাভাষী ও নিজ ভূখণ্ডের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেন। আর সেই কারণেই সীমান্তবর্তী এই জেলাটিই অভিবাসিতরা বেছে নেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর পাসপোর্ট প্রথা চালু করার কথা ঘোষণা করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। এই

খবর পেয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে সংখ্যালঘু হিন্দু এপার বাংলায় আসতে থাকেন। তাদের হাতে সময়ও কম ছিল, তাই সীমান্তবর্তী নদিয়া জেলাতেই থাকার চেষ্টা করেছিলেন।

তৃতীয়ত, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসার ক্ষেত্রে যে বর্ডারগুলি ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দর্শনা ও বেনাপোল। দর্শনা বর্ডারটি নদিয়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত। দর্শনা বর্ডার দিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীরা অতি সহজেই নদিয়া জেলার গেদে স্টেশনে আসতে সক্ষম হতেন। এখান থেকে নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তেন। তাছাড়া বেনাপোল বর্ডারটিও এই জেলা থেকে বেশি দূরে নয়। বনগাঁ স্টেশন থেকে বাসে চাকদহ হয়ে নদিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়তেন।

চতুর্থত, এই দ্বিতীয় শ্রেণির অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ছিলেন কৃষিজীবী। তাই তারা পশ্চিমবঙ্গে এমন এলাকাতেই থাকতে চাইতেন যেখানে একটু বেশি পতিত জমি পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পতিত জমির পরিমাণ নদিয়া জেলায় বেশি ছিল সেই কারণেই এখানে অভিবাসিত মানুষজন থাকার চেষ্টা করেন। একসময় কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট কৃষিসম্পদ উৎপাদনে ঘাটতি ছিল। অথচ আজ কর্মঠ এই উদ্বাস্তু মানুষজনের রক্ত ঘাম করা চেষ্টায় প্রতিটি অনাবাদী জমি উর্বর করে তুলেছেন। দেশভাগের পূর্বে নদিয়া জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল হিন্দুদের তুলনায় বেশি। এখানকার অনেক মুসলমানরাই ভেবেছিলেন দেশভাগের পরে জেলাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় বহু সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায় জেলাটি ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে যান। নিজেরা দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পত্তি বিনিময়ও করেছিলেন অনেকে,আবার ইচ্ছাকৃতভাবেও সবকিছু ছেড়ে কেউ কেউ দেশত্যাগ করেছিলেন। নদিয়া জেলার সেই সব ফেলে যাওয়া স্থানে অভিবাসিত অধিবাসীরা দখল করে বসবাস করতে থাকেন।

সবারই প্রায় জানা, পূর্ববঙ্গে একটি বৃহত্তর নিম্নবর্ণীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। এই জাতীর শিক্ষা ও সচেতনতা প্রসারে শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান অবর্ণনীয়। এদের বসবাস খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল জেলায় বেশি ছিল। এই সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ এপার বাংলায় এসে দুই ২৪ পরগণা, বনগাঁ ও নদিয়া জেলায় আশ্রয় নেন। এখানে ঠাকুরনগর ধাম তৈরি করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের উত্তরসূরীরা এবং তাঁর ভক্তরা পূর্ববঙ্গের মতো ওড়াকান্দির মতো মিলন মেলারও প্রচলন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান এই বাংলায় ভক্তদের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলে। তাঁর শিক্ষা বিষয়কপদক্ষেপ, জমিদার বিরোধী আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ,সাম্প্রদায়িক ঐক্য, নারীর প্রতি মর্যাদা, বিধবা বিবাহ প্রচলন সহ গণস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব, গার্হস্থ্য ধর্মের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া— এইসব মানব জাতির মঙ্গলের পথ দেখানোর মতো বিষয়ে এক বিরাট জন সমর্থনের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া শিক্ষানীতির দ্বারা আজ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার ছাপ রেখে চলেছেন। নদিয়া জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতাঁর অনুগামীরা তৈরি করে নিজেদের খরচে তা দীর্ঘদিন চালিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের একচেটিয়াভাবে নদিয়া জেলায় আগমনের কারণ হিসাবে বলা যায়— ধর্মীয় ঐক্য সুরক্ষা করা, কাজের সুবিধা বিশেষ করে তাঁতের কাজের সুযোগ, মাছ ধরার সুবিধা, নিকটেই জলাভূমি ও গঙ্গা অবস্থিত। কাজের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা — নদিয়া জেলায় এখন প্রচুর সব্জি ও ফুলের চাষ, তাঁতের কাজ, সেইসব দ্রব্য ও কাঁচামাল কলকাতার বাজারে পৌঁছে দেওয়া ও বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ভালো না থাকলে সবদিক থেকে সমস্যা। জেলার সাথে যেহেতু রেল ও সড়কপথের যোগাযোগ ভালো সেই কারণেও এখানে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর বেছে নেওয়া। কলকাতা ছাড়াও উত্তরবঙ্গ, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলীর সঙ্গে নদিয়া জেলার রেলপথ ও সড়কপথের ব্যবস্থা ভালো। নবদ্বীপ ধামের সাথে হাওড়া ও আসামের যোগাযোগ উন্নত। রানাঘাট থেকে দর্শনা বর্ডার,বনগাঁ বর্ডার রেললাইন দিয়ে সংযুক্ত। এছাড়া মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা,কৃষ্ণনগর,শান্তিপুর, গেদে— যোগাযোগ বিস্তৃত হয়েছে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে রানাঘাট গেদে রেলপথেই পাকিস্তানের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ হত।

জেলাভিত্তিক ১৯৫৭ সালের একটি সমীক্ষায় জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তুলনায় নদিয়া জেলাতেই অভিবাসিতদের সংখ্যা ছিল সবথেকে বেশি, ৭টি শিবিরে প্রায় ৬২,৭৯৭ জন অভিবাসিত বসবাস করতেন। এই অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর এই জেলায় আগমনের জন্য আরও আনুষঙ্গিক অনেক কারণ ছিল। রানাঘাটের অভিবাসিতদের আসার জন্য অভিবাসিতদের অনুপ্রেরণা দেওয়া হত। রানাঘাটে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নাগরিকদের নথিভুক্তকরণ করা হত, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হত, তাই এই জেলায় থাকার এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

নদিয়া জেলার শরণার্থী ক্যাম্পগুলো থেকে ধাপে ধাপে পূর্ববঙ্গের এই দ্বিতীয় শ্রেণির অভিবাসীদের দ্বিতীয় বারে বিভিন্ন কৌশলে বঙ্গভাষাভাষী আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে দূর দূরান্তে পুনর্বাসনের নামে গভীর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেমন— দন্ডকারণ্য, আন্দামানসহ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। এই মানুষগুলোর কোনোভাবেই যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এর বিরুদ্ধে অনেক স্থানে আন্দোলনও হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বহু পুনর্বাসন পাওয়া মানুষেরা পুনরায় বাংলায় ফিরে আসে এবং সামরিক ক্যাম্পগুলোর কাছাকাছি জেলায় বসবাস করতে থাকে। এইভাবে নদিয়া জেলায়ও প্রচুর মানুষ ফিরে এসেছে।

নদিয়া জেলায় নিকটবর্তী পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি হল— যশোহর, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজবাড়ি, মাগুরা, ফরিদপুর, নরাইল প্রভৃতি। দুই বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির একটা যোগসূত্র ভৌগলিক কারণেই ছিল। নদিয়া জেলার সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চলের সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেকটা একই রকমের ছিল। গঙ্গায় পূণ্য স্নান করতে আসার জন্য যশোহর জেলায় জমিদারের উদ্যোগে চাকদহ পর্যন্ত সড়ক পথ নির্মিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিথি মেনে চাকদহের গঙ্গাঘাটে পুণ্যস্নানে ও অনুষ্ঠানে যাওয়া আসা চলত। নদিয়া জেলায় বহু তীর্থক্ষেত্রে দুই বাংলার যোগাযোগ ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটত অবলীলায়। রথযাত্রা, বারুণী স্নান, মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, পৌষ পার্বণ, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি উৎসবাদি উভয় অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান একই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হত। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অভিবাসিতদের মনে হয়েছিল তারা নদিয়া জেলায় আশ্রয় নিতে পারলে নিজেদের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি অনেকটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। তাই অন্য দূরবর্তী অঞ্চলে না গিয়ে নদিয়া জেলার কোনো না কোনো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

এছাড়া আত্মীয়তার কারণেও এই জেলা অভিবাসিতদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। সবাই তো অভিবাসিত একই সময় হননি। পূর্বে যারা এসেছেন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের টানে ও তাদের পরামর্শে একই জেলার পাশাপাশি কোনো অঞ্চলে বসবাসে সুযোগ করে দিয়েছেন আর আগত সর্বহারার দল মনে সাহস পেয়ে পরিচিত জনদের কাছে-পিঠে থাকার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় এই জেলায় যারা পূর্বে এসেছে, অন্যান্যরা পরে এসেও একই জেলায় আশ্রয় নিয়েছে। এক্ষেত্রে দেশীয় নেতা ও এলাকার প্রভাবশালীদের অবদানও স্মরণ করার মতো। সরকারী সাহায্য না নিয়েও তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ছিন্নমূল দেশবাসীর জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এমন নেতা কর্মীদের সংখ্যাও কম না।

তাছাড়া নদিয়া জেলার অভিবাসিত শিবিরগুলির মুখাপেক্ষী না থেকে বিরাট একটি অংশ নিজেদের চেষ্টায় ও ক্ষমতার নদিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত জমি, সরকারি জমি, কিংবা ধনী কোনো ব্যক্তির জমি দখল করে রাতারাতি খুঁটি পুঁতে ছাউনি দিয়ে দখল করে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে যে কলোনীগুলির সৃষ্টি হয়েছে তা অভিবাসিত বা উদ্বাস্তু কলোনী নামে কিংবা 'জবর দখল কলোনী' নামে পরিচিত। নদিয়ায় বাইরের জেলাগুলিতেও এমন বহু কলোনী গড়ে উঠেছিল। এছাড়া নদিয়া জেলার মাজদিয়া, মাগুরখালি,পার্বতীপুর,গোবিন্দপুর প্রভৃতি নামে সরকারী বহু কলোনী গড়ে উঠেছে। বর্তমানে নদিয়া জেলার বেশিরভাগ মানুষই এই শ্রেণিভুক্ত। তাই আমরা এদের নদিয়া জেলার অভিবাসিত অধিবাসী বলে গবেষণায় নির্দিষ্ট করেছি।

সরকার সার্বিকভাবে এই মানুষগুলোর উন্নতিকল্পে সব পদক্ষেপ যে সঠিকও প্রয়োজনানুযায়ী করতে পেরেছেন তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। তবু প্রাথমিকভাবে এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত দক্ষতার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমাগত এইভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা এই সমস্ত জেলাগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন, বর্তমান সময়েও তা ঘটে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আত্মকথা, ২য় খণ্ড, প্রকাশিকা- শ্রীমতী শীলারাণী বিশ্বাস, সগুনা, নদীয়া, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১০১

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক

সোনালী দেবনাথ
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ– বর্তমানে আমরা যে ধরনের নাটক মঞ্চে দেখে অভ্যস্ত সেই ধারার সূচনা উনিশ শতকে। গেরেসিম লেবেদেফ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে যে নাট্য ধারার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটিয়ে যান তার সঙ্গে বাঙালির প্রাণের যোগ গড়ে ওঠে। যদিও আমাদের দেশিয় জনজীবনের মধ্যে নাটকের স্থান বরাবরই থেকেছে। সেই চর্যাপদের সময় থেকেই, মধ্যযুগে আমরা তা পাই নাটগীতির মধ্যে। কিন্তু আর সমস্ত কিছুর মতই এই ক্ষেত্রেও আমরা সাহেবদের দেখানো পথেই চলতে আগ্রহী। সাহেবরা যেমন করে নাটক করেন ঠিক তেমন করে না করতে পারলে যেন সার্থক নাটক তৈরিই হয় না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির যোগ্য সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তা মনে করেন নি। নাটক নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিন্দু মেলা সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে যুবকদের মনে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল তার প্রভাব পড়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওপরেও। তাই দেখা যায় একের পর এক নাটকে তিনি হিন্দু বীরদের কাহিনি দর্শকদের সামনে তুলে ধরছেন। পরে এই ধরনের নাটক করা থেকে সরে এলেও তাঁর নাটক তাঁর জীবনের আদর্শকেই তুলে ধরছে সর্বদা।
সূচক শব্দ–জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃত নাটক, লোকশিল্প, নাটগীতি, হিন্দু মেলা।

আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশে পাশ্চাত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের ভূমিকা সবিশেষ। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবীন জীবানানুভব শিক্ষিত বাঙালিকে স্পর্শ করেছিল এবং যে নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রকাশ ওই সময়ের প্রহসন; যার যথার্থ পরিণতি- বাংলা নাটক। উনিশ শতকের এক দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ পরিবেশে বাংলা নাট্যমঞ্চের বিকাশের ধারাবাহিকতায় জন্ম নিল আধুনিক বাংলা নাটক। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। হেরাসিম লেবেদেফ, তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সাহায্যে, 'ছদ্মবেশ' (The disguise) নামক ইংরেজি থেকে অনূদিত নাটকের পাশ্চাত্য ধাঁচের মঞ্চায়ন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু থিয়েটারে ও ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর নিজ বাড়িতেও বিলিতি ধরনের রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তবে ১৮৫৭ সালে জানুয়ারি মাসে অনুবাদ নাটকের পরিবর্তে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে অভিনীত

হয়। এ পর্যায়ের নাটকের মধ্যে আরও উল্লেখ্য ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’। বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে। স্থাপিত নাট্যশালায়। ১৮৫৮ সালে ‘রত্নাবলী’ নাটক দেখতে এসে সদ্য মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর মান দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত থেকে পেয়ে যায় প্রথম সার্থক বাংলা নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’। মধুসূদনের মেধাস্পর্শে বাংলা নাটকের বিষয়, সংলাপ, আঙ্গিক, মঞ্চায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। নবজাগ্রত বাঙালির প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠা এই নাট্যধারা ‘নব নাটক’ হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। মধুসূদন, দীনবন্ধু এই সব নাটককে করে তুললেন অনেক বেশি রুচিসম্মত ও নান্দনিক। এরই ধারাবাহিকতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে বাংলা নাটকের অঙ্গনে; বিকশিত হতে থাকে বাংলা নাট্যধারা। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ও আঙ্গিকে-নিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা নাটকে যোগ করেন বিশ্বমানের স্বাতন্ত্র্য। বিশ শতকের সাহিত্যে অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী দুই বিশ্বযুদ্ধ এসময়ের নাটককে নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এরই সঙ্গে রুশ বিপ্লব, ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদের বিস্তার, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দেশভাগ, শ্রেণিসংগ্রামচেতনা, শ্রেণিবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বাংলা নাটকে সূচনা করে গণনাট্যের ধারা। বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার এই নতুন ধারার নাটক নিয়ে জনমানুষের কাছে পৌঁছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসা শোষণ ও বৈষম্য, এই অঞ্চলের নাট্যকারদেরও গণনাট্যের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। সেইসঙ্গে, পূর্ববাংলায় একের পর এক আন্দোলনের পটভূমি স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যধারা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাংলা নাটকের নাম নিম্নরূপ : রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’, মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো’, দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’, ‘সধবার একাদশী’, মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার-দর্পণ’, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘সাজাহান’, বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’, তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’, উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ প্রভৃতি।

আপাতভাবে ১৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেদেফের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় নাটক অভিনয়ের শুভ সূচনা হিসাবে ধরা হলেও এই বাংলায় এর আগেও অভিনয়ের বিভিন্ন ধারা প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় ধাঁচের নাটকের থেকে এগুলির প্রকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে আমরা একে নাটকের মর্যাদা দিই না, এবং মনে করি ইউরোপীয় চিন্তা চেতনাই আমাদের নাটক নামক অভিনয়ের এই প্রকরণের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছে। কিন্তু

আমাদের দেশীয় অভিনয়ের ধারা ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন চর্যাগীতিসমূহ। এই চর্যাগীতিকাতে নাটকের প্রসঙ্গ আছে।

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই।।"

বীণাপাদের ১৭তম পদটিতে নাটক শব্দটি রয়েছে। সে নাটক আধুনিক নাটকের মতো সংলাপসর্বস্ব অভিনেয় পালা কিনা, তা বলা দুষ্কর। কিন্তু শব্দটি নাটকই ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু, নাটকের রচনাকৌশল ও প্রয়োগকলা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে বাংলা সংস্কৃতির উদ্ভব মুহূর্তেই নাটকের দর্শন মিলছে। নাটক এইভাবে জীবনের নির্দিষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ করতে দেখা দিল; এবং জীবনের অঙ্গুলি হেলনেই তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। 'চর্যাপদ' থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' – এই হল আদি যুগের নাটকের চৌহদ্দি। তারপর তুর্কীবিজয় ও চৈতন্য-আবির্ভাব থেকে মধ্যযুগের সূচনা। নাটক এ যুগেও দেখা দিয়েছে। অভিনয় হয়েছে উৎসব-অনুষ্ঠানে, ব্রত-পার্বণে। ধর্ম আর নাটক পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ইংরেজিতে ড্রামা শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক। বাংলা ভাষায় এই ব্যাপক অর্থটি সম্পর্কে সচেতনতা ছিল। মধ্যযুগের এক বিশেষ ধরনের প্রমোদকলাকে 'নাটগীতি' নামে আখ্যায়িত করা হয়। নাটক অর্থে শুধু সংলাপসর্বস্ব অভিনেয়বস্তু বোঝায় না। মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতির জগতে পাঁচালি ও ঝুমুর উভয়ই বর্তমান ছিল। দুইটিই সমকালবর্তী, কেউ কারোর থেকে উদ্ভূত হয় নি বরং প্রভাবিত হয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা নাটক সাংগীতিকতার কবলে ছিল। শুধু বাংলা দেশে নয় অন্যান্য প্রদেশেও এই ছিল সাধারণ সত্য। ঝুমুর সঙ্গীতের পালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও নাটক হয়ে উঠেছে। গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও নাটক হয়ে উঠেছে। অচিরেই আর ছদ্মবেশ নয়, নাটক স্ববেশেই হাজির হচ্ছে। অর্থাৎ মধ্যযুগেও বাংলা দেশে স্বতন্ত্র নাট্য ধারার অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে।

এরপর উনিশ শতকে ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে দেশে এলো আলোকায়নের জোয়ার। কলকাতায় উনিশ শতকের ষাটের দশকে নাট্যানুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। আর সেই উৎসাহ মধ্যবিত্ত যুবকদের সাধারণ আঙিনায় চলে আসে। নাট্যাভিনয় যত জনপ্রিয় হতে থাকে এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবক যত বেশি সংখ্যায় এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেথাকে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের দাবি ততই সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পেশাদারি বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "A Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal"-এর অনুষ্ঠান পত্রে জাতীয় নাটকের কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরই মন্ত্রশিষ্য নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের পরামর্শে ও প্রেরণায় বাগবাজারের একটি শখের দল সত্য-সত্যই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে বসল এবং তাদের দলের নামও হল ন্যাশনাল থিয়েটার। এই সময় শখের নাট্যদলের বেশ বাড়বাড়ন্ত হয়ে

উঠেছিল। শুধুমাত্র কলকাতাতে নয় মফঃস্বল এলাকাতেও সেসময় নাটকের হুজ্জুতি শুরু হয়। পেশাদারী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে নাটক রচনা শুরু হয়। দীনবন্ধু এবং মাইকেলের নাটক এই সময় জাতীয়তাবোধের উদ্ঘাটনের সহায়ক হয়ে ওঠে, পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণেও সহায়তা করে।

নাটক নিয়ে সমাজে যখন এই আলোড়ন চলছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও তার রেশ পড়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সুযোগ্য সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি মঞ্চ সফল নাটক নির্মাণের উদ্দেশে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক থেকে নিজেই বাংলায় নাটকের তর্জমা শুরু করে দেন। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর অবশ্যাম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে জনমানসে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন হয়। এই উদ্দেশে কলকাতায় হিন্দু মেলার আয়োজন করে জনমানসে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করার প্রয়াস চলতে থাকে। এই বিষয়ে তিনি এক জায়গায় লিখছেনঃ

"হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত – কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ, ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বকথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

হিন্দু মেলা চলাকালীন ইনি কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। ওই মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক সভা চলাকালীন সময়ে উপস্থিত হন এবং এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করে পাঠ করেন। সেই কবিতাটির নাম ছিল 'উদ্বোধন'। তাঁর দেশোদ্ধারকারী নাটক রচনার ভাবনা নিহিত আছে এই কবিতাটির মধ্যে। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই হাত দিলেন প্রাচীন বীরদের বীরত্ব গাথা কীর্তনে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বিখ্যাত বক্তৃতায় রাজা পুরুর গুণ কীর্তন করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়টিকে তাঁর নাট্য রচনায় স্থান দিলেন।আলেকজান্ডার রাজ্য আক্রমণ করলে পুরু পরাজিত ও বন্দী হন, আলেকজান্ডার বন্দী পুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, পুরুর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত, তাতে পুরু বলেন একজন রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করে আপনি আমার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করবেন। এই বাক্য বহিঃশত্রুর আক্রমণের সামনে মাথা উঁচু করে থাকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যা হাতিয়ার হবে। যদিও নাটকটিতে অতিরঞ্জিত কল্পনার প্রাধান্য ছিল। বঙ্গদর্শন পত্রিকা এই নাটকের সমালোচনা করে লিখেছিল,

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নাটকে তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই। সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্যা এবং নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন, তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলে মনে হয়।"

এই নাটক সেই সময় একটি কারণে সেই সময় মর্যাদা লাভ করে, তা হল এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা বর্জিত।

এর পরের নাটক 'সরোজিনী' এই কথন সর্বস্বতা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন, সাধারণ কথোপকথন নাটক নয়। তাই তিনি বলেছেন, "মহাশয় কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কার্য হয় না।" সরোজিনী নাটকে প্রথম হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ এলো। এর প্রেক্ষাপট তুর্কী বিজয় পরবর্তী ভারতবর্ষ। মেবাররাজ লক্ষণ সিংহতাঁর কন্যা সরোজিনীকেবলি দিয়ে দেশ রক্ষা করার সংকল্প করেন। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্যকারী হয় নি। কিন্তু সরোজিনীকে অন্যান্য পুরনারীদের সঙ্গে আত্মবিসর্জন দিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হয়। দিল্লির বিধর্মী সুলতান রাজ্য দখল করলেন বটে কিন্তু চিতোর তখন প্রেতপুরী। এই নাটকে একটি বিখ্যাত গ্রীক নাটক 'ইফিগেনাইয়া'র ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন।

এরপর আসা যাক তাঁর 'অশ্রুমতী' ও 'স্বপ্নময়ী' নাটকের প্রসঙ্গে। এই দুটি নাটকে হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের চর্চা থেকে খানিকটা সরে এলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই নাটক দুটি মানবতাবাদের জয়গান শুনিয়েছে। 'অশ্রুমতী' তাঁর তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই নাটক বিয়োগান্তক। নায়িকার যোগিনী রূপ ধারণের মধ্যে দিয়ে এই বিয়োগান্তক বিষয়টি ফুটে ওঠে। নাটকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেলিম ও অশ্রুমতীর জীবনসংঘাতের মধ্যে। অশ্রুমতী ভীলদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে তাই সেলিম যে মুসলমান সেই জ্ঞান তার নেই। এতে অনেকটা টেম্পেস্টের মিরান্দার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার তাঁর হিন্দু মেলার ভাবাদর্শকে এখানেও পরিস্ফুট করেছেন রাণা প্রতাপ সিংহের অংশটিকে অতীব স্ফীত করার মধ্যে দিয়ে।

'স্বপ্নময়ী' নাটকশোভা সিংহের বিদ্রোহ নিয়ে রচিত। বর্ধমান-দুহিতার যে বিবরণ ইতিহাসে আছে, নাট্যকার সে পথে হাঁটেন নি। স্বপ্নময়ী সংঘর্ষসঙ্কুল জাতীয়তাবাদমূলক নাটকের এক নায়িকা। কিন্তু সে খেয়ালী প্রকৃতির। কৃষ্ণরাম রায়ের রাজসভার দৃশ্য এখানে খুবই বাস্তবসম্মত হয়েছে। এছাড়া শুভ সিংহের দর্শনার্থী জনতার দৃশ্যও বাস্তবসম্মত। শুভ সিংহের চরিত্রটি অসাধারণ। সে ভন্ড, সে সৎ। শেষ মুহূর্তে সে তার ভন্ডামির মুখোশ খুলে ফেলেছে। শুভ সিংহ রাজাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টিত হল, সুরজমলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করল। কিন্তু প্রাসাদের এক অংশ ভেঙে রাজার মস্তকে পড়ল; রাজা নিহত হলেন। স্বপ্নময়ীর চোখে শুভ তখন আর দেবতা নয় পিশাচমাত্র। শুভ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল এবং স্বপ্নময়ী নিরুদ্দিষ্টা হল।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকাংশেই মধুসূদন দত্তের অনুসারী। তবে তাঁর নাটক বড় বেশি দীর্ঘায়িত। তাই অভিনয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই। সরোজিনী নাটকে রামদাসের গান, অশ্রুমতী নাটকে অশ্রুমতীর গান, স্বপ্নময়ী নাটকে জগৎ রায়-সুমতির গান – নাটক অন্তে নাটকের প্রয়াস। গানগুলি মনে হচ্ছে যার গাওয়ার কথা সে গাইছে না। তাঁর রচিত সিরিয়াস নাটকে হাস্যরসের স্থান খুবই অল্প। এর থেকেই বোঝা যায় নাট্যকার তাঁর আদর্শকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন এবং এই আদর্শ হল হিন্দু মেলা কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ। অতিরিক্ত ভাবালুতায়

তাঁর দুঃসহ ট্র্যাজেডিও মেলোড্রামায় পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে উনিশ শতকীয় ইংরেজি ধারার নাটকের তুলনায় তাঁর নাটকে দেশীয় যাত্রার ধারা বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যুগের চাহিদার কথাকে অবশ্যই মাথায় রাখা প্রয়োজন, ইংরেজি শিক্ষার ঘষামাজায় এক শ্রেণির দর্শকের চিন্তা চেতনায় আমূল পরিবর্তন এলেও দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছে এই ধরনের নাটকের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। নিজের আদর্শকে প্রচারের ক্ষেত্রে, বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদের আদর্শকে পৌঁছে দিতে এই ধরনের নাটকের সাহায্য নিতে হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। উনিশ শতকের নবজাগরণ মানুষকে নতুন চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তারই ফলশ্রুতি ছিল হিন্দু মেলার মত বৃহৎ সমারোহের আয়োজন। এই মেলার মাধ্যমেই সর্বাত্মক ভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে এবং দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটে যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁর রচিত নাটকে এই দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সমাবেশ তাই অবশ্যাম্ভাবী ছিল। তাঁর নাটক নিয়ে বহু সমালোচনার অবকাশ থাকলেও তাই বলা যায় তাঁর নাটক ছিল ব্যক্তিগত আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক।

তথ্যসূত্র :

১। দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ- ২৪
২। সুবীর রায়চৌধুরী ও স্বপন মজুমদার, বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশি থিয়েটার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ- ৪৫
৩। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ৩২৮
৪। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৩২৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১। ডঃ দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪
২। পীরুপদ মালিক, উনিশ শতক সমাজ ও সাহিত্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১৯
৩। পবিত্র সরকার, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭১
৪। অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কল্পনা প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬২

নৃত্যকলা যখন জাতীয়তাবাদের ভাষা

পায়েল দাস
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: জীবজগতের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নৃত্যকলার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই নৃত্যকলার মাধ্যমে বিংশ শতকের বিশের দশকে ঔপনিবেশিক ভারতের পটভূমিকায় ভারতীয় আধুনিক সৃজনশীল নৃত্যের স্রষ্টা উদয় শঙ্কর চৌধুরী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'গীতাঞ্জলি'র পর পাশ্চাত্যে ভারত অনুসন্ধানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব বা বিষয় ছিল উদয় শঙ্কর এবং তাঁর স্বতন্ত্র ভারতীয় নৃত্যশৈলী। আমার প্রস্তাবিত এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশে শঙ্কর-নৃত্যশৈলীর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এছাড়াও প্রাচ্যের স্বতন্ত্র নৃত্যকলা পাশ্চাত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়টি নিয়েও পর্যালোচনা করা হবে।
মূল শব্দ: ভারতীয়, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, নৃত্যশৈলী, উদয় শঙ্কর

প্রাক্-ঐতিহাসিক সময়কাল থেকেই ভারতের ভূমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চিন্তা, চেতনা, ও ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। সেই সাংস্কৃতিক ধারা ঔপনিবেশিক ভারতেও অব্যহত ছিল, যার স্ফুরণ ঘটেছিল প্রায় উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, বিংশ শতকের বিশের দশকে ভারতীয় সৃজনশীল নৃত্যের স্রষ্টা উদয় শঙ্কর চৌধুরী তাঁর উদ্ভাবিত নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই ভারতীয়দের তারা নিকৃষ্ট, দুর্বল, অক্ষম তথা অসভ্য জাতি হিসেবে বিবেচনা করত। এই বদ্ধপরিকর চিন্তাভাবনার বিপক্ষে উদয় শঙ্কর তাঁর নৃত্যকলার মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে তুলে ধরেছিলেন। একজন চিত্রশিল্পী থেকে নৃত্যশিল্পী তথা, স্বতন্ত্র নৃত্যশৈলীর পরিকল্পক হিসাবে তাঁর রূপান্তর বাস্তবিক বিস্ময়কর ঘটনা। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে অবস্থান করেও প্রাচ্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে অসীম জ্ঞান, শ্রদ্ধা, এবং ভালোবাসা থেকে 'ভারতীয়ত্ব'র প্রচার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তিনি বলেছিলেন, 'You can better see your home from a far. I could see true India, my motherland through the eyes of the foreigners, from o great distance. In India I cannot realise her greatness and vastness, but when I go out I feel for her.'[১] প্রকৃতপক্ষে,

শঙ্কর অত্যন্ত সচেতন ভাবে নৃত্যকলাকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভাষায় পরিণত করেছিলেন।

১

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর পরাধীন ভারতের তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা যখন পুনরায় ইউরোপের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই সময় ১৯২০ সালে উদয় শঙ্কর চৌধুরী লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট- এ চিত্রকলার অধ্যায়ন করতে যান। চিত্রশিল্পী থেকে নৃত্যশিল্পীতে রুপান্তরিত হওয়ার যাত্রার সূচনা হয়েছিল তৎকালীন বিখ্যাত রাশিয়ান ব্যালেরিনা আনা পাভলোভা-র সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। ভারত ভ্রমণকালে আনা পাভলোভা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বেশকিছু নৃত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং লন্ডনে ফিরে ভারতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ব্যালে প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমন সময় লন্ডনে উপস্থিত ভারতীয় পদাধিকারী কর্মকর্তা নির্মলচন্দ্র সেনের স্ত্রী মৃণালিনী সেন পাভলোভার কাছে উদয় শঙ্করের সুপারিশ করেছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২] শঙ্করের ব্যক্তিত্ব দ্বারা মুগ্ধ হয়ে, আনা পাভলোভা শঙ্করকে তাঁর ব্যালের দলে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পাভলোভার ব্যালের দলের জন্য তিনি *Krishhna and Radha* এবং *An Indian Marriage* নামক দুটি নৃত্য প্রস্তুত করেছিলেন, যেখানে রাধার চরিত্র পালন করতেন পাভলোভা এবং কৃষ্ণের চরিত্রে থাকতেন উদয় শঙ্কর।[৩] ভারতীয় বিষয়ভিত্তিক নৃত্য সহ নতুন ৬ টি ব্যালে উপস্থাপনার জন্য পাভলোভার ব্যালের দল ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে লন্ডনের রয়্যাল অপেরা হাউসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।[৪] নৃত্যের এই অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা ও সৌন্দর্য লন্ডনের চর্চার কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসে। শঙ্করের নৃত্যের পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে লন্ডনবাসী দর্শকেরা যে রূপ ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিলেন তা পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্বতন্ত্র ভারতীয় নৃত্যের বিষয়বস্তু, অঙ্গ ভঙ্গিমা, অভিনয়, সাজসজ্জা ইত্যাদি পাভলোভা এবং তাঁর ব্যালের দল সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। পাভলোভা শঙ্করকে কখনই পাশ্চাত্যের নৃত্যশৈলীগুলির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বা অনুশীলন করতে পরামর্শ দেননি। কারণ তিনি সম্ভবত মনে করতেন পাশ্চাত্যের নৃত্যশৈলীগুলির অভ্যাস শঙ্করের "প্রাচ্য"-এর নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলিকে ম্লান করে দেবে।[৫] ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপনার পর ১৯২৩ সালের ৯ অক্টোবর পাভলোভার ব্যালে দলের সাথে শঙ্করের আমেরিকার সফর শুরু হয়েছিল। প্রায় নয় মাস ধরে তাঁরা কানাডা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, মেক্সিকো ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। আমেরিকার সফর শেষ হলে শঙ্কর পাভলোভার দল ছেড়ে লন্ডনে ফিরে যান। এই সময় ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি টাটা পরিবারের সদস্যা মেহেরবাঈ দোরাবজি টাটা শঙ্করকে ওয়েম্বলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে নৃত্য উপস্থাপনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে,

শঙ্করের এই নৃত্যের উপস্থাপনার মাধ্যমেই, স্বতন্ত্র নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর প্রথম জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে উদয় শঙ্কর তাঁর এই নৃত্যের উপস্থাপনা সম্পর্কে বলেছিলেন – 'I danced the dance of Shiva .... without knowing anything about shiva's dance. I just jumped around, most probably. What I did, God knows, but it proved a big success and they bravoed me. I could not realise why they liked it so much.'[৬]

শঙ্কর তাঁর নৃত্যে অভিনবত্ব আনার উদ্দেশ্যে, ১৯৩০ সালের ৪ জানুয়ারি ভারতে আসেন। ভারত ভ্রমণে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুদক্ষ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী এলিস বোনার।[৭] তাঁরা ভারতের বিভিন্ন শিল্পমন্ডিত মন্দির, গুহা, যেমন- মহাবলীপুরম, কোনারক, খাজুরাহো, অজন্তা-ইলোরা, ইত্যাদি একাধিক জায়গায় ভ্রমণ করেন। সেই সকল দৃশ্য ও কীর্তি থেকে শঙ্কর তাঁর নৃত্যের ধারণা গড়ে তুলতে লাগলেন। অন্যদিকে এলিস বোনার শঙ্করের সাথে ভারতের যে সকল স্থানে গিয়েছিলেন সেখানকার বিশেষত্ব অলংকার, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে লাগলেন।[৮] এই সময় শঙ্কর কেরালায় থেকে গুরু শঙ্করন নাম্বুদ্রী-র নিকট কথাকলির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।[৯] কলকাতায় ফিরে শঙ্কর তাঁর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। ১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে দুর্গা পুজোর পর শঙ্করের দলটি প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। প্যারিসে শঙ্করের দলের সাথে যোগ দেন সিমোন বারবিয়ার, শঙ্কর তাঁর নাম দিয়েছিলেন সিমকি।[১০] ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলী, যেমন- কথাকলি, মনিপুরী, ছৌ, ভরতনাট্যম, একাধিক লোকনৃত্য, দেশের নানা প্রান্তের মানুষের গতিবিধি বা চলন, এবং ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ইত্যাদি যে সকল বিষয় শঙ্কর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তা মিশ্রিত রূপে সুপ্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি নৃত্যের উদ্ভাবন করতে লাগলেন। এটি ছিল শঙ্করের দ্বারা উদ্ভাবিত 'শঙ্কর-নৃত্যশৈলী' সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্ব। এছাড়াও পূর্বে আমেরিকা সফরকালীন শিল্পকলা বিশারদ আনন্দ কুমারস্বামী উদয় শঙ্করকে তাঁর রচিত *The Mirror of Gesture* নামক একটি গ্রন্থ উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। প্যারিসে অবস্থানরত শঙ্কর হঠাৎ একদিন রাতে সেই গ্রন্থটি খুলে নটরাজ অর্থাৎ নৃত্যরত শিবের প্রতিকৃতি প্রথমবার দেখতে পান। এই উপহারটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শঙ্কর, তাঁর নৃত্য পরিকল্পনায় প্রাচীন ভারতীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যগুলির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।[১১] অর্থাৎ উদয় শঙ্করের সৃষ্ট 'শঙ্কর-নৃত্যশৈলী'র ভিত্তি এবং অনুপ্রেরণা ছিল ভারত।

১৯৩১ সালের ৩ মার্চ প্যারিসের *des Champs-Elysees* - নামক থিয়েটারে শঙ্করের দলের প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে *Indra, Wedding Dance, Gandharva, Temple Dance, Spring Dance, Peasant Dance, Radha and Krishna, Sword Dance,* এবং শেষে *Tandava Nrittya* উপস্থাপিত হয়েছিল।[১২] শঙ্করের নব গঠিত দলের এই প্রথম অনুষ্ঠানটি অসামান্য

সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল। এই সময় প্যারিসের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রথম উদয় শঙ্করের সাথে কুমারী অমলা নন্দী-র সাক্ষাৎ হয় এবং তিনিও শঙ্করের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে উদয় শঙ্কর এবং অমলা নন্দী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।[১৩] শঙ্করের নব গঠিত দলটি ১৯৩১ সালে ২৩ ডিসেম্বর 'Compagnie Uday Shankar : Danses & Musique Hindus' নামে উদয় শঙ্কর ও এলিস বোনারের যুগ্ম অংশীদারিত্বে সরকারিভাবে নিবন্ধিত করা হয়েছিল।[১৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় থিয়েটার প্রযোজক সোল হুরোক শঙ্করের একাধিক উপস্থাপনা উপভোগ করে, তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠানের জন্য শঙ্করের দলের সাথে ১৯৩২-৩৩ সালে ছয় মাসের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ২৬ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থিয়েটারে "International Dance Festival"- এ শঙ্করের দলটি উপস্থাপনা করেছিল। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এতটাই বিস্ময়কর ও ইতিবাচক ছিল যে, নিউইয়র্কের ছয় জন বিশিষ্ট শিল্প সমালোচকেরা তাঁদের নিজস্ব পত্রিকায় উদয় শঙ্কর এবং তাঁর উপস্থাপনা সমন্বিত পর্যালোচনা মুদ্রিত করেছিলেন।[১৫] এই পর্বে, দলটি অস্ট্রিয়া, বাল্টিকের লিথুয়ানিয়া, জার্মানির সুলজবার্গ, ফ্রান্সের টুলন, সুইডেনের মালমো, নরওয়ের অসলো, ফিনল্যান্ডের হেলজিৎ ফোর্স, বেলজিয়ামের লিজ, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, হল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, বর্মা, সিঙ্গাপুর, মিশর, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ইত্যাদি জায়গায় উপস্থাপনা করেছিল।[১৬]

মূলত 'শঙ্কর-নৃত্যশৈলী'কে কেন্দ্র করে এক অভিনব সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক জাতি হিসেবে অহংবোধে উদ্দীপিত ইংরেজদের সামনে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় চেতনা প্রসারিত হয়েছিল। ভারতের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে *Indra* নৃত্যটিতে দেবতা ইন্দ্রের ক্ষমতা ও পরাক্রমের চরিত্রটি শঙ্কর তাঁর নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি, অভিনয়, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে পশ্চিমা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। *নাট্যশাস্ত্র* - এ উল্লিখিত *তান্ডব* এবং *লাস্য,* পুরুষ এবং নারী শক্তির প্রতীক। 'তান্ডব' মূলত দেবতা শিব আধারিত, পুরুষত্বের ধারণা এবং শারীরিক ভাষার মূর্ত রূপ। শঙ্কর ভারতের বিভিন্ন শিল্প স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং অঙ্কিত চিত্রে দেবতা শিব বা নটরাজের (নৃত্যরত শিব) যে অঙ্গভঙ্গিমাগুলি দেখেছিলেন, সেইগুলি তিনি *Tandava Nrittya* - র মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন, পাশাপাশি তার সাথে যুক্ত হয়েছিল কথাকলির হস্তমুদ্রা। *Kartikeya* নৃত্যটিতে শঙ্কর কথাকলির প্রয়োগে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ব্যবহারের মাধ্যমে একজন দেবতা যোদ্ধা ও রাক্ষসের লড়াইয়ের প্রস্তুতি পর্বের বিষয়টি অপূর্বভাবে তুলে ধরেছিলেন। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈধ ভিত্তি হিসেবে ইংরেজরা দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা দৈহিকভাবে দুর্বল, অক্ষম, তথা অসভ্য জাতি। অতীত ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়েও ব্রিটিশরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং ভারতীয়দের

নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে পরিগণিত করতেন। তারা মনে করতেন ভারতীয়রা সর্বদাই অলসতা ও কামুকতায় নিমজ্জিত 'পুরুষত্বহীন' জাতি।[১৭] ইংরেজদের এই তত্ত্বের বিপরীতে উদয় শঙ্কর তাঁর এই উপস্থাপনাগুলির মধ্য দিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দর্শকদের সামনে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে নৃত্য উপস্থাপনার সময় তাঁর দৈহিক সক্ষমতা, সামর্থ, পুরুষালি অঙ্গভঙ্গিমা, বীরত্ব এবং গর্বের অভিনয়ের প্রদর্শন দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসকদের ভারত শাসনের বৈধ ভিত্তিকে অবৈধ হিসেবে খন্ডিত করেছিলেন। অর্থাৎ 'শঙ্কর-নৃত্যশৈলী' ভারতীয়দের হাতে এমন এক সাংস্কৃতিক অস্ত্র তুলে দিয়েছিল, যার দ্বারা নিঃশব্দে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব।

২

আসন্ন ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তির দশকগুলিতে উদয় শঙ্কর তাঁর নৃত্যকলার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রাচ্যের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ রূপের নিদর্শন রেখেছিলেন। তিনি *Krishna and Radha* এবং *An Indian Marriage* - এই দুটি নৃত্যে পাভলোভার চরিত্রে প্রাচ্যের 'নারী' এবং তাঁর বিপরীতে নিজের চরিত্রে প্রাচ্যের 'পুরুষ'-এর ধারণা স্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যের দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন,[১৮] এবং সেগুলো গ্রহণযোগ্যতাও অর্জন করেছিল। সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে তার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তৎকালীন লন্ডনে প্রকাশিত *The Times* পত্রিকায় বলা হয়েছিল, It was difficult to get back to the frame of mind necessary to enjoy the Oriental Realism in the two Hindu scenes which followed...... The second of the two, *Krishna and Radha*, certainly produced its own imagination atmosphere.[১৯]

The Daily Telegraph - এ লিখেছিল,

The *Oriental Impression* - the second novelty - is a series of unconnected "acts".... the second represents picturesque scenes which are enacted at a Hindu wedding; and the third, *Krishna and Radha* shows Mme. Pavlova dancing Indian dance in a gorgeous costume, herself as light and sinuous and pliant as her veils. These things are attractive in many ways; the scenery (a stage on the stage, with its own curtain of Indian design) and the panoply of East have unmistakable romantic flavour.[২০]

১৯৩৩ সালের ৪ থেকে ৯ এপ্রিল লন্ডনের আর্ট থিয়েটার ক্লাবে উদয় শঙ্করের দল 'Compagnie Uday Shankar : Danses & Musique Hindus'এর উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইংল্যান্ড তখন উদয় শঙ্করের নৃত্যের জোয়ারে উদ্ভাসিত

হয়ে ওঠে। যার প্রমাণ পাওয়া যায়, তৎকালীন সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে দিয়ে। *The Times* – এ ৫ এপ্রিল ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল,

The programme of dances, instrumental music, and, one might almost say, choral ballet – for the orchestra of half a dozen musicians playing on a around dozen of different instruments frequently breaks into song either with or without words – which was seen and heard at the Arts Theatre, was a strikingly unusual entertainment founded on a highly finished art. The dances of Mr. Uday Shan-kar and Miss Simkie are more static than most European dances, though "The Hunter" had movement enough, and they are danced with the whole body beginning with the extremities, the finger-tips and flowing through the neck and trunk till the whole body, including the feet, in involved – one rarely felt that they were begun by the feet.[২১]

১৯৩৩ সালে ৩ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপনার জন্য শঙ্করের দলটি দেশে এসেছিল। ১৯৩৩ সালের ৬ জুলাই কলকাতার মদন থিয়েটারে শঙ্করের দলের উপস্থাপনা দেখতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। শঙ্করের উপস্থাপনা দেখে কবিগুরু তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[২২] কবির সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে শঙ্কর সঙ্গীত ছাড়াই *Indra* নৃত্যটি উপস্থাপনা করেছিলেন। এই *Indra* নৃত্যটি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের যেখানেই মঞ্চস্থ করেছিলেন শঙ্কর, প্রত্যেক স্থানেই দর্শকদের অনুরোধে তাঁকে একই নৃত্য দুই বার করে উপস্থাপনা করতে হত, এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি নৃত্যটি উপস্থাপনা করতেন তখন কোন সঙ্গীত ছাড়াই করতেন।[২৩] রবীন্দ্রনাথ উদয় শঙ্করকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ভারতে নৃত্য পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।[২৪] উদয় শঙ্কর সম্পর্কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, **"আই অ্যাম অ্যান আরডেন্ট অ্যাডমায়রার অব দিস ম্যান"**। নেতাজি এবং শঙ্করের কোনদিন প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি। তবে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, একবার ভিয়েনায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময়ে ভিয়েনায় উদয় শঙ্করের একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর প্রশংসার স্পষ্ট বাণীগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।[২৫]

১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে উদয় শঙ্করের দলটি লন্ডনের আর্টস থিয়েটার ক্লাবে উপস্থাপনা করেছিল। তৎকালীন ডার্টিংটন হলের নৃত্য ও নাটকের প্রধান মার্গারেট বার শঙ্করের নৃত্যের উপস্থাপনা দেখে লিওনার্ড এলমহার্স্ট এবং ডরোথি এলমহার্স্টের কাছে

তাঁর সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৩৪ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত ডার্টিংটন হলের সাংস্কৃতিক নীতিগুলিতে, ইউরোপীয় শিল্পী অভিবাসীদের এবং উদয় শঙ্করের মতো আন্তর্জাতিক শিল্পীদের উদ্ভাবনগুলি প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এই যুগের উদ্বোধনে ১৯৩৪ সালের ২৬ মে ডার্টিংটন হলের ওপেন এয়ার থিয়েটারে শঙ্করের দলটি উপস্থাপনা করেছিল। উদয় শঙ্করের প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব দ্বারা ডরোথি এলমহার্স্টের কন্যা ব্রিটিস স্ট্রেইট অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ডার্টিংটন হলের সাথে উদয় শঙ্করের সম্পর্ক গভীরতা পেয়েছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডার্টিংটন হলের এলমহার্স্টের কাছ থেকে উদয় শঙ্কর ২০,০০০ পাউন্ডের একটি উদার তহবিল পেয়েছিলেন, যার দ্বারা ১৯৩৮ সালে শঙ্কর ভারতের আলমোড়ায় ‘Uday Shankar India Culture Center’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রবল ভাষ্য রূপে ‘শঙ্কর-নৃত্যশৈলী’র উদ্ভাবনাকে দেশে প্রসার করার উদ্দেশ্যেই শঙ্কর ‘Uday Shankar India Culture Center’ গড়ে তুলেছিলেন।[২৬]

৩

বিংশ শতকের বিশের দশকে পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে উদয় শঙ্করের আধুনিক সৃজনশীল নৃত্যের ধারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক ভিন্ন, বৈচিত্র্যময়, ও গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযুক্ত করেছিল। শঙ্করের নৃত্যের মধ্যে সর্বজনীন ভাষা ছিল, যার ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় স্থানের দর্শক তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুগুলোকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উভয় স্থানের দর্শকবৃন্দ শঙ্করের উপস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ের সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পেরেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ববৃন্দরা যখন জাতীয় মর্যাদা রক্ষার্থে ক্রমাগত ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, সেই সময় শঙ্কর তাঁর নৃত্যশৈলীর দ্বারা ভারত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। পরাধীন ভারতের বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, সরকারি চাকরিজীবী, কেরানি ইত্যাদি ভারতীয়দের একটি বড় অংশ ইংরেজ বিরোধী প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিমুখ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব ছিল না। স্বাভাবিকভাবে, মঞ্চস্থ হওয়া ‘শঙ্কর-নৃত্যশৈলী’র মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ রূপটি দেখে ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে অবচেতন জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল। উদয় শঙ্কর নৃত্যকে বিনোদনের মাধ্যম থেকে একটি মৌলিক সাংস্কৃতিক অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন যা ভারতবাসীকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র :

১. Projesh Banerji, *Uday Shankar and His Art*, New Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1982, p. 8.

২. Mohan Khokar, *His Dance, His life: A Portrait of Uday Shankar,* New Delhi: Himalaya Books, 1983, pp. 27-29.
৩. https://archive.org/details/dni.ncaa.IGNCA-884_886_B-VHS (Accessed on 4 March 2022).
৪. *The Times*, 10 September, 1923, p. 8.
৫. Ruth K. Abrahams, 'Uday Shankar : The Early Years, 1900-1938' *Dance Chronicle*, 30:3, Routledge, 2007, p. 381.
৬. Khokar, *Ibid.*, pp. 36-41.
৭. *Ibid.*, pp. 42-49.
৮. রবি শঙ্কর, 'আমার দাদা', *দেশ*, ৬৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, জুন ১০, ২০০০, পৃ.৪৭।
৯. Abrahams, *Ibid.*, pp. 399-400.
১০. Khokar, *Ibid.*, p. 53.
১১. Abhimonyu Deb, "Uday Shankar interviewed by Sombhu Mitra in English", 9 December 2014, https://www.youtube.com/watch?v=JHq-uBio5vE (Accessed on 24 February 2022).
১২. Jayantee Paine, " Dancer Uday Shankar: Integrating East and West", 2000, p.27. (Unpublished Ph.D. diss., American Universiity).
১৩. অমলা শঙ্কর, 'প্রেমের দেবতা', *দেশ*, ৬৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, জুন ১০, ২০০০, পৃ. ৫৪।
১৪. Urmimala Sarkar Munsi, *Uday Shankar and His Transcultural Experimentations*, Switzerland, Palgrave Macmillan, 2022, pp. 96-97.
১৫. Abrahams, *Ibid.*, pp. 406-407.
১৬. Paine, *Ibid.*, p. 28.
১৭. Thomas R. Metcalf, *Ideologies of the Raj*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 104-112.
১৮. Sarkar Munsi, *Ibid.*, pp. 87-88.
১৯. *The Times*, 14 September, 1923, p. 8.
২০. Khokar, *Ibid.*, p. 30.
২১. *The Times*, 5 April, 1933, p.12.
২২. Khokar, *Ibid.*, p. 75.

২৩. Doordarshan Santiniketan, "DD - Santiniketan_Sataborshe Amala Shankar", 25 July 2018, https://youtu.be/UGwAlU5fYGc (Accessed on 26 February 2022).

২৪. Prarthana Purkayastha, *Indian Modern Dance, Feminism and Transnationalism*, UK: Palgrave Macmillan, 2014, p. 50.

২৫. অমলা শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

২৬. Purkayastha, *Ibid.*, pp. 59-644.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প – প্রসঙ্গ : শোষিত শ্রেণির সংগ্রামী চেতনা

আশিস কুমার সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সংক্ষিপ্তসার : মার্ক্সীয় ভাবনায় ভাবিত 'কলমপেষা' লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সারাটা জীবন তাঁর কলম চালনার মধ্য দিয়ে আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে এবং শ্রেণি সাম্যের পক্ষে। তাঁর প্রতিটি গল্প উপন্যাসের মধ্যে একদিকে যেমন চিত্রিত হয়েছে সমকালীন মানুষের জটিল জীবন সমস্যা তেমনি অন্যদিকে চিত্রিত হয়েছে শাসকশ্রেণির শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের চিত্র। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে গ্রাম-বাংলার বুকে মারী, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, কেরোসিনের অভাব প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল মানুষকে মহা জীবনসংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল। গ্রাম বাংলার এই সংকটময় পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারির মাধ্যমে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিয়েছিল একশ্রেণীর মুনাফাখোর মজুতদার জমিদার। একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মুনাফাখোর জোতদার জমিদার কালোবাজারি শাসকের শাসনযন্ত্রের আঘাত নেমে এসেছিল অসহায় সর্বহারা শ্রেণির উপর। এইরূপ আর্থসামাজিক পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে শাসক এবং শোষিত শ্রেণির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক গল্প রচনা করতে থাকেন শ্রেণিসংগ্রামের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। 'হারানের নাতজামাই, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'দুঃশাসনীয়', 'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'শিল্পী', 'অসহযোগী', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' প্রভৃতি গল্পগুলি যার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি তৎকালীন বাংলার গ্রামীণ সমাজের সর্বহারা মানুষের জীবন- জীবিকা বিপর্যয়ের পাশাপাশি শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ ও শোষিত শ্রেণির প্রতিবাদী চেতনাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি সফলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।
সূচক শব্দ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেণিশোষণ, সর্বহারাশ্রেণি, শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রেণিচেতনা, ছোটবকুলপুরের যাত্রী, হারানের নাতজামাই, শিল্পী, গোষ্ঠীচেতনা।

প্রতিপাদ্য বিষয় : বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তিরিশের দশকে আবির্ভূত ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-১৯৫৬)। মার্ক্সীয় ভাবনায় ভাবিত 'কলমপেষা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাটা জীবন তাঁর কলম চালনার মধ্য দিয়ে আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে এবং শ্রেণি সাম্যের পক্ষে। তাঁর প্রতিটি গল্প উপন্যাসের মধ্যে একদিকে যেমন চিত্রিত হয়েছে সমকালীন মানুষের জটিল জীবন সমস্যা তেমনি অন্যদিকে চিত্রিত হয়েছে শাসকশ্রেণির শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের চিত্র। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে গ্রাম-বাংলার বুকে মারী, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, কেরোসিনের অভাব প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল মানুষকে মহা জীবনসঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল। গ্রাম বাংলার এই সংকটময় পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারির মাধ্যমে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিয়েছিল একশ্রেণীর মুনাফাখোর মজুতদার জমিদার। একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মুনাফাখোর জোতদার জমিদার কালোবাজারি শাসকের শাসনযন্ত্রের আঘাত নেমে এসেছিল অসহায় সর্বহারা শ্রেণির উপর। এই রূপ আর্থসামাজিক পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে শাসক এবং শোষিত শ্রেণির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক গল্প রচনা করতে থাকেন শ্রেণি সংগ্রামের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'দুঃশাসনীয়', 'কে বাঁচায় কে বাঁচে, 'হারানের নাতজামাই', 'শিল্পী', 'অসহযোগী', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' প্রভৃতি গল্পগুলি যার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তেভাগা আন্দোলনের' পটভূমিতে রচিত 'হারানের নাতজামাই' গল্পে শাসক ও শোষিত দুই শ্রেণির মধ্যকার সংঘাত ফুটে উঠেছে। কৃষক আন্দোলনের নেতা ভূবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে হারানোর বাড়িতে গভীর রাতে হানা দেয় পুলিশ। সঙ্গে জমিদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। চাষিদের অনেকেরই সন্দেহ, গ্রামে ভুবনের আসার খবর নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছে পুলিশকে। সালিগঞ্জ গ্রামের চাষিদের মনের কথা গল্পকার তুলে ধরেছেন অনবদ্য ভাষায় – "ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেব না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।"[১] তাই শীতের রাতে ক্লান্ত শরীর চাঙ্গা হয়ে প্রতিরোধে নামে। জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে, পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে – "লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে।"[২] শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। গল্পের মধ্যে দেখি- "গফুর চেঁচিয়ে বলে,মোরা তাল্লাশ করতে দিমু না।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয় দিমু না।"[৩] শাসকের বিরুদ্ধে এইরূপ সংগঠিত প্রতিরোধের চিত্র গল্পটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে বলা যেতে পারে। এইরূপ শাসক ও চাষীদের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতিতে ময়নার মা এগিয়ে এসে বলে-"রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোনো আসামি নাই। চোর-ডাকাইত নাকি যে

ঘরে আসামি রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাশ করতে চান, তাল্লাশ করেন।”[৪] পুলিশের চোখে ধুলি দিতে দশ গাঁয়ের বাপ ভুবন মণ্ডলকে জামাই সাজিয়ে পুলিশের হাত থেকে কৃষক আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডলকে বাঁচায় ময়নার মা। কিন্তু পরের দিন ময়নার মায়ের এই ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে যায়। আসল জামাই জগমোহন ঘটনার কথা শুনে শ্বশুর বাড়িতে আসলে শুরু হয় পারিবারিক ঝামেলা। জামাই জগমোহনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ময়নার মা জানায় –“বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে, আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করেছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান।”[৫] ময়নার মায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে সর্বহারা মানুষের শ্রেণিচেতনা ও জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সুর ধরা পড়ে। শেষপর্যন্ত জগমোহন শান্ত হয়। এমন সময় সন্ধ্যা রাতেই পুলিশ আবার হানা দেয় হারানের বাড়িতে। জগমোহনের সামনেই মন্মথ ময়নাকে নিয়ে নানা কুরুচিকর রসিকতা করতে করতে হাতটা বাড়িয়েছিল ময়নার থুতনির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জগমোহন ময়নাকে আড়াল করে মন্মথর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে-

“মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন।”[৬]

গল্পের শেষে দেখা যায় বৃদ্ধ হারানসহ সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় মন্মথ দেখে দলে দলে লোক ছুটে আসছে। লেখকের ভাষায়-“মথুরের ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগানো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক পথ আটকায়। রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশে পাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।”[৭] এই কয়েকটি চরণে গল্পকারের মূল উদ্দেশ্য সার্থক বলা যেতে পারে। গল্পের শেষে শাসকের বিরুদ্ধে সর্বহারা শোষিত মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে লেখকের শ্রেণিচেতনা ও মার্কসীয় ভাবনার সার্থক প্রকাশ পরিস্ফুট হয়েছে বলা যেতে পারে।

শাসক ও শোষিত– দুই শ্রেণির মধ্যকার শোষণ ও প্রতিরোধের সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছোটবকুলপুরের যাত্রী’ গল্পটিতে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘সংবাদ’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে গল্পটি ‘ছোট বকুল পুরের যাত্রী’ (১৯৪৯) নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়ভাবনার মধ্যে রয়েছে অভিনব সাংকেতিকতা ও তীব্র ব্যঞ্জনা। একদিকে শাসকের অত্যাচার অন্যদিকে শাসকের শোষণের বিরূদ্ধে কৃষক শ্রমিক সর্বহারা মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধ। শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পন্থা হিসেবে শ্রমিক কৃষক বেছে নিয়েছে ধর্মঘটকে। শাসকের প্রতিনিধি স্বরূপ পুলিশ ধর্মঘট

ভাঙতে ধর্মঘটীদের উপর শুরু করেছে অত্যাচার। পুলিশি তল্লাশির নামে যেকোন সাধারণ মানুষকে সন্দেহের তালিকায় রেখে তার উপর চালিয়েছে পুলিশি সন্ত্রাস।

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায় দিবাকর ও আন্না তাদের বাচ্চাকে নিয়ে ট্রেন থেকে স্টেশনে নামে। ট্রেন প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি করেছে তাই রাতের স্টেশনে দু-চার মিনিটের কলরব শেষে প্রায় যাত্রীশূন্য হয়ে একটা থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সশস্ত্র সিপাইর দখলে রয়েছে পুরো স্টেশন। এই গা ছমছম করা দৃশ্যের কারণ ও বিবরণ দিবাকর গাড়িতে শুনেছে। তাই তার কাছে এই দৃশ্য একেবারেই অপ্রাত্যাশিত মনে হয়নি। সশস্ত্র সিপাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাত্রীদের লক্ষ করছে। অনেককেই আবার নামধাম জিজ্ঞাসা করছে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হতেই দিবাকরদের উপর সিপাইদের নজর পড়ে। তিনজন সিপাই সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে তারা কোথায় যাবে। উত্তরে দিবাকর জানায়- "আজ্ঞে ছোটবকুলপুর যাব।"[৮]

ছোটবকুলপুর শুনে তারা একটু চমকে উঠে। রাতের অন্ধকারে কিছুটা দূরের কারখানার উঁচুতে টাঙানো আলোটা তার চোখে পড়ছিল। "ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েকশো মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে।"[৯] দিবাকরকে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করে যেতে দেয়। ছোটবকুলপুরের কথা শুনে গাড়োয়ান প্রথমে গাড়ি নিয়ে যেতে অসম্মত হলেও অনেক অনুরোধের ফলে একজন কমলপুর পর্যন্ত যেতে সম্মত হয়। গাড়িতে উঠে দিবাকররা। শেষপর্যন্ত রাত্রিবেলা মেয়েমানুষের কথা ভেবে গাড়োয়ান ছোটবকুলপুর পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যায়। ছোটবকুলপুর গ্রামের প্রান্তে পৌঁছতেই সাত-আটজন গাড়িটাকে ঘিরে ধরে। চলে নানান জিজ্ঞাসাবাদ। গল্পের শেষে দেখা যায় সাধারণ দিবাকর সিপাইদের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠে। দিবাকরের কেনা তিনটি পান যে কাগজে মোড়া ছিল সেই কাগজে লেখা একটা হেডলাইনই দিবাকরকে অসাধারণ করে তুলে তাদের কাছে। হেডলাইনের দিকে চেয়ে থাকে। তাতে লেখা আছে– "ছোটবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।"[১০] গভীর উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠে –"পাওয়া গেছে! ইস্তাহার পাওয়া গেছে!

ইস্তাহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার!"[১১] তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারা যেন তাদের অভীষ্ট বস্তুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়। গল্পের শেষ কয়েকটি বাক্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে। তারা দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করে–"এ ইস্তাহার পেলে কোথা?"[১২] দিবাকরের সুস্পষ্ট জবাব– "ইস্তাহার? ইস্তাহারের তো কিছু জানি না! চার পয়াসার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটা জড়িয়ে দিল।"[১৩] তারা দিবাকরের কথা বিশ্বাস করে না। দিবাকরকে বলে– "আর ঢং করো না। এবার আসল নাম বলো দিকি।"[১৪] দিবাকর ও আন্না পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। এখানেই কাহিনীর শেষ। কিন্তু ভাবনার পথ কিন্তু এখানে শেষ হয়নি। সেই পথ সুদুরের

পথ, লড়াই সংগ্রামের পথ। যে পথ শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রমিক-কৃষক-মজদুরদের আগামীদেনের লড়াইয়ের প্রস্তুতির আভাসে আভাসিত হয়েছে।

'পরিস্থিতি' (১৯৪৬) গল্পগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'শিল্পী' গল্পেও আমরা দেখতে পাই একদিকে স্বার্থপর কালোবাজারি সুযোগ সন্ধানী শাসকের লোলুপ দৃষ্টি অন্যদিকে শোষিত নিপীড়িত অসহায় মানুষের জীবনযন্ত্রণার পাশাপাশি শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে সর্বহারা মানুষের একত্রিত লড়াইয়ের বাস্তব ছবি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর সমকালীন আর্থ-সামজিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে 'শিল্পী' গল্পের ঘটনা পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। কর্মঠ শ্রমজীবী মানুষ মদন সাতদিন তাঁত না চালানোয় তার প্রভাব পড়েছে শরীরে। ফলস্বরূপ শীতের সকালে মদন তাঁতি শারীরিকভাবে অসুস্থ, মানসিকভাবেও। মদনের "মনটা কেমন টনটন করে একধরণের উদাস করা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে।"[১৫] অন্নের অভাবে আসন্ন সন্তানসম্ভবা বউও ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের এইরূপ বিপর্যয়ের দিনে কাপড় বোনার ফরমাশ পাওয়ার আশায় মদনের মা বউকে নিয়ে গেছে বাবুদের বাড়ি। এমন সময়ে পায়ে হঠাৎ খিঁচ ধরে মদনের। মদনের চিৎকার শুনে উদির বাড়িতে থাকা ভুবন ঘোষাল এসে ঠিক করে মদনের খিঁচ ধরা পা। এরই মধ্যে তাঁতিপাড়ার অনেকেই মদনের বাড়িতে পৌঁছে, অবাক হয়েছে মদনের কাছে ভুবনকে বসে থাকতে দেখে। তাঁতিপাড়ার মানুষের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারে মদন। তাই নিজেই জানায় তার বাড়িতে ভুবনের আসার কারণ। সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ার সকলেরই তাঁত বন্ধ। শুধু বৃন্দাবন ও তার ছেলে কেশব ভুবনের কাছ থেকে সুতো নিয়ে তাঁত চালাচ্ছে। সুযোগ বুঝে এই খবরটি সকলের সামনে ভুবন জানিয়ে দিয়ে মদনকে উদ্দেশ্য করে বলে –"সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছু কাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, এ কি কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা–"[১৬] এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভুবন সর্বহারা শোষিত শ্রেণির ঐক্যের সুতোকে কেটে দিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে।

এদিকে 'এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ি'র বায়নার কথা বাবুদের বাড়ির মেয়েরা শুনেই মদনের নামে হাসি টিটকারি করে বিদায় করেছে মদনের মা, বউকে। সকলের সামনে টিটকারির কথা শুনে খুব অপমানিত বোধ করে মদন। সে বলে– "বেড়েছে– বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।"[১৭] শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি ভূবনের সামনে মদনের এই বক্তব্যের মধ্যে আভাসিত হয়েছে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে সর্বহারা শোষিত শ্রেণির প্রত্যক্ষ জেহাদ।

মদনের বাড়ি থেকে ভুবন বেরিয়ে যাবার সময় বাড়ির ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ শুনে সে উদিকে আবার খবর নিতে পাঠায়। উদির কাছ থেকে জানতে পারে

মদনের বউয়ের প্রসবযন্ত্রণা উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভুবন আবার যায় মদনের কাছে। ঘুরপথে মদনের সম্মতি আদায় করে লোককে দিয়ে সুতো পাঠিয়ে দেয়। একদিকে আসন্ন প্রসবা স্ত্রী, ঘরেতে অন্নাভাব অন্যদিকে শিল্পী সত্তার স্বতন্ত্রতা। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে- মদনের "ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়"।[১৮] গভীর রাতে মদনের বাড়িতে শোনা যায় তাঁত চালানোর ঠকাঠক শব্দ। সকাল হতেই মদনের বাড়ির সামনে ভিড় করে তাঁতিপাড়ার অর্ধেক মেয়ে-পুরুষ। বুড়ো ভোলা জিজ্ঞাসা করে "ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপি চুপি।"[১৯] ওদের মনের অবস্থা বুঝতে পারে মদন। সে সকলকে তাঁতঘরে নিয়ে দেখায় ও বলে– "চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে-"[২০] এভাবেই শিল্পীসত্তার স্বতন্ত্রতা ও জয়ের মধ্য দিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

গল্পের পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর সমকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক পরিবেশ। গল্পকার সেই সময় প্রেক্ষাপটে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রামীণ জনজীবনে মালিকপক্ষ তথা শাসকশ্রেণির অত্যাচার যেমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল তেমনি সর্বহারা শোষিত শ্রেণি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে নামতে বাধ্য হয়েছিল। 'শিল্পী' গল্পে বাঁচার লড়াইটা শুধু মদন তাঁতির একার নয় সমগ্র সর্বহারা শ্রেণির। মদন তাঁতি সমগ্র সর্বহারা শ্রেণির একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবেই নেতৃত্ব দিয়ে সেই বাঁচার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মার্ক্সবাদে গভীর বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা সর্বহারা শ্রেণি সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন। প্রগতিশীল লেখক হিসেবে তিনি জানতেন যে গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র সর্বহারা মানুষের যে দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব তার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী শক্তির নিষ্ঠুর শোষণ। সর্বহারা শ্রেণির উপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় এদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রী মালিকপক্ষ তথা পুঁজিবাদী শাসকের শাসনযন্ত্রের নিস্পেষণকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। এই পুঁজিবাদী নিস্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা কখনোই সর্বহারা শ্রেণির কোন একক ব্যাক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন সর্বহারা শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ লড়াই। লেখকের এই বিশ্বাসের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁর 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' গল্পে। সেখানে মৃতুঞ্জয় একাই লড়েছিল ক্ষুধাতুর মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজেই লঙ্গরখানার ক্ষুধাতুর মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যায়। তাই গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধু নিখিল জেনেছিল- "এভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না।"[২১] নিখিলের ভাবনা- "এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হতো? অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না।"[২২] নিখিলের দুটি ভাবনার মধ্যে এই ধ্রুব সত্যটি ধরা পড়েছে, রিলিফ নয়, না খেতে পাওয়া সর্বহারা মানুষগুলোকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে জোতদার

জমিদার পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল করতে পারলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। আলোচিত প্রতিটি গল্পেও আমরা দেখতে পাই শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শেণির ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রস্তুতি, যা মানিক বন্দ্যোপাধায়ের মুখ্য উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলেছে বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প; সম্পাঃ যুগান্তর চক্রবর্তী ; বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড; পৃঃ- ১৩৭

২। তদেব ; পৃঃ- ১৩৭

৩। তদেব ; পৃঃ- ১৩৯

৪। তদেব ; পৃঃ- ১৩৯

৫। তদেব ; পৃঃ-১৪৩

৬। তদেব ; পৃঃ-১৪৫

৭। তদেব ; পৃঃ- ১৪৫

৮। তদেব ; পৃঃ-১৪৭

১০। তদেব ; পৃঃ-১৪৭

১১। তদেব ; পৃঃ-১৫১

১২। তদেব ; পৃঃ-১৫১

১৩। তদেব ; পৃঃ-১৫১

১৪। তদেব ; পৃঃ-১৫১

১৫। তদেব ; পৃঃ-১০৮

১৬। তদেব ; পৃঃ-১১০

১৭। তদেব ; পৃঃ- ১১১

১৮। তদেব ; পৃঃ-১১৩

১৯। তদেব ; পৃঃ-১১৩

২০। তদেব ; পৃঃ-১১৩

২১। তদেব ; পৃঃ-৮৬

২২। তদেব ; পৃঃ-৮৬

ঋষি অরবিন্দের 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে 'আন্তরিক স্বাধীনতা'র স্বরূপ

মানিক সরকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
শিলিগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ : আমরা বহির্মুখী স্থূলদৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দেখি বলে শরীরই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করে দেহাত্মক বুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিয়ে ফেলি যে বাহ্যিক কর্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে থাকি। এই অজ্ঞানতার ফলে তৈরি হয় জীবনব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখ লালসায় দুঃখ ভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের প্রদত্ত সুখ, পরের প্রদত্ত দুঃখ গ্রহণ করে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। তাই প্রাবন্ধিক ঋষি অরবিন্দ ঘোষ আলোচ্য 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে দেহাত্মক বুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতাকে কারাবদ্ধের ন্যায় দুর্দশা বলে অভিহিত করেছেন এবং এই কারাগৃহ থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ 'আন্তরিক স্বাধীনতার' কথা বলেছেন।
সূচক শব্দ : কারাগৃহ, আন্তরিক স্বাধীনতা, আত্মসংযম, বেদান্ত, সুখ-দুঃখ বর্জন, দেবভাব।

মূল প্রবন্ধ :
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমার বাংলা' নামক গদ্যগ্রন্থের 'মেঘের গায়ে জেলখানা' রিপোর্টাজে বলেছেন- "জেলখানা না দেখলে দেশের একটা বড় দিক অদেখা থেকে যায়। আর জেল বলতেই মনে পড়ে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি কিংবা দমদমের কথা।"[১] জেল, থানা, কারাবাস এই শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। জেল শব্দটির শুদ্ধ বাংলা পরিভাষা হলো সংশোধনাগার। কারাবাসে তথা সংশোধনাগারে থাকাকালীন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের অভিমুখ বা গতিপথ পরিবর্তিত হবার কথা আমাদের অজানা নয়। যেমন কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার বীজ বপিত হয়েছিল কারাবাসে থাকাকালীন। কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'জাগরী' রচিত হয়েছিল। সমরেশ বসুর বেশ কিছু ছোটগল্প উপন্যাসে কারাজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শহীদের মা' ইত্যাদি।

আমার এই আলোচনার মর্মমূলে যিনি রয়েছেন তাঁর জীবনের গতিপথ আমূল ভাবে বদলে গিয়েছিল আলিপুর জেলে থাকাকালীন। সাধারণত প্রাথমিক যে পরিচয় ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে আমাদের গড়ে ওঠে তা হল- তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা

সংগ্রামী। পরাধীন ভারতমাতার ললাটে স্বাধীনতার জয়টীকা পড়িয়ে দেওয়ার কল্পে ভারতমাতার যে সমস্ত সুসন্তান নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ তাদেরই একজন। এ স্থলে একটু ঐতিহাসিক সূত্র উল্লেখ না করলেই নয় এবং তা আবশ্যকও বটে।

আলিপুর বোমা মামলা বদলে দিয়েছিল বিপ্লবী অরবিন্দের জীবন। বাংলায় তখন দিকে দিকে গড়ে উঠেছে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। অরবিন্দ ও তাঁর ছোট ভাই বারীন তখন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। বারীনের গুপ্ত সমিতির সিদ্ধান্তে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিবর্তে ভুল করে নিরীহ দুই ইউরোপীয় মহিলাকে হত্যা করে ফেলে। এই ঘটনার পরে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে, ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি হয়। শুরু হয় ব্যাপক খানা তল্লাশি। বারীনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই পুলিশ পৌঁছে যায় অরবিন্দের কাছে। ভোররাত্রে কলকাতার গ্রে স্ট্রিটে 'নবশক্তি' পত্রিকার অফিসের ওপর তলার ঘর থেকে পুলিশ অরবিন্দকে গ্রেফতার করে। কারণ ঘর খানা-তল্লাশি করার সময় পুলিশ কাগজে মোড়া খানিকটা মাটি উদ্ধার করে, তারা ওই মাটিকে বোমা বানানোর উপাদান মনে করেছিল। আসলে ঐ মাটি ছিল দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে আসার শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি মেশানো মাটি।

প্রায় ১৩১ দিন ধরে চলে আলিপুর বোমা মামলা। অরবিন্দের হয়ে মামলা লড়েন উদীয়মান ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আলিপুর বোমা মামলার আসামী হিসেবে অরবিন্দকে জেলে কাটাতে হয়েছিল প্রায় এক বছর। এই জেলে থাকাকালীনই তাঁর মধ্যে এক দিব্যচেতনার সঞ্চার হয়, তিনি কৃষ্ণ দর্শন করেন। অতঃপর চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দকে বলেছিলেন যে- "আপনি ফিরে আসুন। রাজনীতিতে তাঁর প্রয়োজন আছে। ভারতের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বীজ তিনি রোপন করেছিলেন আজ তা মহীরুহ। তিনি যেন অবশ্যই ফিরে আসেন।"

অরবিন্দ মৃদু হেসে চিত্তরঞ্জন দাশকে প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে- "তিনি আর বিপ্লবী অরবিন্দ নই, তিনি এখন যোগী অরবিন্দ। তার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়।

কারাবাসে থাকাকালীন কারা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এবং সেই সময় তার মধ্যে গড়ে ওঠা নব ভাবোপলব্ধির কথা ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'কারাকাহিনী' গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন চারটি প্রবন্ধে- ক) কারাকাহিনী খ) কারাগৃহ ও স্বাধীনতা গ) আর্য আদর্শ ও গুণত্রয় এবং ঘ) নবজন্ম-এ গ্রোথিত করেছেন। যেখানে তিনি আর বিপ্লবের কথা বলেননি; বলেছেন আধ্যাত্মিক কথা, আত্মিক উন্নতির কথা। আমার আলোচ্য 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি মানুষের আত্মিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন, ভারতীয় আসামী ও পাশ্চাত্য আসামীর চারিত্রিক গুণাবলীর পার্থক্য আলোচনা করেছেন। আন্তরিক স্বাধীনতা বলতে প্রাবন্ধিক মূলতঃ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল- বাহ্য সুখ-দুঃখকে তাচ্ছিল্য করে অন্তরাত্মাকে দেখা। আমরা সর্বদাই বাহ্যিক কর্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে থাকি। সুখের লালসায়, দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত

হই, পরের দুঃখ গ্রহণ করে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। প্রাণের এই সুখ দুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। আমরা বাহ্য অবস্থা ও স্থূল অনুভূতির মধ্যে আবদ্ধ। তাই আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা বেশি।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি স্বাধীনতা বলতে অন্যের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি কিংবা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত প্রকাশ বা স্বাধীনভাবে চলাফেরার কথা বলেননি, তিনি আত্মার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। দীর্ঘ এক বছর কারাবাসে থাকাকালীন তিনি কিছু কয়েদীদের বিনয় প্রকাশ, ভগবানে আস্থা, আর্য শিক্ষা-সুলভ ধৈর্য্য, শান্ত ভাব, সহিষ্ণুতা, প্রসন্নতা লক্ষ্য করে অভিভূত হন। প্রবন্ধমধ্যে একস্থানে তিনি বলেছেন- "যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা, আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বারো মাস কাটাইলাম।"[২] এক বৎসর কাল যাবৎ আলিপুর জেলে কাটানোর পর নিকৃষ্ট ভারতবাসীর মধ্যে মহত্ব আবিষ্কার করলেন। তিনি তিনজন কয়েদীর কথা আলোচ্য প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম সম্বন্ধের মধ্যে রয়েছে ভগবানে আস্থা, আর্যশিক্ষাসুলভ ধৈর্য ও অন্যান্য সদগুণ। এই বৃদ্ধের ভাব দেখে ঋষি অরবিন্দের বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় বলে তিনি প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অন্তরীণ থাকা সত্ত্বেও ঐ বৃদ্ধ কখনো চঞ্চল নয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ নয়, উদ্বিগ্ন নয়, উপরন্তু তাঁর নয়নে প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্বদা প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় বিশেষে ঐ বৃদ্ধের মুখে প্রাবন্ধিক নিরপরাধে কষ্টভোগের কথা, স্ত্রী সন্তানদের কথা এবং ঈশ্বর কবে কারামুক্তি দিয়ে স্ত্রী ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন- এ সমস্ত ভাবনা প্রকাশিত হতে শুনেছেন। কিন্তু কখনো তিনি নিরাশ বা উদ্বিগ্ন বা অধির হননি। উক্ত বৃদ্ধের মত চেষ্টা ও সাধনা সমস্তই অপরের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত। দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তার কথায় সর্বদাই প্রকাশিত, পরসেবা তার স্বভাবধর্ম। একজন অশিক্ষিত গোয়ালার এই সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ করে প্রাবন্ধিক বলেছেন- "আমা হইতে সহস্র গুণ উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্বদা লজ্জিত হইতাম। বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্বদা আমার সুখ-সোয়াস্তির জন্য চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর বিশেষ নিরপরাধ ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার ছায়াদৃষ্টি বিনীত সেবা সম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক প্রশান্ত গাম্ভীর্য ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।"[৩]

অতঃপর প্রবন্ধ মধ্যে প্রাবন্ধিক দু'জন শিক্ষিত যুবকের কথা উল্লেখ করেছেন পেশায় দু'জনেই কবিরাজ, যারা সাত বৎসর সশ্রম কারদন্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই দুজন যুবক যেরূপ শান্ত মনে, শান্ত ভাবে রাজদণ্ড সহ্য করছেন তা দেখে প্রাবন্ধিক

আশ্চর্য হয়েছেন। কখনো তাঁদের মুখে ক্রোধদুষ্ট বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশক একটি শব্দও শোনা যেত না। এমনকি যাদের দোষের কারণে এই কবিরাজদ্বয়কে জেলরূপ নরকে নিজেদের যৌবনকাল অতিবাহিত করতে হয়েছিল তাদের প্রতিও লেশমাত্র তিরস্কার ভাব বা বিরক্তি প্রকাশ পায়নি- “দুইজনই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিংবা বিধাতার নিকট নালিশ না করিয়া সহস্রমুখে নতমস্তকে দন্ড গ্রহণ করিয়াছেন।”[৪]

নগেন্দ্র ও ধরণী দুই ভাই-ই সাধক হলেও তাদের প্রকৃত ছিল ভিন্ন। নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতির গম্ভীর, বুদ্ধিমান, গীতা পড়তে চেয়ে হাতে বাইবেল পেয়েছিলেন, অথচ তিনি গীতা না পাঠ করেও আশ্চর্যের সঙ্গে গীতার শ্লোক আওড়াচ্ছিলেন, এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক অরবিন্দের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- “গীতা না পড়িয়া বাইবেলে গীতার সমতাবাদ, কর্মফলত্যাগ, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে।”[৫] ধরণী নগেন্দ্রর ন্যায় বুদ্ধিমান ছিল না; তবে বিনীত ও কোমল প্রকৃতির মাতৃধ্যানে বিভোর। তাঁর মুখের প্রসন্নতা, সরলহাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখে জেলের জেলত্ব ভাব উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ত। এরা দু’জনেই নিরপরাধ, অথচ বিনাদোষে কারারুদ্ধ হয়েও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখ-দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করে আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। বারোমাস জেলে থেকে দু’একজন ব্যতীত প্রায় সকল কয়েদীর মধ্যেই প্রাবন্ধিক সদ্ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন।

বারো মাস আলিপুর জেলে থাকাকালীন ঋষি অরবিন্দের দু’একজন ব্যতীত যত কয়েদী, চোর, ডাকাতের সঙ্গে সংস্রব হয়েছিল সকলের কাছেই তিনি সৎ ব্যবহার ও অনুকূলতা পেয়েছিলেন এবং সকলের মধ্যেই দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত ও আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করেছিলেন। বরঞ্চ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে এই সকল গুণাবলীর অভাব। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকলেও সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা সেই সমস্ত গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। যে দয়া সহানুভূতি আর্য শিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ তা প্রাবন্ধিক জেলে থাকাকালীন এই সকল চোর ডাকাতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন- মেহতর ঝাড়ুদার পানিওয়ালা বিনাদোষে নির্জন কারাবাস করেও কখনো অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। আবার একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদের নিজের ছেলেদের মত ভালবাসতেন, এমনকি বিদায় নেবার সময় চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

আলোচ্য প্রবন্ধে ঋষি অরবিন্দ প্রথমেই তাঁর সিদ্ধান্ত এবং পরে পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছেন। আলোচিত তিনজন কয়েদী চরিত্র, তাদের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করে জানান মানব শরীরই হল কারাগৃহ, দেহাত্মক বুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু। এই কারাগৃহ এবং কারারূপ শত্রু থেকে মুক্তিলাভের উপায় হল শরীর জয়, স্থূলের আধিপত্য বর্জন, আন্তরিক স্বাধীনতা গ্রহণ। আন্তরিক স্বাধীনতা লাভের পন্থাগুলি হল- আত্ম-সংযম আত্মনিগ্রহ, সুখ-দুঃখ বর্জন, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হটযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ। পশু ও মানুষের ভেদ নির্ণয়ের

ক্ষেত্রেও প্রাবন্ধিক শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন। বিচারশক্তির অভাব পশু ও মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নয়। পশুরও বিচার শক্তি আছে। কিন্তু পশুদেহে তার উৎকর্ষ হয় না -"পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা, শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব বিকাশ। এই স্বাধীনতাই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকে মুক্তি বলে।"[৬]

তথ্যসূত্র :

১. সাহিত্যিচর্চা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮৬।
২. Sri Aurobinda Ashram Trust, The complete works of Sri Aurobinda, vol 9, 2017, পৃষ্ঠা- ৫৬।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৫।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল, ঋষি অরবিন্দ, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ- ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।
২. দাস, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, নিউ সেন্ট্রাল, বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামনি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

ঘর ভাঙার কাহিনি : সিঁদুরে কাজলে

বিপ্লব ব্যানার্জ্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যে বারবার ঘর ভাঙার চিত্র ফুটে উঠেছে কথাকারদের তুলির টানে, প্রসঙ্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদিনী' গল্পদ্বয়ে তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। এই দুই গল্পের নায়িকারা হাসিমুখে নিজের ঘর ভেঙে অন্য ঘরের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে, কিন্তু সৈকত রক্ষিতের 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসে তাঁর নায়িকা স্বেচ্ছায় নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে অন্য ঘর এবং নতুন জীবনের সন্ধানে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। কথাকার কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি তাঁর নায়িকা ভাদরিকে আবার ফিরিয়ে এনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে পাঠককুলের সামনে সমাজের নগ্নরূপের দর্পণটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, আর এখানেই তিনি বাংলা কথাবিশ্বে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নারী যে শুধু পুরুষের মুখে হাসি ফোটাবার যন্ত্র বিশেষ নয়, তারই প্রতিবাদ জানিয়েছে উপন্যাসের নায়িকা ভাদরি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার লেলিহান শিখায় আজ একটা ভাদরি পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হলেও যেদিন লাখ লাখ ভাদরি পুরুষালী নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করে সেই অগ্নি শিখার বিরুদ্ধে ঝাঁপ দেবে সেদিন আর ওই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসটি পাঠের পর সাধারনত কিছু প্রশ্ন জেগে উঠে, প্রথমতঃ সন্তান জন্ম দেওয়ার সমস্ত গুণাবলি থাকার পরও কেন ভাদরিকে সমাজ থেকে 'বাঁজা' অপবাদ শুনতে হয়েছিল? দ্বিতীয়তঃ যদি শুধুমাত্র মাতৃত্ব লাভের জন্যই ভাদরি শ্রীকান্তর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল তবে কেন দুটো সন্তান জন্ম দেওয়ার পরেও এই অবৈধ্য মেলামেশা জারি রেখেছিল? তৃতীয়তঃ ভাদরি কেন এতটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো যে নিজের হাতে নিজের সন্তানকে হত্যা করতে হলো? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে মূল প্রবন্ধে।

সূচকশব্দ : যৌবন, নপুংসক, আত্মতুষ্টি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, বীরাঙ্গনা, দায়বদ্ধতা, অন্ধকার

মূল প্রবন্ধ :

পুরুলিয়ার মুকুটহীন কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে প্রান্তরে, নদী ঘাটে, টিলা ডুংরিতে। ঘুরতে ঘুরেতে প্রবেশ করেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং সঞ্চয় করে এনেছেন দুর্লভ মণি মানিক্য। সমাজে অবহেলিত, শোষিত

ও নিপীড়িত জনপদের সঙ্গে থেকে দেখেছেন তাদের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ দুর্দশার বিচিত্র রূপ। এভাবেই সমাজের তুচ্ছ অবহেলিত মানুষগুলি তাঁর গল্প উপন্যাসের মূল চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'জন্ম সূত্রে পুরুলিয়ার অধিবাসী হওয়ায় এই প্রান্তিক জেলার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা।'[১] কথাকার তাঁর সাহিত্যে একদিকে যেমন চিত্রিত করেছেন পুরুলিয়ার প্রান্তিক মানুষজনের জীবন সংগ্রাম, তেমনি অন্যদিকে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপটিকে বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নারী মনস্তত্ত্বের ভাবটি বিশেষভাবে ফুটে উঠে তাঁর 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসটিতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বলবত্তায় থেকে নারীর অবদমিত মনের ইচ্ছা জমতে জমতে কখন বিস্ফোরকের আকার ধারণ করে একটা সংসারকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয় তারই বাস্তবসম্মত রূপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসটিতে।

বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যে বারবার ঘর ভাঙার কাহিনি উঠে এসেছে, লক্ষণীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে স্বামীহন্তা ভিখুর হাত ধরে পাঁচী নতুন ঘরের সন্ধানে পা বাড়িয়েছে। অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাদ্যায়ের 'বেদেনী' গল্পে শম্ভুর ঘরে আগুন লাগিয়ে কিষ্টোর হাত ধরে রাধিকা নিরুদ্দেশ হয়েছে অন্য ঘরের সন্ধানে। ঠিক একইভাবে পুরুলিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমন্ডল থেকে কথাকার সৈকত রক্ষিত এক দুঃসাহসিক কথাবস্তুকে পাঠক বিশ্বে উত্থাপিত করেছেন, তাঁর 'সিঁদুরে কাজলে'[২০০২] উপন্যাসটি না পাঠ করলে যা অনুধাবন করা যাবে না। উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে। সেখানে কলঙ্কিনী ভাদরি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর শিশু কন্যা চাম্পিকে নিয়ে সংগোপনে স্বামীঘর মালথরে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনি পট শুরু হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিসূত্র থেকে জানা যায় সুন্দরী, তপ্ত যৌবনা ভাদরির বিবাহ হয়েছিল মালথরের আদালত মাহাতোর সঙ্গে। স্বামীঘরে অভাব ছিল না কোনো কিছুর, রাজরানীর মতো দিন কেটে যাওয়ার কথা কিন্তু সেখানে বাদ সাধলো আদালতের পুরুষত্বহীনতা। এই পুরুষত্বহীনতাকে কোনো ভাবেই ভাদরি মেনে নিতে পারেনি। তাই সমাজের দেওয়া বাঁজা অপবাদ থেকে মুক্তির জন্য বার বার স্বামীকে এই বিষয়ে খোটা দিতে থাকে- 'তোর হতেই হামার কপালে এমন কলঙ্ক জুটেছে। তুঁই ক্যানে হামার পেট ভরাতে পারিস নাই? হামি নাই থাকব তোর সঙ্গে।'[২] নাছোড়বন্দা ভাদরি বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেও আদালতের পুরুষত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। তাই এই বিষয়ে বারংবার তাদের মধ্যে চলতে থাকে নানান কথা কাটাকাটি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বলবত্তায় থেকে আদালত কোনো ভাবেই এই অপমান মেনে নিতে পারেনি। ফলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল বিভীষিকাময়। সেই অসুস্থ সম্পর্কের চোরাস্রোত বেয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিমূর্ত অবয়বে হাজির হয়েছিল তৃতীয় জন, শ্রীকান্ত। তার মোহিনী বাঁশির সুর ও ঝুমুরের ছন্দ উত্তপ্ত যৌবনা ভাদরির সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এরপরেই শুরু হয় শ্রীকান্ত ভাদরির অবৈধ মেলামেশা। এত দিনের বাঁজা অপবাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে ভাদরির কোল ভরাল পুত্র ভভ। ভভ

হয়ে উঠল তার মায়ের নেউটা, আর এখানেই বাদ সাধলো শ্রীকান্ত ভাদরির অবৈধ্য মেলামেশার। শ্রীকান্তর প্রতি ভাদরির অতিরিক্ত যত্ন দেখে ভভর শিশু মনেও নানান প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। যে ভালোবাসা তার বাবা অর্থাৎ আদালতের প্রাপ্য তা পাচ্ছে একজন বাগাল। এটা ভভ কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না, তাই বাবাকে বলে দেওয়ার হুমকি দিত ভাদরিকে। ভাদরি বুঝতে পেরেছিল তার সেই ছোট্ট শিশুটি আর নিতান্ত নির্বোধ নয়। তাই সে এরূপ কর্মের আগে নিজের ছেলেকে কোঠা ঘরে বন্দি করে চোখের আড়ালে রাখে। কিন্তু তাতেও বিপত্তি কমেনি, একদিন বন্দি অবস্থাতেও দরজার ফাঁক দিয়ে তার মা এবং বাগাল ছেলে শ্রীকান্তর শঙ্খিনী রূপ দেখে ফেলে চিৎকার করে ওঠে শ্রীকান্তকে দরজা খোলার নির্দেশ দেয় এবং বাবাকে বলে দেওয়ার প্রচণ্ড হুঙ্কার দেয়। ভভর এরূপ আক্রমণত্মক মেজাজ দেখে ভাদরি বুঝতে পারে আর কোনো প্রলোভন বা ভীতি দিয়ে শিশু মনকে স্তব্ধ করা যাবে না। ফলে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং নিজের ছেলেকে শত্রুর মতো প্রহার করতে শুরু করে, শেষে অমানুষিক ভাবে প্রচণ্ড জোরে ছেলের গলা চেপে ধরে, আর তাতেই প্রাণ ত্যাগ করে ভভ। এরূপ ঘটনার পর ভাদরি ও শ্রীকান্ত খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারে এখানে তাদের আর থাকা চলবে না। শ্রীকান্তের হাত ধরে সেই দিনেই মৃত সন্তান এবং আপনজনদের ত্যাগ করে নিরূপায় ভাদরি পাড়ি দেয় নিরুদ্দেশের পথে। স্বাধীন এবং মুক্ত পরিবেশে সেই শ্রীকান্তই হয়ে উঠে চরম অসহনীয়। তাই ভাদরি সুযোগ বুঝে শিশু কন্যা চাম্পিকে নিয়ে পা বাড়িয়েছিল ফেলে আসা মালথরের উদ্দেশ্যে। সে জানতো মালথরে তার জন্য অপেক্ষা করছে চরম বিপদ তবুও শেষ বারের মতো আদালতের সামনে দাঁড়াতে চায়, মাথা নত করে নিজের সমস্ত ভুল স্বীকার করে নিতে চায়। কিন্তু মালথরে পৌঁছে সেই প্রায়শ্চিত্য করার সুযোগ তো দুরের কথা আদালতের নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতাই উপহার পেয়েছিল। আদালত সহ গ্রামের লোক তীব্র অসম্মান দেখিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়া করে গদাই ডুংরি পার করে দিয়ে এসেছিল।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত পুরুলিয়ার সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নারীদের যেখানে ঘোমটা এবং চার দেওয়ালের মাঝখানে সীমাবদ্ধ থাকার কথা, সেখানে একজন নারী আত্মতুষ্টির জন্য সমস্ত বেড়াজাল ডিঙিয়ে পার হতে আগে কখনও খুব একটা চোখে পড়েনি পাঠক মহলের। কথাকার সৈকত রক্ষিত ভাদরির দুঃসাহসিক আত্মক্ষয়ী পথ চলাকে উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যিক রূপ দান করতে চেয়েছেন। এখানে ভাদরি শুধুমাত্র একটি চরিত্র নয়, ভাদরি হয়ে উঠেছে সীমান্তবর্তী জনসমাজের নারীর একজন প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে বহু নারী দিনের পর দিন সমস্ত অন্যায় অবিচার মুখ বুজে এত দিন সহ্য করে গেছে। কিন্তু এখন সময় বদলাচ্ছে, নারীকে এখন আর অবলা ভাবা যায় না। নারী এখন প্রতিবাদ করতে শিখেছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও শিখেছে। ভাদরির মধ্যে সন্তান ধারন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কেন সমাজের দেওয়া 'বাঁজা' অপবাদ সহ্য করবে? সমাজের

সমস্ত নিয়ম নীতি মানুষেই তৈরি করেছে এবং মানুষেই সেই নিয়ম নীতির নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই নিজেদের অবদমিত ইচ্ছে গুলো নিয়ম নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে একদিন কর্পূরের মতো উবে যায়। ভাদরি কিন্তু আর পাঁচটা সাধারন মহিলার মতো সমাজের দেখানো পথকে অনুসরণ করেনি, সে নিজের ইচ্ছাকে মূল্য দিয়ে নির্দ্বিধায় শ্রীকান্তর সঙ্গে মেলামেশা করে মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করেছে। আর এখানেই একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, ভাদরি কি শুধু বাঁজা অপবাদ ঘোছানোর জন্য অর্থাৎ মাতৃত্বের জন্য শ্রীকান্তের সঙ্গে মেলামেশা করেছিল নাকি তার মধ্যে অন্য কোনো অভিসন্ধি লুকিয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই অনুধাবন করা যায় উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যাসটি লক্ষ্য করলেই। ভাদরি যদি শুধু মাত্র মাতৃত্বের আশায় শ্রীকান্তর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল তাহলে কেন সন্তান জন্ম দেওয়ার পরও এই অবৈধ্য মেলামেশা জারি রেখেছিল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তপ্ত যৌবনা ভাদরির শরীরী চাহিদাও শ্রীকান্তর কাছ থেকেই মিটত। ভাদরি এই মেলামেশা জেনে বুঝেই করেছে, আর করবেই না বা কেন? এখানে ভাদরির কোথায় দোষ ছিল, সে তো নিজের বাবা মার দেখানো পাত্রের সাথে সুখে সংসার করতে চেয়েছিল। সে তো পাঁচ বছর নপুংসক আদালত মাহাতোর সঙ্গে মুখবুজে সংসার করে গেছে, কিন্তু তার পরিনামে সে পেয়েছে সমাজের দেওয়া বাঁজা অপবাদ। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে একজন নির্দোষ মহিলা এই অপবাদ কেন মুখ বুজে সহ্য করবে। মানুষ মাত্রই কামনা বাসনা চাহিদার দাস, তবে কেন ভাদরি অন্য পথ বেছে নেবে না? কেন ভাদরির মধ্যে কোন কামনা থাকবে না? শুধু মাত্র মহিলা বলে কি তার কোনো ইচ্ছা বা বাসনা থাকতে পারে না । বিবাহ মানে কি শুধু অন্যের সাথে ঘর করা, এর বাইরে কি আর কিছু না? এই সব প্রশ্নের উত্তর ভাদরি নিজেই দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মুখে ঝামা ঘসে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে অবলীলায় শ্রীকান্তর সঙ্গে মেলামেশা করে শ্রীকান্তর হাত ধরেই অন্য ঘরের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু এত বড়ো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একা একজন নারী অসহায় হয়ে পড়েছে। সমাজে প্রচলিত শব্দ 'সতী' তা নারীর জন্য ব্যবহৃত হলেও পুরুষের জন্য হয় না। পুরুষের তৈরি করা নিয়ম নীতিতে নারীর সতীত্ব একবার চলে গেলে তাকে আর সমাজে উঠানো যায় না, তাই কথাকার হয়তো দুঃসাহসী নারীর কথা লিখতে বসলেও শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারে নি। তাই বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন, "পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নারীসত্তার প্রতিকারহীন পরাজয়ের আখ্যান'।[৩]

উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিয়ে যদি একটু অন্য ভাবে ভাবতে বসি তাহলে কাহিনি পটটি অদ্ভুত ভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। ভাদরিকে যদি বৈষ্ণবীয় রাধার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে সমস্তটাই কি রকম অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে। রাধার বিয়ে হয়েছিল নপুংসক আইহন ঘোষের সঙ্গে অনুরুপ ভাবে এখানেও ভাদরির বিয়ে হয়েছিল নপুংসক আদালত মাহাতোর সঙ্গে। স্বামী সুখ উভয়েরই কপালে জুটেনি,

আবার কৃষ্ণের মোহিনী বাঁশির সুর শুনে রাধিকা যেভাবে আত্মহারা হয়ে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে চেয়েছিল ঠিক একইভাবে শ্রীকান্তর ঝুমুর গানের কণ্ঠ শুনে ব্যকুল ভাদরি আত্মসম্মান ভয়কে পিছনে ফেলে অবলীলায় মিলিত হয়েছে শ্রীকান্তর সঙ্গে । কৃষ্ণ যেমন রাখাল ছিল একইভাবে শ্রীকান্তও ছিল বাগাল ছেলে। অতএব এভাবে ভাবতে গেলে ভাদরিকে দোষ দেওয়া মিছে হবে, ভাদরি নিমিত্ত মাত্র আসল খেলা তো শ্রীকান্তর অর্থাৎ কৃষ্ণের হাতে। মোহিনী বাঁশির সুরে কতো ভাদরি ঘর ছাড়া হয়েছে তার হিসেব কে বা রাখে? তাই শেষে দেখা যায় রাধিকার মতো সমস্ত লজ্জা ভয় দূরে সরিয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় করে শ্রীকান্তর হাত ধরে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাই এখানে বৈষ্ণব কবির পদটি খুবই সামঞ্জস্য পূর্ণ-

‘কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজায় ঘরে।।’[৪]

উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেও রয়েছে অনন্যতা। উপন্যাসটির নাম ‘সিঁদুরে কাজলে’, অর্থাৎ এই দুটি হলো মেয়েদের প্রসাধনী। প্রথমটি সিঁদুর এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ, হিন্দু ধর্মে সিঁদুর বিবাহিত নারীর প্রতীক। দ্বিতীয়টি কাজল যা একধরনের চোখের প্রসাধনী তা আবার মেয়েদের চোখের সৌন্দর্য বাড়ানোর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি গেলো নামকরণের বহিঃরঙ্গ বিষয়, অন্তরঙ্গ বিষয়টি উপন্যাসটি পাঠ করার পর খুব ভালো ভাবে পরিস্কার হয়ে উঠে। কথাকার সৈকত রক্ষিত একজন বিবাহিতা নারীর জীবন কাহিনি যে লিখতে বসেছেন, তা নামকরণের প্রথম শব্দ থেকে অনুধাবন করা যায়। ভাদরি এক তপ্ত যৌবনা বিবাহিত নারী, মালথরের অধিবাসী আদালত মাহাতোর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ভাদরি সন্তান সম্ভবা হয়ে উঠে না। হয়ে না উঠার কারণ তলিয়ে দেখতে গেলে পরিষ্কার বোঝা যায় আদালত নপুংসক, আর এখানেই কাজলের কালো অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে ভাদরির শরীর ও মন। সেখান থেকেই কাজলের ব্যবহার শুরু, ভাদরির নিজের জৈবিক চাহিদা এবং সন্তান কামনার আশায় বেছে নেয় অন্ধকারের পথ। মেলামেশা শুরু করে বাগাল ছেলে শ্রীকান্তর সঙ্গে আর এখান থেকেই উপন্যাসের কাহিনির পট পরিবর্তন হতে শুরু করে। ভাদরি মিলিয়ে যায় অন্ধকারে, নিজের হাতে নিজের সন্তানকে হত্যা করে পালিয়ে যায় শ্রীকান্তের সঙ্গে। এখান থেকেই ভাদরির জীবনে নেমে অন্ধকারের কালো ছায়া এবং ঔপন্যাসিকও উপন্যাসটিকে ক্লাইমেক্সে পৌঁছে দেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্তের সঙ্গেও টিকতে না পেরে স্বামীঘর মালথরের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তণ করে স্বামীর কাছে নত হয়ে সমস্ত ভুল স্বীকার করে নিতে চায়। ভাদরি চাইলেই কি হবে? আদালত তাকে মেনে নেয় নি, বরং সকলের সামনে তাকে অস্বীকার করেছে। গ্রামের লোকজন নানা ভাবে অপমান করে ভাদরিকে গদাই ডুংরি পার করে গ্রাম ছাড়া করেছে। একা নারী, সঙ্গে কন্যা চাম্পিকে নিয়ে চিরতরে অন্ধকারে যেন হারিয়ে যায় ভাদরি। আবার অন্য ভাবে ভাবতে গেলে দেখা যায় ‘সিঁদুর’ কোথাও যেন সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ইঙ্গিত

করে, তাই সিঁদুর এখানে আদালতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'কাজল' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝ যায়, কাজল এক প্রকার প্রসাধনী যা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা উপন্যাসে শ্রীকান্তর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সিঁদুরের দায়বদ্ধতা কোথাও যেন কিছু সময়ের জন্য কাজলের মাদকতার কাছে হেরে গিয়েছিল। মাদকতায় নেশাচ্ছন্ন ভাদরির নেশার রেশ কাটতে বোধহয় একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই হয়তো শেষ পর্যায়ে এসে সিঁদুর তাকে বর্জণ করেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবাদী নারী চরিত্র বা বীরাঙ্গনা নারীর কথা উঠে এলেও তাদের আঁতের কথা সৈকত রক্ষিতের মতো সোচ্চার কন্ঠে আর কাউকে সেভাবে বলতে শোনা যায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সেভাবে যে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয় নি তা বলা বাহুল্য। কথাকার সৈকত রক্ষিত সমাজের নগ্নতার দর্পণ সমাজের চোখেই তুলে ধরেছেন। একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কিভাবে অন্ধকারের কালো ছায়ায় মিলিয়ে গেলো তারই প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে। একবুক স্বপ্ন নিয়ে ঘর করতে আসা ভাদরির ঘর সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কিভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো তা অবশ্যয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভাবিয়ে তুলবে। এই প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র পুরুলিয়ার নয়, জীবনের সার্বজনীন সত্যের দাবী জোরালো হয়েছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস আসলে জীবনকথার এক চিরন্তন ক্যানভাস, যেখানে কথাকার সৈকত রক্ষিত তাঁর আপন তুলিতে এক অনন্য বাঙ-রূপ দান করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। দাস প্রতিমা, 'সৈকত রক্ষিত, বৈশম্পায়ন কহিলেনঃ মহাভারতীয় অনুসঙ্গে বিনতার নারী জাগরণ', আরশি নগর, সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা, বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা; ৮৯।

২। রক্ষিত সৈকত, 'সিঁদুরে কাজলে', মুক্তাক্ষর, কলকাতা ৭০০০৪০,প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃষ্ঠা; ২৫।

৩। ভট্টাচার্য তপোধীর, 'আখ্যানের বিপ্রতীপ স্বর', সোপান, ২০৬ বিধান সারণী, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, ২০২০, পৃষ্ঠা; ১৫০।

৪। মুখোপাধ্যায় শ্রীহরেকৃষ্ণ(সম্পা.), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা; ৫৭।

সহায়ক গ্রন্থ

১। পলমল অরূপ (সম্পা.), 'সৈকত রক্ষিতঃ অনুরাগে অনুভবে', তপতী পাবলিকেশন, ৯/4 টেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ৮ নভেম্বর; ২০২২।

২। রায় ভারতী (সম্পা.), 'নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট; ২০১৯।

৩। দাস রমানাথ, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড), নলেজ ব্যঙ্ক পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট্রর্স, ৪১, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা; ৭০০০০৫।

৪। ব্যানার্জ্জী অরীন্দ্রজিৎ (সম্পা.), 'দাম্পত্য অভিঘাত ও অভিপ্রায়', সোপান, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা; ৭০০০০৬।

৫। আচার্য অনিল, সাহা অর্ণব (সম্পা.), 'যৌনতা ও বাঙালি', অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা; ৭০০০০৯

৬। টিকাইৎ অতনু (সম্পা.), 'হে পুরুল্যে', শব্দযান, নদীয়া; ৭৪১১৬০।

৭। চৌধুরী কমল (সম্পা.), 'পুরুলিয়ার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ৭০০০৭৩।

৮। ভট্টাচার্য জগদীশ (সম্পা.), 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স(প্রাঃ) লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা; ৭০০০৭৩।

৯। চক্রবর্তী যুগান্তর (সম্পা.), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা; ৭০০০৭৩

পড়োশী মুখে ওড়িশা কথা

শিশির বেহেরা
সহকারী অধ্যাপক,
ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা

সারসংক্ষেপ:অতীতে বাংলা পত্রিকায় ওড়িশা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। পুরাতন উৎকলের ছবিকে নিজের লেখনী মাধ্যমে অঙ্কন করার সঙ্গে ওড়িশার পারম্পরিক চলনি, নীতিনিয়ম, খাবারদাবার,সংস্কৃতি,পরম্পরা আর ইতিহাসকে গভীরভাবে অবলোকন করে তার বৈচিত্র্যকে নিখুঁতভাবে পরবিষেণ করেছেন বাংলার লেখক। সময়ের সঙ্গে ওড়িশাকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। বিশেষকরে পুরাতন উৎকলের ইতিহাস, তার শাসনপ্রণালী, লোকাচার, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি প্রমুখ প্রসঙ্গরূপে উভা হয়েছে।প্রতিবেশীভাবে ওড়িশাকে অধিক অনুভব করার প্রয়াস এই আলোচনা থেকে অনুমিত হয়। কাজের জন্য হোক, জীবিকা আধারে হোক অথবা ভ্রমণজনিত উদ্দেশ্যে হোক, ওড়িশা ভূমিকে আগমন করার সময়ে তাঁদের লেখকীয় সত্তা ওড়িশাকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রযত্ন করেছে। বাংলাভাষার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীনওড়িশার অবিভক্ত কটক তথা অধুনার যাজপুর জেলায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কলেক্টর ভাবে কাজ করেন। তাঁর অনেক উপন্যাসে এবং লেখায় উৎকলের ছবি লক্ষিত হয়। পুনশ্চ ওড়িশা ইতিহাসের আনুষঙ্গিক চরিত্রও তাঁর রচনায় চিত্রিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংপর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ ওড়িশার সঙ্গে। তিনিও তাঁর কয়খানি লেখায় ওড়িশা সম্বন্ধে আলোচনা করার দৃষ্টিগোচর হয়। উভয় ওড়িশা এবং বঙ্গদেশের সংপর্ক অতীত থেকে বেশ্ নিবিড়তর। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মধ্যে পরস্পরের সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। কাজের জন্য অনেক প্রবাসী উভয় রাজ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিক এবং আলোচক উভয়ে ইংরাজী ও বাংলাভাষায় ওড়িশা সম্বন্ধে অনেক সময়ে চর্চা করেছেন। তার মধ্যে অনেক বাংলা বই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেমনকি : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা* (১৮৪৪), কবিচন্দ্র সোমের *ওড়িশার ইতিহাস* (১৮৬৭), ক্লান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্যের *উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে* (১৮৭০), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কাঞ্চিকাবেরী* (১৮৭৯), যতীন্দ্র সিংহের *উড়িষ্যার চিত্র* (১৯০৩), বিশ্বম্বর দাসের *জগন্নাথ মঙ্গল* (১৯০৫), যোগেন্দ্রনাথ

রায়ের *উৎকলের পঞ্চতীর্থ* (১৯০৬), গুরুদাস সরকারের *মন্দিরের কথা* (১৯২১), সতীন্দ্র নারায়ণ রায়ের *উড়িষ্যার কথা* (১৯২৮), সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের *শ্রীক্ষেত্র* আদি গ্রন্থ প্রাচীন উৎকলের বিবিধ বিষয়কে নিয়ে রচিত।ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গদেশে ওড়িশা সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে নানা চর্চালোচনা অব্যাহত রয়েছে। ওড়িশার বহু অনুবাদক এবং আলোচক উবর্যুক্ত কয়েখানি গ্রন্থের ওড়িআ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। পড়োশীর মুখে ওড়িশার কথা শুধু উচ্চারিত হয়েনি; বরং অতীত উৎকলের ইতিহাসকেও নিরীক্ষণ করার জন্য বঙ্গীয় লেখকেরা যথাসাধ্য উদ্যম করেছেন। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি তার সমুচিত উদাহরণ। পরবর্ত্তীপর্যায়ে অনেক গ্রন্থ ওড়িশাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথকৈন্দ্রিক বা উৎকলের ধর্মধারা আশ্রিত এবং শ্রীচৈতন্য দেব প্রভাবিত বৈষ্ণবধর্ম সম্বলিত। এই গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত রয়েছে স্বাধীনতা পরকালীন সময় পর্যন্ত। গ্রন্থের মতন বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়, যার মধ্যে ওড়িশার বিস্তৃত বিবরণী এবং ইতিহাসকে লক্ষ্য করাযেতে পারে।

সূচক শব্দ : পড়োশী, ওড়িশা,বঙ্গীয় পত্রিকা, বাংলার লেখক, ওড়িশার সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, পরম্পরা, শ্রীজগন্নাথদেব, ভ্রমণ, পর্য্যটন, প্রাচীন উৎকল।

মূল আলোচনা:

ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত ওড়িশা সংপর্কীয় বহু উপাদেয় প্রবন্ধ বঙ্গীয় পত্রিকা মণ্ডন করেছে। বিশেষকরে ভ্রমাণানুভূতি, তীর্থমহাত্ম্য এবং বৃত্তি বা কাজের উপলক্ষে ওড়িশা আগমনকালীন বিবরণীর প্রতুল বর্ণনা উক্ত প্রবন্ধগুলিতে পরস্ফুিটিত। এ সংপর্কে বিশেষ আলোচনা আমাদের নজরে আসেনি। তাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই আলোচনা। সংপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার মধ্যে নানা কারণবশতঃ তর্ক-বিতর্ক লেগেথাকিলেও উভয় পড়োশীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ অতীত থেকে। পড়োশী বঙ্গদেশের প্রমুখ আকর্ষণ হয়েছে ওড়িশা। নানা গবেষক, ধর্মগুরু, পরিব্রাজক, শ্রদ্ধালুরা ওড়িশার মহনীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়েছেন। ওড়িশার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ভৌগোলিক অবস্থিতি , দর্শনীয় জায়গা বঙ্গীয় মানুষদের কাছে হয়েছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সেই সুখলব্ধ ওড়িশার সারস্বত এবং সাংস্কৃতিক সম্মোহন তাঁদের লেখকীয় জীবনে বিস্তৃর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই উপলক্ষে বঙ্গদেশে কেমন ভাবে ওড়িশাকে নিয়ে বা

ওড়িশা সম্বন্ধে ধারাবাহিক চর্চালোচনা জারি রেখেছে, তার কিছু সূচনা এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হল।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অনেক বাংলা পত্রিকায় ওড়িশার কথা স্থানিত হয়েছে। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত *'নব্যভারত'* পত্রিকার বহু সংখ্যায় তৎকালীন উৎকলের বিবিধ প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। উক্ত পত্রিকার সংপাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী *উৎকলভ্রমণ* শীর্ষকে(১৮৮৯-৯০ সংখ্যায়) ধারাবাহিক ভাবে তাঁর ওড়িশা ভ্রমণের স্মৃতিকে উপস্থাপন করেছেন। এই পত্রিকায় আবার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *মহিমাধর্ম* (১৮৮৭), শ্রীনাথ দত্ত *ময়ূরভঞ্জ* (১৮৯০), ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়ের *কটকে* (১৯০০) প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পুনশ্চ এই সময়ে দুটি প্রসিদ্ধ বাংলা পত্রিকা '*প্রবাসী*' এবং '*ভারতবর্ষ*' উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। *প্রবাসী* (১৯০১) মাসিক পত্রিকার সংপাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং এর কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন আশুতোষ চক্রবর্ত্তি। এলহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস্ থেকে নিয়মিত প্রকাশ পেয়েছিল *প্রবাসী*। তেমনিও বিখ্যাত নাট্যকার এবং গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিকল্পিত *ভারতবর্ষ* পত্রিকা ১৯১৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে কলকাতা পুস্হক প্রকাশন সংস্থা *গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স* দ্বারা। পত্রিকার সংপাদক জলধর সেন এবং সহকারী সংপাদক ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।সুন্দর প্রচ্ছদ মধ্যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবিতে আঁকা পত্রিকার সুশোভন দীর্ঘসময় ধরে পাঠকদের আমোদিত করেছে। এই পত্রিকা দ্বয়ে তৎকালীন প্রব্রজ্যাকারী, ওড়িশাপ্রেমী বঙ্গীয় লেখক বহু উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার মধ্যে সমকালীন ওড়িশাকে অতি নিবিড়ভাবে অনুধ্যান করাযেতেপারে। মুখ্যতঃ শ্রীজগন্নাথ, পুরী, শ্রীচৈতন্য, বৈষ্ণবধর্ম, ধার্মিকস্থলী ইত্যাদি হয়েছে তাঁদের প্রমুখ প্রতিপাদ্য। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শনের অভিলাষ নিয়ে এসে থাকা তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভব, শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচার, জগন্নাথদেবের সঙ্গে তাঁর প্রেমার্ত্তি ভাব, পঞ্চসখাদের সঙ্গে অন্হরঙ্গতাআদি প্রসঙ্গ অনেক প্রবন্ধে স্থানিত হয়েছে। লেখক সারদাচরণ মিশ্রের *উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য* শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ১৯০৪ সালে নিয়মিত ভাবে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।*প্রবাসী*র নানা সংখ্যায় তিনি প্রাচীন ওড়িশার নৈসর্গিক প্রকৃতি, বৌদ্ধধর্মের বিকাশ, শবর-বসু আদি জনজাতিদের প্রসঙ্গকে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করার সঙ্গে দয়ানদী, ধউলি, রাজা অশোকের শাসন, কেশরী বংশ, গঙ্গবংশ, আফগান-পাঠানদের রাজত্ব ঘটনা আদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। পুনশ্চ, শ্রীচৈতন্য দেবের ওড়িশা আগমন সময়ে তাঁর ভ্রমণকরা স্থানের বিবরণী, যথা- বালেশ্বরের জলেশ্বর,

রেমুণা, ক্ষীরচোরা থেকে শুরুকরে যাজপুরের বিরজাক্ষেত্র, মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাটের বর্ণদা উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তেমনি কটকের কাঠযোড়ি নিকটে পৌঁচবার বিবরণী, গড়গড়িআ ঘাটের নামকরণ, ভুবনেশ্বরের কেশরী বংশ, বৌদ্ধগুম্ফা, একাম্রকানন, কেদারগৌরী, মহাবোধি মন্দির, বিন্দুসাগর, ভুবনেশ্বর মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য্য বর্ণনার মধ্যদিয়ে শ্রীচৈতন্যের পুরী আগমনকে খুব সুন্দর ভাবে চত্রিত করেছেন প্রাবন্ধিক। এই প্রবন্ধে তাঁর খোর্দ্ধা ষ্টেসন থেকে সাক্ষীগোপাল, অঠরনলা এবং শেষে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান আদি প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হয়েছে। বঙ্গ-ওড়িশা যাত্রা মধ্যদিয়ে শ্রীচৈতন্যের ওড়িশার নানা স্থান বা ক্ষেত্রভ্রমণ এবং সেখানে রহণি সময়ের বাস্তব চিত্র দিয়েছেন লেখক। গৌরবময় ওড়িশার ইতিহাসকে অবতারণা করে লেখক উৎকলীয় গঙ্গবংশীয় রাজত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন এইমতে : *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সময়ে বঙ্গদেশের স্বাধীন মুসলমান রাজা হোসেন সাহার সহিত চোর বংশীয় উৎকলরাজ প্রতাপরূদ্রের বিগ্রয় চলিতেছিল। প্রতাপরূদ্রদেবের ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপশালী ছিলেন।১৫১০ খৃঃ অব্দে হোসেন সাহার সৈন্যধ্যক্ষ ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা আক্রমণ করের এবং প্রতাপরূদ্রদেব তৎকালে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে থাকায় মুসলমান বীর উড়িষ্যার রাজধানী কটক অধিকার করিয়া পুরী পর্যন্ত দেশলুণ্ঠর করেন। কিন্তু তৎকালের উড়িয়্যা এখনকার মত ছিলনা। তখন উড়িষ্যাবাসী এক জন্তু ছিলনা। শৌর্য্যবীর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। বখ্‌তীয়ার খিলিজী ১২০৩ খৃঃ অব্দে সপ্তদশ জন সৈন্য লইয়া নবদ্বীপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু তিনি উৎকলে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই।মধ্যে মধ্যে মুসলমান বীরেরা উৎকল অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। বাঙ্গালা বিজয়ের পর সাড়ে তিনি শত বৎসর উৎকলবাসীরা মুসলমান সৈন্য সামন্থকে ক্রমান্বয়ে পরাজয় করে। হোসেন সাহার সেন্যাধ্যক্ষঅতি সত্বরই উৎকলত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৫১৫খৃঃ অব্দে অর্থাৎ যে বৎসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথপদদর্শনে গমন করেন, প্রতাপরূদ্রদেবের চতুরঙ্গ সেনা সুবর্ণরেখা পার হইয়া বঙ্গদেশে বিচরণ করিতেছিল। সুবর্ণরেখা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বিগ্রহস্থান হইয়াছিল। কথিত আছে যে গঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা চোরগঙ্গ বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত জয় করয়িাছিলেন। পঞ্চম রাজা অনঙ্গাভীমদেব ১১৭৪*

খৃঃ অব্দ হইতে ১২০২ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। বস্তুতঃ ১৫৬৮ খৃঃ অব্দের পূর্বে কোন মুসলমান যোদ্ধা জিগীষু হইয়া বৈতরণী নদী পার হইতে পারেন নাই। সেই বৎসর নবাব সলিমানের সৈন্যাধ্যক্ষ কালাপাহাড় গঙ্গাবংশীয় রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটে পরাজয় ও নিধন করিয়া বৈতরণী পার হইয়া পবিত্র ওড়্রদেশের পবিত্রতা লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১]

কুমুদবন্ধু সেন তাঁর *উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য* প্রবন্ধেও অনুরূপ ওড়িশার ইতিহাসের বিররণীকে স্থানিত করেছেন। তিনি ব্রন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত* এর আধারে চৈতন্যদেবের কীর্ত্তীগান করার সঙ্গে ওড়িশার পঞ্চসখা, মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ দাস. মাদলাপাঞ্জির নানাবিধ প্রসঙ্গকে উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। উৎকলের সংপর্কে তিনি বলেন : *উড়িষ্যা ধর্মসংস্কৃতির কেন্দ্র, বিশেষ নীলাচলধাম। প্রাচী, চিত্রোৎপলা, বৈতরণীর কূলেকূলে ; উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং ললিতগিরির গাত্রে হিন্দু বৌদ্ধ জৈনধর্ম প্লাবনের দাগ এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। অতীত ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে- গোরক্ষনাথ, মল্লিকানাথ, লোহিদাস, বীরসিংহ, বলিঙ্গাদাস প্রমুখ যোগী-সংপ্রদায়ের যোগধর্ম্মের ধারা নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক দর্শনের ভিতর দিয়া বৌদ্ধ আমলের যোগাচারের সঙ্গে মিশিয়াছিল – জৈনমত ও জৈনদর্শনও সে ধারায় লুপ্ত হয় নাই-গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নীলাচল চারি ধামের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ধাম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্থাপিত গোবর্দ্ধন মঠের একাদশ মঠাধিপতি শ্রীধরস্বামী সকল ধারাকে ভক্তিপথে প্রবাহিত করিয়া ভাগবত ধর্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে এক সমন্বয় স্রোতের উৎস খুলিয়া দেন- সে উৎসক্রমবর্দ্ধমান ভাবে চলিতেছিল। শ্রীচৈতন্য সেই উৎসকে দুকূলপ্লাবী প্রবল প্রেমবন্যায় নীলসিন্ধুতটে এক মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত করেন।*[২]

প্রাবন্ধিক কুমুদবন্ধু তাঁর *শ্রীচৈতন্য ওওড়িয়া জাতি* নামক অন্য এক প্রবন্ধে ওড়িআ জাতির অধোপতনের জন্য শ্রীচৈতন্যকে দায়ী করার প্রসঙ্গকে খণ্ডনকরে এর ঐতিহাসিক সত্যতাকে প্রতিপাদিত করার জন্য প্রয়াস করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *History of Orissa* চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম ওড়িআ জাতের অবক্ষয়ের কারণ বলে যে মতামত প্রদান করেছিলেন এবং তৎসহিত ওড়িশার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তথা উৎকলের নেতা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস তাঁর রচনায় উক্ত মতবাদকে সমর্থন করা এবং সর্বোপরি উভয় ওড়িআ-বাঙ্গালীরা এই মতবাদকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করাকে লেখক বিরোধ করেছেন।প্রতাপরূদ্রদেবের

গৌড়রাজ্য সাথে যুদ্ধ, গৌড়ের পাঠান, বিজয়নগর আর দক্ষিণের বিজাপুর আদিলসাহী, নিজামসাহী, কুতবসাহী রাজ্যের আক্রমণ, বিজয়নগর সাথে সন্ধি, ভোইবিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতা আদি ইতিহাসের ঘটনা ওপরে তিনি আলোকপাত করেছেন; বলেছেন : *পরপর রাজবংশে হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও মুসলমান আক্রমণে সমগ্র ওড়িয়া জাতিকে একেবারে উড়িষ্যা রাজ্যকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব একবার উড়িষ্যা রাজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু কালাপাহাড়ের প্রবল আক্রমণে এবং অন্ত: বিপ্লবে উড়িষ্যার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইল আন্ত:র্হিত ইহা বৈষ্ণবধর্মের দোষ নয়, ইহা অদৃষ্টের পরিহাস। জাতির অধঃপতন হয় আন্তকলহে, স্বার্থপরতায়, অনৈক্য এবং চরিত্রহীনতায়। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না। উড়িষ্যার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। যদি বিজয়নগর ও উড়িষ্যা যুদ্ধবিদ্রোহে নিরত না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইত, তবে শুধু উড়িয়া কেন সমগ্র দক্ষিণভারত ও বাংলা ইতিহাস অনুরূপ হইত। ইহা ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবও ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে ওড়িয়া জাতি বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা উড়িষ্যার ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। তথায় সহজে কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই এবং জোর করিয়া ধর্মান্তর ঘটাইলেও তাহারা আবার বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিতে পারিত। ইহা জাতির দৃ ঢতা রাখিতে কম সাহায্য করে না।*[৩]

এই আলোচনায় লেখক চ্যৈতন্যদেবের আগমনের আগে প্রতাপরূদ্রের বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা,পঞ্চসখাদের সঙ্গে সংপর্ক আদির সবিশেষ বিবরণীও দিয়েছেন।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লিখিত *চৈতন্য যুগের উড়িয়া বৈষ্ণবগণ* প্রবন্ধে ওড়িশার অনেক কবি এবং তাঁদের রচনা সম্বন্ধে আলোকপাত করাহয়েছে। বহুস্থানে তিনি যদিও ওড়িআ কবিদের সারস্বত কীর্ত্তিগান করেন, তবুও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যাদর্শ প্রতি মোহগ্রস্ত রয়েছেন। মাত্র উল্লেখযোগ্য, উক্ত নিবন্ধে ওড়িশার রাজবংশের পরিচয় প্রদানসহ মার্কণ্ড দাসের *কেশব কোইলি*, মাটির মহাকবি সারলা দাসের *মহাভারত*, জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, যশোবন্ত দাসের *শিব স্বরোদয়*, দেবদুর্লভ দাসের *রহস্যমঞ্জরী*সংপর্কে সূচনা দেওয়ার সঙ্গে অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি পঞ্চসখাদের দৃষ্টিতে থাকা চৈতন্যদেবের উচ্চাদর্শকে বিচার করেছেন। এর মধ্যে কটক সাহিত্য প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে এবং কহ্নেই খুণ্টিআ,

ভীমভোই, বৃন্দাবতী দাসী, দীনকৃষ্ণ দাস, সালবেগ প্রমুখ কবিদের নামোল্লেখ করে ওড়িআ কবিদের কেমন চৈতন্যদ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এথিসঙ্গে তৎকালীন ওড়িআ *সহকার* পত্রিকায় জয়দেবকে ওড়িশার কবিভাবে প্রমাণিত করার প্রসঙ্গকে প্রভাত মুখোপাধ্যায় নাবপছন্দ করে ভিন্ন মত দিয়েছেন। মুটামুটিভাবে চৈতন্যপূর্ব ওড়িশার পঞ্চসখা বৈষ্ণব এবং চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবধর্মের এক বিবর্ত্তিত রূপকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন। মাত্র আলোচনার সত্যতা আজও বিতর্কের বিষয়।কিন্তু ১৯৩১ সালে প্রকাশিত এই আলোচনার গুরুত্বকেও অস্বীকার করাযায়না। এই প্রবন্ধে কবি চৈতন্য দাসের সময় নিরূপণ নিয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, এখানে লক্ষ্যণীয় : *উড়িষ্যার সাহিত্য তথা ধর্ম-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে অধ্যাপক আর্ত্তবল্লভ মহান্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'প্রাচী' গ্রন্থমালা পড়া দরকার। উড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার একনিষ্ঠ সেবার অর্ঘ্য এই গ্রন্থমালা। তবে, মতামতের দ্বৈধ চিরকালই সাহিত্যক্ষেত্রেদেখা যায়। তাঁহার অনেক মতওআমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের প্রথম আপত্তি চৈতন্যদাসের সময়-নিরূপণ লইয়া। চৈতন্যদাসও পঞ্চসখার তূল্য প্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি। বুদ্ধেশ্বরের ঔরসে কটক জেলার বড়মূল গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ইনি প্রতারুদ্রের সমসাময়িক। শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন , "He was not their (পঞ্চসখার) contemporary but flourished shortly afterwards." শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বসু মহাশয়ের মতও তিনি খণ্ডন করিতে যান নাই। চৈতন্যদাস নাম শুনিলেও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত এরূপ সন্দেহ হয়। তবে এ বিষয়ে তিনি বলেন, তাঁহার চৈতন্যদাস নাম গুরু দিগম্বর সন্ন্যাসী ধ্যানদাসের প্রদত্ত।*[৪]
তেমনিও ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী *উৎকলে শ্রীচৈতন্য* (নব্যভারত-১৯১৮) শীর্ষকে এক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ওড়িশার ধার্মিক আকর্ষণ এবং প্রভাব বঙ্গীয় জাতীয়-মানসকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রাচীন সময় থেকে সাংপ্রতিক কালখণ্ড পর্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় বাঙ্গালীকে ওড়িশার ধর্মক্ষেত্র, দেবাদেবী, তীর্থস্থান আকর্ষিত করে এসেছে।তীর্থাটন এবং ভ্রমণ উদ্দেশ্যে এসে দর্শনের অনুভবকে তাঁরা শব্দায়িত করেছেন। তাঁদের বহু গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ এই সত্যের দ্যোতক। এর ভেতরে বাঙ্গালী লেখকের স্বাধীনতার পূর্বকালের ওড়িশাকে দেখার আকাংক্ষাকে অনুমান করতে হয়।যেমন : বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের *ভুবনেশ্বর* (প্রবাসী,২য় ভাগ-১৯১০), নির্মল কুমার বসুর *উড়িষ্যার মন্দির* (প্রবাসী-১৯৩১),

কোণার্কের মন্দির (প্রবাসী-১৯৩৩), *ভুবনেশ্বর* (১৯৩৪), *উড়িষ্যার কয়েকটি অখ্যাত মন্দির* (প্রবাসী-১৯৩৮), নূরল আলম চৌধুরীর *পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি* (প্রবাসী-১৯৪৬) ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ির *পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েকদিন* (প্রবাসী-১৯৫০) সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উৎকলের চক্রক্ষেত্রে* (প্রবাসী-১৯৫৩), বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের *ভুবনেশ্বর* (প্রবাসী-১৯৫৬), *পুরুষোত্তম ক্ষেত্র* (প্রবাসী-১৯৫৭), গুরুদাস সরকারের *পুরীর কথা* (ভারতবর্ষ-১৯১৮), পিনাকলাল রায়ের *সাক্ষীগোপাল* বনাম সত্যবাদী (ভারতবর্ষ-১৯৩৩) প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে লেখকদের ভ্রমণতৃষ্ণা, তীর্থাটন এবং ধার্মিক যাত্রাদিকে উপলব্ধি করতে হয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই যে, এ সমস্ত লেখায়কল্পনার অতিরঞ্জন পায়তঃ নেই, আছে সৌন্দর্য্যজনিত অনুভব। সে সময়ের পত্রিকায় কালোসাদা ফোটো মাধ্যমে উক্ত তীর্থস্থান ও কীর্ত্তিরাজির ঐতিহাসিক, ধার্মিক এবং স্থাপত্যের বৈচিত্র্যকে বঙ্গীয় লেখকেরা অতি আত্মীয়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। অনুভব করেথাকার সেই সব চর্চা ওড়িশার ইতিহাস ও সাহিত্যানুশীলনে বেশ্ সহযোগী ।

ওড়িশার ইতিহাস, রাজনীতি, রাজতন্ত্র সংপর্কে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত *History of Orissa* নামে দুখানা গ্রন্থ এর যথার্থ উদাহরণ। পুনশ্চ, বিভন্নি বঙ্গীয় লেখকেরা তাঁদের রচনায় উৎকলের রাজনীতি ও রাজবংশের সূচনা দিয়েছেন।যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসে এ সবুর ছায়া প্রতিফলিত। প্রবন্ধে সাতিত্যেও এ সম্বন্ধে অনেক তথ্যও উপস্থাপিত করাহয়েছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস ১৯২৯ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায় *উড়িষ্যার সাম্রাজ্য কপিলেন্দ্রদেব* নামক এক ইতিহাসধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই লেখার প্রারম্ভে তিনি ওড়িশাবাসীকে ভীরু-কাপুরুষ ভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস করেছেন। বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ওড়িশার চরম অবনতি হয়েছে- এটা তাঁর মত। মাত্র, এই সমস্ঃ আস্ফালনের মধ্যে অতীত উৎকলের গৌরবময় অধ্যায়কেও বর্ণনা করতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েননি। এই প্রবন্ধে স্থানিত ঐতিহাসিক ঘটণাবলী অনুসন্ধানসাপেক্ষ। কারণ, পরবর্ত্তী কালের ওড়িশা ইতিহাসের প্রমুখ ঘটণাপ্রবাহ ঐতিহাসিকদের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে পরীক্ষিত হয়ে লিখিত হয়েছে। রাখালদাস উল্লেখ করেছেন : *উড়িষ্যার রাজা সুদূর দাক্ষিণাত্যেবিশাল বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে লুণ্ঠন করিয়া সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ এবং জগন্নাথের রত্নবেদী নামক সিংহাসন লুণ্ঠন করিয়া*

আনিয়াছিল। কাঞ্চীর রাজ-রাজেশ্বর মন্দির গাত্রে উড়িষা রাজার বিজয়-গাথা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে হুগুলীর সর্বাধিকারী-বংশ এবং মেদিনীপুরের মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর মহাপাত্রগণ উড়িষ্যার রাজাদিগের কৃপায় তাঁহাদের বংশগত প্রাচীন সন্ধানের অধিকারী।[৫]

কপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বকালের গৌরব এবং গজপতি শাসনের মহনীয়তা বর্ণিত হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে। রাখালদাস আবার বলেছেন : আধুনিক যুগের তথাকথিত ভীরু উড়িষার পূর্বপুরুষগণ মহাবীর ছিলেন, তাঁহাদিগের শৌর্য্যে উত্তরে ও দক্ষিণে মুসলমান রাজগণ সর্বদা ত্র্যস্ত থাকিতেন। তাঁহারা সেদিন কাপুরুষ ছিলেন না। আসমুদ্র বিস্হৃত বিজয়নগরের সম্রাটগণকেও আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্হ করয়িা তুলিয়াছিলেন ; *তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। ধর্মরক্ষার জন্য উড়িষ্যার সূর্য্যবংশের সম্রাটগণ বারবার বহমনী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধংসোন্মুখ বরঙ্গলের কাকতীয়বংশীয় রাজগণকে রক্ষা করিয়াছেন। ..... সে সময় হুগলী জেলার দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ আরামবাগ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অধিকারভুক্ত ছিল। ''গজপতি'' উড়িষ্যার রাজার নিজস্ব উপাধি এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে উড়িষ্যার রাজার তূল্য সংখ্যক রণহস্হী ভারতবর্ষে অন্য কোনও রাজার ছিল না।*[৬]

তেমনি বিদ্যাসাগর কে.সি .এস.আইয়ের লেখা *পুরুষোত্তম দেবের শাসনপত্র* (ভারতবর্ষ-১৯১৯), সুরেন্দ্র মোহন বসুর *ময়ূরভঞ্জ রাজবংশ* (নব্যভারত-১৯২০), জনরঞ্জন রায়ের *উড়িষ্যার করদরাজ্য* (ভারতবর্ষ-১৯৩৮), প্রিয়রঞ্জন সেনের *উড়িষ্যায় বর্গীর প্রতিরোধ* (প্রবাসী-১৯৩২), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির *রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও* (প্রবাসী-১৯৩৪), প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের *প্রতাপরুদ্র গজপতি*(প্রবাসী-১৯৪৩), দীনেশচন্দ্র সরকারের *উড়িষ্যার সোমবংশ* (প্রবাসী-১৯৪৪) ইত্যাদি প্রবন্ধগূলিতে ওড়িশার রাজবংশ, শাসন, শাসক, সাম্রাজ্য বিস্তার, শিক্ষা-সংস্কৃতির পতুল ছবিকে প্রত্যক্ষ করাযায়।ওড়িশার তৎকালীনরেভেন্সা কলেজের সুবিখ্যাত বিজ্ঞান অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় বারিপদার ভাবী কীর্ত্তিমান মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও ছিলেন তাঁর ছাত্র। একদা রাজার অনুরোধে তিনি বারিপদা ভ্রমণে এসে সে সম্বন্ধে এক চমৎকার প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। *রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও* শীর্ষকে লিখিত এই ভ্রমণ-প্রবন্ধে তাঁর ভ্রমণজনিত উপলব্ধির সঙ্গে ইতিহাসের নতুন উপাদান এবং তথ্যকে সংযোজিত করেছেন যোগেশচন্দ্র। যথা : *অনেক জানেন মিষ্টার পি-এন বোস (প্রমথনাথ বসু,*

প্রায় এক বৎসর স্বর্গগত) ময়ূরভঞ্জে লোহার আকর আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সে আবিষ্কারের ফলে টাটা-কোম্পানীর বিপুল কারখানার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অনেক জানেন না, বসু-মশায় কি সূত্রে ময়ূরভঞ্জে এসেছিলেন। বসু-মশায়ও আদি বৃত্তান্ত জানতেন না। তিনি ইং ১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে গবর্মেণ্ট ভূবিদ্যা বিভাগের কর্ম হতে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, ডিসেম্বর মাসে রাজার ভূবিদ্যাবিৎ হয়েছিলেন। তার পর ময়ূরভঞ্জের গোরুমহিষানি পাহাড়ে লোহার আকর দেখতে পান।[৭]

ওড়িশায় দীর্ঘ বর্ষের বসবাস এবং বৃত্তিগত জীবনই যোগেশচন্দ্রকে ওড়িশামনস্ক করিয়েছে। তাঁর বিপুল অনুভব ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর অন্য এক প্রবন্ধ থেকেও এই আবেগকে হৃদয়ঙ্গম করাযেতে পারে। *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ বঙ্গাব্দ) '*সত্যবাদী স্কুল*'নামক দীর্ঘ অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন বাংলা ভাষায়। এক সরস্বতী পূজোর দিনে তিনি সত্যবাদী বনবিদ্যালয়ের পরিদর্শনে এসে বকুলবনের ছুরিঅনা কুঞ্জে উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। এই মানুষগড়া কারখানা বনবিদ্যালয়ের শৈক্ষিক পরিবেশ, গরুকূলাশ্রম, ছাত্রদের নিষ্ঠাপর সাধনা, সেবা এবং দেশপ্রেমকে দেখে অভিভূিত হন যোগেশচন্দ্র। সত্যবাদীর পঞ্চসখাদের (গোপবন্ধু, নীলকণ্ঠ,আচার্য্য হরিহর,গোদাবরীশ মিশ্র, গোদাবরীশ মহাপাত্র প্রমুখ) ত্যাগপূত জীবন এবং দেশ-দশের জন্য উৎসর্গীকৃত মনোভাব যোগেশচন্দ্রকে এত প্রভাবিত করেছিল, যাকে তিনি *সত্যবাদী স্কুল* প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন।

বাঙলার স্বনামধন্য পণ্ডিত, গবেষক ও ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ওড়িশার সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্যকে নিয়ে বেশ্ কিছু আলোচনা করেছেন। চর্য্যাসাহিত্য আলোচনায় তাঁর এই পাণ্ডিত্য ও বিদ্‌বত্তাকে অনুভব করাযায়। চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ *নারায়ণ* পত্রিকায় *উড়িষ্যার জঙ্গলে* এবং বৈশাখ ১৩২৩, *প্রবাসী* পত্রিকায় *উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম* নামে দুটি উপাদেয় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে ওড়িশার গড়জাত মহল, পঞ্চসখা সাধকদের সাধনা, প্রতাপরুদ্রদেবের শাসন সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণী সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি স্থাপনে থাকা ওড়িশার উল্লেখনীয় অবদান সংপর্কে আলোচনা করাহয়েছে। আলোচক শাস্ত্রী মহাশয় ওড়িশার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্মের পুনরনুসন্ধান করেছেন তাঁর উক্ত প্রবন্ধে।ওড়িশায় বৌদ্ধধর্মের স্থিতিকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অশোকের শিলালেখ থেকে শুরুকরে ধউলি ও জউগড়ের শিলালেখ, মাদলাপাঞ্জি, ময়ূরভঞ্জের প্রমুখ স্থান, হাতীগুম্ফা শিলালেখ

আদির চর্চা করেছেন প্রসঙ্গক্রম।মহিমাধর্ম এবং ভীমভোইকে তিনি বৌদ্ধধর্মের সংপ্রদায়ভুক্ত করার জন্য প্রয়াস করেছেন। আলোচনাক্রমে ভীমভোইর শূন্যপুরুষ উপাসনা, অলেখধর্মকে বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত করে তিনি শ্রীজগন্নাথকেও বৌদ্ধরূপে অবতারণা করেন। প্রবন্ধকে প্রমাণিক করার জন্য তিনি নগেন্দ্রনাথ বসু মশাইয়ের ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিকাল সর্ভেয়ার থাকার সময়ে ওড়িশায় বৌদ্ধধর্মের স্থিতি অনুধ্যান এবং বৌদ্ধধর্ম সংপর্কিত বহু ওড়িআ গ্রন্থ-সংগ্রহেয় তথ্যাত্মক প্রসঙ্গকে আলোচনা করে *'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'*এ বলরারাম দাস ব্যবহার করে থাকা *নিরঞ্জন* শব্দের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রী মহাশয়। মহমিাধর্ম সংপর্কে তিনি বলেন : *প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম নামে এক নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গের ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম। এ ধর্মেও ভিক্ষা করিতে খাইতে হয়। এ ধর্মের প্রধান গুরু ভীমভোই- ইঁহার পুরা নাম ভীমভোই অরক্ষিতদাস।... নীচ জাতির অন্ন মহিমা-ধর্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুম্ভ নামক গাছের বাকল পরে, সেই জন্য ইহাদিগকে কুম্ভপটিয়া বলে। ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব লীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, '' আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন?'' বুদ্ধদেব বলেন, ''আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু।'' বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে থাকিতে বলেন। তিনিও বারো বৎর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্েহ্ জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া অন্তর্ধান হন।*[৮]

একজন ভ্রমণকারী ভাবে মণীন্দ্রনাথ মুস্েহাফী সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করার পথিকৃৎ হিসেবে সুখ্যাত।১৯২৭ সালে অক্টোবর ১ তারিখ থেকে শুরুকরে ২২ তারিখ পর্য্যন্েহ্ তিনি কলকাতা থেকে পুরীধাম যাত্রা করেন সাইকেলে। ২২ দিনের ভেতরে অতিক্রান্েহ্ পথ ৮২৬ মাইল। কলকাতা থেকে গ্রাণ্ড রোড় ধরে বরাকের বামপথ দিয়ে পুরুলিয়া, রাঞ্চি, চাঁইবসা, টাটানগর, কেন্দুঝর, যাজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর এবং চিলিকা হ্রদ পরিভ্রমণ করে শেষে পুরীধামে পদার্পণ করেন। এই ভ্রমণজনিত আবেগ-অনুভূতিকে তিনি *'দ্বচক্রে ক্যালকাটা হুইলার্স'* নামক ভ্রমণ প্রবন্ধে স্থানিত করেছেন। এই লেখাটি মুস্েহাফীর *'ভ্রমণের নেশা'*বইতেও সংযোজিত। মাত্র এই

শীর্ষকে ১৯২৭ সালে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় (জ্যেষ্ঠ ১৩৩৫বঙ্গাব্দ, ১৫তম সংখ্যা) এর এক সংক্ষিপ্ত অংশ প্রকাশ করেছিলেন। ওড়িশার কেন্দুঝর অভিমুখে যাত্রা করেন অক্টোবর ১২ তারিখে। পথে টাটা কারখানা দর্শন, চাইঁবসা দিয়ে করদরাজ্য কেন্দুঝর যাত্রা। তাঁর এই যাত্রাকালীন অনুভূতি চমৎকার ভাবে চিত্রিত হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে। বৈতরণী নদীর শোভা উপভোগের সাথে গড়জাত অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থানীয় আদিবাসী মানুষের জীবনধারা, চম্পুআর রাস্তা, পলাশপঙ্গা অঞ্চলের মুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক মণীন্দ্রনাথ। কেন্দুঝরে পৌঁচার পর রাজউআস(রাজপ্রাসাদ) এবং গড় দর্শন করে মহারাজা বলভদ্র ভঞ্জদেও এর আতিথ্য লাভ করেন। লেখকের ভাষায় এই অনুভূতি এমন ভাবে : *কিয়ন্‌ঝড় একটী পাহাড়ী সহর। রাজ্যের পরিসর প্রায় ৩০৯৬ বর্গ মাইল। উচুনীচু সুন্দর চওড়া রাস্তাগুলি পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে থেকে, সহরটীকে গড়বন্দী করে রেখেছে। বাড়ীগুলি সবই বাংলো। রাজসরকারে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা ছাড়া সহরে বেশীর ভাগই জংলি ও উড়িয়া। লোকসংখ্যা প্রায় তিনি লক্ষ। কিয়ন্‌ঝড় বহু পুরোন করদ রাজ্য (Feudatory State)। এখানকার বর্ত্তমান রাজা (Chief) বলভদ্র ভঞ্জদেও নাবালক বলে State Superintendent রাজকার্য্য দেখেন। শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ দে প.ঙ.থমহাশয় এখানকার Acting Superintendent. শুনলুম, শ্রীঘ্রই রাজা বাহাদুরসাবালকত্ব পাবেন। এঁর পিতা স্বর্গীয় রাজা গোপীনাথ নারায়ণ ভঞ্জদেও অতিশয় কড়া ও নিপুণ রাজা ছিলেন। উক্ত রাজ্যের বাৎসরিক আয় প্রায় দশ লক্ষ টাকা এবং রক্ষিত জঙ্গলাদি থেকে তিনি লক্ষ টাকা। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির ও দরবার হল দেখবার জিনিষ। রাজা বলভদ্রদেবের পুরোন প্রাসাদথেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে পাহাড় কেটে তৈরী। সে প্রাসাদে একটী অন্ধকারময় দুর্গ বিশেষ। সেইজন্য সেই সেকেলে প্রাসাদে বাস করা অসুবিধে বলে রাজাবাহাদুরের নতুন রাজবাটী নির্মিত হচ্ছে।* [৯]এই আলোচনা ভেতরে তৎকালীন গড়জাত কেন্দুঝরের প্রাকৃতিক সুষমা, ঘণ্ণ অরণ্যানিবেষ্টিত আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা, পথ-ঘাট, নদী-ঝরণা, ঘটগ্রাম, আনন্দপুরের যাতায়াত ব্যবস্থাদি সংপর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আসে পাঠকের মনে। লেখক মণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে কেন্দুঝর সংপর্কে অনেক তথ্য আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

ওড়িশার শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, কলাকৃতির প্রশংসা পড়োশী বঙ্গীয় লেখকদের প্রবন্ধে পরিলক্ষিত। উন্নত কারিগরী ও নির্মাণ-পটু সুনিপুণ ওড়িআ জাতি সমগ্র বিশ্বভুবনে সুখ্যাত। ওড়িশার অসংখ্য মন্দির, শিল্পকলা, কারুকার্য্য সকল মানুষকে

মোহাচ্ছন্ন করে। ভ্রমণপ্রিয় বঙ্গবাসী এই সৌন্দর্য্যকে বেশ্ নিবিড়ভাবে আহরণ করেছেন। তাই বঙ্গীয় লেখকদের লেখনীতে ওড়িশার যাবতীয় প্রসঙ্গ রূপ পেয়েছে। যেমন : কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের *জগন্নাথ দর্শন* (নব্যভারত-১৯০০), সদাশিব কাব্যকণ্ঠের *জগন্নাথদেবের মন্দির* (নব্যভারত-১৯০৬), নির্মল কুমার বসুর *উড়িয়া মন্দির* (নব্যভারত-১৯২৪), *পুরীতে আবিষ্কৃত একটি মূর্ত্তি* (প্রবাসী-১৯৪৫), ফণীন্দ্রনাথ বসুর *ময়ূরভঞ্জের শিল্প* (প্রবাসী-১৯২৬), *ভারতীয় শিল্প ও ময়ূরভঞ্জ*, দেবপ্রসাদ ঘোষের *উড়িষ্যার মণ্ডণ শিল্প* (প্রবাসী-১৯৩০), আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের *বরাকের প্রাচীন উড়িষ্যার হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন* (ভারতবর্ষ-১৯৩৩), মহীতোষ বিশ্বাসের *উড়িষ্যার গ্রমপথ* (প্রবাসী-১৯৫৭) প্রভৃতি লেখায় দেশ-বিদেশে থাকা ওড়িশার কলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অনুভব করাযায়। দেবপ্রসাদ ঘোষ বলেন : *প্রাচীন উৎকলবাসী পাষাণশিল্পে যে নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য দেখাইয়াছে তাহা জগতের শিল্পকলা-রাজ্যে এবং শিল্পকলার ইতিহাসে চিরদিনই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। এই কারুকার্য্যে বিশেষভাবে চিত্রালঙ্কার ও রূপসৌন্দর্য্যের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। উড়িয়া-শিল্পী নব নব রূপের কল্পনা করিয়া এবং নব নব মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যে আনন্দলাভ করিত, তাহা বোধহয় আর কোন জাতি এই শিল্পের সাধনা হইতে লাভ করিতে পারে নাই। এই শিল্প-সাধনা তাহার জীবন-ধারার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে এমনই মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের চিত্তের সমগ্র ভাব-ধারা নয়নাভিরাম অলঙ্কার-ধারারূপে প্রকাশিত হইত। উড়িয়া শিল্পী কেবলমাত্র কাল্পনিক চিত্রচাতুর্য্য দেখাইয়াই ক্ষান্হ হয় নাই। দেবমন্দিরকে শ্রী-সম্পদে এ শোভার ঔজ্জল্যে ভূষিত করিবার জন্য প্রাচীন আসিরীয়গণের ন্যায় সে প্রাণী-জগতেও আশ্রয় লইয়াছে। সেখান হইতে আপনার রূপতৃষ্ণার ও রূপকল্পনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। যে দৃষ্টি বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার গঠনভঙ্গীর অন্হরালে রস-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায়, যে দৃষ্টি দ্বারা শিল্পী জাতি তুচ্ছ ও হেয় বস্তুর মধ্যে আপনার শিল্পকলার প্রেরণা পায় এবং যে কল্পনা থাকিলে, সেই অন্হরের বস্তু-স্বতন্ত্র রূপ-সৌন্দর্য্য অভিনব শ্রী ধারণ করে এবং এক অবান্হর কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সে দৃষ্টি উড়িয়া শিল্পীর ছিল। তাহা না হইলে সে বনের পশুপক্ষীর গঠনভঙ্গীটুকু প্রস্হরগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিত না। আজ যে জগতের সুসভ্য দেশের সুধী ও সহৃদয় সমালোচকগণ উড়িয়া শিল্পীর প্রস্হর ক্ষোদিত লতাপাতা ও জীবজন্তু দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেছেন, সেই শিল্পের মূল যে কতখানি গভীরতা ওরসবস্তুর অনুভূতি আছে, তাহা বর্ত্তমানের সাধারণ শিল্পীর বা*

সাধারণ দর্শকের কল্পনার অতীত। বর্ত্তমানে এমন কোন মণ্ডণ-শিল্প-বিশারদ আছেন কিনা জানি না, যাঁহার বা যাঁহাদের শিল্প-কল্পনা উড়িয়া-শিল্পীর সান্নিধ্যলাভের দাবী করিতে পারে। উড়িয়া শিল্পী প্রাণীজগৎ হইতে কত মনোহর আকৃতি , কত সুন্দর অঙ্গবিন্যাস, কত সুঠাম ভঙ্গী, কত বিচিত্র চলন আপনার শিল্প-কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রোজ্জ্বল ওভাস্বর রূপচ্ছটায় দেবমন্দিরের গাত্রকে ভূষিত করিয়াছে। যে পশুপক্ষীর আকৃতি বা শক্তি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বা যাহাদিগের নিকট মানুষ উপকারের ঋণে আবদ্ধ ছিল কিংবা যাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি মানবচিত্তে ত্রাস উৎপন্ন করিত তাহাদের সকলে উড়িয়া-শিল্পীর শিল্প-সাধনায় যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছিল।[১০]

পুনশ্চ, ওড়িশার লোকসংস্কৃতি চর্চায় বঙ্গীয় গবেষক এবং লেখকেরাও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঝোটি-চিতা(আল্‌পনা), মুরুজ, আঁকার কলা-কৌশল ওড়িশা-সংস্কৃতির এক প্রমুখ বৈশিষ্ট্য। পূজাপার্বণ, ওষাব্রত এবং ধার্মিক অনুষ্ঠানে আল্‌পনা এক জরুরী আবশ্যকতা বাসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে পরিলক্ষিত। এই মহনীয় লোককলাকে নিয়ে ফণীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন *উড়িষ্যার আল্‌পনা* (প্রবাসী-১৯২৭)। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ওড়িশায় প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন আল্‌পনার ছবি সহ তার ব্যাবহারিক দিকের পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর মত : *উড়িষ্যায় আল্‌পনা 'ঝুঁটী' নামে পরিচিত। এইসব ঝুঁটি দেয়ালের গায়ে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজার সময় দেখা যায়। কিন্তু পূজা-পার্বণ ছাড়াও অনেক সময় শুধু দেয়াল সাজাবার জন্যও অনেক রকম আল্‌পনা দেয়ালে দেওয়া হয়। যেমন অনেক সময় দেয়ালে শুধু এক রথের আল্‌পনা দেওয়া হ'য়। এর সঙ্গে অবশ্য ধর্মের একটু সম্বন্ধ আছে। কারণ, উড়িষ্যায় রথের সঙ্গে সাধারণে খুব পরিচিত, বিশেষ জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে। .... এই আল্‌পনার বিশেষত্ব এইযে, এগুলি একান্তই মেয়েদের সম্পত্তি। যদিও তাঁরা কোন আর্টস্কুলে শিক্ষা পান না, তবুও খুব সুন্দরভাবে তাঁরা এগুলি আঁকেন।*[১১]

তেমনি বৃন্দাবন নাথ শর্মার লিখিত *'উড়িষ্যার লোকসাহিত্য'* (প্রবাসী-১৯৪৫, ২য় খণ্ড) প্রবন্ধে ওড়িআ *'বারমাসী কোইলি'* সম্বন্ধে আলোচিত এবং পুরীতে বসবাস করে থাকা যাযাবর 'কেলা' সংপ্রদায় মধ্যে প্রচলিত 'বাঁউশরাণী' গীতকেও আলোচনা করা হয়েছে। *'গাথার দেশ উড়িষ্যা'* (প্রবাসী-১৯৫৪, ২য় খণ্ড) প্রবন্ধে লেখক চিত্তরঞ্জন দেব ওড়িশার বিভিন্ন লোকগীত, কৃষকগীত, সাইযাত, পাটুআযাত্রা, বন্দনা গীতিকা, বিরহ সঙ্গীত আদির পরিচয় দিয়েছেন। ওড়িআ সাহিত্যের নানাবিধ বিভাগকে নিয়ে বঙ্গসাহত্যে আলোচনা হয়েছে। বঙ্গীয় লেখকেরা তাঁদের লেখায় এই

বিষয়বস্তুকে স্থানিত করেছেন অন্তরঙ্গ ভাবে। যেমন : জগৎ মোহন সেনের *‘উৎকলের প্রাচীন কাব্যসম্পদ’* (ভারতবর্ষ-১৯৩০), প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের *‘বাংলা ধর্ম সাহিত্যে উড়িয়া পদকর্ত্তা’* (প্রবাসী-১৯৩৩), শশীভূষণ দাশগুপ্তের *‘উড়িয়া শাক্ত সাহিত্য’* (প্রবাসী-১৯৫৯), প্রিয়রঞ্জন সেনের *‘উড়িষ্যার ভক্তকবি মধুসূদন’* (প্রবাসী-১৯৬১) প্রভৃতি প্রবন্ধালোচনা বঙ্গীয় প্রাবন্ধিকদের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্ত লেখার মধ্যে ওড়িআ ভাষা-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক এবং পর্য্যায়কেও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, ১৯১৮ সালে ধারাবাহিক ভাবে *‘ভারতবর্ষ’* পত্রিকায় রমেশ চন্দ্র দাশ *‘উৎকল সাহিত্য’* শীর্ষকে বহু ওড়িআ লেখার আলোচনা এবং অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাগ্মী বিশ্বনাথ করের প্রবন্ধ ও তাঁর ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ থেকে নির্বাচতি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এরসঙ্গে *‘মুকুর’*, *‘পরিচারিকা’* এবং জগবন্ধু সিংহ এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *‘প্রাচীন উৎকল’* থেকে প্রবন্ধ নির্বাচন করে তার অনুবাদও করেছিলেন। এই মতো অনেক প্রবন্ধ বহু বঙ্গপত্রিকা মণ্ডন করেছে, যার মধ্যে ওড়িশার বিবরণী এবং স্মৃতি-অনুভূতি স্থানিত। যেমন: দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর *‘উৎকলে-দুর্ভিক্ষ’* (নব্যভারত-১৯০৮), কামাক্ষা প্রসাদ বসুর *‘ময়ূরভঞ্জে ত্রিপুরা’*(নব্যভারত-১৯২০), লালমোহন চট্টোপাধ্যায়র *‘কটকে মহাত্মাগান্ধী’* (নব্যভারত-১৯২১), লাবণ্যরেখা দেবীর *‘বসন্ত কুমার দেবী ও পুরী বিধবাশ্রম’* (প্রবাসী-১৯৩১), হেমেন্দ্রলাল রায়ের *‘পুরীর ডায়রী’* (প্রবাসী-১৯২৪), রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের *‘উড়িষ্যা ও ভারতবর্ষ’* (প্রবাসী-১৯৫৯), উমাপদ চক্রবর্ত্তির *‘উড়িষ্যার জঙ্গলে তেষঠি দিন’* (ভারতবর্ষ-১৯৩৯), বীরেন্দ্রনাথ রায়ের *‘জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্ত্তির পরিচয়’* (ভারতবর্ষ-১৯৩৯) আদি প্রবন্ধে ওড়িশা-চর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাসকে অনুমান করাযেতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে অনুমিত হয়যে, স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে শুরুকরে দীর্ঘ শতাব্দীর উর্দ্ধকাল ধরে এযাবৎ পড়োশী বঙ্গদেশে ওড়িশা-চর্চ্চা বিশেষভাবে গতিশীল। সেই সমস্ত আলেখ্য বা প্রবন্ধের মধ্যে ওড়িশার অতীত-ঐতিহ্য, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, পরম্পরা, শিল্প-ভাস্কর্য্য, ধর্ম, পর্য্যটন, ভ্রমণ আদির সূচনা সঙ্গে উৎকলের ভৌগোলিক রূপচিত্রকেও অনুধ্যান করাহয়। বঙ্গীয় লেখকেরা ওড়িশার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন, তার ইতিহাস , সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন সংপর্কে অবহিত হয়ে ওড়িআ-অস্মিতাকে স্বীকার করেছেন, উপরোক্ত প্রবন্ধই সেই সত্যকে প্রতিপাদিত

করেছে। অতীতের মত আজও বাংলা পত্র-পত্রিকায় ওড়িশার কথা নিরন্তর আলোচনা চলছে। প্রবন্ধের মত ওড়িশা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বই প্রকাশিত হয়ে পাঠকাদৃত লাভ করেছে । বিখ্যাত গবেষক বিজিয় চন্দ্র মজুমদার, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশির কুমার দাশ, অপূর্ব কুমার রায় প্রমুখ লেখকেরা তাঁদের পুস্তক এবং প্রবন্ধে ওড়িশার সমৃদ্ধ ইতিহাসকে স্বীকার করেছেন। দুই পড়োশীর মধ্যে সুসংপর্ক, ধার্মিক-সাংস্কৃতিক একতা, পরস্পরের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে প্রভাবিত করেএসেছে, উক্ত আলোচনায় তার সত্যতা প্রমাণিত।

সংকেত টীকা :

১. প্রবাসী :জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, ৪র্থভাগ, ২য় সংখ্যা
২. প্রবাসী : বৈশাখ ১৩৪২, ৩৫ সংখ্যা, প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা-৮
৩. প্রবাসী : শ্রাবণ,১৩৪৪, ৩৭ সংখ্যা, প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা-৫৭১
৪. প্রবাসী : আশ্বিন,১৩৩৮, ৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড, , পৃষ্ঠা-৮৮৩
৫. প্রবাসী : আষাঢ,১৩৩৬,২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩৭৭
৬. প্রবাসী : আষাঢ,১৩৩৬,২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩৭৭/৭৮/৭৯
৭. প্রবাসী : কার্ত্তিক,১৩৪১, পৃষ্ঠা-২২
৮. নারায়ণ : চৈত্র, ১৩২২, উড়িষ্যার জঙ্গলে
৯. ভারতবর্ষ- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ১৫শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৮৯৪
১০. প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ-১৩৩৭,৩০শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৪৩/৪৪
১১. প্রবাসী : আশ্বিন-১৩৩৪, ২৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৭৮৫

মধুসূদন দত্তের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ও সমকালীন রাজনীতি

কৌশিক দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : সমাজের নানান স্তরে রাজনীতি শুধু আজকের দিনে নয়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমকালীন সাহিত্যেও এর বিশেষ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্যজগতে যেমন মৌলিক নাটকের স্বাদ দিয়েছিলেন তেমনি বেলগাছিয়ার রাজাদের অনুরোধে দুটি প্রহসনও লিখেছিলেন। উদ্দেশ্য- বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয় ও সমকালীন সামাজিক সমস্যার উন্মোচন। কিন্তু প্রহসনদুটি সেখানে মঞ্চস্থ তো হতে দেওয়া হয়নি, এমনকি দ্বিতীয় প্রহসন ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (পূর্বনাম ছিল ‘ভগ্ন শিবমন্দির’) এর শিরোনাম পর্যন্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কিন্তু একজন মহান নাট্যকারের লেখা নাটকের উপর এমন আক্রমণ হল কেন? কেনই বা তিনি এরপর আর কোন প্রহসন লিখলেন না? কেন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন বাংলায় আর তিনি প্রহসন লিখবেন না, যদি লেখেন তাহলে হিব্রু কিংবা চাইনিস ভাষায় লিখবেন। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের এমন সামাজিক, রাজনৈতিক চাপ এসেছিল মধুকবির উপর। আলোচ্য গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দুই হল সমকালীন সেই রাজনীতির উৎস সন্ধান।

সূচক শব্দ : মধুসূদন দত্ত, প্রহসন, রাজনীতি, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, আক্রমণ।

মূল আলোচনা:

রাজনীতি শব্দটির সাথে আমরা সবাই বিশেষভাবে পরিচিত। সমাজের নানান স্তরের রাজনীতি শুধু আজকের দিনে নয়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমকালীন সাহিত্যেও এই রাজনীতির বিশেষ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। মহাকবি মধুসূদন দত্ত মহাকাব্যের জগৎ থেকে একটু সরে এসে বাংলা নাটকের প্রয়োজনে নাটক লেখা শুরু করেন। আর বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রয়োজনে লেখেন দুটি প্রহসন- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’(১৮৬০) ও ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’(১৮৬০)। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই দুটি প্রহসনের কোনটাই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থের জন্যে লেখা হলেও সেখানে তা মঞ্চস্থ হতে পারেনি। বলা যেতে পারে মঞ্চস্থ হতে দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনটির শিরোনাম পর্যন্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। এর পূর্বনাম ছিল ‘ভগ্ন শিবমন্দির’। বেলগাছিয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই শিরোনাম পালটে ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কেন?

এর পিছনে লুকিয়ে আছে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের নোংরা রাজনীতি। বিশেষ করে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি অভিনীত না হওয়ার পিছনে আছে গভীর ষড়যন্ত্র।

আঠারো-উনিশ শতকের সমাজের দিকে যদি আমরা একটু দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো, তখনকার দিনের সমাজের চাকা গড়াতো বাকসর্বস্ব মুখ্য বা তথাকথিত প্রধানের অঙ্গুলিহেলনে। সেই সমাজে কেবলমাত্র মদ্যপানই খারাপ পথে যাবার একমাত্র পথ ছিল না, পথ আরো ছিল। মানুষের জৈব প্রবৃত্তি তাকে অন্য পথে চালনা করতে পারে। আসলে সমাজে যারা মাথা, তাদের স্বনির্বাচিত একটি ক্ষেত্র ছিল। সেখানে তাদের কথাই শেষ কথা। আর এই ক্ষমতা তারা লাভ করতো দুটি দিক থেকে,- এক) সামাজিক প্রতিপত্তির দিক থেকে, দুই) আর্থিক প্রতিপত্তির দিক থেকে। এই ক্ষমতার জন্য যেমন নির্দিষ্ট কোন বয়স লাগে না, তেমনি বয়সের কোন উর্ধ্বসীমাও লাগে না। তৎকালীন সমাজে এ এক কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সেই সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন -

> "অর্থ দ্বারা ষাট বৎসর বয়স্ক যে ব্যক্তি ষোড়শী কন্যার পানিগ্রহণ করে, সেও এই বৃত্তির তাড়নায়ই এই কাজ করিয়া থাকে, ইহার মধ্যে সমাজের সমর্থন আছে বলিয়ে ইহাকে ব্যভিচার বলা হয় না, কিন্তু তথাপি ইহা ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নহে। সামাজিক প্রতিপত্তিও ইহার সহায়ক। যাঁহাদের অর্থনৈতিক কিংবা অন্যান্য কারণেও সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহারাই সমাজ নীতিকে লঙ্ঘন করিবার শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজের বশ হন না, বরং সমাজ তাঁহাদেরই বশীভূত বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন - তাঁহারাও সমাজের মধ্যে নৈতিক ব্যভিচারে লিপ্ত হন।" [১]

অতৃপ্ত জৈব তৃষ্ণা মানুষের মনে ব্যভিচারের প্রেরণা দিয়ে থাকে। বয়স পেরিয়ে গেলে কোন পুরুষের যদি সামাজিক প্রথা মেনে বিয়ে করতে অসুবিধে থেকে থাকে তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি। স্ত্রী না থাকলে জৈবিক ক্ষুধা চরিতার্থের জন্য কোন প্রভাব প্রতিপত্তিবান সমাজপতিও এই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। কলকাতায় ইংরেজের আবির্ভাবের সাথে সাথে একদিকে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন, অন্যদিকে বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রিক কলকাতার নাগরিক জীবনে চাকুরীজীবির আবির্ভাবের ফলেই প্রধানত উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ব্যভিচার লক্ষ্য করা যায়। পল্লীসমাজে দেখা দেয় এমনই এক শ্রেণির বিলাসী জমিদারদের। যাদের বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল তৎকালীন পল্লীসমাজ। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আরও জানিয়েছেন -

> "নৈতিক ব্যভিচার যে কেবলমাত্র মদ্য এবং পতিতার সঙ্গেই জড়িত ছিল, তাহাই নহে... সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা চিরকালই নিজের রুচি এবং মনোবৃত্তি অনুযায়ী ইহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যে উল্লেখযোগ্য নাটক

> বা প্রহসনটি রচিত হইয়াছিল তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’;” [২]

ফলে বোঝাই যাচ্ছে মদ কিংবা ইংরেজি শিক্ষাই শুধু উনিশ শতকের সমাজকে কলুষিত করেনি। ভন্ড জমিদার শ্রেণির কিছু মানুষ, যাদের সমাজ মাথায় করে রাখে, তারাই ধর্মের নামে অধর্মাচারণ করে বেড়ায়, তারাই সমাজের নিয়মের দুর্ব্যবহার করে। অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত পরিবারের মেয়েদের টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের সম্মানহানি করে। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে মধুসূদন দত্তের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনটিতে। প্রহসনটির বিষয় পর্যালোচনা করলেই আমরা এর সত্যতা সম্বন্ধে জানতে পারবো।

কলকাতার কাছাকাছি কোন এক গ্রামে ভক্তপ্রসাদ নামক এক বৃদ্ধ জমিদার বাস করতো। সে ছিল পরম বৈষ্ণব। তার মুখে সবসময় হরিনাম লেগে থাকতো, আর হাতে থাকতো জপের মালা। তার প্রজা হানিফ গাজী। এক অজন্মার বছর হানিফ তার প্রদেয় খাজনা ভক্তপ্রসাদকে দিতে পারেনি। ভক্তপ্রসাদ অবশ্য হানিফের নতুন বিয়ে করা বৌ ফতেমার কথা শুনে হানিফের খাজনা মুকুবও করে দিতে চায়। সে চাকর গদাকে ও পুঁটিকে টাকা দেয় ফতেমাকে পাওয়ার জন্যে। সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে হানিফ ও বাচস্পতি ভক্তপ্রসাদকে উচিত শিক্ষা দেয়। শেষে ভক্তপ্রসাদ অঙ্গীকার করে-

> “আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।” (দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অবশ্য ভক্তপ্রসাদ চরিত্রটিকে কাল্পনিক বলেছেন। তাঁর মতে এমন চরিত্র তৎকালীন সমাজে ছিল না। এটা মধুসূদন দত্তের অতিরঞ্জিত সৃষ্টি। তিনি বলেছেন কোন হিন্দু জমিদার কর্তৃক কোনো মুসলমান নারীর প্রতি এমন আসক্তি স্বাভাবিক নয়।

> “...পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের বর্ণিতরূপ ভক্তপ্রসাদ কয়জন আছেন? কই পাঠকগণ! ওরূপ জমিদার সচরাচর দেখিতে পান কি? ফলতঃ এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে।” [৩]

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বৃদ্ধ জমিদারের ভিন্ন ধর্মের নারীর প্রতি আকর্ষণকে তিনি অস্বাভাবিক বলে মনে করেছেন। আসলে বার্ধক্যেও অনেকের মনের অগোচরে কামনা-বাসনা সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। আর তা বিশেষ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকে। পুরাণেও তো আমরা দেখেছি রাজা যযাতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর জরাগ্রস্থ শরীরটাকে পুত্র পুরুর কাঁধে ফেলে পুত্রের যৌবন নিজে নিয়ে সহস্র বছর ধরে যৌবন সুখ ভোগ করেছেন। ফলে

অনেকের মধ্যেই যৌবন বিগত হলেও যৌবন সুখ ইচ্ছে থেকে যায়। আর তার জন্য তারা সুযোগ খোঁজে,- কখনো পায়, কখনো পায় না। এখানে বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ একা থাকে বাড়িতে। অর্থের কোন অভাব নেই। একমাত্র পুত্র অম্বিকাপ্রসাদ কলকাতায় থাকে পড়াশোনার জন্য। ফলে তার সুবর্ণ সুযোগ। এই ভক্তপ্রসাদ অত্যন্ত কামক্ষুধাতুর চরিত্র, যে বাইরে ভক্তিভরে পূজার ভান করে, কিন্তু অন্তরে কামকে পোষণ করে। ফলে গ্রামেতে ভক্তপ্রসাদের মত চরিত্র নেই এ কথা বলা যাবে না। তাই রামগতি ন্যায়রত্নের মন্তব্যকে কখনোই সঠিক বলা যাবে না। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রহসনটির বাস্তবতা ঠিক খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন -

> "আমাদের বিবেচনায় বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার বর্ণিত ঘটনার কিছুমাত্রই অস্বাভাবিক নহে। নাটকীয় পাত্রগণের দুই একটি কথা আপত্তিজনক থাকিতে পারে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়টি বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতার' ন্যায় ইহাও মধুসূদন তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন নিকট সম্পর্কিত আত্মীয় ভক্তপ্রসাদ রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন এবং হানিফ গাজী, পাঁচিতেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন কোন স্ত্রী পুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণ এখনো রাজত্ব করিতেছেন। উপধর্মের আক্রমণে হিন্দুধর্মের যে ক্ষতি না হইয়াছে, হিন্দু নামধারী এইরকম ভক্তপ্রসাদগণের দ্বারা তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতি হইতেছে। ইহারা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে কীটরূপে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। নব্য সম্প্রদায়ের শাসনের জন্য যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ন্যায় গ্রন্থের আবশ্যক, তেমনি এইরকম ভক্তপ্রসাদগণের দন্ডের জন্য বুড়ো সালিকের ঘাড়ের রোঁয়ার ন্যায় প্রহসনের প্রয়োজন।" [৪]

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে সে যুগের সমাজের এক জ্বলন্ত ছবি ধরা পড়েছে ভক্তপ্রসাদ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। এমন চরিত্র যে মধুসূদন দত্তের কল্পনাজাত নয়, ভক্তপ্রসাদের মত ভন্ড হিন্দু জমিদার সেই সময় সমাজে ছিল। আর তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হত সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ ও নারীরা। পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভক্তপ্রসাদ চরিত্রকে যতই অস্বীকার করুন না কেন, ভক্তপ্রসাদ যে কতটা বাস্তবজাত তার একাধিক প্রমাণ আমরা পাই সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ প্রহসনটির নাম পরিবর্তন। প্রহসনটি প্রথম যখন মধুসূদন দত্ত লিখে ফেলেন তখন তিনি এর নাম রেখেছিলেন 'ভগ্ন শিবমন্দির'। এই তথ্য জানা যায় ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে। এই চিঠিতে তিনি তাঁর কাছে এই প্রহসনটির পরিণাম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন – 'What about the farce, The ভগ্ন শিব মন্দির?' ক্ষেত্রমোহনবাবু মধুসূদন দত্তের

চিঠি পেয়ে কি উত্তর দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি, কিন্তু আমাদের মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়, 'ভগ্ন শিবমন্দির' নামটি তিনি পরিবর্তন করলেন কেন? কোন্ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রহসনকার প্রহসনটির নাম পরিবর্তন করলেন? যদিও সাহিত্যের নাম পরিবর্তন সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাহিত্যের গুণাবলী বিচার করে ভাবনা চিন্তা করে কোন গ্রন্থের নাম একাধিকবার পরিবর্তন করতে আমরা দেখেছি। কিন্তু এখানে কারণটা ছিল অন্যরকম।

ভগ্ন শিবমন্দির এই প্রহসনের ক্লাইম্যাক্সের পশ্চাৎপট। সেজন্যেই প্রহসনকার প্রথমে প্রহসনের নাম রেখেছিলেন 'ভগ্ন শিবমন্দির'। এছাড়া জমিদার ভক্তপ্রসাদ বৃদ্ধ বলেই বহু জীর্ণতার দাগ রয়েছে তার মধ্যে। ভগ্ন শিবমন্দিরে যেমন বহু নোংরা আবর্জনা থাকে, তেমনি বুড় ভক্তপ্রসাদের মধ্যেও আছে নোংরা আবর্জনা। সেদিক থেকে এ প্রহসনের প্রাথমিক নামকরণটি সার্থক ছিল। কিন্তু সমস্যা হল এখানেই। প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় এমনকি জমিদারশ্রেণি এর বিরোধিতা শুরু করলো। তাদের মতে -

১। শিব হলেন ঈশ্বর। তাঁর মন্দির কখনো ভগ্ন হতে পারে না।

২। প্রহসনে দেখানো হয়েছে মুসলমান ফতেমাকে ভগ্ন শিবমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একজন বিধর্মী নারীর দেবালয়ে প্রবেশ এটা তারা মেনে নিতে পারেনি।

৩। ভক্তপ্রসাদকে এখানে হীন করে দেখানো হয়েছে, ফলে তার মত এমন কিছু জমিদার সেই সময় ছিল, যারা প্রহসনের বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি।

তাই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য লেখা হলেও সেখানে এটি মঞ্চস্থ হতে পারেনি। গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় ও কিছু জমিদার শ্রেণির কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতা এলো এর বিরুদ্ধে। তাই বেলগাছিয়া থিয়েটারের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় বাধ্য হয়েছিলেন প্রহসনের নাম পাল্টে দিতে। আবার শুধু নাম পরিবর্তন করেও সমস্যার সমাধান হয়নি, প্রহসনটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হতে দেয়নি। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদন জীবনীকার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসুকে পত্রে লিখেছিলেন -

> "I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of 'Young Bengal' and the other those of the old Hindus and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre." [৫]

পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছিলেন, মধুসূদন দত্ত তাঁর দুটি প্রহসন বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চস্থের জন্যই লিখেছিলেন, সেখানে অভিনয়ের জন্য রিহার্সালও হয়ে

গিয়েছিল, তবু প্রহসনটি সেখানে মঞ্চস্থ হয়নি। এটা নিয়ে মধুসূদন দত্ত প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন -

> "Mind, you broke my wings once about the forces; if you play a similar strick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese." [৬]

এখান থেকেই স্পষ্ট সেই সময়ে সমাজে রাজনীতি কতটা ভয়ঙ্কর ছিল। একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের লেখা নাটক রিহার্সালের পরেও অভিনয় হল না। কেবলমাত্র কোন একটি শ্রেণি বা একটি সম্প্রদায়ের জন্য। তারা ঠিক প্রহসন দুটি বন্ধ করে দিল। আর বেলগাছিয়ার রাজারা পর্যন্ত কিচ্ছুটি করতে পারলেন না। মধুসূদন দত্ত হিব্রু কিংবা চাইনিজ ভাষায় প্রহসন হয়তো লেখেননি, কিন্তু বাংলাতেও তিনি আর প্রহসন লেখার জন্য কলম ধরেননি।

তথ্যসূত্র :

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সামাজিক নাটকে বিবর্তন', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৪, পৃ- ৩০৯-৩১০।

২। তদেব, পৃ- ৩১৩-৩১৪।

৩। রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', হুগলী, বুধোদয় যন্ত্রে, শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯৩০(১৮৭৩), পৃ- ২৬৮।

৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তে জীবন-চরিত', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৯০৫, পৃ- ৩০৬-৬০৭।

৫। তদেব, পৃ- ৬৭৭।

৬। তদেব, পৃ- ৬৭৭।

নদিয়ার উলা-র উলাইচন্ডী মেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য : একটি পর্যালোচনা

নারায়ণ নন্দী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ : উৎসবপ্রিয় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।সারা বছর তার কোন না কোন আনন্দ-উৎসব লেগেই আছে,সে ধর্মীয় উৎসব বা সামাজিক উৎসবই যা কিছু হোক না কেন ? এছাড়া অঞ্চলভেদে রয়েছে বহু ধর্মীয় ও আঞ্চলিক উৎসব এবং লোকসংস্কৃতি। আর এই আনন্দ-উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে।বহু মানুষের সমাগম ঘটে।নদিয়া জেলাতেও অঞ্চলভেদে এইরকম বহু আঞ্চলিক উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।এই রকমই একটি উৎসব হলো নদিয়ার উলা তথা বীরনগরের উলাইচণ্ডীর প্রাচীন মেলা।যে মেলায় মিশে আছে স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় ঐতিহ্য,বিশ্বাস,রীতিনীতি,প্রথা।এই প্রাচীন মেলা ঘিরে রয়েছে মিথ,রয়েছে অনেক কল্পকথা।বীরনগর তথা প্রাচীন উলা গ্রামে উলাইচন্ডী দেবী প্রাচীন বটগাছের নিচে সারাবছর পূজিতা হন।গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে ইঁট দিয়ে বাঁধানো বেদীর উপর রক্ষিত সিঁদুর মাখানো একটি পাথর,যাকে চন্ডীর ধ্যানে পূজা করা হয়।এই পাথর খন্ডটি উলাইচণ্ডী দেবীর প্রতীক।কিন্তু প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে মহাসাড়ম্বরে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।জনশ্রুতি আছে যে শ্রীমন্ত সদাগর এখানে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বটবৃক্ষতলে চন্ডী দেবীকে স্থাপনা করার পর নিয়মিতভাবে দেবীর পূজা হতো না।পরবর্তী সময়ে নদীয়ারাজ রাঘবেন্দ্র রায় দেবীর নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করেন।কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে তিনি উলা ছুঁয়ে গিয়েছেন বলে উল্লেখ আছে।উলাইচন্ডী নাম থেকে স্থানের নাম উলা হয়েছে বলে মনে করা হয়।আবার অন্য একটি মতও প্রচলিত আছে যে এই অঞ্চল উলুবনে ভর্তি ছিল,উলু কেটে গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয় বল এর নাম উলা।আবার কেউ কেউ মনে করেন ইরানী শব্দ 'আউল' বা 'জ্ঞানী' থেকেই এর নাম 'উলা' রাখা হয়েছিলএই মেলা কয়েক শত বছর ধরে এখানে চলে আসছে।উলাই দেবীর পূজা ও মেলা উপলক্ষে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে।খুব ভোর থেকেই মেলা শুরু হয়ে যায়।জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ উলা তথা বীরনগরের মেলায় আসেন।মেলাতে দর্শনার্থীরা এই বিশ্বাস নিয়ে পুজো দেন যে দেবী তুষ্ট হলে শান্তি ফিরবে,রোগ ব্যাধি সারবে,মনস্কামনা পূর্ণ হবে।তারা এই বিশ্বাসে আজও বটবৃক্ষের গালে ইঁটের টুকরো বা ঢেলা বাঁধে।মেলার সময় স্থানটি জনজোয়ারে মুখরিত হয়।আবার মেলাশেষে যে যার মতো ঘরে ফিরে যান।তবে এখন দেশের লোকের

ভক্তির আর সে প্রবলাশক্তি নেই,তবু পূজা হয়,মেলা হয়।মেলা প্রাঙ্গন জনজোয়ারে মুখরিত হয়ে ওঠে।জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে।তাই আজও এই মেলা নদীয়াবাসীর কাছে এক মিলনক্ষেত্র-ধর্ম,সমাজ ও সংস্কৃতির মিলনস্থল।

সূচক শব্দ : উলাইচন্ডী, চন্ডীমঙ্গল, বীরনগর, বৈশাখী পূর্ণিমা, উলা, বটবৃক্ষ।

হাজার মানুষের মহামিলনক্ষেত্র মেলা।মেলায় মানুষের সমাবেশ মেলার একটি অঙ্গ।তবে পূজা-পার্বণ,উৎসবে জনসমাগম ও রাজনৈতিক সম্মেলন কিংবা বড় হাটবাজারে জনসমাগমের একটি চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে।বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পরম্পরায় বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন এক অঞ্চলে মেলা বসে।মেলায় মিশে থাকে ধর্মীয় ঐতিহ্য, রীতিনীতি,প্রথা,বিশ্বাস,গতানুগতিকতা ও ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনের বিপরীতে বৈচিত্র্যময় উষ্ণ প্রাণচঞ্চল জীবনের আহ্বান। মেলা প্রসঙ্গে ডঃ শতঞ্জীব রাহা বলেছেন-বিশেষ কোনো উৎসব উপলক্ষে কোন স্থানে বহু মানুষের সমাবেশ,সভা সমাজ প্রদর্শনী স্বল্প সময়ের জন্য কেনাবেচার বাজার,মিলে যাওয়া,মিশে যাওয়া,মিলবিশিষ্ট হওয়া ইত্যাদি কিংবা যাত্রা করা।[১]

নদিয়া জেলা বাংলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা বাঙালির বারো মাসের ১৩(তের) পার্বণ বলে যে প্রবাদ তা এই জেলাতেও পরিলক্ষিত হয়।এছাড়া রয়েছে জেলার স্থানীয় নানা উৎসব ও লোকসংস্কৃতি।নদিয়া জেলায় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেমন সত্যপীর,শীতলা,মনসা,ওলাবিবি,সতীমা প্রভৃতি এমনি কত লৌকিক দেবদেবী জেলার উৎসব সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত।[২]

নদীয়া জেলার এরুপ একটি প্রাচীন উৎসব হল উলা বা বীরনগরের উলাইচন্ডীর মেলা।এই মেলা সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে শ্রীমন্ত সদাগর এখানে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বটবৃক্ষতলে চন্ডী দেবীকে স্থাপনা করার পর নিয়মিতভাবে দেবীর পূজা হতো না।কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে তিনি উলা ছুঁয়ে গিয়েছেন বলে উল্লেখ আছে।[৩]

''বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।।
উলা বাহিয়া যায় কিছিমার পাশে।
মহশ্চয়পুরের নিকটে সাধু ভাসে।।

পরবর্তী সময়ে নদীয়ারাজ রাঘবেন্দ্র রায় দেবীর নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করেন।[৪]

প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উলা বা বীরনগর গ্রামে উলাইচণ্ডীর মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে ইঁট দিয়ে বাঁধানো বেদীর উপর রক্ষিত সিঁদুর মাখানো একটি পাথর,যাকে চন্ডীর ধ্যানে পূজা করা হয়।এই পাথর খন্ডটি উলাইচণ্ডী দেবীর প্রতীক।

এই পূজা সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল খ্যাত শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাত্রাকালে প্রবল ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং এইখানে দেবী চণ্ডীর পূজা করে রক্ষা পান।অন্য একটি মতও প্রচলিত আছে যে শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাওয়ার সময় তার নৌকায় একটি পাথরখণ্ড ঠেকে এবং দেবী চন্ডী কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ঐ পাথরখণ্ডটিকে পূজা করেন।প্রবাদ যাই হোক না কেন উলার এই উৎসবটি বেশ প্রাচীন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।এছাড়াও স্থানীয় কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে তার 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থে উলাইচণ্ডীর পূজা ও মেলার উল্লেখ করেছেন। [৫]

নদিয়া জেলার উলা বা বীরনগর ছাড়াও জেলার নগরউখড়াতে প্রতিবছর চৈত্রমাসে উলাইচন্ডী মেলা বসে।এটি স্থানীয়ভাবে বারোপূজোর মেলা বলে পরিচিত।এখানে প্রতিবছর চৈত্রমাসে শেষ মঙ্গলবার একদিনের মেলা বসে।তবে শেষ মঙ্গলবার সংক্রান্তি হলে মেলা বসে তার আগের মঙ্গলবার।প্রবাদ আছে যে,নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র জীবনকৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করলে মহারাজ খুশি হয়ে প্রায় ২৬(ছাব্বিশ) শতক জমি নগরউখড়াতে দান করেন।যে সময় কলেরা-ম্যালেরিয়া মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল, সেই সময় থেকেই এখানে উদয়চণ্ডীর পূজা ও মেলা চলে আসছে। [৬]

যাই হোক উলাগ্রামের(বীরনগর)গ্রাম্য দেবতা উলাইচণ্ডী যথেষ্ট প্রাচীন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উলাইচন্ডী নাম থেকে স্থানের নাম উলা।আবার অন্য একটি মত প্রচলিত আছে যে এই অঞ্চল উলুবনে ভর্তি ছিল,উলু কেটে গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয় বল এর নাম উলা অর্থাৎ উলু বনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ থেকেই এই স্থানের পত্তন হয়েছিল বলেই এর নাম ‘উলা’ রাখা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন ইরানী বা পার্সি শব্দ ‘আউল’ বা ‘জ্ঞানী’ থেকেই এর নাম ‘উলা’ রাখা হয়েছিল।উলায় যেহেতু বেশ কিছুসংখ্যক পন্ডিতের বাস ছিল।সেই অর্থে আউল থেকে উলা আসতে পারে।তবে সবচেয়ে জোরালো মতটি হলো দেবী উলাদেবীর নাম থেকে উলা নামটি এসেছে। [৭]

বীরনগর বা উলা ছিল জমিদার অধ্যুষিত অঞ্চল। কথিত আছে যে,দস্যু দমনে স্থানীয় মানুষের বীরত্ব দেখে ইংরেজরা এই স্থানের নাম দিয়েছিলেন ‘বীরনগর’— অর্থাৎ ‘বীর’দের নগর! জানা যায় খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জমিদার মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে একবার দস্যু হানা দিয়ে লুট করতে গেলে বীরনগরের সমবেত জনগণ ওই দস্যুদলকে দমন করেন এবং ১৮ জন দস্যুকে বন্দি করেন।তার পর সেই বন্দি দস্যুদের ‘কলকাতা কোর্ট অফ সার্কিট’ তৃতীয় জজের বিচারে চিরনির্বাসিত করা হয়।এর পরই নাকি সেই ইংরেজরা উলার নাম পরিবর্তন করে নাম দেন ‘বীরনগর। [৮]
ব্রিটিশ শাসনকালের পূর্বে গঙ্গা তীরবর্তী এই বীরনগর এর নামই ছিল উলা।উলা তথা বীরনগরের আপামর জনসাধারণের রক্ষাকারী দেবী উলাইচন্ডী।উলাইচন্ডী বছরভর

প্রাচীন বটগাছের নিচে পূজিত হলেও প্রত্যেক বছর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। [৯]

কয়েকশত বছর ধরে এখানে এই প্রথা চলে আসে উলাই দেবীর পূজা উপলক্ষে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে, মেলা বসে।খুব ভোর থেকেই মেলা শুরু হয়ে যায়। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ উলা তথা বীরনগরের মেলায় আসেন।শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর শাখায় উলা গ্রামের রেল স্টেশনটির নামও বীরনগর।মেলা উপলক্ষে রেলপথে বহুদূর দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থী এখানে এসে জমায়েত হয়।এছাড়া বীরনগরে সড়কপথেও যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে।একসময় উলার সন্নিহিত ভাগীরথী দিয়ে বড় বড় নৌকা চলত।উলার এই বহু প্রাচীন মেলাতে দেবীর মন্দির বলতে কিছুই নেই।একটি বট বৃক্ষ ও শিলাখণ্ডকে কেন্দ্র করে দেবীর আরাধনা চলে।শিলাখন্ডটি সিঁদুর রঞ্জিত।এটি দেবী উলাইচন্ডীর প্রতীক। [১০]

উলার এই প্রাচীন মেলাতে দর্শনার্থীরা এই বিশ্বাস নিয়ে পুজো দেন যে দেবী তুষ্ট হলে শান্তি ফিরবে,রোগ ব্যাধি সারবে,মনস্কামনা পূর্ণ হবে।তারা এই বিশ্বাসে আজও বটবৃক্ষের গালে ইঁটের টুকরো বা ঢেলা বাঁধে।প্রাচীন বটগাছ অনেক জায়গা নিয়ে তার ঝুড়ি নামিয়েছে।পুরো অঞ্চলটিকে মানুষ পবিত্র বলে মনে করে।দেবীর প্রতীক শিলাখন্ডটি বর্তমানে লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।বর্তমানে পুরোহিতদের বসার স্থান রয়েছে।লোকমুখে এটা শোনা যায় যে উলার মুস্তাফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মুস্তাফি সর্বপ্রথম চেষ্টা করে নিজ পুরোহিতকে অনুষ্ঠানে বসার ব্যবস্থা করে দেন।সেই থেকে বটবৃক্ষের নিচে ওই স্থানে পুরোহিতদের বসার ব্যবস্থা হয়ে যায়।যখন মুস্তাফিগন গ্রামের জমিদার ছিলেন,তখন তাদের প্রবল প্রতাপ ছিল।[১১]

সে সময় লোকচক্ষুর আড়ালে বৈশাখী পূর্ণিমার যাতের দিনে সর্বপ্রথম হাড়িগণ উলাইচন্ডী সম্মুখে শূকর বলি দিয়ে পুজার সূচনা করেন। তারপরে এই অঞ্চলের রাজেশ্বর নদীয়ারাজের পুজো, এরপর মুস্তাফিদের ও গ্রামের ব্যক্তিদের পুজো দেওয়ার রীতি ছিল।বর্তমানে এই নিয়ম আর মানা হয় না। [১২]

উলার এই প্রাচীন মেলা সম্পর্কে বহু কৌতুক কাহিনীও প্রচলিত আছে।উলা মায়ের সেবক কোন এক ব্রাহ্মণ এক কৃপণ ধনীর নিকট মায়ের পূজার জন্য চাঁদা ভিক্ষা করতে যান লোকটি বয়সে প্রবীণ, স্থূলকায় কলেবর, এক চক্ষুহীন; কিন্তু খুব কৃপণ। বাবুটি এই ব্রাহ্মণের বারবার কাতর প্রার্থনায় উত্তেজিত হয়ে বলেন - "দেখো ঠাকুর কেন বারবার ওই প্রসঙ্গ আনছো, আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না, কারণ দেখেতেই তো পাইতেছ বাজে খরচ আমার আদৌও নাই, ওটা আমার কুষ্টিতে লিখি না।" তখন ব্রাহ্মণ অনন্যগতি না হয়ে সবিনয়ে তাকে বলেন-তার ব্যাখ্যা সত্য,কিন্তু বাজে খরচ যে নেই তা বোধ হচ্ছে না,কারণ যে চক্ষুটি দৃষ্টিশক্তিহীন সেটাতে বরকলা কেন ? ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত বাবুর থেকে দক্ষিণা নিয়ে সহস্র চিত্তে বিদায় নিন। [১৩]

আরোও একটি ঘটনাও প্রচলিত আছে যে একবার হেস্টিংসের দেওয়ান প্রতাপশালী গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ কার্য উপলক্ষে ভাগীরথী দিয়ে যাবার সময় শান্তিপুর ঘাটে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেন।উলার সেবকগণ এই সংবাদ পেয়ে কৌশলে মায়ের পূজার নিমিত্ত কিছু আদায় করার জন্য শান্তিপুর ঘাটে দেওয়ানের বজরার সামনে সকলে রজ্জু(দড়ি) হাতে মল্লবেশে সমস্বরে বলতে থাকেন-"বেটা সিংহ কোথায় ? বেটা সিংহ কোথায় ?"কোলাহল দেখে দেওয়ান বের হলে মায়ের প্রধান পান্ডা রজ্জু নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন -"বেটা সিংহ মহামায়ের সিংহের পায়ে ব্যথা হয়েছে।কাল রাতে দয়াময়ী প্রত্যাদেশ করেছেন যে মায়ের সিংহাসন তোমায় নিয়ে যেতে হবে।মায়ের ইচ্ছা এবার তোমার কাঁধে মা আসবেন।তাই আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।"যাই হোক ভক্তি গদগদ হয়ে দেওয়ান সিংহ মহাশয় সেবার মায়ের পূজার সমগ্র দায়িত্ব নিজে কাঁধে গ্রহণ করেছিলেন।[১৪]

নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সময় উলার দক্ষিণপাড়ায় চট্টোপাধ্যায় বংশের সহিত তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে নদিয়া রাজবাড়ী থেকে উলাচন্ডী পূজার জন্য দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ব্যয় চট্টোপাধ্যায়দের কাছে প্রেরণ করা হতো এবং তারা পুজোর বন্দোবস্ত করে দিত।পূর্বকালে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে দেবীর চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত স্থানে শত শত ছাগ ভাগ বলি হত।অনেকের মতে মহিষ বলিও হত।কেউ কেউ চিনি, ও সন্দেশ দিয়ে সাধ্য অনুযায়ী দেবীকে পূজা দিত। [১৫]

উলাইচণ্ডী আসলে প্রাচীন উলা জনপদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই দেবীর পূজার প্রবর্তক শ্রীমন্ত সওদাগর।কোন এক সময় কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেওয়ায় এই পূজার প্রবর্তন বলে মনে করা হয়।উলাইচন্ডীর পূজা উপলক্ষে উলাইচন্ডী মেলা নদীয়ার একটি প্রাচীন মেলা।এই যাতের মেলায় দক্ষিণপাড়ায় শাক্তদেবী মহিষমর্দিনী ও উত্তরপাড়ায় বিন্দুবাসিনী পূজা হয়। [১৬]

উলাইচন্ডী যাত সম্বন্ধে 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গীণী'-তে উল্লেখ আছে যে উক্ত গ্রন্থ রচনার সময় অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে যাতের দিনে লক্ষ লোকের সমাগম হত।গ্যারেট সাহেবও লিখেছেন যে উলাইচণ্ডীর যাতে কমপক্ষে ১০(দশ) হাজার যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। [১৭]

এই বিবরণ সম্ভবত ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের বলে অনুমান করা হয়।তবে বর্তমান সময়ে যাত্রী সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে বলে মনে হয়।তা সত্ত্বেও এখানে নিত্যসেবা হয় এবং বটগাছটির উলাচন্ডীতলায় বহু মানুষ মনস্কামনা সিদ্ধি ও রোগের মুক্তি ও শান্তির জন্য ইঁট বেঁধে মানত করে থাকেন। উলাইচন্ডী শিলার দুর্গতিও কম হয়নি।[১৮]

আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জনৈক অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী বেশধারী এক পাগল উলাইচন্ডী শিলাটি চুরি করে নিয়ে যায়।তখন পুরোহিত ঠাকুর বিধান দিয়েছিলেন যে ভক্তের পূজায় কোন বিঘ্ন হবে না।বটবৃক্ষের মুলে এই পূজা হবে।তারপর

দক্ষিণপাড়ার এক বাগদী প্রচার করেন যে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে কাঁটা আরির চূর্ণী নদীর ঘাটে জলের মধ্যে চণ্ডীদেবীর শিলা রয়েছে।কিন্তু ওখানে প্রাপ্ত শিলাটি চন্ডীদেবীর শিলার চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড়।এই শিলা কিছুদিন পূজো হতে থাকে।পরে একজন গোপ চখার বিলের দক্ষিণ দিকে তার ধানের জমির মধ্যে একটি প্রস্তুর খন্ড পান।এই শিলাটিকে তিনি বাড়ি নিয়ে যান।পরে এই শিলাটি দেবীচন্ডীর থামে স্থাপিত করে,পূর্বের শিলাটিকে চন্ডীতলার কিছু দূরে একটি বেদীতে 'পঞ্চানন্দ শিব'-রুপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।চন্ডীদেবী অদৃশ্য হলে এই পঞ্চানন্দ কয়েক বছর যাবৎ তার স্থানে চন্ডীরূপে বিরাজিত ছিল।

এরপর আরো একবার উলাইচণ্ডীর প্রস্তরখন্ডটি অপহৃত হয়।কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাকে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়।সেখান থেকে এনে নির্দিষ্টানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।আর এই দেবী পূজাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক বছর এই প্রাচীন মেলা বসে। কয়েকশ বছর ধরে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা চলে আসছে।

উলা বা বীরনগরের আপামর জনসাধারণের রক্ষাকারী দেবী উলাইচন্ডী বছরভর এই বটবৃক্ষের ছায়াতলে পূজিতা হলেও প্রতি বছর বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে বটবৃক্ষের নিচে একদিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন প্রায় ভোররাত থেকেই মেলা শুরু হয়ে যায়। বটবৃক্ষের চতুর্দিকে ঘিরে বহু পুরোহিত বসে ভক্তদের পুজা করে দেওয়ার জন্য। জনজোয়ারে মুখরিত হয় উলার মেলারস্থানটি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই মেলায় মিলিত হন। আবার মেলাশেষে যে যার মতো ঘরে ফিরে যান।নানা দোকানপাটে ভরে ওঠে মেলার প্রাঙ্গণ। চলে দল কষাকষি, হাঁক-ডাক, বেচা-কেনা, ক্রেতা-বিক্রেতার হট্টগোলে মেলার প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে জমজমাট খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বহু লোকের সমাগম ঘটে এই মেলায়।জিলিপি, পাঁপড় ভাঁজার গন্ধে চারিদিক ভরে ওঠে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই উলাইচন্ডী মেলারও যবনিকা পতন ঘটে।এই মেলা উলা তথা বীরনগরে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের আবেগের মহামিলনক্ষেত্র।

তথ্যসূত্র :

১. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সম্পাদিত, 'নদীয়ার সংস্কৃতি চর্চা', অমর ভারতী,কলকাতা, ২০১৮ পৃষ্ঠা নম্বর ২৬৩.

২. নিতাই ঘোষ,'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া',পুস্তক বিপণী,কলকাতা,২০১২, পৃষ্ঠা নম্বর ৫৩.

৩. মালিনী ভট্টাচার্য,ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, প্রদীপ ঘোষ ও অন্যান্য,জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ : নদীয়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,কলকাতা,২০০৩ পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৪.

৪. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সম্পাদিত,'নদীয়ার ইতিহাস চর্চা', অমর ভারতী,কলকাতা ২০১৬, পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৯.

৫. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সম্পাদিত,'নদীয়া চর্চা'অমর ভারতী, কলকাতা,২০১৪,পৃষ্ঠা নম্বর ২২১.

৬. মতিলাল কিস্কু,বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও অন্যান্য সম্পাদিত,'পশ্চিমবঙ্গের মেলা' (প্রথম খন্ড), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা,২০১৯, পৃষ্ঠা নম্বর ৩২.

৭. রত্না ভট্টাচার্য ও শক্তিপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত,'পায়ে পায়ে নদীয়া',পরশ পাথর প্রকাশন, কলকাতা, (তৃতীয় সংস্করণ),২০১৮,পৃষ্ঠা নম্বর-৫২-৫৩.

৮. ড. মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন,'অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি (১৭৮৬ -১৯৪৭),গতিধারা, বাংলাবাজার(ঢাকা)পৌষ ১৪১৫,পৃষ্ঠা নম্বর ১৭৪.

৯. তদেব,পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৬.

১০. রত্না ভট্টাচার্য ও শক্তিপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃষ্ঠা নম্বর ৫২.

১১. কমল চৌধুরী সম্পাদিত,'নদীয়ার ইতিহাস'(দ্বিতীয় পর্ব)দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা নম্বর ২৪৫.

১২. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সম্পাদিত,'নদীয়ার ইতিহাস চর্চা',পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃষ্ঠা নম্বর ৯৪.

১৩. বিলু কবি সম্পাদিত,' কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া কাহিনী', বইপত্র, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা নম্বর ২৪৪.

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৫.

১৫. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সম্পাদিত,'নদীয়ার ইতিহাস চর্চা',পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃষ্ঠা নম্বর ৯৪-৯৫.

১৬. মালিনী ভট্টাচার্য,ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, প্রদীপ ঘোষ ও অন্যান্য,পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃষ্ঠা নম্বর ১৫.

১৭. কমল চৌধুরী সম্পাদিত,'নদীয়া ইতিহাস' (প্রথম পর্ব) দেজ, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা নম্বর ১৫০.

১৮. তদেব পৃষ্ঠা নম্বর-১৩১.

উত্তরাধুনিকতার দৃষ্টিতে নারীবাদের প্রসঙ্গ

চয়ন কর্মকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ : অধিকারের প্রসঙ্গে- নারী'র সমতা অধিকারের দাবী বা আন্দোলন বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। যদিও নারীর অধিকার পুরুষ ও নারীর সমতা বিষয়ে, তবুও এই অধিকারের প্রকৃতি বা ধরণ বিভিন্ন পরিসরে – সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা বিভিন্ন পরিসরে জন্ম দিয়েছে নারীবাদের বিভিন্ন মতাদর্শ- উদারনৈতিক নারীবাদ, চরমপন্থী নারীবাদ, কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ,পরিবেশ নারীবাদ, উত্তরাধুনিক নারীবাদ প্রভৃতিতে। আবার সময়ের দিক থেকে 1800 শতকে পাশ্চাত্যে নারীবাদী আন্দোলনের ব্যাপকতা শুরু হলেও, প্রাচীন বা মধ্য যুগে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে নারীবাদের দাবী গুলি আলোচনার বাইরে ছিল -এমন নয়। তবে বর্তমান পরিসরে নারীবাদের ভিন্ন এক আঙ্গিক দিয়েছে উত্তরাধুনিকতাবাদ। এই পরিসরে ' উত্তরাধুনিকতার দৃষ্টিতে নারীবাদের প্রসঙ্গ ' প্রবন্ধটি তারই প্রস্তাবনা।

সূচক : আধুনিকতা, জ্ঞানদীপ্তি, উত্তরাধুনিকতা, বৈষম্য, চিন্তন বিধি, নারীবাদ।

মূল আলোচনা :

মেয়ে বলে নারী বলে কেন ছোট করা হবে ?
দু'রকম ব্যবহার সমাজের কেন আজ হবে ?
কেন তার বিয়ে হয়, বিয়ে করে কেবল পুরুষে ?
সে যদি বিদ্রোহ করে, সে যদি গর্জনে ওঠে ফুঁসে ?

[মেয়েটি সপিনী যেন: কৃষ্ণা বসু]

সুদীর্ঘকাল ধরে আজ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পুরুষ-তন্ত্রী সমাজেই নারীরা সম্মুখীন হয়ে চলেছে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দ্বিচারিতা,ও বঞ্চনার। এসবের বিরুদ্ধে একটি বিরূপ সমালোচনা বা একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে- যা 'নারীবাদ' নামে পরিচিত। তবে নারীবাদ কেবলমাত্র একটি আন্দোলন নয়, বরং একই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারা, একটি দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সর্বোপরি একটি বিকল্প জীবন দর্শন বলা যেতে পারে। রাজশ্রী বসু তাঁর "প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা" গ্রন্থে বলেছেন – "নারীবাদ হল সকল ধরনের আত্ম-সচেতন, সমাজ সচেতন, আধিপত্য বিরোধী নারী অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ একটি চিন্তাধারা[১]"। আবার John Scott 'নারীবাদ' প্রসঙ্গে বলেছেন -" A social movement, combining theory with political

practice which seeks to achieve equality between men and women." নারীবাদী চিন্তাধারা মোটামুটি ভাবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হলেও ১৯৫০ এর পর থেকে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করে এবং ক্রমশ নারীবাদী বৈষম্য সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠতে শুরু করে। নারীবাদ চায় সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীদের নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করতে এবং নারী ও পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীভূত করতে। যদিও নারীদের এই দুর্দশা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া নিয়ে নারীবাদী তত্ত্বের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে উদারনৈতিক নারীবাদ, বৈপ্লবিক নারীবাদ, কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ প্রভৃতি নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়, তবে বিগত কয়েক দশক ধরে নারীবাদের যে দৃষ্টিভঙ্গিটি অধিক আলোচিত হচ্ছে সেটি হল উত্তর-আধুনিক নারীবাদী (Postmodern Feminism) দৃষ্টিভঙ্গী।

উত্তর আধুনিকতার নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে আসে তাহ'ল 'উত্তর-আধুনিকতা' বলতে কি বোঝায় এবং 'আধুনিকতা' বলতেই বা আমরা কি বুঝি ? বেশিরভাগ সময়ই আমরা আধুনিক বা আধুনিকতা শব্দগুলি ব্যবহার করি কোন নির্দিষ্ট সময় বা কালকে বোঝাতে নয় বরং একটি গুণবাচক (যেমন- আধুনিকতা মানেই হল যুক্তির প্রাধান্য, প্রযুক্তির ব্যবহার, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আলোচনা ইত্যাদি) শব্দ হিসাবে। আধুনিক বলতে ঠিক কি বা কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অষ্টাদশ শতকে সমগ্র ইউরোপ ধরে গড়ে ওঠা জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) সঙ্গে এর আত্মিক সম্পর্ক বর্তমান। উত্তর-আধুনিকতার কোন সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হলেও একথা বলা যায় ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তিকে ঘিরে যে আধুনিকতার জন্ম, তাকে ক্রিটিক বা সমীক্ষণ করে উত্তর আধুনিকতাবাদ[২]; অর্থাৎ সমগ্র আধুনিকতাকে নস্যাৎ না করে, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে অতিক্রম করতে চায়। যুক্তি, সত্যতা, বৈজ্ঞানিকতা, প্রযুক্তি - আধুনিকতার এই সকল বৈশিষ্ট্য সমূহকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ করে উত্তর-আধুনিকতাবাদ। তাহলে এই উত্তর-আধুনিকতার দর্শন কী ? বলা হয়, উত্তর-আধুনিকতার ভিত্তিতে আছে 'দর্শন শূন্যতা'[৩]। তবে স্টিফেন হোয়াইট উত্তর-আধুনিকতার চারটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন – মহাআখ্যানের (Grand Narrative) প্রতি বিরূপ মনোভাব, 'যৌক্তিকতা' সম্পর্কে নতুন চেতনা, তথ্যপ্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার এবং নতুন সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব[৪]। এর উপরই ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, উভলিঙ্গ, যৌনকর্মী, সমকামী, নারী ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তর আধুনিক সামাজিক আন্দোলনের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে[৫]।

উত্তর আধুনিকতাবাদ যেমন আধুনিকতাকে ক্রিটিক বা সমীক্ষণ করে তার অসংগতি, অন্ধকার অযৌক্তিকতা ও অসত্যকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, ঠিক একইভাবে

উত্তর আধুনিক নারীবাদ আধুনিকতা ও পিতৃতন্ত্রের সমালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করে যে নারীরা কিভাবে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। উত্তর আধুনিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জুডিথ বাটলার (Judith Butler) ডোনা হারাওয়ে (Donna Haraway) প্রমুখ[৬]। নারীবাদের এই ধারা মূলত ফুকোর 'ক্ষমতা'র (Power) ধারণা, লাঁকার 'ভাষাতাত্ত্বিক' (Linguistics) ধারণা এবং দেরিদার 'বিনির্মাণ'(Deconstruction) পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে।

"Man is a Rational Animal"- অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যকে বীজ মন্ত্র করে আধুনিক তত্ত্ব কাঠামো মনে করে যে মানুষের চিন্তন কতগুলি আবশ্যিক বিধি নিয়ন্ত্রন বা 'Laws of thought' অনুসারে চালিত হয়। অ্যারিস্টটলের ভাবনা অনুসারে 'Laws of thought' এর মৌলিক তিনটি নীতি হল – (1) বিরুদ্ধতা বিধি বা 'The law of contradiction' ($p \bullet \sim p$), (2) নির্মাধ্যম বিধি বা 'The law of excluded middle' ($p \vee \sim p$), এবং (3) তাদাত্ম্য বিধি বা 'The principle of identity' ($P \supset P$).

'Laws of Thought' বা চিন্তন বিধির দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ নির্মাধ্যম বিধিকে উত্তর আধুনিক নারীবাদ আঘাত হানে কারণ এই নীতি অনুসারে সমস্ত কিছুই 'P' অথবা 'P নয়' এই দুই ভাগে বিভক্ত, এছাড়া অন্য কোন বিকল্প হতে পারে না। অর্থাৎ জগতের সব কিছুই হয় 'P' বর্গের অথবা 'P নয়' বর্গের, যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কোন ব্যক্তি 'ভালো' অথবা 'ভালো নয়'- এই দুইয়ের মধ্যে একটি প্রকারের হবে, এছাড়া কোন বিকল্প হতে পারে না বা কোন মধ্যপন্থা থাকতে পারে না। আধুনিকতার এই যুক্তি যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে "বহুমাত্রিকতার" ধারণাকে বিসর্জন দিতে হয়। এছাড়াও আধুনিকতা সমস্ত কিছুকে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ দুটি বর্গে ভাগই করেনা, বরং বর্গ দুটির ('P' এবং 'P নয়') একটিকে উৎকৃষ্ট এবং অন্যটিকে তার থেকে নিকৃষ্ট হিসাবে বর্ণনা করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'ভালো' এবং 'ভালো নয়' এই দুটি বর্গের নামকরণের মাধ্যমে বোঝা যায় 'ভালো' এই বর্গটি উৎকৃষ্ট এবং 'ভালো নয়' এই বর্গটি নিকৃষ্ট হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে উৎকৃষ্ট বর্গটিকে স্বতন্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করার অভ্যাস চলতে থাকে, দুটি বর্গের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও। কোন বর্গটি উৎকৃষ্টের স্থান পাবে আর কোনটি হবে নিকৃষ্ট তা নির্ধারিত হয়ে থাকে ক্ষমতার প্রেক্ষিতে। ঠিক এভাবেই 'পুরুষ' এবং 'পুরুষ নয়' এই দুটি বর্গের মধ্যে 'পুরুষ' বর্গকে উৎকৃষ্ট এবং 'পুরুষ নয়' বর্গকে নিকৃষ্ট হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। আর উত্তর আধুনিক নারীবাদীরা মনে করে আধুনিকতার চিন্তনের নীতির মাধ্যমে যে বৈষম্য গুলি সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যই প্রধান। আধুনিক চিন্তা বিধির মাধ্যমে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় উত্তর-আধুনিক নারীবাদ তাকে 'পুরুষতন্ত্রের কর্মসূচি' বলে গণ্য করে[৭]।

আধুনিক দর্শনে ‘দ্বিত্ব বিভাজন’ (Binary) কিভাবে সমস্ত জগতকে সম্পূর্ণ দুটি বর্গের বিভক্ত করে (যেমন- 'সাদা- কালো', 'ভালো- মন্দ', 'আলো- অন্ধকার') এবং একটি বর্গকে অন্য বর্গের নিকৃষ্ট হিসাবে প্রতিপন্ন করে দুটি বর্গের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উত্তর আধুনিক নারীবাদ। উত্তর-আধুনিক নারীবাদ দেখাতে চায় যে এই ‘দ্বিত্ব বিভাজনের’ ফলশ্রুতিতেই পুরুষ ও নারী এই দুটি বর্গের উৎপত্তি ঘটেছে, আর এই দুটি বর্গের স্ব-ভাব স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের উপযুক্ত গুণাবলীকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অন্য গুণাবলীকে অবজ্ঞা করা হয়। পুরুষ ও নারীর লিঙ্গ সাপেক্ষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নির্দিষ্ট করা হলেও যদি প্রশ্ন করা হয় লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসাবে 'মানব বা মানুষের' বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীগুলি কি ? এক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তন অনুসারী উত্তর হল যুক্তিবাদিতা ও বিমূর্ত ধারনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুরুষের লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যই বেশি, কারণ সে সবকিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়। কিন্তু অপরদিকে নারীর লিঙ্গগত বৈষম্যের (সে আবেগপ্রবণ, মমতাময়ী) সঙ্গে পার্থক্য অনেকটাই। সুতরাং আদর্শ মানুষ হতে গেলে একজন পুরুষকে নিজেদেরকে যতটা পরিবর্তন করতে হয়, নারীকে করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি। তাই দেখা যায় আদর্শ মানুষের বৈশিষ্ট্য অর্জনে পুরুষের আধিপত্যই বেশি আর নারীরা পায় পরাশ্রয়ীর ভূমিকা। ফলস্বরূপই সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বের। শেফালী মৈত্র তাঁর 'নৈতিকতা ও নারীবাদ' গ্রন্থে বলেছেন- “চিন্তন বিধির এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেবে একটি কৃত্রিম রেষারেষি - চলবে পুরুষ লিঙ্গ-ধর্ম অর্জনে নারীর প্রচেষ্টা আর নারীর সঙ্গে লিঙ্গ-পার্থক্য বজায় রাখাই পুরুষের প্রচেষ্টা”[৮]।

উত্তর আধুনিক নারীবাদ মনে করে সমস্ত নিত্য বস্তুর “প্রকৃত প্রকার বা ন্যাচারাল কাইন্ড” সম্ভব নয়[৯]। আমরা যে বিভাজন দেখি তা কেবল জগতকে বোঝার জন্যই। তাই উত্তর আধুনিক নারীবাদ মনে করে পুরুষ এবং নারীকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। ভাষা, তত্ত্ব ও আচরণের বিভাজন প্রকৃতপক্ষে নির্মিত এবং তা আপেক্ষিকও বটে।

“One is not born, but rather becomes, woman” -Simone de Beauvoir – এর এই উক্তি থেকে একথা বলা যায় জন্মের সময় একটি মেয়ে কেবলমাত্র জৈবিক দিক থেকেই মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিটি সমাজ তাদের চরিত্রগত গুণাবলী নির্দিষ্ট করে দিয়ে একজন মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতিকভাবে নারী হিসাবে গড়ে তোলে। (যেমন নারীর চরিত্রগত কাজ হল সংসার সামলানো, সন্তান মানুষ করা ইত্যাদি।) অর্থাৎ সমাজ একজন মানুষকে চরিত্রগত কাজের বিভাজনের ভিত্তিতে পুরুষ ও নারী হিসাবে নির্মাণ করছে। পুরুষের মধ্যে নারী-সুলভ গুণ আবার নারীর মধ্যে পুরুষ সুলভ গুণ থাকতেই পারে, তাই বলা যায় আধুনিক চিন্তার নির্ধারিত 'পুরুষ' ও 'নারী' বর্গের গুণাবলী আসলে

আপেক্ষিক। তবে এর অর্থ এই নয় যে উত্তর আধুনিক নারীবাদ নিজেদেরকে সাপেক্ষীকবাদী বলে মনে করে।

অ্যারিস্টটল বর্ণিত চিন্তন দর্শনের তিনটি নীতির তৃতীয় নীতি অর্থাৎ তাদাত্ম্য বিধিকেও উত্তর আধুনিক নারীবাদ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে। এই বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র তার নিজের সাথেই তাদাত্ম্য বা একাত্মতা সম্ভব। অর্থাৎ এই বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসম্পূর্ণ এবং পরনির্ভরশীল। এই নীতি মেনে চললে মানুষে মানুষে আত্মিক সংযোগ থাকা সম্ভব নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমালোচনা করে উত্তর আধুনিক নারীবাদ পারস্পরিক নির্ভরতার উপর গুরুত্ব দেয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন উঠে আসে তা হল- উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের মতে নারীদের উপর চলতে থাকা এই বৈষম্য থেকে কিভাবে নিস্তার সম্ভব ? উত্তর আধুনিকতার মতো উত্তর আধুনিক নারীবাদও এক্ষেত্রে কোন মহাআখ্যানের বা Grand Narrative এর বিরোধী অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নারীর নিস্তার সম্ভব নয় বলে এই তত্ত্ব মনে করে এবং এটাও স্বীকার করে যে ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়ে নারীদের চরম মুক্তি সম্ভব নয়। যদিও এই তত্ত্ব সকল প্রকার প্রভুত্ব বা দমনমূলক ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ প্রকাশ্যে আনার কাজ চালিয়ে যায়। নারীদের প্রতি এই বৈষম্য মোচন করতে উত্তর আধুনিক নারীবাদ প্রথমেই যেটা চায় তা হল 'Laws of Thought' এর সংস্কার সাধন, তাছাড়া এই তত্ত্ব এমন এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে চায় যেখানে বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা এবং বহুমাত্রিকতার ধারণা বজায় থাকবে।

এক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের আক্রমণের অন্যতম স্থান হল ভাষা, উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা মনে করে সম্পূর্ণ নতুন ভাষা গড়ে তুলতে পারলেই দূর করা সম্ভব এই বৈষম্য। কারণ ভাষাই পারে নতুন চিন্তন কাঠামো গঠন করতে। তবে উত্তর আধুনিক নারীবাদ ‘অন্তর্ভুক্তি প্রকল্প’[১০]-এ বিশ্বাসী নয় কারণ এর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক নারী ক্ষমতা অর্জন করতে পারলেও ক্ষমতার অসম বন্টন থেকেই যায়, এর মাধ্যমে বৈষম্যের কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটে না। তারা তাদের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেবল নারীদের নয়, একই সাথে সমস্ত অবদমিত, নিপীড়িত, শোষিত শ্রেণীর মুক্তি ঘটাতে চায়।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের পূর্বেও দর্শনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হলেও তা ছিল কেবলমাত্র দর্শনের পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাতে নারীদের সমস্যার বিভিন্ন বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়, কিন্তু উত্তর আধুনিক নারীবাদ এখানেই ক্ষান্ত হয়নি তারা সমগ্র দর্শনের চিন্তন কাঠামোর পরিবর্তন ঘাটাতে চায়, তারা এটা দেখানোর চেষ্টা করে যে নারীদের অবদমনের প্রক্রিয়া দর্শনের বিশ্লেষণ কাঠামোর মধ্যেই রয়ে গেছে তাই তার পুনর্গঠন প্রয়োজন[১১]।

নারী বৈষম্যের প্রধান কারণ গুলি গভীরভাবে এবং দর্শনের তৃণমূল স্তর থেকে অনুধাবন করার প্রক্রিয়ার তোড়জোড় যে উত্তর আধুনিক নারীবাদের হাত ধরেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আধুনিকরা যেমন সহজ সরলভাবে জগতের সবকিছুকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিভাজন ('P' বর্গ এবং 'P নয়' বর্গ বিভাজন) করে ফেলছে, এবং তার ফলে সমাজে যে বৈষম্য ও শ্রেণী বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সামনে হাজির করে এই তত্ত্ব। তবে উত্তর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মতো উত্তর-আধুনিক নারীবাদী তত্ত্বও তার বিশ্লেষণকে যে এক জটিল যুক্তির জালে আবদ্ধ করেছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। দর্শনের চিন্তন পদ্ধতি, প্রচলিত ভাষা কাঠামো ও আধুনিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমে উত্তর আধুনিক নারীবাদ কতদূর নারীদের বৈষম্য থেকে পরিত্রাণের পথ দেখতে পারবে সেটাই হবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্যের মানদণ্ড।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, রাজশ্রী,(২০২১), নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব, রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী(সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* (পৃ ১০৪), উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ।

২. বসু, প্রদীপ, উত্তর আধুনিকতার রাজনৈতিক তত্ত্ব : ফুকো ও দেরিদা, দীপক কুমার দাশ (সম্পাদিত), *রাজনীতির তত্ত্বকথা, ১ম পর্ব,*(পৃ. ৩১৫) কলকাতা: প্রকাশন একুশে ২০০৬ ।

৩. খাসনবিশ, রতন, (২০১২),*উত্তর আধুনিকতা ও মার্কসবাদ,* (পৃ ২৩), রূপালী, কলকাতা ।

৪. বসু, প্রদীপ,(২০০৬), উত্তর আধুনিকতার রাজনৈতিক তত্ত্ব : ফুকো ও দেরিদা, দীপক কুমার দাশ (সম্পাদিত), *রাজনীতির তত্ত্বকথা, ১ম পর্ব,* (পৃ ৩১৫), কলকাতা: প্রকাশন একুশে।

৫. দাস, তুহিন কুমার,(২০১৬),উত্তর আধুনিকতারতা ও মার্কসবাদ : একটি বিতর্ক, *কথা,বিভাগীয় সাহিত্য পত্রিকা,* দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ, পৃ ৭৫ ।

৬. বসু, রাজশ্রী,(২০১৪), *নারীবাদ,* (পৃ ৫৩) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৭. মৈত্র, শেফালী,(২০০৩),*নৈতিকতা ও নারীবাদ,* (পৃ ৮৮),নিউ এজ,কলকাতা ।

৮. মৈত্র, শেফালী,(২০০৩),*নৈতিকতা ও নারীবাদ,*(পৃ ৮৯), নিউ এজ,কলকাতা ।

৯. বসু, প্রদীপ,(২০১৯),উত্তর আধুনিক নারীবাদ,রতনতনু ঘোষ(সম্পাদিত), উত্তরাধুনিকতা,(পৃ ২৯৯), ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ।

১০. মৈত্র, শেফালী,(২০০৩),*নৈতিকতা ও নারীবাদ,*(পৃ ৯৩), নিউ এজ,কলকাতা

১১.. মৈত্র, শেফালী,(২০০৩),*নৈতিকতা ও নারীবাদ,* (পৃ ৯৬), নিউ এজ,কলকাতা ।

ছদ্মবেশী রবীন্দ্রনাথ

মলি মিত্র
সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ,
মেমারি কলেজ, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

বাংলার সংগীত ভান্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীত এক বিরাট সংযোজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য প্রতিভার যাদুদন্ডের স্পর্শে সাহিত্যে এবং সংগীতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে রচিত সকল কাব্যই পরবর্তী জীবনে বর্জন করেছিলেন। কেবল রেখেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, এই পদাবলী কবির ষোল বছর বয়সের লেখা। কবি লিখে ছিলেন "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে সেই মেঘলা দিনের আকাশের আনন্দে বাড়ির ভেতরে একটি ঘরের খাটের উপর উপুড় হইয়া পরিয়া একটি স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহণ কুসুম কুঞ্জ মাঝে' একটি গান লিখে কবির নিজের উপর বিশ্বাস জন্ম নেয়।"[১] (জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃষ্ঠা, ৪৬২ রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড।)

তারপর লিখলেন একটি পর একটি কবিতা । এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের পদাবলী সৃষ্টি। প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হলো অভিসার পর্বে । "সজনী গো আঁধার ও রজনী ঘোর ঘনঘটা চমৎকতা যামিনী রে কুঞ্জ পথে সখী কৈসে যাউওবা অবলা কামিনী রে"। - পদাবলী 'ভারতী' পত্রিকার আদি যুগের রচনা অর্থাৎ কবির ১৬ বছর বয়সের লেখা । বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারার অনুসরণে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা নব প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহ" নামে কিছু পদ রচনা করে পদাবলী সংগীত বা সাহিত্যকে নবজীবন দিয়েছিলেন।

কিশোর কবিকে প্রভাবিত করেছিল মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলীর স্রোত বাংলা সাহিত্যে বহুকাল থেকে তেমন প্রচলিত ছিল না বললেই চলে। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার পর এবং কীর্তনাঙ্গ পদগুলির ভাষা শব্দালঙ্কারের সুর ও লালিত্য কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত "ব্রজঙ্গনা" কাব্যে ১৮৬১ সালে বৈষ্ণব ভাবে কবিতা রচনা করেন। তিনি সেই কাব্যে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার করেননি। প্রাচীন পদকর্তাদের এমন নকল করা পদাবলী রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেউ লিখতে পেরেছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। পদাবলীর প্রথম রচনা ও সময়কাল বাংলা ১২৮৪ সাল বর্ষাকালে "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে"- এই গানটি এই পর্যায়ে প্রথম গান । এরপর পরপর কুড়িটি পদ রচিত হয়। বৈষ্ণব ও কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ সম্বন্ধে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন- " মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি।"[২] (সংগীত চিন্তা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -পৃষ্ঠা ১৭১।)

এই পদাবলী তিনি এমন গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে এর অনুকরণ করা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল তাছাড়া এই সময় ছিল অনুকরণের যুগ। গোবিন্দ দাস রচনা করেছেন –"শরত চন্দ পবন মন্দ / বিপিনে ভরুল কুসুম গন্ধ ফুল্ললিকা মালতি যুতি" ইত্যাদি। এরই ছন্দ ও শব্দ ঝংকারের সাথে ভানুসিংহের পদের আমরা তুলনা করতে পারি। "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে', মৃদুল মধুর বংশী বাজে/ বিসরি ত্রাস লোক লাজে সজনী আও আওলো।" – ভানুসিংহের এই যে পদটি রচিত হয়েছে তার সবগুলিই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্পর্কিত। বৈষ্ণব পদাবলীর যা প্রধান উপকরণ। বৈষ্ণব পদাবলীর সম্বন্ধে কবির প্রথম কৌতুহল উদ্দীপিত হয়েছিল প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেই। রবীন্দ্রনাথের এই ছদ্মনামের যে কাহিনী আছে তা আমরা তাঁর জীবনস্মৃতি থেকে পাই। তা হল এইরকম; 'ভানুসিংহ' নামকরণের পেছনে মূলত প্রতিভাবান ইংরেজ কবি Thomas Chatterton এর জীবন কাহিনীর কিছু ভূমিকা থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'ভানুসিংহ' এর কবিতা প্রবন্ধে কবি নিজেই এর সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। Chatterton অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন ইংরেজ কবি ছিলেন।(১৭৫২-১৭৮০)। তিনি অতি অল্প বয়সেই প্রাচীন ভাষায় (ওল্ড ইংলিশ) এমন কিছু কাব্য রচনা করেন যা তৎকালীন পাঠকরা তাঁর রচনা বলে ধরতে পারেননি। Chatterton এই কবিতা গুলি ছদ্মনামে রচনা করেন। ছদ্মনামটি থমাস রলি(Thomas Rolay)। পরবর্তীকালে এই রচনাগুলি যে তাঁরই, এ কথা যখন প্রকাশ হলো তখন কবি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং আত্মহত্যা করেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক বন্ধু শ্রী অক্ষয় চৌধুরীর কাছে কবি উক্ত কাহিনীটি শুনেন। কাহিনীর মধ্যে যদিও যথেষ্ট নাটকীয়তা ছিল; তথাপি বালক ইংরেজ কবি প্রাচীন ভাষায় ছদ্মনামে কাব্য রচনার রহস্যটি জেনে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে ছিলেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ছদ্মনামে কিছু পদ রচনার করেছিলেন মূলত প্রাচীন পদকর্তাদের ভূমিকা এবং Chatterton এর কবিতা থেকেই ছদ্মনামে পদ রচনার অনুপ্রেরণা পান এবং 'ভানুসিংহ' নামের পশ্চাতে এই ইতিহাসটুকু লুকিয়ে রাখেন।

বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বয়স্ক বন্ধুকে বুঝিয়েছিলেন এই পদাবলী 'ভানুসিংহ' নামে এক প্রাচীন পদকর্তা রচিত। এই পুঁথি খানি পাওয়া গেছে আদি ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থশালা থেকে। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেন শ্রী অক্ষয় কুমার সরকার ও শ্রী সারদাচরণ মিত্র এই কাব্য সংগ্রহ ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৫ সালে, কবির বয়স ১৩ কি ১৪ হবে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৬ বছর তখন 'ভারতী' পত্রিকায় ভানুসিংহের প্রথম ৭টি পদ প্রকাশিত হয়। বাকী ১৩টি পদ প্রকাশিত হয় যখন কবির বয়স ২৫ হবে। ভানুসিংহের পদগুলি নিয়ে পরিণত বয়সে কবির সংকোচের অন্ত ছিল না। তিনি এই গুলিকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পদাবলীর জালিয়াতি', যদিও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার শেষ ছিল না। কবির মতে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যকে এমন ভাবে সমৃদ্ধ করেছে যার সাথে কিছুর তুলনা করা চলে না। তুলনা করলে খাপ ছাড়া বলে মনে হয়, এই বিষয়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন – "আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম সমাজের লাইব্রেরির খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে। তাহা হইতে কোন প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতা গুলি শুনাইলেন, শুনিয়া তিনি ভীষণ বিচলিত হইয়া উঠলেন এবং কহিলেন এই পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি, চন্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। এই কবিতা বিদ্যাপতি চন্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইতে পারে না কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন নিতান্তই মন্দ হয় নাই"।[৩] (জীবনস্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পৃষ্ঠা ৪৬২- রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খন্ড)।

কবি যদিও প্রকাশ্যে ভানুসিংহ সম্পর্কে আর কোন উচ্চ বাচ্চা করেননি। তবুও কৈশোর কালে এই গানগুলির উপর তাঁর যে সবিশেষ প্রীতি ছিল তার প্রমাণ হলো এই গানের সুরগুলি ভানুসিংহের পদের ভাষায় সুরের লালিত্য অসাধারণ। যদি "জীবনস্মৃতি" রচনা কালে অর্থাৎ মধ্য বয়সের তাঁর কীর্তি হল- " ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা বসিয়া দেখিলে তাহার মেকিং বাহির হইয়া পরে"।[৪] (জীবনস্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পৃষ্ঠা ৪৬২ রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খন্ড)

বৈষ্ণব কবিদের রস সাধনা ও পরমাত্মার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রকাশিত হয়েছে পদাবলী তে। ভানুসিংহের পদাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর এইখানেই তফাৎ, কারন ভানুসিংহের গানে কেবলমাত্র অন্ধ অনুসরণ আর নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। এছাড়া কোনো সাধনা বা মৌলিকতা বিশেষ নেই, অবশ্য থাকার কোনো উপায় ও ছিল না। কারন রাধাকৃষ্ণের প্রতি কবির সে রকম কোনো ভক্তি ছিল না।

ভানুসিংহের পদাবলী তখন "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তখন ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানিতে তিনি ইউরোপীও সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের দেশে গীতি কাব্য সম্বন্ধে একটি চটি বই লিখেছিলেন। তাতে ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্তা রূপে বহু সন্মান দিয়েছিলেন। সে সন্মান কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে জোটে নি। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখে ডঃ উপাধি লাভ করেন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৮৮৪ খ্রীষ্ঠাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে এই পদাবলীর সব কবিতা কে এক শ্রেণীতে ফেলা যাবে না। কারন সব গুলি এক সময় রচনা নয়। "মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান"। গানটি কড়ি ও কোমল যুগের রচনা। ভাষা কৃত্রিম হলে ও এই এর ভাবের মধ্যে নিছক অনুকরণ দেখা যায় না। ভানুসিংহ মরণকেও কল্পনা করেছিলেন এবং এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাঁর সুদূর পার্থক্য। কবির চোখে মৃত্যুর রূপ হলো "মেঘ"। তাই তিনি অবলীলাক্রমে বলতে পেরেছেন – " মেঘ বরন তুজ, মেঘ জটা জুট,/ রক্তকমলকর, রক্ত অধরপুট"। -- প্রকৃতির সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে মৃত্যুর অভিসারে যাওয়ার জন্য রাধা প্রস্তুত,- "এ কলি যাওব তুজ অভিসারে,/ তুঁহু মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে-/ ভয় বাঁধা সব অভয় মুর্তি ধরি পন্থ দেখায়ব মোর"। ভানুসিংহের পদাবলীর শ্রীরাধার মৃত্যুকে শ্যামের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ

করেছেন। ভানুসিংহের প্রায় সব গানগুলি বিরহের গান। সমালোচকরা বলেন এতে আছে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব। ভানুসিংহের পদাবলীতে সুর ও তার গানের ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ সব সমেত **২২**টি পদাবলী রচনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর মধ্যে **১১**টি গানের সুর পাওয়া যায়। এই সকল গানের অর্ধপরিচিত ভাষাই গানগুলোকে রোমান্টিক করে তুলেছে। "শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা" -গানটি। রাগ মল্লার। তবে অনেক ক্ষেত্রে কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হয়েছে। " রিমঝিম " শব্দটি বর্ষার জলধারার প্রতিধ্বনি জাগায়। "সজনী সজনী রাধিকা লো"- গানটির সুর মাজ-খেমটা। এই রাগে কবির আর কোনো গান নেই। "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" গানটির সুর ঝিঁঝিট, তাল একতাল। " অজু সখী, মুহু মুহু গাহে পিক"- সুর বেড়াই, তাল ঝাঁপতাল। "শুনলো শুনলো বালিকা" – গানটির সুর ভৈরবী, তাল একতাল। এই পদাবলী কবির অল্প বয়সে গানগুলি রচিত হয়েছে বলে প্রত্যেকটির গানে রাগ রাগিনীকে অতি সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে । এছাড়া রবীন্দ্রনাথ একটি বিদ্যাপতির পদে সুর দিয়েছেন- "এ সখী হামারি দুখের" এবং অপরটি গোবিন্দ দাসের " সুন্দরী রানে আওয়ে বলি"। কবির এই গানগুলি কীর্তন অঙ্গের গান নয়, বাংলা কীর্তনের যেসব ধারা প্রচলিত আছে, তাদের কোনটির সঙ্গে এর মিল নেই । আবার রাগ রাগিনী চিহ্নিত করা গেল ও গানগুলি রাগ সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না।

পরিশেষে বলা যায় যে,সব মিলিয়ে কবির স্বপ্নের ভানুসিংহের গানগুলি কবির অপরাপর সমস্ত গানগুলি থেকে পৃথক । রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার উদ্ভবের পূর্বে বলেই হোক বা বিজাতীয় ভাষার জন্যই হোক গানগুলি একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন এ কথা অনস্বীকার্য। তাঁর এই রচনা সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের আভাসের খবর দেয়। রূপকে ছাড়িয়ে অপরূপের সন্ধানে ইঙ্গিত দেয়। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম এবং পদাবলীর যৌগিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এই কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দুর্ভাগ্য রবীন্দ্র প্রতিভার একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে অধরাই থেকে গেল। তবে স্বাতন্ত্রের দাবি নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য সৃষ্টি পদাবলী সাহিত্যের এক পাশে স্থান করে নিয়েছে । এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে ছদ্দবেশী ঠাকুর নিজেকে নতুন রূপে, নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে, নতুন এক সৃষ্টিকে সামনে এনেছেন; যা শ্রোতাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। যা আমাদের সমৃদ্ধ করে তোলে।

তথ্যপঞ্জী

১) জীবনস্মৃতি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, – পৃষ্ঠা – ৪৬২, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড।)
২) সংগীত চিন্তা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -পৃষ্ঠা ১৭১।)
৩) জীবনস্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পৃষ্ঠা ৪৬২-
৪) জীবনস্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পৃষ্ঠা ৪৬২ রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খন্ড)

গ্রন্থপঞ্জী:

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ – জীবনস্মৃতি – বিশ্বভারতী।

২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ – গীতবিতান – বিশ্বভারতী।

৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ – স্বরবিতান – বিশ্বভারতী।

৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ – সংগীত চিন্তা – বিশ্বভারতী।

৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ – ছবি ও গান – বিশ্বভারতী।

৬) দেবনাথ ধীরেন্দ্রনাথ- রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু - রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৭) বসু ডঃ অরুন কুমার – বাংলা কাব্য সংগীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত – দেজ পাবলিশিং।

৮) বন্দ্যোপাধ্যায় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র - রবীন্দ্রসংগীতঃ কাব্য ও সুর - করুণা প্রকাশনী।

৯) মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার - গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী - টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

১০) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ - সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান - শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা।

বাংলা ছোটগল্পে রামকুমার মুখোপাধ্যায়–একটি পর্যালোচনা

রিমি বাছাড়
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মাঝে মাঝেই তার বাঁক বদল হয়েছে। বিষয়-আঙ্গিক সমস্ত দিক থেকেই বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই বদলের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ রয়েছে সময়ের। পঞ্চাশ পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প বৈভব ও ঐশ্বর্যে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
সূচক শব্দ – রামকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশ-পরবর্তী ছোটগল্প, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা, গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ, ‘ঘুঘু কিংবা মানুষ’, ‘নব রত্নাকরের উপাখ্যান’।

মূল আলোচনা :
সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৫৬) প্রায় শতাধিক গল্প লিখেছেন। তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে বাঁকুড়ার একটি গ্রামে। তাই রাঢ় বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিজাত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বিচিত্র পেশার গ্রামীণ মানুষদের ভিড় দেখা যায় তাঁর গল্পে। বাংলায় তখনও সবুজ বিপ্লব ঘটেনি। বছরে একবারই ধান চাষ হত, বর্ষায়। স্বাভাবিকভাবেই ভূমিহীন মানুষদের বেঁচে থাকা তখন কঠিন ছিল। এই পেশাগত সংকট এবং তার থেকে মুক্তিলাভের আমরণ চেষ্টা রামকুমারের বহু গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। ঘরের চাল ছাওয়ার মিস্ত্রী, ফুলুট বাজিয়ে শিল্পী, সাধারণ তাঁতি, জনমজুর – ইত্যাদি নানা রকমের পেশার মানুষদের সামগ্রিক সংকট নিয়েই রচিত হয়েছে তাঁর গল্প। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম ‘মাদলে নতুন বোল’ (১৯৮৪)। ‘ঘুঘু কিংবা মানুষ’ গল্পটির (‘পরিচয়’, জানুয়ারি ১৯৮৪) নায়ক সুচাঁদ দিনের পর দিন কাজ পায় না। এমনিতে সুচাঁদ শান্ত। কিন্তু পেটে দানা না পড়লে জ্ঞানগম্যি থাকে না। বউয়ের উপর রাগ করে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। হয়ত মরবার জন্যই। সুচাঁদের বউ তাই বরকে খুঁজতে যায়। চারদিন পর পূর্ণিমার দিনে ফিরে আসে সে। আর মরা হয়নি তার। ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে মরতেই গিয়েছিল – “মরতুম বটে। সাঁওতালডির পোস্টটা ধরে তর তর করে উঠছি। এক জোড়া ঘুঘু পিরিত করতে করতে বসলে গিয়ে ঠ্যাঙাতে। ঠিকা গেল তারে তারে। শালা খাঁইছে শক – চিৎপটাং। বলি খিদার জিনিশ ভগবান দেখছেন, মরতে যাব কোন দুঃখে? তার উপর তুই উপোস করে আছিস বটে।”

উনুন জ্বলে। ঘুঘুর মাংস বসে। গাঁ-সীমায় পৌঁছে বিনে পয়সায় এক বোতল মাল জোগাড় করে সুচাঁদ। পুকুর পাড়ে বসে টানে। তার গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে সুচাঁদের বউ গান ধরে। এভাবেই এগিয়ে চলে সাধারণ মানুষদের জীবনচর্যা। সার্বিক যন্ত্রণা-সমস্যার ভিতরেও মানুষ বাঁচার খোরাক পেয়ে যায়। এরই নাম হয়ত জীবনরস। একেই বলে জীবনযাপন। আর এই জীবনদৃষ্টি রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকে স্বতন্ত্র করেছে।

ছোটবেলা থেকে লেখক গ্রামীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। তিনি লিখেছেন – ‘‘তুষুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তন এসব নিয়ে আমার শৈশব এবং কৈশোরের জগৎ। ... কৈশোরের ওই পর্বে, ষাটের দশকে, ভাগচাষী ও কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধেছে। ক্ষেতে খামারে সংঘর্ষ, পুলিশের আনাগোনা। গোরার ‘নগর ভ্রমণের’ পাশাপাশি প্রায় নিত্যদিনের রাজনৈতিক মিছিল। বৈষ্ণবীয় খোল আর মাদল দুটোরই গ্রাম পরিক্রমা চলে। বাদ্যযন্ত্রের বোলের টান এবং কৈশোরের কৌতূহলী আবেগ আমাকে দু মিছিলেই হাঁটিয়েছে’’।[১] বস্তুবাদী এই লেখকের লেখায় কীর্তন-বাউল-কথকতা ইত্যাদি দেশজ সাংস্কৃতিক উপাদান ঘুরেফিরে এসেছে। রূপকথা বা বেতালের গল্পের বহিরঙ্গেও একাধিক গল্প লিখেছেন। এইসব মৌখিক সাহিত্যের আদলের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর নিজস্ব ভাষারীতি তৈরি করতে চেয়েছেন। তবে এইসমস্ত গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সমসময়। ‘নব রত্নাকরের উপাখ্যান’ (‘দৈনিক বসুমতী’, শারদীয় ১৯৯১) গল্পের নামকরণে ‘উপাখ্যান’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। এর মধ্যে একটা দেশজতা আছে। লেখক আমাদের দেশজ ভঙ্গিতে দেশজ আখ্যান শুনিয়েছেন। গল্পের শুরুতে লেখক তাঁর পরিচয় দিয়েছেন পাঁচালী-উপাখ্যানের ঢঙে –

‘‘কনক মাতার নাম, পিতা রামাঙ্গ।
বসতি গেলিয়া গ্রাম বাঁকুড়ার অঙ্গ।। ...’’

সম্পাদকের নির্দেশে যে তিনি এই লেখায় হাত দিয়েছেন, তাও জানিয়েছেন কাব্যের ভূমিকায়। মূল আখ্যানের সঙ্গে এই ভূমিকার বিষয়ের দিক থেকে প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ নেই। কাহিনির কোনো ইঙ্গিতও নেই এখানে। এই গল্পে আধুনিক পাঠককে তিনি নিয়ে গেছেন প্রাগাধুনিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আবহে। এর গদ্যশৈলীও স্বতন্ত্র। তৎসম বহুল সাধু গদ্যে গল্পটি বর্ণিত।

আজকের রত্নাকরের কাহিনি শুনিয়েছেন লেখক। আজকের বাল্মীকি মুনি অনেক বাস্তববোধ সম্পন্ন। তাঁরা মুনি তৈরি করতে চান না। আজকের মুনি-ঋষিরা মনে করেন, অন্যদের পথ দেখিয়ে কাজ নেই। নিজের পথ নিজেই খুঁজুক মানুষ। এভাবেই তো আত্মমুক্তি ঘটবে। এও তো একটা পথের দিশা। রত্নাকরের লাঠিটি সরিয়ে তাকে সেই দিশাই দেখিয়েছেন বাল্মীকি মুনি।

তাঁর গল্পের বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে মন্তাজধর্মীতা। তাঁর গল্প নির্মাণ প্রকৃতপক্ষে এক একটি বিনির্মাণ। প্রসঙ্গত তাঁর জোব চার্ণককে লেখা গল্পগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে নিয়ে লেখক অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। সবকটি গল্পেই লেখক চার্ণকের বন্ধু। সাহেব বন্ধুর সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডায় এগিয়েছে এই পর্যায়ের গল্পগুলি। স্থান-কাল-পাত্রকে নিজের মত ব্যবহার করেছেন চমৎকার দক্ষতায়। 'প্রাণপাখির দেহে ফেরা' ('শারদীয়া কৃত্তিবাস মাসিক', অক্টোবর ২০২০) গল্পের শুরুতে কথক বলেছেন, জোবের সঙ্গে কীকরে পরিচয় হল তাঁর। ভোরবেলা কইমাছ ধরতে গিয়ে দেখা তাঁর সঙ্গে। তারপর বন্ধুত্ব। সুতানুটিতে আসার সময় জোবের সঙ্গে তাঁরই প্রথম দেখা হয়েছিল। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়না ইনি কলকাতার আবিষ্কারক জোব চার্ণক। পুরনো কলকাতার কথা এসেছে। গল্পের শেষদিকে এসেছে করোনার প্রসঙ্গ। চিন থেকে আসা এই বিপদে দলে দলে লোক পালাচ্ছে। তাঁরাও চা নিয়ে বই লেখা মুলতুবি রেখে বাড়ি ফেরার কথা ভাবেন। তাঁদে বোট হারিয়ে যাওয়ায় অন্যদের সঙ্গে হাঁটা শুরু করেন। রাস্তায় কথক প্রায় মারা গিয়েছিলেন। তাঁর প্রাণপাখি দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। গুণিন বহু চেষ্টায় ফিরিয়ে আনে। এই হল গল্প। এই পর্যায়ের তাঁর প্রতিটি গল্পে আপাত মজার আড়ালে সমাজ এবং সময় সম্পর্কে গভীর কিছু কথা শুনিয়েছেন লেখক। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়ের লোকায়ত বিভিন্ন আখ্যানকে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভাবনার সঙ্গে চমৎকার দক্ষতায় মিশিয়ে দিয়েছেন। সাহেবরা আসার আগেও আমাদের দেশে অন্যভাবে যে একটা নবজাগরণ হয়েছিল, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক।

সাহিত্য একাদেমির গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গভীরভাবে পরিচয় রয়েছে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে। দেশের নানান প্রান্তে লোকসমাজে ছড়িয়ে থাকা লোকায়ত আখ্যানের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ। স্মরণীয় তাঁর 'কথার কথা' গ্রন্থটির কথা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশর লোককথা নিয়েও বহু গল্প লিখেছেন তিনি। যেমন, 'দা-কাটা' ('ভাষাবন্ধন', শারদ ২০০৭) গল্পটি। এখানে মিজোরামের একটি লোককথা শুনিয়েছেন লেখক। দা বানানোর এই লোককাহিনির মর্মার্থ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন – "এটাই তো নিয়ম। শিল্পায়ন ছাড়া তো সভ্যতার অগ্রগতি হবে না। আর কলকারখানা তো আকাশে হবে না। জমি, জলা, পাহাড়, উপত্যকাতেই করতে হবে।"[২]

বাংলা হাসির গল্পের ধারাটি ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সরস সাহিত্যের একজন অন্যতম বিশিষ্ট লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর সরস লেখাগুলিতে রয়েছে ঐতিহ্য, দেশজতা, পুরাণ ভাবনা, লোকায়ত যাপন। আবার 'দুখে কেওড়া', 'সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু' সিরিজের আখ্যানগুলিতে দেখা যায়, সেখানকার দরিদ্র প্রান্তবাসী মানুষদের মুখ দিয়ে লেখক রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলার গ্রাম-মফস্‌সলের নিজস্বতাকে রামকুমার তাঁর লেখায় বারে বারে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দেশের মাটি থেকেই উঠে এসেছে তাঁর গল্প। তাঁর বহুস্বরিক গল্পগুলি ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক স্বরূপকে উন্মোচিত করে।

তথ্যসূত্র :

১. ‘রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প’, ভূমিকা, ১৯৯৩ খ্রিঃ।
২. ‘জ্বলদর্চি’ পত্রিকা, ‘রামকুমার মুখোপাধ্যায়’ সংখ্যা।

অতীতগমনের স্বরূপ-সন্ধানে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'

প্রদীপ্তা ঘোষ
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ফেলে আসা অতীতে সকলেই ফিরে যেতে চায়। নিজের শিকড়ের অন্বেষণে ব্যাকুল হয় মন। কেননা সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে অস্তিত্বের দ্যোতনা। বাস্তবে বিপরীতগমন কখনোই সম্ভব নয়। সময় স্রোতে যা হারিয়েছে, তাকে কি আর ফিরে পাওয়া যায়? সময়ের ব্যবধানে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বহুল পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কিন্তু সেই সুদূর কালপর্বে পাড়ি জমাতে না পারার আক্ষেপানুভূতিকে অস্বীকার করা যায় না। এই সূত্রে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত' প্রবন্ধের কথা- "....মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।....আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান।" [১]

কিন্তু স্রষ্টা যে সৃষ্টির কান্ডারী। প্রাত্যহিকতার মধ্যে থেকেও তার চলন ঊর্ধ্বমুখী। তার মনোজগতে যেন ত্রিকালের সঙ্গম। কল্পনার সরণি বেয়ে তিনি অবাধ বিচরণে সক্ষম। আর তাই একমাত্র রচয়িতাই 'কল্পনার মেঘদুত' পাঠিয়ে আমাদের জন্য সৃজন করেন হারানো সময়ের পটভূমি। 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' তেমনই একটি উপন্যাস। যেখানে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ মনন সাজিয়েছে পুরাতনের ইতিবৃত্ত। অতীতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও সেই যাত্রাপথের যে সীমারেখা সমগ্র উপন্যাসে রূপলাভ করেছে, তার অন্বেষণই এই আলোচনার বিষয়বস্তু।

সূচক শব্দ: অতীত, যাত্রা, ধনপতি, চন্ডী, সিংহল, রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

মূল আলোচনা:

উপন্যাসের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় বাতাবরণকে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা। যার পাথেয় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের ধনপতি উপাখ্যান। ঔপন্যাসিক এই কাব্যের অনুকরণ করেননি। শুধুমাত্র অনুসরণ করতে চেয়েছেন সময়ের তটরেখাকে। তাই আখ্যানের সূচনালগ্ন নয়, ধনপতির সিংহল যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণই তার উপন্যাসের উপজীব্য। আলোচনায় নিবেশিত হওয়ার পূর্বে প্রচ্ছদের বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য। কেননা সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে তার প্রচেষ্টার যথার্থতা- "ধনপতির সিংহল যাত্রা উপনিবেশ-পূর্ব বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে নতুন সেতুবন্ধন।.... নানা অবলুপ্ত নদী ও বিস্তৃত জনপদের বর্ণনা এবং অপ্রচলিত শব্দাবলী

পুনরুদ্ধারে এ-টি একটি দিগদর্শী রচনা।" [২] সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে দেশ-কাল। শুধু ইতিহাসের পাতায় কিংবা কাব্যের পান্ডুলিপিতে রয়ে গেছে কিছু নাম। কবিকৃত বিবরণগুলির স্মৃতিচারণে আবদ্ধ থাকেননি লেখক। বরং আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে পাঠকের কাছে নতুন ভাবে পরিবেশন করেছেন প্রাচীনের আলেখ্য। কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায়, রাজসমীপে চলেছেন ধনপতি। বিষয়বস্তুর রূপান্তর হয়নি এখানে। ফলতঃ রাজা আদেশ দিয়েছেন সিংহল যাত্রার। চন্দন কাষ্ঠ, লবঙ্গ, নানা মনি-মুক্তা নিয়ে আসতে হবে সুদূর দেশ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই ধনপতির হৃদয় দোলায়িত হয়। ঘর-সংসার, বধূ খুল্লনাকে ছেড়ে যেতে সে অক্ষম। তার গৌড়দেশ যাত্রাকালে লহনা কর্তৃক খুল্লনার দুর্গতির ছবি এখনও যেন তাজা। কিন্তু রাজাজ্ঞা অবিচল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে আয়োজন করতে হয় বাণিজ্যের। কবির কাব্যরূপটিকেই গদ্যের আঙ্গিকে সজ্জিত করেছেন লেখক। দৈবজ্ঞের নিষেধ, ডিঙা উত্তোলন কিংবা বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহের চিত্রটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। তৎকালের আচার-প্রক্রিয়া, বাণিজ্য উপকরণগুলি পুনরায় ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তরণী পূজার সমাপনে খুল্লনা নিমগ্ন চণ্ডীর আরাধনায়। স্ত্রীলিঙ্গ পূজায় ধনপতির কোপ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। তবে যাওয়ার আগে নদীবন্ধে উপস্থিত ধনপতির শৈশবচারণা মধুরতায় জারিত। সেখানেই প্রকট প্রাচীনত্বের সৌন্দর্য- "জলস্তরের অবতরণে জলতৃণের আস্তরণ পড়ে পাথরে, সিঁড়ি বেয়ে শম্বুক চলে নীচে, জলকাউড়ি ছোটো করে শ্বাস, দশভুজা কুলির বাস গড়ে নদীগর্ভে।.... কৈশোর-যৌবনে বহুবার জলতলে গেছে ধনপতি। ওখানে গুনগুন গান গায় মধুকরী, সে-সুরে মধুর মিষ্টতা, পুষ্পের সুরভি।..... শুধু ধনপতির আঁখি থেকে মুছে যাবে এই পট, এই পটভূমি" [৩] নিত্যদিনের সাধারনই আজ অরূপের আচ্ছাদনে ধরা দিয়েছে তার কাছে। এই দেখা যেন বিচ্ছেদের পূর্বে চির-পরিচিতের কাছে পুনরায় নতজানু হওয়ারই নামান্তর। সেসব ছেড়ে লবণাক্ত জলে ভাসমান হওয়ার দুঃস্বপ্ন কাতর করে তাকে। বলতে ইচ্ছা হয়, এই অসহায়তা ধনপতির সমান্তরালে সঞ্চারিত হয়েছে পাঠকের হৃদয়েও। বঙ্গের অকৃত্রিম রুপরাশি নবনবায়মান। যার আস্বাদন পেতে সৌভাগ্যের প্রয়োজন।

অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমাপ্ত হয়নি মোহমুগ্ধতা। অনিশ্চয়তার হাত ধরে ধনপতি চলেছে সিংহল অভিমুখে। রচয়িতা তার পথচলার সূত্র ধরেই গঠন করেছেন একটি মানচিত্র। ভৌগলিক সত্যতার পাশাপাশি, যাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে প্রকৃতির নৈসর্গিক শোভা। উপন্যাস পাঠকালে পাঠকও যেন হয়ে ওঠে সহযাত্রী। সপ্তডিঙ্গা জল কেটে এগিয়ে যায়। আর দৃশ্যগোচর হয় দুধারের জনপদ ও টুকরো জীবনযাত্রা। অতল জলে এটাই প্রাণের স্পন্দন- "ডাহিনে বাবলা বৈচি তাল খাজুর যজ্ঞডুমুর ঘেরা ছোট একটি গ্রাম। নাম ললিতপুর।.... আঁধারের ভেতর থেকে ফুটে-ওঠা গ্রামটির বায়ুতে শুচিতা, লবঙ্গলতায় শুভ্রতা, স্বরে মধুরতা। বিলাসী সেই গাঁয়ে ধীর পায়ে মাঠে চলে হালের বৃষ, আয়েশে গোঠে যায় কিশোর রাখাল, মন্থর পাক দেয় তেলিয়া বলদ, শুয়ে থাকে একান্তে

কুমারের চাক।” [৪] সত্যই আচ্ছন্ন করে গ্রাম্যতার স্পর্শ। সেখানে নগরায়নের যান্ত্রিকতা নেই। আছে অলস সুরের প্রশ্রয় আর অবসরের আনন্দ। লেখনীর টানে পরিস্ফুট হলেও ক্ষণিকের শান্তি পাওয়া যায়। এতে লেখকের রসজ্ঞতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে গ্রামটি। এরপর অজয়ের দক্ষিণতটে বিবাহের উদ্দেশ্যে চলে বরযাত্রীর দল। তাদের পোশাকে যেমন কুমকুম, তারবালা, কলাধৌত মুকুটের মতো প্রসাধনীর তালিকা বিদ্যমান; তেমনি নৃত্যগীতের আসরে সম্পূর্ণ হয়েছে উৎসব। ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক আচরণ-অনুষ্ঠানের এই চিত্র, বস্তুতই সেই সময়পর্বের সমৃদ্ধ জীবনপ্রবাহের সাক্ষ্য বহন করে। বহু স্থান অতিক্রম করে ধনপতি উপনীত হয় নদীসঙ্গমে, লেখক জানিয়েছেন- “ভাগীরথী-অজয় সংগমে জন্ম নেয় এক নব প্রত্যুষ। আঁধারের অবশিষ্ট কণাগুলি ঝড়ে পড়ে নদীজলে হিমকণা সঙ্গে। ধূসর দিগন্তটি ধীরে ধীরে কলধৌত। ধনপতি সদাগর দেখে সুদূর বিস্তৃত এক জলপুরী। দুই স্রোতের মিলনে তরঙ্গ বাঙ্ময়, নদী-সংগম উচ্ছল। যেন দীর্ঘ আনন্দঘন, প্রতিক্ষিত এই মিলন সুদূর প্রত্যাশী।”[৫]

রাত্রির রহস্যময়তায় সূর্যের কিরণ ঢেলে দিয়েছে আলোকের উচ্ছলতা। ব্রাহ্মমুহূর্তে পুণ্যস্নান সেরে পবিত্র হয় ধনপতি। গাভীর সরলতা তাকে মনে করিয়ে দেয় উজানীর কথা। তৎকালে হিন্দু সমাজে গাভী পূজিত হতো গো-মাতা রূপে। ধনপতি যেভাবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, তা এই বিষয়ের সাক্ষী। ষোড়শ শতকের আধ্যাত্মিক পরিবেশ গড়ে ওঠে ঋষিগনের বেদমন্ত্র উচ্চারণে। বেদ ও পৌরাণিকতার মিশেলে সমাপন হয় নদীসঙ্গমের বৃত্তান্ত। পুনর্বার আসে ভাগীরথী স্রোতে নিশীথের হাতছানি। উর্বর শ্যামলতা ততক্ষণে অন্তর্হিত। ভাগীরথীর জলে কেবল নিস্তব্ধতা- “নদীর দুই-তীরে গাঢ় হয় নৈশ দ্বীপ্রাহরিক আঁধার। ঘন বাজে রাতের স্বর। সপ্তডিঙার কেরয়াল-ধনী নিদ্রাতুর।.... সপ্তডিঙ্গা ভেসে চলবে চন্দ্র আশ্বিন এর মেঘমালার মত নির্ভার।” [৬]

রাতের অন্ধকারে আরও মনমুগ্ধকর হয়ে ওঠে ভাগীরথীর দুই পাশের জনপদগুলি। শুধু সপ্তডিঙ্গা নয়, লেখকের বর্ণনায় সেই নিস্তব্ধতার আবেশে চলমান হয় পাঠকের মনও। ত্রিবেণী পার হয়ে তারা যায় সপ্তগ্রামের দিকে। এই বন্দর বণিকদের তীর্থক্ষেত্র। বহুদেশ থেকে সদাগরেরা বাণিজ্যের আশায় আসে এখানে। আমদানি-রপ্তানির জন্য নিয়ে যায় প্রচুর দ্রব্য। প্রভাত হতেই কর্মব্যস্ততায় নিমজ্জিত সপ্তগ্রাম। তাদের বেশভূষা, দেহভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এমনকি কাজের মধ্যে পাশা খেলা বা অক্ষয় ক্রীড়ায় নিজেদের ক্লান্তি দূর করে বণিকগণ। তৎকালীন বাংলার বাণিজ্য-ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করে নিতে অসুবিধা হয় না। এই জীবনচিত্রের সঙ্গেই সংযোজিত হয়েছে খাদ্য তালিকা- “ব্যবস্থা হয় দ্বিপ্রাহরিক আহারের-ফুলবড়ি দেওয়া নট্যাশাক, খন্ড দেওয়া দুগ্ধ-অলাবু, ইক্ষুরস মেশানো মুগসূপ, আদারস ও মরিচ জারিত কই ভাজা, মান ও বড়ি দেওয়া কাতলের ঝোল, চিঙ্গিরার বড়া।” [৭]

এছাড়া মিষ্টান্নের সমাহারও কম নয়। এ তো বাঙালি রসনার ঐতিহ্য, যা সমৃদ্ধ করেছে সাহিত্যকে। বঙ্গের বিশালতা এই পর্যালোচনায় তুলে ধরা একপ্রকার অসম্ভব। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নদ-নদীর নামোল্লেখ। ধনপতিকে বিপাকে ফেলতে নদ-নদী ধাবিত হয় মগরায়। যার অন্তরালে রয়েছে চন্ডীর ষড়যন্ত্র। অলৌকিকতার আবরণে প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত। অবশ্য আধুনিক লেখকের মূল লক্ষ্য নদীমাতৃক বঙ্গের সম্যক ধারণা প্রদান করা। কাঁকি, মুন্ডেশ্বরী, দ্বারহাটা, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি জনপদ ঐতিহাসিকতার প্রতীক। যার মধ্যে দিয়ে রূপনারায়ন, কোপাই, ত্রিনয়না গঙ্গা ইত্যাদি নদী মগরা গামী। প্রকৃতির প্রলেপে যা আরো প্রাণবন্ত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ডিঙাগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। সর্বস্ব হারানো ধনপতি তখন যেন কেবল এক অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতিরূপ। সাগরসঙ্গম অতিক্রান্ত হলে দেখা যায় একটি মাধব দেউল। যার মন্দির গাত্রে অঙ্কিত প্রতিমূর্তিগুলি পুরাকালের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়ক। মাধবের দশাবতার রূপ, সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য, বামনাবতারের আখ্যান ইত্যাদি মৃৎ-চিত্রের বিবরণে; হিন্দুধর্মের পৌরাণিক ঐশ্বর্যের সুচারু বর্ণনা মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। একা দুর্গাবরে ধনপতি চলে নীলাচলের দিকে। কান্ডারী কথকথায় বিবৃত করে নীলাচলে মাধব বংশের গৌরব-মহিমা। যদিও ছয় ডিঙ্গা আর অজস্র প্রাণের হাহাকারে ধনপতি তখন বিমর্ষ। তটরেখা দেখা গেলে সকলেই ভক্তি ধারায় প্রণত-‘গড় হও হে সর্বজন, নাম নাও’ [৮]। সংকটের অভিঘাতে পরিত্রাতার চরণে নিবেদিত হওয়াই শেষ আশ্রয়। নদীপথের পালা সাঙ্গ করে তারা হাজির পুণ্যতীর্থ জগন্নাথ ধামে। যার অনন্ত মাধুর্য এনে দেয় স্বর্গীয় আশ্বাস। রাধা-কৃষ্ণ নাম শ্রবণে শুচিস্নিগ্ধ শ্রীক্ষেত্র। সেখানের লীলা পাঠককে এক অর্থে দাড় করিয়ে দেয় মধ্যযুগীয় পর্বে- “ধনপতি দাঁড়ায় দেবালয়ের সমুখে। অজস্র শ্বেত কবুতর ওড়ে দেবালয় শীর্ষে। সোপান ভাঙে ধনপতি। করযোড়ে প্রণতি জানায়। অর্পণ করে পুষ্প, তুলসি, ধূপ, ধুনা। নয়ন দু-টি মুদে উচ্চারণ করে বন্দনা মন্ত্র।.... নয়ন মেলে দেখে সম্মুখে অপরূপ জগন্নাথদেবের মূর্তিখানি” [৯]

পূর্ণচন্দ্র তিথিতে তারা রওনা হয় সাগরের দিকে। নানা উত্থান-পতন পেরিয়ে ধনপতির বাণিজ্যতরি যখন সিংহলে প্রবেশ করতে আর মাত্র একদিন বা অষ্টপ্রহর বাকি, তখনই চিন্তায় আকুল দেবী চণ্ডী। কারণ একবার সেই স্থানে পৌঁছে গেলে মর্ত্যে চন্ডীর পূজাপ্রচার থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। তাই সখী পদ্মাবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কমলেকামিনীর রূপ ধারণ করেন কালিদহে। আসলে সেই জলে ভাসমান ধনপতির একটাই দুর্বলতা, “ধনার কিসের ব্যাধি সে কথা সর্বজনে জানে। ওটি হল কামজ্বর” [১০]। ফলতঃ একে ব্যবহার করেই দেবী তাকে দুর্বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ভঙ্গের পর ধনপতি দর্শন পায় কমলেকামিনীর- “বিস্ময়ে দেখে প্রতিপদ নিশিতে কালিয়দহে পূর্ণিমার রজতশোভা। পদ্মাবতির যুক্তিতে অভয়ার মায়াজাল কালিয়দহে।.... অভয়া হাস্যবদনা কামিনী রূপে উপবেশন করে কমলটিতে। মায়াবদ্ধ ধনপতি সে অনন্য দৃশ্য দেখে অনন্ত বিহ্বলতায়।” [১১] এই রমণীয়তা মনের অজান্তেই

অন্তরজগতে আভাসিত করে, কবিকঙ্কনের কাব্যে প্রতিকায়িত কমলেকামিনীর রূপকে-
"অধর বিম্বুক বন্ধু : বদন শরদ ইন্দু : কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন। প্রভাত ভানুরছটা : কপালে সিন্দুর ফোঁটা : তনুরুচি ভুবনমোহন।।" [১২]

এখন প্রশ্ন এই মূর্তির সঙ্গে বঙ্গদেশীয় পূজার যোগসূত্র গড়ে উঠেছে কিভাবে। এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও একটি কথা স্বীকার্য যে, কমলেকামিনী আসলে পৌরাণিক গজলক্ষ্মীর মূর্তি। যার সঙ্গে বাঙালি সমাজের পরিচয় গড়ে ওঠে, যখন বাণিজ্য সূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে যাতায়াত শুরু হয়। বাঙালী বণিকদের সমৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের দেবী রূপে পূজিত হতে থাকে কমলেকামিনীর মূর্তি। মুকুন্দরামের কাব্যে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার এই নিদর্শনটি সম্ভবত ঔপন্যাসিককেও প্রলোভিত করে। সেহেতু তিনি এটিকে সমমর্যাদা দিয়েছেন। চন্ডীমঙ্গলের উপাখ্যান অনুযায়ী দৈবজ্ঞের বিপাকে ধনপতি পর্যবসিত হয় বন্দীশালায়। তবে এই উপন্যাসে বন্দী অবস্থায় ধনপতির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি মনকে বেশিক্ষণ আবিষ্ট রাখে না। সেটিই হয়তো লেখকের অভিপ্রায়। কারণ কোনো ব্যক্তি নয়, এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে অতীতচেতনার উপলব্ধি। তাই আবারও ঋতুচক্রে 'গীতময় লঙ্কা দ্বীপ' বয়ে আনে ভিন্ন সুরমূর্ছনা। বৃক্ষ, পুষ্পরাজী, পতঙ্গের আলোড়নে রচিত হয় সুরলৌকিক ব্যঞ্জনা। সেখানেই উপসংহার সূচিত হলেও তার রেশ থেকে যায় বহুক্ষণ।

পরিশেষে বলা যায়, ঔপন্যাসিক প্রাগাধুনিক পর্ব ভ্রমণের তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে তুলেছেন। দিবারাত্রির আবর্তনে তা শুধু দৈনিক পট পরিবর্তনের ঈঙ্গিত নয়। সেখানে নিবদ্ধ হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের চলমানতার ইতিহাস, বাংলার বুকে সাধারণ মানুষের দিন যাপনের প্রণালী। প্রকৃতির নিবিড় আলিঙ্গনে যার শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। অতীত ভ্রমণের এর চেয়ে সহজলভ্য উপায় আর কী বা হতে পারে! তাই বলা যেতেই পারে, শিক্ষিত বাঙালির হৃদয়ে তথ্যের বাইরে সত্য রূপে ধরা দিয়েছে 'ধনপতির সিংহল যাত্রা'। বললে অত্যুক্তি হয় না, 'সে উপন্যাস আমাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছে আমাদের হাতে' [১৩]। মগ্ন রচয়িতা করেছেন শিল্পের উদযাপন। যা বাংলা সাহিত্যের রত্নাগারে উপন্যাসটিকে করে তুলেছে চিরস্থায়ী।।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, চৈত্র ১৩৯৩, মেঘদূত, পৃষ্ঠা ৭১৬
২. মুখোপাধ্যায় রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৪, প্রচ্ছদ
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৬১-৬২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৯
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১০৪

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৭
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ২০১
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৩
১২. চক্রবর্তী মুকুন্দ, সম্পাদনা- সনৎকুমার নস্কর, বিদ্যা পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫
১৩. মুখোপাধ্যায় রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৪, প্রচ্ছদ

১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ,বাঙালী উদ্বাস্তু ও জনস্বাস্থ্য – একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বিভাস বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ নাকাশিপাড়া, নদিয়া

সারসংক্ষেপ : ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা বহুবছর ধরেই অব্যাহত ছিল। এই গবেষণা পত্রটির প্রাথমিক লক্ষ্য হল, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা সেই সকল অভাগা উদ্বাস্তুদের স্যানিটারি তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা। তখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের 'উদ্বাস্তু শিবিরে' আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের জন্য কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ন্যূনতম চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের জন্য নেওয়া হয়নি স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা। উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতার শিয়ালদহ রেল স্টেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সময়, এই রেল স্টেশনটি উদ্বাস্তুদের 'ট্রানজিট ক্যাম্প' হিসেবে বিবেচিত হত। সেখানে অনেক উদ্বাস্তুকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে ও অশেষ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে 'মুক্তিযুদ্ধ' শুরু হওয়ার পর পুনরায় ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি হিন্দু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতবর্ষে চলে আসে এবং তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। ফলত, সেসময় মানবিক সংকট আরো একবার ব্যাপক আকার ধারণ করে। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়, খাদ্য, জল, সঠিক পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাবলি তাঁদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। কলেরা, অপুষ্টি, পেটের রোগ, যক্ষা, ডায়রিয়া ইত্যাদি কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এসময়।

শব্দ সূচক : উদ্বাস্তু, দেশভাগ, জনস্বাস্থ্য, ডায়রিয়া, কলেরা, শিবির (ক্যাম্প)

ভূমিকা : ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দু জনসাধারণ মুসলিমদের দ্বারা নানাধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল। তাঁদের গরু, ছাগল, উৎপন্ন ফসলাদি একপ্রকার জোর করে কেড়ে নেওয়া হত, এমন কি বাড়ির মেয়েদের সম্মান রক্ষা করাটাও এসময় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দুরা আশায় বুক বেঁধেছিল এই ভেবে যে, দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে পারলে তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি সম্মানের সাথে তাঁরা বেঁচে থাকতেও পারবে। এছাড়া তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্য

উপযুক্ত শিক্ষার এবং সুন্দর ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের জন্য ১৯৫০-এর দশকে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি হিন্দু তাঁদের নিজ দেশ (পূর্ব পাকিস্থান) ত্যাগ করে ভারতে চলে আসে বা আসতে বাধ্য হয় এবং উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার সময় মহিলাদের উপর হামলা, নৃশংসতা, অপহরণ ও চুরি খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। ফলত, আরো একবার সে দেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেয়, খুঁজে পায় নতুন বাসস্থান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে 'মুক্তিযুদ্ধ' শুরু হলে পুনরায় প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষ পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে ভারতে চলে আসে ও আশ্রয় নেয় উদ্বাস্তু হিসেবে।

৭১-র মুক্তিযুদ্ধের সময়ের উদ্বাস্তু ও তাঁদের জনস্বাস্থ্য:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পূর্বের মতো আরো একবার বহুসংখ্যক বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ভারতে আসতে শুরু করে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশনার (UNHCR)-এর মতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে প্রায় দশ মিলিয়ন উদ্বাস্তু ভারতে এসেছিল। এই উদ্বাস্তুরা মূলত ভারতের চারটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসামে আশ্রয় নিয়েছিল। এসময় ভারতে আগত এই দশ মিলিয়ন উদ্বাস্তুর মধ্যে আনুমানিক ৭.১ মিলিয়ন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল বাসস্থানের খোঁজে এবং এর মধ্যে আবার পাঁচ মিলিয়ন মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল বিভিন্ন অস্থায়ী 'উদ্বাস্তু ক্যাম্পে'। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন স্কুল, হোস্টেল, এমনকি পাইপও বসবাসের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতো।

লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু যারা ভারতে এসেছিল, তাঁরা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতেই ভারতে বসবাস করতো। খাদ্যের অভাব, অপর্যাপ্ত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নিকৃষ্ট মানের জীবনযাত্রা ইত্যাদি কারণে উদ্বাস্তুদের মধ্যে মৃত্যুর হারও ছিল বেশ বেশি। ১৯৭১ সালের জুলাই মাস থেকে উদ্বাস্তু আগমনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এসময় আবার ভারী বর্ষার কারণে কলেরা রোগের প্রকোপ দেখা দেয় এবং তার জন্য প্রচুর মানুষ মারাও যায়। এছাড়া, অপুষ্টিজনিত কারণে উদ্বাস্তু শিশুদের অবস্থাও খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে এসময় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁরা উদ্বাস্তুদের ভারতে প্রবেশ রোধ করতে সীমান্ত সিল করার পরিকল্পনা করছে কিনা? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, খাদ্য ও আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে আসা কোনো উদ্বাস্তুকে ফেরৎ পাঠাবে না ভারত সরকার। উদ্বাস্তুদের মৌলিক সুবিধা প্রদানের জন্য ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা ও স্থানীয় জনগণের সাথে কাজ করেছিল। সরকার, NGO এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলির দ্বারা প্রদত্ত প্রধান পরিষেবা গুলির মধ্যে অন্যতম একটি পরিষেবা ছিল স্বাস্থ্যসেবা।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে উদ্বাস্তু জনসাধারন আসতে শুরু করলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে যে, তাঁদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হবে এবং তার খরচও সরকারই বহন করবে। অবশ্য আত্মীয় বা বন্ধুদের কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁদের এই সাহায্য প্রদান করা হয়নি। ওই বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আসা প্রায় চার মিলিয়ন উদ্বাস্তু মানুষের মধ্যে মাত্র ১.৯ মিলিয়নের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। প্রায় পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তু বিভিন্ন স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকিরা খোলা জায়গায় ছিল। জুন মাসের ভারী বর্ষা উদ্বাস্তুদের অবস্থা আরো বেশি খারাপ বা সংকটময় করে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ, বাদুড়িয়া এবং স্বরূপ নগরের মতো বেশ কিছু ক্যাম্পে প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি উদ্বাস্তু মানুষদের রাখা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার তৎকালীন অতিরিক্ত জেলাশাসক J.V.R Prasad Rao প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, দুই মিলিয়ন স্থানীয় জনসংখ্যার বিপরীতে প্রায় ১.২ মিলিয়ন উদ্বাস্তু নদিয়া জেলায় আশ্রয় পেয়েছিল। এই জেলাতেই রাজ্যের সবথেকে বড় ‘উদ্বাস্তু ক্যাম্প’ ছিল, যেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রয় নেওয়া এই উদ্বাস্তুদের অনেকেই ডায়রিয়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন মারা গিয়েছিল ।

উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম বন্দোবস্তের যথেষ্ট অভাব ছিল, যা তাঁদের অনিশ্চিত জীবনকে আরো বেশি বিপজ্জনক করে তুলেছিল। চ্যাপ্টা বাঁশের ঝুপড়ির লম্বা লাইন বৃষ্টিতে দিন দিন যেন আরো দীর্ঘ হচ্ছিল। ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট চালা ঘরের মেঝেতে মানুষ ঘুমাতো, রাস্তার ধারে মলত্যাগ করতো। এমনও দেখা গেছে যে, একটি ডিম পাওয়ার জন্য প্রায় পঞ্চাশটি শিশু মারামারি করছে। অনেক সময় দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে বমি করতে করতে বহু শিশু অবসন্ন বা অজ্ঞান হয়ে যেত। খোলা আকাশের নিচে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অনেক মহিলা মাটির উপরেই সন্তান প্রসব করে দিত। গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন-এর নারায়ণ দেশাই লিখেছেন, এমন দৃশ্যও দেখা গেছে যে, প্রায় ২৩ জন মানুষ মাত্র ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৯ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি তাবুর নিচে বসবাস করছিল । হাঁটু সমান জলের সাথে সংযোগ এড়িয়ে চলার জন্য একটু উঁচু করে বানানো ৮ বর্গফুটের বাঁশের মাচায় বাস করতেন প্রায় ১৬ জন মানুষ। কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং এটাই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম।

১৯৭১ সালের ৮ই জুন, নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় চল্লিশ হাজার উদ্বাস্তু একটি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখান থেকে তেইশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি। মৃত্যুগুলি হয়েছিল মূলত বিভিন্ন রোগ, অবসাদ ও অপুষ্টি জনিত কারণে। যদিও কলেরার কারণে কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। কলকাতা শহরের মধ্যেই অবস্থিত দ্বিতীয় ক্যাম্পে নতুন কোনো কলেরা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। যে রোগটি ‘Gastro-intestinal’ ব্যবস্থাকে আক্রমণ

করেছিল, তা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই, বর্ষা ঋতুতেও কলকাতার রাস্তার ধারে অবস্থিত বিভিন্ন গাছ ও ঝোপঝাড়ের নিচে বসবাস করতো বা করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত উভয় কারণে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইচ্ছা ছিল কলকাতা থেকে কমপক্ষে কুড়ি মাইল দূরে নতুন কোনো উদ্বাস্তু ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা। তবে,সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'Boy Scout Centre'-এ নতুন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' থেকে আরো জানতে পারা যায় যে, তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, উমা শঙ্কর দীক্ষিত সংসদকে জানিয়েছিলেন যে, প্রায় ৪,৭৩৮,০৫৪ জন উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে ভারতে এসেছিল। তবে বেশ কয়েকজন পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, ভারতে আগত বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি ছিল এবং তা ৫ মিলিয়নের অধিক। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মি. দীক্ষিত এটাও বলেছিলেন যে, প্রায় ১,২৫০ জন উদ্বাস্তু কলেরা মহামারীতে মারা গিয়েছিল এবং প্রায় ৯,৫০০ জন হাসপাতালে ভর্তি ছিল। যদিও প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তা প্রায় ৪,০০০-এর কাছাকাছি। ১৯৭১ সালের গ্রীষ্মকালে কলেরা রোগ দেখা দেয় এবং তার ফলে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। John's Hopkins Centre for Medical Research and Training in Calcutta(JH-CMRT) উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ডাক্তারদের সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত বনগাঁতে যখন কলেরা মহামারীর আকার নেয়, তখন তাঁরা উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা করতো। চিকিৎসক ও প্যারামেডিকদের একটি দল পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন যে, *"সংক্রামক রোগীদের জন্য ১৬ টি শয্যাসহ দুটি কটেজ নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু তা কলেরা ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হত। আমরা যখন ১৯৭১ এর ২৪-শে জুন পৌঁছেছিলাম, তখন প্রায় আনুমানিক ৩,৫০,০০০ জন উদ্বাস্তু শহরে আশেপাশে বসবাস করছিল। ওই সময়েই প্রতিদিন শহরে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,০০০ জন। এর ফলে শহরে সঞ্চিত স্বল্প সম্পদের উপর যথেষ্ট চাপ পড়েছিল।"* ওই বছরের জুন মাসের শেষ নাগাদ, প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন করে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছিল। শীঘ্রই কলেরা ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত কটেজগুলির শয্যা শেষ হয়ে যায়। এরপর রোগীদের মেঝেতে রাখা হতে থাকে এবং সেখানেও ভিড় বাড়তে থাকে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে কলকাতা থেকে অস্থায়ী ক্যানভাস খাট আনতে হয়, যেগুলো হাসপাতালের অস্থায়ী তাবুতে রাখা হয়েছিল।

কলেরা ছাড়াও অপুষ্টি, ক্লান্তি বা অবসাদ এবং পেটের রোগের কারণেও বহু উদ্বাস্তু মারা গিয়েছিল। অনেক উদ্বাস্তু ক্যাম্পে যক্ষা প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। বর্ষা ঋতুর স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা খারাপ পরিস্থিতিকে আরো বেশি খারাপ করে তুলেছিল। ডায়রিয়া এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার কারণে প্রায় ৮০০ জন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্প গুলির প্রায় ১৪% শিশু

অপুষ্টিতে ভুগছিল। মার্কিন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন যে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও বয়স্ক উদ্বাস্তুরা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমনও দেখা গেছে যে, মায়ের কোলে যে শিশুটি রয়েছে সে তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। অনেক সময় সে মাথা তুলতে পারতো না বা তার শরীর থেকে চামড়া ঝুমঝুল করতো। আবার 'ওডেমা' রোগের কারণে অনেকের পা ফুলে যেত। অনেক সময় ভিটামিনের অভাবে বাচ্চারা অন্ধ হয়ে যেত বা শরীরে কোথাও ঘা হলে তা আর সহজে সারতে চাইতো না।

সরকারি উদ্যোগ : দেখা গেছে যে, ১৯৭১ সালের আগে যে সকল মানুষ উদ্বাস্তু হিসেবে পূর্ব পাকিস্থান থেকে ভারতে এসেছিলেন, তাঁরাও বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হয়েছিল এবং অনেকে মারাও গিয়েছিল। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য এক কোটি টাকা ব্যয় করেছিল। সেই সময়ে যক্ষা রোগীদের প্রয়োজনে ছয়টি ভ্রাম্যমান ইউনিটের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল এবং এগুলি পরে উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার প্রয়োজনেও ব্যবহার হত। এক্ষেত্রে যক্ষা নিয়ন্ত্রণের সফলতাকে সরকার তার কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এছাড়াও সরকার অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের বিনামূল্যে অ্যান্টিবায়োটিক সরবরাহ করেছিল। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্প বা আশ্রয় শিবিরে যাওয়ার আগে উদ্বাস্তুদের টাইফয়েড ও কলেরা টিকা নিতে বলা হয়েছিল এবং তাতে ভালো ফলও পাওয়া গিয়েছিল। সরকার যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বহির্বিভাগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। যক্ষা রোগীদের চিকিৎসার জন্য রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া এবং বর্ধমানে ছয়টি মেডিকেল ইউনিট এসময় কাজ করে গেছে। তবে এই পদক্ষেপগুলি যথেষ্ট ছিল না।

১৯৭১ সালের ২০-শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪৬,৭৫২ জন উদ্বাস্তু কলেরা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং তার মধ্যে প্রায় ৫,৮৩৪ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৭১-এর উদ্বাস্তু সংকটের সময় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ৭০০ টি মেডিকেল ইউনিট খোলা হয়েছিল। নতুন ও পুরনো মিলিয়ে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল প্রায় ৫০ টি রেফারেল হাসপাতালের। বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে অতিরিক্ত চার হাজার শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । এমনকি খোলা হয়েছিল একশো সজ্জা বিশিষ্ট একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল। এছারা উদ্বাস্তু জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রায় ৪০০ জন ডাক্তার, ২,১০০ জন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ এবং ৭০০ জন ডাক্তারি ছাত্র সর্বদা নিয়োজিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কলকাতায় একটি 'মেডিক্যাল স্টোর' ছিল। এই স্টোরে পর্যাপ্ত পরিমানে কলেরা নিরোধক ভ্যাকসিন, রিহাইড্রেসন ফ্লুইড, ব্লিচিং পাউডার,ম্যালেরিয়ার ঔষধ ও অ্যান্টিবায়োটিক মজুত রাখতে বলা হয়েছিল। সরকার বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও তার আশেপাশের বাসিন্দাদের গণ-টিকাকরণের ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়া ভারত সরকার উদ্বাস্তু শিশুদের নিয়েও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল, কারণ বেশিরভাগ শিশুই অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছিল।এই সমস্যা নিরসনের

জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সারকার ‘Operation Life Line’ নামে একটি কর্মসূচী গ্রহন করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি তখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অন্যান্য ব্যবস্থাদির জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। অন্য একটি তথ্য থেকে এটাও জানা যায় যে, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ কোনো সারকারি সাহায্য গ্রহন করেনি। তবে বলা যায় যে, উভয় সরকার দ্বারা নেওয়া এই পদক্ষেপগুলি মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না এবং সকল উদ্বাস্তু জনসাধারনের কাছে অন্যান্য পরিষেবার সাথে চিকিৎসা পরিষেবাও সমানভাবে পৌঁছাতে পারেনি।

উপসংহার : অসহায় উদ্বাস্তুদের কাছে সঠিক স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যবিধি, চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব

সরকারি নীতিও অনেক ক্ষেত্রে বেশ কঠোর ছিল। চালু হবার পর উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলির অবস্থা দীর্ঘদিন প্রায় একই রকম ছিল। এই অসহনীয় অবস্থা উদ্বাস্তুদের জীবন তথা তাঁদের সামাজিক পরিবেশকে ভীষণ প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা তারপরে আসা উদ্বাস্তুদের জীবন ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। একদিকে উপযুক্ত বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধির অনুপস্থিতি এবং অন্যদিকে কলেরার মতন মহামারী, মৃত্যু ইত্যাদির কারণে বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকট সে সময় ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছিল। একথা সত্য যে, সরকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা নিরসনে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিল। কিন্তু, সেই একই সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি ছিল খুবই উদাসীন।

তথ্যসূত্রঃ

1. Saha, K. C.,“The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East.”*Refugees and the State: Practices of Asylum and Care in India,* 1947 to 2000, Sage Publication,(New Delhi, 2003), P.213.
2. Ibid.
3. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার,প্রান্তিকমানব, দীপপ্রকাশন,(কলকাতা,২০২২),পৃ: ৩২২
4. “Lok Sabha Debates” July 21, 1971. Access on 22/12/22(https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2321/1/lsd_05_02_21-07-1971.pdf)
5. Saha, K. C.,“The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East.”*Refugees and the State: Practices of Asylum and Care in India,* 1947 to 2000, Sage Publication,(New Delhi, 2003), P.213.

6. Claude Mosse, “The Testimony of Sixty on the Crisis in Bengal” (Oxford: Oxfam, 1961), Cited in
7. Utsa Sarmin., *The Crisis of Public Health Among East Bengali Refugees in 1971.*
8. Narayan Desai, “The Testimony of Sixty on the Crisis in Bengal” (Oxford: oxfam, 1971), Cited in
9. Utsa Sarmin., *The Crisis of Public Health Among East Bengali Refugees in 1971.*
10. “Refugees and Cholera increase in India” New York Times, June 8, 1971. Access on 02.02.23 (https://www.nytimes.com/1971/06/08/archives/refugees-and-cholera-increase-in-india.html)
11. Ibid.
12. Saha, K. C.,“The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East.”*Refugees and the State: Practices of Asylum and Care in India,* 1947 to 2000, Sage Publication,(New Delhi, 2003), P. 213.
13. Edward Kennedy, “The Testimony of Sixty on the Crisis in Bengal” (Oxford: oxfam, 1971), Cited in UtsaSarmin., *The Crisis of Public Health Among East Bengali Refugees in 1971.*
14. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, উদ্বাস্তু, দীপপ্রকাশন, (কলকাতা,২০২২),পৃ: ১২০
15. Report on Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal 1957, Health, P.78
16. Saha, K. C.,“The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East.”*Refugees and the State: Practices of Asylum and Care in India,* 1947 to 2000, Sage Publication,(New Delhi, 2003), P.228.
17. 1Ibid.
18. Ibid.
19. Assembly Proceedings, Page 190, 16th Feb,1973.
20. Assembly Proceedings, Page 191, 16th Feb,1972(June-August).

লোকসংস্কারের সন্ধানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প (নির্বাচিত)

বাপ্পী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: গ্রামীণ জনজীবনে বিশেষত কৃষিনির্ভর পল্লিসমাজে, প্রান্তিক অঞ্চলে লোকসংস্কারের নানাদিক আজও নানাভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে সমাজে। সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবর্তন হলেও ভাবগত কাঠামো প্রায় একইরকম থেকে গেছে। তাঁদের জীবনযাত্রা-আচার-আচরণ, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তা লক্ষ্য করা যায়। নাগরিক জীবনের রূপকার হিসেবে সাধারণ পাঠক সমাজে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচিতি লাভ করলেও কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রায় প্রোথিত লোকসংস্কারের নানা বৈচিত্র্য বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কিছু গল্পে অনায়াসে ফুটে উঠেছে।
সূচক শব্দ: কৃষিনির্ভর, গ্রামীণসভ্যতা, প্রোথিত, বস্তুবিশ্ব, লোকজীবন, লোকসংস্কার, লোকসংস্কৃতি, সংস্কারবদ্ধ।

মূল আলোচনা:
প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে বর্তমান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত দেশকালের প্রেক্ষিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। জীবন-জীবিকার চাহিদা অনুসারে উৎপাদন সম্পর্ক, গোষ্ঠীজীবনের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে অবিরামভাবে। সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির এই পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বলেছেন। তারা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংস্কৃতির পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। পল্লব সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা হলো বস্তুবিশ্বের সামগ্রিক এবং অবিরাম বিবর্তনের সূত্র ধরেই মানুষের সামাজিক ঊর্ধ্বতনও ঘটে চলে।"[১]

তবে বস্তুবিশ্বের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপ বদলানোর সঙ্গে তাল রেখে মানবসভ্যতা, সংস্কৃতির সর্বাঙ্গিক রূপটি পরিবর্তিত হলেও অপরিবর্তিত থেকে গেছে তার অন্তর্নিহিত মানস পরিকাঠামোটি। সংস্কৃতির বহি:রঙ্গ একটু একটু করে রূপান্তরিত হলেও ভাবগত কাঠামো মোটামুটি ভাবে অবিকৃত থেকেছে। আর সংস্কৃতির এই অন্তর্নিহিত অবিকৃত ভাবগত পরিকাঠামোর উৎস লোকজীবনের দৈনন্দিন জীবনাচারের নানা ক্রিয়াকর্ম, উৎসবের মধ্য দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে ফুটে ওঠে। গোপাল হালদার তাঁর 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন–

"লোক-গীতি, লোক-সাহিত্য যা টিকে আছে, লোকজীবনের মধ্যে।"[২]
এই লোকজীবনযাত্রার শিকড় সন্ধানে লোকসংস্কৃতিচর্চা অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। লোকসংস্কৃতি বলতে সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে যাদের অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমজীবী–

"ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি যারা সৃষ্টি করেন তারা ভারতবর্ষে বা এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই হয় কৃষক, নতুবা শ্রমজীবী। এশিয়ার লোকসংস্কৃতিতে কৃষিজীবনের উপাদানই বেশি।"[৩]

লোকজীবনে প্রচলিত নানা লোকসংস্কার মূলত লোকসংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। এই লোকসংস্কার মানুষের নিত্যনৈমত্তিক আচার-আচরণ, ধর্মবিধি, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মে কোনো না কোনোভাবে পরিলক্ষিত হয়। লোকজীবনের প্রতি যেকোনো লেখকরই একটা আত্মিকটান বজায় থাকে, যা কোনো না কোনো ভাবে তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠে। এরকমই একজন বিশিষ্ট মননশীল লেখক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)। যদিও তাঁর প্রধান পরিচয় শহর ও শহরতলীর জীবনের রূপকার তথা নাগরিক জীবনের লেখক হিসেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে লোকসংস্কারের নানাদিক তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ আইন' (১৮৫৬) পাস হয়েছে। দীর্ঘ এত বছর পরেও তার বাস্তব ভিত্তি আজও বিবর্ণ। সমাজে বিধবা-বিবাহের দৃশ্য মূলত ডুমুরের ফুলের মতো। উপরন্তু বিধবাদের নানা নিয়ম-শৃঙ্খলা, বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। সমাজে যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজার্চনা থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের স্থান হয় একমাত্র রন্ধনশালায়। নিজেদের বাপের বাড়িতেও তাদের স্থান হয় না কেননা সমাজের চোখে তাদের বিধবা হওয়া অকল্যাণকর। শুধুমাত্র বিধবা হওয়ার জন্য সামাজিক মান-মর্যাদা, নারীর কামনা-বাসনা থেকে তারা বঞ্চিত। এমনই এক সমাজ পরিত্যাক্তা বিধবা নারীর পরিচয় আমরা পাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুয়াশায়' গল্পে। লেখকের লেখনীতে তা স্পষ্ট রূপ পেয়েছে–

"বিধবা হবার পর ক'বছর তার বাপের বাড়িতে কেটেছে। বাপ-মা মারা যাবার পর ভায়েরা গলগ্রহ বলেই তাকে যে শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে গেছে, একথা সে জানে এবং তার জন্যেও তার কোনো ক্ষোভ নেই। সিঁথির সিন্দুর মুছলে বধু ও কন্যারা হেঁসেলে আশ্রয় পায়, এই এ বাড়ির সনাতন নিয়ম।"[৪]

পিতৃগৃহ পরিত্যাক্তা শ্বশুরবাড়িতে রন্ধনশালায়রত এই বিধবা নারী আর কেউ নয়, সে হলো আলোচ্য গল্পের অন্যতম চরিত্র সরমা। সমাজের চোখে তার জীবনের প্রথম ভুল বিধবা হওয়া এবং দ্বিতীয় ভুল হলো পুনরায় নতুন জীবন যাপনের স্বপ্ন নিয়ে মোক্ষদার ভাইপো নরেনের হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে তার জীবনে দ্বিতীয় ভুলের শেষ পরিণতি ছিলো মারাত্মক, তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সংস্কারবদ্ধ রক্তচক্ষু সমাজের ভয়ে নরেনের হাত ধরে থাকার স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেছে মুহূর্তে। নিরুপায় সরমা চিরতরের জন্য আশ্রয় স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছে সেই তিন কাঠা ফাঁকা জমি–

"পৃথিবীতে সমস্ত দ্বার যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন এই বিবর্ণ ঘাসের জমিটুকু সরমাকে বহুকালের হারানো মেয়ের মতো কোল দিয়ে তার ব্যর্থ জীবনের ওপর কুয়াশার যবনিকা টেনে দিয়েছিল।"[৫]

প্রেমেন্দ্র মিত্র সৃষ্ট আর একটি সংস্কারবদ্ধ বিধবা চরিত্র হলো 'সাগরসংগম' গল্পের দাক্ষায়ণী। লেখক এই গল্পে ধর্মসংস্কারের পাশাপাশি মাতৃত্বের স্নেহ ব্যাকুলতাপূর্ন মনুষ্যত্বের দিকটিকেও তুলে ধরেছেন। গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নান করার উদ্দেশ্যে দাক্ষায়ণী নৌকারোহনে বের হয়। কিন্তু যখন সে শুনতে পারে, বেশ্যার দল তাদের সহযাত্রী তখন থেকে সে নৌকায় জল গ্রহণ একপ্রকার বন্ধ করে দেয়। এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে আট বছরের বাতাসি নামক বেশ্যা মেয়েটিকে কেন্দ্র করে। কেননা সমাজে বেশ্যারা অস্পৃশ্য। তাদের হাওয়া লাগলে শরীর অশুচি হয়ে যায়- এমন একটা ধারণা লোকসমাজে আজও প্রচলিত। যদিও লেখক শেষ পর্যন্ত সংস্কারের বেড়াজাল কাটিয়ে দাক্ষায়ণী ও বাতাসির মিলনের মধ্যে দিয়ে মাতৃত্বের হৃদয় ব্যাকুলতার পাশাপাশি মনুষ্যত্বের জয়গানই ঘোষণা করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লেখকের মনুষ্যত্বের এই জয়গান হয়তো সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সফল ভাবে গ্রহন করতে পারেনি। তাই আজও সমাজে নীচুজাত উঁচুজাতের ভেদাভেদের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জাতপাতের ন্যায় আলোচ্য গল্পে লোকবিশ্বাস-এর আরেকটি দিক লক্ষ্য করা যায়, তা হলো মন্ত্র শক্তির প্রভাব। ব্রাহ্মণের মুখের কথা কখনো বিফলে যায় না- এই বিশ্বাস প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মধ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে আছে। সমাজের সর্বোচ্চস্তরে অবস্থিত ব্রাহ্মণেরা যদি অভিশাপ দেয় তাহলে আর রক্ষা নেই। দাক্ষায়ণীর তীর্থযাত্রীর সঙ্গী লক্ষণের ভয়-ভীতির মধ্যে দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়েছে স্পষ্টরূপে-

"ছই-এর ভেতর হইতে দাক্ষায়ণীর কণ্ঠ শোনা যায়, জোচ্চোর, পাজি, হারামজাদা, আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই তো তোকে সাগর পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না- তার আগে তুই ওলাউঠায় মরবি। লক্ষণ এ অভিশাপে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই নাই।"[৬]

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জনজীবন ও নাগরিক জীবনযাত্রার মধ্যে সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে। লোকবিশ্বাস, আচার-বিচার, অস্পৃশ্যতা লোকজীবনে যতটা সমাজবদ্ধ, নাগরিক জীবনে ততটা নয়। লোকসংস্কারের বেড়াজাল অনেকটাই কেটে উঠতে পেরেছে নাগরিক জীবন। 'মহানগর' গল্পে তাই আমরা দেখতে পারি, চপলা গ্রামের বাড়িতে যেতে পারেনি কিন্তু মহানগরে ঠাঁই পেয়েছে। কেননা চপলা তখন আর গৃহবধূ নয়, সে বারবণিতা। গ্রামে যে তার ঠাই নেই, এটা সে ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। কিশোর রতন সমুদ্রভরা একবুক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিল দিদিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে

যাওয়ার জন্য। কিন্তু জটিল, দুর্বোধ্য, নিষ্ঠুর, অমানবিক বিষাক্ততায় পরিপূর্ণ বিকৃত নগরজীবন থেকে লোকসংস্কার সম্পর্কে অজ্ঞাত রতন দিদিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। চপলাও সমাজসংস্কারের বেড়াজাল উপেক্ষা করে স্নেহের ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। তাই চপলাকে কাতরমুখে বলতে শোনা যায় তার অন্তরের গভীর বেদনার কথা-

"আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই।"[৭]

রতন ও চপলার বেদনা, হতাশার মধ্যে দিয়ে 'মহানগর' গল্পে একদিকে যেমন নগরজীবনের বিকৃত, জটিলতা, ইতরতা ও রুক্ষতা ফুটে উঠেছে তেমনি পরোক্ষভাবে সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ লোকজীবনের বাস্তব সমাজের ফ্যাকাশে বিবর্ণ রূপটিও যে ধরা পড়েছে তা বলা যেতেই পারে।

সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা পরিবারের সর্বময়কর্তা হলেও সংসার খরচের মূলধন মূলত নারীর(গৃহকর্ত্রী) হাতেই সঞ্চিত থাকে। এমনকি পুত্রবধূ আসার পরও সংসারের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কিছুর মূলে গৃহকর্ত্রী হিসেবে শাশুড়ি সর্বেসর্বা। লোকসমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানলে একজন শাশুড়ির কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তা লেখকের 'শৃঙ্খল' গল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভূপতি, বিনতি, ও ভূপতির মা মিলে তিন জনের সংসার। বিয়ের পূর্বে সংসারের যাবতীয় খরচপত্রের টাকা ভূপতি মা-র হাতেই জমা রাখত। গল্পে ভূপতির কথায় তা স্পষ্ট–

"সংসারের খরচপত্র আগে মা-ই করিতেন। টাকাকড়ি তাঁহার হাতেই থাকিত।"[৮]

কিন্তু ভূপতির বিয়ের পর সংসারের রাশ আর তেমনভাবে মায়ের হাতে থাকলো না। ইঁটের পাজার মতো গেঁথে থাকা দীর্ঘদিনের এই সংস্কৃতি কোনোমতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি ভূপতির মা। তাই শেষ পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে অভিমানে–

"হাতে যে আর কিছু নেই রে। মাইনে পেতে এবারে এত দেরি যে। ...ভূপতি আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া বলিয়াছে- আচ্ছা ওর কাছেই দেব'খন। চেয়ে নিও যা দরকার। আঘাত হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। ...সেইদিন হইতে তিনি নিজেকে সমস্ত সংসার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন।"[৯]

শহরতলীর জীবনযাত্রাতেও লোকসংস্কারের যে ছাপ রয়েছে তা ভূপতির মা-র আত্মমর্যাদার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

গতিশীল বস্তুবিশ্বে উৎপাদন সম্পর্ক, কৃষিব্যবস্থার বিবর্তন, গোষ্ঠীজীবনের উত্তরণ, চিন্তন ও মননের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও রূপান্তরিত। তবে সংস্কৃতির বহি:রঙ্গ একটু একটু করে রূপান্তরিত হলেও ভাবগত কাঠামো মোটামুটি ভাবে অবিকৃত থেকেছে। তাই লোকজীবনের পাশাপাশি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহরতলীর জীবনযাত্রাতেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ভাবগত কাঠামোর অবিকৃত রূপ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত নাগরিক জীবনের রূপকার হলেও জীবনের ভাঙ্গন, অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচন ও জীবনে জটিলতার বিশ্লেষণে লোকসংস্কারের নানা দিক যে তাঁর শ্রেষ্ঠগল্পে ফুটে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না। সচেতন বা অবচেতনভাবে মানুষের নানা বিশ্বাস, আচার-বিচার, সংস্কারের মধ্যে তা আজও গভীরভাবে প্রোথিত।

তথ্যসূত্র:

১. পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১১

২. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. অরুনা হালদার, অমিয় ধর (সম্পা.), 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, গোপাল হালদার', প্রকাশভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৯, পৃ. ২১৮

৩. দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা.), 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩, পৃ. ২৩

৪. সৌরিন ভট্টাচার্য, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২, প্রথম দে'জ সংস্করণ, মে, ২০০১, ষষ্ঠ সংস্করণ, মে, ২০১৪, পৃ. ১১২

৫. তদেব, পৃ. ১২৩

৬. তদেব, পৃ. ৫৩

৭. তদেব, পৃ. ৯৮

৮. তদেব, পৃ. ১৫৬

৯. তদেব, পৃ. ১৫৬-১৫৭

মৈমনসিংহ গীতিকা : পালাগানের আধারে প্রেম-সংগ্রামের ইতিকথা

মলি পাকড়ে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : চিরন্তন কাল থেকেই সাহিত্যের পাতায় চিত্রিত হয়েছে মানবজীবনের প্রতিকৃতি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য দেবনির্ভর হলেও তার ব্যতিক্রম নয়। সেকালের রচয়িতাদের কল্পনাতেও মনুষ্য জীবনের স্থূল-সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি অবয়ব লাভ করেছে তাদেরই সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্যে। মানব মনের অনন্য অনুভব গুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রেম। যা নিত্য নতুন রূপে লালিত হয়েছে নারী-পুরুষের মননে। তবে প্রেম মানে কি শুধুই রূপকথার আবেগ, ভাবকল্পনার বহিঃপ্রকাশ? উত্তরটা অবশ্যই নেতিবাচক। কারণ মানুষের জীবন সরলরৈখিক নয়। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তো সংগ্রামেরই নামান্তর। সেই অসম লড়াইয়ে পরাজয়ও দুর্লভ নয়। মানুষের এহেন নিরন্তর জীবন সংগ্রামের অধ্যায়ে প্রেম যেন একফালি আলোকরশ্মির মতোই উজ্জ্বল। সবসময় তা সুখ পরিণতি নাও পেতে পারে। কিন্তু সংসারের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও সেই প্রেমকে পূর্ণতা দেবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস বিরল নয়। এমনকি কোথাও তা যেন মিশে যায় মানুষের জীবন সমরের আধারে। যা আরও দৃঢ়তর করে একজন নারী ও পুরুষের পারস্পরিক বন্ধনকে। এই সম্পর্কের টানাপোড়েনের সূত্রে নর-নারীর ব্যক্তিত্বের পরিসরও নানামাত্রায় বিকাশ পায়। দৈবনির্ভর সাহিত্যের যুগেও শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের কথা স্থান পেয়েছে এমন একটি সাহিত্য সংরূপ হল ময়মনসিংহ গীতিকা।

সূচক শব্দ : নারী-পুরুষ, প্রেম, জীবন, সংগ্রাম, মৃত্যু, গীতিকা।

মূল আলোচনা :

প্রেম হল নারী-পুরুষের নিজস্ব হৃদয়ের অনুভব। এই পৃথিবীর সব যুগের সব ভাষার সাহিত্যে প্রেম অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। তবে নারী-পুরুষের হৃদয়ের আকুতি যে সংরাগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, সাহিত্যে সেই প্রেমেরই প্রাধান্য বেশি। বাংলা সাহিত্যে নারী ও পুরুষের পার্থিব প্রেমমূলক রচনালেখ্য হিসেবে উল্লেখ্য মৈমনসিংহ গীতিকা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই প্রেমকাহিনি বেশ চর্চিত। তাই এইসকল গীতিকাগুলি পল্লীকবিদের জীবনাভিজ্ঞতায় জারিত হয়েই এর প্রেম রক্তমাংসের এর মানবদেহে বাস্তবসম্মত উপায়ে বেড়ে উঠেছে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত 'সৌরভ' নামক একটি মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য অনুরাগী চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক এই সকল গীতিকার লোকগাথাগুলি

প্রকাশিত হলে, সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজ এর সম্মুখে আসে এই সকল গাথা, অতঃপর এই গীতিকার কাব্যগুন উপলব্ধি করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রদ্ধেয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে এবং সাহিত্য ইতিহাসকার আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পালাগুলি সংগৃহীত ও ময়মনসিংহ গীতিকা নামে যত্নসহকারে প্রকাশিত হয়।

এই গীতিকার মূল আখ্যানই হল প্রেম। সেইরকম একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে মহুয়াকে দিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। মহুয়ার অপূর্ব রূপ দেখে সকলেই পাগল হয় তাকে পেতে। হুমরা তাকে নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। খেলা দেখায়। এই খেলা দেখাতে গিয়েই বেদের মেয়ে মহুয়ার সঙ্গে নদ্যার চাঁদের মন দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল। নদ্যার ঠাকুর তাকে মনের কথাটি জানিয়ে বলে জলের ঘাটে দেখা করতে। মহুয়া তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলেছে-

"নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।"[১]

মহুয়া জানিয়ে দেয় ঠাকুরের প্রতি তার প্রেম কত গভীর, এবং জানাতে ভোলেনা ঠাকুরও তাকে প্রাণভরে ভালোবাসে। নদ্যার চাঁদ ও মহুয়ার আছে একে অপরের প্রতি উৎকণ্ঠা, আছে দায়িত্ববোধ, আছে চাওয়া-পাওয়া আর অফুরন্ত ভালোবাসা। মহুয়া ও নদের চাঁদ প্রেমকে সফল করার জন্য ছেড়েছে ঘর, ছেড়েছে জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের বন্ধন। সবকিছু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করেও মহুয়া জয়ী হয়েছে। তাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ঠিক ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হয় মহুয়ার পালক পিতা। মহুয়াকে যখন তার পিতা বলে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করতে, তখন মহুয়া বলেছে-

"কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি।।"[২]

তাদের দুজনের দুজনের প্রতি এতো ভালোবাসা তা সত্ত্বেও তারা একে অপরের হতে পারে না, বনদম্পতির সুখে কোথাও যেন বিধাতাও বিমুখ। শেষপর্যন্ত তাদের মৃত্যু হলেও প্রেম অমরত্ব লাভ করেছে। মহুয়া ও নদের চাঁদ সমাজের তীব্র মর্মযন্ত্রণা সহ্য করেও তারা হয়ে উঠেছে মৃত্যুঞ্জয়ী।

আবার 'মলুয়া' পালাতে প্রথম দর্শনেই এখানে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেমে আসক্ত হয়েছে। মলুয়ার বড় ইচ্ছা করেছিল বিনোদের পরিচয় জানতে, তার ঠিকানার সন্ধান করতে। এ কি শুধুই অসহায় ভিনদেশী এক পথিকের প্রতি করুণা প্রদর্শন নাকি আর কিছু !

"একলা অবলা আমি কুল মানের ভয়।
পন্থ-হারা ভিনপুরুষের দুঃখ নাহি সয়।।"[৩]

এই পালায় মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের প্রেম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মলুয়া বড় বেশি চিন্তিত এই কদমতলার অপরিচিত মানুষটির জন্য। যেখানে প্রকৃত ভালোবাসা থাকে সেখানে ঝড়-ঝাপটা আসবেই। এই ভালোবাসাকে তাই নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মলুয়ার রূপ দর্শনে কাজী উন্মত্ত হয়ে উঠলে কুট্টনি কাজীর বার্তা নিয়ে এলে মলুয়া কুট্টনিকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে মলুয়া জানায় যে –

"রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী।।
আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চুড়া।
আমার স্বামী যেমন রণ দৌড়ের ঘোড়া।।
আমার স্বামী যেমন আসমানের চান।"[৪]

অর্থাৎ একটা মেয়ের জীবনে তার স্বামীর স্থান কোথায় ঠিক তার প্রকৃত স্থানও সে নির্দেশ করে দেখিয়েছে। মলুয়ার ব্যবহারে উঠে এসেছে তেজোদ্দীপ্ত নারীর প্রখর ব্যক্তিত্ব। মলুয়ার সতীত্বের কোনো তুলনায় নেই। কিন্তু সমাজের বিচারে দাঁড়িপাল্লার মাপকাঠিতে সেই প্রেম ব্যর্থ হয়ে যায়। মলুয়াকে দেখি শেষপর্যন্ত বেহুলার মতো মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে আসে, এখানেও মলুয়া আরেকবারের মতো নিজের সতীত্বকে প্রমাণ করে দেয়। তবুও কোথাও না কোথাও এই প্রশ্ন থেকে যায়- সতীলক্ষ্মীরা সত্যিই কি এ সমাজে ঠাঁই পায়? না নিষ্ঠুর সমাজ, স্বার্থপর সমাজের কাছে এদের কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই। তাই মলুয়ার মতো নারীদের সংসারের জন্য, স্বামীর জন্য এতো লড়াই করেও বিনিময়ে বেছে নিতে হয় মৃত্যুকেই। মলুয়ার যে এই ত্যাগ আমাদের সামনে তুলে ধরে সম্পর্কের প্রকৃত অর্থকেই।

মনসার ভাসান রচয়িতা দ্বিজমাধবের কন্যা চন্দ্রাবতী 'মহুয়া' এবং 'মলুয়ার' থেকে তার প্রেমের স্বরূপই আলাদা। বাবার শিবপূজার জন্য সে প্রত্যহ ফুল তুলতে আসে। সেখানে ফুল তুলতে এসেই জয়ানন্দের সঙ্গে তার পরিচয়। জয়ানন্দ একদিন আড়াই অক্ষরে চন্দ্রাকে প্রেমপত্র লেখে তাই- "পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি।" নারীদের চোখের জলের মূল্য অনেক বেশী কারণ এর পিছনে থাকে নারী হৃদয়ের সার্থকতা, আত্মতৃপ্তি আর ভালোবাসা। যদিও বিবাহের পূর্বেই চন্দ্রাবতী মনেপ্রাণে পতি হিসেবে বরণ করে নিয়েছে জয়ানন্দকে-

"বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রক্তজবা আরি।
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি।।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি।।"[৫]

চন্দ্রাবতী এখানে নিজের হৃদয়ের মনপাখিকে শিকলে বেঁধে রেখে কেবল পিতার অনুমতি নেওয়ার জন্য জয়ানন্দকে বংশীর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে-

"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কি বা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী।।"[৬]

চন্দ্রাবতীর কাছে একদিন যে ছিল খেলার সঙ্গী আজ সে হল প্রণয়প্রার্থী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে শৈবলিনী ও প্রতাপের এর মধ্যে যে বাল্যপ্রেম সেটা এখানে চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের মধ্যেও দেখা যায় কিন্তু তা পূর্ণতা পায় না। কারণ বিবাহের ঠিক পূর্বে জয়ানন্দ একটি সুন্দরী মুসলমান যুবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ধর্ম ত্যাগ করেছে। একটা মেয়ের কাছে কতোটা তা অপমানের, আঘাতের। প্রেম যেন এখানে একতরফা নারীর হৃদয়গত সম্পদ হয়ে উঠেছে। চন্দ্রাবতীর এই প্রেমানুভব অকৃত্রিম পবিত্র বলেই তার অভিমান ও সুকঠিন, আবার তা প্রিয়কে হারিয়ে নির্বাক, পাগলপ্রায়। চন্দ্রাবতীর মধ্যে আমরা দেখি আত্মসংযম করার অভাবনীয় ক্ষমতা এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো দুঃখের চোরা স্রোত তাকে কতোটা ভেঙে চূড়ে দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হল তার জীবনের বিপরীতধর্মী দুই আদর্শের প্রভাব। একদিকে পিতৃভক্তি, অন্যদিকে প্রেম। চন্দ্রাবতীর জীবনে এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে সে পুরোপুরিভাবে হয়েছে নিঃস্ব, ক্ষতবিক্ষত। প্রেমের আঘাত একজন নারীর কাছে যেমন কষ্টের, তেমনই পুরুষের কাছে কষ্টেরও। চন্দ্রাবতী শেষপর্যন্ত সংসার জীবনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না করে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের পথ বেছে নিয়েছে, এ ক্ষেত্রে আমরা জয়ানন্দের পদস্খলনের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং এদের দুজনের প্রেমের বিপর্যয়ই আমাদেরকে উপলব্ধি করায় যে প্রেম যেমন জীবনকে চেনায় তেমনি সঠিক পথ ও দেখায়।

আবার ‘দেওয়ান ভাবনা’ পালায় দেখি নদীর ধারে পুষ্প চয়ন করতে গিয়ে মাধবের সঙ্গে সুনাই এর সাক্ষাৎ হয়। মাধব পদ্মপাতায় পত্র লিখে রূপসী সুনাইকে তার মনের কথা ব্যক্ত করে। সুনাই পত্রের উপরে তার মনের কথা ব্যক্ত করে। সেইসময় সুন্দরী সুনাই এর সংবাদ পৌঁছায় দেওয়ান ভাবনার কাছে। দেওয়ান ভাবনা রূপসী সুনাইকে ধরে নিয়ে যায়, মাধব দেওয়ান ভাবনার সঙ্গে লড়াই করে ফিরিয়ে আনে। একজন স্বামী জানেন তার সহধর্মিনীকে কিভাবে শত সহস্র বিপদের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে রক্ষা করতে হয়। তারা যেখানে তাদের দাম্পত্য জীবনের এই মুহূর্তগুলো সুন্দরভাবে অতিবাহিত করবে সেখানে তখন চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। সুনাই তাই পতিব্রতা স্ত্রীর মতো মনসা পূজা করে-

“শায়ন মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা।।”[৭]

নারীর জীবনে তার স্বামী হল একমাত্র বিশ্বাস, ভরসার, সেখানে দেওয়ান ভাবনা রাত্রিবেলায় তার কাছে উপস্থিত হলে সে স্বামীকে স্মরণ করে-

“সোয়ামির পদে জানায় শতেক ভকতি।
তারপর স্মরে কন্যা দুর্গা ভগবতী।।”[৮]

পতিব্রতা নারীর কাছে সবার আগে তার স্বামী, তারপর দেবদেবী। অর্থাৎ পতি তার একমাত্র পরম গুরু। সুনাই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। পালাকার সমাপ্তিতে বলেন-

"দুর্জন দুষমন ভাবনার আশা না পূরিল।
প্রাণ বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল।"[৯]

মৃত্যুর মাধ্যমে সুনাই প্রমাণ করে দিয়েছে তার সতীত্ব। মাধবের প্রতি সুনাইয়ের সুগভীর প্রেমই সুনাইকে সুমহান আত্মোৎস্বর্গের প্রেরণা দিয়েছিল। মাধব ও সুনাইয়ের পরস্পর পরস্পরের রূপজমোহের মধ্যে তাদের প্রেমের জন্ম হলেও রূপমোহকে জয় করে তারা যথার্থ প্রেমের পথ বেঁধে ছিল।

মৈমনসিংহ গীতিকার প্রণয় গাথাগুলি একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সার্থক। মৈমনসিংহ গীতিকাতেও এই নারী ও পুরুষের সম্পর্ক খুব সহজেই পরিণতি পায় না, নানা বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। জীবনের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ছিল সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা বা আকুলতা। এই গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি হল উজ্জ্বল আকর্ষণীয় প্রেমের শক্তিতে শক্তিময়ী। তারা প্রতিটি মুহূর্তে নতুন এক পথ দেখায়, জীবনকে নতুন ভাবে চেনায়।

প্রেমের ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ানুভবকেই সমানাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পল্লীকবিরা। প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নায়িকারা পেয়েছেন সত্য আদর্শের মর্মবাণী। তাইতো বারংবার পরাজিত হতে হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তিকে তাদের কাছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ গীতিকার ভুমিকা অংশে বলেছেন-

"এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারী প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই, - চিরকাল প্রেম বড় হইয়াছে। জননী রূপে তিনি জগতের বরেন্যা, স্ত্রী রূপে তিনি জগতের প্রাণ।"[১০]

আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর যুগে প্রেম যখন স্বার্থের, এককথায় প্রেমেরও বিচার চলছে দাঁড়িপাল্লায়' তখন এই গীতিকা গুলি নারী-পুরুষের জীবনে এক প্রাণখুলে শ্বাস নেওয়ার জায়গা বটে। একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রেমকেই পল্লীগীতিকার কবিগণ সাদরে গ্রহণ করেছেন। সেই কারণে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

"মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণের বিশিষ্ঠতা এইখানে যে, বাস্তব সত্যের তুচ্ছতার মধ্য দিয়াও তাঁহারা কাব্যকে দেখাতে সংস্কুচিত হন নাই -জীবনের মধ্যেই প্রেম ও প্রকৃতিকে দেখাইয়াছেন; সেই জন্যই উহারা কেবল মনকে নহে হৃদয়কেও স্পর্শ করে।"[১১]

তথ্যসূত্র :

১. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, মহুয়া পালা, পৃ. ৩৬।

২. তদেব, পৃ. ৩৯।

৩. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, মলুয়া পালা, পৃ. ৭৪।

৪. তদেব, পৃ. ৭৫।

৫. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, চন্দ্রাবতী, পৃ. ১০৮।

৬. তদেব, পৃ. ১১৫।

৭. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, দেওয়ান ভাবনা, পৃ. ১৮৭।

৮. তদেব, পৃ. ১৯০।

৯. তদেব, পৃ. ১৯১।

১০. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ-গীতিকা, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৮।

১১. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ-গীতিকা, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৩-২০১৪।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা লোক-সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৭।

৩. কেয়া চট্টোপাধ্যায়, মৈমনসিংহ গীতিকাঃ নব আলেখ্য, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৫।

৪. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খন্ড), ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭০।

৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০১০।

৬. দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), মৈমনসিংহ গীতিকা, (প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

৮. মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, মৈমনসিংহ-গীতিকা: পুনর্বিচার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২।

৯. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে নারীচরিত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৬৬।

১০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৫।

১১. সুখময় মুখোপাধ্যায় , ময়মনসিংহ-গীতিকা, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯১।

উৎপল দত্তের পথনাটক স্পেশাল ট্রেন : প্রাসঙ্গিকতা

মিঠু সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: নাটক হল এক প্রকার প্রচার মাধ্যম– সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার এই নাটকের মধ্যেই পথনাটক প্রচার মাধ্যম হিসাবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে- সে কথাও স্বীকৃত। বিশ শতকের ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই উৎপল দত্তের পথনাটক রচনার পথ পরিক্রমা শুরু হয়। উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে পথনাটকে অভিনয় শুরু করেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত রচিত এবং অভিনীত অন্যতম পথনাটক হল- 'স্পেশাল ট্রেন'। বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি একটি মাইলস্টোন। ১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে এই নাটকটি বাংলার রাজনীতিতে এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকের মাধ্যমে উৎপল দত্ত তৎকালীন সময়ে সাধারণ শ্রমজীবী, শ্রমিক শ্রেণির মানুষের দুখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। এই নাটকে দেখা যায় কারখানার শ্রমিকেরা তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘট ডাকলে কোম্পানীর মালিক বিড়লাজী নানা উপায়ে ধর্মঘট বাতিল করার চেষ্টা চালায়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর মালিক পক্ষ ও পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা তিনি এই নাটকে বর্ণনা করেছেন। এইসব আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর মালিক পক্ষের নির্যাতন এবং নানা উপায়ে ধর্মঘট বানচাল করার কৌশল তৎকালীন সময়ে কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। নাটকে দেখা যায় বিড়লাজি স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে এলাকার কয়েকজন ভাড়াটে শ্রমিককে দিয়ে কাজ চালানোর প্রচেষ্টা করলেও, তা ব্যর্থ হয়। নাটকের শেষে আমরা দেখতে পাই, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থা হার মানতে বাধ্য হয়। সংগঠিত মানুষের আন্দোলন দাবী আদায় এবং অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে কতবড় ভূমিকা পালন করতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি। এই পথনাটকটি শুধুমাত্র তৎকালীন সময়ে গণ আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেছে তাই নয়, বর্তমান সময়েও শ্রমজীবী মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।

সূচক শব্দ: পথনাটক, শোষণ, শ্রমিক, পুঁজিবাদ, হিন্দমোটরস, রাজনীতি, মার্কসীয় ভাবনা, আন্দোলন।

মূল বক্তব্য

নাটক হল একটি মিশ্র কলা শিল্প। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা ভাষায় রচিত নাটক এবং নাট্যাভিনয় দর্শক এবং পাঠকদের মধ্যে শুধুমাত্র সাহিত্যরস এবং আনন্দ দান করেনি। সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। শাসক ও শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগঠিতভাবে লড়াই সংগ্রামের প্রতিবাদের হাতিয়ার রূপে দেখা দিয়েছে। আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পথনাটক প্রচার মাধ্যম হিসাবে বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দেশেও উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি তৎকালীন সময়ে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্ষম ভূমিকা পালন করেছে। শাসক মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত অজেয় শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের কাহিনী হল উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন'। নাটক হল এক প্রকার প্রচার মাধ্যম– সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার এই নাটকের মধ্যেই পথনাটক প্রচার মাধ্যম হিসাবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে- সে কথাও স্বীকৃত। নাটক এবং নাট্যশালার চিরায়ত ধারণা থেকে অনেকে মনে করেন, 'নাটকে রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালানো অন্যায়'। কিন্তু আমরা দেখলাম, এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে উৎপল দত্ত জোরালো জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নাটক রাজনীতি প্রচার করতে পারবে না এ হেন কথা আপনারা কোথা থেকে পেলেন?' নাট্যকার উৎপল দত্তের ধারণাই ছিল 'রাজনীতি ভীতিও হল' একপ্রকার গণতন্ত্র নিধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। অভিনেতা, ছাত্র, ডাক্তার, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, তরুণ যুব সম্প্রদায়- সবাই রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালে, কিছু পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ আয়েশ করে ব্যবসা ফাঁদতে থাকেন। নাট্যকার উৎপল দত্তের পক্ষে এটি মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। আমরা জানি, মহামতি লেনিন বলেছিলেন- 'দু'রকমের প্রচার আমাদের করতে হবে- প্রোপোগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন'। প্রোপোগান্ডা হল - একটা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দেয়, মানুষের অনাস্থা জাগিয়ে তোলে এই সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে। সেটা অনেক গভীরে কাজ করে। আর অ্যাজিটেশন হচ্ছে একটা তাৎক্ষণিক ইস্যুর ওপরে মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তোলা। পথনাটিকা হচ্ছে এই অ্যাজিটেশনের অংশ। যার জন্য গোড়ার দিকে গণনাট্য সংঘ এটাকে পোস্টার প্লে অথবা অ্যাজিট পোস্টার প্লে বলেছে। অ্যাজিট পোস্টার হল রুশ শব্দ, যা থেকে এসেছে অ্যাজিটেশন। পথনাটকগুলির মধ্যে দিয়ে সামাজিক শোষণ এবং রাজনৈতিক শাসনের চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। আমরা গণশক্তি পত্রিকা থেকে জানতে পারি, উৎপল দত্ত বলেছেন-

> *"যা কিনা খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে ও বিনা আড়ম্বরে অভিনয়। আর একটি হলো পথনাটকের বিষয়—যা কোনো মতেই রাজনীতি বর্জিত নয়। পথনাটক বলতে আমরা যা বুঝি তার ইতিহাস এই পথেই এগিয়েছে। আধুনিক পথনাটকের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে,*

> *যখন দেশে বিদেশে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব। পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।"* [১]

নাট্যকার উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে পথনাটকে অভিনয় শুরু করেন। গণনাট্য সংঘে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে এবং পথনাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী থিয়েটারের উপাদান আহরণ করেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত মনে করতেন, যে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্যের তুলনায় পথনাটকের অভিনয়ে অনেক বেশি জনগণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সময়ে নাট্যকারকে একদিনে তিন-চার জায়গারও বেশি অভিনয় করতে হয়েছে। উৎপল দত্ত মনে করতেন, 'চরিত্র বিশ্লেষণ-টিশ্লেষণ করবার জায়গা পথনাটিকা নয়। এটা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জায়গা।' পানু পালের লেখা 'ভোটের ভেট' পথ নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপল দত্ত পথনাটিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। গণনাট্য সংঘের হয়েই প্রথম তিনি এই পথনাটকটি অভিনয় করেন। এই সময় থেকেই উৎপল দত্ত পথনাটক পরিচালনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। এরপর থেকে তিনি একাধিক পথনাটক রচনা শুরু করেন। শুধুমাত্র রচনাই নয়, সফলভাবে অভিনয়ও করেন।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই উৎপল দত্তের পথনাটক রচনার পথ পরিক্রমা শুরু হয়। ১৯৫১ – ১৯৫২ সালে 'পাশপোর্ট' নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্তের পথনাটক রচনার হাতে খড়ি হয়। নাট্যকার উৎপল দত্তই প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে মার্কসীয় ভাবনা দ্বারা বিশ্লেষণ করতে থাকেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই উৎপল দত্ত প্রকৃত এবং উৎকৃষ্ট পথনাটক রচনা করেছিলেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত রচিত এবং অভিনীত অন্যতম পথনাটক হল- 'স্পেশাল ট্রেন'। বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি একটি মাইলস্টোন। ১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে এই নাটকটি বাংলার রাজনীতিতে এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া এবং কোন্নগর স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে শিল্পপতি বিড়লার হিন্দ মোটরস কারখানা অবস্থিত। ১৯৬১ সালে এই কারখানায় ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। আমাদের সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আইনিভাবে স্বীকৃত। ধর্মঘট করার স্বাধীনতাও শ্রমিকদের আছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমদপ্তর আছে, ট্রাইবুনাল আছে, সর্বপরি দেশের আইন ব্যবস্থা আছে। হিন্দ মোটরস কারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য ধরে বিধিসম্মত নিয়ম মেনে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। হিন্দ মোটরস কারখানার কর্তৃপক্ষ

বেআইনিভাবে কারখানা লকআউট ঘোষণা করে। তবুও হিন্দ মোটরস কারখানার শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যান।

হিন্দ মোটরস কারখানার মালিক বিড়লাজী কারখানা বন্ধ হওয়া নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত। কারণ বিড়লাজীর লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা বন্ধ। কারখানার মালিক পক্ষ প্রথমে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, বরখাস্ত করে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে ব্যর্থ হলে, পুলিশ ও সমাজ বিরোধীদের দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অফিস, ক্যাম্প ভাঙচুর করে অত্যাচার চালায়। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব স্থানীয় ধর্মঘটীদের প্রহার ও গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরেও যখন শ্রমিক আন্দোলনকে কোন স্তর থেকেই ভাঙতে পারেননি, তখন শুরু হল কারখানা পার্শ্ববর্তী এলাকায় দমনপীড়ন নীতি। এই দমনপীড়নে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষক, ঘুমন্ত নাগরিক, অসহায় রমনীদের উপর অত্যাচার চলে। আন্দোলন দমন করার নামে চলে দোকান-পাঠ লুঠ করা। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পুলিশের সাহায্যে নিরীহ কৃষকদের উপর অত্যাচার চলে। তারপর শ্রমিকদের দমনপীড়ন চালিয়েও বিড়লাজী শ্রমিকদের ধর্মঘটে ফাটল ধরাতে পারেন নি। তখন হিন্দ মোটরস কারখানার মালিক সরকারের সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে ভাড়াটে দালাল নিয়ে এসে কারখানা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এইজন্য বিড়লাজী স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিড়লাজিকে সাহায্য করার জন্য তৎকালীন সরকার বেআইনি ভাবে স্পেশাল ট্রেনের অনুমতি দেয়। আন্দোলনরত শ্রমিকেরা বিড়লাজির এই পরিকল্পনা এবং সাহায্য সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন এই স্পেশাল ট্রেনকে কোনভাবেই উত্তরপাড়া, কোন্নগর স্টেশনে বা কারখানার সন্নিহিত অঞ্চলে দাঁড়াতে দেয় নি। ফলে বিড়লাজীর ভাড়া করা দালালরা কারখানায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এই কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি রচনা করেন।

'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি শুরু হয়েছে, লেবার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। লেবার অফিসার শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, তার ধারণার বদল ঘটতেই তিনি বিড়লাজীর চরমতম দালালের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। লেবার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, বিড়লাজীদের পক্ষেই সরকার, শ্রমিক অফিসার প্রমুখ। পুলিশ ইন্সপেক্টর শাসন-শোষণ ও দমননীতিতে বিশ্বাসী। তার উদাহরণ হিসাবে পথনাটকে দেখা যায় –

> *"**লেবার** :দেখুন, আমরা ভেবেছিলাম হতভাগা মজুরের বাচ্চারা দিন পনেরোরবেশি দাঁড়াতে পারবে না। দুমাস যে হতে চলল; শালারা একেবারে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে আছে। আরো গুরুতর ব্যাপার হলো রাজ্যের যত মজুর ইউনিয়ন সব ওদের টাকা পাঠাতে শুরু করেছে, রনেন সেন বলেছে ওরা একলক্ষ টাকা তুলবে। আর আছে ওই*

নেহেরুজীর দুঃস্বপ্ন কলকাতা শহর; ঐ বজ্জাত শহরের বজ্জাত লোকগুলো হিন্দ মোটরস-এর হরতাল নিয়ে খেপে উঠেছে। আরে বাবা তোদের বাপের কি বল তো? বিড়লাজীর কারখানায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তোদের চোখ টাটাচ্ছে কেন? এমন কি বিশ্ব মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সমর্থন জানিয়েছে। বুঝুন। সারা পৃথিবীতে হিন্দ মোটরস-এর খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। এমতবস্থায় ঐ রনেন সেন মনোরঞ্জন হাজরা-কার্ত্তিক দাসের দলের বুক ফুলে দশ হাত হয়েছে।

পুলিশ :*আরে রাখুন দশ হাত বুক। দশ হাত বুককে ডান্ডা চালিয়ে এক বিঘৎ করে দিতে আমার কতক্ষণ লাগবে? এই সেদিনও খাদ্য আন্দোলনের সময়ে আশিটা লোককে স্রেফ লাঠিপেটা করে যমের বাড়ি পাঠিয়েছি। তার ওপর এটা হচ্ছে পুলিশের শতবার্ষিকী বছর। পুলিশ মন্ত্রী কালিবাবু বলে দিয়েছেন রবীন্দ্র সরোবরে, যে ১৯৬১ সালটা দুই কারণে গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত এটা রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী, দ্বিতীয়ত এটা পুলিশের শতবার্ষিকী। এটা বিড়লাজীর কারখানা; বিড়লাজীর হুকুমে খোদ পুলিশ মন্ত্রী পর্যন্ত এসে হাজির হবেন খন।"*[২]

হিন্দ মোটরের আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর মালিক পক্ষের নির্যাতন এবং নানা উপায়ে ধর্মঘট বানচাল করার কৌশল তৎকালীন সময়ে কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়নি। একজন প্রগতিশীল এবং সংবেদনশীল শিল্পী হিসাবে নাট্যকার উৎপল দত্ত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দ মোটরস কারখানা সংলগ্ন এলাকায় যান। সেখানকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে নাট্যকার কথাবার্তা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কাছ থেকে মালিক পক্ষ এবং প্রশাসনের অত্যাচারের খবরাখবর সংগ্রহ করেন। একজন প্রগতিশীল শিল্পীর হাতিয়ার যে নাটক, সেই নাটক দিয়েই উৎপল দত্ত মালিক পক্ষের অত্যাচার, নিপীড়ন এবং পার্শ্ববর্তী মানুষের ওপর নির্যাতন ইত্যাদি সংবাদ শুধুমাত্র রাজ্যবাসী নয়, দেশের মানুষের কাছেও পৌঁছে দেবেন এই ভাবনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন। নাট্যকার একজন শিল্পীর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করার অংশত দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকের মধ্যে দিয়ে বিগত দিনে পুলিশ ও শাসকের অত্যাচার নিপীড়নের নানা পরিচয় তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। যেমন হিন্দ মোটর স্টেশনের প্লাটফর্মে লাঠি চালিয়ে, টিয়ার গ্যাস ছাড়িয়ে জনগণকে ঠান্ডা বানিয়েছে, কলেজ ছাত্রের হাতের আঙুল উড়িয়ে দিয়েছে, কমিউনিস্ট এম.এল.এ মনোরঞ্জন হাজরাকে বুটের লাথি মেরেছে, এক মহিলার শাড়ি খুলে নিয়েছে, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপকদের লাঠিপেটা করেছে, স্টেশনের ঘরটাকে দখল করে পুলিশ ক্যাম্প

বসিয়েছে ইত্যাদি। অপরদিকে লেবার অফিসার বলেন- 'কোম্পানিও বসে নেই, কলকাতার রাধাবাজার স্ট্রিটে এক অফিস খুলেছি, সেখানে দালাল জড়ো করে স্পেশাল ট্রেনে নিয়ে আসছি হিন্দমোটর-এ'। বিড়লাজীর হয়ে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে এলাকার কয়েকজন ভাড়াটে শ্রমিককে দিয়ে কাজ চালানোর প্রচেষ্টা করলে, তাও ব্যর্থ হয়। ছয় হাজার শ্রমিকের পরিবর্তে মাত্র পঁচিশ জন শ্রমিক দ্বারা সেই কাজে অসমর্থ চিমনি থেকে নকল শব্দ এবং ধোঁয়া বের করার প্রচেষ্টাও মালিক পক্ষ গ্রহণ করে, যাতে শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হয়। নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকার দেখিয়েছেন, লেবার অফিসার সর্বত্রই শ্রমিক ধর্মঘটের এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধী। একজন শ্রমিককে নাটকের অভ্যন্তরে বলতে শোনা গেছে তাদের নিজস্ব অধিকারের প্রশ্ন –

> *"**শ্রমিক :**ধর্মঘট বেআইনী মানে? সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বোনাসের দাবীতে ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। জবাবে বিনা নোটিশে লক-আউট করে বে-আইনী কাজ করেছেন আপনারা। নইলে ট্রাইবুনালে যেতে পর্যন্ত এত ভয় পান কেন? ইউনিয়ন তো সাফ বলে দিয়েছে—ট্রাইবুনাল যদি বলে লক আউট আইন সঙ্গত হয়েছে তবে এই দুই মাসের মাইনে চাই না। আর যদি ট্রাইবুনাল বলে লক আউট বে-আইনী হয়েছে তবে প্রত্যেকের বাকী মাইনে পাই পয়সা গুনে দিতে হবে।"*[৩]

লেবার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর উভয়ই শ্রমিককে বলেন- 'আপনারা বোনাস চান কোন মুখে। ভারতের অর্থনীতির একটি মূল স্তম্ভ হল মোটরকারখানা। তাকে বিপদে ফেলে, বন্ধ করে আপনারা দেশদ্রোহিতা করছেন। পুলিশ : এরা চীনের দালাল।' এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রমিক জানান- আমরা মজুরেরাই অর্থনীতির মূল স্তম্ভ, আমরাই দেশ এবং জাতি গড়ার কারিগর। মালিকশ্রেণি হচ্ছে অর্থনীতির সবচেয়ে বড়ো শত্রু। সবচাইতে বড় দেশদ্রোহী হল ওই বিড়লারা। দীর্ঘ তেরো বছর যাবৎ এক পয়সাও বোনাস দেয়নি শ্রমিকদের। একটি আর্থিক বছরে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা নিট মুনাফা কোম্পানি অর্জন করলেও ৬ হাজার শ্রমিককে এক পয়সাও বোনাস দেয়নি। সব মালিক পক্ষই সর্বদা জুলুম করে, শোষণ করে। কিন্তু বিড়লাদের মতো নির্লজ্জ শোষক আমাদের দেশে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন নাট্যকার। আবারও নাট্যকার বলেছেন শ্রমিকদের ওপর মালিকদের সীমাহীন শোষণ অব্যহতভাবে চলতে থাকবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। শ্রমিকদের ঘাম, রক্ত জল করার বিনিময়ে মালিকের মুনাফার পরিমাণ প্রতিনিয়ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই পথনাটকটির মধ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন, যেহেতু শ্রমিকেরাই দেশ গড়ে, তাই দেশ গড়ার মুনাফা শুধুমাত্র বিড়লার পকেটে যাবে কেন, আমরা কেন পাব না? শ্রমিকদের ওপর বিড়লাজীদের দীর্ঘকালের শাসন-শোষণ স্বরূপ তাদের কোন পে-স্কেল নেই, বছরের পর বছর শ্রমিকদের কোনও বেতন বৃদ্ধি নেই, চাকরিতে কোনও পদোন্নতি নেই। নাট্যকার

উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকে শ্রমিক চরিত্রের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস উল্লেখ করেছেন।

তৎকালীন সময়ে কংগ্রেস সরকারের শাসনে শ্রমিক নিপীড়ন নাট্যকার দেখিয়েছেন ১৯৫০ সালের মজুরেরা মোট আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ পেয়েছিল, ১৯৫৮ সালে মজুরেরা পেয়েছে শতকরা ৩৮ ভাগ। সেই অনুপাতে শিল্পপতিদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, আর শ্রমিকেরা ক্রমশ গরীব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক বাজেটে শিল্পপতিদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর বাবদ এসেছে ২০৬ কোটি, পরোক্ষ কর অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পকেট থেকে এসেছে ৫৬২ কোটি টাকা। শিল্পপতিদের কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার আবার ১২০ কোটি টাকা মতো কর মকুব করে দিয়েছে। এই তথ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার পুঁজিপতিদের গোলামে পরিণত হয়েছিল। দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থ সরকারের কাছে বড় নয়। শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের প্রধানতম কাজ। এই শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থেই হিন্দ মোটরস কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুলিশ এবং অফিসার একত্রে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার এবং নিপীড়ন নামিয়ে আনে। নাটকের শেষে দেখা যায়, নুনিয়া এসে পুলিশ অফিসারকে খবর দেয়-

> *"**নুনিয়া :**স্পেশাল ট্রেন থামলো না হুজুর। যেরকম গতিতে আসছিল ঠিকই সেই গতিতে কোন্নগরের দিকে চলে গেল।.............হুজুর উত্তরপাড়া স্টেশনে নাকি হাজার লোক জমা হয়ে দালালদের টেনে নামাচ্ছিল। পুলিশ এসে বেদম লাঠি চালিয়েও পাব্লিককে ঠান্ডা করতে পারেনি। তাই ট্রেনের ড্রাইভার ভয় পেয়ে হিন্দ মোটরে না থেমেই পালিয়ে গেছে স্যার।"* [৪]

নাটকের শেষে আমরা দেখতে পাই, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থা হার মানতে বাধ্য হয়। এই শ্রমিক আন্দোলন সারা রাজ্য এবং দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা কিনা সরকার ও শিল্পপতিদের মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এক প্রকার বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিড়লাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এই শ্রমিক আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের আপামর ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সকলেই নৈতিক সম্মান জানিয়ে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আন্দোলনরত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। নাট্যকার উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকের প্রথম অভিনয় করেন ৬ই ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে গড়িয়াহাটের মোড়ে। আবার কেউ কেউ বলেন উত্তরপাড়াতে প্রথম এই পথনাটকটি অভিনীত হয়। তারপরে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই পথনাটকটির অভিনয় চলতে থাকে। কখনও মনুমেন্টের তলায়, কখনও শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে আবার কখনও ডালহৌসির চত্বরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি অভিনীত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন কলকারখানার গেটেও নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

সর্বত্রই শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস, লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের উপস্থিত করা এবং সর্বপরি জয়ধ্বজা উড়ানো- সবকিছুই শ্রমিকের মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি।

সংগঠিত মানুষের আন্দোলন দাবী আদায় এবং অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে কতবড় ভূমিকা পালন করতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি। এই পথনাটকটি শুধুমাত্র তৎকালীন সময়ে গণআন্দোলনে ভূমিকা পালন করেছে তা-ই নয়, বর্তমান সময়েও শ্রমজীবী মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। একবিংশ শতাব্দীতে যেখানে পুঁজির সীমাহীন আস্ফালন যত্রতত্র শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সেখানে শ্রমিকদের জীবন প্রায় একপ্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যন্ত্রসভ্যতার নতুন নতুন আবিষ্কার যেখানে যেমন খুশি মালিকশ্রেণি শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এই পথনাটকটি গণ আন্দোলনকে প্রসারিত করে বিড়লাজীকে বাধ্য করেছিল শ্রমিকদের কাজ ফিরিয়ে দিতে। এই 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটির মধ্যে দেখতে পাই শুধুমাত্র হিন্দ মোটরস কারখানার শ্রমিকরাই আন্দোলন করেননি, আপামর সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আন্দোলনের বীজ বপন করে দিয়েছিল। সর্বস্তরের শোষিত মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। আবার বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় তারাও শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেছিল। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিড়লাজীর শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার, ক্ষোভ, অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণির মধ্যেই আক্রমণ নয় অত্যাচারীর নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত মানুষের লড়াই ভিন্ন অন্য কোন পথে এই অত্যাচার নিপীড়ন বন্ধ করা যাবে না। তাই আমরা মনে করি গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'স্পেশাল ট্রেন' আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক। নাট্যকার উৎপল দত্ত বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র একটি জায়গায়, শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে এই আন্দোলন করলে হবে না, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা সারাদেশের মানুষের মধ্যে অত্যাচারী সরকার এবং মালিক বিড়লাজীর বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরে ক্ষোভ-অসন্তোষ ছড়িয়ে দিতে হবে। শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে আটকে থাকলে হবে না। সরকারের ভূমিকা এবং মালিকশ্রেণীর জুলুমবাজির কথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। নাট্যকার উৎপল দত্ত এই পথনাটক নিয়ে সর্বত্র অভিনয় করে বেড়িয়েছেন। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ সরকারের এই ভূমিকা এবং বিড়লাজীর অত্যাচার উপলব্ধি করে শোষকের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়েছে। অবশেষে সরকার বিড়লাজীর থেকে সাহায্যের হাত সরাতে বাধ্যহন এবং মালিক বিড়লাজীও কারখানা খুলে শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। তৎকালীন সময়ে শ্রমিকদের লড়াইয়ের মনোভাব মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি।

তথ্যসূত্র :

১) উৎপল দত্ত, 'সাদা পোষাক কালো হাত', গণনাট্য পত্রিকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৪৮

২) উৎপল দত্ত, 'স্পেশাল ট্রেন' উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র ১ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫২১

৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২৬

৪) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২৮-২৯

আকর গ্রন্থ :

উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র ১ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা :

অরূপ মুখোপাধ্যায়- 'উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি' ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া 'নেহেরু ভবন', ৫ ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, নয়াদিল্লি- ১১০০৭০

উৎপল দত্ত (সম্পাদক), এপিক থিয়েটার, মার্চ- ১৯৯৪, কলকাতা-১৪

গণনাট্য পত্রিকা, ১৯৮০, কলকাতা- ০৯

দর্শন চৌধুরী- থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত), বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৯, পথনাটক সংখ্যা ২০০৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

আনসারউদ্দিনের নির্বাচিত ছোটগল্প : প্রেক্ষিত লোকসাংস্কৃতিক উপাদান

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

।। ১।।

বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশের সচল প্রবাহে সাহিত্যিক আনসারউদ্দিন একজন উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। বিংশ শতকের শেষ দশক ও একবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়া এখনো প্রবাহিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি ব্যতিক্রমী ধারায় তাঁর যাবতীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রবাহিত করেছেন। Ultra Modern যুগে বর্তমান থেকেও সাহিত্যিক আনসারউদ্দিনের মন পড়ে থাকে গ্রামবাংলার আপামর মানুষের কাছে লোকায়ত জীবনের কাছে। সর্বদা-ই সত্তায় শিকড়ের টান অনুভব করেন। মেট্রোপলিটন সিটির আগ্রাসন ও শহুরে নীল আলোর ঝলকানি উপেক্ষা করে তিনি লিখে চলেন গ্রামবাংলার সহজ, সরল জীবন-যাপনের ছবি আর লোকায়ত ঐতিহ্যের কথা। স্মরণে ব্যাপ্তিতে ধরা পড়ে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মুসলিম সমাজের সামগ্রিক আখ্যান। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে থাকা সাধারণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন যুদ্ধ তাঁর সাহিত্যে রূপকথার সমতুল্য হয়ে ওঠে। মহানাগরিক উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বেডরুম শেয়ার করার পরিবর্তে আনসারউদ্দিন নিস্তরঙ্গ গ্রাম জীবনের গভীরে যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, হিংসা, ভয়, কামনা লুকিয়ে থাকে তাকেই তিনি তাঁর ছোটগল্পে ফল্গুধারার মত ছাড়িয়ে দেন। পাঠকেরা দেখতে পান সেই মাটির গন্ধ মাখা মানুষগুলির সামগ্রিক জীবন-আচরণ, তাদের লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতি, উৎসব-পালা-পার্বণ আর তাদের টিকে থাকার নিজস্ব ভঙ্গি। মূলত লোকজীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে আনসারউদ্দিনের গল্প সাহিত্যে।

।। ২।।

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের সংযুক্তি ও ব্যবহার আনসারউদ্দিনের সমগ্র সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। আমি আমার প্রবন্ধে আলোচনা করব আনসারউদ্দিনের ছোটগল্প নিয়ে। নদিয়া, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, নাকাশিপাড়া, শালিগ্রাম, কাঁটাতারের সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ছবি ফুটে ওঠে তাঁর ছোটগল্পে। আমি আমার আলোচনার সুবিধের জন্য ‘গণিচাচার খেত-খামার’ (এপ্রিল ২০১৭) গল্পগ্রন্থটিকে নির্বাচন করেছি। গল্পগ্রন্থে ১৭টি গল্প আছে। গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে প্রায় বিলুপ্ত হতে বিভিন্ন লোকাচার, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, হেঁয়ালী, ছড়া, কথকতা, প্রবাদ, প্রবচন, লোকগান,

লোকউৎসব প্রভৃতি উপাদানের প্রয়োগ আমাদের বিশেষ নজর কাড়ে। নগরায়ণ, শিল্পায়ন সভ্যতায় সময়ের ছিন্নপত্রে লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি স্থায়ী স্বাক্ষর রাখে। আনসারউদ্দিন তাঁর ছোটগল্পে এই লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের উপাদানগুলিকে একটু ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহার করেন। ব্যবহৃত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি তাঁর সৃষ্ট আখ্যানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন মাত্রার অর্থবহন করে উপাদানগুলি বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। এখন আমরা আনসারউদ্দিনের বিভিন্ন গল্প নিয়ে এই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করব।

গণিচাচার খেত-খামার : পেটের খিদে বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে না। বিশেষ করে গরীব মানুষের খিদে একটু বেশি। রুটি রুজির জন্য গরীব-গুর্বো মানুষদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, বেঁচে থাকার বিভিন্ন ঝুঁকি নিতে হয়। গণিচাচা আর তার স্ত্রী ভাদুবিবির এক খণ্ড জমিতে ধান ফলানোর প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কোন রকমের টিকে থাকার আখ্যান-ই প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। সকালের পানি-পান্তা খেয়ে মাঠে যাবে গণিচাচা। এখন মাঠে কাজের হিড়িক। বোরোধান চায়ের মরশুম চলছে। গতবারের পাওয়া বোরোধানের একটা অংশ বীজ হিসেবে রাখা হয়েছে মাটির কুঠুরিতে। উঠোনের রোদে ভাদু বিবি সেই ধান ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছে। শুকিয়ে যাওয়া ধানে ভালো বীজ হয়। অন্যথায় ধানে ছাতা ধরে, সেই ধানে বীজ হয় না। শুকিয়ে যাওয়া ঝকঝকে বীজধানগুলোকে অন্তত তিনদিন ভিজিয়ে রাখা হয়, তারপর ঢাঙায় তুলে ওম দেওয়া হয়। এতে বীজের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়। অঙ্কুরিত হয় বীজ। এটাকে বলা হয় ধানবীজ কল নিয়েছে। ধানবীজ কল নিলে বীজতলা তৈরির ব্যস্ততা ও আয়োজন চোখে পড়ে। কথায় বলে বীজধান হল বিষ ধান। বীজধান খাওয়া যা বিষ খাওয়া-ও তাই। কারণ বীজধান খাওয়া মানে-ই হল গোটা ফসলের জমিকে অজন্মা করে তোলা। তাই গ্রামের গরীব মানুষগুলো বীজধান খাওয়ার কথা ভাবতে-ও পারে না। প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন গণিচাচার মতো গরীব চাষীদের ভীষণ ক্ষতি করে। এমনি এক বন্যার বছরে হাড় কাঁপানির মাঠে জল জমে আছে দীর্ঘদিন। কথায় বলে বন্যার বছরে ফসল ডোবে ঠিকই, কিন্তু মাছে ভরে যায় বিল। সন্ধ্যা পেরোলেই অনেক মৎস্য শিকারী মানুষের দল আলো আর পলুই নিয়ে হাড় কাঁপানির জলাশয়ের দিকে আসে। বিভিন্ন রকমের মাছ ধরা পড়ে, যেমন--- বোয়াল, চিতল, লাঠা, ট্যাংরা, বেলে, চিংড়ি, ধান চিংড়ি ইত্যাদি। সেবার মাছ ধরতে মাগুর মাছের হাঁড়ার সন্ধান পেয়েছিল গণিচাচা। হাঁড়ার সন্ধান পেলে একটি মাছ নয় অনেক মাছ থাকে ঘোলাজলের নিচে। এমনি পরিস্থিতিতে গণিচাচা তার এই আবিষ্কারকে সকলের কাছে লুকোতে তসিম আলির প্রশ্নের জবাবে হেঁয়ালির সুরে বলে ওঠে---

হাঁড়ায় জানে হাঁড়ির খবর

কসনে কথা জবর জবর।

(আনসারউদ্দিন, 'গণিচাচার খেত-খামার, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, পৃ-১৫)

গ্রামাঞ্চলে ভ্যান রিকশায় বাঁধা মাইকের চোঙে যখন যাত্রাগান বা যাত্রাপালার দিনক্ষণ ঘোষণা হয় তখন ৫-৭টি গ্রামের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়। বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। কেননা যাত্রাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। মেলার হাতখরচ বা যাত্রাগানের টিকিট কেনার জন্য টাকা জোগাড় করতে চুরির একটা প্রবণতা দেখা যায়। চুরির তালিকায় যাকে জমির কাটা ধান, পাট, চাল-গমের বস্তা, কাঁসার বদনা কিংবা ঘড়া, বালতি প্রভৃতি এমন গৃহস্থালির অনেক কিছু জিনিস। এমনি এক ঘটনার শিকার তাবারক। তার ভাগে করা ১০ কাঠা জমির ধান উধাও। গভীর দুঃখ, বেদনা আর হতাশায় তাবারকের বউ সুর করে গেয়ে ওঠে---

হায় গো আমার পোড়া কপাল
দেখতে হল এমন সকাল
ভাগের জমিতে বুনতে ধান
জীবন হল পেরেশান
সেই ধান কুথায় গেল রে---
কোলকেতার যাত্রাপার্টি
রুটি রুজি করল মাটি
কী খেয়ে ঘুরবে সন
ভেবে মরি অনুক্ষণ
হায়! আমার পোড়া কপাল গো---

(ঐ, পৃ-১৮)

গরীব গণিচাচার মেয়ে তিনুর জন্য সমন্ধ এসেছে হনুমানগাছি থেকে। কিন্তু তিনু পাত্রের বাবার সামনে আসতে চাইছে না। ভাদুবিবির কাছ থেকে জানা যায় রাতদিন মেয়েকে কানভাঙানি দিচ্ছে হনুমানগাছির মানুষ নাকি দেখতে হনুমানের মত। সেই সূত্রে পাত্রের বাবা একটি প্রবাদের উল্লেখ করে---

হাজার টাকা সিঁথানে
কান ভাঙানি পথেনে।

(ঐ, পৃ-২৩)

এই কথার অর্থ হল কেউ যদি চোরের ভয়ে মাথার সিঁথানে অর্থাৎ মাথার কাছে বালিশের নিচে বা তোষকের-কাথার নিচে টাকা রাখে আর পথের লোক যদি বলে

মাথার নিচে টাকা রাখলে চৌদ্দ পুরুষের মাথা খাওয়া হয় বা বংশ নির্বংশ হয়, তাহলে কেউ কি টাকা ফেলে দেবে? ঠিক তেমনি কান ভাঙানিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত না। আরেকটি প্রবাদে উঠে আসে মানুষের নিয়তির প্রসঙ্গ। নিরুপায় অসহায় মানুষ কপালকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকে। পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব চাপায় কপালের উপর। গণিচাচা তার মেয়ের বিয়ে এবং হাড়কাঁপানির মাঠের ক্ষয়ক্ষতির দায় কপালের উপর দিয়ে বলে ওঠে---

চার আঙুল ফাঁকা জমি
কী লিখেছে অন্তর্যামী
জানতে ইচ্ছে সবার হয়
কিন্তু মানুষ নিরুপায়।

(ঐ, পৃ-২৬)

প্রায় একই রকমের প্রসঙ্গ নিয়ে গণিচাচা ভেবে আকুল হয়। তার মত গরীব মানুষের পক্ষে নগদে অগ্রিম টাকা দিয়ে ধান চাষের জন্য তেল, জল, সার জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব কাজ। এই প্রেক্ষিতে উঠে আসে আরেকটি প্রবাদ---

ভাবনার নেইকো কুল
ভেবে ভেবে হলাম আকুল।

(ঐ, পৃ-৪৪)

টেলিফোন : গল্পটিতে গল্পকার যান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ টেলিফোনের মাধ্যমে প্রেম-ভালোবাসার সংযোগ স্থাপনের প্রয়াসকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে ন' পাড়ার শালিগ্রাম থেকে ফুলজানি কথা বলছে আরব দেশে কাজ করতে যাওয়া জামালের সঙ্গে। কথায় আছে--- বিপদ একা আসে না। পরিবর্তনও তেমনি। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারে শুধু টেলিফোন হয় এই রকম হাজার যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়ে সমাজের পরিবর্তন সাধিত করে প্রগতি আনে। যদিও গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবী। জীবনভর মাটির আকর্ষণ করেই বেঁচে থাকে। ধান-পাট, গম, ছোলা, আইড়ি, কলাই, খেসারি ইত্যাদি বিভিন্ন ফসল আবাদ করে। বাড়ি-ঘর নির্মাণ সূত্রে আমরা জানতে পারি দক্ষিণমুখো বাড়ি সবথেকে ভালো। খনার বচনে আছে---

উত্তর দুয়ারের মুখে ছাই
পশ্চিম দুয়ারে কখনও না যাই।

(ঐ, পৃ-৬৬)

অভাবের সাতকাহন : গ্রাম্য জীবনে অভাব মানুষের নিত্যসঙ্গী। অভাব কিন্তু মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে কোনদিন কোনকালেই একেবারে রোধ করতে পারে নি। গ্রামীণ কিছু কিছু মানুষের যাত্রাপালার দিকে ঝোঁক ছিল প্রবল। আলোচ্য 'অভাবের সাতকাহন' গল্পে

কথক তাদের অভাবের কারণ প্রসঙ্গে তার বাবার বিভিন্ন স্থানে যাত্রা প্রবণতার কথা বলেছে। গ্রামে গ্রামে কথকের বাবা রাজা-উজির সেজে আসর মাতাতো। সংসারের দিকে তার কোন আগ্রহ ছিল না। গল্পকার আনসারউদ্দিন গ্রামে অনুষ্ঠিত যাত্রাপালার একটি পরিষ্কার বিবরণ দিয়েছেন---

‘গাঁয়ের যাত্রাপালা হত চারিদিকে খোলা মঞ্চে।
মঞ্চের একদিক দখল করে থাকত বাদ্যযন্ত্রী আর
প্রম্পট মাস্টারের দল। মঞ্চ থেকে একটু দূরে থাকত
সাজঘর। এখান থেকে কলাকুশলীরা যাতে নির্বিঘ্নে
মঞ্চে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য দু-পাশে
বাঁশের বেড়া দেওয়া থাকত।’

(ঐ, পৃ-৯৭)

আলোচ্য গল্পে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নামে একটি যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। পালায় কথকের বাবা অভিনয় করে সিরাজ দৌলার ভূমিকায়। পুবপাড়ার পঞ্চা দফাদারের আমবাগানে যাত্রার আসর বসবে। গাঁয়ের যাত্রাপালায় প্রবেশ অবাধ। আমবাগানে ইংরেজদের সঙ্গে চলছে নবাবের ভীষণ যুদ্ধ।

জম্‌জমের পানি : লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় আলোচ্য গল্পে। জম্‌জম আরব দেশের পবিত্র কূপ। গ্রামের লোকের বিশ্বাস আরব দেশের ঐ পানি পান করলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি যেমন--- হাঁপানি, কাশি, গ্যাস-অম্বল, শিরঃপীড়া, বুকশূল, পিত্তশূল ইত্যাদি আল্লার মর্জিতে ভালো হবে। অন্ধের চোখ খুলে যাবে, বোবারা কথা বলবে। গল্পে গ্রামের ইব্রাহিম হাজি আরবের জম্‌জম কূপ থেকে এই পানি বোতলভরে নিয়ে এসেছে। সেটা নিতে গ্রামের লোকের কারো হাতে বাটি, কারো হাতে গ্লাস।

স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন : জীবনে স্বপ্ন দেখেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্বপ্নের মধ্যে আলাদা একটি জগৎ থাকে, এই স্বপশ নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। স্বপ্ন যেমন-ই হোক আর যখন-ই দেখুক তা দেখতে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। তবে গ্রামে একটি প্রবাদ আছে, --- কানার আর ঘুম কী? অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের ধারণা যে মানুষ চোখে দেখতে পায় না, সে সর্বদা ঘুমিয়ে থাকে। তার ক্ষেত্রে আলো অন্ধকার একই বিষয়। গল্পের আখ্যানে দেখা গেল দিদার হাজি আরব দেশের জম্‌জম থেকে যে পানি নিয়ে এসেছে তাতে তারই রোগ ভালো হচ্ছে না। ফলত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারে একটা প্রবল ধাক্কা। পরে এই প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ শোনা গেল---

আরব দেশের জম্‌জমের পানি

তারও বাড়া খোদার বাণী।

(ঐ, পৃ-১৫৩)

তৈরি হল আর একটি লোকবিশ্বাস--- আরব দেশের জম্‌জমের পানি থেকে খোদার বাণী অনেক বেশি কার্যকর। খোদার বাণী হল দোওয়া-দরুদ। কোন খোদাবন্দ মানুষ শুদ্ধ গগনে পানির পুকুরে ফুঁ দিলে তাতেও নাকি আগুন ধরে যায়। এই সঙ্গে করিমনচাচির বলা একটি প্রবাদ শুনে খুশী হয় ফজলেচাচা---

আমল ছাড়া আল্লা কানা
দেশ দুনিয়া তানা-না না।

(ঐ, পৃ-১৫৪)

অর্থাৎ আমলদার মানুষের জবান শুদ্ধ হয়। সেই জবানে দোয়া-দরুদ পড়লে তা ফলে। পশ্চিম দিক থেকে আগত বিভিন্ন সমস্যা যেমন কালবৈশাখীর ঝড় গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে সর্বশান্ত করে দেয়। আবার পশ্চিমে রোগ হলে তো গরু-মহিষের জীবন সংশয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। কথায় বলে---

যদি হয় পশ্চিমে রোগ
গোরু মোষের মহাভোগ
আছে যত গো বদ্যি
রোগ সারাবে কার সাধ্যি।

(ঐ, পৃ-১৫৭)

পশ্চিমে রোগ গবাদি পশুর পক্ষে কতটা মারাত্মক তা এই প্রবাদ থেকে বোঝা যায়। তাই খনার বচনে আছে---

দক্ষিণ দুয়ারে ঘরের রাজা
পুব দুয়ারে তাহার প্রজা
উত্তর দুয়ারের মুখে ছাই
পশ্চিম দুয়ারে কখনও না যাই।

(ঐ, প-১৫৭)

ভোট : গল্পটি শুরু হচ্ছে একটি লোকগান নিয়ে। গল্পে গানটি করেছে গাঁয়ের শুকুর আলি। পার্টিগত হিংসার কারণে কিংবা বিভিন্ন দুর্নীতি বা বে-আইনি কাজের কারণে দেশ যে ধবংসের দিকে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত গানটিতে---

পার্টিতে পার্টিতে দেশটা করল মাটি
পার্টি ছেড়ে আমি যাই কোথা
লাল পার্টি আর নীল পার্টি
ভোটের কালে পরিপাটি

মাইক পেলে বুকনি ঝাড়ে
বুঝতে নারি নকল খাঁটি
পার্টিতে পার্টিতে দেশটা করল মাটি
পার্টি ছেড়ে আমি যাই কোথা।

(ঐ, পৃ-১৬০)

ভালোবাসার ভূত : গ্রামে লোকবিশ্বাসে দেখা যায় এরকম অনেকে আছে যারা ভূত-পেতনি বা জিন-পরিতে ধরলে, মানুষের উপর থেকে তাদের তাড়াতে পারত। এই রকম মানুষ গুনিন বা ওস্তাদ বা পীর নামে খ্যাত। গল্পে পচাফকির একজন নাম করা গুনিন। গল্পে দীনুর মেয়ে সখীসোনাকে ভূতে ধরেছে। সে কখনো হাসে আবার কখনো কাঁদে। আইবুড়ো মেয়ে। বয়েস হয়েছে। সামনে ফাগুনে বিয়ে হবার কথা। দীনুর চিন্তা আরও বেড়ে যায়। তখন তার একমাত্র ভরসা পচা ফকির।

পচা ফকির দীনুকে আশ্বস্ত করে এক পো শুকনো লঙ্কা, এক শিশি খাঁটি সরষের তেল আর আনকোরা এক খণ্ড থান কাপড় জোগাড় করতে বলে। এরপর পচাফকির রোগী সখিসোনাকে সামনে বসিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে---

এনার কাঠি বেনার বোঝা
আমার নাম ঠনঠনে ওঝা
একটা ঝাড়লে সাতটা মরে
যদি না মরে তাহলে দেশব্যেপে
আমার কেলেঙ্কারি হবে।

(ঐ, পৃ-১৭১)

পচাফকির রোগীর দিকে প্রশ্ণ ছুড়ে দিল--- এবার বলো দেখি সোনা, বাড়ি কুথায়? সখীসোনার উপর ভর করা অশুভ শক্তি জবাব দিল--- 'তুই হলি ঠনঠনে ওঝা/কথা নিবি এতই সোজা?' এতে ফকির বুঝতে পারল এ ব্যাটা মহা ঘোড়েল। ওস্তাদ কমজোরি হলে তারও ঘাড় মটকে দেবে। তাই সে অন্য মন্ত্র হাঁকাল---

কোথায় আছিস জিনের বাদশা, ভূতের সর্দার
এক রোগীতে জীবন জেরবার
একে ডাইনে বললে বাঁয়ে যায়
বাঁয়ে বললে ডাইনে পালায়
উড়নচণ্ডী ঝোড়ন ভূত
বাদবাকি সব দেবদূত
আমার এখন জীবন যায়
মান-সম্মান ধুলোয় লুটায়

চলে আয় জিনের বাদশা ভূতের সর্দার
আমায় তোরা কর উদ্ধার।

(ঐ, পৃ-১৭২)

এরপর সলতের আগুনে জ্বালিয়ে রোগীর মুখে মুহুর্মুহু ছ্যাঁদা মারতেই ভূত নাকি পালিয়ে যায় সখীসোনার উপর থেকে। ফল হয় যন্ত্রণায় দীনুর মেয়ে সখীসোনা চিৎকার করে ওঠে।

গানের খোঁজে : আলোচ্য গল্পটি গ্রাম-গঞ্জে প্রায় ওশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষের কণ্ঠে গীত হওয়া প্রায় বিলুপ্তির পথে যাওয়া গান নিয়ে। যে সমস্ত গান গ্রাম বাংলার মানুষ একসময় মাঠে-ঘাটে গাইত, সেই গানগুলি কারা রচনা করেছে, কারাই বা সুর দিয়েছে তার হাল-হদিশ করা এখন খুব মুশকিল। বঁদগান, ধুয়োগান, জারিগান, সারি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওইয়া ইত্যাদি গান গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনের নিজস্ব গান। গল্পে বঁদ আর ধুয়োগানের দলের ওস্তাদ আপছার মল্লিকের গাওয়া গান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ঢোলকের শব্দ একটু স্তিমিত হতেই তার গলা থেকে গানের সুর অমৃতবাণীর মতোই ভেসে উঠত। আপছার মল্লিক গেয়ে উঠত---

আশমান জোড়া ফকির ওরে ভাই
জামিন জোড়া কাঁথা
সেই ফকির মারা গেলে
জায়গা হবে কোথা।
আকাশেতে লাঙল বয় ওরে---
জমিনেতে মই---
তার ঝোলার ভিতর তিনটে গোরু
রাখাল কিষান কই রে---
আশমান জোড়া ফকির ওরে ভাই।

(ঐ, পৃ-১৮৬)

গভীর রস ও রহস্যে ভরা এই গান আপামর বাঙালির লোকায়ত জীবনের অমূল্য সম্পদ। সংরক্ষণের অভাবে আজ সেগুলি বিলুপ্তির পথে।

কিছু কিছু গানে পূর্বসূরী গায়কদের ইতিহাস বর্ণিত হয়। এই রকম একটি গান গেয়েছে ফরিদ ভাই।

বঁদ আর ধুয়ো গানে পাল্লা এবার লেগেছে---
পদ্মমালার জমিরদ্দি
আর হাট খোলার কাশেম বদ্যি
তিন দিন তিন রাত্রি সমানে গান গেয়েছে

বঁদ গান আর ধুয়োগানের পাল্লা এবার লেগেছে
আবার আছে ডোমপুকুরের চায়না মলিক (মল্লিক)
আতাগাছির মোহন শালিক
গানের গলা তার অতি ভারী
আছে যত নরনারী
দাঁড়িয়ে গান শুনেছে
বঁদ আর ধুয়োগানের পাল্লা এবার লেগেছে।

(ঐ, পৃ-১৮৮)

গ্রন্থঋণ :

১। আনসারউদ্দিন। 'গণিচাচার খেত-খামার'। অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৭।

সঞ্জয় ঘোষের 'যামিনী কলকাতা সংলাপ' : এক চিত্রশিল্পীর উত্থান ও নিজস্বতা অর্জনের আখ্যান

আদেশ লেট
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : চিত্রশিল্পী যামিনী রায় আমাদের জীবনে শিল্পগত ও ব্যক্তিগত উভয় দিকে থেকেই এক অনুপ্রেরণা। যে সময়ের প্রেক্ষাপটে শিল্পী যামিনীর উত্থান, সেইসময় কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের পাশাপাশি যামিনী রায়ের চিত্রশিল্পী হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করা শিল্পজগতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যামিনী বাঁকুড়া জেলার একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিল্পীসত্তা তাঁকে একজন বড়ো শিল্পী হয়ে ওঠার শক্তি জুগিয়েছিল। তাই বাবার নিষেধাজ্ঞা না মেনে বাঁকুড়ার এক জেলা প্রদর্শনীতে লুকিয়ে নিজের আঁকা ছবি পাঠিয়েছিলেন ও পুরষ্কার লাভ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য সেখান থেকেই শিল্পী হয়ে ওঠার জেদ তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর বাবা পাশ্চাত্যরীতি একদমই পছন্দ করতেন না। বাবার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জ্যাঠামশাই ও মামা চারুচন্দ্র দত্তের সহায়তায় তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষালাভ করলেও তিনি ডিগ্রী অর্জন করতে পারেননি একথা ঠিকই, তবে সেখানে পাশ্চাত্য রীতিতে খুব ভালোভাবে পোর্ট্রেট শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজস্ব চিত্রভাষার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি পোর্ট্রেট শিল্পের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন। তিনি ফিরে যান গ্রামবাংলার পটুয়াদের কাছে। সেখানে তিনি দেশীয় রীতি আয়ত্ত করে পটের আদলে এক নতুন চিত্রভাষা সৃষ্টি করেন। নিজেকে তিনি আবিষ্কার করেন নতুনভাবে। এমন বীপরীতমুখী মোড় নিতে গিয়ে তিনি ভুগেছেন আর্থিক, মানসিকসহ আরো নানান প্রতিকূলতায়। আলোচ্য প্রবন্ধে 'যামিনী কলকাতা সংলাপ' উপন্যাসটি পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর শিল্পীজীবনের এমন সফর প্রসঙ্গে জানবো। পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানাদিকও আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে।

সূচক শব্দ : যামিনী রায়, কলকাতা, সংলাপ, সঞ্জয় ঘোষ, চিত্রশিল্প, সম্ভ্রমবোধ, বেলিয়াতোড়, বাংলার পট, কালীঘাট পট।

মূল আলোচনা :

যামিনী রায় (জন্ম : এপ্রিল ১৮৮৭–মৃত্যু : ২৪ এপ্রিল ১৯৭২) চিত্রকলার জগতে এক বিশ্বপরিচিত নাম। দুটি বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে শিল্পী যামিনীর উত্থান।

সেইসময় বাংলাসহ অন্যান্য সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তেমন শিল্পও অভূতপূর্ব প্রসারলাভ করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হয়েও কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে অন্যান্য শিল্পীদের পাশাপাশি যামিনী রায়ের চিত্রশিল্পী হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করা শিল্পজগতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যামিনী বাঁকুড়া জেলার একটি ছোট গ্রাম বেলিয়াতোড়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রামটি জঙ্গলমহল এলাকায় অবস্থান করায় হিংস্র পশুদের আর্তনাদ শৈশব থেকেই যামিনীর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। আজীবন তিনি এই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে যামিনী গ্রামের আর পাঁচজনের মতো একঘেঁয়ে বাঁধাধরা জীবনযাপনের কথা ভাবতে পারতেন না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিল্পীসত্তা তাঁকে একজন বড়ো শিল্পী হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই বাবার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেও বাঁকুড়ার এক জেলা প্রদর্শনীতে নিজের আঁকা 'সমাজ' নামক একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। গুণীজনদের প্রশংসা ও আশীর্বাদ তাঁর বিশ্বাসকে আরও সবল করে তুলেছিল। বলাই বাহুল্য সেখান থেকেই শিল্পী হয়ে ওঠার জেদ ও স্বপ্ন তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। মামা চারুচন্দ্র দত্তের উৎসাহে তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে পাশ্চাত্য রীতিতে পোর্ট্রেট শিক্ষা অর্জন করে নিজের দক্ষতাকে তিনি কিংবদন্তির পর্যায়ে নিয়ে যান। প্রথম জীবনে তিনি সফল পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজস্ব চিত্রভাষার অন্বেষণ করতে তিনি ফিরে যান গ্রামবাংলার পটুয়াদের কাছে। তিনি দেশীয় রীতি আয়ত্ত করে পটের আদলে এক নতুন চিত্রভাষা সৃষ্টি করেন এবং অভিনবভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। শিল্পী হিসেবে এমন 'একশো আশি ডিগ্রি' মোড় নিতে গিয়ে তাঁকে আর্থিক, মানসিকসহ আরো নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ঘোষ রচিত যামিনী রায়ের জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস 'যামিনী কলকাতা সংলাপ' পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর শিল্পীজীবনের এমন সফরকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিজীবনের নানাদিক আমাদের আলোচনা করবো।

ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ঘোষ (জন্ম : ১২ এপ্রিল ১৯৫৮) পেশায় একজন চিকিৎষক(ত্বক বিশেষজ্ঞ)। তবুও তাঁর শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি আগ্রহ অসামান্য। তিনি আনন্দবাজার, আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন-এর মতো বাজারসফল পত্র-পত্রিকায় ও লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত গল্প, কবিতা এবং দেশ-বিদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখালেখি করেছেন। চিত্রকর হিসেবেও তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। বলা যেতে পারে চিত্রশিল্পের প্রতি এমন আগ্রহ থাকার দরুনই তিনি শিল্পী যামিনী রায়-এর জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। লেখক কলকাতা নিয়ে যে ট্রিলজি রচনা করেছেন এটি হল তার শেষ রচনা। প্রথম দুটি উপন্যাসের নাম হল – 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী?' ও 'লাল নীল হলুদ কলকাতা'। আলোচ্য 'যামিনী কলকাতা সংলাপ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে জানুয়ারি ২০১৮ সালে। বাংলার মানুষজন যামিনী রায়ের ছবি কিনেছে, দেওয়ালে টাঙিয়ে ঘরের শোভা বাড়িয়েছে কিন্তু

তাঁর জীবন সম্পর্কে খোঁজ করেনি। তাই লেখক বলেছেন – 'বাঙালি যামিনী রায়ের ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে, অথচ তাঁর জীবনের আলো-অন্ধকার, উত্থান পতনের, ডাইকোটোমির সন্ধান করেনি তেমনভাবে।'[১] আলোচ্য উপন্যাসটি এই অন্বেষণেরই স্বরূপ একথা বলাই বাহুল্য। গতানুগতিক রচনার ধারা থেকে সরে এসে সাহিত্যের প্রায় সমস্ত উপকরণে পৃথক শৈলীর মধ্য দিয়ে নিজের ভাব-কল্পনাকে পরিস্ফুট করা আধুনিক রচয়িতাদের একটি অন্যতম প্রবণতা। এই উপন্যাসটিও যেন সেই প্রবণতারই একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পনেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটির সমগ্র আখ্যান বর্ণিত হয়েছে সংলাপাকারে। যা মূলত কাল্পনিক। ব্যক্তি যামিনী কিছুটা মুখচোরা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি নিজমুখে সব কথা প্রকাশ করে না গেলেও তাঁর সমগ্র জীবনের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কলকাতার ওলিতে-গলিতে। তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার পিছনে কলকাতার অবদান অনস্বীকার্য। তাই লেখক উপন্যাসে যামিনীর পাশাপাশি 'কলকাতা'কে প্রধান চরিত্ররূপে স্থান দিয়েছেন। কলকাতার নানান প্রশ্নের উত্তরে যামিনীর মুখ দিয়েই প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর সমগ্র জীবনসত্যকে।

যামিনী বেলিয়াতোড়ের মত প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় জন্মগ্রহণ করেও কীভাবে কলকাতায় এলেন? বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও কলকাতা মহানগরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ালেন কীভাবে? তা আমাদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তোলে। যামিনী শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে এই আগ্রহের জাগরণ তুলেছিলেন বাবা রামতরণ রায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবান মানুষ। তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারায় একেবারেই প্রভাবিত ছিলেন না। তিনি শহরে কয়েকবছর সরকারি চাকরি করেন। পরে তা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে চাষবাস শুরু করে জীবনযাপন করেন। এপ্রসঙ্গে অরুন সেন লিখেছেন – ' "এক হাতে বই, অন্য হাতে লাঙল" বলতেন যামিনী রায়ের বাবা রামতরণ রায়। শুধু বলতেনই না, নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন অসামান্য বীরত্বে।'[২] তিনি শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকেও দেশীয় শিল্পকলা ও পদ্ধতিকে পছন্দ করতেন সেই পদ্ধতিতেই গ্রামের সাধারণ পরিবারের ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। উপন্যাসের এই অংশে বিষয়টি স্পষ্ট। 'যামিনী : ...উনি বিশ্বাস করতেন আমাদের দেশের শিল্পীরা যেভাবে কোনো টেকনিক্যাল স্কুলে না গিয়েই আমাদের মন্দিরে মন্দিরে এত উচ্চমানের কাজ করে গেছেন ... এত অসাধারণ সব টেরাকোটা ... সেই শিক্ষায় ... উনি নিজে বাউরি, সাঁওতালদের ছবি আঁকা শেখাতেন দেশীয় পদ্ধতিতে, প্লেট এবং কাঠের ওপর নকশা আঁকতেন, কখনো-কখনো এর জন্য নরুনের মতো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন ...'[৩]। তিনি অত্যন্ত প্রচার বিমুখ ছিলেন। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যামিনী বাঁকুড়ার জেলা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠানোর জন্য বাবার কাছ থেকে অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করেন। কারণ তিনি মনে করেন ছবি মনের আনন্দে আঁকা। প্রদর্শনীতে ছবি দেওয়া এক লোক দেখানো ব্যাপার। কিন্তু যামিনী সেকথা মেনে নিতে পারেননি। বাবার অনুমতি উপেক্ষা করেও 'সমাজ' নামক একটি ছবি প্রদর্শনীতে

পাঠান ও বিচারকদের থেকে পুরস্কারসহ অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করেন। বেলিয়াতোড় গ্রামটি জঙ্গলমহল এলাকায় অবস্থান করায় রাত্রে জন্তু-জানোয়ারদের আর্তনাদ শৈশব থেকেই যামিনীর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। জানা যায় সেই ভয় তিনি আজীবন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। উপন্যাসে ছেলে জীমূতের মৃত্যু প্রসঙ্গে যামিনীর মুখ থেকে একথা জানা যায় – 'বেলিয়াতোড়ের বাড়ি থেকে কিছু দূরেই তো জঙ্গল ... ছোটো থেকেই ওই জঙ্গল আমার কাছে আতঙ্ক ... রাতে শুয়ে শুয়ে বুনো জন্তুর ডাক শুনতাম ... বাবা একটা কাটারি নিয়ে শুতেন আমার পাশে'[৪]। এছাড়াও তিনি গ্রামের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত বাঁধাধরা জীবনযাপনের কথা ভাবতেন না। তাই বলা যেতে পারে প্রথম থেকেই গ্রামজীবনের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পী হতে। বাঁকুড়ার জেলা প্রদর্শনীতে অর্জিত গুণীজনদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ যামিনীর শিল্পী হয়ে ওঠার জেদ ও স্বপ্নকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তাই মামা চারুচন্দ্র দত্তের উৎসাহে তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকেই তাঁর শিল্পের জগতে পদার্পন। তারপর যামিনী আর গ্রামে ফিরতে চাননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন তাঁর শিল্পসাধনার একমাত্র স্থান হল কলকাতা। তাই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নরেশ গুহ ও বিদেশি বন্ধু ডিমক-কে নিয়ে বাড়ি গেলেও দু-চারদিন পর আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

যামিনী ১৯০৩ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে পান ই.বি. হ্যাভেল-কে। আর্ট স্কুলে পড়াকালীন যামিনী আরও দুজন অধ্যক্ষ তথা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পার্সি ব্রাউন-এর সান্নিধ্য অর্জন করেন। আর্ট স্কুলে প্রায় তেরো চোদ্দো বছর ধরে যামিনী পাশ্চাত্যরীতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন এবং নিজের দক্ষতাকে কিংবদন্তির পর্যায়ে নিয়ে যান। তবে তিনি ডিগ্রী অর্জন করতে পারেননি। কেননা, যামিনীর খেয়াল ছিল অন্যরকম। যামিনী ডিগ্রী অর্জনের আশায় কলকাতায় আসেননি। বাবার সান্নিধ্যে তিনি শিল্পের দেশীয় রীতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও পরিচিত ছিলেন। তাই পাশ্চাত্যরীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ তাঁকে পেয়ে বসে। অন্যান্য শিল্পীরা মনে করেন আর্ট কলেজে ঢুকলে শিল্পীরা নিজের শিল্পীসত্তাটুকু ভুলে যায়। কিন্তু যামিনী বলেন – 'ওখানে অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং নিয়ে আমার ভিতটা মজবুত হল অনেক বেশি ... আইন না জানলে আইন ভাঙব কী করে!'[৫]। এখানে চিরাচরিত ভাবধারা থেকে সরে এসে এক পৃথক চিন্তাধারার পরিচয় দেন যামিনী। আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন উপলব্ধি করেছিলেন যামিনী খুব কম সময়ের মধ্যে অ্যানাটমি শিক্ষা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি যামিনীকে স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে রাখতে চাননি। সস্নেহে তাঁকে স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করেছিলেন। এই স্বাধীনতা ছিল যামিনীর কাছে দৈব্য আশীর্বাদের মতো। যামিনী বাড়ি থেকে কোনো খরচ নিতেন না। এমনকি কলকাতায় দাদার বড়ো ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও তাঁর থেকে কোনো সাহায্য গ্রহণ করেননি। বরং দাদার কাজ করে দিয়ে মজুরি বাবদ সামান্য অর্থ নিয়ে সেই টাকায়

নিজের খরচ চালাতেন। এমনই ছিল তাঁর সম্ভ্রমবোধ। এছাড়াও আর্থিক অনটনের কবলে পড়ে তিনি অন্যান্য কাজও করতেন। শিল্পের সাধনায় তিনি নিজের সমস্ত আরামপ্রিয়তা ত্যাগ করে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ঔপন্যাসিক যামিনীর এমন জীবনযাপন ও আদর্শকে শিল্পী গনেশ পাইনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। যামিনী এমন কঠোর জীবন সংগ্রামমুখর পরিস্থিতিতে বুঝেছিলেন টাকার আসল মূল্য কতখানি। তাই তিনি শিল্পচর্চাকেই পেশা করতে চেয়েছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যরীতিতে পোর্ট্রেট শিক্ষায় হাত পাকিয়ে, প্রথম জীবনে পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবেই বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই পোর্ট্রেট শিল্প যামিনীর জীবনে এনে দিয়েছিল আর্থিক স্বচ্ছলতা।

পোর্ট্রেট শিল্প যামিনীকে সফলতার চরম শিখরে নিয়ে গেলেও এই রীতিতে তিনি নিজেকে বেশিদিন স্থায়ী রাখতে পারেননি। শিল্পী হিসেবে মর্যাদার অভাববোধ তাঁর মধ্যে আত্মদ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। তাই অর্থের পরোয়া না করে অন্বেষণ করেছিলেন নতুন শিল্পভাষার। পোর্ট্রেট শিল্পের প্রতি তাঁর মধ্যে অনীহা আসার কারণ আমাদের অবাক করে তোলে। আমরা যারা নিজেদের শিল্পপ্রেমী মনে করি সত্যিই কী শিল্পবোধ আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে? হয়তো কিছু বোদ্ধার রয়েছে। তবে যারা শিল্পীর সৃষ্টিকে নিছকই ঘর সাজানোর উপকরণ মনে করি কিংবা শুধুমাত্র সমাজে 'স্টেটাস মেইন্‌টেন্‌' করার জন্য টাকার বিনিময়ে অর্ডার মাফিক শিল্প সংগ্রহ করতে চাই তারা শিল্পের অমার্যাদা করি। এই অমার্যাদা যামিনীর শিল্পীসত্তাকে আঘাত করেছিল। উপন্যাসের একটি অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে – 'যামিনী : পোর্ট্রেট আঁকাটা যেন ফরমায়েশি হয়ে উঠছিল দিন দিন, কেউ হয়তো একটা ফ্যামিলির দশজনের গ্রুপফোটো এনে দিল, তার মধ্যে রয়েছে তার মৃত পিতার ছোটো একটা মুখ। সেইটে বড়ো করে পোর্ট্রেট করে দিতে হবে, বোঝো অবস্থা! শুধু তাই নয়, একজন হয়তো টাই-কোট পরে ফোটো তুলেছিল, এবার আমাকে বলা হচ্ছে সেই ফোটোকে ধুতিচাদর জড়িয়ে পোর্ট্রেট এঁকে দিতে হবে। কিংবা আমি হয়তো কোনো একটা মুখমণ্ডলে নিজের মতো করে চরিত্রের রূপটা ফুটিয়ে তুলতে চাই চিরাচরিত পোর্ট্রেটের নিয়ম না মেনে। সেটা পছন্দ হবে না ক্রেতার, বলবে একদম হুবহু ফোটোগ্রাফি করে দিতে। ...ভাবলাম সারাজীবন এই করে যাব? এই ফরমায়েশি? এর জন্যে শিল্পী হলাম?'[৬] উদ্ধৃতাংশে শিল্পীর বেদনার জায়গাটি স্পষ্ট। যামিনী শিল্পের অমর্যাদা একেবারেই মেনে নিতে পারতেন না। এমনকি নিজের আঁকা ছবি কোনো ক্রেতার বাড়িতে অযত্নে পড়ে আছে দেখলে টাকা দিয়ে সেই ছবি কিনে এনে নিজের বাড়িতে যত্ন করে রাখতেন। যামিনী তাই পোর্ট্রেট আঁকা ছেড়ে নতুন শিল্পভাষার সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করেন।

যামিনী জানতেন পোর্ট্রেট আঁকা ছেড়ে দিলে সংসার চালানো মুশকিল হবে। কিন্তু তবুও তিনি মৌলিক সৃষ্টির প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত এঁকে গেছেন। চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করতেন তাঁর কাজ শুধু আঁকা। আঁকা শেখানো

নয়। সেইসময় তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যামিনীর কাজের প্রতি এমন নিষ্ঠা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য - 'যামিনী : কবিরা আমার কাজ দেখে কতটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল আমি জানি না, তবে তারাশঙ্কর ... একবার বলেছিল যে, আমার সারাদিন কাজ করা দেখে ও লেখার অনুপ্রেরণা পায়...'[৭]। বুদ্ধদেব বসুও যামিনীর ব্যক্তিজীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন –'কলকাতা : বুদ্ধদেব বসুও লিখে গেছে যে তোমার 'ব্রতপালনের মতো জীবন' ওকে কবি হিসেবে শক্তি জোগায়...'[৮] যামিনী চিত্রভাষা খুঁজতে সবকিছুকে অত্যন্ত ধর্য্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। সন্তান অমিয়-র (ডাকনাম পটল) আঁকা ছবি দেখে তিনি উপলব্ধি করেন এমন সরল স্বাচ্ছন্দ্যের ছবিই তিনি খুঁজছিলেন। তাই তিনি ফিরে যান বাংলার পটুয়াদের কাছে। সেখানে তিনি পটুয়াদের দেশীয় রীতি পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। মন্দিরের গায়ে গায়ে টেরাকোটার কাজ উপলব্ধি করেন। পটুয়াদের পটের মধ্যে পুরাণকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র এই পদ্ধতিতেতেই দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। এই ভাবনা থেকেই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি পটের আদলে সৃষ্টি করেন নতুন চিত্রভাষা। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সকল প্রান্তের মানুষের কাছে নিজের সৃষ্টি পৌঁছে দিতে।

এই নতুন ধারার ছবি আঁকার জন্য তিনি তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছেন। যাঁরা খ্যাতনামা পোর্ট্রেট শিল্পী যামিনীকে চিনতেন তাঁরা যামিনীর এমন পরিবর্তনকে কিছুতেই মেনে নিতে চাননি। তাঁকে শুনতে হয়েছে- পট আঁকার মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? কখনও শুনতে হয়েছে তাঁর ছবি নাকি হুবহু কালীঘাটের পটের নকল। এসব সমালোচনায় তিনি খুব কষ্ট পেতেন। তিনি স্বীকার করেছেন বাংলার পট দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও কখনও নকল করেননি। পটুয়াদের তুলির টানের সঙ্গে যামিনীর তুলির টানের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পটুয়াদের মধ্যে ছবিকে 'থ্রীডাইমেনশন'-এ দেখানোর একটা প্রবণতা রয়েছে। কালীঘাটের পটের মধ্যে তা আরো বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। যামিনী তা গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করতেন 'থ্রী ডাইমেনশন'-এ আঁকা মানে দর্শকদের ঠকানোর প্রচেষ্টা করা। আমরা যখন ফ্ল্যাট চিত্রপটের দিকে তাকিয়ে থাকি তখন কোনোভাবেই 'থ্রী ডাইমেনশন' দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর ছবিতে 'টু ডাইমেনশন' পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি ছবির রঙ তৈরি করতেন সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে।

কলকাতা : তোমার ছবি তো কালীঘাটের পটের নকল?
এই নিয়ে সবাইয়ের অভিযোগ!

যামিনী : আমি অবাক হয়ে ভাবি, লোকের খালি আমার ছবির সঙ্গে কালীঘাট
পটের মিল চোখে পড়ল! তার অমিলটা চোখে পড়ল না?
কালীঘাট পটে তো দেশীয় রীতির সঙ্গে ইউরোপীয় রীতির

যথেষ্ট মিশেল দেওয়া হয়েছিল।[৯]

উপন্যাসের এই অংশে স্পষ্ট হয়ে যায় যামিনীর বক্তব্যটি। এছাড়াও নরেশ গুহ তাঁর 'যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর' গ্রন্থে যামিনীর মৌলিকত্বকে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন - 'তার 'চোখে-না-দেখা' ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব। রিয়ালিজম্ ত্যাগ করে শিল্পকলার এই বিশেষত্ব অর্জন করাই ছিল যামিনী রায়ের অন্বিষ্ট আধুনিকতা।'[১০] পার্থ গোস্বামী তাঁর 'রূপদক্ষ যামিনী রায়' গ্রন্থে অধ্যাপক ও কলাবিশারদ শোভন সোম-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখিয়েছেন যে কালীঘাটের পটের সঙ্গে যামিনীর আঁকা ছবির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তারই সামান্য অংশ তুলে ধরা হল – 'যামিনী রায় কালীঘাটের পটের রেখাকে গ্রহণ করেননি। তাঁর রেখা মোটা ও কড়া – এই রেখাকে মোলায়েম করে দেখানোর জন্য দেহের ভেতরের দিকে কালো রেখা ঘেঁষে ধূসর বা লালরেখা দেখা যায় ছবির কোথাও কোথাও। ভঙ্গিকে অনেকটা বাঁকিয়ে, কোমরকে বেশ খানিকটা সরু করে, হাত-পা আঙুলে লতার ভাব সৃষ্টি করে ড্রইংকে নিজের মতো করে নিয়েছেন।'[১১] আজও যামিনী সম্পর্কে আন্তর্জালিক মাধ্যমে বা পত্রপত্রিকায় এই পট ঘেঁষা মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন – 'যামিনী রায় বাংলার বিখ্যাত লোকচিত্র কালীঘাট পটচিত্র শিল্পকে বিশ্বনন্দিত করে তোলেন। যামিনী রায় নিজে পটুয়া না হলেও নিজেকে পটুয়া হিসেবে পরিচয় দিতেই তিনি পছন্দ করতেন'[১২] যামিনী সম্পর্কে এ মন্তব্যের কোনো তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না, তাই বলা যেতে পারে একথা ত্রুটিপূর্ণ। কেননা প্রথমত, তিনি নিজে মুখে স্বীকার করে গেছেন কালীঘাটের পট নয় বাংলার পট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যেহেতু পট আঁকেননি তাই কখনই নিজেকে পটুয়া বলতে চাননি। তিনি একজন চিত্রশিল্পী একথায় সর্বাগ্রে গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিগত ভাবেও যামিনী সমালোচিত হয়েছিলেন নানাভাবে। যামিনীর জীবন আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো সহজ ছিল না। জীবন সংগ্রামী যামিনী তাই সফলতার চরম শিখরে পৌঁছেও সাদামাটা জীবনযাপন করেছেন। এজন্য অনেকেই তাঁকে কৃপণ বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। স্বয়ং ঔপন্যাসিকও জীমূতের মৃত্যু প্রসঙ্গে শিল্পী-যামিনীর সংকীর্ণ মানসিকতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যামিনীর ছবির কখনও প্রশংসা করেছেন আবার কখনও তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবুও যামিনী সুধীন্দ্রনাথকে ভালোবাসতেন। সুধীন্দ্রনাথের বিবাহ নিয়ে সমস্যা হলে যামিনী নিজে বিপুল অর্থ খরচ করে সেই সমস্যার সমাধান করেছেন। কেন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের এই অংশটি - 'যামিনী : ...সুধীনের মতো পণ্ডিত মানুষ আমি জীবনে দুটি দেখিনি। ও আমার সম্বন্ধে কিছু কটু কথা হয়তো বলেছিল, কিন্তু ওই তো আমার সম্বন্ধে অত প্রশংসার কথাও লিখেছিল!'[১৩] এখানেই যামিনীর আসল পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনযাপনের আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না ঠিকই, তবে প্রয়োজনে জলের মতো টাকা খরচ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই তাঁকে কৃপণ বলা

চলে না। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের করা সমালোচনার কথা ভুলে প্রশংসার কথা মনে রেখেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে যামিনীর মধ্যে একজন উদারতা সম্পন্ন আদর্শবান মানুষের ছবিই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। তবে যামিনী শুধুই সমালোচিত হয়েছেন তা নয়। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি বিপুল প্রশংসা লাভ করেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ প্রথম ‘সাঁওতাল মা ও ছেলে’ ছবিটি কিনে তাঁর নতুন ধারার ছবিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রায় সকলের কাছেই তিনি প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

উপন্যাসের কথোপকথন সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক হলেও, উপন্যাসের কোনো ঘটনায় ঔপন্যাসিকের মনগরা নয়। যামিনীর জীবনের প্রতি আগ্রহ লেখকের মনে হাজার প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিলে। সেইসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই লেখক যামিনীকে নিয়ে খুঁটিনাটি গবেষণা করেছেন ও সংগ্রহ করেছেন। বইয়ে নির্দেশিত উল্লেখপঞ্জিই তার প্রমাণ। তাই বলা চলে এই ‘কলকাতা’ লেখক নিজেই। তিনি নিজেই নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যামিনীর সমগ্র জীবনসত্যকে নিংড়ে বের করে এনেছেন পাঠকের সামনে। শুধু যামিনীর শিল্পীসত্তা নয়, ব্যক্তিসত্তা, সমকালীন রাজনৈতিক বোধ, সমকালীন সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গকে এক বিশেষ কৌশলের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। যাই হোক, আমরা দেখলাম যে যামিনী গ্রাম থেকে শহরে ছুটে গেলেন শিল্পী হওয়ার নেশায়। অর্থ উপার্জন করতে পাশ্চাত্যরীতিতে পোর্ট্রেট শিক্ষা অর্জন করে চরম সফলতাও অর্জন করলেন কিন্তু নিজেকে স্থায়ী রাখতে পারলেন না। যে যামিনী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও বাড়ি ফিরতে চাননি সেই যামিনী চিত্রভাষা খুঁজে পেলেন গ্রামের মাটিতেই। আজ আমরা পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে যামিনীকে চিনিনা। বলাই বাহুল্য মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর পরও দেশীয় রীতিতে আঁকা এই নতুন চিত্রভাষার

জন্যই যামিনী রায় আজ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে রয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

১. ঘোষ সঞ্জয়, যামিনী কলকাতা সংলাপ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, বইয়ের মলাটের উল্টোপৃষ্ঠা।
২. সেন অরুণ, যামিনী রায় বিষ্ণু দে : বিনিময়, প্রতিক্ষণ, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৩, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২২।
৩. ঘোষ সঞ্জয়, যামিনী কলকাতা সংলাপ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৫৩।
৪. তদেব, পৃ. ২৭।
৫. তদেব, পৃ. ৬৩।
৬. তদেব, পৃ. ১১৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৩৯।

৮. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৯. তদেব, পৃ. ১৭০।
১০. গুহ নরেশ, প্রভাতকুমার দাস(সম্পাদনা টীকা), যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর, লালমাটি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৯।
১১. গোস্বামী পার্থ, রূপদক্ষ যামিনী রায়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৯, পৃ. ১৩১-১৩২।
১২. মণ্ডল দেবব্রত, যামিনী রায়ের জীবনী, অনলাইন, www.bhugolshiksha.com
১৩. ঘোষ সঞ্জয়, যামিনী কলকাতা সংলাপ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৪৬

মৈমনসিংহ-গীতিকায় নির্বাচিত পালায় আত্মহত্যার মনস্তত্ত্ব

স্বপ্ননীল সরকার
স্নাতকোত্তর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: 'আত্মহত্যা' শব্দটির বুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আত্মন্-√হন্+কযপ্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্ (এটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ)। আত্মহত্যা বর্তমান সমাজে একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা। মধ্যযুগের সাহিত্যে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে থাকলেও মৈমনসিংহ-গীতকার অন্তর্গত প্রায় প্রতিটি পালায় (ব্যতিক্রম কমল, কাজলরেখা) আত্মহত্যার প্রসঙ্গ অবসম্ভাবীভাবে উঠে এসেছে। মৈমনসিংহ-গীতকার নির্বাচিত পালায় আত্মহত্যা-প্রসঙ্গগুলিকে আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও দর্শনচিন্তার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ: আত্মহত্যা, আত্মত্যাগ, আত্মহত্যার হুমকি, Pleasure Principal, Thanatos, Egoistic Suicide, Altruistic Suicide, Schizophrenia.

মূল আলোচনা:

'আত্মহত্যা' (Suicide) শব্দটি লাতিন 'Sui' এবং 'Cidium' থেকে এসেছে; যাদের অর্থ যথাক্রমে একজন (of himself) এবং হত্যা (slaughter)।[১] অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি গ্রন্থে ১৬৫১ সালে 'সুইসাইড' শব্দটির উল্লেখের প্রমাণ থাকলেও স্যার থমাস ব্রাউনি'র 'রিলিজিও মেডেসি' গ্রন্থে ১৬৩৫ মতান্তরে ১৬৪২ সালের শব্দটির প্রথম প্রয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] আত্মহত্যা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—নিজেই নিজেকে হত্যা করা; অন্যকে দিয়ে নিজেকে হত্যা করানো; এমন কোনো অবস্থার মধ্যে নিজেকে নিয়ে যাওয়া, যার মধ্যে দিয়ে নিজের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং কোনোরকম বাধা না দিয়ে নিজেকে সেভাবে মরতে দেওয়া; এমন অবস্থা তৈরি করা যেখানে অন্য ব্যক্তি এসে এই ব্যক্তিকে হত্যা করবে; অন্যকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেকে মরতে দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো বিচার করে অরিন্দম চক্রবর্তী আত্মহত্যার যে প্রাথমিক সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন, সেটি হল—'নিজের মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কেউ এমন কাজ করে যার ফলে সত্যিই সে মরে যায়—তখন তার সেই কাজকে আত্মহত্যা বলে।'[৩]

১৯২৩ সালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যে আত্মহত্যা প্রবণতার প্রসঙ্গ কম বেশি থাকলেও মধ্যযুগের ধর্মীয় ভাবনায় যেহেতু আত্মহত্যা 'পাপ' বলে স্বীকৃত ছিল; তাই কোনো চরিত্রই সরাসরি আত্মহত্যা করেনি।

পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে মঙ্গলকাব্যে সতীর দেহত্যাগ কিংবা বাংলা রামায়ণে (অনুবাদ-কাব্য) রাম, সীতার আত্মহত্যার প্রসঙ্গ থাকলেও আত্মহত্যার নৈতিক সমর্থন না থাকায় এই চরিত্ররা আবার কোনো না কোনো রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার আত্মহত্যার হুমকির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলিতে চণ্ডীদাসের রাধার মুখ থেকে শোনা যায়, ‘কামনা করিয়া সাগরে মরিব,/সাধিব মনের সাধা/মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন/তোমারে করিব রাধা’। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে স্বামী বাণিজ্যমুখী হলে সতীনের অত্যাচারে খুল্লনা আক্ষেপ করে আত্মহত্যার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। রামায়ণে অন্ধক-অন্ধকী স্বেচ্ছায় আগুনে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করেছে। বিক্ষিপ্তভাবে আত্মহত্যা-প্রসঙ্গ মধ্যযুগের সাহিত্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু, মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত প্রায় প্রতিটি পালার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে অবধারিতভাবে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এসেছে।

আত্মহত্যাকে মনস্তত্ত্বে বাস্তব জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পলায়নীবৃত্তি হিসেবে বিবেচিত নয়। সক্রেতিসের ভাবনায়, ভীরুরাই আত্মহত্যা করেন—এই অবৈজ্ঞানিক মিথকে ভেঙে দেয় ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’র দ্বিজ কানাই প্রণীত ‘মহুয়া’ পালায়মহুয়ার আত্মহত্যার প্রসঙ্গ। জীবনের প্রবল প্রতিকূলতাতেও তিনি মৃত্যুইচ্ছা পোষণ না করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপ্রাণ লড়াই করতে পিছুপা হন না। মহুয়া ভিনদেশী বণিক-সাধুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিষ-পান তৈরি করে সাধু-সহ মাঝিমল্লারদের হত্যা; ডিঙার কাছি কেটে কুঠারের আঘাতে নৌকার তলদেশ ভেঙে ডুবিয়ে দেওয়া; মুনির থেকে বাঁচতে, প্রেমিককে বাঁচাতে অসুস্থ প্রেমিককে কাঁধে তুলে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করার শারীরিক সক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু হঠাৎ পিতা হুমরার মুখোমুখি মহুয়া; পিতা জানান, নিজের প্রাণ বাঁচাতে দু-টি শর্ত মহুয়াকে পালন করতে হবে—

> ‘প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।/বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষ্মনেরে মার।।
> আমার পালক পুত্র্র সুজন খেলোয়ার।/বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।’[৪]

এ-অবস্থায় প্রাণপতিকে হত্যা না করে মহুয়া নিজের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করেন। মহুয়া তখনই আত্মহত্যা করেছেন যখন তাঁর বাঁচার এবং প্রেমিককে বাঁচানোর ন্যূনতম সুযোগটিও নেই। তিনি জানেন, পিতা কিছুতেই চাঁদকে বাঁচতে দেবেন না। আর চাঁদের প্রেম ছাড়া মহুয়ারও বাঁচা অসম্ভব। তাই একান্ত নিরুপায় হয়েই আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। মহুয়ার আত্মহত্যা ভীরু-কাপুরুষতার পরিচায়ক নয়; পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ধ্বনিত। বিবাহে পিতার নয়, যাঁর সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে, সেই নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই একমাত্র মানদণ্ড; মহুয়ার আত্মহত্যা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ-প্রসঙ্গে আনোয়ারুল করীম বলেছেন—

> "এখানে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে পতি হিসেবে গ্রহণ করার যুক্তি হিসেবে তার প্রেমের উল্লেখ করেছে। বলেছে, প্রেমিকের চোখ নিয়ে দেখলে হুমরা বেদে কিংবা সুজন এই প্রস্তাব দিতে পারে না। বিবাহ নর-নারীর উভয়ের। এটা একটি সামাজিক চুক্তি। হিন্দু সমাজে নারীর এই অধিকার তৎকালীন সমাজে ছিল না। ইসলামে বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি বিশেষ। বাংলাদেশে ইসলাম সুফীদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এবং অনেক মুসলমান এ দেশে বিবাহ করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকায়' কবি বিবাহে নারীর মতামতই শুধু নয়—তার যে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আছে...তারই প্রাধান্য দিয়েছেন। আত্মহননের মধ্য দিয়ে মহুয়া এই সত্যকে প্রমাণিত করেছে।"[৫]

মহুয়ার আত্মহত্যা পিতৃতান্ত্রিক সামাজের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় প্রতিষ্ঠা। কারণ, মহুয়ার আত্মহত্যার পর হুমরার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে; তিনি ভুল বুঝতে পারেন; পিতৃতান্ত্রিক কাঠিন্যের পোশাক খসে গিয়ে বেরিয়ে আসে পিতৃহৃদয়ের স্নেহাতুর হাহাকার। মহুয়ার আত্মহত্যা পিতার জীবনকে বদলে দিয়েছে; গোষ্ঠীচেতনার ঊর্ধ্বে ব্যক্তিচেতনার বিজয় ঘোষণা করেছে। হুমরা সমাজপতি-গোষ্ঠীপতি হিসেবে নয়, পিতা হিসাবে বুঝতে পেরেছেন সন্তানের জীবনের ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুরুত্ব, প্রেম-নির্বাচনের স্বেচ্ছাধীনতার তাৎপর্য। কার্ল মার্ক্স বলতে চেয়েছিলেন আত্মহত্যা আত্মহত্যাকারীর অপরাধ হিসেবে না বিবেচিত হয়ে সমাজের অপরাধ হিসেবে গণ্য হোক—'প্রতিটি আত্মহত্যায় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক একটি প্রতিবাদ...অস্তিত্বটাই এই জাতীয় অবিচারিত স্থুলদৃষ্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোলা প্রতিবাদ।'[৬] এক্ষেত্রে মহুয়ার আত্মহত্যাও পুরুষতান্ত্রিক, পিতৃ-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার মূলে যেন এক আধুনিক নারীবাদী আন্দোলন সংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে।

'মলুয়া' পালায় মলুয়া তাঁর স্বামী বিনোদকে কেন্দ্র করেই নিজের অস্তিত্ব গড়ে তুলেছিলেন। কাজী কর্তৃক বিনোদের প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে উদ্ধার করা, দেওয়ানের কবল থেকে নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য ব্রত-পালনের অজুহাতে তিন মাস সময় চাওয়ার কৌশল অবলম্বন, কাজীকে শূলে চড়ানো ইত্যাদি সাহসিকতা ও অগাধ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন মলুয়া। মলুয়া কাজীর সঙ্গে সহবাসের বিনিময়ে বিলাসী জীবনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন; এমনকি নিদারুণ অর্থকষ্টের দিনেও স্বামীকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ির সচ্ছলতায় দিনযাপন করতেও রাজি হননি। মুসলিম দেওয়ানের হাভেলীতে থাকায় ব্রাহ্মণসমাজপতিরা তাঁর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পরিবার-সহ বিনোদও তাঁকে ঘরে তুলতে রাজি হননি। অনাদর-অবিশ্বাসে

স্বাভাবিকভাবেই প্রেম ক্ষত-বিক্ষত হয়। বিনোদ পুনর্ব্বিবাহ করলেও 'বাইর কামুলী' বা দাসী হিসেবে সংসারের বাইরে এককোণে পড়ে থাকে মলুয়া। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় একে 'Displacement' বলা যেতে পারে। তাঁর ভিতরে ভিতরে জমতে থাকে বিষণ্ণতা, হতাশা। তিনি বুঝতে পারেন, স্বামীর ভালোবাসা তিনি আর কোনোদিনও পাবেন না। যে স্বামী এতদিন ছিল মলুয়ার Pleasure Principal, তাঁকে বাঁচাতে, তাঁর ভালোবাসাকে বাঁচাতে মলুয়াকে কতই না সংগ্রাম করতে হয়েছে; কিন্তু প্রতিদানে তিনি এখন দ্বিতীয় পত্নীর প্রেমে আচ্ছন্ন। বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে মলুয়ার Ego প্রবল হওয়ায় দাসীর জীবন মেনে নিয়েও বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছিল মলুয়া। এ-অবস্থায়, একদিন কোড়া শিকারে গিয়ে বিনোদকে কালসর্পে দংশন করতে মলুয়াই ওঝার সাহায্যে তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন। এই ঘটনার পর অনেকেই মলুয়াকে ঘরে তুলতে অনুরোধ করলেও জ্ঞাতিবর্গের আপত্তিতে বিনোদ তাঁকে ঘরে তোলেনি। এই অপমান ও অবহেলা এবার মলুয়ার কাছে সহ্যাতীত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর Id প্রাবল্য লাভ করল। এতদিন প্রতিদানের প্রত্যাশা উত্তীর্ণ নির্লিপ্তি নিয়ে যে মহুয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এখন তাঁর মনে প্রত্যাখ্যানের কশাঘাত প্রবলতর হয়ে উঠল। তবে তাঁর প্রধান ভাবনা ছিল এই যে, তাঁর স্বামী ও দ্বিতীয় স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝখানে আগাছার মতো কলঙ্কিত ইতিহাস নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই; তাতে স্বামীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে; ফলে স্থির করলেন, 'কলঙ্কজীবন মোর ভাসাইব সাগরে'[৭]। ভাঙা নৌকায় উঠে মাঝ-নদীতে গিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। যদিও সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে না পেরে সতী মলুয়া এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।'[৮] কিন্তু অন্যভাবে ভাবলে বোঝা যায়, 'মিথ্যা অপবাদে'র কারণে নয়, সমাজের বিরুদ্ধে এবং সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এই আত্মহত্যা। শেষকালে ননদ, শাশুড়ি, ভাই, স্বামী, জ্ঞাতিজন, বন্ধু সকলে তাঁকে ফিরে আসতে বললেও তিনি আত্মহত্যা থেকে বিরত হননি। এই স্বেচ্ছামৃত্যুকে অনেকে 'সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' বললেও এই মৃত্যু সমাজ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কারণ, তাঁর পরিবার-আত্মীয়-স্বজনদের সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সামর্থ নেই; অন্যদিকে মহুয়ার অস্তিত্বই তাঁর স্বামীকে সমাজের কাছে অস্বস্তিকর নিন্দনীয় পাত্র হিসেবে চিহ্নিত করছে; তাই এই সমাজের মুখ বন্ধ করতে স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মহুয়া আত্মঘাতী হলেন—'আমি নারী থাকতে তোমার কলঙ্ক না যাবে/জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে'; তাই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে স্বামীর সামাজিক-স্বীকৃতি ফিরিয়ে আনতে 'পথের কাঁটা'-স্বরূপ নিজ-জীবনকে সরিয়ে ফেলতে চাইছেন মলুয়া। আত্মহত্যাটি রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে চন্দরার কথা মনে করিয়ে দেয়।

মৈমনসিংহ গীতাকার একজন পুরুষ চরিত্রই আত্মহত্যা করেছেন, তিনি 'চন্দ্রাবতী' পালায় জয়ানন্দ। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বিবাহের দিন এক মুসলমান নারীর রূপজমোহে আচ্ছন্ন হয় জয়ানন্দের 'পলিগ্যামাস' মন। বিশ্বাসঘাতকতায় হতবাক চন্দ্রাবতী শিব পূজায় নিমগ্ন হন। কিছুকাল পরে অনুতপ্ত জয়ানন্দ ক্ষমাপ্রার্থনা করে একবারের জন্য

'জন্মশেষ দেখা'র আশা নিয়ে পত্র লিখলেও চন্দ্রাবতী অনড় থাকেন। অবশেষে জয়ানন্দ মন্দিরের দ্বারে এসে কাতরভাবে শেষবারের দেখার জন্য কাকুতি মিনতি করেও কোনো ইতিবাচক ফল পান না—'শেষ বিদায়' জানিয়ে জয়ানন্দ নদীতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। জয়ানন্দ অপরাধবোধ থেকে মুক্তির জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। যদিও জয়ানন্দের আত্মহত্যা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,

> "জয়ানন্দের চরিত্রে দৃঢ়তা নাই সেইজন্য প্রেমেও নিষ্ঠা নাই; অতএবং সে যেন তাঁহার প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামিনীতে আসক্ত হইতে পারে, তেমনই সে আকস্মিক উত্তেজনায় জীবনও বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু এই জীবন বিসর্জনের মধ্যে তাহার আত্মহত্যার পাপই বৃদ্ধি পাইয়াছে, আত্মত্যাগের গৌরব প্রকাশ পায় নাই।...তাহার জন্য চন্দ্রাবতীও এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না, নারীর নিকট পুরুষের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরাজয়।"[৯]

কিন্তু গভীরে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, প্রণয়ের আকর্ষণ না থাকলে প্রত্যাবর্তন ও আত্মবিসর্জন সম্ভবপর হত না। যখন তিনি মুসলিম রমণীর প্রেমে পড়েন, তখন তিনি Id-চালিত; কিন্তু পরবর্তীকালে Super Ego তাঁকে অনুশোচনাবিদ্ধ করেছে, তাই তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। এই আত্মহত্যা প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন—

> "ক্ষণিকের রূপদর্শনে এরূপ গভীরতা সম্ভব নয়। জয়ানন্দের প্রত্যাবর্তনে তার গভীর প্রণয়াবেগেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তার আত্মবিসর্জনের ঘটনাও মোটেই আকস্মিক নয়। স্বীয় গুরুতর অপরাধবোধের অসহনীয় অনুশোচনা তাকে আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। যন্ত্রণামুক্তির পথ হিসেবে আত্মবিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েই সে শেষবারের মতো চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ-প্রার্থী হয়েছে।"[১০]

'দস্যু কেনারাম পালা'য় আত্মহত্যা নেই, কিন্তু আত্মহত্যার প্রচেষ্টা আছে। বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের পর মানসা-বন্দনা গীত শুনে নিষ্ঠুর ডাকাত কেনারামের মন ভক্তিরসে বিগলিত হয়। তিনি ভুল বুঝতে পেরে বলেন—

> "জন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীর জলে।/ডুবিয়া মরিব আমি ঐ না নদীর জলে।।...
> খাণ্ডা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাথে।/বিদায় চাহিল কেনা গুরুর সাক্ষাতে।।
> রক্তজবা আখি কেনা পাগলের প্রায়।/আপন দেহের মাংস আপনি কামড়ায়।।

> ‘কত পাপ করিয়াছি লেখাজুখা নাই।/আমার মতন পাপী ত্রিভুবনে নাই।।
> কত লোক মারিয়াছি এই খাণ্ডা দিয়া।/আপনি মরিব আজি দেখ দাড়াইয়া।।”[১১]

অপরাধবোধ থেকে মুক্তির জন্য কেনারাম আত্মহত্যার পথ নির্বাচন করতে চান; যদিও বংশীদাস তাঁকে আত্মহনন থেকে বিরত করেন। কেনারাম অর্থলোভমুক্ত; ‘মানুষ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ’—হত্যার আনন্দই হচ্ছে তাঁর Pleasure Principle। Pleasure Principle নিয়ন্ত্রিত Id এবং বংশীদাসের সাক্ষাতে জেগে ওঠা Moral Principal নিয়ন্ত্রিত Super Eco—এই দু’য়ের প্রবলতর দ্বন্দ্বে Id পরাজিত হলে কেনারামের মনের গহনে ‘Thanatos’-এর আবির্ভাব ঘটে। এই Thanatos একপ্রকার Death Drive Force-এর মতো কাজ করে; Oxford Dictionary of Psychology-অনুযায়ী,

> ‘In psychoanalysis, the unconscious drive towards dissolution and death, initially turned inwards on oneself and tending to self-destruction; later turned outwards in the form of aggression.’[১২]

সেই কারণেই নিজেই দাঁত দিয়ে নিজের মাংস কামড়ে, খড়্গা দিকে নিজের মাথা কেটে কিংবা জলে ডুবে আত্মহনন করতে তাড়িত হয় কেনারাম। ‘অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান: মানসিক ব্যাধের লক্ষণ কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি’ গ্রন্থে নিহাররঞ্জন সরকার, তনুজা সরকার লিখেছেন—“আত্মহত্যার জন্য বহু প্রেষণাকে দায়ী করা হয়েছে (Mintz, 1968)। যেমন, ক্রোধ যখন অর্ন্তমুখী হয় (Aggression turned inward), তখন মানুষ আত্মহত্যা করে। ঠিক তেমনি ভাবে, অন্যের মধ্যে অপরাধ বোধ সঞ্চালিত করে প্রতিশোধ নেওয়া, অন্যের কাছে থেকে ভালবাসা আদায় করা, অতীতের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করা বা সংশোধন করতে চেষ্টা করা, অযাচিত বা অবাঞ্ছিত অনুভূতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা,...পুনর্জন্ম লাভের চেষ্টা করা, মৃত প্রিয় জনের সাথে মিলিত হওয়া, পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করা বা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করা,...অসহ্য ব্যাথা, অথবা আবেগীয় শূন্যতাবোধ।” (জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৩৮৮)। কেনারামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যেই আত্মবৈরিতার কথা বলেন আমেরিকান মনোচিকিৎসক কার্ল মেনিংগার সেই ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করে বলেন, যেকোনো আত্মহত্যাই তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত অবচেতনিক মাত্রাকে উপস্থাপন করে—

১. Revenge/hate (a wish to kill)
২. Depression/Hopelessness (a wish to die)

৩. Guilt (a wish to be killed)

প্রতিশোধ বা ঘৃণাবোধ থেকে উদ্ভূত জিঘাংসাবৃত্তি, অবসাদ বা আশাহীনতা থেকে উদ্ভূত মৃত্যুইচ্ছা, অপরাধবোধ থেকে হত্যা হওয়ার ইচ্ছা—এই তিনটি প্রবৃত্তির যেকোনো একটি তীব্রভাবে যখন আত্মমুখী হয় তখনই ঘটে যায় আত্মহত্যা।[১৩] কেনারামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিজের কৃতকর্মের প্রতি ঘৃণাবোধ, ব্যর্থ বা তাৎপর্যহীন জীবনের গ্লানি এবং অপরাধবোধের জন্য অনুশোচনা—এই থেকেই তাঁর মৃত্যু-ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

'দেওয়ান ভাবনা' পালায় সুনাইয়ের আত্মহত্যা মলুয়ার মতোই পরার্থপর। স্বামীর জীবন ও নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য একমাত্র পন্থা হিসাবে আত্মহত্যাকে অবলম্বন করেছেন। শ্বশুর গৃহবধূ সুনাইকে পুত্র মাধবের উদ্ধারের জন্য দেওয়ানের নিকট দেহদানের অনুরোধ করলে স্বামীকে উদ্ধারের জন্য সুনাই দেওয়ানের কাছে যান এবং সঙ্গে নেন বিষবড়ি। দেওয়ানকে সুনাই বলেন—'আমার বন্ধুরে আগে করিবা খালাস/তবে সে মিটাইবাম আমি তোমার মনের আশ'[১৪]। এরপর দেওয়ান কর্তৃক মাধব মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলে নিশিকালে দেওয়ান বাংলোতে ঢুকে দেখেন পালঙ্কে শয্যাশায়ী সুনাই—'বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কালা।/অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরলের জ্বালা'(তদেব, পৃ.১৯১)।

এই আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করলে তিনটি দিক উঠে আসে—১. একনিষ্ঠ প্রেম প্রমাণের লক্ষ্য, ২. দেওয়ানের লোলুপতা থেকে নিজের সতীত্বকে রক্ষা, ৩. পুরুষতান্ত্রিকতার অভিশাপ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী বরাবরই ভোগ্য কিংবা হাতের পুতুল। শ্বশুর যখন বলে ওঠেন—'তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই'; তখন বোঝা যায়, পুত্রকে বাঁচাতে পুত্রবধূকে বিক্রি করতে চাইছেন তিনি; কিংবা যখন কামুক দেওয়ান ছলে-বলে-কৌশলে পরস্ত্রী সুনাইকে ভোগ করার উদগ্র বাসনা পোষণ করেন; তখন বোঝা যায়, তাঁর আত্মহত্যার পিছনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো দায়ী। যদিও মুনমুন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সুনাইয়ের আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যে মাধব চরিত্র কিছুটা ম্লান হলেও তাকে সুনাইয়ের পরিণতির জন্য দায়ী করা যায় না কোনওভাবেই'[১৫]। কিন্তু, মুক্তি পাওয়ার পর মাধবের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই; নির্লিপ্ত মাধব নিশ্চিন্তভাবেই 'ভাওয়ালিয়া' করে স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন! তখন ওই নির্বিকারতা পুরুষতান্ত্রিকতা-পুষ্ট 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' সম্ভাবনাটিকেই নির্দেশ করে।

দেবব্রত দাস বলতে চেয়েছেন, সমাজ নির্ধারিত Super Ego দ্বারা পরিচালিত সুনাই আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে Sublimation-এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন[১৬]; কিন্তু Sublimation সমাজের কোনো কল্যাণকর দিককে নির্দেশ করে। ফ্রয়েডের 'অবদমন-প্রসঙ্গে' বনানী ঘোষ বলেছেন,

> "চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি মূল্যবান বিষয়গুলো সৃষ্টির প্রেরণা আসে যার মাধ্যমে সেই বৃত্তিজাত

> শক্তির কল্যাণসাধন করে। যে প্রক্রিয়ার ফলে অসামাজিক বৃত্তিগুলো সামাজিক কল্যাণকর রূপ ধরে প্রকাশ পায়, তাকে উদ্‌গতি (sublimation) বলা হয়। এর ফলে আক্রমবৃত্তি চিকিৎসককে অস্ত্রোপ্রচারের পথে নিয়ে যায়, ব্যক্তিকে গান-বাজনায় লিপ্ত করে, ধুলো-ময়লা ঘাঁটার প্রবৃত্তি উদ্‌গত হয়ে চিত্রকলার রূপ নেয়। একে সফল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাও বলা হয়।"[১৭]

সুনাইয়ের মৃত্যু স্বামী বা শ্বশুরের পক্ষে কল্যাণকর হলেও বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে কি আদৌ মঙ্গলসাধক? একজনকে বাঁচাতে অন্যের আত্মহত্যা কি কাঙ্ক্ষিত? পুরুষতান্ত্রিকতার অভিশাপে কিংবা ভালোবাসার টানে নারী আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন, তাকে 'বৃত্তিজাত শক্তির সৃষ্টিশীল প্রেরণা' বলা যায় না। তাই সমাজ-নির্দেশিত Super Ego দ্বারা পরিচালিত হলেও এই আত্মহত্যাকে Sublimation নয়। বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিচ্ছিন্ন কোণঠাসা নারীর 'Egoistic Suicide' বলা যায়।
'কঙ্ক ও লীলা' পালায় এক ধরনের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আছে, যা কোনো বাহ্যিক বস্তু-উপাদান বা পরিবেশ (যেমন—বিষ, দড়ি, আগুন, জল ইত্যাদি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কোনো রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, কিন্তু তিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করাচ্ছেন না; অর্থাৎ মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষমান। এটিও একপ্রকার আত্মহত্যা। লীলা মাধবের থেকে জনরবে ভেসে আসা জলে ডুবে কঙ্কের মৃত্যু ঘটেছে—এই সংবাদ পেয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মহনন করেন। স্বার্থক্লিন্ন সমাজের সবরকম প্রতিকূলতার মাঝখানে যে বিরহকাতর লীলা কেবল কঙ্কের স্বপ্ন দেখেই বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছিলেন; সেই লীলাই কঙ্কের মৃত্যুসংবাদের আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে পরলোকে কঙ্কের সঙ্গে মিলনের পথ খুঁজে নিতে চেয়েছেন—'বাচিয়া নাহিক কঙ্ক রইব কোন আশে।/যে দেশে গিয়াছ বন্ধু যাইব সেই দেশে।'[১৮] যে বিধবারা সমাজের চোখ রাঙানিতে নয়, নিজের ইচ্ছায় স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত টানে সহমরণে যেতেন; যেমন—'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রমিলা স্বামী ছাড়া নিজের অস্তিত্বই খুঁজে না পেয়ে সহমরণে যান; ঠিক তেমনভাবেই লীলা স্বামীর মতোই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। আত্মহত্যাটিকে Altruistic Suicide বলা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের থাবা, পিতার প্রতি অবিশ্বাস, গৃহপালিত প্রিয় গাভী সুরভীর মৃত্যু, জনশ্রুতিতে ভেসে আসা কঙ্কের অপমৃত্যুর করুণ সংবাদ—একাকী লীলা আত্মহত্যার পথ নির্বাচনে বাধ্য হন। অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয়,

> "একজন আত্মহত্যা করলে তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে যত কষ্ট পায়, অন্যকোনো কারণে মৃত্যু হলে এসব অনুভূতি তত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একটি পরিবারে এক জনের আত্মহত্যার পর যারা বেঁচে থাকে

তারাও মৃত্যুর কোলে সহজে ঢলে পড়ে। প্রিয়জনের আত্মহত্যার পর জীবিতদের মধ্যে একই বৎসরে মৃত্যুর হার বেশি থাকে।”[১৯]

যেহেতু কঙ্ক আত্মঘাতী হয়েছে বলে ধরেই নিয়েছেন লীলা, ফলে আত্মহত্যার বাসনা তাঁর নিজেরও প্রকট হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী অবসাদে ভুগতে ভুগতে ডিপ্রেশনে থেকে (যে-কারণে আহার, নিদ্রার ইচ্ছাও চলে গেছে) তিলে তিলে মৃত্যুযাতনা আস্বাদন করতে করতে মারা যান।

গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বংশগতি ও জিনগত প্রভাব ধনাত্মক। লীলাও হয়তো জিনগত সূত্রে পিতার থেকেই ওই আত্মহত্যা-প্রবণ মানসিকতা লাভ করেছিলেন। একদিকে ব্রাহ্মণ সমাজের চাপ, অন্যদিকে জ্ঞাতিদের ইন্ধন, কঙ্ককে হত্যা করতে গিয়ে পোষ্য তথা গো-হত্যার গ্লানি, কন্যাকে হত্যার বাসনা, কন্যার নামে ছড়িয়ে পড়া কলঙ্ক ইত্যাদি নানা মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে যখন দৈববাণী শুনে সত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করেন; তখন লজ্জায়, অপরাধবোধে মনে মনে আত্মহত্যার ইচ্ছে পোষণ করেন গর্গ। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গর্গের এই মানসিক অবস্থাটির গদ্যানুবাদ করেছেন—

“গর্গ তখন বিলাপ করে বলতে থাকেন, ‘না জেনে-শুনে আমি যে কাজ করলাম, তাতে শাস্ত্রধর্ম আমাকে ছলনা করল। ইহকাল পরকাল জুড়ে সর্ব ধর্মচর্চাই আমার পণ্ডশ্রম হল। নিজের পায়ে আমি কুড়ুল মারলাম। সরলা, সুশীলা কন্যা আমার, কোনো পাপ যে জানে না, তার প্রাণে আমি কাটারি দিয়ে আঘাত করলাম। তাকে মারার অভিসন্ধি করেছি। এ পাপের কথা মুখে বলা যায় না। আর দেবতার মতো যার সরল মন সেই পুত্রকে মারার জন্য ভাতে বিষ দিলাম। আশ্রমে যে গোহত্যা হল তার কারণ তো আমি। আজ আগুনে আত্মবিসর্জন করব।”[২০]

‘দেওয়ানা মদিনা’ পালায় দুলাল দেওয়ানি লাভের আহ্বানে মদিনার প্রণয়কে হেলায় তুচ্ছ করে প্রাক্তন প্রণয়ী মদিনাকে তালাকনামা দিয়ে আসেন। মদিনা ভেবেছিলেন, এই তালাকনামা পরিহাস মাত্র। দীর্ঘ অপেক্ষান্তে মদিনা তাঁর ভাই ও শিশুপুত্রের থেকে স্বামীর দ্বিতীয়-বিবাহের কথা জানতে পেরে নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখে উপস্থিত হন। ক্ষোভাভিমানে, প্রবঞ্চনার ঘেরাটোপ থেকে পালিয়ে বাঁচাতে অতীতের নানা রঙের দিনগুলি স্মৃতিপটে হাতড়াতে থাকেন তিনি। হঠাৎ প্রাপ্ত এই আঘাত তাঁকে সিজোফ্রেনিয়া রোগীর মতো অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। উক্ত রোগের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে তা আচরণে—

কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির দুঃখে দিন যায়।/খানাপিনা ছাড়া কেবল করে 'হায় হায়।।
তারপরে না চিন্তায় শেষে হইল পাগল।/যাইনা মুখে লয় তাই সে বকছে কেবল।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দেয় গালি।/ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার (দেয়) ক্ষণ করতালি।
খাওন বেগর আর এই না আবেস্তার।/সোনার অঙ্গ মৈলান হইয়া হাড়েতে মিশায়।।
দিনে দিনে সর্ব্ব অঙ্গ হইল যে শেষ।/কালি কেশরতা মুখ অইল বিশেষ।
তারপর না একদিন সগল চিষ্টা রইয়া।/বেস্তের হুরী না গেল বেস্তেতে চলিয়া।।[২১]

অসংলগ্ন আচরণ, খাওয়ায় অনিচ্ছা, বিভ্রম, অলীক কথন, নোংরা পোশাক পরিধান ইত্যাদি সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলি প্রকট হতে থাকে। আর সমীক্ষায় দেখা গেছে, সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের আত্মহত্যা প্রবণতা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এভাবেই আহার-নিদ্রা প্রত্যাখ্যান করে আত্মহত্যার আশ্রয় নেয় মদিনা।

সূত্রনির্দেশ:

১. Grimshaw, William, 1848, An Etymological Dictionary of English Language, Grigg, Elliot & Co., Page247
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম, জুলাই ২০১৯, এখনও অনেক আছে বাকি, 'কিছু শব্দ, কয়েকটি মিথ', পরম্পরা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ.২১
৩. চক্রবর্তী অরিন্দম, ডিসেম্বর ২০২১, ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, পৃ.৭৮
৪. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৯৩, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.৩৯
৫. মণ্ডল, সন্দীপকুমার (সম্পা.), ১০ মে ২০১৯, মৈমনসিংহ-গীতিকা:বাঙালির গান বঙ্গের আখ্যান, 'মহুয়া গাথাকাব্য এবং আজকের নারীবাদী আন্দোলন, আনোয়ারুল করীম, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ.২৮৯
৬. চক্রবর্তী, অরিন্দম, ডিসেম্বর ২০২১, ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, পৃ.৯২-৯৪

৭. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৯৩, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.৯৯

৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর, মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পাদিত) ২০১৯, ময়মনসিংহ-গীতিকা, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, পৃ.XVI

৯. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৬২, বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথমখণ্ড:আলোচনা, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.৪১২

১০. ময়মনসিংহ গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, সৈয়দ আজিজুল হক, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ১২০

১১. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৯৩, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ২৩৫

১২. Colman, Andrew M., 2003, Oxford Dictionary of Psychology, Oxford University press, Oxford, P.158

১৩. চক্রবর্তী, কুমার, এপ্রিল ২০২২, অস্তিত্ব ও আত্মহত্যা, তবুও প্রয়াস, কলকাতা, তবুও প্রয়াস সংস্করণ, পৃ.৭১

১৪. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৯৩, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.১৯০

১৫. চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন, জুলাই ২০২১, মৈমনসিংহ-গীতিকা:পুনর্বিচার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, পৃ.৫৬

১৬. মণ্ডল সন্দীপকুমার (সম্পা), ২০১৯, মৈমনসিংহ-গীতিকা:বাঙালির গান বঙ্গের আখ্যান, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ.১৯১

১৭. মিশ্র, পুষ্পা (সম্পা), আগস্ট ২০১৮, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এবং মুশায়রা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃ.১০৮

১৮. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৯৩, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.৩০৭

১৯. সরকার, নিহাররঞ্জন, সরকার, তনুজা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান:মানসিক ব্যাধের লক্ষণ কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ পৃ.৩৮৬

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, মৈমনসিংহ গীতিকার কথামালা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ.৮৮

২১. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৯৩, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.৩৮১

বি. আর. আম্বেদকর ও দলিত আন্দোলন : ফিরে দেখা

দীপক হাজরা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সারাংশ : একবিংশ শতকেও দলিত সম্প্রদায় মানুষের উপর শারীরিক ও মানুষিক অত্যাচার বর্তমান। একেই বলে জাতের নামে বজ্জাতি । এর যে কোথায় শেষ ,তা বোধ হয় সভ্য সমাজের কাছে উত্তর নেই । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য দিন ঘটে চলা দলিত সমাজের উপর অত্যাচারের কাহিনীই আজ আমাকে এই লেখা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে । এখন প্রশ্ন হল দলিত কারা ? সভ্যতার বিকাশের সহিত এদের স্থান কোথায় ? ভারতমাতার বীর সন্তান বি. আর. আম্বেদকরই বা কে ছিলেন? বা কেনই তিনি দলিত সম্প্রদায়- মানুষের ত্রাতা হয়ে উঠলেন ? এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সব কিছুর জানার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ : দলিত, আম্বেদকর, অত্যাচার, সম্প্রদায়

‘যে স্বরাজে অবদমিত শ্রেণির মানুষের
মৌলিক অধিকার গুলি সুনিশ্চিত নয় ,তাঁদের
কাছে তা স্বরাজ হবে না । তাঁদের কাছে তা
হবে নয়া দাসত্ব ।’

- ডঃ; বি. আর. আম্বেদকর

আজকের এই লেখাটি লিখতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বর্তমান ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য দিন ঘটে চলা দলিত সমাজের উপর অত্যাচারের কাহিনী। ফল স্বরূপ তৈরী হচ্ছে দলিত রাজনীতি, যা ভোটের রাজনীতির বড় খোরাক। ভোটের রাজনীতির তাগিতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও , নানা ভাবে আম্বেদকরকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমার আলোচনার বিষয় বি. আর. আম্বেদকর ও দলিত আন্দোলন।এটি আলোকপাত করার আগে আমাদের জানতে হবে ,দলিত কারা ? কি তাদের পরিচয় ?[i]

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ কাল থেকেই ভারতের জাতি বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে। আর্য সভ্যতায় দেখা যায় ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য – এই তিন জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকত শূদ্র সম্প্রদায়। পরবর্তী কালে ভারতীয় সমাজে অনেক অস্পৃশ্য জাতির উদ্ভব ঘটে। বৈদিক যুগের জাতি বৈষম্য ও পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের লাঞ্ছিত ঘটনা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দিয়ে উপনিবেশিক ভারত ও বর্তমান ভারতেও প্রবেশ করেছে। ব্রিটিশ শাসন কালে এই শোষিত ,নির্যাতিত ,পশ্চাদপদ সম্প্রদায় এক কথায় দলিত নামে পরিচিত। দলিতরা নানা দিক থেকে উচ্চ বর্ণের

শোষণ ,অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।ব্রিটিশ ভারতে ব্রাহ্মণরা নিজেদের ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃত ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু দলিত শ্রেণীর মানুষ ইংরেজি বা সংস্কৃত ভাষা জানত না। তারা নিজেদের কথ্য ভাষা ব্যবহার করত।কিন্তু ব্রাহ্মণরা দলিত শ্রেণীর এই কথ্য ভাষা কে খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখত। মনে রাখতে হবে জাতীয় কংগ্রেসে উচ্চ বর্ণের নেতাদের প্রাধান্য থাকায় দলিতদের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন ছিল ।ফলে দলিতদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। এখন প্রশ্ন হল আম্বেদকর কেন দলিত আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠলেন।

ডঃ আম্বেদকর নিজে ছিলেন দলিত মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিচু বংশ জাত ব্যক্তি। বিংশ শতকে ছুৎ মার্গতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যেখানে নিম্ন জাত মানুষের অসম্মান , অপমান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব। মহারাষ্ট্র তথা ভারতের অনেক জায়গায় দেখা গেছে নিম্ন বর্ণের অচ্ছুৎ শ্রেণীর মানুষদের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা ছিল, উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একই কঁুয়োতে জল তোলা তাদের নিষেধ ছিল , স্কুলে দলিত শ্রেণীর বাচ্চাদের পড়াশুনা করার অধিকার ছিল না । তাদের বসবাসের জায়গা নির্বাচিত ছিল শহরের বা গ্রামের শেষ প্রান্তে বস্তি সংলগ্ন স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় । ডঃ আম্বেদকরকে এই দৃষ্টান্ত শঙ্কিত করেছিল।তিনি বুঝেছিলেন এটি মানবতার উপর অভিশাপ । এই গুলি দূর করতে ১৯২৭ সালে দলিতদের নিয়ে মহারাষ্ট্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। একই বছর মনু স্মৃতিগ্রন্থটি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করেন।

আম্বেদকরের লক্ষ্য ছিল শিক্ষা, কর্ম সংস্থান ,ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ই দলিত দের অধিকার সুনিশ্চিত করা। ক্রমে দলিতদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আম্বেদকর তাদের স্বার্থ রক্ষায় সোচ্চার হন। তিনি ১৯৩০-৩৩ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণীর জন্য আইন সভায় আসন সংরক্ষণের জন্য দাবী জানালেন।ফল স্বরূপ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাগডোলান্ড ' সাম্প্রদায়িক্ বাঁটোয়ারা' মধ্য দিয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করে নেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং গোঁড়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে অন্তিম মুহুর্ত পর্যন্ত জেহাদ চালিয়ে ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার প্রায় ২০ বছর পর উচ্চ হিন্দুদের দলিত সম্পর্কে ধারণা কি রকম ছিল তার একটা প্রকাশ পায় নিচের ঘটনার মধ্যে দিয়ে - ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গবাদের মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বালা সাহেব আম্বেদকরের নামাঙ্কিত করার বিরুদ্ধে শিবসেনা ব্যাপক প্রতিরোধ গড়েছিল। শিবসেনা প্রধান বাল কেশব ঠ্যাকরে কুখ্যাত স্লোগান তুললেন – **'ঘরত নাহি পীঠ্ মাগতায় বিদ্যাপীঠ'**– খাবার রুটি টুকু ও নেই ,তারা আবার বিশ্ববিদ্যালয় চাই। বলা বাহুল্য ঔরঙ্গবাদের ডিগ্রি কলেজ ,মিলিন্দ কলেজ চালু করেন কিন্তু আম্বেদকর। যাই হোক সেই রাজনৈতিক কাজিয়ার ফলে জাত -পাত নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরী হয়, চলেছিল সাতষট্টি দিন । তিনটি জেলায়

প্রায় ১২০০ গ্রাম তার কবলে পড়ে , উনিশ জন দলিতকে হত্যা করা হয়। দলিত নারীরা নিগৃহীত ও ধর্ষিত হন। সেই সময়ে বহু দলিতের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।(রিডলস -ইন – হিন্দুইজম)

আম্বেদকর যখন 'ডিপেস্ড ক্লাসের ' জন্য ;সেপারেট ইলেক্টোরেট ' এর জন্য দাবী জানালেন গান্ধী এর প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশনে বসলেন। কারণ হিসাবে বলা যায় ;সেপারেট ইলেক্টোরেট হলে গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমানদের মত একটা আলাদা জাতি, আলদা নেশনের রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরী হবে। সেই রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকেই কিন্তু জাতিত্ব ,নেশনহুড তৈরী হয়। গান্ধীজী প্রথম থেকেই ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি কখন ও অনুন্নত হিন্দু অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের দাবী স্বীকার করেন নি । তবে তাদের আশু সমাধানের জন্য হয়তো তিনি ভেবে ছিলেন সংরক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। আম্বেদকরের চিন্তা , দর্শন ,ভাবনা কোথাও গান্ধীর সঙ্গে পার্থক্য ছিল ই কারণ জন্ম সূত্রে দুইজন ছিলেন বিপরীত হিন্দু জাতির প্রতিভূ। স্বভাবতই তাৎক্ষনিক দৃষ্টি ভঙ্গির একটা পার্থক্য থেকেই যায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজী ,নেহেরু ,সুভাষ চন্দ্র বসু , প্রমুখ ব্যক্তিকে যে ভাবে পাই আম্বেদকরকে সেই ভাবে ধরা সম্ভব নয়। ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর জোড়ালো উত্থান '৪৭' -এর পর থেকে । আম্বেদকর এসেছেন একমাত্র সংবিধান তৈরির ক্ষেত্রে। তার আগে পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান সমালোচক ছিলেন। প্রথম যখন পাকিস্থান রেজোলিউশন হয় ,তার উপর তিনি যে বই লিখেছিলেন তা হল – 'Pakistan or partition of India' । এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন হিন্দু মুসলিম বিরোধে কোন পক্ষেই তিনি নেই । কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন – আমি হিন্দু ও নই , মুসলিম ও নই। তিনি মনে করেছিলেন ভারতবর্ষের এখন যা অবস্থা তাতে দেশভাগ হলেই দু -পক্ষের মঙ্গল। ফলতঃ কখনই কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার চিন্তা ভাবনা মেলে না। আম্বেদকর সেই অর্থে জাতীয় রাজনীতির মূল ধারাতে আসছেন স্বাধীনতার পর। তিনি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে বাংলা থেকে নির্বাচিত হলেন। এবং তারপর তিনি কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটিতে গেলেন, এবং পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় আইন মন্ত্রী হলেন। তবে আম্বেদকরের ঐতিহাসিক অবদান অবশ্যই সংবিধান রচনা ।তবে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ ছিল উচ্চ বংশীয় সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট যা বারবার আম্বেদকর সমালোচনা করে এসেছেন। শুধু সমালোচনাই নয় প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন,কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়েছেন। সুতরাং আম্বেদকরকে এখন যে স্বীকৃতিটা দেওয়া হচ্ছে ,তার একটা কারণ হয়তো সংগঠিত দলিল আন্দোলনের এই যে সর্বভারতীয় চেহারা এবং তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ।

ডঃ আম্বেদকর শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।এ নিয়ে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী , ঐতিহাসিক নানা ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তবে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠোদ্ধার করে

মনে হয় ।তার একটি কারণ হল ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দু নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক,অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বৈষম্য তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এই বৈষম্য সমাজ আম্বেদকর কখনই চাননি। আবার অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোন ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী না থাকায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কারণ। বৌদ্ধধর্ম ও তার আচার কি হবে ,তা নিয়ে তিনি ‘ **দ্য বুদ্ধ এন্ড হিজ ধম্মা** ‘একটা বইও লিখেছিলেন। সেই ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য নীতি কি হবে ,সে গুলি প্রায় তিনি নিজেই সৃষ্টি করলেন।

বি. আর.আম্বেদকর তাঁর যে সব কাজ জীবদ্দশায় প্রকাশ করে যেতে পারেন নি ,তাদের একটি হল ‘রিডলস -ইন – হিন্দুইজম’। হিন্দু কোড বিল নিয়ে অচলাবস্থা তৈরী হবার পরে **১৯৫১** সালে সেপ্টেম্বরে আম্বেদকর নেহেরু মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন। দিল্লীতে তার শেষ বছর গুলি কাটে ২৬, আলিপুর রোডের একটি বাংলোতে। এটি তিনি সিরোহীর প্রাক্তন রাজার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন।তাঁর সঙ্গে থাকত স্ত্রী সবিতা আম্বেদকর। মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগের পর আম্বেদকরের না থাকল সচিবালয় ,না থাকল কোন সহকারী । এই সময় তিনি নানক চাঁদ রত্তুকে অনুরোধ করেন সচিবের কাজকর্ম সাহায্যের জন্য। সেই মত রত্তু নিজ কাজ শেষ করে প্রতি সন্ধ্যায় আম্বেদকরের বাড়ি আসতেন ও মাঝ রাত পর্যন্ত কাজ করতেন । মূলত এই সময় তিনি আম্বেদকরের চিঠি পত্র ও বিভিন্ন প্রবন্ধ টাইপ করতেন (১৯৫১-৫৬)। আম্বেদকর শুধু দলিত নেতা ছিলেন না , তিনি ছিলেন একজন Organic Intellectual ব্যক্তিত্ব। তিনি দেশের কৃষক , শ্রমিক শ্রেণির এবং নারী সমস্যা নিয়ে ও সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর হিন্দু কোড বিল নারী স্বাধীনতার নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সর্ব হারা মানুষের কথা বলেছেন ।কিন্তু বর্তমানে মূলত রাজনৈতিক কারণে অনেকে তাকে সমাদার করছেন ও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীরমধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখছেন। এখন তাঁর পরিচিতি দলিত নেতা কিংবা সংবিধান জনক ইত্যাদি । সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের অধিকারের লড়াই দেশের সামাজিক কাঠামোর নিরিখে কতটা বৈষম্য মূলক তা আম্বেদকর গভীর ভাবে অনুভব করতেন । সেই জন্যই যঁারা সাম্যের অধিকারের জন্য লড়ছেন তাঁদের সমর্থনে তিনি একটা পাকাপোক্ত আইনি কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিলেন । তিনি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের আশা- আকাঙ্খা পূরণের একটা ব্যবস্থা সংবিধানের মধ্যে অন্তভুক্ত করেছিলেন । আইনি ব্যবস্থায় তাদের অধিকারের স্বীকৃতি টুকুই নয়, তাঁদের লড়াই যাতে সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্য থেকেই লড়া যায় সেটাই সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন ।

বর্তমান ভারতে এখন অনেকের মুখে বলতে শোনা যায় দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন দরকার ।তারা আরো বলেন ,আম্বেদকরই চেয়েছিলেন যে ,নির্দিষ্ট সময় সীমার পর সংরক্ষণ থাকবে না । কিন্তু বলা বাহুল্য যে বা যঁারাএই ধরণের বক্তব্য পেশ করেন তাদের জানা দরকার আম্বেদকর সংরক্ষণের বিলোপ সাধন

চেয়েছিলেন এটি সম্পূর্ণ ভুল। আম্বেদকর রাজনৈতিক সংরক্ষণ নিয়ে বলেছিলেন যে প্রতি দশ বছর অন্তর সংসদ বা বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের বিষয়টি রিভিউ করা হবে । কিন্তু চাকরী বা শিক্ষাতে সংরক্ষণ নিয়ে এমন কিছু ই বলেন নি । কোন সময় সীমা ধার্য করেন নি। তিনি জোড়ের সহিত বলেছিলেন যে , যতক্ষণ না সামাজিক কাঠামো অসাম্য দূর করে , ততক্ষণ সংরক্ষণ থাকবে।

আম্বেদকরের জীবনে দুটি বড় কার্য মনে হয় –১। সংবিধান -যার উপর আমি, আপনি সবাই দাঁড়িয়ে আছি । ২। হিন্দু কোড বিল। আম্বেদকর অবশ্য এই বিল পাস করিয়ে যেতে পারেন নি , রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাধা দিয়েছিলেন । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একবছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হয়।এর ফলে দেশ এগিয়ে গেল। এই বিলের জন্য অবশ্যই আম্বেদকরের ধন্যবাদ প্রাপ্য । ফলে প্রমাণিত হল তিনি অস্পৃশ্যদের নেতা নন, সমস্ত ভারতের নেতা। আম্বেদকরের পরবর্তি ভারতে সে অর্থে কোন ও দলিত নেতা সর্বভারতীয় রজনীতিতে কেন উঠে এলেন না ,সেটি অবশ্যই গবেষণার বিষয়। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে যারা জনপ্রিয় ,তারা কিন্তু কোন অবস্থাতেই বালা সাহেবের ছায়া ও নন। ভোটের প্রয়োজনে সব রাজনৈতিক দল বাবাসাহেবকে মালা দেন , কিন্তু তাঁর সাম্যবাদী সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কেউ আগ্রহী নন। তবু যত দিন যাচ্ছে বাবাসাহেবের ছায়া ততই উজ্জ্বল হচ্ছে ।ভারতের সর্বত্র আওয়াজ উঠছে -‘ জয় ভীম । ’

তথ্যসূচী :

২। সুমিত সরকার - আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭) -(কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি)

৩। সৈয়দ কওসার জামাল ,–বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা ,শান্তনু পালিধ (অনুবাদক) সম্ভার (বাংলা সংস্করণ ,পঞ্চদশ খন্ড)

৪। এই সময় (পত্রিকা) - ১৪ ই আগস্ট ২০১৬

৫। B. R. Ambedkar - What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchabl Bombay : Tracker & Co.Ltd

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর - পলাশী থেকে পার্টিসান (ওরিয়েন্ট বুক সোয়ান , পৃষ্ঠা-৪১৫)

২। পত্রিকা- (এই সময়) - ১৪ ই আগস্ট ২০১৬

৩। তদেব – (পৃষ্ঠা-৭)

৪। তদেব – (পৃষ্ঠা-১)

৫। পত্রিকা - (এই সময়) - ১৪ ই আগস্ট ২০১৬ , (পৃষ্ঠা-৬)

৬। তদেব (পৃষ্ঠা-৭)

৭। তদেব (পৃষ্ঠা-৭)

৮। তদেব (পৃষ্ঠা-১)
৯। তদেব (পৃষ্ঠা-৪)
১০। তদেব (পৃষ্ঠা-৪)
১১। তদেব (পৃষ্ঠা-৫)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিটেমাটি' : এক প্রাণের স্পন্দন

প্রবীর দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনে একটি মাত্র নাটক লিখেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনটাই এক বৈচিত্রময় নাট্যশালা যেখানে একের পর এক ঘটনা এসে অন্তিম দৃশ্যে যবনিকা টেনেছে। মানিক একজন প্রথাগত লেখক তবুও তাঁর প্রথার বাইরে বেরিয়ে মাতৃভুমি, দেশের জন্যে অন্তরের যে মমত্ব বোধ তারই এক প্রয়াস 'ভিটেমাটি' নামাঙ্কিত নাটকটি। মানিকের লেখনিতে ধরা পরেছে গ্রাম্য জীবনের এক বাস্তব চিত্র, গ্রাম্য সংস্কার, রীতি-নীতি। নাটকটির মধ্যেও রয়েছে মাতৃভূমির প্রতি স্নেহের নাড়ির টান। এই নাড়ির বাঁধনকে ছিন্ন করতে বহু ছেদনকারী অশুভ শক্তি আঘাত হেনেছে বার বার, আর এই অশুভ কালিমাকে কাটিয়ে মানুষ কীভাবে তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তারই এক রেখাঙ্কিত এই নাটক। নাটকটি যেন প্রত্যেক মানুষেরই প্রানের এক সূক্ষ্ম স্পন্দন।
সূচক শব্দ : গ্রাম্য পরিবেশ, ঐক্যবধ্যতার সুর, মাতৃভূমি, আন্দোলন, বিবেক, কালোবাজারি।

মূল প্রবন্ধ :
বিশ্বের বিস্ময় এই বাংলা সাহিত্য বাসরে অন্তত দশটি পূর্ণ সিংহাসন স্থাপন করা যায় তবে তাঁর একটিতে মানিক বাবু বসবেন। তাঁর আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু সাহিত্য জগতে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই পরিচিত। অধিকাংশ পাঠকেই তাঁর আসল নাম অজ্ঞাত। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ জৈষ্ঠ ১৯০৮ সালের ১৯ মে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে মানিকের জন্ম। পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম পত্রে নাম ছিল অধরচন্দ্র কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সূত্রে জানতে পারা যায় গায়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখে আঁতুড়েই তাঁর ডাকনাম হয় মানিক। বন্ধুদের সঙ্গে বাজিরেখে 'বিচিত্রি'য় প্রথম গল্প পাঠানোর সময় লেখক হিসেবে নিজের ডাকনাম ব্যবহার করে ছিলেন তিনি। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় পৈতৃক নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অর্ন্তগত মালপদিয়া গ্রামে। কলকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে মৃত্যু ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে। এই ৪৮ বছর জীবৎকালে মাত্র ২৮ বৎসর সাহিত্য চর্চার মধ্যে আমাদের উপহার দিয়েছেন ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০টি ছোটগল্প, প্রায় দেড়শোটি কবিতা ও একটি নাটক। তাঁর গদ্যের ভাষা কিছুটা রাবীন্দ্রিক হলেও সম্পূর্ন নিজস্ব ঘরনার।

আমরা ঔপন্যাসিক মানিক, গল্পকার মানিকেই চিনি কিন্তু চিনি না নাট্যকার মানিককে। জীবনটাই তাঁর নাটক, ঘটনার পর ঘটনা এসে তাকে পরিনতির দিকে নিয়ে গেছে আর এসবের মাঝেই লিখেছেন একটি মাত্র নাটক 'ভিটেমাটি'। তিনি আর নাটক রচনায় তেমন ভাবে অগ্রসর হননি। আমরা অনেকেই জানতাম না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাটকটির কথা। নাটকটি লেখা হয় ১৯৪৩ সালে। এটিকে মানিক নাটিকা বলেছেন। স্ট্যান্ডার্ড পাবিলাশার্স (৩৫/৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা- ৭০০০২৫) এর পক্ষ থেকে সত্যবন্ধু ভট্টাচার্য এই নাটকটি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে বৈশাখে (১৯৪৬ সালে) প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ নাটক রচনার তিন বছর পর। সিদ্ধিনাথ সান্যালের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শচীন দত্ত। নাট্যগ্রন্থটির দাম ছিল দের টাকা (১.৫০ টাকা)। কিন্তু নাটকটিকে স্বাধীনতার পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অধ্যক্ষ স্বপন মজুমদারের প্রচেষ্টায় দুস্প্রাপ্য এই নাটকের একটি কপি সংগৃহিত হয়। এরপর 'বহুরুপী' পত্রিকার ৩৯তম সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৭২) পুণর্মুদ্রিত হয়।

ভারতীয় গননাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', বিশেষত ১৯৪৩ সালে 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় বিশেষ সারা জাগিয়ে ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় গননাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা-নাট্যকর্মী, কলাকুশলীকে প্রত্যক্ষ করে ছিলেন এবং গ্রামীণ লোকায়ত পটভূমিতে রচিত 'নবান্ন' নাটকের কাহিনিও তাকে সমভাবেই আকৃষ্ট করে ছিল। সমকালীন নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে মানিক অনেকটাই সজাগ ও সচেতন ছিলেন। এজন্যই হয়ত তিনি 'ভিটেমাটি' নামে একটি নাটক রচনা করেন। তবে আমাদের প্রশ্ন জাগে একটি নাটক রচনা করেই তিনি বিরত রইলেন কেন? আর কোন নাটক রচনায় অগ্রসর হননি কেন ? এর উত্তর সন্ধান করতে গেলে আমরা দেখব যে- নাটকে নাট্যকারের বাক্ স্বাধীনতা একটা গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, কেবলমাত্র কয়েকজন পাত্র-পাত্রীর মুখদিয়ে জীবনের ঘটনাগুলিকে পর পর বলে যাওয়া। সেখানে বিশ্রামের অবকাশনেই, কল্পনার রঙ নেই, নেই কোন মনখুলে কথাবলার পরিসর, আছে শুধু ফেলে আসা জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা। দারিদ্রের কষাঘাতে, সমাজের ব্যঙ্গাঘাতে মানিক ছিলেন ক্লান্ত, অবসন্ন। তাই তিনি চেয়ে ছিলেন একটু বিশ্রাম, একটু শান্তি, একটু মন খুলে কথা বলতে আর তিনি সেটা গল্প উপন্যাসে খুজে পেতেন। মানিক তাঁর জীবনকে কোন দিনই গন্ডীর মধ্যে ছকে বেঁধে রাখতে পারেননি। যার ফলে নাটকের চার দেওয়ালে বন্দী হয়ে থাকা মানিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মানিক ছিলেন পেশাদারি লেখক, নাটক বিক্রি কম, উপন্যাস বিক্রি বেশী, সাহিত্য রচনা যাঁদের একমাত্র জীবিকা তাদের পক্ষে সম্পাদক প্রকাশকের দাবি মেটাতেই হবে।

নাটকটি যখন মানিক লেখেন তখন তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সময়টা ১৯৪৩, গণনাট্য আন্দোলনের সূচনাকাল। তারই আগের বছর ১৯৪২এর ৯ই আগস্ট মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে 'ভারত ছাড়ো

আন্দোলন' বা 'আগস্ট আন্দোলন' ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধের কাছে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রাথমিক ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এই আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে পড়লেও ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে আরও বেশী সংখ্যক পুলিশ এনে মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তি অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী মানুষজনের উপর হঠাৎ আক্রমন চালায়। এই সূত্রে লুটপাঠ, নারীদের সন্মান লুন্ঠন, ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া পুরুষদের মেরে ফেলা নয়তো বন্দী করা- এই নৃশংস অত্যাচার কখনও দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে। সাধারন গ্রামবাসী এই আক্রমনে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফসল লুন্ঠনের ভয়, নারীর শ্লীলতা হানি, প্রাণনাশের ভয়ে গ্রামে কৃষক মজুর মধ্যবিত্ত এমনকি সামন্ততন্ত্রের উত্তরসূরীরাও পালিয়ে যেতে শুরু করল ভিটেমাটি ছেড়ে। এই প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র নাটক 'ভিটেমাটি' অবশ্য মানিক নাটকের মধ্যে সরাসরি কারা আক্রমনকারী সেটা বলেননি। ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে, সরাসরি বলা হয়তো অসুবিধা ছিল। নাট্যনিয়ন্ত্রন আইন (১৮৭৬) চালু ছিল এবং সরকার বিরোধী নাটক লেখা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে নাট্যকাহিনী বয়ন করেছেন। সরাসরি মানিক হয়তো তুলে ধরতে চাননি, তাই ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়েছেন।

নাটকটি যখন লেখা হয় তখন সোনার বাংলায় মন্বন্তরের (১৯৪৩) করাল ছায়া তেমন ভাবে ঘনিয়ে আসেনি তবে মন্বন্তরের পূর্ব সংকেত কিছুটা পাওয়া গেছে। আর এটা বুঝতে পেরেই গ্রাম্য মহাজন, আড়তদারেরা চাল, ডাল, তেল, চিনি অথাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাপক ভাবে মজুত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

'ভিটেমাটি' প্রকাশ পায় ১৯৪৬ সালে, সে সময়ে মানিকের দুটি উপন্যাস 'শহর বাসের ইতিকথা' ও 'চিন্তামণি', দুটি গল্পগ্রন্থ- 'আজ কাল পরশুর গল্প' ও 'পরিস্থিতি' প্রকাশ পায়। এই গল্প উপন্যাসগুলির মধ্যে মানিকের যে ভাবনা-চিন্তা তারই কিছু ফসল 'ভিটেমাটি'র মধ্যে পাই। গ্রামের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি মনের আকর্ষণ প্রথম থেকেই ছিল। গ্রামের খোলা হাওয়াতে তিনি থাকতে চেয়েছেন, তাই তাঁর লেখায় গ্রাম্য জীবনের চিত্র বেশী করে উঠে এসেছে।

ভিটেমাটির প্রতি মানুষের টান আজীবন এই মাটিতেই তাদের জন্ম, তাই চিরবাসনা থাকে এই মাটিতেই যেন তারা মরতে পারে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে মানুষকে ছাড়তে হয় তার ভিটেমাটি, আশ্রয় নিতে হয় পথে প্রান্তে, শহরের ফুটপাতে, অলিতে-গলিতে। আরও এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ঘটনায়। তারা ভিটেমাটির কথা ভেবে শুধু স্বপ্ন দেখে। মানিকের শিশুকাল থেকে গ্রাম্যজীবনের প্রতি নিবির প্রাণের সর্ম্পক ছিল। তাই 'ভিটেমাটি' নাটকে ছোটলালের মুখ দিয়ে মানিক তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন, 'ভিটেমাটির মায়া এদেশে সংস্কারের মত, মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। সহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়ীতে বাস,

বড়জোর একপুরুষের তৈরী বাড়ীতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।'[১]

'ভিটেমাটি' নাটকের মধ্যে একদিকে আছে ভিটেমাটির প্রতি মানুষের প্রাণের সর্ম্পক অপর দিকে আছে গণজাগরণের ইঙ্গিত। এই নাটকের নায়ক মধুই কখনও তার ভিটেমাটি বা মাতৃভূমি ছেড়ে যাবে না, সে কথা সে গায়ের সকলকে জানায়, 'আমি কথাও যেতে পারবনা। ঘরবাড়ী, গাইবাছুর জমিজমা ফেলে কথায় যাব? কি করে যাব?'[২] সে ভিটেমাটিকে নিজের প্রাণের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছে, মধু ভিটেমাটির জ্বালা অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে। ভিটেমাটির জন্য সে সব কিছু করতে পারে, প্রাণদিতে পারে তবু তার মায়া ত্যাগ করতে পারে না। মাতৃ স্নেহ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। সে পদ্মাকে বলে, 'তুই মেয়ে মানুষ, বাপের ঘরে বড় হয়ে সোয়ামীর ঘরে চলে যাস ঘরদোর জমিজমার দরদ তুই কি বুঝবি ? বেড়া থেকে একটা কঞ্চি কেউ খুলে নিয়ে নিলে টের পেয়ে যাই। ক্ষেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে। সব ফেলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে যাক, একা আমার ক্ষেত খামার ঘরবাড়ী গাইবাছুর আগলে গাঁইয়ের মাটি কামড়ে পরে থাকবো।'[৩] এই মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর সর্ম্পক, রক্ত জল করে এই সেদিন মহাজনের দেনা শোধ করেছে। তার ওপর বুড়ো বাপটা শুধু দুধ খেয়ে বেছে আছে লক্ষ্মীকে ফেলে বিদেশে পালালে খেতে না পেয়ে মরে যাবে, মাথা নেড়ে পরিষ্কার ভাবে পদ্মাকে মধু জানায়, আমার যাওয়ার উপায় নেই। এই অশিক্ষিত বলশালী মানুষটির কি অসাধারণ কর্তব্যবোধ। কোন অবস্থাতেই কোন লোভ, কোন স্বপ্ন, এমনকি প্রেমিকা পদ্মার জন্যও সে তার ভিটেমাটি ত্যাগ করল না। মধু ভাল রকম জানে যে বিপদের মোকাবিলা করার জন্য সৎসাহসে গ্রামে পড়ে থাকবে। দরকার হলে সে প্রাণ দিতে পারে। মাখন যখন তাকে শোনায়- শম্ভু মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে আজ, তুই যাবি না। তখন মধু স্পষ্ট জবাব দেয়, 'শম্ভুর মেয়ে চুলোয় গেলে মোকেও যেতে হবে?'[৪] গ্রামের সবকিছু মধুর জীবনে গাঁথা হয়ে গেছে, কোন বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছে তুচ্ছ। এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষটির মধ্যে আছে দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। শুধু নিজে বাঁচা নয় অপরকেউ বাঁচাতে সে চেষ্টা করে এইশিক্ষা তার জন্মগত। এ রকম লোকেরা কোনদিনই একশো টাকা আয় করে পাঁচশো টাকা ওজনের কথা বলতে পাড়ে না। এই মানুষ সব সময় আশার স্বপ্ন দেখে।

'ভিটেমাটি' নাটকের আরেকটি প্রধান চরিত্র ছোটলাল, ছোটলাল একজন শিক্ষিত যুবক। তার মধ্যেও একই রকম মাতৃত্বের প্রতি টান লক্ষ্য করা যায়। তার দাদা দাঙ্গার ভয়ে গ্রাম থেকে চলে যায়, কিন্তু ছোটলাল তার বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে থেকে যায়। গ্রামের সকলকে সে ভালোবাসে, সকলকে বোঝায় গ্রাম ছেড়ে চলে না যেতে। হিন্দু-মুসলমান পরিবার বেষ্টিত অনেক গুলি গ্রাম নিয়ে সে 'গ্রাম মৈত্রী সংঘ' গড়ে তোলেন। দাঙ্গার হাত থেকে গ্রামকে বাঁচানোর জন্য দিনে রাতে পাহারার বন্দোবস্ত

করেন। নিজে ঘুরে ঘুরে গ্রামের সকলকে পরামর্শ দেন। তার সঙ্গে থাকে রামঠাকুর, মধু, কাদের, আজিজ, সুভদ্রা। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। এই ছোটলালের মধ্য দিয়ে মানিকের ভিটেমাটির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছ, ছোটলাল যেন মানিক নিজেই। নাটকের পাঁচটি দৃশ্য জুরে ছোটলাল রয়েছেন এবং গ্রামের মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করেছেন। তাদেরকে দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই গ্রামের সকল মানুষ জনকে নিয়েই তার ভিটেমাটি। ছোটলাল গ্রামের সকল দরিদ্র মানুষ জনদের ভরাসা। কাদের ও আমিরুদ্দীন এর মুখে শুনতে পাড়ি, আপনিও পালাচ্ছেন শুনে মোরা ডরিয়ে গেছি। সুতরাং এই বাক্যে আমরা বুঝতে পাড়ি ছোটলালের ভরাসা সকলেই করে।

নাটকের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই ভিটেমাটির টান রয়েছে। সহজে কেউ ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে গেলেও মাতৃত্বের টানে তাদের আবার ফিরে আসতে হয়েছে। আমরা দেখি নাটকের প্রধান নারী চরিত্র পদ্মা শম্ভু দাসের মেয়ে। গ্রাম ছেড়ে পদ্মা চলে গেলেও বাড়িরটানে, মাতৃত্বের টানে রাতের অন্ধকারে পদ্মা পালিয়ে এসেছে, বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল। রামপ্রাণ ভট্টাচার্য বা রামঠাকুর ভিটেমাটিকে বাঁচানোর জন্য, গ্রামের সকলকে বাঁচানোর জন্য নিজের লোভ বির্সজন দিয়ে গ্রাম মৈত্রীয় সভায় যোগ দিয়েছেন। রামঠাকুরের বক্তব্য, 'না লিখে না লিখে লিখতেই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। কম্মো তো পুঁথি সামনে খুলে রেখে যা মুখে আসে বিড় বিড় করে বলা। অতবড় পন্ডিত পিতা যে স্কুলে আর বাড়ীতে পড়িয়ে বিদ্যা দিয়ে ছিলেন, এতদিন পর একটু কাজে লাগল।'[৫] নাটকের একটি সাধারণ চরিত্র কাদের সেও দাঙ্গার ভয়ে একদুজনকে চলে যেতে দেখে নিজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবুও যেত পাড়েনি, ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে চায়নি। তাই তার একটি মন্তব্য, 'তবে সত্য কথা বলি ছোটবাবু, অতসব হিসেব না করেও যেতে মন চায় না। রাতভোর ঘুমাইনি, ভোরে উঠে ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এত যত্নের নিড়ানো ক্ষেতে আগাছা ভরে যাবে ভাবতে গিয়ে মনটা হু হু করে উঠল। ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়ীটা যেন কাঁদছে। কিন্তু কি করি, সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে।'[৬] 'ভিটেমাটি' নাটকের অন্যতম প্রধান খলচরিত্র বা খলনায়ক জোতদার কালোবাজারী ব্যবসায়ী 'নকুড়'। সে সবসময় সাধারণ মানুষদের বিপদে ফেলে বা ছলচাতুরি করে নিজের আখের গোছাতে চাইছে, সে গ্রামের লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তেল, চাল, ডাল, কেরসিন কম দামে কিনে মজুত করে রেখেছে দুর্ভিক্ষের সময় দশগুণ দামে বাজারে বিক্রি করবে, কিন্তু ছোটবাবুর চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। সে সবসময় শম্ভুর মেয়ে পদ্মাকে কামনা করছে, পদ্মাকে ছিনিয়ে নিতে চায় আর এই কাজে যখন ব্যর্থ হয়ে রামঠাকুরের হাতে ধরা পরে এবং তাকে গ্রাম ছেড়ে পালানোর পরার্মশ দেন তখন নকুড়কে অনায়াসে বলতে শুনি, - কেন যাব ? আমার সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আমি যাব কেন ? কি করেছি আমি। এ উক্তির মধ্যেও আমরা ভিটেমাটির বন্ধন

অনুভব করি। আমরা লক্ষ্য করলাম গ্রামের প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে ভিটেমাটির প্রতি ভালোবাসা। চোর, ডাকাত, গুন্ডা বদমাশ, সে যা-ই হোক না কেন মাতৃত্বের প্রতি টান তার মধ্যে রয়েছে। যে যেখানেই থাকুক না কেন, ভিটেমাটির কথা তার মনে পড়বেই এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার একটা আবেগ তাদের মনে ফুটে উঠবে। 'ভিটেমাটি' নাটকের নায়ক মধু জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত ভিটেমাটি থেকে সরে আসেনি। মধু মাতৃত্ব বাঁচাতে প্রান দিয়েছে তবু ভিটেমাটির মান খোয়ায় নি।

নাট্য কাহিনীর বয়নের দিক থেকে মানিক সফল। পাঁচটি দৃশ্যে বিভাজিত নাট্য কাহিনীতে মানিক তাঁর বক্তব্য সোজাসুজি তুলে দরেছেন। কোথাও কোন জটিলতা নেই, উপকাহিনীর আশ্রয় নেই, একমুখী কাহিনী বহুচরিত্রের অবস্থান পুরোপুরি বজায় রেখে সমাপ্তিতে পৌছেছেন। গ্রাম ছেড়ে, ভিটেমাটি ছেড়ে মানুষ যখন পালাতে চাইছেন তখন নাট্যকার চমক সৃষ্টি করেছেন। যেখানে যেখানে গিয়ে তারা বাঁচবে, ভয় মুক্ত হবে সেখান থেকেও লোক ভয়ে পালিয়ে এসেছেন। সংলাপ সৃষ্টিতে মানিক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রে মুখে অজস্র কথা জুগিয়েছেন তিনি। নাট্যকার সর্বত্র সাবলীল কাহিনী বিন্যাস করেছেন।

মানিক ছিলেন মার্কসবাদে বিশ্বাসী, তাঁর লেখার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'অধিকার চাইলে অধিকার পাওয়া যাবে না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়।' তাঁর মনে বারং বার প্রশ্ন জেগেছে মানুষ কেন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, কেন স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী মানুষগুলি গরিবের রক্তের টাকায় সুখের স্বর্গে বাস করবে। দেশে প্রচুর খাদ্য শস্য থাকা সত্যেও সাধারণ দরিদ্র মানুষ কেন দু'মুঠো খেতে পাবেনা ? কেন মধুর মত সাধারণ মানুষেরা নকুড়ের মত জোতদার অসাধু ব্যবসায়ী ও রামঠাকুরের মত ব্রাহ্মণ পন্ডিতের কাছে ছোট হয়ে থাকবে ? মানিক তাই 'ভিটেমাটি' নাটকে ছোটলালের ভূমিকা নিয়ে নিজে নিজেই প্রশ্নের মীমাংসা করতে লাগলেন তিনি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে পরার্মশ করতে লাগলেন। সবাই সমান সর্বকাজে,সব ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার আছে এবং থাকবে। যে অধিকার নকুড়ের মত লোকেরা ছিনিয়ে নিয়েছে, সে সব ফিরিয়ে নিতে হবে। 'ভিটেমাটি' নাটকে আমরা অপর দিকে লক্ষ্য করি নারী জাগরণ। বিপদে আপদে একদিকে যেমন তারা পুরুষের কাজে সহায়তা করেছেন অপরদিকে নিজেরাও সমস্ত বাঁধা বিপত্তি, সংস্কার ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। ঘোমটা খুলে অস্ত্র ধরে দাড়িয়েছে শত্রুর সামনে। হয়তো সেদিন অনেক শৌখিন লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল। নাটকেও রয়েছে নারী জাগরণের জোয়ার সূবর্ণের উদ্দেশ্যে ছোটলালকে বলতে শুনি, চোখ কান বুজে থাকলে আর চলবে না সূর্বণ।

'ভিটেমাটি' নাটকটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়, এটি দাঙ্গার সময়ে লেখা। মানিক ঐ দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এই নাটকে পড়েছে। আর এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে রয়েছে দেশকে ভালোবাস, ভিটেমাটির প্রতি স্নেহের টান। আর এই স্নেহ ভালোবাসার জন্যেই অনেকে প্রাণ দিয়ে

ভিটেমাটির মান বাঁচিয়েছেন। ভিটেমাটি তাদেরকে নিজের বুকে আগলে রেখেছে সন্তান স্নেহে। তাদেরকে এই ভিটেমাটি থেকে কেউ কোন দিনই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

মানিক প্রথানুগ নাট্যকার নন। দ্বিতীয় কোন নাটক নিখেছেন বলে জানা যায়নি। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এই নাটকটি ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। নাটকটির মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকলেও রয়েছে বহুভালো দিক।

তথ্যসূত্র :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিটেমাটি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ৩৬/৮ পদ্মপুকুর রোড, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ- ৫৫-৫৬।
২. তদেব, পৃ- ৫।
৩. তদেব, পৃ- ৫-৬।
৪. তদেব, পৃ- ১৮।
৫. তদেব, পৃ- ৫৬।
৬. তদেব, পৃ- ২৪।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ঘনশ্যাম চৌধুরি (সম্পদনা), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্রতার সন্ধানে, দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৬, কলকাতা।
২. ড. জয়গোপাল মন্ডল, প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৬, কলকাতা।
৩. ড. শ্রী সাধন কুমার ভট্টাচার্য, নাট্য তত্ত্ব মীমাংসা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯১৬, কলকাতা।
৪. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা।
৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস, অনুষ্টুপ, চর্তুথ সংস্করণ মে ২০১৭, কলকাতা।

অরণ্য মানব

গৌতম চন্দ্র বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে বনভূমি। অরণ্যচারী মানুষেরা কখনো নির্বিচারে প্রাণ দিয়েছে বা সভ্যতার প্রান্তদেশে মিশে গেছে ক্রমশঃ। রাজধানী দিল্লী এক সময় পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, তৎপূর্বে ছিল খাণ্ডবপ্রস্থ নামক বন। এ অরণ্য সাতবার পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অরণ্যবাসীরা তা দমন করেছে বারবার। ফলে অরণ্যবাসীদের হত্যা না করলে বন পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না। খাণ্ডবদাহনে কারা লাভবান হয়েছিলেন? নগর পত্তন করেছিলেন কারা? কারাই বা একটি সমৃদ্ধ নগর তৈরীতে গাইতি শাবল চালিয়ে রাতারাতি সভা নির্মাণে সহায়তা করেছিল। ময়দানবকে কোন স্বার্থে বা শর্তে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল তা একেবারে অস্পষ্ট থাকে না। ময় হলেন দৈত্যদের বিশ্বকর্মা। এবং শুক্রাচার্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধিকারী।

এক পক্ষ কাল আগুন জ্বলল। প্রায় কেহই রক্ষা পেলেন না। প্রাণে বাঁচল কেবল ময় দানব, নাগ গোষ্ঠীর তক্ষকপুত্র অশ্বসেন এবং চারটি পক্ষী শাবক— ব্রাহ্মণের বীর্যে জন্ম যাদের। ময় দানবকে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু অর্জুনের শরণাপন্ন হওয়ায় প্রাণে রক্ষা পায়। প্রাণের বিনিময়ে ময় সভা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। খান্ডবদাহনে কৃষ্ণ পেয়েছেন সুদর্শন চক্র আর কৌমোদকী গদা। অর্জুন লাভ করেছেন গান্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ, কপিধ্বজ রথ এবং ভবিষ্যতে মহাদেবকে তুষ্ট করে অন্যান্য অস্ত্র সকল লাভ করার ইঙ্গিত। নিজেদের স্বার্থে পাণ্ডবেরা নির্বিচারে হত্যা করতে সিদ্ধ হস্ত। কুরু যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে দ্রোণাচার্যের প্রবল পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষের অবন্তী দেশীয় ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা হাতীকে মারলেন— অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ।

খাণ্ডবপ্রস্থে দাহ্য হলো এক অরণ্য প্রাণী। এবং অরণ্যচারী জনজাতিও। ময়দানব যত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন তার সঙ্গে আরো অনেক মানুষ না থাকলে রাতারাতি বিরাট একটি সভা নির্মাণ করা সম্ভব হত না। পরাজিত বন মানুষেরা হলেন প্রজা, রাজা হলেন যুধিষ্ঠির। অরণ্য যদি মানুষ বসবাসের অতই অযোগ্য ছিল, তাহলে বিশ্বকর্মার দোসর ভুবন বিখ্যাত স্থপতি শিল্পী প্রভূত রত্নমানিক্যের অধিকারী ময় দানব কি করছিলেন সেখানে। বিস্তৃত ভারতবর্ষের অসংখ্য সুগম্য জায়গা থাকতে বিশেষ করে দিল্লিতেই কেন রাজধানী গড়ে ওঠে, যা পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ, যা খাণ্ডববন। বোধয়, এ বন কেবল জঙ্গল নয়, বিপুল সম্ভবনাময় এক অরণ্যনগরী। ইন্দ্র কেন এ অরণ্য বারবার

রক্ষা করছেন, কোন স্বার্থে। বনে মধু আছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমান অর্জুন তাদের ভুবন বিখ্যাত অস্ত্রগুলি এখান থেকেই লাভ করেছিলেন।

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য অরণ্য গভীরে কি করে আশ্চর্য বিদ্যা লাভ করেছিলেন কোন প্রশিক্ষিত গুরুর সাহায্য ছাড়া। একমাত্র একলব্যই হতে পারতেন অর্জুন অতিক্রমি যোদ্ধা। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের ব্রাহ্মণ বুদ্ধিতে নিষাদ পুত্রকে আঙুল বিসর্জন দিতে হলো। তিনি ক্ষত্রিয় নন বলেই এহেন হীন পন্থা অবলম্ববনে ছিলেন অকুণ্ঠিত। পরশুরামের নিকট ভিক্ষালব্দ বিদ্যার অধিকারী দ্রোণাচার্য একলব্যের ধনুঃশরের টংকার ন জানন্তি। পাণ্ডবাদির গুরুদেব বাহ্যিক, নিষাদ পুত্রের গুরুদেব অন্তরের। মাস মাইনের চুক্তিতে আবদ্ধ নয়। একলব্যের গুরু দক্ষিণার ভেতর ভক্তি উদারতা কৃতজ্ঞতা কটাক্ষ সবকিছুই মিশ্রিত আছে এবং আছে কনফিডেন্স। চার আঙুলেই মেপে নেবেন পাঁচ আঙুলের শক্তি। নিষাদের ছেলে আঙুল ছেড়ে ছিল, তীর ধনুক ছাড়েন নি। নিষাদের বিদ্যা ছিন্ন করে পুষ্ট হলো ক্ষত্রিয় সমাজ। এ কেবল রূপক গল্প নয়– ইতিহাস। কৃষ্ণবর্ণ একলব্য নীচুজাতের হলেও তিনি ছিলেন রাজপুত্র। পাণ্ডবেরা তাকে যখন আবিষ্কার করলেন বনমধ্যে, রাজা হিরণ্যধনুর পুত্রকে দেখা গেল মলিনবসন মৃগচর্মাবৃত জটাধারী রূপে একাগ্র অধ্যবসায়ে রত। তার বিদ্যা সাধনায় অর্জিত, ভিক্ষার দান নয়, প্রতিদানে লব্ধও নয়।

প্রকৃতির সাথে নিরন্তন লড়াই করে, তীর বল্লমে বিদ্ধ করে যাদের খাবার সংগ্রহ করতে হয় তারা তো শুধু যুদ্ধের জন্য অস্ত্রধারণ করেননি। ফলে অরণ্যবাসীদের তীর ধনুক চালনা প্রায় সহজাত গুণের মতোই হয়ে গেছে। অব্যর্থ তাদের নিশানা। শিকারির চোখ তাদের। কিন্তু যুদ্ধের কূটনীতি অজ্ঞাত বলে ওরা হেরে যায় বারবার। একটা সমগ্র বন পুড়িয়ে দেবার ফন্দি তাদের মাথায় আসে না। মহাকাব্য পুরানাদির বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে অরণ্যকান্ড বা বনপর্ব। যাদের বনবাসে পাঠানো হয়েছে তা শাস্তি স্বরূপ দেয়া হলেও অরণ্য জীবনই ছিল নিবিড় শান্তি পূর্ণ এবং প্রেমময়।

একটি বন্য বরাহকে যুগপৎ তীর বিদ্ধ করলেন অর্জুন এবং একজন কিরাত। কার তীর আগে বিদ্ধ করেছে এই নিয়ে অর্জুন ও কিরাতের মধ্যে ভয়ানক দ্বৈতযুদ্ধ হয়। গাণ্ডীবধারী তৃতীয় পাণ্ডব পরাস্ত হন কিরাতের কাছে। স্তবে সন্তুষ্ট করেন তাকে। তিনি কিরাত রূপী শূলপাণি। যার কাছ থেকে অর্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভ করবেন। শূলপাণি কিরাতের রূপ ধারণ করেছিলেন না কিরাতের রূপান্তর ঘটেছে মহাদেবে— এ কুতর্ক না করে অন্তত এটুকু বলা যায়, বিশেষ করে কিরাতের রূপই নিলেন কেন মহাদেব— কেননা কিরাতের পক্ষে ওই যুদ্ধ টা মানান সই। মানে, বলতে চাইছি, অরণ্যবাসী কিরাতেরা শর নিক্ষেপে অর্জুনের প্রতিস্পর্ধী হতে পারেন।

দুর্যোধনের ষড়যন্ত্রে মাতা কুন্তী সমেত পঞ্চপাণ্ডব বারণাবত নগরে নির্বাসিত হলেন। তার শিল্পকর্ম বিশারদ মন্ত্রী পুরোচন সুকৌশলে নির্মাণ করেছেন জতুগৃহ। কিন্তু খুল্লতাত বিদুরের পরামর্শে পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গ কেটে পলায়নের পথ সুনিশ্চিত করে

রেখেছেন। যথা সময়ে আগুন জ্বালবেন ভীমসেন, পুরোচন পুড়ে মরবে, পাণ্ডবেরা পালাবে, দ্রুতগামী নৌকা আপেক্ষা করবে গঙ্গার তীরে— সমস্ত পরিকল্পনা সাজানো রয়েছে দাবার ঘুটির মতো। যে রাত্রে আগুন জ্বলে উঠবে, সেদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন ভোজনন্দিনী কুন্তী। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী পাঁচ পুত্র সমেত এসেছে পান-ভোজনের আশায়। কুন্তী তাদের উদরপূর্ণ করে খাওয়ালেন এবং গলা অব্দি মদ গেলালেন। তারা এত পরিমাণে খাদ্য-পানীয় গলাধকরণ করল বা করানো হলো যে তারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। যথা সময়ে আগুন জ্বলল। পুড়ে মরল পাঁচ পুত্র সমেত নিষাদী। যাদের অগ্নিদগ্ধ দেহগুলি পঞ্চপুত্র সমেত কুন্তী বলে মিথ্যে স্বাক্ষ দিয়ে দুর্যোধনদের ধোঁকা দেবে। নাটকের মতো সুপরিকল্পিত ঘটনায় সপুত্রক নিষাদীর আগমন আকস্মিক হতে পারে না। বারণাবতে পাণ্ডবেরা মৃগয়া ছলে সারাদিন বনেবনে ঘুরে বেড়াতেন। সেখানেই পেয়েছিলেন নিষাদ পরিবারটিকে। হয়ত তাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাহ্মণ ভোজনে প্রলুব্ধ করেছিলেন তাদের। সকলেই জানেন ভোজনন্দিনী কত পরম আদরে অতিথি সেবা করতে পারেন। একদা দুর্বাসাকে তুষ্ট করেছিলেন। অতএব পাণ্ডবদের আন্তরিকতায় সন্দেহ জন্মায় না। আত্মরক্ষার জন্য নিষাদ পরিবারটিকে দাহ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভবিষ্যতে বিপদ মুক্ত থাকার প্রচেষ্টায় এই হনন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আগত আতিথি বৃন্দের সকলেই ভোজন তৃপ্ত হয়ে আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরে গেছেন, কেবল ছ'জন নিষাদ ছাড়া। নিষাদের সংখ্যা আদমশুমারিতে নেই। কজন নিষাদ হারিয়ে গেলে খোঁজ করবার কেউ নেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পাণ্ডবদের প্রক্সি দিলেন একটু খাবার আর আরেকটু মদের বিনিময়ে!

নিষাদ পরিবারটি হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ দুর্যোধনেরা জানেনি। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তিমে আহত রাজা দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপনের সংবাদ অরণ্যচারী ব্যাধদের চোখ এড়ায়নি। এই ব্যাধেরা ভীমসেনের জন্য মাংসের যোগান দিত। পুরুস্কারের লোভে গোপনে সংবাদ দিলেন পাণ্ডব শিবিরে। রাজার পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন বিজিত পক্ষে কে থাকে। জতুগৃহ দাহ তখন বিস্মৃত অধ্যায়। এই পাণ্ডবেরাই ঠাণ্ডা মাথায় পুড়িয়ে মেরেছিল না তাদেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা নিষাদ পরিবারকে। খাণ্ডব বন দহন করেছিল, বিনষ্ট করেছিল একলব্যের স্বপ্ন। আত্মবিস্মৃত জাতী আমরা। আমরা খুব সহজে মিশে যেতে পারি কৃষ্ণপক্ষে— মহম্মদের বলে ইংরেজের দলে লেলিনের স্লোগানে কিম্বা ইতালীয় রমণীর ছলে— সব ভুলে যাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত। তিন যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। বলদেব দেহ রেখেছেন। চিন্তান্বিত শ্রীকৃষ্ণ নিবিড় বনে বিশ্রামরত। হঠাৎই এক ব্যাধের তীর মৃগয়া ভ্রমে বাসুদেবের পদতলে বিদ্ধ হয়ে অন্তিম প্রণাম জানায়।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) কালীপ্রসন্ন সিংহ – 'মহাভারত', তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২) ইরাবতী কার্বে – 'যুগান্ত', (অনুদিত) সাহিত্য অকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

৩) সুধীরচন্দ্র সরকার – 'পৌরাণিক অভিধান', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮

৪) বুদ্ধদেব বসু – 'মহাভারতের কথা', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪২০

অগ্নিকন্যা কমলা দাশগুপ্ত

কোয়েল রানা
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কমলা দাশগুপ্ত প্রথম জীবনে ছিলেন অহিংসের পূজারী মহাত্মা গান্ধীর অনুগামিনী।কিন্তু পরিস্থিতি তাকে সহিংস আন্দোলনের পথে চালিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী থাকা অবস্থায় তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। এই দলের অন্যতম সদস্য দীনেশ মজুমদার এবং রসিকলাল দাসের অনুপ্রেরণায় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ডালহৌসি স্কোয়ার মামলায় অভিযুক্ত এই বীরাঙ্গনা ২১ দিন হাজত বাস করেন। বিপ্লবী বীণা দাশ কে তিনি একটি রিভলবার দিয়েছিলেন যা দিয়ে বিনা ১৯৩২ সালে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকশন কে গুলি করার চেষ্টা করেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বারংবার গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও প্রমাণের অভাবে কমলা দাশগুপ্ত মুক্তি পেয়ে যান। এরপর তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। তিনি উপলব্ধি করলেন লেখনীর মাধ্যমে মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। তাই তিনি ১৯৩৮ সালে মহিলাদের পত্রিকা 'মন্দিরা' সম্পাদনার ভার নেন। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তাকে পুনরায় প্রায় চার বছরের জন্য কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে গান্ধীজীর নির্দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কালে নোয়াখালীতে রিলিফ ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব পান তিনি। এই বিপ্লবী নারী ২০০০ সালের ১৯শে জুলাই ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন।

সূচকশব্দ : বীরাঙ্গনা, যুগান্তর, মন্দিরা, নোয়াখালীর দাঙ্গা।

ঊনবিংশ শতকের শেষের পর্ব থেকে বাংলায় যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জনমানসে স্পষ্ট হতে থাকে তারই এক চরম ফলশ্রুতি হল সশস্ত্র রাজনৈতিক অভ্যুত্থান। এই সশস্ত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপই ঐতিহাসিকদের কাছে কখনও বিপ্লববাদ , আবার কখনও সন্ত্রাসবাদ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী এই রাজনৈতিক পন্থাকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে অভিহিত করা অপেক্ষা বৈপ্লবিক কর্মধারা হিসেবে উল্লেখ করাটা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। রাওলাট কমিটির রিপোর্টেও এই বৈপ্লবিক কথাটিই ব্যবহৃত হয়েছে।[১] তবে ড: বিপিন চন্দ্র তার গ্রন্থে এই ধরনের রাজনৈতিক

কার্যকলাপকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ বলে উল্লেখ করলেও বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ স্পষ্টভাবে তাদের এই কর্মচিন্তনকে বিপ্লববাদ বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

বিংশ শতকে বাংলার বৈপ্লবিক রাজনীতির অঙ্কুরোদগমের সময় থেকেই পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করা থেকে শুরু করে বিপ্লবীদের কার্যকলাপে পরোক্ষ সহায়তা দান সকল ক্ষেত্রেই নেপথ্যে থেকে বাংলার বঙ্গনারী তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার,পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও খাদ্যের সংস্থান ,গুপ্ত সমিতির গোপন বার্তা কর্মীদের মধ্যে আদান প্রদান করা, পুলিশের নজরের আড়ালে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, নারীদের বিপ্লবী সমিতি তৈরি করে সেখানে সদস্যদের বিপ্লবের কার্যোপযোগী করে তুলে আরো বেশি সংখ্যক মেয়েকে রাজনৈতিক সচেতন করে তোলা, প্রভৃতি কাজে বয়স ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য মহিলা এগিয়ে এসেছেন । বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী সরলা দেবী চৌধুরানী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উদার স্বদেশী বাতাবরণে বেড়ে ওঠা শিক্ষিতা সরলা দেবী প্রথম বাঙালি কে 'মৃত্যু চর্চার আহ্বান জানান'এবং তিনি শরীর চর্চা, কুস্তি, তলোয়ার চালনা, লাঠি খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে শারীরিক দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে যুবকদের বলিষ্ঠ হওয়ার আদর্শ প্রচার করেন। শুধু শারীরিক কসরৎ নয় মানসিক ভীরুতা কাটিয়ে ইংরেজ বিরোধী ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পন্থা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব,বীরাষ্টমী ব্রত পালনের ন্যায় 'Hero worship' এর আয়োজন কে।[৩] বাংলার প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্যের ন্যায় হিন্দু জমিদার যেভাবে মুঘল বাদশাহদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন,সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যাতে বঙ্গের বীর সন্তানরাও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এই ছিল এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।[৪] অন্যদিকে পরোক্ষ কাজগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ঝুঁকি পূর্ণ দুঃসাহসিক কাজ হল পুলিশের সন্দেহপূর্ণ নজর এড়িয়ে পলাতক বিপ্লবীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়দান। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্বে বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী হিসেবে যে বীরাঙ্গনার নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে, তিনি হলেন ভারত জার্মান ষড়যন্ত্রের (১৯১৫-১৯১৬খ্রী) সঙ্গে যুক্ত পলাতক বিপ্লবীদের সকলের পিসিমা হাওড়া জেলার বালির বাসিন্দা ননীবালা দেবী। ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের তৎপরতায় জার্মান থেকে ভারতে অস্ত্র সরবরাহ করার যে প্রয়াস চলছিল, তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় এই দলের সদস্য বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার পিসিমা ননীবালা দেবী বৈপ্লবিক রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন।[৫] বৈপ্লবিক কার্যকলাপে বাংলার মেয়েদের অপর একটি পরোক্ষ অংশগ্রহণ হল ডাক বাক্সের ভূমিকা পালন করা। অর্থাৎ বিপ্লবীদের মধ্যে গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখার

কাজ করতেন বঙ্গনারীরা। পুলিশের দৃষ্টি ও সন্দেহ এড়িয়ে বি. ভি দলের মীরা দত্তগুপ্ত ও উমা সেন, চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের কল্পনা দত্ত, প্রমিলা দাস, আরতি রক্ষিত, অনুশীলন দলের প্রতিভা ভদ্র, পারুল মুখার্জি, কলকাতার যুগান্তর দলের কল্যাণী দাস,কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখ নারী আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগের সেতু বন্ধন কারী হিসেবে কাজ করতেন।[৬]

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে বঙ্গনারীরা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, খাদ্য সংগ্রহ ,গোপন বার্তা প্রদান, গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ন্যায় পরোক্ষ কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেও সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়নি। কিন্তু ১৯৩০ এর দশক থেকে মেয়েরা বিশেষত স্কুল কলেজের ছাত্রীরা ক্রমেই বিপ্লবী দল গুলির পুরুষ সদস্যদের মতোই ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ অত্যাচারী কর্মচারীদের নিধন যজ্ঞে অংশ নিতে শুরু করেন। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে সক্রিয় রাখার মধ্য দিয়েই দেশমাতৃকার সেবায় আত্মাহুতি দেবার একটা বড় সুযোগ পেয়েই বেশ কিছু নারী বিপ্লবের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। একে একে শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, উজ্জলা মজুমদারের ন্যায় বীরাঙ্গনারা কখনো দলীয় নির্দেশে আবার কখনো একক প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখ সমরের কর্মসূচি গ্রহণ করে ক্রমেই সরকারের ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠেন। বিংশ শতকের অগ্নিযুগে বাংলার নারী সমাজে আবির্ভূত বীরাঙ্গনাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমলা দাশগুপ্ত।

কমলা দাশগুপ্ত এর জীবন শুরু হয় বিপ্লবী দলের কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে। এই মহীয়সী নারী ১৯০৭ সালের ১১ই মার্চ ঢাকার বিক্রমপুরে এক বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মাতা চারুলতা ছিলেন শান্ত, বুদ্ধিমতী ও দেশাত্মবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কমলা দাশগুপ্তের বাবার খুব কাছের বন্ধু। সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলি" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন কমলা দাশগুপ্তের বাবা।[৭] এই সূত্রেই কমলার মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তি তৈরি হয়। কমলা দাশগুপ্ত ১৯২৪ সালে ঢাকার ব্রহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন, এবং দু'বছর ধরে ১৩ টাকা করে ব্রহ্মময়ী তারাসুন্দরী বৃত্তি পান। এরপর তিনি সপরিবারে কলকাতায় এসে বেথুন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ কালে কল্যাণী দাসের ছাত্রী সংঘের সদস্যা হন এবং প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কমলা দেবী ছিলেন কৃতি ছাত্রী। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী থাকা অবস্থায় গান্ধীজিকে চিঠি লিখেছিলেন দেশ সেবা করবেন বলে। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর কাছ থেকে জবাব এল ‘‘বাপ মায়ের অনুমতি নিয়ে চলে এসো’’ কিন্তু বাবা-মায়ের অনুমতি পাওয়া কমলার সম্ভব হলো না।[৮] কাজেই তার পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কার্যের সঙ্গে যুক্ত হন।[৯]

স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা গ্রহণ কালে কয়েকজন সশস্ত্র বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন। এইসব বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন দেশের স্বাধীনতা লাভ করা কখনোই রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন দীনেশ মজুমদার। দীনেশ মজুমদার কমলার মধ্যে বিপ্লবের আগুন দেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কমলাকে। তিনি কমলাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বোমা তৈরির দক্ষ কারিগর রসিক লাল দাস এর কাছে। এদের সংস্পর্শে এসে কমলা দেবী অস্ত্রধারী বিপ্লবীদের একজন গভীর ভক্ত হয়ে উঠলেন,এবং রসিক লাল দাসের অনুপ্রেরণায় গান্ধীজির অহিংসবাদ পরিত্যাগ করে ১৯২৯ সালে যুগান্তর দলে যোগদান করেন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য।[১০] বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে দলের সব রকম গোপনীয় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত থাকার জন্য তার বাড়ি থেকে প্রচন্ড বাধা আসে। কোন বাধার কাছেই তিনি নতি স্বীকার করলেন না। তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন দেশের কাজের দলের ছত্রছায়ায় এবং দলের প্রয়োজনে গড়পার রোডের একটি হোস্টেলে থাকতে লাগলেন। হোস্টেলে গুদাম ঘরে তিনি বোমা লুকিয়ে রাখতেন এবং দলীয় নির্দেশে বোমা ভর্তি সুটকেস কখনো যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন আবার কখনো অন্য বিপ্লবীরা এসে তা গোপনে নিয়ে যেত। এই বীরাঙ্গনা বেশভূষা পরিবর্তন করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আইনের নিষিদ্ধ বোমা, রিভলবার নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি কখনো মাথায় বিরাট ঘোমটা টেনে গ্রাম্য বধু সেজে অন্যের সাথে আড়ষ্ট পথে কখনো বা অতি আধুনিকা সেজে রাত নয় দশটার সময় ট্যাক্সি করে পোশাকের ভেতর রিভলবার চালান করেছেন।[১১] ১৯৩০ সালের ২৫শে আগস্ট কলকাতায় ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবকে হত্যার ভার পড়ে শৈলেন নিয়োগী, অতুল সেন, অনুজা সেন ও দীনেশ মজুমদারের ওপর।[১২] টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমার আক্রমণ ও বিস্ফোরণ হলেও টেগার্ট কোনক্রমে বেঁচে যান। নিহত হন অনুজা সেন এবং দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হন। ধরে ধরে বিপ্লবী মেয়েদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। এরা হলেন শোভারানী দত্ত, সত্য রানী দত্ত, রেনু সেন ও কমলা দাশগুপ্ত। ঢাকা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, কলকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের মূল ঘাঁটির ওপর বিপ্লবী আক্রমণ ও সংগ্রাম শুরু হয়।[১৩]

কমলা দেশের যুবাশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করার জন্য ছাত্রী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[১৪] ছাত্রী সংঘ গড়ে ওঠে, ১৯৩২ সালে তিনি একদিন তার বন্ধু কল্যাণী দাসের বাড়িতে যান, কল্যাণী তখন আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছেন তার ছোট বোন বীনা দাস কমলা দাশগুপ্তকে আস্তে আস্তে বললেন- "তোমায় একটা কথা বলব কমলাদি? আমার ইচ্ছা গভর্নর কে গুলি করি। "তুমি আমাকে রিভলভার দেবে"?[১৫] সেই বছরে কনভোকেশন হল থেকে বীনার বি.এ ডিগ্রী আনবার কথা ছিল। কনভোকেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য গভর্নর আসেন ডিগ্রি দিতে। কমলা এ কাজের বিপদের দিকটা বীনাকে দিনের পর দিন বোঝাতে শুরু করেন। কিন্তু

বীনা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কমলা তার এক সহকর্মী সুধীর ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসানকে গুলি করা হবে এবং গুলি করার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে।[১৬] একদিন সুধীর ঘোষ রিভলভার নিয়ে আসেন, কমলা বীনাকে নিয়ে বসলেন রামমোহন লাইব্রেরীতে নিরিবিলি একটি ঘরে। রিভলবারের প্রতিটা অংশ খুলে কমলা দাশগুপ্ত বিনা কে বুঝিয়ে দিয়ে তার হাতে তুলে দেন সেই অগ্নিনালিকাটি। ১৯৩২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি সেনেট হলে গভর্নর জ্যাকসন যখন তার কনভোকেশনের অভিভাষনটা পড়ছিলেন তখন বীনা তার আসন থেকে উঠে এসে গভর্নর কে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর সতর্ক হয়ে তৎক্ষণাৎ মাথাটা সরিয়ে নিলে বীনা আবার গুলি চালায়, কিন্তু তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে গভর্নর প্রাণে বেঁচে যান। সেই মুহূর্তে মঞ্চ থেকে কর্নেল সুরাওয়ার্দী ছুটে এসে বীনার গলা সজোরে চেপে ধরলে সেই অবস্থাতেই গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বীনা গুলি চালাতে লাগলো। কিন্তু কেউই সেই ভাবে আহত হননি। বীনা পুরো অবস্থাটা অনুভব করে তার সঙ্গে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি।[১৭] এর ফলে কলকাতা সহ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। “গভর্নরের মৃত্যুটাই বড়ো কথা নয় বড়ো কথা হল আমাদের আঘাত ইংরেজ শাসনের দৃঢ় ভিত্তিকে কতখানি শিথিল করতে পেরেছে ,বিপ্লবের স্রোতে আমরা কতখানি আবর্ত আনতে পেরেছি।” এই কথা সুধীর ঘোষ কমলাকে বলেন আর এখানেই আমাদের স্বার্থকতা।[১৮] এরপর পুলিশ বিনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় গোয়েন্দা দপ্তর ইলিসিয়াম রোতে। এর পাশাপাশি কমলা দাশগুপ্ত সহ আরো অনেক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ বিমল প্রতিভা দেবী, কমলা দাশগুপ্ত, লীলাবতী দেবী, সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে বীনার যোগাযোগের অভিযোগ ওঠে এবং এদের মহিলা বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।[১৯] ১৯৩৩ সালে কমলা দাশগুপ্তকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হলো দেশদ্রোহীতার অভিযোগে। তাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে ও পরে হিজলি বন্দি নিবাসে আটক করে রাখা হয়। হিজলি বন্দি নিবাসে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন।[২০] সেখান থেকে মুক্তি পান ১৯৩৮ সালে।

ওই বছরই বিপ্লবী দল গুলির অনেক নেতাও মুক্তি পেয়েছিলেন। বিপ্লবীদের সশস্ত্র এবং গুপ্ত আন্দোলনের ফলে মুষ্টিমেয় বীরদের চরম ত্যাগের আদর্শ দেশময় প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু তাদের গণসংযোগ ও গণ সংগ্রাম হয়নি। আর গণ সংগ্রাম ব্যতীত স্বাধীনতা আসতে পারে না। অন্যদিকে গান্ধীজী একটার পর একটা গণ আন্দোলন করে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, এতদিন তার আন্দোলন প্রবাহে ছিল সর্বাধিক লোকের অল্প ত্যাগ কিন্তু ১৯৩৮ সালে তিনিও চাইলেন সর্বাধিক লোকের চরম ত্যাগ। বিপ্লবী দলের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনার ফলে তারাও কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এর পাশাপাশি কমলা দাশগুপ্তও কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস মহিলা সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়

'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' যেটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কংগ্রেসী রাজনীতির শরিক হয়ে ওঠে। কমলা দাশগুপ্তের পাশাপাশি লীলা নাগ, কমলা চ্যাটার্জী, বীণা দাস, কল্যাণী দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী মহিলারা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন, এবং তাদেরই তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় এই অগ্নি কন্যাদের মুখপত্র 'মন্দিরা'।[২১] 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম', 'স্বাধীনতা', 'যুগান্তর' পত্রিকা গুলির মত 'মন্দিরা' রও উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগরিত করা। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা হয়ে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা ও গ্রামে গিয়ে মেয়েদের কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা চালান। এরপর ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যখন সমগ্র দেশের জনসাধারণ গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রে উত্তাল হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে কমলা দাশগুপ্ত ও ব্যতিক্রম ছিলেন না। আন্দোলনে যোগদানের কারণে তিনি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন। জেল থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় কর্মযজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করলেন। পরিস্থিতি বুঝে ইংরেজ সরকার স্বাধীনতা আন্দোলন কে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্যে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালীর ভয়াবহ দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। সেই দাঙ্গার নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্য গান্ধীজি সেখানে ছুটে যান।

সেই সময় কাগজের একটা বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে ৮৬ খানা চিঠি এসে পড়ে কমলার হাতে। চিঠির লেখকরা নোয়াখালীর দাঙ্গার সময় ধর্ষিতা মেয়েদের বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা রূপে কমলা দাশগুপ্ত কে ১৯৪৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাঠানো হয় গান্ধীজীর কাছে ওই চিঠি গুলি দিয়ে। গান্ধীজি তখন নোয়াখালীর অভ্যন্তরে শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তার সেক্রেটারি প্রফেসর নির্মল কুমার বোস ৮৬ খানা চিঠি হাতে নিয়ে চলে গেলেন গান্ধীজীর ঘরে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ল, কমলারা ঘরে ঢুকবার আগেই গান্ধীজী হাসিমুখে তাদের নমস্কার করছেন যেন তারা তার চির আপন। সেদিন ছিল তার মৌন দিবস তিনি লিখে দিলেন: "personally I do not think the extend of the evil is so great.Many such cases have not come under my observation. In any case you may keep in mind the young men who will take in such girls and see what can be done when you come across a bonafide case." অর্থাৎ "এমন অশুভ ঘটনার সংখ্যা এত বেশি বলে আমি মনে করি না। এরকম ঘটনা খুব বেশি আমার নজরে আসেনি। যাইহোক যেসব যুবক এমন মেয়েদের বিয়ে করতে চায় তাদের কথা মনে রেখো এবং যখন এরকম প্রকৃত ঘটনার সন্ধান পাবে তখন কি করতে পারো দেখো"।[২২] তারপর বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজতে কমলা বহু রিলিফ ক্যাম্প ঘুরলেন। ওরকম দু একটি মেয়ে তিনি যা পেয়েছেন তাদের বয়স ১৪

বছরের নিচে। যে দু একজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন তারা বিবাহিতা এবং স্বামীর সাথে ঘর করছেন, কাজেই তার এই বিবাহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

সুচেতা কৃপালিনী কমলাকে দিয়ে বিজয়নগর গ্রামে একটা কর্মকেন্দ্র স্থাপন করালেন এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালান। একদিন সতীশ দাশগুপ্ত খবর পাঠালেন গান্ধীজী নোয়াখালীতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য গ্রামের পর গ্রামে যে পদ পরিক্রমা করে চলেছিলেন তার মধ্যে পড়বে বিজয়নগর কেন্দ্রও। ১৯৪৭ সালের ৯ এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি তিনি কমলাদের কেন্দ্রে দুদিন থাকবেন। ১৯৪৭ সালের ২রা জানুয়ারি থেকে নোয়াখালীতে শুরু হয়েছিল গান্ধীজীর ঐতিহাসিক পদযাত্রা। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে আছে শুভ বুদ্ধি, সে অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নগ্ন পায়ে চলেছিলেন সাতাত্তর বছরের এই বৃদ্ধ পিতা। ৯ ই ফেব্রুয়ারি কমলা গান্ধীজিকে নন্দীগ্রাম থেকে বিজয়নগরের কর্ম কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেই সময় রাস্তায় সবাই মিলে রামধনু গাইছিলেন, "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম, ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সম্মতি দে ভগবান", তিনি এক হাতে সেলাম ও অন্য হাতে নমস্কার করলেও তাদের কাছ থেকে সেলাম ফিরে পাচ্ছিলেন না।[২৩] তাই কমলা থাকতে না পেরে বলে উঠলেন গান্ধীজি আপনাদের সেলাম করছেন আপনারাও করুন। গান্ধীজী বললেন, 'ওরা নাইবা করল, আমার কর্তব্য আমি করে যাবো, একাই তো চলতে হবে, একলা চলো, একলা চলো রে।' যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরা গাইতে লাগলেন- "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে"।[২৪]

কমলার তুচ্ছ জীবন এমন সব অসামান্য দুর্লভ রত্নের সংস্পর্শে এসে অনুভব করেছিল 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। তিনি শিক্ষকতা ছাড়াও "রক্তের অক্ষরে" নামে তার আত্মজীবনী লিখেছিলেন যেটি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন তা হল "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী" নামক গ্রন্থটি লিখে, যা স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে নারীর অবদানের এক জ্বলন্ত দলিল। কমলা দাশগুপ্ত তার বিপ্লবী স্মৃতি কথাই লিখেছেন তিনি স্বাধীনতার প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন।[২৫] অবশেষে ২০০০ সালের ১৯শে জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন।

তথ্যসূত্র:

১. Sedition committee report 1918 S.A.T Rowlatt(Government of India Home Department).

২. নলিনী কিশোর, গুহ, বাংলার বিপ্লববাদ, কলিকাতা: এ. মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ , পৃষ্ঠা; ১-৫।

৩. সরলাদেবী, চৌধুরানী, জীবনের ঝরাপাতা, কলকাতা: পাবলিকেশন, ২০০৭, পৃষ্ঠা; ১১৮ - ১২৫।

৪. তদেব।

৫. অমলেন্দু, ঘোষ, “বীরাঙ্গনা (সরলাদেবী)”, অগ্নিযুগ, শৈলেশ, দে, (সম্পাদিত), কলিকাতা: পূর্ণ প্রকাশ, ১৯৭৮, ১৯৯৯ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা; ৫

৬. তীর্থা, মন্ডল, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গনারা, কলিকাতা : মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃষ্ঠা;২২.

৭. কমলা, দাশগুপ্ত,'রক্তের অক্ষরে',নবান্ন , কলকাতা ,১৯৫৪।

৮. তদেব

৯. ভি.অ্যাগনিউ,এলিট উইমেন ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, ভিকাস পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড ,(দিল্লী১৯৭৪),পৃষ্ঠা;৬২-৭৯।

১০. Kumar, Radha(1997),The History of Doing :An illustrated account of movements for women's rights and feminism in India,1800-1990, published by zubaan,1993, page -87,ISBN 81-85107-76-9.

১১. কমলা দাশগুপ্ত,'রক্তের অক্ষরে ', নবান্ন, (কলকাতা,১৩৬১বঙ্গাব্দ)পৃষ্ঠা; ৩৫-৪৩।

১২. তদেব।

১৩. কমলা, দাশগুপ্ত , 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী', পূর্বোল্লিখিত,পৃ; ২৪।

১৪. গোয়েন্দা (আই.বি) দপ্তরের গোপনীয় ফাইল নং-১৭২,১৯৩২।

১৫. তদেব

১৬. তদেব

১৭. সফিউন্নিসা, স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি বীরাঙ্গনা, কলকাতা:মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা; ৫৯-৬৫

১৮. তদেব

১৯. স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিস -১৪ থেকে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। গোয়েন্দা (আই.বি) দপ্তরের গোপনীয় ফাইল নং-১৭২,১৯৩২ সাল ।

২০. ভাস্করব্রত, পতি(২০১৬,২২শে ডিসেম্বর) দেশের প্রথম মহিলা জেল এখন আই আই টির গুদামঘর,গনশক্তি ডট কম , কলকাতা ।

২১. সফিউন্নিসা, স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি বীরাঙ্গনা, কলকাতা:মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা;২৯,৯৯।

২২. তদেব

২৩. তদেব

২৪. তদেব

২৫. কমলা, দাশগুপ্ত, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী', বসুন্ধরা প্রকাশনী, (কলকাতা,১৩৭০ বঙ্গাব্দ) পৃষ্ঠা; ১৩৫।

রাধারাণী দেবীর ‘লীলাকমল’: বন্দিনী নারীসত্তার বন্ধন মুক্তির আনন্দ

ফটিক চন্দ্র অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শিলদা চন্দ্র শেখর কলেজ

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকে কবি রাধারাণী দেবী তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমকালে অনেকেরই কাছে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। রাধারাণী দেবীর কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ‘লীলাকমল’ কাব্যের মাধ্যমে। এই কাব্যে কবি মন আত্ম-উন্মোচন হল-বর্হির্জগতকে সম্পূর্ণ আস্বীকার করে, মানবজগতে বিবরণের মাধ্যমে। এই অন্তর্মুখীনতাই ‘লীলাকমল’ –এর মূলকথা। আর এই ‘নিমেষে উত্তাল’ ‘সিন্ধু’-স্রোতস্বিনীর দুর্বার অগ্রগতির ছন্দেই লীলাকমলের কবির হৃদয় উচ্ছসিত। এমন কুণ্ঠাহীন আত্মঘোষণা বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে আর কোনো নারীকণ্ঠে শোনা যায়নি। “লীলাকমল” কাব্যগ্রন্থে এক অকথিত প্রণয়ের রেশ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, তা আত্মসর্বস্ব প্রেম নয়, অন্তরের সুপ্ত কামনার প্রকাশ, ‘অহেতুক আনন্দ’ কে বাইরে ভাষা-ছন্দ-উপমায় আবৃত্ত করে কবি রাধারাণী পাঠকের কাছে পৌছে দিয়েছেন। “অভিসারিণী”র কবি রাধারাণী দেবী রবীন্দ্রনাথের ‘দোসর’কেই অনুসরণ করেছেন,। কবি রাধারাণী দেবীর চলার নেশায় উন্মুখ পথিক হৃদয়ের ছবি ধরা পড়েছে “পথহারা” কবিতায়। “পরিণীতার পত্র” কবিতাটি “লীলাকমল” কাব্যগ্রন্থের একটি ভিন্নধর্মী কবিতা। এখানে কবিকণ্ঠ পেলব, আত্মনিবেদনে উন্মুখ নয় বরং ঋজু, নারীব্যক্তিত্বের আত্মগরিমায় ভাস্বর।
সূচক শব্দ: মহিলা কবি, রাধারাণী দেবী, লীলাকমল, বিকাশ, কালি শুক্লা চতুর্দশী রাতে, প্রেম-প্রশস্তি, নারী ও প্রেম, অভিসারিণী, পথহারা, পরিণীতার পত্র, মৌন-নিবেদন, গধূলি-লগ্নে।

মূল আলোচনা:
বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্ন ধারার মহিলা সাহিত্যিক হলেন রাধারাণী দেবী। রাধারাণী দেবীর রচিত কাব্য, গল্পে, প্রবন্ধে ও বিভিন্ন চিঠিপত্রে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ও শিল্পকুশলতার পরিচয় পাই। রাধারাণী দেবীর রচিত সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সমকালে অনেকেরই কাছে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কন্যা সাহিত্যিক নবনিতা দেবসেন “রাধারাণী দত্ত ও রাধারাণী দেবী এবং আমরা’ প্রবন্ধে লিখেছেন-“মায়ের ধীমত্তা, তাঁর সাহস, তাঁর সততা, তাঁর স্পষ্টভাষণ, তাঁর শব্দচয়ন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার তীক্ষ্ণতা, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁর অসামান্য দখল-আমাকে তাঁর পদতলে মুগ্ধ ভক্ত

করে রেখেছিল। মা যা-ই বলতেন, তা হয়তো আমাদের চেয়ে আলাদা, গভীর ও বিশিষ্ট চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল। নিজস্ব ভাষার গুণে মৌলিক।”[১] বিশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা যখন মধ্যগগনে এবং যখন আরও অনেক মহিলা লেখিকা স্বনামে সুপ্রতিষ্ঠিত, বাংলা সাহিত্য এমনি এক সময়ে রাধারাণী দেবীর আবির্ভাব। আর কবি রাধারাণী বলাকা-পুরবী-মহুয়ার কবির কাছে প্রতিবদ্ধচিত্ত। তাই উৎসর্গের পরপৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন কবিঃ

“-অন্তরে রাখিয়া গেছো দান। বিচ্ছেদেরি হোম-বহ্নি হতে
পূজামূর্ত্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”[২]

প্রত্যেক শিল্পী তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপ্ট হিসাবে নিজের ব্যক্তিজীবনের বিশেষ ঘটনা, লেখক স্বভাব ও নিজের পারিপাশ্বিক অবস্থানের পরিচয় তাঁর সাহিত্যে তুলেধরেন। তাই কোন শিল্পীর বা সাহিত্যিকের সৃষ্টির মধ্যে তাঁর নিজের অন্তঃজগতের প্রতিফ্লন দেখা যায়.।এই জন্য কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টি বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁর অন্তঃজগত সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাধারাণী দেবীর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হল ‘লীলাকমল’। রাধারাণী দেবী কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ‘লীলাকমল’ কাব্যের মাধ্যমে। ‘লীলা-কমল’-এ লেখিকা সার্থকভাবে আপনার অন্তরকে উদঘাটিত করতে পেরেছেন। আত্মপ্রকাশ করা যেমন পুরুষের পক্ষে সহজ ন্য, নারীর পক্ষে তা আরও কঠিন, বিশেষত আমাদের বাংলাদেশে। সেই বাধা অতিক্রম করার সাহস ‘লীলা-কমল’ কাব্যে রাধারাণী দেবী দেখিয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতাগুলি প্রথাগত হয়ে উঠেনি।

রাধারাণী দেবীর মানস-কমল যখন উন্মীলিত হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যৌবন। বলাকা-পূরবী-মহুয়ার কবি যৌবনের দীপ্তরাগে জ্বলদর্চি তনুতে উদ্ভাসিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আলোয় নারীচিত্তের বেদনার মেঘে-মেঘে যে ইন্দ্রধনু- বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে তারই উল্লেখ রয়েছে ‘বিকাশ’ কবিতার মধ্যে-

“স্ফুরি সপ্তবর্ণচ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন- ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধ-তুলি
বসন্ত-বল্লবী সম কুসুম-প্লাবনে বর-তনু
উঠিল উচ্ছলি।
নিশার নিক্ষ-প্রান্তে প্রভাত সঞ্চার সম ধীরে,
অপরূপ রূপ রাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে
রচি ইন্দ্রজাল,
শীর্ণা সিন্ধু-স্রোতস্বিনীর ভরা- ভাদ্র –পুর্ণিমার ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।”[৩]

এই 'নিমেষ উত্তাল' 'সিন্ধু' –স্রোতস্বিনীর দুর্বার অগ্রগতির ছন্দেই লীলাকমলের কবির হৃদয় উচ্ছ্বসিত। রাধারাণীর জন্ম অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দশীতে। 'লীলাকমল' –এর 'কালি শুক্লা বাসন্তিকা রাতে' কবিতায় কবি তাঁর নবজন্মের কথা শুনিয়েছেন-

"কালি শুক্লা-বাসন্তিকা রাতে
বকুল বীথিকাতলে
নব-শ্যাম-দুর্বাদলে
কুসুম ঝরিল মোর মাথে।
চুমিয়া লালট গ্রীবা ছুঁয়ে কবরীর কালো চুল
ঝরিয়া পড়িল কটি বৃন্তখসা শিথিল-বকুল
অসহ- হ্রষ-রসে শান্ত-তনু তটীনী-দুকুল
প্লাবি এল বাণ!"[৪]

কবির জন্মলগ্নে হেমন্তের শুল্কা চতুর্দশী ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন। কবির নবজন্ম শুল্কা- বাসন্তিকা রাতে। প্রেমের আলোয় জীবনের কুহেলিকা অপসারিত হয়েছে। সেদিন শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী বিগতনাথা তরুণীর লেখনীমুখে নবীন পুর্বরাগের বলিষ্ঠ গীতোচ্ছাস বাংলার বিদগ্ধ রসিকসমাজকে বিস্মিত করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেন বলেছিলেন, 'বিপ্লব তাঁর কবিতায় আভাত হয়েছে' –এ সব কবিতা পড়লে তার অর্থ বোধগম্য হয়। বস্তত, এমন কুণ্ঠাহীন আত্মঘোষণা বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে আর কোনো নারীকণ্ঠে শোনা যায়নি।

দুঃখ- কারা পরিত্যাগ করে আনন্দ- মন্দিরে যাওয়ার আহ্বান এল গোধুলি লগ্নের স্বপ্নে। গোধুলির রক্তরাগকে প্রিয়তম- প্রেরিত 'সিঁথার সিন্দুর' মনে হল তাঁর। সেই অভিলষিত মিলনের কল্পনায় সমস্ত চেতনা মধুময় হয়ে উঠল। মনে জেগে উঠল, 'মিঠা লাজ' বাঞ্ছিত বল্লভের বন্দনার কলকণ্ঠী কপোতীর আনন্দ-কুজনে রুদ্ধগৃহ মুখরিত হল। 'লীলা-কমলে'র মধ্যে বচয়িত্রী মানবজীবনের চিরন্তর তৃষাতুর একটি দিককে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'প্রেম- প্রশস্তি' কবিতায় তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন-

"হে চির নির্ম্মল! তব প্রাণ-ধন নিবিড় পরশ
দাও দাও মর্ম্মে মোর,-করো চির অমৃত-সরস।
পুঁথির মানুষ হ'য়ে রবো বেঁচে আর কতো কাল?"[৫]

ভাষার লালিত্যে এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে এই অন্তরোখিত কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। মানবজীবনের তথা নারী- জীবনের চিরন্তর প্রেমতৃষ্ণা ও মধুর ভাবের প্রকাশ এই কাব্যে ঘটেছে। কবিচিত্তের আত্ম- উন্মোচন হল- বর্হিজগতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, কবির মানসজগতে বিচরণ করার মাধ্যেমে। এই অন্তর্মুখীনতাই 'লীলাকমল' –এর মূলকথা। কিন্তু এই আত্ম-মগ্নতা বা ভাবতন্ময়তা বাস্তববাদকে উপেক্ষা করেনি। নারীহৃদয়ের তৃষাতুর ভাবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বেদনাও মূর্ত হয়ে উঠেছে-

"সুদৃঢ় পাষাণে গড়া লৌহদ্বার মর্ম্মপুরে
নিঃশব্দে অকিল যায় ছুটি,-
কঠিন প্রাচীর-শ্রেণী মৃদুল-সোহিনী সুরে
পুষ্পসম পড়ে টু টি-টু টি!
সেদিন স্বেচ্ছায় নারী সর্বাঙ্গীন-অধীনতা
লহে বরি সঁপি তনু-প্রাণ
চিত্তের আনন্দ রাগে দীপ্ত হয়ে সে-দীনতা
রাণীর গৌরব করে দান।"[৬]

দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক রহস্যের আলোছায়ায় 'লীলাকমল' মানবজীবনের অনন্ত লীলার প্রতীক, যে লীলার পাপড়িগুলি শতদলের মত সজীব ও সরস। তাই 'লীলাকমল' কাব্যের 'নিবেদন' অংশে রাধারানী দেবী লিখেছেন- "মর্ম্মের মধু- মঞ্জুষায় অফুরন্ত- মধু নেই যা'র- পরিমল- গন্ধ যা'ব দিগন্তে আপনা বিস্তৃত হয় না, তাঁর এই 'লীলাকমল' সংজ্ঞা হয় তো কারুব কাছে উপহাস এবং কারুর কাছে করুণা মাত্র পাবে। তাঁর জন্য লজ্জা পেলেও দুঃখ করবো না। 'লীলাকমলের মধ্যে আমি মানব-জীবনের চিরন্তর- তৃষ্ণাতুর একটি দিকের একটি মাত্র অবশ্যম্ভাবী ভাবের বিচিত্র ও বিভিন্নতর কাব্যরূপের বিকাশকে, -ফুলের পাপড়ির মতো একবৃন্ত্যে সাজিয়ে দিতে চেয়েছি। আমার এ' প্রয়াসে যদি ত্রূটি থাকে তাঁর জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। --বিনীতা-রচয়িত্রী।"[৭]

"লীলাকমল" কাব্যগ্রন্থে এই অকথিক প্রণয়ের রেশ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, তা আত্মসর্বস্ব প্রেম নয়, অন্তরের সুপ্ত প্রকাশকামনা, 'অহেতুক আনন্দ' কে বাইরে ভাষা-ছন্দ-উপমায় আবৃত করে কবি রাধারানী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষের সমস্ত কর্মের মধ্যে রয়েছে তার প্রকাশকামনা এবং সাহিত্যেও সেই প্রকাশকামনা মূর্তিমান। আর প্রকাশ করার চেষ্টারও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা। "লীলাকমলে"র কবি তাঁর কবিতা থেকেই সেই আন্নদের অনুসন্ধানে আত্মমগ্নঃ

"বক্ষে উতল ঘন-মধু-রস মর্ম সুরভি ভোর,-
প্রভাত-রবির প্রেম-অঞ্জনে পরানে রঙের ঘোর।
মেলিয়াছি আঁখি, আমি জলবালা, সূর্য-স্বয়ংবরা,
উর্ধ্বে পসারি মড়িণাল-গ্রীবাটি
হেরিতে আসিনু ত্রুণ-দিবাটি
হেরিতে আসিনু সোনার কিরণে কনকোজ্জ্বল ধরা।"[৮]

এই উদ্ধৃতির 'সূর্য-স্বয়ংবরা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে যে প্রভাত রবির কথা বলা হয়েছে সে রবি নিসর্গ আকাশে যেমন সত্য সারস্বত আকাশেও তেমনি সত্য। রাধারাণী তাঁর 'জীবন দেবতাকে উৎসর্গ করেছেন "লীলাকমল" কাব্যগ্রন্থ এবং সেই জীবনদেবতারূপী চিরবাঞ্ছিতের অনুসন্ধান রয়েছে সমগ্র কাব্যশরীরে। কবিতাগুলিতে

মানবপ্রীতি, নিসর্গ বর্ণনাকে আশ্রয় করে ব্যাপ্তি পেয়েছে। এক চির শাশ্বতের অনুসন্ধনে তার রচনাকর্ম হয়ে উঠেছে আত্মস্থিত। উদাস এবং সুদুরের প্রতি অভিনিবেশই, তিনি ব্যাকুল হলেও নিশ্চিত।

কবি রাধারাণী সত্য, সুন্দর ও অখন্ডের ধাবণা তাঁর সমকালীন ঐতিহ্যমণ্ডিত রবীন্দ্রপরিমন্ডল থেকে লাভ করলেও তা নিতান্তই ধারণামাত্র ছিল না আর সেই কারণে এই সাদৃশ্যগুলি বহিরঙ্গে থাকলেও তিনি অন্তরঙ্গে সেই ঐতিহ্যর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, অন্তলীন অনুভুতিতে রাধারাণীর একান্ত ব্যক্তিগত নারীসত্তা প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যে একনিষ্ঠ এবং স্বাধীন আত্মবিশ্বাস স্থিচিত্ত এই লেখিকার কাছে- "মেয়েমানুষ" না হয়ে 'মানুষ মেয়ে' হয়ে উঠেছে। "লীলাকমল" কবিতায়, প্রস্ফুটিত কমলে উর্ধ্বমুখী "সুর্যস্বয়ংবরা" রূপটি মুলতঃ মানবজীবনেরই চিত্র। নিত্যদিনের মলিনতায় জীর্ণ, বিবর্ণ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হলো আরও মঙ্গলের দিকে, খন্ডতা থেকে অখন্ডতার দিকে উত্তোরণ। সূর্য এখানে পরম সত্যের রূপ, সত্য বলেই ভাস্কর উজ্জ্বল। জীবন পরিক্রমার শেষে, সেই সত্য সুন্দর ও আদর্শের কাছেই মানুষের নতিস্বীকার, তার পরম আশ্রয়। মানবজীবনের লীলা শেষ হয় অরূপ-জীবনদেবতার স্বরূপটি চেনার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ (সাহিত্যের পথে) "সৃষ্টি" প্রবন্ধে বলেছিলেন যে রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ করে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্যলাভ করে। সেই ঐশ্বর্য শুধু তার সাহিত্যকর্মে ললিতকলায় নয় তার আত্মবিসর্জনের লীলাভূমি-সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায় । কবি রাধারানী মানবজীবনের বিকাশকে পঙ্কজের প্রস্ফুটনের সঙ্গে উপমিত করেছেন। কমলের জীবনলীলার তাৎপর্যে, নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জ হয়ে উঠেছে মানবের পূর্ণতার অনুসন্ধান।

"অভিসারিণী"র কবি রাধারানী দেবী রবীন্দ্রনাথের 'দোসর'কেই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু রচনাটি অনুকরণের পর্যায় অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেননা এই ছন্দই তাঁর প্রাণছন্দ। অভিসারিণী নির্ঝরিণীই তাঁর আত্মার প্রতীক। পাহাড়ের অটল স্থিরতা, অরণ্যের বিধুর ছায়া, উপলের কাঠিন্য, তটভূমি কুসুমলতা-ক্ষেত্র-তরু-বন-পাথর-মাটি-নদীর প্রগাঢ় আহ্বান উপেক্ষা করে, অজানার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছে কবিমন। অভিসারিণী নির্ঝরিণী পাহাড়কে বলেছে-

"কুসুম লতা ক্ষেত্র তরু বন পাথর মাটী-
ডাকছে,-'নদী! থামলো, দিব পুলক বাঁটি'!
চলার নেশায় মাতলো জে-জন, হায় গো তারে
এই ধরণীর অচল যারা-তারা কি কেউ বাঁধতে পারে?"[৯]

অভিসারিণীর এই উক্তি, রাধারাণীর মর্মলোক থেকেই উৎসারিত হয়েছে। এই বলিষ্ট আত্মপ্রকাশের ভাষাই লীলাকমলের কবির ভাষা। কবি এখানে সেই একলা চলার বিপুল আনন্দে বিহ্বল। তিনি জানেন কোন সংস্কার, কোন নিয়মই তাঁকে পিছন পানে টানতে পারবে না। যে "সত্য" কে তিনি জীবনে আদর্শরূপে পাথেয় করেছিলেন, সেই "সত্যে'র

প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই তার পথ নির্মাণ করেছে, কি সাহিত্য সৃষ্টিতে, কি ব্যক্তিগত জীবনে। নির্দ্দিষ্ট কোন ঘেরাটোপে নিজেকে সীমায়িত করেন নি বলেই রাধারানী দেবী নিজেকে অপরিজিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন, সম্ভব হয়েছিল এবং সার্থক হয়েছিল তাঁর এই অভিনব প্রয়াস। "অভিসারিণী"তে যে গতিভাবনা প্রতিবিম্বিত তারই অবলম্বনে রচিত হয়েছে, "পথহারা", "সুন্দরের সন্ধানে", "কোথায় চলার শেষ", প্রভৃতি কবিতা।

কবি রাধারানী দেবীর চলার নেশায় উন্মুখ পথিক হৃদয়ের ছবি ধরা পড়েছে "পথহারা" কবিতায়। তাঁর একাকী স্বাধীন কবিজীবনের বিষাদমগ্ন নিঃসঙ্গতার ছবিও কি এখানে ধরা পড়ে নি। তিনি আরেক কবি নরেন্দ্র দেবের সহচর্য ও সন্নিধ্যের স্নেহছায়ায় নিজের জিবনে মাধুর্য ও প্রেমের অনালোকিত বাস্তব দিকটি অনুভব করেন এবং ক্রমশঃ জীবনের সেই অজানা দিকটি সম্পর্কে তাঁর ক্ষুব্ধ তরুণী হৃদয় আগ্রহী হয়ে ওঠে। "পথহারা"-য় সেই অনুভবের উজ্জ্বল স্বাক্ষর-

"পথিক-অচিন। কোন কুহকে হঠাৎ তারে
বাঁধলে তোমার প্রেমের রাখীর মিলন-হারে।"
"থামিয়ে দিল পথ-চলা ঐ আঁখির মায়া-,
পড়লো প্রাণে স্নিগ্ধ তোমার স্নেহের ছায়া।
যা ছিল তাঁর শূন্য ধূ ধূ-
নিদাঘ- তাপেই দীপ্ত শুধু।"[১০]

"পরিণীতার পত্র" কবিতাটি "লীলাকমল" কাবযগ্রন্থের একটি ভিন্নধর্মী কবিতা। এখানে কবিকণ্ঠ পেলব, আত্মনিবেদনে উন্মুখ নয় বরং ঋজু নারীব্যক্তিত্বের আত্মগরিমায় ভাস্বর। কাব্যগ্রন্থের সূচনায় যিনি বলেছিলেন,- "সুন্দরের অর্ঘ্য মোর সামান্যেরে অর্পিব না কভু।" তাঁকেই আবার ফিরে পেলাম আমরা। এই কবিতার নবপরিণীতা বধূ যেন, 'স্ত্রীর পত্রে"র মৃণালেরই স্বগোত্রীয়া। কাবিতাটির প্রথম অংশে রয়েছে গোধুলিলগ্নে সুসজ্জিত বিবাহসভার স্মৃতি। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে প্রথম আটটি পংক্তিতে-

"প্রিয়তম। কবে কোন বসন্তের গোধূলি-লগনে
মনে পড়ে জুগ্ম-শংখ বেজেছিলো গম্ভীর-সঘনে।
কল্যানী আরতিকণ্ঠে সম্মিলিত শুভ উলুরব
নন্দিত করিয়াছিলো দুজনের মিলন-উৎসব ।"[১১]

তৃতীয় স্তরে, পরিণীতা বধূটি অনায়াসে ছেড়ে দিচ্ছে পত্নীত্বের গৌরব। প্রেমহীন কর্তব্যের নিছক লোকদেখানো দাম্পত্য সম্পর্কে তাঁর স্পৃহা নেই বরং অন্য কোন নারীকে লাভ করে যদি তাঁর স্বামী সুখী হন তাহলে স্ত্রীর অধিকার থেকে তিনি তাঁর স্বামীকে মুক্ত করে দিতে পারেন। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি উপস্থাপনে পরিণীতা বধূটির কণ্ঠে আধুনিক নারীর উদারমনস্কতার স্বর আমরা শুনতে পাই-

মিথ্যার দূর্ব্বহ-বোঝা মিলনের মাঝে নাহি এনো,
মোর প্রেমে ঈর্ষা-দ্বেষ, ভিক্ষালেশ নাহি সখা জেনো।
আর কারো ভালবাসা তৃপ্তি যদি দিতে পারে তবে
তারি মালা নিয়ো কণ্ঠে। মোর এই ব্যর্থ মালা হবে
সেদিন সার্থক সখা,"[১২]

অতীত বর্তমানকে অতিক্রম করে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে পরিণীতা বধূটির স্বর। দুটি নারী পুরুষের সম্পর্কের কথা বলার পরেও অন্য নারীর আগমনের সম্ভাবনায় সানন্দ সম্মতি থাকছে একটি পরিণত নারী মনের।

শুধুমাত্র অধিকারবোধ থেকেই পুরুষটিকে মুক্ত করে দিচ্ছেন না, তাঁর প্রেমের মুক্তি কথাও একই সঙ্গে বলা হয়েছে। এই বন্ধনহীনতার কথা বলতে গিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে তার সুপ্ত ভালবাসা। বধূটি কাউকেই দোষারোপ করেনি, প্রচলিত সামাজিক নিয়মের নিগড়ে বাঁধাপড়া দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতরের ফাঁকিটাকে সে তার ব্যক্তিত্বের, তার অনুভুতির মাপকাঠিতে বিচার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত দায়বদ্ধতা নিয়ে কবিতার নারীটি সরে দাঁড়িয়েছে সাজানো সংসারের পুতুলখেলা থেকে-

আমার প্রেমের দায়ে মুক্তি দিনু তোমারে গো মিতা,
প্রশান্ত হৃদয়ে আজি। ইতি
তব-ভুল পরিণীতা।"[১৩]

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, সাধারণতঃ একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার্য হয় নারী পুরুষের সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্কের ত্রুটি খুজিতে গেলে কোনো না কোন ভাবে, অপরাধীর কাঠগড়ায় বধূটিকেই দাঁড়াতে হয়। এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বিচার করেছে কবি রাধারানী। তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন পুরুষটির আসনে। তাই সম্বোধনের সূচনায় বা অতীতচারিতার সময় 'প্রিয়তম' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও পরে তার রূপান্তর ঘটেছে "বন্ধু" বা "সখা" তে। এই সমদৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি অসম সম্পর্কের প্রাণহীণ বন্ধন থেকে পুরুষটিকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। হয়তো পরিণীতা বধূটির আখাঙ্খিত মুক্তির নেশার সাহসী ভাবনায় তিনি আদ্যন্ত আধুনিক। তৎকালীন সাহিত্যধারার প্রেক্ষাপটে এ তাঁর সার্থক বিদ্রোহ। একদিন প্রেমের কাছে আত্মনিবেদিত কবি বলেছিলেন-

"নিবিড় সজল-ব্যাথা শ্রাবনের ঘন মেঘ-পারা
প্রাণে আছে ঘিরে!
সুন্দরের স্বপ্ন মোরে বেড়িয়াছে আশ্লেষের মত
নিবিড় সম্প্রীতে,
জীবনের দুঃখ কারা, আন্নদে-মন্দিরে পরিণত,
---প্রাণের আমৃতে।"[১৪]

কবি বুঝতে পেরেছিলেন, "তিল তিল দুঃখভরা এ জীবন প্রকান্ড মরণ"। জানতে পেরেছিলেন, "সোনার জীবন নীল হয়ে গেছে, বেদনার বিষে সর্বনাশা।" এই দুর্বিষহ পরিবেশে তাঁর মর্ম মরুতে নেমে এল অমৃতপ্রেমের অলকানন্দা, দুঃখ কারা ত্যাগ করে 'আনন্দ মন্দিরে' যাবার আহ্বান এল "গোধূলিলগ্নের" স্বপ্নে। গোধূলির রক্তরাগকে প্রিয়তম প্রেরিত "সিঁথার সিন্দুর" মনে হল তাঁর। সেই অভিলাষিত মিলনের কল্পনায় সমস্ত চেতনা মধুময় হয়ে উঠল। মনে জাগ্রত হল, "মিঠালাজ" বাঞ্ছিত বল্লভের বন্দনায় কলকণ্ঠী কপোতীর আনন্দ কুজনে রুদ্ধগৃহ মুখরিত হল-

"দিনের বিদায়-চুম্বন লেগে মেঘে-মেঘে ফোটে ফাগ!
মোরপ্রাণ-পুটে উথলিয়া উঠে কার ব্যাথা অনুরাগ?
ও গো দূর প্রিয়তম।
গোধূলির গায়ে দেছ কি পাঠায়ে সিঁথার সিন্দুর মম?
এতদিন পরে ক্ষনিকের তরে মোরে কি স্মরেছ বধূ?
তাই সারাপ্রান গেয়ে ওঠে গান-মধু-মধু-সবি মধু।"[১৫]

"লীলাকমল" কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে গভীর আত্মমগ্ন জীবনচেতনা, নিসর্গকে আশ্রয় করে মূর্ত থেকে বিমূর্তের অভিসার লক্ষ্য করা গেলেও প্রণয়মূলক কবিতাগুলি সম্পর্কে অন্নদাশংকর রায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক প্রতিবাদ করেন যে, কবিতাগুলি প্রণয়ে অনভিজ্ঞা, উচ্চপরিবারের বাল্যবিধবা রাধারাণীর নিছক কল্পনাজ্ঞাত সেখানে জীবনের অকৃত্রিম অনুভূতি অনুপস্থিত। তাই 'রাধারানী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় 'লীলাকমল' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভূমিকা' অংশে জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন- "সুদ্ধান্তঃপুরের অবরোধে বন্দিনী নারীসত্তা সারস্বত আকাশে প্রেমের আলোয় কি করে সমস্ত অবরোধ ভেঙে দিয়ে বন্ধনমুক্তির আনন্দে উদ্বেল হল, তারই ছন্দিত ইতিহাস 'লীলাকমল' এর প্রতিটি রচনায় উদগীত হয়েছে।"[১৬] এইজন্য সামগ্রিকভাবে বিচার করে আমরা দেখতে পাই, তাঁর কবিতাগুলি কৃত্রিম অনুভূতি সজ্জিত নয়। ব্যক্তিগত প্রণয়ের স্নিগ্ধ আলোর স্পর্শে বন্ধন মুক্তির প্রয়াসে প্রতিটি কবিতাই এক গভীর অর্থ-ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১) অভিজিৎ সেন (সংকলন)– রাধারাণী দেবী রচনা সংকলন– ১' ভূমিকা– নবনীতা দেবসেন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা– ৫
২) রাধারাণী দেবী– 'লীলাকমল' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫, উৎসর্গের পরের পৃষ্ঠা
৩) তদেব, 'বিকাশ', পৃষ্ঠা- ৫
৪) তদেব, 'কাল শুক্লা চতুর্দশী রাতে', পৃষ্ঠা- ১২
৫) তদেব, 'প্রেম-প্রশস্তি', পৃষ্ঠা- ৫৯

৬) তদেব, ‘নারী ও প্রেম’, পৃষ্ঠা- ৬৭
৭) তদেব, ‘নিবেদন অংশ’, পৃষ্ঠা- ৪
৮) তদেব, ‘লীলাকমল’, পৃষ্ঠা- ১
৯) তদেব, ‘অভিসারিণী’, পৃষ্ঠা- ১০
১০) তদেব, ‘পথহারা’, পৃষ্ঠা- ২৫
১১) তদেব, ‘পরিণীতার পত্র’, পৃষ্ঠা- ৩২
১২) তদেব, ‘পরিণীতার পত্র’, পৃষ্ঠা- ৩৪
১৩) তদেব, ‘পরিণীতার পত্র’, পৃষ্ঠা- ৩৫
১৪) তদেব, ‘মৌন-নিবেদন’, পৃষ্ঠা- ৪৫
১৫) তদেব, ‘গোধুলি-লগ্নে’, পৃষ্ঠা- ৭৩
১৬) নবনীতা দেবসেন– ‘রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ভূমিকা– জগদীশ ভট্টাচার্য, ভাবরি, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৮, পৃষ্ঠা– ১০

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রসঙ্গ

সুব্রত চ্যাটার্জী
গবেষক, দর্শন বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত

সারসংক্ষেপ : অধিক শিল্পায়ন, নগরায়ন, আধুনিকরণ এবং প্রযুক্তি প্রভৃতির উন্নতি যেমন আমাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে সামাজিক সমস্যা এবং প্রকৃতির উপর ব্যাপকভাবে বিরুপ প্রভাব ফেলে চলেছে। এই সংকট থেকে মুক্তির পথ হিসাবে, সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রসঙ্গে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দিকে ফিরে তাকাবো। যেখানে ব্যক্তি-মানবেতরপ্রানী-সমাজ-প্রকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই আলোচনা করা হয়েছে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন বলে আলোচনা করা হয়নি। তাই আমরা এই নিবন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখব, সেখানে সুস্থায়ী উন্নয়নের কোন রসদ পাওয়া যায় কিনা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নে পৌঁছানোর কোন পথনির্দেশ আমরা খুঁজে পাই কিনা।

মূল শব্দ : অর্থশাস্ত্র, সুস্থায়ী উন্নয়ন, ব্যক্তি উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ, রাষ্ট্র।

মূল আলোচনা :

আমরা সাধারণ ভাবে অধিক মাত্রায় শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং আধুনিকরণকেই উন্নয়ন মনে করি। কিন্তু এই উন্নতির পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবেশ কেন্দ্রিক সমস্যা। পরিবেশ বলতে আমরা কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বুঝবোনা, সামাজিক পরিবেশকেও বুঝবো। আসলে এই দুটির সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রকৃতি-মানুষ, মানুষ-মানুষ এই সমস্ত ধরণের সম্পর্কগুলিই পরিবেশ আলোচনায় এসে পড়ে। প্রাকৃতিক সম্পদের সহনশীল ব্যবহার, যা আমাদের বেঁচে থাকার রসদকে নিঃশেষ করে ফেলবেনা, সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে এখানে সেই ভাবনাকেই মেলে ধরা হয়েছে। আমাদের সামনে এখন বড় প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, যে কিভাবে উন্নয়নকে আমরা সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবো? আমরা কি আধুনিক চিন্তাভাবনার পাশাপাশি প্রাচীন চিন্তাভাবনা, দর্শন থেকে কোন সদর্থক সামাধানের উপাদান খুঁজে পেতে পারি? এই প্রশ্ন নিয়েই ফিরে তাকাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দিকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা ব্যক্তি-সমাজ-প্রকৃতির সামগ্রিক আলোচনা দেখতে পাই। অর্থশাস্ত্রের 'অর্থ' শব্দটির তাৎপর্য গভীর। এখানে 'অর্থ' মানে শুধুমাত্র সম্পদকে গ্রহন করা হয়নি। এই সম্পদ ব্যবহারকারি মানুষের আধার যে পৃথিবী বা ভূমি তাকেই 'অর্থ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে। এই পৃথিবীর অধিগ্রহন এবং পালন হচ্ছে এই অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়। অর্থাৎ মানুষ,

মানবেতর প্রানী, প্রকৃতি সমস্ত কিছুর সামগ্রিক আলোচনা এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে চিন্তার প্রায়োগিক দিক। তাই এই নিবন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণ করে সুস্থায়ী উন্নয়নের কোনও পথ নির্দেশ আমার পাই কিনা সেটাই বিচার্য। তবে এখামে মনে রাখতে যে, কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে 'সুস্থায়ী উন্নয়ন' বলে আজ আমরা যা বুঝছি তেমন ভাবনায় আলোচনা হয়নি। আমরা প্রথমে সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করবো এবং সেই সুস্থায়ী উন্নয়নের বৈশিষ্ট কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো। পাশাপাশি সেই সুস্থায়ি উন্নয়নে পৌঁছানোর কোন পথ নির্দেশ পাওয়া যায় কিনা তাও বিশ্লেষণ করে দেখবো।

উন্নয়ন চিন্তায় সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা : আমরা যখনই উন্নয়ন কথাটি শুনি তখনই আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয় যে, উন্নয়ন হলে আমরা ভালো থাকবো। তাহলে কেন উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে? কারণ এই 'উন্নয়ন' ধারণাটার মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। আমরা উন্নয়ন বলতে অধিকমাত্রায় শিল্পায়ন, ব্যাপকহারে প্রযুক্তির উন্নতি, আধুনিকরণ, নগরায়ন, বড় বড় বাঁধ নির্মান, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনকে বুঝেছি। যেমন রেলপথের বিস্তার, পাকা রাস্তা তৈরি করা, বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করাকে আমরা উন্নয়ন বলে মনে করেছি। আর এই উন্নয়নের জন্য আমরা নির্বিচারে অরন্য ধ্বংস করেছি। কারণ অরণ্য ধ্বংস করেই আমরা নতুন নগর স্থাপন করেছি। যেমন- মহাভারতে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম অরন্যে আগুন লাগিয়ে অরন্য ধ্বংস করে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করা হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্যও নির্বিচারে জঙ্গল ও গাছ কাটা পড়েছে, যার দামে আমরা রেলপথ স্থাপন করেছি। এই নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে আমরা বর্তমান সময়ে অধিক উষ্ণপ্রবন আবহাওয়া অনুভব করছি। যা ভীষণভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে হিমবাহগুলি আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছে। আবার এই উষ্ণপ্রবন আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য আমরা প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে বাতানুকূল যন্ত্র আবিষ্কার করেছি, যা থেকে আমরা সাময়িক স্বস্তি পেলেও মানুষের স্বাস্থ্য তথা পরিবেশের স্বাস্থ্যে বিরুপ প্রভাব ডেকে আনছে। এবং অত্যাধিক প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। যেমন- বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্রার (Artificial Intelligence) উন্নতির ফলে বহু মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্র হয়ে উঠেছে। এই সমস্যাগুলি মানুষের ব্যক্তিজীবন তথা সামাজিক জীবন এবং সর্বপরি প্রকৃতির উপর বিরুপ প্রভাব ডেকে নিয়ে এসেছে। তবে প্রশ্ন হতে পারে, এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির উন্নতির ফলেই তো আমরা অনেক সুবিধা লাভ করি। যা আমাদের জীবনে অনেক সদর্থক দিক খুলে দেয়, তাহলে আমরা এই গুলিকে কেন উন্নয়ন বলবো না? হ্যাঁ এটা সত্যি যে এগুলি আমাদের জীবনে বহু সদর্থক দিক নিয়ে আনে। আমরা অনেক সুবিধা লাভ করি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন এই

যোগযোগব্যবস্থা, বড় বড় বাঁধ নির্মান ইত্যাদিকেই উন্নয়ন বলে মনে করি তখনি তা ব্যক্তি তথা সামাজিক এবং সর্বপরি প্রকৃতির উপর বিরুপ প্রভাব বয়ে নিয়ে আসে। সেজন্যই আমাদের উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে হচ্ছে। এখন মূল প্রশ্ন উঠে আসছে কি করে আমরা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন ঘটাবো? এবং তার সাথে সাথে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বজায় রাখব? অর্থাৎ আমরা উন্নয়নকে কিভাবে সুস্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) দিকে নিয়ে যাবো? এই প্রশ্নের উওর পাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তা আগে আলোচনা করবো।

সুস্থায়ী উন্নয়নঃ কী ও কেন : সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? এই সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণাটি **১৯৭২** সালে স্টকহোলমে অনুষ্ঠিত জাতি-সংঘের 'মানব পরিবেশের সম্মেলনে' প্রথম বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।[১] যদিও এই সম্মেলনে সুস্থায়ী উন্নয়ন শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এতদিন মানুষের সমস্যা ও পরিবেশের সমস্যাকে আলাদা ভাবা হয়েছে। কারণ মানুষ ভেবেছিল প্রকৃতি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকবে, প্রকৃতির ভাল থাকার দিকে নজর দেওয়া হয়নি তেমন করে। তবে মানুষের ক্রিয়াকর্মের জন্যে প্রকৃতি তথা পরিবেশের যেভাবে ক্ষতি হচ্ছে, তা দেখে চিন্তাশীল মানুষেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশের স্বাস্থ্য নিয়ে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সেজন্য এই সম্মেলনে মানুষের উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ সমস্যাকে পৃথকভাবে না দেখে একসঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা হয়। এরপর সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণাটি **১৯৯২** সালে রিও ডিজেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 'পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে'র ভিত্তি তৈরি করে।[২] এখন প্রশ্ন সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে আমরা কী বুঝবো? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাই 'Brundtland Comission' এর দেওয়া সংজ্ঞায়। **১৯৮৭** সালে 'Our Common Future' শীর্ষক নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এই কমিশন। এই প্রতিবেদনে সুস্থায়ী ঊন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের সক্ষমতার সাথে কোন ধরণের আপোষ না করে, বর্তমান প্রজন্মের চাহিদাকে মেটানোই হচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়ন।[৩]

এই উন্নয়নে সব সময়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাই বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে, যাতে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরনে কোনও রকম বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি সুস্থায়ী উন্নয়ন ভবিষ্যতের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তাহলে কি বর্তমান প্রজন্মের গুরুত্ব কি কমে যাবে? তা নয়, কারণ সুস্থায়ী উন্নয়ন ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান উভয়েরই উন্নয়নের জন্য পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমাদের জীবনযাত্রার মান কমে যাবে। যেমন- ছোট দূরত্ব যাওয়ার জন্য মোটরচালিত গাড়ি ব্যবহার না করে হেঁটে

বা সাইকেলে যেতে পারি। যা আমাদের অর্থ বাঁচাবে, স্বাস্থ্য ভাল রাখবে এবং ভবিষ্যতের ক্ষতি করবে না।

এই সুস্থায়ী উন্নয়নে প্রকৃতিকে রক্ষার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে, যাতে তা প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত না করে। এখানেও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে সুস্থায়ী উন্নয়নে কি শুধুই পরিবেশকে বিঘ্নিত না করাই লক্ষ্য? এটা ঠিক যে সুস্থায়ী উন্নয়নের একটি অন্যতম লক্ষ্য হল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। কারণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত না হলে ব্যক্তি তথা সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেমন- অপরিকল্পতভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ায়, আর্সেনিকের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তি তথা সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে। এমনকি বলা যায় মানুষের অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়ে যায়। তাই সুস্থায়ী উন্নয়ন শুধুমাত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথাই বলেনা, তার সাথে সাথে মানুষ তথা সমাজের উন্নয়নের কথাও বলে। সুতরাং সুস্থায়ী উন্নয়ন হল এমন এক নীতি যার লক্ষ্য হল মানুষের উন্নয়ন। সমাজের উন্নয়ন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। যার ফলে আমরা বর্তমানের প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সুস্থায়ী উন্নয়নে আমরা কিভাবে পৌঁছাবো? সুস্থায়ী উন্নয়ন ভাবনার মূল কথা প্রয়োজন অতিরিক্ত ভোগচাহিদাকে নিয়ন্ত্রন করে প্রকৃতির উপর অনাবশ্যক শোষণ বন্ধ করা। প্রকৃতি ও মানুষের অচ্ছেদ্য বন্ধনকে স্বীকার করে প্রকৃতির সঙ্গে ভোক্তা-ভোগ্য সম্পর্কটির অবসান। এখন এ বিষয়ে আধুনিক চিন্তাভাবনার পাশাপাশি আমরা অতীতের চিন্তা ভাবনা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছি কারণ প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্কটিকে অতীতে এক বিশেষ চোখে দেখা হত। যদিও সুস্থায়ী উন্নয়নের ভাবনাটিতে আমরা পৌঁছেছি শিল্পবিপ্লব পরবর্তী প্রাকৃতিক শোষণ ও তার নেতিবাচক ফলাফলকে প্রত্যক্ষকরে কিন্তু সুস্থায়ী উন্নয়ন ভাবনার রসদ আমরা অতীত থেকে সংগ্রহ করতেই পারি। এ প্রসঙ্গে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করবো এবং দেখার চেষ্টা করবো কৌটিল্যের চিন্তাভাবনায় সুস্থায়ী উন্নয়নে পৌঁছানোর কোন পথ নির্দেশ নিয়ে আলোচনা আছে কিনা।

মানববিদ্যার আলোকে অর্থশাস্ত্রর স্থান : এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য নির্বাচন করলাম? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হলেও আজকের দিনে এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। আর কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে ব্যক্তি-সমাজ-পরিবেশ নিয়ে এক সামগ্রিক আলোচনা পাই। আমরা আগেই দেখেছি 'অর্থ' মানে শুধুমাত্র সম্পদকে গ্রহন করা হয়নি; এই সম্পদ ব্যবহারকারি মানুষের আধার যে পৃথিবী বা ভূমি তাকেই 'অর্থ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে।[৪] এখানে মানুষ, মানবেতর প্রানী, প্রকৃতি সমস্ত কিছুর সামগ্রিক আলোচনা এখানে করা হয়েছে। তাই সুস্থায়ী উন্নয়ন কিভাবে বাস্তবায়িত করা

যায়, সেই প্রশ্নের কোন পথনির্দেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখার জন্য কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র নির্বাচন করা হয়েছে।

আমারা সুস্থায়ী উন্নয়নের যে আলোচনা করলাম, তাতে দেখতে পেলাম যে, সুস্থায়ী উন্নয়ন হতে গেলে সবার প্রথম প্রয়োজন ব্যক্তি তথা মানুষের উন্নয়ন। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো, কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে ব্যক্তি তথা মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে কোন পথনির্দেশ পাই কিনা।

আমরা জানি যে মানুষের উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করে বিদ্যা শিক্ষা। জীবনে অগ্রগতির সঠিক পথ শিক্ষাই আমাদের চেনাতে শেখায়। শিক্ষার দ্বারাই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি যেমন করতে পারি, তার সাথে সাথে আমরা একজন সচেতন সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে পারি। কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বদান করেছেন। কৌটিল্য গ্রন্থের শুরুতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রকার ও তাদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধিকরণ বিদ্যাসমুদ্দেশ শীর্ষক অধ্যায়ে কৌটিল্য চার প্রকার বিদ্যার কথা বলেছেনঃ[৫]

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দন্ড নীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ। (১.২.১)

অর্থাৎ বিদ্যা হচ্ছে চারপ্রকার, যথা- আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দন্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী বিদ্যাতে আলোচনা করা হয় সাংখ্য দর্শন, যোগাদর্শন ও লোকায়ত দর্শন, ত্রয়ীতে আলোচনা হয় ধর্ম ও অধর্ম নিয়ে, অর্থ এবং অনর্থ নিয়ে আলোচনা হয় বার্তা বিদ্যায় এবং নয়-অপনয় (Good policy and bad policy) আলোচনা হয় দন্ডনীতিতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চারবিদ্যা মানুষের উন্নয়নে কিভাবে সহায়তা দান করে? এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা হল মূলত যুক্তিশাস্ত্র। যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান মানুষকে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে যেমন সাহায্য করে, তেমনি বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন এবং কোন বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ন তা নির্ধারণ করতে পারে। মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন, তা সে নির্ধারণ করতে পারে। আবার মানুষের বিপদের সময় বুদ্ধিকে অবিচলিত রাখতে সাহায্য করে এই আন্বীক্ষিকীর জ্ঞান। এছাড়াও যে ব্যক্তি আন্বীক্ষিকী বিদ্যার জ্ঞান লাভ করেছে তার প্রজ্ঞা, বাক্য ব্যবহারও উন্নততর হয়, ফলে ব্যক্তি কর্মশক্তির নৈপুন্য সম্পাদন হয় এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ফলে। কিন্তু মানুষের কর্মশক্তি কিভাবে প্রয়োগ করে, ব্যক্তি তার বস্তুগত উন্নতি করবে? এর উত্তর আমরা পাই বার্তানামক বিদ্যাশিক্ষায়। বার্তা বিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল কৃষিকার্য, পশুপালন ও বানিজ্য। এই বার্তানামক বিদ্যার মাধ্যমে ব্যক্তি কৃষিকার্য, পশুপালন ও বানিজ্যের মাধ্যমে যেমন নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগার করতে পারবে, তেমনি সোনা, রূপোর মত বহু মূল্যবান ধাতু বানিজ্যের মাধ্যমে নিজের বস্তুগত উন্নতি ঘটাতে পারবে। কিন্তু শুধুমাত্র বস্তুগত উন্নতি হলেই কি মানুষের উন্নয়ন হয়েছে বলতে পারবো? যদি মানুষ লোভ, হিংসা, দ্বেষের বশে অপর মানুষকে ঠকিয়ে, কিংবা অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তার সম্পত্তি লুঠ করে, যদি মানুষ নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটায় তাহলে তো

মানুষের উন্নয়ন হয়েছে বলা যাবে না। তাহলে মানুষ সদাচার কি করে জানবে? এর উত্তর আমরা পাই ত্রয়ী নামক বিদ্যাতে। যেখানে মানুষ ধর্ম ও অধর্মের জ্ঞান পাবে। এখানে ধর্ম বলতে সদাচারকেই আমরা বুঝবো। বিশেষ ধর্মের পাশাপাশি কিছু সাধারণ ধর্মের জ্ঞানও মানুষ এখান থেকে শিখবে। যেমন- অহিংস আচার, সত্যনিষ্ঠতা, কায়-মন-বাক্যে শুদ্ধি ইত্যাদি। যা মানুষকে সৎ পথে চালিত করে মানুষের নৈতিক উন্নতিতে সাহায্যদান করে।

তবে এই আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও বার্তা এই তিনবিদ্যার মূল হচ্ছে দন্ড অর্থাৎ দন্ডনীতির জ্ঞান। কারণ মানুষের বস্তুগত ও নৈতিক উন্নতি যদি সঠিক নীতি দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে তা মানুষের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে না, সেজন্য বলা হয়েছে, দন্ডনীতির দ্বারা অলব্ধ বস্তুর লাভ হয়, লব্ধ বস্তুর রক্ষা করা যায়, রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি ঘটানো যায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুকে সঠিক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া যায়।

সুতরাং বলা যায়, এই চারিবিদ্যার জ্ঞান মানুষের যেমন বস্তুগত উন্নতি ঘটিয়ে মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলে, তেমনি মানুষ সদাচারের মাধ্যমে নৈতিক হয়ে ওঠারও শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে মানূষের নৈতিক উন্নতির পথের সন্ধানও আমরা এই চারিবিদ্যার মধ্যে পেয়ে থাকি।

অর্থশাস্ত্র ও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গ : তবে কিছু মানুষের বস্তুগত এবং নৈতিক উন্নতি মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনা। কারণ সমাজে যদি কিছু মানুষের উন্নতি হলেও অধিকাংশ মানুষ যদি পিছিয়ে পড়ে, সমাজে বহু মানুষ যদি দারিদ্র, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিন কাটাতে হয়, তাহলে তা সমাজে সুস্থিতি নিয়ে আসেনা। যার ফলে ব্যক্তির উন্নতিতেও ব্যাঘাত ঘটে। সেজন্য মানুষের সার্বিক উন্নয়ন হতে গেলে ব্যক্তি মানুষের উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নও প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কি সামাজিক উন্নয়নেরও কোন পথ নির্দেশ পাওয়া যাবে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য বা রাষ্ট্রের উন্নতিতে। রাজ্য বা রাষ্ট্রের উন্নতি হলে, মানুষেরও উন্নতি হবে। কারণ রাজ্য বা রাষ্ট্র বলতে রাজ্যের মানুষকেই বোঝায়। জন ছাড়া জনপদ হয়না, রাজ্যও হয়না।[৬] সেজন্য ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতির জন্য কৌটিল্য রাষ্ট্রের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যক্তির সাথে সমাজের উন্নতিরও দায়িত্ব রাষ্ট্র নির্বাহ করবে। অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়নের কান্ডারী হচ্ছে রাষ্ট্র। এই ব্যক্তি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নানান জায়গায় আলোচনা হয়েছে। তবে বিশেষ করে সমাজের উন্নতির বিষয়ে দ্বিতীয় অধিকরণের 'জনপদনিবেশ' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাই।

একটি সমাজের উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সেই সমাজের মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে, ব্যবসা বানিজ্যের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের চলাচলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং ক্রয় বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত

বাজার বা হাটের ব্যবস্থা। যাতে সেই সমাজ উপযুক্তভাবে নিজের উন্নতি করতে পারে। এগুলির উপস্থিতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা দেখতে পাই। কৌটিল্য বলছেনঃ[৭]

> দ্রব্যহস্তিবন-ব্রজবনিক্‌পথ-প্রচারান্‌ বারিস্থল-পথ-পন্য-পত্তনামি চ নিবেশয়েত্‌। (২.১.৪)

অর্থাৎ রাষ্ট্র সমাজের মানুষের কল্যানের জন্য খনিজসম্পদ উদ্ধার করা এবং শিল্প-বানিজ্যের উন্নতি সাধন করবেন, তারজন্য কারখানা স্থাপন করবেন, বনিকদের বানিজ্যের সুবিধার জন্য যাতায়াতের পথ তৈরি করবেন, মানুষদের চলাচলের জন্য জলপথে উপযোগী নৌচলাচলের ব্যবস্থা করবেন, স্থল পথে উপযোগি পথ এবং বনিকরা যারা বানিজ্য করবেন তাদের সবরকম সহায়তা করবেন। পন্য বিক্রি ও সাধারণ মানুষ তা যাতে কিনতে পারে তার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে, এরসঙ্গে সঙ্গে অসৎ উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষদের জীবন যাতে সংকট আনতে না পারে, সে বিষয়ে রাষ্ট্র দেখবে। এর সাথে সাথে রাষ্ট্র দ্রব্যবন তৈরি করবেন, যাতে প্রয়োজনীয় কাঠ, চন্দন প্রভৃতি সেই বন থেকে পাওয়া যায়। সমাজের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র আরও কর্তব্য পালন করবেন, যেমন- সেতু নির্মান করবেন এবং নদী থেকে নালা তৈরির কাজ করবেন যাতে চাষিরা সেই জল দিয়ে তাদের চাষাবাদ সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়াও পথের মধ্যে মানুষের বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার এবং মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে যাতে চিকিৎসা করাতে পারে, তার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি রাষ্ট্রই করবে।

কিন্তু এসব সত্বেও যদি কোনও মানুষ পিছিয়ে পড়ে, যেমন- পঙ্গু মানুষ শারীরিকভাবে স্বক্ষম না হওয়ার জন্য চাষাবাদ বা অন্য কোনও কাজ করতে যদি না পারে, তাহলে তার কি হবে? যদি হঠাৎ আপৎকালিন কোন বিপদ ঘটে তাহলে কি হবে? এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতিরও জন্য পথনির্দেশ আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাই। এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির দায়ভার কৌটিল্য রাষ্ট্রের উপরেই ন্যাস্ত করেছেন। এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির জন্য কৌটিল্য কতগুলি বিশেষ সমাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন, যেমন- বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অশক্ত কিংবা পঙ্গু, অনাথ ব্যক্তিদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রই নেবে। যদি গর্ভবতী মহিলা অনাথ হন, তাহলে সেই মহিলা সন্তান প্রসব করার পর, সেই সন্তানের দায়িত্ব রাষ্ট্রই নেবে। কোন অনাথ বালকের সম্পত্তি গ্রামবৃদ্ধরা নিয়ে নেবে না, বালক যখন ঐ সম্পত্তি ব্যবহারের উপযুক্ত হবেন তখনই তাকে রাষ্ট সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, যদি কোন স্বক্ষম ব্যক্তি তার স্ত্রী, সন্তান কিংবা পরিবারের মানুষের দায়িত্ব নিতে না চায়, তাহলে রাজা সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন এবং পুত্র ও স্ত্রীর জীবনধারণের ব্যবস্থা না করে দিয়ে কেউ সন্ন্যাস গ্রহন করতে পারবে না। এরকম বহু সমাজনীতির কথা আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খুঁজে পাই যা এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়ন ঘটাবে।

সমাজে যদি হঠাৎ কোন আপৎ কালিন বিপদ বা সমস্যা আসে, তাহলে তার প্রতিকার কিভাবে করতে হবে, তারও পথনির্দেশ আমরা অর্থশাস্ত্রে পাই। যেমন- সমাজের মধ্যে যদি কোনও রোগ বা অসুস্থতা দেখা যায়। তাহলে সেই খবর রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেবে বৈদ্য। যদি বৈদ্য ইচ্ছাকৃত সেই খবর রাষ্ট্রের কাছে না পৌঁছে দেয় তাহলে সেই বৈদ্যের শাস্তির বিধানও দেওয়া আছে। এবং বৈদ্যর অসাবধানতা বশত যদি রোগীর মৃত্যু হয় তাহলেও বৈদ্যের শাস্তির বিধান আছে।

হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন- অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে যদি কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্র করতো নেবেই না, উপরন্তু বীজধান, শস্য দিয়ে সেই কৃষকের চাষাবাদে সাহায্য করবেন। এভাবেই রাষ্ট্র সমাজের মানুষের আপৎকালিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করে, তাদের জীবনের উন্নতির পথকে প্রশস্ত করবে। সেজন্যই নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর *দন্ডনীতি* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে, "রাষ্ট্র এখানে একদিকে সমস্ত সামাজিক কল্যানের কেন্দ্রবিন্দু"।[৮]

কৌটিল্য ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নয়নের রুপরেখা একেছেন। যা মানুষেকে সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন পথে ব্যক্তি তথা সামাজিক উন্নয়ন বাস্তবায়িত করা যাবে? কৌটিল্য এই উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য গ্রাম অর্থনীতির উপরেই সবচে বেশী জোর দিয়েছেন। এই গ্রাম অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য কৌটিল্য একটি নিয়ম চালু করেছিলেন। তাহল, স্থানীয় লোক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীর দল ছাড়া বাইরের কেউ গ্রামে প্রবেশ করে গ্রাম বাসীদের কাজে ব্যাঘাত করতে পারবে না।[৯] কিন্তু এই গ্রাম অর্থনীতির উন্নতি কোন পথে হবে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই গ্রাম অর্থনীতি উন্নতির জন্য কৌটল্য সবচেয়ে বেশী কৃষিব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন। আর এই কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের গুরুত্বকে বার বার তুলে ধরেছেন। কারণ রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। আর কৌটিল্য মনে করেণ যে শস্যসম্পদ বৃদ্ধি ও সুরক্ষার দ্বারা রাষ্ট্রকেও সুরক্ষিত করা যায়। সেজন্য জন্য কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য নানান উপদেশ দিয়েছেন। যেমন-[১০]

অনুগ্রহ-পরিহারৌ চৈভ্যঃ কোশ-বৃদ্ধিকরৌ দদ্যাত্। (২.১.৩)

অর্থাৎ কৃষকেরা কৃষিকাজের উপকরণের অভাবে যদি চাষ করতে না চায়, তাহলে রাষ্ট্র তাদের বীজধান, গবাদি পশু কিংবা অর্থ দিয়ে অনুগ্রহ[1] করবে। এবং কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য কৌটিল্য আরও বলেন যেঃ[১১]

> করদেভ্যঃ কৃতক্ষেত্রান্যৈক-পুরূষিকানি প্রযচ্ছেত্ অকৃতানি কর্তৃভ্যো নাদেয়াত্। (২.২.২)

---

[1] অনুগ্রহ বলতে অল্পকালস্থায়ী করের ছাড় বা কৃষিকাজের উপযোগি ধান প্রভৃতি দান করা।

অর্থাৎ যে কৃষক রাজাকে নিয়মিত কর দেয়, তারা যদি নিজ চেষ্টায় কোনও ক্ষেত্রকে ফসল উৎপাদনের উপযোগি করে তোলে, তাহলে রাষ্ট্র ঐ জমি তাদের কে দান করবে। আর যদি কৃষক অনুর্বর বা ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত জমিকে ফসল উৎপাদন উপযোগি করে তুলতে পারে, তাহলে রাষ্ট্র আর ঐ জমির সত্ব ফিরিয়ে নেবে না। এভাবে নানা উপদেশের মাধ্যমে কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটিয়ে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির পথনির্দেশ আমরা পাই। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে কৌটিল্য গ্রাম অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য খনিজ সম্পদ উদ্ধার করা এবং শিল্প বানিজ্যের উন্নতির কাজটুকুও রাষ্ট্রেরই উপর ন্যাস্ত করেন।[১২]

এবার আমরা ফিরে আসি পরিবেশ প্রসঙ্গে যেখান থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল। আমরা সুস্থায়ী উন্নয়নের আলোচনায় দেখেছিলাম, ব্যক্তি তথা সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশের সাম্যাবস্থা বজায় থাকলে, তবে আমরা তাকে সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে পারবো। তাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কি পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে কোন পথনির্দেশ পাওয়া যাবে? কৌটিল্য মানুষকে বুদ্ধি ও বিবেচনার সাথে প্রকৃতিকে রক্ষা করার কথা বলেছেন।[১৩] কৌটিল্য পরিবেশ সচেতনতা বলতে বুঝেছিলেন দেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা। আর কৌটিল্য মনে করতেন যেহেতু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রধানত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে, তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে দক্ষতার সঙ্গে এই প্রকৃতির ধ্বংসকে রক্ষা করা । সেজন্য তিনি পরিবেশ রক্ষার জন্য নানান উপদেশ দিয়েছে। যেমন-[১৪]

> নদী-শৈল-বন-গৃষ্টি-দরী-সেতুবন্ধ-শাল্মলী-শমী-ক্ষীরবৃক্ষানন্তেষু সীম্নাং স্থাপয়েত্। (২.১.১)

অর্থাৎ গ্রামের সীমাকে চিহ্নিত করার জন্য নদী, শৈল, বন, বদরা নামক ঔষধি গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ বা বট জাতীয় প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। এবং সেই গাছ গুলি রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া কাটা যাবে না। যদি কেউ কাটে তাহলে তার শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে যদি বিশেষ কোন জরুরী প্রয়োজন হয় তাহলে গাছ কাটা যাবে, অপ্রয়োজনে নয়। (২.১৭.১)[১৫]

মানুষের সাথে প্রকৃতির কিংবা মানুষের সাথে মানবেতর প্রানীর সম্পর্ক কেমন হবে, তা আমরা সেতু, বন ও ব্রজ এই তিনটি শব্দ দ্বারা বুঝতে পারি। অর্থশাস্ত্রে সেতু কৃষিকাজ সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহকে বোঝায়, এর দ্বারা পুষ্পোদ্যান, ফলের বাগান, সবজির বাগান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। বন শব্দের দ্বারা পশুদের বিচরণক্ষেত্র রূপ বন, মৃগবন, দ্রব্যবন, হস্তিবন প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। ব্রজ শব্দের দ্বারা গৃহপালিত পশু, যথা গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।[১৬] অর্থাৎ মানুষ তার খাদ্যের জন্য ফলমূল, সবজি, শস্য, গ্রহন করবে। প্রয়োজনীয় রসদ টুকুই গ্রহন করবে। যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রাকৃতিক সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে। আবার বন্য পশুদের জন্য আলাদা বন থাকায়, বন্য পশুরা যেমন মানুষের ক্ষতি করবে না,

তেমনি মানুষেরাও পশুদের ক্ষতি করবেনা। এরসাথে যে জমি কৃষিযোগ্য নয়, সেখানে গবাদী পশুদের চারণভূমি করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আর এই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা এবং নতুন নতুন সেতু, বন প্রভৃতি নির্মান করার দায়িত্ব কৌটিল্য রাষ্ট্রের উপর অর্পন করেছেন।

সুতরাং মানুষ, মানবেতর প্রানী এবং প্রকৃতির সহাবস্থানের কথাই আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খুঁজে পেলাম। যেখানে কল্যানকর রাষ্ট্রের সহায়তায় মাধ্যমেই আমরা সুস্থায়ী উন্নয়নে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পাই।

তথ্যসূত্র :

১. History of SD, http//W.W.W.sd-commission.org.uk,access date: 08.07.2023
2. তদেব
৩. তদেব
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়.ডঃ মানবেন্দু,*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্,*প্রথম খন্ড,কলকাতাঃসংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,২০২১,পৃঃ-২
৫. তদেব,পৃঃ-৭৩
৬. ভাদুড়ী.নৃসিংহপ্রসাদ,*দন্ডনীতি,* কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ,২০১৯,পৃঃ-৭৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়.ডঃ মানবেন্দু, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্,*প্রথম খন্ড,পৃঃ-১৯৭
৮. ভাদুড়ী.নৃসিংহপ্রসাদ,*দন্ডনীতি,*পৃঃ-৭৬
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়.ডঃ মানবেন্দু,*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্,*প্রথম খন্ড,পৃঃ-৩৫
১০. তদেব,পৃঃ-১৯৬
১১. তদেব,পৃঃ-১৯৫
১২. ভাদুড়ী.নৃসিংহপ্রসাদ, *দন্ডনীতি,* পৃঃ-৭৫
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়. ডঃ মানবেন্দু,*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্,* প্রথম খন্ড,পৃঃ-৮৪৮/২
১৪. তদেব,পৃঃ-১৯৩
১৫. তদেব, পৃঃ-৪০২
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়.ডঃ মানবেন্দু,*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্,*দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতাঃসংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,২০১১,পৃঃ-৮২৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

সিকদার. সুকুমার, *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র,* কলকাতাঃ অনুষ্টুপ,২০২০
রাধাগোবিন্দ.বসাক, *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* কলকাতাঃ কামিনি প্রকাশলয়।২০২২
Shamasastry. Dr.R, *Kautilya's Arthasastra*,Mysore:Sei Raghuveer printing,1951

ধান্যসংস্কৃতি : উৎপত্তি, বিবর্তন, সমাজ ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক পর্যালোচনা

অজয় কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

।।এক।।

"শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুন মষ্ট্রামুদিঙ্গয়।।

....

শুনং নর ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
পুনং পর্জন্যে মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্"।[১]

-বলীবর্দসমূহ সুখে বহন করুক। মনুষ্যগণ সুখে কার্য করুক। ফাল সমেত লাঙল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক। রক্ষকগণ বলীবর্দের সাথে সুখে গমন করুক। জল দ্বারা পৃথিবী সিক্ত হোক। শুন সীর! (বায়ু দেবতা, ভিন্ন মতে, শুন অর্থাৎ বায়ু এবং সীর অর্থাৎ আদিত্য, আদি অর্থ লাঙল) আমাদের সুখ প্রদান কর।

লাঙল দিয়ে চাষ করার পূর্বে কৃষিকার্য বিষয়ক এই সূক্তের প্রত্যেক ঋক্ উচ্চারণ করা আবশ্যিক ছিল। ঋগ্বেদের যুগে কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। বোঝা যাচ্ছে, বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ছিল। আদিম মানুষকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হত। শিকারজীবী মানুষও খাদ্যের অনিশ্চয়তাবোধে পীড়িত হতেন। কৃষিজীবী মানুষ যে সে সংকট থেকে একেবারে মুক্তি পেয়েছিলেন তা নয়। খরা, অতিবৃষ্টি এবং জলপ্লাবনের কারণে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ খাদ্য সংকটে জর্জরিত হতেন।

প্রাচীন শিকার ব্যবস্থা পরবর্তী মানুষ পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। তার পরের পর্যায় অভিমুখ হল কৃষি। মানুষের সংস্কৃতিরও ঘটে গেলো ক্রমস্তরীয় বিবর্তন। মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল। বন্য এবং বর্বর অবস্থা কাটিয়ে সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের ধারা গতিশীল থাকল। লুইস হেনরি মর্গ্যান (Lewis Henry Morgan-1818-1881) তাঁর 'Ancient Society' (1877)- গ্রন্থে মানব সংস্কৃতির বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। নৃবিজ্ঞানী মর্গ্যান মানুষের সামাজিক বিবর্তনের অনুসন্ধান করেছেন উক্ত গ্রন্থে। কার্ল মার্কস (Karl Marx 1818-1883)

তাঁর 'Das Capital' গ্রন্থে লিখেছেন- মানুষের শ্রমই হল উৎপাদনের ভিত্তি- "Labour is, in the first place, a process in which both man and Nature participate, and in which man of his own accord starts, regulates, and controls the material re-actions between himself and Nature. He opposes himself to Nature as one of her own forces, setting in motion arms and legs, head and hands, the natural forces of his body, in order to appropriate Nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it".[২]

মার্কস মনে করেন, উদ্‌বৃত্ত ফসল মজুত হয় স্বর্ণলতা শ্রেণীর বুর্জোয়া জোতদার-জমিদারদের কাছে। শোষণ ছাড়া পাহাড় পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে না। শ্রমিক-কৃষকের শ্রমই হল উৎপাদনের ভিত্তি। যাই হোক, শিকারজীবী মানুষ পরবর্তী স্তরে পশুপালন করে জীবন ধারণ করেছে। এ সময় মানুষ যাযাবর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। যুথবদ্ধ মানুষ স্থানান্তরিত হতেন পশুর পাল সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এর পরেই মানুষ কৃষির আবিষ্কার করেছে। গড়ে উঠেছে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Damodar Dharmanand Kosambi তাঁর "An Introduction to the Study of Indian History" –গ্রন্থে লিখেছেন- "the power of group life must have transcended individual self-interest far more powerfully under the conditions that prevailed over 10,000 years ago. Baskets, leather containers, pottery mark stages in food preservation which ultimately led to barter, production of a surplus, and commodity production-in short, to a new social organization".[৩]

মানুষ আরণ্যক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে আরও পরিশীলিত হয়েছে। আরণ্যক জীবনে অভ্যস্ত মানুষ বৃক্ষকে দেবতা কল্পনা করেছে। ধর্মবোধ এবং পৌরাণিক মহিমা আরোপিত হয়ে বৃক্ষ পবিত্র হয়ে উঠেছে, পূজা পেয়েছে। অরণ্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতিই পরবর্তীকালে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। মানুষ তাঁর হারানো ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে। উত্তরাধিকারের ধরতাকে বহন করেছে। অরণ্য নির্ভরতা থেকে কৃষি নির্ভরতা – এই যুগগত পরিবর্তনে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিন্যাস ব্যবস্থায়ও বদল ঘটেছে। অরণ্য ছিল প্রকৃতি দত্ত ও অনেকখানি সহজাত। অপরপক্ষে কৃষি শ্রম এবং উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। অরণ্য পরিষ্কার করে প্রজা বসতি হয়েছে। গ্রাম এবং পল্লির নবরূপায়ণ ঘটে গেছে। গ্রামের মধ্যে পল্লি বা পাড়া অনুযায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। বৃত্তি নির্ভর সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে এক এক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের নামেই পল্লির নামকরণ হল। যেমন

কুমোরপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি। পৃথিবীকে দেবীরূপে কল্পনা করা হল। মানুষের ধর্মচিন্তায় মাতৃদেবীর সঙ্গে একটি বিশেষ কাল্ট সম্পৃক্ত হল- তা উর্বরতাবাদ। কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে কৃষিমাতার আবির্ভাব হল। শস্যদেবী লক্ষ্মী-নতুনভাবে পরিকল্পিত হলেন। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের উত্তরণে কৃষি সংস্কৃতিতে ঘটে গেল শ্রেণি-নির্ভরতা। স্তর বিভক্ত সমাজে মালিক শ্রেণির জন্ম হল। বৈষম্য নির্ভর সমাজে মালিক এবং খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবনচর্যার পার্থক্য বজায় থাকল। ভেঙে গেল মানুষের আদিম সাম্যবাদী সমাজ কাঠামো। উদ্‌বৃত্ত কৃষি সামগ্রী থেকে জন্ম হয়েছে বিপুল সম্পদ। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা। সমাজে পুরুষ দেবতার স্থান নিল মাতৃদেবী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস হল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ইতিহাস। ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব এবং দেববাদ সমস্ত সমাজকে ন্যুব্জ করে ফেলেছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং আধিপত্যবাদ সামাজিক অবয়বের সমস্ত ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল সামাজিক অন্ধকূপের গভীর গহ্বরে। দেবদেবী এবং ধর্মবোধ-কে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। কৃষি অর্থনীতিকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় মানুষকে পশুর সমান করে তুলেছিল। প্রাচীনযুগ এবং মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য-সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিরা সমাজকে এর থেকে বেশি কিছু দেয় নি। কৃষিক্ষেত্র, কৃষি-সংস্কৃতি এবং কৃষিপণ্যের উপর পূর্ণ দখলদারি কায়েম করেছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। কৃষি-সংস্কৃতি তাঁর স্বাভাবিক পথ হারিয়েছিল। নানা ছদ্ম ছলনায় পদক্ষেপে পদক্ষেপে কৃষককে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছিল। অবশেষে কৃষকের শেষ পরিণতি ছিল ভাগচাষী অথবা দিনমজুর। কখনো কখনো সামন্ত জমিদারদের জমিদারী ছেড়ে অন্য কোথাও পলায়ন ও মৃত্যু। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের কৃষকদের পরিণতি আমাদের খুব মনে পড়ে। মনে পড়ে কুঞ্জ ও রাধিকার পথ কুকুরের সঙ্গে খাবার খুঁটে খাওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য। বিবেকী মানুষের হৃদয় গুটিপোকায় কাটে।

।।দুই।।

পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হল ধান থেকে তৈরি চাল। ভারতে যে সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তার মধ্যে ধানের স্থানই প্রধান। আর দানাশস্য সর্বমোট উৎপাদিত জমির ৩০ ভাগ হল ধান। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে ধান চাষ হয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে ধান উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চীন প্রথম স্থানাধিকারী। ধান গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ‘Oryza Sativa’। ধানগাছ ঘাস গোত্রের (Gramineae family) ওরইয়া গণে (Oriza Genus)-র অধীন। এই গণের অন্তর্গত ২০ টি প্রজাতি থাকলেও ওরাইয়া সাতিভা (Oryza Sativa) এবং ওরাইয়া গ্লাবেররিনা (Oryza Glaberrina) এই মাত্র দুই প্রজাতির চাষ পশ্চিম আফ্রিকার সামান্য কিছু অঞ্চলে হয়। এককথায় সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ওরাইয়া

সাটিভা (Oryza Sativa) – প্রজাতিরই ধান চাষ হয়। এই প্রজাতির দু'টি উপপ্রজাতি হল (Sub species) যথাক্রমে –ইণ্ডিকা(Indica) এবং জাপোনিকা (japonica)। ইণ্ডিকা প্রজাতির ধান চাষ হয় গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলে। অপরপক্ষে জাপোনিকা ধানের চাষ হয় ৩০° উত্তর দক্ষিণ অক্ষরেখা অঞ্চলে।

ধান অতি পুরাতন খাদ্যশস্য। ভারতবর্ষ, চীন, জাভা ও পূর্ব আফ্রিকায় ধান চাষ হয়ে এসেছে। পুরাতত্ত্ব গবেষক পণ্ডিতেরা ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধান চাষের নমুনার প্রমাণ পেয়েছেন। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, ধানের উৎপত্তি স্থল হল ভারতবর্ষ। ভারতে ধান উৎপাদনে অগ্রণী দুই রাজ্য হল- পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার। এছাড়া তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। ধান গাছ জলজ উদ্ভিদ। যে সব জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকে, সেই সব জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়। ভারতে তিনবার ধান চাষ করা হয়। এই তিন ভিন্ন ঋতুর ধানের নাম যথাক্রমে- আউস, আমন ও বোরো। ভারতবর্ষে কয়েক হাজার বছরের ধান চাষের প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম। সম্প্রতি পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, সংকর বীজ এবং ঔষধের সাহায্যে ধানের ফলন বেড়ে গেছে। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষক গরুর সাহায্যে হাল-লাঙল করে কৃষিকার্য করে থাকেন। ঢেঁকি বা সাম্প্রতিককালে মেশিনের সাহায্যে ধান ছেটে তুষ ছাড়িয়ে চাল তৈরি করা হয়। চাল থেকে বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত প্রস্তুত হয়। এছাড়া চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠে-পুলি প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যময় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ধান গাছের কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নয়। তুষ, কুড়া পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুড়ো থেকে রান্নার তেল উৎপাদিত হয়। এছাড়া খড় গোখাদ্য হিসেবে তো বটেই, আবারও খড়ো ঘরের ছাউনিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। কাগজ তৈরির মণ্ড রূপেও খড়ের ব্যবহার আছে। সর্বোপরি পল্লিগ্রামে গৃহস্থের জ্বালানি সমস্যার সমাধান করে খড়। আর খড়ের বেড়ার অসাধারণ সৌন্দর্য খুবই দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। তুষ বা কুড়া শুধু গোখাদ্য নয়, জ্বালানি রূপেও পল্লিগ্রামে এর ব্যবহার যথেষ্ট।

ভারতবর্ষে সমগ্র প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগ জুড়ে জমি থেকে উৎপন্ন ধানই ছিল অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, ভাগচাষ ও তার সমস্যা, কৃষি ও কৃষক সমস্যা সবই জমি কেন্দ্রিক। শুধু ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবন নয়, দেশের সরকারের অর্থনীতির চালিকাশক্তিও জমি। এবং জমিতে উৎপাদিত ধান। সরকারের রাজস্বের সিংহভাগই জমিকেন্দ্রিক। বাঙালি সংস্কৃতির অনেক কিছুই যেমন দলিল-দস্তাবেজ, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, বার-ব্রত, দেব-দেবী, বিশ্বাস-সংস্কার, ধাঁধা-প্রবাদ-এককথায় বাঙালির ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনচর্যা আবর্তিত হয়েছে ধান্য সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। জমি কেন্দ্রিক মামলা মোকদ্দমা, হানাহানি-কাটাকাটি ও লাঠি কেন্দ্রিক যুদ্ধ-সাহসিকতার সমাচার বৃত্তান্ত শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিকেরা তাঁদের সৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। ধান্য সংস্কৃতিই বাঙালির জীবন শতকিয়ায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

পর্যন্ত অভাব-অনটন ক্ষত নিরন্ন মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার দিনলিপি প্রস্তুত করেছে। উর্বরতাবাদ কেন্দ্রিক ধর্মভাবনা ও রীতি-নীতি মান্যতা পেয়েছে ফসল নির্ভর সংস্কৃতির কল্যাণে। পৃথিবীকে মাতা রূপে কল্পনা এবং নারী প্রতীকে দ্যোতিত করার মধ্য দিয়ে প্রজননক্ষম জীবনচর্যা পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে। মধ্যযুগে অনুদার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বাংলাদেশের উর্বর জলহাওয়ায় সহজেই শেকড় বাকড় চালিয়েছিল। শোষণ-বঞ্চনা এবং অস্পৃশ্যতার অন্ধকূপ খনন করে আপন শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করেছিলেন সেদিনের মাতব্বর মহাজনেরা। সামন্ত সভ্যতার প্রতিভূ ব্যক্তিবর্গ নিম্নবর্গের মানুষকে ভূমিদাসে রূপান্তরিত করেছিলেন। সামন্ত সভ্যতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পরম্পরিত রূপ – অন্ধকার গোলকের এপিঠ ওপিঠ। তবুও নরকের মাঝে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখে। ধান্য সংস্কৃতির আজ অনেককিছুই অবলুপ্ত। তবুও বাঙালির আসক্তি-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা ও অপূর্ণতার অনেককিছুই আজ সুপ্ত বিবেকী যন্ত্রণার মত গোপন রয়েছে ধান্যসংস্কৃতির মধ্যে।

হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থে ধান্যসংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় আছে। ঋগ্বেদ ছাড়াও বাল্মীকি রামায়ণে কৃষির উল্লেখ আছে। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন, ধার্মিক রাজা জনক একদিন যখন ক্ষেতে চাষ (ক্ষেত্র কর্ষণ) করছেন, তখন লাঙলের ফাল থেকে ('লাঙ্গল পদ্ধতি') এক কন্যা উত্থিত হয়। ক্ষেত্র কর্ষণ করার সময় সীতা ('লাঙ্গল-পদ্ধতি') থেকে সেই কন্যা লাভ করেছিলেন বলে, তাঁর নাম সীতা হয়েছে। সীতা ছিলেন মৃত্তিকা উত্থিত। মহাকবি লিখেছেন-

"অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা তত
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা"।[৪]

বাল্মীকি রামায়ণ থেকে বহু শতাব্দী পরে কবি কৃত্তিবাস আদি কবির কৃষি বাস্তবতার পুনরুল্লেখ করেছেন। সীতা কতখানি মৃত্তিকা উত্থিত, সেই কষ্ট কল্পিত মহাকাব্যিক কাহিনী অলৌকিকতার কারণে বর্জিত হতে পারে আধুনিক সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে। কিন্তু রাজা জনক যে লাঙল দিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে পারেন, তা কখনোই অবান্তর নয়। সেই রামায়ণের যুগেও গভীর অরণ্য কেটে কৃষি কাজের চিহ্ন রেখে যাচ্ছেন স্বয়ং আর্য নৃপতি। আর কবি কৃত্তিবাস সেই অগ্রজ কবিকে সম্মান জানাচ্ছেন সংযোজিত অনুবাদ শিল্পের ধরতায়-

"পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি
সহস্তে ক্ষেতেতে রাজা চষয়ে লাঙ্গলে।
ডিম্ব এক উঠে তাঁর লাঙ্গল শিরালে।।
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খানখান।
কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান।।
চাষভূমি হৈতে এই কন্যার জনম্।

তব কন্যা বটে এই করহ পালন"।।[৫]

আর অপরিস্কৃত অরণ্য কেটে প্রজা বসতির পাশাপাশি কৃষি পত্তনের ব্যবস্থাপক হিসেবে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতু চিরকালই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মহাভারতের অর্জুন খাণ্ডব দহন করে অরণ্য এবং প্রাণিকুলকে অসহায় করে তুলেছিলেন।বিনষ্টও করেছিলেন বটে। মুকুন্দরামের কালকেতুও অপরিষ্কৃত অরণ্য পরিষ্কৃত করেছেন। কিন্তু নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন করেননি তিনি। অপরপক্ষে আধুনিক সাহিত্যের বাঙালি কথাকার বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের সত্যচরণ অরণ্য ধ্বংসের প্রধান স্থপতি হয়ে রইলেন। মুকুন্দরামের কালকেতু অরণ্যের গাছ-গাছালি কাটার জন্য সহস্র 'বেরুনিঞা' (কাঠুরিয়া শ্রমিক) নিযুক্ত করেছিলেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"মহাবীর হাথে ধনু ফিরএ কানন
বন কাটে বেরুনিঞা জন
শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ
ওকড়া ধুথুরা কাটে অপাঙ্গ
আঁকড় কাটে সিঅলি নেহালী"।[৬]

বাংলা সাহিত্যে কালকেতু ছাড়া বৃক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কেউই এমন সুবিবেচক হতে পারেন নি। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, বৃক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কালকেতু কেটেছেন অনেক গাছ, আবার অনেক গাছ তিনি কাটেন নি। আসলে বনই যাদের জীবন, যাদের প্রাণ সেই অনার্য অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের তরুণ যখন প্রজাবসতির জন্য বৃক্ষচ্ছেদন করেন তখন তিনি সুবিবেচক হবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাঁর কলিঙ্গ নগরের রাজ্যপাট যে অনেক আর্য সামন্ত নৃপতির থেকে বেশি ভাল ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। কি কি গাছ রেখেছেন কালকেতু। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলের মূল কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে-	পাঠান্তরঃ
"কাঁটাল কদলি রাখিল গুআ	"মাগুরী পাগুরী কাটে শতমূলী।
অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া	ফলহীন জাম কাটিল কুলি।।
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গা।	রাখে জামরুল দ্রাক্ষা লবঙ্গ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা	..... রাখিল আর কামরঙ্গ।।
ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা	কাঁটাল কদলী রাখিল গুয়া।
টকর তুলসী রাখিল রাঙ্গন	অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া।।
করুনা কমলা ছোলঙ্গ টাবা	করুণ কমল ছোলঙ্গ টাবা।
তাল নারিকেল নগরে শোভা	ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা।
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন।	শঙ্কর পূজিতে রাখে বিল্ববন
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম	করবির কুন্দ করিল স্থাপন।
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম	টগর তুলসী রাখিল রঙ্গন

মূল বান্ধিল আনিআ থৈকর বক শেফালিকা রাখিল কাঞ্চন।
নৃপতি রঘুনাথ কৈল অবধান"।[৭] তাল নারিকেল থাকিল রোপা
মালতী মল্লিকা রাখিল চাঁপা। বটতরু রাখে ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখে জনবিশ্রাম"।[৭.ক]

কালকেতু অরণ্যের মধ্যে দ্রাক্ষা, লবঙ্গ প্রভৃতি গাছ-গাছালি যেমন রেখেছেন, তেমনি রেখেছেন অশ্বত্থ গাছ। আর শিবের পূজার জন্য রেখেছেন বিল্ববন। আর রেখেছেন মহাতরু বটবৃক্ষ। দেবী ষষ্ঠীর আবাসস্থল, যেখানে পথশ্রমে শ্রান্ত পথিক বিশ্রাম লাভ করেন। পরিশীলন কেবল কোন সভ্য জাতির একক নিজস্ব নয়। পরিশীলন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। ব্যাধ যুবক কালকেতু অনার্য বলেই যে শীলিত হবেন না, তা নয়। বরং নগরপত্তন ও বৃক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কালকেতু অনেক সুচিন্তিত সুস্থ ভাবনার পরিচয় রেখেছেন। প্রতিটি জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একথা সত্য। দেবী চণ্ডীর প্রদত্ত অর্থে কালকেতু যে শুধু নিজে শীলিত হয়েছেন, তা নয়। বরং একটা পশ্চাৎপদ অনগ্রসর নিম্নবর্গীয় জাতিকে শীলিত করেছেন। শুধু তাই বা কেন, কালকেতু যখন নগরপত্তন করেন, তখন সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি ছিল তাঁর সরল উদাত্ত আহ্বান। কৃষক বুলন মণ্ডলকে কালকেতু বলেছেন-

-"আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর
... ...
জত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।[৮]

কালকেতু মধ্যযুগের রাজা-রাজড়ার মত আধিপত্যবাদের প্রবর্তক হয়ে ওঠেন নি। মধ্যযুগীয় সীমিত পরিসরে যুগগত অনিশ্চয়তা এবং অবকাঠামোর মধ্যেও যথাসম্ভব শোষণহীন সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কালকেতু একনায়ক জমিদার নন। সহজ সরলভাবে তিনি সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের কর্মবৃত্তিকে সম্মান জানিয়েছেন। শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে সর্বমানবের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কৃষক প্রজা বুলন মণ্ডলকে আহ্বানের মধ্যে তাঁর ছিল সরল অন্তরের স্পর্শ। মধ্যযুগ তো বটেই, সেকাল-একাল সব কালেই তা দুর্লভ। আর বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের সত্যচরণের যন্ত্রণা জর্জর উক্তি – 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়'।[৯] –এক হতাশাদীর্ণ নায়কের অনুশোচনা। এমন আত্মপীড়ন ও আক্ষেপোক্তি কলকাতার গড়ের মাঠের দূষিত বাতাসকেও যেন বিষণ্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু জঙ্গল কেটে প্রজা বসানোই তো তাঁর চাকুরি। এই অসহায়তা হয়তো আমৃত্যু তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে।

।।তিন।।

"এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু পূজিতা বন্দিতা সদা।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী”।।[১০]

-তিনি লক্ষ্মীদেবী। সর্ব সম্পদ স্বরূপিণী তিনি। সকল ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। তিনি সর্বজনের দ্বারা বন্দিতা। 'দেবীভাগবতম্'- পুরাণে একথাও বলা হয়েছে, সেই দেবী স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী রূপে, মর্ত্যে তিনি রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মী রূপে বিরাজিত। তিনি সর্বমঙ্গলা। গৃহীর গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী। তাঁরই কল্যাণ অংশ দ্বারা গৃহে গৃহিণীরূপে , সম্পদরূপে শস্যে, বস্ত্রে, প্রতিমাতে, মঙ্গল ঘটে, মণিমাণিক্যে, চন্দনে, রমণীয় বৃক্ষশাখায় এবং নবমেঘে সৌন্দর্য-শোভা রূপে তিনি গৃহ ও প্রকৃতি পরিবেশে অবস্থান করছেন-

“স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শত্রুসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালে নাগলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।।
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেম্বেব গৃহিণাঞ্চ কলাংশতঃ।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গলমঙ্গলা।।

… … … … … … … … … … … …

সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ
প্রতিমাসু চ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষু চ
বৃক্ষশাখাসু রম্যাসু নবমেঘেষু বস্তুষু
বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ”।[১১]

দেবী লক্ষ্মী শুধু সম্পদের দেবী নন, তিনি কল্যাণের দেবী, তিনি সৌন্দর্যের দেবী। আমাদের দৈনন্দিন সাংবাৎসরিক কাজকর্মের সারাৎসারে সেই মঙ্গলময়ীর সারভূতা সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে লিখেছেন- “বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, ...আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ”।[১২] আমাদের কৃষকেরা রোদে পুড়ে জলে ভিজে অনাবাদি মাটিকে কর্ষণ করে আবাদি করে তোলেন। কার্তিকের হৈমন্তিক বিকেলের মৃদু হাওয়ায় সোনালী শস্য দুলতে থাকে। নবান্নের গন্ধে ম-ম-করে ওঠে পল্লি প্রকৃতি। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর এই শুভ অনুষ্ঠান পরিশীলিত জীবনচর্যারই অংশ। নবান্ন উৎসবের সুস্বাদু সুগন্ধী অন্ন লক্ষ্মীদেবী, গৃহদেবতা, পূর্বপুরুষ ছাড়াও গৃহপালিত পশু এবং কাকেদের উদ্দেশ্যে প্রথম নিবেদিত হয়। আমাদের দিন যাপনে শুদ্ধ কল্যাণী মূর্তি চিরন্তন সৌন্দর্যরূপে দ্যোতিত। নবান্ন উৎসব শস্যদেবীর মনস্তুষ্টি জনিত প্রয়াস। নতুন ফসল বন্দনার সবুজ উদ্ভাস। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নিমন্ত্রণ-সভা'-প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেন- “এবং আমাদের গৃহিণীগণের এই সকল আচার অনুষ্ঠানও যেমন বিচিত্র, নিমন্ত্রণের মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য আছে। ...আমাদেরও সেইরূপ ভাতের নিমন্ত্রণ, পূজার নিমন্ত্রণ, শুভ কর্ম্মের নিমন্ত্রণ, অরন্ধন, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, পিঠাপার্ব্বণ ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের

নিমন্ত্রণ আছে এবং তাহাতে আহারাদির ব্যবস্থারও যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সবশুদ্ধ অতিথিপরায়ণতা প্রাচ্য জাতির একটি বিশেষ ভাব। এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সামাজিকতায় এই আতিথ্যধর্ম্মের বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব হয়। আমাদের সকল ব্যাপারেরই অন্তরে অন্তরে যে একটি সাত্ত্বিক শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমুদয় আকর্ষণ”।[১৩]

বাংলা মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় শিল্প-সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ছন্দবন্ধনে নানা প্রজাতির ধানের উল্লেখ রয়েছে। সেকালের ধান্যসংস্কৃতির গৌরবময় অধ্যায় সহসা একালের পাঠকের মনোলোকে স্পষ্ট হয়। সেই সামন্ততান্ত্রিক অনতি পুরাতনী যুগের প্রায় বিস্মৃত উপকথার মত কৃষি ও কৃষক, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রাম, হাল-লাঙল-বলদ সম্পৃক্ত জীবনচর্যা এক ঝলকেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালি কৃষক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে কৃষি কাজের পদ্ধতিকে লালন করে এসেছে। চাষের প্রক্রিয়া শুরু হত বৈশাখ মাস থেকে। লোকমুখে যত্রতত্র ফেরাফেরি হত একটি পংক্তি – ‘চাষবাস বৈশাখ মাস’। বৈশাখ মাসে ‘ব্যান ধান’ ফেলার জন্য কৃষক শুকনো জমিকে লাঙল দিয়ে কর্ষণ করে কাঁকড়ি তলার উপযোগী করতেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঝে মাঝে যে বৃষ্টি হত, সেই বৃষ্টিতেই বীজধান থেকে চারাগাছ গজিয়ে উঠত। এই ধান ছিল আমন ধানের চাষ। বাঙালির কৃষি উৎসবে আমন ধানই প্রধান। এরপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের সবুজ চারাগাছ তরতরিয়ে উঠত। এই কাকড়ি তলার চারা খুবই টেকো হয়। অতিবৃষ্টি বা জলপ্লাবনে মাঠ ডুবে গেলেও এই ধান চারা বা ‘ব্যান’ সহজে বিনষ্ট হয় না। এমন কি, আষাঢ়- শ্রাবণে এই কাঁকড়ি তলার যে ধানচারা রোপিত হয়, সেই রোয়া ধানগাছও অতিবৃষ্টিতে সহজে পচে যায় না। বীজধানকে পল্লিচাষীরা ‘ব্যানধান’ বলেন। কাঁকড়ি তলার কিছু পরে আষাঢ়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে যখন ভারি বৃষ্টি হয়, তখন কৃষকেরা বীজধানের পেকো তলা ফেলানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। নির্দিষ্ট তলাক্ষেত্রে আল দিয়ে সেউনী বা সেনির সাহায্যে জল ছিঁচে লাঙল করে কাদা মাটি প্রস্তুত করেন। তারপর অঙ্কুরিত বীজ ধান বা কোলাধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বীজধান জলে ভিজিয়ে বস্তায় ভরে খড় বা কুড়োর মধ্যে রেখে অঙ্কুরিত করা হয়। পাঁকযুক্ত এই তলাকে ‘পেঁকোতলা’ বা ‘পেকুয়াতলা’ বা ‘প্যেচকুয়া তলা’ বলে। এই ধানের চারাগাছ কিছুটা নরম হয়। বীজ তলা যখন বেড়ে ওঠে, তখন তলাক্ষেত্রের আগাছা এবং ঘাস পরিষ্কার করে চারাগাছকে বড় করে তোলা হয়। ধানতলায় কোলা বীজের পেকোতলার ব্যান গাছ তত শক্ত-পোক্ত হয় না। এরপর চারাগাছ রোপণের পালা।

রোপণের পূর্বে জমি প্রস্তুত করার কাজ। এই কাজটি জটিল, শ্রমসাপেক্ষ। কৃষক তিনটি পর্যায়ে চাষযোগ্য জমি প্রস্তুত করেন। এটি হল লাঙল করার স্তর। প্রথম স্তর আগুয়াচিরা, দ্বিতীয় বড়ানি, আর শেষেরটি কাদা। এই তৃতীয় স্তরটি সম্পূর্ণ হলে তবেই

ধানচারা জমিতে রোপণ করা হয়। জমিতে যখন বৃষ্টির জল বা নদীর জল থই থই করে, তখন গ্রীষ্মের শুকনো জমির মাটি নরম হয়ে যায়। এমন কি ছোট বড় ঘাসও জন্মাতে থাকে, তখন কৃষক লাঙল-জোয়াল-গোরু-মই নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। আগুয়াচিরা বা এগুয়াচিরা সব থেকে কঠিন কাজ। যে গোরু এত শ্রম করে থাকে তাকে খেতে দেওয়া হয় চেঁচকো ঘাস, কথায় বলে- 'গোল গোরুকে চেঁচকো ঘাস'। কৃষকের দারিদ্র্য এর কারণ।কৃষক গোরুকে যত্ন করেন, পুজো করেন। শেকড় শুদ্ধ ঘাস কেটে কঠিন মাটিকে লাঙলের ফাল দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে উল্টে দেন কৃষক। আগুয়াচিরার ১০-১২ দিন পর বোড়ানির কাজ শুরু হয়। তার ফলে উলটে যাওয়া মাটিতে যে ঘাস থাকে তা পচতে শুরু করে। পচা ঘাস জৈব সারে পরিণত হয়। যে সরলরেখাতে আগুয়াচিরা হয়, বড়ানির সময় তাঁর বিপরীতধর্মী সরলরেখাতে লাঙল করা হয় । যুক্ত চিহ্নের (+) মত আগুয়াচিরা ও বড়ানিতে লাঙল করার ফলে জমির আর কোন অংশই কর্ষণ করতে বাকি থাকে না। আগুয়াচিরার পর মই দেওয়া হয় না। কিন্তু বোড়ানির পরে মই দিয়ে কাদা জমির অসমতল অংশকে সমতল করা হয়। বড়ানির পরেও ঘাস পচানোর জন্য জমিকে কম করে ৫-৭ দিন ফেলে রাখা হয়। রাখি পূর্ণিমার দিন হিন্দুরা গোয়াল পুজো এবং গোরু পুজো করেন।এই পুজোও প্রকৃতপক্ষে কৃষি সংস্কৃতির অন্তর্গত। এখানে গোরুকে স্নান করানো, পিঠে খাওয়ানো, শালুক ফুল খাওয়ানো প্রভৃতি এই কৃষি সংস্কৃতির অঙ্গ। এরপর চাষযোগ্য জমিতে ধান চারা রোপণের জন্য গোরুকে লাঙলের কাজে ব্যবহার করা হয়। মাটিকে লাঙল দিয়ে 'কাদা' করা হয়। আগাছা, ঘাস, পাতিঘাস বা চেঁচকো ঘাস যদি কিছু থাকে, তবে সেগুলিকে উপড়ে ফেলে কাদা জমি সমতল করা হয়। অবশেষে লাইন করে ধান চারা রোপিত হয়।

কৃষক যখন লাঙল করেন, তখন লাঙলের শিরা ধরে ধরে এগিয়ে চলেন। খুব ভারি জল থাকলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অসুবিধা হয়, তখন বাঁশের ছড়ি নরম মাটিতে পুঁতে পুঁতে লাইন ঠিক রেখে হাল নিয়ে এগিয়ে চলেন কৃষক। হালের প্রথম স্তর আগুয়াচিরার পরে মইয়ের ব্যবহার হয় না। বড়ানিতেই প্রথম মই দেওয়া হয়। মই দিয়ে জমির কাদা মাটি সমতল করা হয়। বড়ানির সময় গবাদি পশুর কষ্ট বাড়ে। লাঙলের সাহায্যে আগাছাকে উলটিয়ে দেওয়া হয়। ওপরে জল থাকার দরুন আগাছা পচে বড়বড়ে হয়ে ওঠে। তা জৈব সারে রূপান্তরিত হয়। মই ভারি মসৃণ কাঠের তৈরি। এটি শিল্পিত তক্তা জাতীয় বস্তু। গোরুর কাঁধে দড়ি দিয়ে পেছন দিকে মই বেঁধে তার উপর কৃষক বসে থাকেন। কখনো কখনো গোরুর লেজ মুড়ে দেন। কখনো ছড়ি দিয়ে পিঠে আঘাত করেন। গোরু চলতে থাকে। এবং মইকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে লাঙলের এবড়ো খেবড়ো মাটি মইয়ের সাহায্যে সমতল হয়। গোরু যাতে লাঙল করার সময় ঘাস বা জল খেতে না পারে, তার জন্য দড়ির তৈরি জাল গোরুর মুখাবরণ বা

জালতি রূপে ব্যবহার করা হয়। আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস ধরে এরকম হাল-লাঙল বা রোপণ কার্য চলতে থাকে। লোকসমাজে চাষ আবাদের উপযুক্ত প্রচুর বৃষ্টি হওয়াকে কাড়ান লাগা বলে। প্রবাদে পাওয়া যায়-

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে।
শাওনে কাড়ান ধানকে।।
ভাদুরে কাড়ান শীষকে
আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে।(১৪)

অর্থাৎ আষাঢ় মাসে ধান রোপণ করলে কেবল খড়ই হয়। শ্রাবণের রোপণে ভাল ফল হয়। আর ভাদ্রে কেবল শীষ হয়, কিন্তু ফলন ভাল হয় না। আর আশ্বিনের রোপণে কিছুই লাভ হয় না। ছোটোকালে বর্তমান প্রাবন্ধিকের পিতা এরকম একটি প্রবাদ বলে বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন –

" আষাঢ়ে রয় দলকে
শ্রাবণে রয় ফলকে
আশ্বিনে রয় শীষকে
কার্তিকে রয় কীসকে।"(১৪.ক)

মাসেদের মধ্যে অগ্রহায়ণ শ্রেষ্ঠ মাস। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন – "মাসানাং আর্গশীর্ষোহম ঋতুনাম্ কুসুমাকরঃ।" এই মাসে মাঠ থেকে ধান তোলা হয়। ধান যখন পেকে যায়, তখন কৃষক দীর্ঘ বাঁশ দিয়ে ধান গাছকে নুইয়ে দেন। একে ধানে বাঁশ দেওয়া বলে। এতে পাকা ধান হাওয়া বাতাস লেগে ঝরে পড়ে না। ধান কাটতে সুবিধা হয়। তারপরে সমগ্র অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস জুড়ে ধান কাটা, বিড়া বাঁধা ও ধান তোলা হয়। ধান কাটার পরে ধানের আঁটি বাঁধা, বোঝা বাঁধা, অবশেষে মাথায় বোঝা নিয়ে ধান খামারে রাখা হয়। দু'একটি ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও গোরুর গাড়ি ও ঠেলা গাড়িতে ধান খামারে আনা হয়। ধান আনার পরে লেপা-পোছা খামারে ধানের গাদা বা গাদি দেওয়া হয়। ধানের গাদা তৈরিতে বাঙালির শিল্প সৌন্দর্যের আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। বড় বড় ধানের গাদায় বহু ধানের আঁটিকে সুসজ্জিত করে ধাপে ধাপে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হয়। ধানের গাদা বাঙালির শিল্প সৌন্দর্যের বিচিত্র স্মারক। ধানের গাদা অনেকটা পায়রা টুঙ্গের মত হয়। কিছু কাল আগেও বড় বড় খামারে পাঁচ থেকে দশটি ধানের বড় গাদা পাশাপাশি বিরাজ করতো। বর্ষাতে ধানের গাদার মধ্যে যাতে জল না ঢুকতে পারে, তার জন্য গাদার ছাউনিকে ছাতা বা টুপীর বিশেষত্ব অনুসরণ করে নির্মাণ করা হত। গাদার পাশে জোল দিয়ে জল বের করার ব্যবস্থা থাকে। ধানের গাদা একালে প্রায় লুপ্ত লোকশিল্প। একালের ধানের গাদার সৌন্দর্য তেমন চোখে পড়ে না। বাঙালির অবলুপ্ত এই শিল্প কলাটির মধ্যে ধান্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কৃষক শিল্পীর সৃষ্টিশীল কৌশলী হাতের স্পর্শ ছিল একদিন। এরপর সময় মতো ধানের গাদা খুলে

ধান ঝাড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এরজন্য ধানের গাদার উচ্চ মুড়ি উন্মুক্ত করা হত। দুই চার করে ধানের আঁটি নামানো হত। বাঁশের পাটায় ধান ঝাড়ানো এবং ধান মাপক কাঠার সাহায্যে মাপজোখ করে ধান বস্তায় গুনে গুনে পরিমাপ করে গোলায় তোলা হয়। ধানের গোলা বাঙালি শিল্পীর প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের চমৎকার দ্যোতনা। এক অতুলনীয় শিল্পকর্ম। হারিয়ে যাওয়া এই শিল্পটি বাঙালি জীবনে অন্তরাগের বিষণ্ণ স্মৃতি বয়ে আনে। ধানের গোলায় লক্ষীমূর্তি ও গণেশ ঠাকুর আঁকা হত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'বিছন-পুড়া' – র উল্লেখ করেছেন। 'বিছন পুড়া' – হল ধানের গোলা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিছন-পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।"[১৪.খ]

ধূর্ত ভাঁড়ু দত্ত ধান রাখার জন্য কালকেতুর কাছে 'বিছন পুড়া'ও দাবি করে বসেছেন। কি না চান তিনি? কালকেতুর রাজ্যপাটও ছলে বলে কৌশলে দখলে নিতে চান। পারলে কালকেতুকেও কিনে নিতে চান।

এরপর ধান সেদ্ধ, শুকনা এবং ধান ভানিয়ে চাল তৈরির পর্ব। বেশিরভাগ সময় লাড়া এবং খড়কে জালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো তুষের আগুনে-উনুনে ধান সেদ্ধ করা হয়। সাধারণত ধান দু'বার সেদ্ধ করা হয়। তবে অবস্থা অনুযায়ী এক সেদ্ধও হয়। এরপর রোদে শুকিয়ে চাল তৈরির জন্য বতর দেখে নেওয়া হয়। ঢেঁকিশালে ঢেঁকিতে ধান ভানিয়ে, ধান ছেটে চাল তৈরি করা হয়। এসব কাজে বাঙালি রমণীদের কর্মঠ হাতের স্পর্শ রয়ে গেছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নিমন্ত্রণ - সভা' , প্রবন্ধে লিখেছেন – "বৈশাখ মাসে কাসন্দীর দিন। দুই দিন পূর্ব্ব হইতে বধূরা আসিয়া ঢেঁকিশালের মেঝ্যা ও সম্মুখের দাওয়াটি বেশ করিয়া নিকাইয়া দিয়া যায়। ...... ঢেঁকিতে বরণ করিয়া হুলুধ্বনিপূর্ব্বক প্রথম পাড় দেওয়া হয়। .... এমনি, কাসন্দীর পর কুলচুর, কুলচুরের পর বড়ি, কুমড়া কোটা, ডাল কোটা, সরুচুকলি ও পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, এক ঢেঁকি সালেই কত অনুষ্ঠান।" [১৪.গ]

মাঠ থেকে ধান তলা, চাল তৈরি, গাদা দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যে বাঙালি গৃহস্থ লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করেন। ধান ওঠার পর গৃহস্থের খামারেও উঠোনে 'লেবা' টানা হয়। শুদ্ধ নাকড়া দিয়ে সাদা মাটির সাহায্যে রাস্তা থেকে ঘর পর্যন্ত এই 'লেবা' টেনে দেবী লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। গেরস্থ লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যেই রাখতে চান। চালের পিটুলি গলা জলে তেল সিঁদুরের সাহায্যে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার দেবীর পুজো করে বাঙালি রমণী সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। লক্ষ্মীর ব্রতের উপাচার শস্যপূর্ণ কলস, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন সমন্বিত আলপনা, আম্রপল্লব, ধানছড়া, লক্ষ্মী পেঁচার চিত্র প্রভৃতি। লক্ষ্মীর পুজো করেন মূলত গৃহস্থ রমণীরা। এঁরা ব্রত পালন করে দেবীর মহিমা বিষয়ক পাঁচালি পাঠ করেন। বাড়ির বালক-বালিকারাও ছোটবড়

সকলেই ব্রতকথা শোনেন। এককথায় বাঙালির সংসারের নিত্য দিনের ক্রিয়াকর্মে তো বটেই, গৃহস্থ রমণীর মানসস্বাস্থ্য উজ্জ্বল হয় লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায়। সম্পদ কামনা শুধু নয়, গৃহস্থের ঘরদোর পূর্ণতায় ভরপুর হয়ে ওঠে। দেবী পূজা গ্রহণ করেন। দেবী লক্ষ্মী শ্রী-সৌন্দর্য ও কল্যাণের মথিত মূর্তি। লক্ষণীয়, ধান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই কি কৃষক ছিলেন? ধান্যসংস্কৃতি কি কেবল হিন্দুর সংস্কৃতি? উত্তর না। ধান্যসংস্কৃতির স্রষ্টা, রক্ষক এবং সঞ্চালক সকলে কৃষক ছিলেন না। সকলে হিন্দু নয়। ধান্যসংস্কৃতি অনেক বিস্তৃত। গবেষকদের গবেষণা অনুযায়ী, হিন্দু সমাজে নিম্নবর্গীয় মানুষ, মুসলিম সমাজের ক্ষেতমজুর ছাড়াও বর্গাদার নরনারী, যারা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। যারা কেবল শ্রম দিয়ে শস্য ফলায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধান, গম উৎপন্ন করেন, তারাই কৃষক। যারা রাজাকে, জমিদারকে ফসলের ভাগ রাজস্ব হিসেবে দিতেন, তারাই কৃষক। যারা ঋণ করেন এবং যারা এগারো মাস দুঃখ কষ্টে কাটায়। যারা ঋণ শোধ করেন, পুনরায় ঋণ করবেন বলে। যারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পাতা ফাঁদে সহজেই পা দেন, একরকম উপায়হীন ভাবে। যারা শান্ত, সরল এবং দুঃখকে নিয়তি বলে মনে করেন। যারা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়, রিক্ত থেকে রিক্ততর। শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়, তবুও টিকে থাকেন। যারা শুধু বাঁচার জন্য টিকে থাকেন। যারা জমিদার আর ইংরেজ শাসকদের হাতে নিপীড়িত হতে হতে রোদ্দুর ভক্ষণ করে কেবলই হা- হুতাশ করেন। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে এই কৃষক সম্প্রদায় শোষিত, নিগৃহীত হতে থাকেন। যারা ভূমিহীন চিহ্নিত হয়ে ওঠেন। মহর্ষি মনুর কাল থেকেই নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায় তথা ভূমিহীন কৃষক জনমজুর রূপে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

।। চার ।।

কৃষিসংস্কৃতি কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রবাদের মধ্য থেকে লোকসমাজে কৃষকের দুঃখ যন্ত্রণার ব্যথিত ছবি তীক্ষ্ণধী সামাজিকেরা রেখে গেছেন। কিন্তু কৃষকের সমস্যার কোন সুস্থির সমাধান নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আশা মরিতে মরিতেও মরে না। তিনি ‘শিক্ষা’ প্রবন্ধে লিখেছেন – “ আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও” [১৫] আর সম্বৎসর আশায় আশায় থেকে সময় কেটে যায় চাষার। অবশেষে আসে আষাঢ় মাস। অনেক অনেক যন্ত্রণাকে হৃদয়ে লালন করেন কৃষক। পাষাণ চাপা দিয়ে যন্ত্রণাকে ভুলে থাকা কৃষক আষাঢ় মাসের প্রতীক্ষায় থাকেন। প্রবাদে পাই – ‘আষাঢ় মাস, চাষার আশ।’[১৬] ধান্যকেন্দ্রিক প্রবাদের সংখ্যাও অনেক । কেননা, বারোমাসই তো চাষ-বাস নিয়ে থাকেন কৃষক। ধান্যসংস্কৃতি কেন্দ্রিক এমন উল্লেখযোগ্য প্রবাদ হল –

(ক) ‘ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা’।[১৭]

(খ) ‘ধান নেই তার মান বড়’।[১৮]

(গ) 'ধান নেই চাল নেই, আড়িটি ডাগর।[১৯]
(ঘ) ধান সিদ্ধ বড় কাম, মাথা বেয়ে পড়ে ঘাম।[২০]
(ক) সংখ্যক দৃষ্টান্তে কম ব্যয়ে কম শিক্ষালাভের কথা বলা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষার জন্য অর্থ যে গুরুত্বপূর্ণ সেদিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। 'খ' – সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রবাদকার বলেছেন, ধান অর্থকরী ফসল। ধান লোকসমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তির নির্ণায়ক। সুতরাং যার বাড়িতে ধান থাকে না, তিনি স্বাভাবিক ভাবে অপাংক্তেয় হয়ে ওঠেন। তাকে কেউ খাতির করেন না। 'গ' – সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রবাদকার বলেছেন, ধানের সঙ্গে ধানের মাপক বস্তুটিরও সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যেখানে ধান চালই অপ্রতুল, সেখানে শস্য পরিমাপক তিন কাঠা আড়ির বাহুল্য কোনোক্রমেই বাঞ্ছিত হয়ে ওঠে না। তিন কাঠার মাপক বস্তু কখনই স্বল্প শস্য মাপকের পরিপূরক ও সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। 'ঘ' – সংখ্যক দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে, শুধু কৃষক রোদে পুড়ে জলে ভিজে ফসল ফলায় না। ধান গোলাজাত করার পরে, যখন তা নামিয়ে সেদ্ধ করা হয়, তখন সে আর এক কঠিন শ্রমের কাজ। উনুনের তাপে মাথা বেয়ে ঘাম ঝড়ে পড়ে। দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যপীড়িত কৃষক ও কৃষক রমণী এভাবেই সংবৎসরের জন্য দুঃখ যন্ত্রণার পাথর ঠেলে ঠেলে ধান সেদ্ধ করতে থাকেন। থাকেন তো থাকেন। ঘাম ঝড়ে পড়ে তো পড়ে। যন্ত্রণার বিরাম নেই।

কৃষকের দুঃখকে আমাদের এই জগদ্দল বাঙালি সমাজ দেখেন বড্ড উন্নাসিক দৃষ্টিতে। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রেই শোষণ এবং দারিদ্র্য কৃষকের সঙ্গী হয়ে ওঠে। অবশেষে কৃষককে সর্বনাশের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয় লোলুপ অর্থলোভী মহাজনেরা। চাষার দুঃখের অমারাত্রির আর অবসান হয় না। প্রবাদকার বলেন – "চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ আর সকল মাস সুখ"[২১] অনিবার্য শোষণ, অপুষ্টি আর ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী কৃষক জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকেন জীবনভোর। আর বৃত্তি পরিবর্তন? কৃষক বৃত্তি অবলম্বন করে অন্য কোন সম্প্রদায় বেঁচে বর্তে খেয়ে পরে ভালভাবে থাকতে পারেন না। কৃষিকাজের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। লোকায়ত সমাজও সেই হতভাগ্য কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করল কই? ড. সুশীলকুমার দে'-র সংগৃহীত একটি প্রবাদে পাওয়া যাচ্ছে –

"খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
কাল করল তাঁতী এঁড়ে বাছুর কিনে।"[২২]

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে কৃষিসংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন যে কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে তিনি তা দেখিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে যখন ধানি জমিতে জল জমে যায়, তখন বাঁধ কেটে জল বের করার দরকার হয়ে পড়ে। তা না হলে ধানগাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়। একশ বিঘের মাঠটা ডুবে গেছে। জমিদার বেণীবাবু জল আটকে রেখেছেন। উপায়ান্তর না দেখে রমেশ এসেছে রমার কাছে। রমেশ রমাকে

বলেছে –“ জল বার করে দেবার জন্য তোমার মত নিতে এসেছি।”(২৩) রমা মত দিলে না। রমেশ নিজে পেশাদার লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাতে ভূপতিত করে নিমেষে সরিয়ে দিয়ে বাঁধ কেটে ধান রক্ষা করলেন। আকবর বেণী ঘোষালকে বলেছেন – “খবরদার বড়বাবু? বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি – ও পারি না। ..... ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লি জানতি পারতে ছোটো বাবু কি? (২৪) রমেশ যে এতবড় লাঠিয়াল , তা বুঝে উঠতে পারেন নি, রমা কিংবা বেণী ঘোষাল। সেকালে অনেক কৃষিক্ষেত্র ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। জমির দখল, ধান রোয়া, ধান তোলা প্রভৃতি নিয়ে জমিদারের সঙ্গে জমিদারের, জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের এবং কৃষকের সঙ্গে কৃষকের গ্রাম্য বিবাদ লেগেই থাকত । এ সমস্ত বিবাদগুলির সমাধান করত লাঠি। কথায় বলে – ‘যার লাঠি তার মাটি’।(২৫) কিংবা – আর একটি প্রবাদে পাই – “ লাঠি যার মাটি তার।”(২৬)

সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে কৃষি বিষয়ক ধারণাগুলি লোকসমাজে বিশেষ মান্যতা পেয়ে এসেছে। কৃষি বিষয়ক লোক অভিজ্ঞতাগুলিকে বলা হয় ‘খনার বচন’। লোকমান্য এমন ভবিষ্যৎবাণীতে আবহাওয়া, মাস- ঋতুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন, চাষবাস, শস্য উৎপাদন, খরা, বন্যা, বৃষ্টি এবং হাল লাঙল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। যেমন ড. সুশীলকুমার দে সংগৃহীত একটি ‘খনার বচন’ – এ পাওয়া যাচ্ছে – আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে যদি মুষল ধারে বৃষ্টি হয়, তবে দেশে অনাবৃষ্টি নেমে আসে। আর যদি রিমিঝিমি বৃষ্টি হয়, তবে পৃথিবী শস্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে –

“কি কর শ্বশুর লেখাজোকা। আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখ।।
যদি বর্ষে মুষল-ধারে। মাঝ সমুদ্রে বগা চরে।।
যদি বর্ষে ছিটে-ফোঁটা। পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিণী।”(২৭)

আর একটি প্রবাদে (‘খনার বচন’) – এ পাওয়া যাচ্ছে মাঘ মাসে যদি বৃষ্টি হয়, তবে দেশ পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে –

“যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।”(২৮)

শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে অভিজ্ঞ মানুষের দুরদৃষ্টিই এই শ্রেণির প্রবাদের উৎসভূমি। কৃষির অবস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্য নির্ণায়ক এমন বচনগুলি ‘খনার বচন’ রূপে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

শত শত বছরের নিপীড়ন, অত্যাচার, অনাচারে কৃষকের মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে। সামন্ততন্ত্র যখন ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছিল, বুর্জোয়া শিল্প সভ্যতার অভ্যুদয় যখন একরকম নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিল, সেই টানাপোড়েনে, সহজ কথায় দ্বন্দ্ব-সংকটের আবর্তে সহায়-সম্বলহীন কৃষক বৃত্তি পরিবর্তন করেছে। নিজের সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ত্যাগ করে মুসলমান

হতভাগ্য দারিদ্র্য পীড়িত চাষা গফুর মেয়ে আমিনাকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। এ গল্পের কাহিনী শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুরকে নিয়ে।

জমিদার তর্করত্ন প্রায়শ্চিত্তের জন্য গফুরের ভিটে বেচতে চান? তাই লোক পাঠিয়েছেন আর গফুর জানেন চটকলে মেয়েদের ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত - আব্রু থাকে না। তবুও তাকে যেতে হবে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র শাসিত জমিদার তর্করত্ন দরিদ্র কৃষক প্রজা গফুরকে রাখলেন কই? যাত্রাকালে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে মুখ তুলে গফুর আল্লার উদ্দেশ্যে বলেছেন – "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।"[(২৯)] গফুর ভারতীয় কৃষক সমাজের জীবন্ত ফসিল। যিনি চলমান। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আগুন ঝারানো রক্তচক্ষুর লাভাস্রোত তাকে অর্ধদগ্ধ করেছে। আজও ধুকতে ধুকতে মৃতপ্রায় তিনি হেঁটে চলেন। হয়তো চটকলে কাজ করেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কৃষককে মাটির অধিকার তো দেয় নি। হয়তো ধুলো-কালির নরকের মধ্য থেকে রাতের আকাশকে গফুর আজও মাঝে মাঝে অপলকে দেখে থাকে। আর কলঙ্কের কালি সারা গায়ে মেখে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া কাপড়ের বিছানায়। কৃষক হারিয়েছে অনেক কিছু। শেষ সম্মানটুকুও। যে কৃষক ত্যাগে, তিতিক্ষায়, কঠিন শ্রমে মানুষের জন্য ধান উৎপাদন করে, অন্ন সংস্থান করে , কিন্তু সেই কৃষক নিজের অন্নের সুরাহা নিজে করতে পারে না। কৃষকের ঘামে রক্তে উৎপাদিত অন্ন জমা হত বড়লোকের মরাইয়ে। আর এখন মজুত হয় কল মালিকের চালকলে। কলকাতার বড়লোক-সাহেব সেই চালে সওদা করেন। দেশ বিদেশের ধাঁ-চকচকে বিগবাজারে কৃষকের ঘাম- রক্ত এভাবেই প্যাকেট-জাত হয়ে বিক্রি হয়। কৃষক আর বলিষ্ঠ নয়। সে হারিয়েছে অনেক কিছু। অবশেষে আত্মসম্মানটুকুও। বাঙালি রমণীর পিঠে-পুলি অনুষ্ঠান আজ উপকথার মত হারিয়ে যাওয়া বিস্মৃত স্মৃতি মাত্র। কৃষক বধূ আজ আর ভাতের হাঁড়ি শিকায় তোলে না। আজ কৃষক রমণী একশো দিনের মাটি কাটার কাজ করেন, আবার কাজ হারায়। এখন তিনি নারী শ্রমিক, মজুর-গৃহ পরিচারিকাও বটে। আমাদের ক্লান্ত দিন যাপনে রূপকথার ভাতের হাঁড়ি তবুও ফিরে ফিরে আসে। রূপকথার শঙ্খ মালার দেশ। ভাতের হাঁড়ির গন্ধ ম-ম-করে ওঠে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদার ঝুলি' র সেই কাঠুরাণী ভাতের হাঁড়ি শিকায় তুলে রাখেন – "না, বেলা ক্রমে আরও বাড়িল, - ময়ূর ময়ূরী পাখা ছাড়িল, শালিক-শারী ধূলি - স্নান করিল, তখন, কাঠুরাণি, ব্যস্ত হইয়া, ভাতের হাঁড়ি সিকায় তুলিয়া রাখিয়া, ঝাঁপের দুয়ারে নিম গাছের ডাল খানা পুতিয়া থুইয়া এক কলসী কাঁখে এক কলসী হাতে বাহির হইল।"[(৩০)] সেদিনের সেই কৃষিসংস্কৃতি আজ বিপন্ন।

কৃষক দারিদ্র্য পীড়িত এমন জীবনের মধ্যেও হতাশা এবং বিষণ্ণতাকেও কাটিয়ে উঠে। ফসলের অপেক্ষায় থাকে। এমন একটি সংস্কৃত শ্লোক, যা প্রবাদরূপে প্রচলিত হয়ে সমাজমান্যতা অর্জন করেছে। সেখানে বলা হয়েছে – যে অন্ন ভোজন করলে সহজে জীর্ণ হয়ে যায়, সেই অন্নই প্রশংসনীয়। আর যে শস্য ক্ষেত থেকে বাড়িতে আনা হয়েছে সেই শস্যই প্রশংসনীয় –

"শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্
জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ
ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাম্
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং
শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্।।"[৩১]

তথ্যসূত্র :

১। রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খণ্ড, ৪ মণ্ডল, সূক্ত ৫৭, ঋক ৪,৮, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৫৩২

২। Karl Marx, Das Capital, Includes vol. I, II and III, Fingerprint classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2020, P. 114

৩। Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, Popular Prakashan, Bombay, 2002, P. 25

৪। মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৫

৫। কৃত্তিবাস ওঝা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সম্পা. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা-ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫০-৫১

৬। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সম্পা. সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লি, রবীন্দ্র ভবন, ১৪১৩, পৃ. ৬৯

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৭.ক। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ১৫৩

১০। পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৯৪৬

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪৫-৯৪৬
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৩১, ৬৩৪
১৩। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিমন্ত্রণ-সভা, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪৩৩
১৪। সুশীল কুমার দে (সম্পা), বাংলা প্রবাদ, কৃষি সম্বন্ধীয় খনার বচন, এ.মুখার্জী এণ্ড কো.লি.কলকাতা, ভাদ্র-১৩৫৯, পৃ. ৮২৫
১৪। (ক) ব্যক্তিগত সংগ্রহ। বর্তমান প্রাবন্ধিকের পিতা কৃষিবিষয়ক এই বচনটি শোনাতেন।
১৪.খ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সম্পা. সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লি, রবীন্দ্র ভবন, ১৪১৩, পৃ. ৭৩
১৪।(গ) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিমন্ত্রণ-সভা, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪৩২
১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৫৭২
১৬। সুশীলকুমার দে (সম্পা.), বাংলা প্রবাদ, প্রবাদ সংখ্যা- ৬৬৯, এ.মুখার্জী. এণ্ড কোঃ লি., কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৯, পৃ. ১৪৮
১৭। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ৪৩৭১, পৃ. ৪৫৪
১৮। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ৪৩৭৮, পৃ. ৪৫৪
১৯। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ৪৩৭৫, পৃ. ৪৫৪
২০। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ৪৩৮৮, পৃ. ৪৫৫
২১। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ২৯৯৪, পৃ. ৩৩৯
২২। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ২১৬৪, পৃ. ২৭০
২৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পল্লী-সমাজ, শরৎরচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৩২
২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
২৫। সুশীলকুমার দে (সম্পা.), বাংলা প্রবাদ, প্রবাদ সংখ্যা- ৭২১৯, এ.মুখার্জী. এণ্ড কোঃ লিঃ, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৯, পৃ. ৬৭৫
২৬। পূর্বোক্ত, প্রবাদ সংখ্যা – ৭৭৫২, পৃ. ৭১৪
২৭। পূর্বোক্ত, কৃষি সম্বন্ধীয় খনার বচন, পৃ. ৮২৫
২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৬

২৯। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেশ, সুনির্বাচিত ছোটগল্প, সম্পা. - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৭৯
৩০। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শঙ্খমালা, ঠাকুরদাদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ৩১৫
৩১। সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত, সরল বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী, চতুর্থভাগ, নিউ বেঙ্গল প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ – ১৯৮৪, পৃ. ১৫১২

মধ্যবিত্তের সংকট ও স্বরূপ উন্মোচন ও সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, রানাঘাট কলেজ

সারসংক্ষেপ : চল্লিশের দশক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তরী ঘটনা ঘটে যায়। ত্রিশের দশকের গল্পকারগণ সেই প্রথম রাবীন্দ্রিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্রপথ গ্রহণ করলেন। দ্বান্দ্বিকতাময় গল্পভুবনের পথ ছেড়ে ছোটগল্প দুটি ধারায় তা প্রবহমান হল।

এই সময়ের ছোটগল্পের একটি বিশেষ মাত্রা হল, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা, সুবিধাবাদ ও অমানবিকতার খোলসটিকে ছিঁড়ে ফালাফালা করে জীবনযাপনের প্রাণবন্ত সত্যটিকে লেখনীর মাধ্যমে কাহিনীতে প্রতিফলিত করা। কালাভিঘাত অর্থাৎ যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, তেভাগা, অগাস্ট বিপ্লব -- এ সবেরও প্রভাব এই সময়ের গল্পে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

এই বৈশিষ্ট্যময় মধ্যবিত্ত মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশের কলমকার ছিলেন সুবোধ ঘোষ। লেখকজীবনের আটাশটি(১৯৪০-১৯৬৮) বছরে সুবোধ প্রায় ১৫৭টি গল্প লিখেছিলেন। সেখানে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে চিত্রায়িত করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির শঠতা,বঞ্চনা,নীচতা, ভীরুতা, সুবিধাবাদ,আত্মপ্রবঞ্চনা, ঘৃণ্য আপসকামিতা জাতীয় ক্ষতিকারক দোষসমূহ। এই শ্রেণীর মুখোশ খুলে আলগা করতে তাঁর মতো দক্ষ রূপকার গল্পজগতে বিরলপ্রায়। প্রাবন্ধিক জগদীশ ভট্টাচার্য বলছেন,' বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর মতো সুবোধ ঘোষকেও নূতন গদ্যরীতির স্রষ্টা বলা যায়'।

সৃষ্টির ভাবনা জীবনবোধের ভাবনা। জীবনসত্য এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের ভাবনাও বটে। সফল সাহিত্যিক মনে মনে একটা বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। তিনি সত্য বলেন, সুন্দর করে বলেন। এই মেলবন্ধন তখনই সম্ভব যখন লেখকের ভেতরে থাকে একটি সুন্দর মন, সুন্দর আত্মা। সেই অন্তরের সৌন্দর্য রচনায় ফুটে ওঠে।

মূলশব্দ : মধ্যবিত্ত, সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলা ছোট গল্প, বাস্তববাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ।

মূল লেখা

কোন লেখকের মধ্যে সামসময়িক প্রেক্ষিত সাহিত্য রচনায় এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তরী ঘটনা ঘটে যায়।

ত্রিশের দশকের গল্পকারগণ সেই প্রথম রাবীন্দ্রিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্রপথ গ্রহণ করলেন। দ্বান্দ্বিকতাময় গল্পভুবনের পথ ছেড়ে ছোটগল্পের দুটি ধারায় তা প্রবহমান হল।

এক, কল্লোলীয় বিদ্রোহী বাস্তবতা আর মোহময় ভাববিলাস যেখানে কাহিনীকার বিশ্বাস করতেন, মানুষকে তার আটপৌরে জীবন থেকে শুরু করে জৈবক্ষুধা, মনোবিকার, আদিমতাসহ পুরোটা ধরতে হবে। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র,অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক প্রমুখ ও দ্বিতীয় ধারাটি হল বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর জোরাল কলম ও জগদীশ গুপ্তের পাল্টাস্রোতের জীবনভাবনা তথা জীবনানন্দের শয়তানি চক্রের মায়াপ্রভাব।

ছাড়াও এই সময়ের ছোটগল্পের একটি বিশেষ মাত্রা হল, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা,সুবিধাবাদ ও অমানবিকতার খোলসটিকে ছিঁড়ে ফালাফালা করে জীবনযাপনের প্রাণবন্ত সত্যটিকে লেখনীর মাধ্যমে কাহিনীতে প্রতিফলিত করা। কালাভিঘাত অর্থাৎ যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, তেভাগা, অগাস্ট বিপ্লব -- এ সবেরও প্রভাব এই সময়ের গল্পে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

যাই হোক, এই বৈশিষ্ট্যময় মধ্যবিত্ত মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশের কলমকার ছিলেন সুবোধ ঘোষ। লেখকজীবনের আটাশটি(১৯৪০-১৯৬৮) বছরে সুবোধ প্রায় ১৫৭টি গল্প লিখেছিলেন। সেখানে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে চিত্রায়িত করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির শঠতা,বঞ্চনা,নীচতা, ভীরুতা, সুবিধাবাদ,আত্মপ্রবঞ্চনা, ঘৃণ্য আপসকামিতা জাতীয় ক্ষতিকারক দোষসমূহ। এই শ্রেণীর মুখোশ খুলে আলগা করতে তাঁর মতো দক্ষ রূপকার গল্পজগতে বিরলপ্রায়। প্রাবন্ধিক জগদীশ ভট্টাচার্য বলছেন,' বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর মতো সুবোধ ঘোষকেও নূতন গদ্যরীতির স্রষ্টা বলা যায়'[১]।

চল্লিশের দশকের পূর্বে সাধারণভাবে প্রেমচর্চাই ছিল প্রধান কিন্তু চল্লিশের দশকে প্রধান হয়ে উঠল রাজনীতি চর্চা। বিশ্ব মহাসমর এবং তার আনুষঙ্গিকের ধাক্কায় দ্রুত সংগঠিত হচ্ছিল সমাজের ভাঙন, ফলে মনোরাজ্যেও দেখা দিল আদর্শ সংঘাত। সুবোধ ঘোষের মধ্যে আছে তারই সার্থক রূপায়ণ।

সুবোধ ঘোষের বহু গল্প আলোচনা করে দেখা যায় সমাজ সচেতন সৃষ্টি হিসেবে সেগুলো উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু গল্প লিখেছেন। তার গল্প গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশটি। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', ''জতুগৃহ', ‘পুতুলের চিঠি’, ‘মনভ্রমরা’, ‘ভোরের মালতী’, ‘মণিকর্ণিকা’, ‘অর্কিড’, ‘সায়ন্তনী’, ‘নিকষিত হেম’, ‘রূপনগর’, ‘পলাশের নেশা’, ‘গ্রাম যমুনা', নানা গল্পসংগ্রহ ইত্যাদি। এককথায় বলা যায় সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পে উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী।

তিনি নিজেই বলেন, “আমার সাহিত্যকর্মের সাধ আজ ঈশ্বরবিশ্বাসের নতুন প্রদীপের কাছে এসে নতুন আলোর অভিষেক খুঁজছে। তাই থমকে থাকতে হচ্ছে। যদি সেই অভিষেক পাই, তবেই রূপে গুণে ভাবে ও প্রকারে নতুন বলে বোধ হবে, এমন

গল্প ও উপন্যাস লিখতে পারবো, নইলে পারবো না। ...... গল্প ও উপন্যাস লেখার সাহিত্যিক কর্ম এক ধরনের রিচুয়াল তথা বিশ্বাসের তর্পণ বলে মনে হয়েছে।'[২]

স্বভাবতই তখন সুবোধ ঘোষের জীবনবোধে ভারত-চৈতন্য, ভারত প্রেমকথা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পে উপন্যাসে বহু বিচিত্র সৃষ্টিতে তাঁর লেখনী আর সীমাবদ্ধ নয়। সিগমণ্ড ফ্রয়েড, ভারতের আদিবাসী, অমৃত পথযাত্রী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তাঁর বিচিত্র জ্ঞানপিপাসার ফসল।

সুবোধ ঘোষের গল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা, শাণিত দৃষ্টিভঙ্গি, চল্লিশের সূচনাতেই বিরাট সাড়া জাগায়। তাঁর প্রথম গল্প অযান্ত্রিকের (১৯৪০) নায়ক একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে ভালোবাসে তাঁর বহুদিনের জীর্ণ পুরাতন সেকেলে মোটর গাড়িকে। এই গাড়িই তার জীবনসঙ্গিনী। তার সেই ভালোবাসা যেমন প্রচণ্ড তেমনি তার বিরাগও ক্ষমাহীন। যে গাড়ি সম্পর্কে কারুর বিরূপ মন্তব্য তার অসহ্য ছিল সেই গাড়িকেই একদিন সে ওজন দরে লোহার ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিল। কোমলে কঠিনে এক অদ্ভুত গল্প। কিন্তু তার চেয়েও তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' বাংলা সাহিত্যের এক ল্যাণ্ডমার্ক।

সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্র কখনই এক সঙ্গে টিকে থাকতে পারে না । এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য। সামন্ততন্ত্র যেমন কৃষিপ্রধান ধণতন্ত্র তেমনি শিল্প প্রধান । কৃষিতে যেমন শ্রমিক দরকার, শিল্পেও তাই। অঞ্জন গড়ে খনি প্রতিষ্ঠা করে অভ্র অ্যাসবেস্টাস তোলা শুরু হতেই বণিকদের প্রয়োজন হয় কুলির । এলাকার নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীনদের বেশী পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে কুলির কাজে আকৃষ্ট করা হয় । কুর্ম প্রজারা কৃষিকাজ ছেড়ে দলে দলে খনির ধাওড়ায় নাম লিখিয়ে কুলি হয়ে গেল। এতেই সমস্যা দেখা দিল রাজ সরকারের কৃষিকাজে । রাজার জমিতে , রাজার বাগানে রাজার পোলো গ্রাউন্ডে কাজ করবার আগ্রহ আর কারো থাকল না । মহারাজার কৃষিকর্ম বন্ধ হতে বসল । মি. মুখার্জী বুঝতে পেরেছিলেন , প্রজারা বেশী প্রাপ্তির আশায় খনিতে কুলির কাজ করতে গেলে মহারাজার ক্ষতি হবে। সেই ক্ষতি রোধ করবার উদ্দেশ্যই তিনি কুর্মী নেতা দুলাল মাহাতোর কাছে এবং সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসনের কাছে নিজে গিয়েছেন। কিন্তু, সুরাহা কিছু হয় নি।

আসলে, বণিকরা কাজ পাবার জন্য কুলিদের নগদ মজুরি এবং কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতেন, সেটা দেওয়া রাজসরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই , মহারাজার পক্ষ থেকে কাজ করবার নির্দেশ এলে কুর্মী নেতা দুলাল মহারাজার কাছে নানা রকম আবদার করে বসে । তেমন আবদার করতে তাকে শিখিয়েছে গিবসন । একটি চিঠিতে দুলাল মহারাজা কে লিখেছে “.... এবছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে তাতে যেন সরকারি হাত না পড়ে । আইন সঙ্গত ভাবে সরকার কে যা দেয় , তা আমরা দেব ও রসিদ নেব ।”

দুলাল রাজনৈতিক নেতার মতোই কুর্মীদের একত্র করে বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়েছে " চিনে দেখ কে আমাদের দুশমন কে বা আমাদের দোস্ত । আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জত , এর উপর ছুরি চালাতে আসবে তাকে কোন মতেই ক্ষমা নয় ।" মহারাজা দুলালকে সমঝে দেবার জন্য দরবারে ডেকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। দুলাল দরবারে এসে বিনয়ের অবতার হয়েও মহারাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছে । তাতে জানিয়েছে " যেহেতু আমরা নগদ মজুরি পাই , না পেলে আমাদের পেট চলে না , সেই হেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ । ... আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে । রাজ তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয় ।... আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝরি আর লকরি ব্যাবহার করার অনুমতি হয়।"

এই সকল আবদার মেনে নেওয়া তো দূরে থাক , পড়া মাত্রই রাজার সামন্ততান্ত্রিক মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে । পুরুষানুক্রমে যারা মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে , তারা ন্যায্য প্রতিবাদও সইতে পারে না । অন্য কেউ সেই প্রতিবাদকে সমর্থন করলে তাকেও শত্রু ভাবতে শুরু করে । এই জন্যই যে বণিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে রাজ সরকারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল , তারাই পরে শত্রুতে পরিণত হলো । কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায় । এখানেও রাজ সরকার আর বণিকদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে অশিক্ষিত , দরিদ্র , সাধারণ মানুষের জীবনে বিপদ নেমে এসেছে । যখন দুই শক্তিশালী পক্ষ পরস্পরকে দুর্বল করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তৎপর হয়েছে , তখন আকস্মিকভাবেই খনির ১৪নং পিট ধ্বসে যায় এবং ৯০ জন কুলি চাপা পড়ে মারা যায় । এই সংবাদ পেয়েই মহারাজা আনন্দ সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । খুশি প্রকাশ করেছেন কারণ শত্রু বণিকদের দুর্বল করতে এই ঘটনাটা অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে । নিজেরই রাজ্যের এতগুলি প্রচার এই দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর জন্য রাজার মনে শোক জাগেনি । আবার পরে যখন জানা গিয়েছে মহারাজার ফৌজদার জঙ্গলে লোকরি কাটতে যাওয়া ২২ জন কুর্মী প্রজাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে, তখন মহারাজা শঙ্কিত হয়েছেন প্রজাদের মৃত্যুর কারণে নয়, শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হল বলে, বণিকরাও নিশ্চয় এই ২২ জন প্রজার মৃত্যুর দায় রাজ সরকারের উপর চাপিয়ে স্বার্থসিদ্ধ করতে চাইবে ।[৩]

সামন্ততন্ত্র ও বণিক তন্ত্রের সংঘাতে সাধারণ মানুষ, তথা শ্রমিক বা কুলিদের সমৃদ্ধি নেই । স্বার্থপরেরা স্বার্থের কারণে যেমন লড়াই করে, তেমনি স্বার্থের কারণে সন্ধিও করে । দুটি ঘটনায় শতাধিক গরীব মানুষ মারা গেল। সেই মৃত্যুর দায় যাদের, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ভয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঝামেলার ভয়ে তারা শত্রুতা ভুলে এক টেবিলে মিটিং এবং খানাপিনা করে মৃত্যুর ঘটনা দুটোকেই গোপন করার উদ্যোগ হল । সমস্ত লাশ রাতারাতি ১৪নং পিটে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হল । যার

মাধ্যমে দুর্ঘটনার কথা প্রশাসন ও আদালতের কাছে প্রকাশ হতে পারত , সেই দুলাল মাহাতো কেও হত্যা করে লাশ ফেলে দেওয়া হল পিটের গর্তে ।

গল্পের কাহিনীর নায়ক বা দ্রষ্টা মি. মুখার্জী র থেকে আমরা বুঝেছি, এই অসহায় শ্রেণীর মানুষেরা সামন্ততন্ত্র বা ধনতন্ত্রের কাছে কত তুচ্ছ , কত সাধারণ। সামন্ত তান্ত্রিক, জমিদার, ধনতান্ত্রিক বণিক, চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত আর শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষদের শ্রেণীর সংঘাতের ছবি এ গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ যেন আমাদের জাতীয় সংকটেরই প্রতিফলন। দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণা যেন বড় লোকদের কাছে ভাববার মতো কোনো বিষয়ই নয়। স্বার্থের কারণে পশুর মতো বলি দিলেও আপত্তি করবার কেউ নেই। এইখানেই গল্পের ট্রাজিক আবেদন। আর এইখানে ছোটগল্প হিসেবে “ ফসিল ” গল্পটির সার্থকতা।

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, `সত্যকে উপলব্ধি করতে হয় । যে লিখবে সেও উপলব্ধি করবে ; যে পড়বে সেও । উপলব্ধির অভাব আর কিছু দিয়ে ভরে না । এর জন্যে ডুব দিতে হয় জীবনযমুনায় । ... জীবন একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, তার পদে পদে দু:খ দৈন্য দ্বন্দ্ব । পদে পদে স্নেহ প্রীতি করুণাও আছে । নইলে চলা কবে থেমে যেত ! .. মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবলে দু:খ দৈন্য স্নেহ প্রীতি ইত্যাদির অর্থ হয় না । মানুষিক ভাবনার ঊর্দ্ধে উঠলে এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যায় ।'

এ কথাগুলো সুবোধ ঘোষের লেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে বাজে। জীবনযমুনায় ডুব দিয়ে নান্দনিক সঙ্গীতে শ্রবণ তৃপ্ত করা শুধু শিল্পীর কাজ নয়, এ কাজ দার্শনিকের ।

সৃষ্টির ভাবনা জীবনবোধের ভাবনা। জীবনসত্য এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের ভাবনাও বটে। সফল সাহিত্যিক মনে মনে একটা বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। তিনি সত্য বলেন, সুন্দর করে বলেন। এই মেলবন্ধন তখনই সম্ভব যখন লেখকের ভেতরে থাকে একটি সুন্দর মন, সুন্দর আত্মা। সেই অন্তরের সৌন্দর্য রচনায় ফুটে ওঠে।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টি একাকার হয়ে উঠেছে। একাধারে সাহিত্যিক এবং দার্শনিক হয়ে তিনি তাঁর লেখার জগতকে এক উচ্চতায় তুলে নিয়েছেন, অনায়াস সাবলীলতায় পাঠকের মননসঙ্গী হয়ে উত্তরণের মন্ত্র শিখিয়েছেন ।

তাঁর দুটি বিখ্যাত গল্প `অযান্ত্রিক' এবং `ফসিল' নিয়ে বাঙালি-অবাঙালি উভয় পাঠকমহলেই চরম আগ্রহ, সে দুটির আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করেই আরও অনেক ছোটগল্পের নাম করা যায়, যারা একে অন্যকে ছাপিয়ে উঠেছে । প্রত্যেকটি যেন উত্তাল সমুদ্রের নতুন ঢেউ । `সুন্দরম্', `পরশুরামের কুঠার', `গোত্রান্তর', `জতুগৃহ', `বারবধূ', `অলীক', `ঠগিনী', `শ্মশানচাঁপা' .. জীবন ও জীবিকার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের ছবি ।

`তিন অধ্যায়'[৪]-এর অহিভূষণ... লেখাপড়ায় ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি, মিউনিসিপ্যালিটির সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার হয়ে নোংরা খাকি হাফপ্যান্ট পরনে শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়, শহরের সব নালা নর্দমার পাশে বসে মেরামত করে । সেই অহিভূষণের ভদ্রলোক হবার প্রবল আকাঙ্খায় মজা পায় তার এককালের বন্ধুরাই, তারা আজ পেশাগতভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠিত কৃতি মানুষ । আছেন পুলিনবাবু আর তাঁর মেয়ে বন্দনা । বন্দনা হাসপাতালে কি একটা কাজ করে, ভদ্রলোকের সংস্কার অমান্য করে জীবিকা অর্জন করে । আর তার বাবা পুলিনবাবু পেশার কারণে সমাজের ভদ্রলোকদের কাছে শুধুই একজন `চামার' ।

একজন ভদ্রলোক স্কুলমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে অহিভূষণের বিয়ে ভেঙে দিতে বাধ্য হন ভদ্রলোক বন্ধুরা, সমাজকে অনিয়ম থেকে রক্ষার দায়ে ... তেমন করেই `হাসপাতালের জমাদারনী' মেয়ে বন্দনার ভদ্র পরিবারে বিয়ের সম্বন্ধটাও সমাজ ক্ষমা করতে পারে না, শীল আর আচারের প্রশ্নে । সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার অহিভূষণ, চামার পুলিনবাবু, জমাদারনী বন্দনার সমাজের ভদ্রলোকদের রুচিশীল জীবনের আসরে ও বাসরে আর জায়গা হয় না । সমাজের ভদ্রলোকরা নিজেদের পিঠ চাপড়ে বলেন, `কোনো অন্যায় করি নি আমরা, ওদের কোনো ক্ষতি করি নি, ওদের জীবিকাই ওদের কালচার নষ্ট করেছে । ওরা যা ওরা তাই । আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি ।'

বাস্তব সমাজের এমন নিপুণ ছবি দেখে বুকের মধ্যে টনটন করে, পাঠক নিজেকে অসহায়তার ঘেরাটোপে বন্ধ করে ফেলে, ঠিক যেমন করে চোখ বন্ধ করে সমাজের অন্য অত্যাচারগুলো দেখে।

গল্পের তৃতীয় অধ্যায়ে অদ্ভুত অপরূপ এক আলো । অহিভূষণের সঙ্গে বন্দনার বিয়ে । আর সে নরম আলো আকাশ বাতাস হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, যখন দেখি সে বিয়ের আসরে সব পুরোনো বন্ধুরাই হাজির... যারা ভদ্রলোক হওয়ার তাগিদে অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছিল, আজ এ বিয়ের আসরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অপরাধী ভূমিকার মুখোমুখি হয়ে উত্তরণের পথের যাত্রী।

উত্তরণের এই মন্ত্র সব গল্পে। প্রতিটি গল্পের উপাদান মানুষ; যথা অর্থের `মানুষ' । প্রতিটি গল্প উত্তরণের গল্প ; মনুষ্যত্বে উত্তরণের বার্তা। সে `পরিপূর্ণার'[৫] জয়ন্তী হোক, `খদ্যোত'-এর নীরজা কিংবা `সায়ন্তনীর' অনিরুদ্ধ। চোখ দিয়ে আমরা যেটুকু দেখি, সেই দেখাটাই সব নয় যে । `তাকানো' আর `দেখা' দুটি পৃথক শব্দ । অন্তরের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ অসামান্য, অপূর্ব, বিশিষ্ট ; সুবোধ ঘোষের লেখায় আমরা `দেখা' শিখি, অনুভব করতে শিখি, নিজেকে চিনতেও শিখি ।

`সাধ না মিটিল'[৬]-র কালীচরণ আর সনাতনীর ঘর, চিরকালের ঝগড়ার ঘর সংসার । বেশি কিছু নয়, সনাতনীর দাবী সামান্য, শুধু সোনার একজোড়া দুল । এই দাবীর বয়সটাও কম নয়, প্রায় কুড়ি বছর । দিতে পারেনি কালীচরণ । অনেক চেষ্টায়, অনেক খেটে আর ভাত-কাপড়ের দাবী অনেক কাটাছাঁটা করে মাঝে মাঝে বড় জোর

দশ বারো টাকা জমেছে, তারপরেই একটা না একটা অঘটন, একটা অসুখ, অথবা ভাঙাঘরের চালা সারাতেই সে টাকা শেষ হয়ে গেছে । সে দিনটা সনাতনীর মুখে হাসি ফুটবার দিন । ময়দানে মশলামুড়ি বিক্রী করতে গিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর সত্যি সোনার একটা দুল পেয়েছিল কালীচরণ । একজোড়া নয়, একটা দুল । স্বপ্ন দেখে স্বামী-স্ত্রী, আর গোটা পনেরো টাকা জোগাড় হলেই মাধব স্যাকরাকে দিয়ে আর একটা দুল গড়িয়ে নেওয়া যাবে । কিন্তু সে সাধ মেটে না সনাতনীর । কারণ মোক্ষম সময়ে জানতে পারা গেল যে, রমেশ মিস্ত্রীর মা-মরা মেয়েটার হারিয়ে যাওয়া দুল সেটা - সেই মেয়েটার আজ বিয়ে, মায়ের দুলজোড়া কানে দিয়ে বিয়ে হোক, এইটুকু চেয়েছিল রমেশ - ময়দানে মনের ভুলে সে দুল হারিয়ে এসেছে । অভাবী নির্ধন, অথচ অন্তরের ঐশ্বর্যে ধনী কালীচরণ সে দুল ফেরত দিয়ে আসতে দ্বিধা করে না, সনাতনী কেঁদে আকুল হয়, কিন্তু তারপর সুন্দর শান্ত হয়ে সাধ না মেটার কষ্ট মেনে নিয়ে রমেশ মিস্ত্রীর মেয়ের মুখখানা দেখার জন্যে ব্যস্ত হয় ।

`দণ্ডমুণ্ড'[৭]-এর অনুকূল গোঁসাইও এই মন্ত্রেই বুঝি জাতপাতের অনেক ওপর উঠে `মানুষ' হয়ে উত্তীর্ণ হয় । `পক্ষিতত্ত্বে'র মহেশবাবুর আবার মানুষজন্মে স্পৃহা নেই । তাঁর সিদ্ধান্ত, `পাখিরাই সুখী, কারণ পাখিদের মেয়ের বিয়ের জন্যে চিন্তা করতে হয় না' ... একটি মুখের কথায় সামাজিক একটি সমস্যার করুণ প্রকাশ । মানুষ জন্ম হলেই `মানুষ' হয়ে উঠতে পারলে সমাজের ছবিটাই বদলে যেত।

`শুক্লাভিসার'[৮]-এর দেবল ত্রিপাঠী... কলের চিম্নি কলোনি, বোম্বাইয়ের দাদার.. আর বরুত্রী । নরনারীর মিলন প্রণয়ের নতুন রাখী - `সঙ্কল্প' । সংসারে মানুষই মহাপুরুষ হয়ে ওঠে, সেই গল্প । আবার এ এক গভীর ভালোবাসার গল্পও । সমস্ত লেখকজীবন ধরে কত ভালোবাসার ছবিই না এঁকেছেন লেখক।

বাঙালি পাঠকের কাছে সুবোধ ঘোষ আর `ভারত প্রেমকথা' প্রায় সমার্থক শব্দ। পৃথিবীর অমর প্রেমকথাগুলোকে এক অনবদ্য ক্লাসিক সুরে গেয়েছেন তিনি, পড়তে পড়তে পাঠক তন্ময় হয়ে ওঠেন । মহাভারতের চরিত্ররা তাঁর কলমে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তাঁর `কিংবদন্তীর দেশে'[৯] সেইরকমই লোককথা ও উপকথা থেকে নেওয়া গল্পের সঙ্কলন । আদিবাসী জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি পাই তাঁর লেখায় । একইসঙ্গে লিখেছেন `ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' বা `অমৃতপথযাত্রী'-র মতো গবেষণাধর্মী লেখাও । ছোটগল্পের সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলেছেন একের পর এক উপন্যাস : `তিলাঞ্জলি', `গঙ্গোত্রী', `ত্রিযামা', `সুজাতা', `শুন বরনারী', `বসন্ততিলক', `জিয়া ভরলি', `বাগদত্তা', `রূপসাগর', `বর্ণালী', `বন্ধু গোলাপ', `এসো পথিক' - এমন অনেক উপন্যাস ।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে গ্রাম্য জীবন ও নগর জীবনের পার্থক্য সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পগুলির মধ্যে খুবই সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। সেই রকম ভাবে কোন বিস্তৃত নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব সে বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য তার উপন্যাস নেই। তবে ভার ছোট গল্প গুলির মধ্যে নগর জীবন এবং গ্রাম জীবনের মধ্যে অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সুস্পষ্ট ভাবে। ১৯৩৯ এর শেষে 'ফসিল' গল্পের মাধ্যমে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব বাংলা ছোটগল্পে এক কথায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঘরে বাস্তবতার এক অভিনব রূপ নিয়ে এলেন তিনি। গভীর আর্থ-সামাজিক চেতনা প্রখরতম বাস্তব জ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবন বোধ তাঁর সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। তিনি প্রথম থেকেই আত্ম প্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচক। তিনি মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, ঈর্ষা, নীচতা, সুবিধাবাদী প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এদিক থেকে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী। যেমন, 'ফসিল' গল্পে হতভাগ্য মজুরদের প্রতি লেখকের মমতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত মুখার্জির লক্ষ বছর, পরেকার স্বপ্নের আড়ালে। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'কালো গুরু' ও 'শিবালয়' গল্প দুটি। মধ্যবিত্তের মানসিকতার মনোবিশ্লেষণে তিনি যে নিপুণ শিল্পী ছিলেন। তার প্রমাণ 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'স্নানযাত্রা', 'গরল অমিয় ভেল' ও বারবধূ প্রভৃতি গল্প। প্রেমের গল্প রচনায়ও সুবোধ ঘোষ জীবনের জটিলতা ও রহস্যময়তাকে শাণিত দৃষ্টিতে উপহাসিত করেছেন। 'যতুগৃহ' গল্পে দেখানো হয়েছে ভালোবেসে বিবাহ করে বিচ্ছেদ ও তার পাঁচ বছর পর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পরস্পরের আলাপ চা পানির বৃত্তার। শতদল ও মাধুরীর চরিত্রের অঙ্কনে সরকার নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাই এই দুই নারীর কাছে যে প্রেম ছিল জীবনের সাথেয়, তাই একদিন মরে যায়। তাই দুজন স্টেশনের প্রতীক্ষালয় শুধুমাত্র আলাপ জমায়, কোন অতীত স্মৃতি তাদের ব্যাকুল করে না। আবার 'বারবধূ', 'ঠগিনী প্রভৃতি গল্পে দেখিযেছে প্রেম ব্যবসায়ীনিদের কাছে প্রেমের প্রভাব কতখানি। আবার 'শুক্লাভিসার' গল্পে প্রেম এসেছে নাগপঞ্চমীর ব্রত অর্চনার পথ ধরে, শুরু বাসন্তীর পূর্ণ চাঁদের মায়া ছড়িয়েছে। আসলে দাম্পত্য প্রেমনিষ্ঠার সনাতনী আদর্শের আড়ালে কত যে বিচিত্র চোরাগলি আছে, আছে কুটিলতা ও জটিলতা তাকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। এদিক থেকে তিনি জগদীশ গুপ্তের অনুসারী হলেও জীবন ভাবনায় দুজন পৃথক শিল্পী।

গল্পকে গল্প করে বলা, সেইসঙ্গে শিল্পের স্বচ্ছতম গুণটিকে ধরে রাখা - এই অনায়াস সিদ্ধিতে সুবোধ ঘোষ কথার জাদুকর । বস্তুত, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষের আসনটি সুচিহ্নিত । লেখকজীবনের সুচনাকাল থেকেই তিনি স্বমহিম । লেখক সারাজীবন তাঁর নিজের রচনার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে নিজের কথাই বলেন।

সুবোধ ঘোষ কখনও লিখেছেন প্রীতির কথা, বন্ধুত্বের কথা, ভালোবাসার কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বেষ-বিদ্বেষ-ক্ষুদ্রতা-বিফলতার কথা, জাতে প্রকৃতিতে গাঢ়তায় গভীরতায় মানবমনের নানা স্তরের নানা উপলব্ধির কথা। অমর এই কথাশিল্পী বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের মতো সব ছবি থেকে উত্তরণের ছবি এঁকেছেন।

তথ্যসূত্র:

(১) " সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প" - *সম্পা:* জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ ভবন (জৈষ্ঠ্য, ১৩৫৬) ১৯৪৯। পৃষ্ঠা - ১৬।

(২) সেদিনের আলোছায়া—সুবোধ ঘোষ, সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড), *সম্পা:* উত্তম ঘোষ ও সমীরকুমার নাথ, নাথ ব্রাদার্স, জানুয়ারি ১৯৯৮। পৃষ্ঠা -৫৮৯।

(৩) ফসিল - সুবোধ ঘোষ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড অ্যান্ড লিমিটেড। চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৭ (১৯৬৫০)

(৪) তিন অধ্যায় - সুবোধ ঘোষ, গল্প সমগ্র ২, সুপ্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী,১৯৬০। পৃষ্ঠা ৯-২০।

(৫) পরিপূর্ণা- পূর্বোক্ত । পৃষ্ঠা - ৩২-৩৮।

(৬) সাধ না মিটিল'- পূর্বোক্ত । পৃষ্ঠা ৭৯-৮৩।

(৭) `দণ্ডমুণ্ড - পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১০০-১১০।

(৮) শুক্লাভিশার- পূর্বোক্ত । পৃষ্ঠা ৫৯-৬৬।

(৯) কিংবদন্তীর দেশে - সুবোধ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশিং, ১৯৬১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যকৌতুক নাটকে ছোটদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ

রিয়া পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে সৃজনশীলতা নির্মাণ করেছিলেন তা প্রত্যেকের কাছেই অবশ্য স্বীকার্য। তিনি ছোট-বড় সকলের জন্যই লিখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সেগুলি কাব্য, গদ্য-রচনা, গান বা নাটক যাই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ লক্ষ করি। তাঁর নাটকের সংখ্যাও সুপ্রচুর। তিনি শিশুদের মন ও মস্তিস্ক দুটোই বুঝতেন সেই কারণে শিশুদের উপাদেয় এমন কিছু নাটক রচনা করলেন যেগুলি তারা পাঠ করলেও আনন্দ পাবে, আবার এগুলি অভিনয়যোগ্যও বটে। বর্তমানে আমরা শিশুদের সারাদিন পাঠ্যপুস্তকের চাপে এতটাই ব্যস্ত রাখি যে সেখানে তারা নিজেদের ইচ্ছে মতোন নিশ্বাসও নিতে পারে না। আবার একথাও বলা যায়, শিশুদের নিতান্ত অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখেও দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের বয়সটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন, এছাড়াও তাঁর নাটকে শিশুদের জন্য উন্মুক্ত চিন্তাভাবনা করে বাংলা শিশু সাহিত্যকে এক নতুন দিগন্ত দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত হাস্যকৌতুক নাটকগুলি অত্যন্ত মজার ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ দ্বারা রচিত। সেখানে তিনি ছোটদের নানান সমস্যাকে স্বল্প কথায় ব্যক্ত করে ক্ষুদ্র সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিস্ফুটিত করেছেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিশুদের জন্য যে নাটকগুলি সংযোজন করলেন সেগুলির উপাদানে বিচিত্রতা আছে এবং সর্বজনীন আবেদনের পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট নাটকগুলি নিখুঁত বর্ণনায়, চরিত্র বিন্যাস, সরল কথোপকথনে এক অভিনব হাস্যরসের ধারা তৈরিতে শিশু-কিশোরদের মনে যে ছবি এঁকেছেন তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫টি হাস্যকৌতুক নাটক রচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক নাটকগুলিকে মূলত আমরা নির্বাচন করেছি এবং সেখানে ছোটদের মনোজগতে এই নাটকগুলি কতটা প্রভাবিত হতে পেরেছে এই নিয়ে আলোচনা করব।

সূচক শব্দ : হাস্যকৌতুক, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, নাটিকা, মনস্তত্ত্ব।

মূল আলোচনা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাস্যকৌতুক বিষয়টিকে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে উত্থাপন করলেন। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং নিজেও একজন দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে

অন্যান্য নাটকের পাশাপাশি কৌতুকনাটকও অভিনীত হত। বালক রবীন্দ্রনাথ মাত্র ১৬ বছর বয়সে হাস্যকৌতুক নাটকে অভিনয় করেন। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেন-" যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের শিরোমণি নহেন। নটচূড়ামনিও বটে।"[১] অন্যদিকে অত্যন্ত স্বল্প বয়সেই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদিত ছোটদের 'বালক' পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন দীর্ঘদিন। এভাবেই ছোটদের জন্য তাঁর লেখার সূত্রপাত হয়েছে। তিনি সচেতন ভাবেই শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে একাত্ম অনুভব করেছিলেন। তাঁর হাস্যকৌতুক রচনাগুলি শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও বড়রাও এর স্বাদ আস্বাদনে ব্যর্থ হবে না। লেখকের এই ক্ষুদ্রনাটক গুলিকে আমরা নাটিকাও বলতে পারি, কারণ স্বল্প সময়ে একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার পরিনতিকে দেখানো হয়েছে কিছু সামান্য সংখ্যক চরিত্রদের দ্বারা। 'রবীন্দ্রনাথ দেশি ও বিদেশি উপকরণ দিয়ে নাটক সৃষ্টি করলেও কোথাও নিজের স্বকীয়তা নষ্ট হয়নি। শেক্সপিয়রের কমিডি কিম্বা দেশীয় যাত্রা থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও তাঁর সৃষ্টিশীলতায় নতুন নতুনতর হয়ে উঠেছে।'[২] তাঁর রচিত ১৫টি নাটক 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'অভ্যর্থনা', 'রোগের চিকিৎসা', 'চিন্তাশীল', 'ভাব ও অভাব', 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'আর্য ও অনার্য', 'একান্নবর্তী', 'সূক্ষবিচার', 'আশ্রমপীড়া', 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার', 'রসিক', 'গুরুবাক্য' এগুলি 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৩১৪ সালে 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' নামে গ্রন্থাকারে বের হয়। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন-

"এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড় (charade)- নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারাই অনুকরনে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল- আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায়িক কোন উদ্দেশ্য বা দর্শকদের চাহিদা পূরণ ও রুচি নিয়ে নাটক রচনা করেননি। এগুলি নিতান্তই অবাণিজ্যিক এবং শিশুদের বিশুদ্ধ হাস্যরসের তাগিদেই মনোযোগ দেন এই লেখাতে। এখানে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন হয়েছে হাস্যরসের মাধ্যমে। সমাজের অসঙ্গতি, শিশুদের মানসিক সম্যসার প্রতিফলনকে গুরুগম্ভীর বক্তব্য বা তত্ত্ব কথায় আলোচনা না করে কৌতুকের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে পরিস্ফুটিত করেছেন। 'কবি যাহাই বলুন এই কৌতুক নাট্যগুলি য়ুরোপীয় শারাড় এর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য নাই। ইহাদের হাস্যরসের মূল নিহিত আছে অস্বাভাবিকত্বে ও আতিশয্যে। কথোপকথনের মধ্যে এই অস্বাভাবিকত্বে একটা হাসির উচ্ছ্বাস আমাদিগকে উল্লসিত করিয়া আনন্দ দান করে।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত হাসির নাটকগুলিতে প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি, সহমর্মী মনোভাব ও শিশুদের মনের বিস্ময়, কৌতূহলকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটকের সাবলীলতাকে বজায় রেখেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি নাটকই চলিত ভাষায় লেখা। ছোটদের জন্য এই রকম নতুন চিন্তা, বাস্তব জগতের সাথে পরিচয়, সহজ সরল বাক্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া ছোটদের যে এক নিজস্ব কল্পনার ভুবন আছে সেখানে বহু কবি শিশুমন বুঝতে অসমর্থ ছিলেন কিন্তু কবি ছোটদের মনের বিচিত্র স্বাদ ও আকাঙ্খার সঙ্গে নিবিড় ঐক্য অনুভব করতেন। 'জীবনস্মৃতি' তে লিখেছেন-

"ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম। যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের ওপর কাজ করিয়া যাইত।"[৫]

এর থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যকে শুধুমাত্র অবাঞ্ছিত রূপে দেখেননি তিনি শিশুদের সাহিত্য মনস্ক রূপেও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর থেকে আমরা এক নতুন ধারার প্রবর্তন লক্ষ করি। এই যে নতুন হাস্যকৌতুকের সূচনা করেছিলেন লেখক 'বালক' পত্রিকায় তার ভূমিকাতে বলেছেন-

"সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না। ...বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলে মানুষী জ্ঞান করি- বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সে-গুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।"[৬]

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যকৌতুক নাটকগুলি নিম্নে আলোচনা করবো তাহলেই বুঝতে পারবো তার শিশুসুলভ মন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির কথা। হাসির নাটকগুলিতে বিপরীতধর্মী চরিত্র বা দুষ্ট চরিত্র সেভাবে লক্ষ করা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে নাটকের প্রয়োজনে এইসব চরিত্ররা থাকলেও তাদের মুখের সংলাপ ও উপস্থাপনা দুইই অভাবনীয়। সহজভাবে কোন জটিলতা ছাড়াই এই ক্ষুদ্র নাটকগুলি আকর্ষণীয় এবং এখানে সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রন ও লক্ষ করা যায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষতা ও প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা দেখতে পাই। নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন- 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তীব্র হাস্যরসবোধ এবং উইটের সংমিশ্রন ঘটেছিল। তাঁর হাস্য কৌতুকের রচনাগুলিতে আঘাত অপেক্ষা আমোদই বেশি। সংলাপ জাত হাসি উৎপাদনই যেন রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে আনন্দ পেতেন। এই 'উইট' মানে বুদ্ধির সূক্ষতা বা দীপ্তি।'[৭]

'ছাত্রের পরীক্ষা' নাটকটিতে আমাদের চিরপরিচিত মাস্টারমশায় ও ছাত্রের সম্পর্ক কেমন তা হাস্যপরিহাসের মধ্যে হলেও তার মধ্যে যে রুঢ় বাস্তব লুকিয়ে আছে সেটাই আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বদ্ধ পড়াশোনাকে মেনে নিতে পারেননি তার অনেক পরিচয় আমরা 'জীবনস্মৃতি' তে পেয়েছি। এখানে ছাত্র

মধুসূদনকে কালাচাঁদ মাস্টার পড়াতে এসেছে। অন্যদিকে ছাত্রের বাবা তার ছেলের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে সেই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করছে ছেলেকে। মধুসূদন এই সুযোগে তার মাস্টারকে তাড়ানোর ফন্দি আঁটে কেননা প্রতিদিন বেতের বাড়ি খেয়ে তার নাজেহাল অবস্থা। তার বাবা যা প্রশ্ন করে ইচ্ছে করেই সব ভুল উত্তর দেয়। এই কথোপকথন অংশটি অত্যন্ত মজার। নাটকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম তাহলে আমরা রবীন্দ্রনাথের অসাধারন হাস্যদীপ্ততার পরিচয় পাবো।

অভিভাবক। আচ্ছা উদ্ভিদ কাকে বলে বল দেখি।

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটি উদাহরণ দে।

মধুসূদন। কেঁচো !

কালাচাঁদ। (চোখ রাঙ্গাইয়া) অ্যাঁ ! কী বললি!

অভিভাবক। রসুন মশায়, এখন কিছু বলবেন না! (মধুসূদনের প্রতি) তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ; আচ্ছা, কাননে কী ফোটে বলো দেখি?

মধুসূদন। কাঁটা। (কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন) কী মশায় মারেন কেন? আমি কী মিথ্যে কথা বলছি?[৮]

মধুসূদনের শিক্ষার এই পরিণাম তার বাবা চাক্ষুষ দেখে সিদ্ধান্ত নেয় তার ছেলেকে নিজেই পড়াবে এবং এই বেতের প্রহারে দিন দিন তার ছেলে মূর্খে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে কালাচাঁদ মাস্টার পরিত্রাণ পেয়ে বলে – 'বাঁচা গেল মশায়! এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যানুয়াল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।'[৯]এই সমস্যা বর্তমানে সমস্তছোট বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকট রূপে দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নীরস শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ করে কৌতুকের ছলে এই নাটকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'পেটে ও পিঠে' নাটকটি তিনটি দৃশ্যে রচিত। এর মূল বিষয় তিনকড়ি নামে এক চতুর যুবক বনমালীর সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার সন্দেশগুলি বিভিন্ন ছলের সাহায্যে আত্মসাৎ করে। বনমালী কাঁদতে শুরু করলে তার বাবাকে জবাবে জানায় পাড়ার ছেলেরা সন্দেশ কেড়ে নিয়ে মেরেছে কিন্তু তিনকড়ি বনমালীকে সন্দেশ কিনে দিয়েছে। এই কথা শোনার পর তিনকড়িকে যারপরন্যায় যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে এসে পিঠে খাওয়াতে থাকে। কিন্তু তিনকড়ি অফুরন্ত খাবার পরও না বলে না এদিকে বাড়িতে সমস্ত পিঠেও শেষ। তখন দিদিমা তিনকড়ির পিঠে কিল দিয়ে বলে আর পিঠে খাবে? তখন তিনকড়ি পিঠে খাওয়া থেকে বিরত হয়। সকালে উঠে তার পেটে ব্যথা শুরু হয় তখন অনুভব করে 'পিঠে খেলে পেটে সয় না।'[১০]এই নীতিবাক্যটি রবীন্দ্রনাথ এখানে মজার ছলে ব্যবহার করেছেন।

'অভ্যর্থনা' নাটকে চতুর্ভুজ এম.এ পাশ করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছে অনেক বছর পর, সঙ্গে একটি মোটাসোটা কাবুলি বিড়ালও আছে। কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকের সাথে দেখা হলে চতুর্ভুজের কথা কেউ জানতে চায় না। সবার আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয় বিড়ালটি। এমনকি বাড়িতেও তার কোন যত্ন হয় না বিড়াল নিয়ে সবাই ব্যস্ত। তখন রেগে বিড়ালকে লাথি মেরে চতুর্ভুজ আবার শহরে ফিরে যায়, গ্রামের ছেলেরা তাকে 'কাবুলি বিড়াল' বলে রাগাতে থাকে। এখানে প্রকৃত অভ্যর্থনা হয় বিড়ালের। এই নাটকটি প্রকৃতপক্ষেই শিশুদের উপযুক্ত একটি হাসির নাটক।

'রোগের চিকিৎসা' চারটি দৃশ্যে রচিত একটি শিক্ষণীয় নাটক ছোটদের জন্য। হারাধন প্রতিদিন ডাক্তারদের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরি করে। এবার সে আস্ত হাঁসটাই চুরি করে নিয়ে এসেছে এই ভেবে যে তাদের বাড়িতেই এবার সব ডিম থাকবে আর চুরি করতে যেতে হবে না। চুরি করে এনে হাঁসটাকে জামার ভেতর লুকিয়ে রাখার পর সেখান থেকে হাঁসটা ডেকে ওঠে। বাড়ির লোক ভেবে অস্থির হয় হারাধনের পেটের ভেতর বুঝি কঠিন অসুখ হয়েছে। তার বাবা পুরো ঘটনা বুঝতে পেরে তাকে শিক্ষা দেবার জন্য সাহেব ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে। সেখানে ডাক্তারও সব বুঝতে পেরে বলে হারাধনের পেট কাটতে হবে নয়তো অসুখ সারবে না। হারাধন ভয়ে জামার ভেতর থেকে হাঁস বের করে সাহেবকে ফেরত দিয়ে বলে-' তোমার এ হাঁস কোনমতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভালো।'[১১]

'চিন্তাশীল' নাটকটিতে নরহরির অত্যধিক চিন্তা হয় যে কোন কথাতেই। সেই কথার উৎপত্তি কী এবং তার ব্যকরণগত অর্থ কী এইসব চিন্তা করতেই তার সময় বয়ে যায়, অথচ সে বাস্তব বোধহীন। এখানে কিছু মজার সংলাপ রয়েছে যা নিতান্তই ছোট ও বড় সকলেরই মন জয় করবে।

'ভাব ও অভাব' এখানে কুঞ্জবিহারী ও বশম্বদ দুজনের ভাব ও অভাব ভিন্ন ভিন্ন এই নিয়ে রচিত নাটক। কুঞ্জবিহারী তার বাগানের সৌন্দর্য দেখে সেইসময় বশম্বদ তার কাজের অভাব নিয়ে আসে। কিন্তু কুঞ্জবিহারী বাগানের ভাবে বিভোর সে কোন কথাতেই কর্ণপাত করে না। বশম্বদ তার কাজের কথা বললে এড়িয়ে গিয়ে মেঘের রূপের প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বশম্বদ কাশতে শুরু করলে বিরক্ত হয়ে পড়ে কুঞ্জবিহারী। সেই সময় ভৃত্য এসে খাবার দেওয়ার কথা বললে কুঞ্জবিহারী বেরিয়ে যায়। এই নাটকটি বিশেষত ছোটদের রসবোধে অসমর্থ হবে এবং হাস্যরসের ক্ষেত্রেও।

'রোগীর বন্ধু' নাটকে বৈদ্যনাথ অসুস্থ, তার সাথে পরিচয় হয় দুঃখীরামের। ট্রেন কিছুক্ষণ থামার পর তাদের আলাপ আরম্ভ হয়। দুঃখীরাম বৈদ্যনাথের অসুস্থতা লক্ষ করে তার মনোবল আরও ক্ষীন করে দেবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। প্রথমে তাকে জানায় তার ভাইয়ের ও মারা যাবার পূর্বে এই রকম লক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। এছাড়াও বর্তমানে ট্রেনটি যেখানে দাড়িয়ে আছে সেই গ্রামে মড়ক লেগেছে ও

সমস্ত মানুষ মারা গেছে। এই কথা শোনার পর বৈদ্যনাথের ঘন ঘন নিশ্বাস পতন হয় এবং মূর্ছা যায়।

'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটকের বিষয় একজন উকিলের কাছে দেশহিতৈষী যুবক আসে চাঁদার জন্য। উকিল দুকড়ি যুবকের কাছে চাঁদার কথা শুনে তাকে তাড়িয়ে দেয়। যুবকটি মনে মনে ফন্দি আঁটে জব্দ করার জন্য। সেইমতো এক সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেয় উকিল দুকড়ি বাবু পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন। এই খবরে উকিলও খুব খুশি হয়। তার পসারও বৃদ্ধি হয় এবং প্রচুর মানুষের আগমন ঘটে তার কাছে। তাদের আবির্ভাবের হেতু যখন জানতে পারে প্রত্যেকে কোন না কোন কারণে তার থেকে টাকা নিতে চায়। কারণ তার বদান্যতার পরিচয় ইতিমধ্যে প্রত্যেকেই পেয়েছে। সেই মুহূর্তে দুকড়ি প্রত্যেককেই বিতাড়িত করে। এত উৎপাত সহ্য করে শেষ পর্যন্ত উকিল নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। তার খ্যাতির এই বিড়ম্বনা রবীন্দ্রনাথ স্বল্প সংলাপে মজাদার করে তুলেছেন।

'আর্য ও অনার্য' নাটকটিতে আর্য জাতির পক্ষে চিন্তামণি কুণ্ডু বক্তব্য রেখেছেন, এবং অনার্য জাতির বিপক্ষে কথা বলেছেন। আর্য জাতির পক্ষে এমন সব যুক্তি দিয়েছেন যেগুলি নিতান্তই হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু এই নাটকটি কতটা শিশু মনের উপযোগী সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

'একান্নবর্তী' নাটকটিতে পরিবারের সকলে মিলে একসাথে থাকলে তা স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয় এই রকম বক্তৃতা সভাতে দৌলত সকলকে শুনিয়েছে। তাছাড়াও সে যে পরিবারহীন, নয়তো একমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে কীভাবে পরিবারের সাথে থাকতে হয় সেটা প্রত্যেকে অনুকরণ করত। এই কথা প্রচার হওয়া মাত্র দলে দলে তার বাড়িতে লোকজন আসতে থাকে তার দুসম্পর্কের আত্মীয় বলে। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও এখন থেকে দৌলতের একথাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেয়। এইরকম পরিস্থিতিতে পড়ে দৌলতের একেবারে হতভম্ব অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই একান্নবর্তী পরিবারের একসাথে থাকা নিয়ে যে পরিশীলিত ভাষায় হাসির উদ্রেক করেছেন তা সত্যই অভাবনীয় এবং দৌলতের আত্মোপলব্ধি ঘটিয়েছেন। তাই নামকরণটিও যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

'সূক্ষ্ম বিচার' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের 'ভাব ও অভাব' নাটকের কিছুটা পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলা যায়। এখানে কথার মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে, সেজন্য শিশু কিশোরদের মনে এটা কতটা প্রভাব ফেলেছে সে প্রশ্ন রয়েই যায়। 'আশ্রমপীড়া' নাটকটির বিষয়ও একই রকম। তবুও এই নাটকগুলি আসাধারণ বাকচাতুর্য ও মার্জিত সংলাপের কারণে এগুলির মূল্য রয়েছে।

'অন্ত্যেষ্টি-সৎকার' নাটকে এক বৃদ্ধের মৃত্যু আসন্ন ভেবে তার পুত্র পূর্বেই তার সমস্ত শ্রাদ্ধাদি কাজের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সময়মতো প্রত্যেক আত্মীয়কে নির্দিষ্ট সময়ে তার বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য পত্র প্রেরণ ও করে ফেলেছেন। ভোরের আলো

ফুটতেই সমস্ত লোকজনেরা একে একে সমবেদনা জানাতে উপস্থিত হলে পুত্র বেজায় সম্যসায় পড়ে কারণ তার বাবা এখন সুস্থ অসুস্থতার কোন লক্ষণই আর প্রকাশ পাচ্ছে না। সেই সময় বৃদ্ধ কৃষ্ণকিশোর বলে ওঠে- 'এতক্ষণ তোমরা প্রফুল্ল ছিলে, হঠাৎ বিমর্ষ হলে কেন? আমি তো ভালোই বোধ করছি।'[১২] এই রকম পরিস্থিতিতে ছোট থেকে বড় সকলের মনকেই অভিভূত করে এক হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটির মধ্যে আমরা বৈচিত্র লক্ষ করি এবং তিনি হাস্যরসের বিষয়েও যে যথেষ্ট সচেতন সেগুলি তাঁর কৌতুক মিশ্রিত সংলাপ গুলিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'রসিক' নাটকে রসিক নামের যুবক এবং তার কিছু সঙ্গী নিয়ে তারা সকলের সঙ্গে তির্যক ব্যঙ্গ করে ও অনবরত হাসতে থাকে। এগুলি অনেকের কাছেই অপছন্দের বিষয় কিন্তু তারা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করে না। ধীরাজ নামের এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তার বাড়ির সম্পর্কে বলেছেন –'ভেগ্নিসভার সভ্যি আর সভাপেত্নী'।[১৩] স্বভাবতই এই কথার মানে তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি। তখন তাকে বুঝিয়ে বলা হয় ভাগ্নিকে ভেগ্নি ও পত্নীকে পেত্নি বলা হয়েছে। এই শুনেই তিনি পলায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই নাটকের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এক হাসির পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিলেন সেজন্য এটি কখনই একঘেঁয়েমি মনে হয়নি।

'গুরুবাক্য' নাটকের নামটির মধ্যেই তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন সমস্যায় গুরুর কাছে এসেছে বিধান নিতে তাদের সমস্যাগুলিও বিচিত্র এবং হাস্যকর। যেমন- একজন শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে কুল দিয়ে এসেছে, কিন্তু এখন এই গরমের দিনে কুলটুকু বাদ দিয়ে যদি তার ঝোলটুকু খায় তাতে অপরাধ হয় কিনা জানতে এসেছে। অন্য এক ব্যক্তির নাম কার্তিক, তার ছোট শালার নাম কীর্তি। তার স্ত্রী নিজের ভাইকে কীর্তি বলে ডাকতে পারবে কিনা এটা স্থির করতে না পারলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সে সংসার করতে পারবে না। এদিকে গুরু তার জ্ঞানের দিক থেকে একেবারে অন্তঃসারশুন্য। শুধু কতগুলি অপ্রয়োজনীয় ও আবাস্তব কথা শুনিয়ে তাদের মন জয় করেছে। এদিক থেকে নাটকটি মনোরঞ্জনগ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে সকলের কাছেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'হাস্যকৌতুক'-এর মধ্যে 'আর্য ও অনার্য', 'সূক্ষ বিচার', 'গুরুবাক্য' এই নাটিকায় আর্যামি ও নব্য হিন্দুয়ানিকেই বিদ্রূপ করিয়াছেন। এই সমস্ত রচনার মধ্যে কবি মনের একটা আলোড়ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাছাড়া নব্যহিন্দু আন্দোলনের প্রতি কবির মনোভাবটি প্রতিফলিত হইয়াছে।[১৪] রবীন্দ্রনাথের অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর হিসাবে এই নাটকগুলি আজও সমানভাবে জনপ্রিয় এবং শিশু-কিশোরদের হাসির নাটকের মাধ্যমে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. দ্র. সুরঞ্জন মিদ্দে: রবীন্দ্র নাটক: বিশ্ব সাহিত্যে বর্ণময় বিস্ময়, রবি প্রদক্ষিণ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৫৩০।

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩৫।

৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা- ১৫২।

৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬১, দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা-৩৯৯।

৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা-৪৪৭।

৬. বালক, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

৭. দ্র. সুরঞ্জন মিদ্দে, পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ৫৩৬।

৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ১৫৫।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৬।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬০।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৬।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯২।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৬।

১৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ৪০০।

বর্তমানে যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রা : ভারতবর্ষের এক নিষিদ্ধ অধ্যায়

লোপামুদ্রা গাঙ্গুলী
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ,
বেদান্ত কলেজ
শুভদীপ মন্ডল
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক
শিউলি মন্ডল
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারাংশ :
পতিতাবৃত্তি, যার অর্থ যৌনতা বিক্রি, বিশ্বের প্রাচীনতম কাজগুলির মধ্যে একটি। প্রাচীন ভারতে ধনী ব্যক্তিরা তাদের জন্য নৃত্যশিল্পীদের "শহরের বধূ" নামে আমন্ত্রণ জানাতেন। এই নর্তকী কখনও কখনও পতিতা ছিল। লোকেরা এখন এই কাজের কথা বলতে "যৌনকর্মী" শব্দটি ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে যৌন ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কথা বলার সময় সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। দেহব্যবসায় যারা প্রত্যক্ষভাবে যৌনসেবা প্রদান করেন এবং যারা এর সাথে পরোক্ষভাবে কাজ করেন যৌনকর্মী শব্দটি তাদের সবাইকে নির্দেশ করে। যারা প্রত্যক্ষভাবে যৌনসেবা প্রদান করেন তাদের অধিকাংশ সময় 'গণিকা' বা 'বেশ্যা' বলা হয়। অপরদিকে যারা পরোক্ষভাবে কাজ করেন তাদের বলা হয় দালাল বা কুটনী, দালাল ছাড়াও আরও পরোক্ষ যৌনকর্মীর অস্তিত্ব বিদ্যামান। সোনাগাছি কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল যেখানে এই পেশা এ যুক্ত মানুষ এর সংখ্যা নেহাৎ ই কম না । এই পেশা এ যুক্ত মানুষ দের জীবন যাত্রা র বর্ণনা ই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ।
মূলশব্দ: যৌনকর্মী, আগ্রাওয়ালি, নাবালিকা, শিশু-পাচার, যৌন ব্যবসা

ভূমিকা :
ভারতে যৌনকর্মীদের পেশাটি বিভিন্ন কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হয়। ভারতে যৌনকর্মী এবং পাচার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ন্ত্রণকারী আইনী আইন হল ‘দ্য সাপ্রেশন অফ ইমোরাল ট্রাফিক ইন উইমেন অ্যান্ড গার্লস অ্যাক্ট’ (1956), যা 1986 সালে ‘অনৈতিক ট্র্যাফিক প্রতিরোধ আইন’ হিসাবে সংশোধিত হয়েছিল। এই আইন অনুসারে, যৌনকর্মীরা ব্যক্তিগত স্থানে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে, তারা আইনত জনসাধারণের জায়গায় গ্রাহকদের অনুরোধ করতে পারে না বা হোটেল

পরিষেবা বা যৌনকর্মীদের রিংগুলিতে জড়িত হতে পারে না তাই, পতিতাবৃত্তি আইনগত জটিলতার আওতাধীন হলেও, এটিকে ঘিরে অনেকগুলি কার্যকলাপ যেমন পাবলিক সলিসিটেশন, পতিতালয় পরিচালনা এবং সামাজিক বঞ্চনা উল্লেখযোগ্য (Punekar,1962)।

বর্তমান সময়ে যৌনকর্মীদের জীবনসত্য :

'রেড লাইট এরিয়া' বা বেশ্যাপল্লীতে অবস্থিত এইসব নারীরা কিভাবে এবং কেন এই পেশা গ্রহণ করলো তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতুহলের অভাব নেই কিন্তু তা শুধুমাত্র কৌতুহলেই সীমাবদ্ধ (Dutta, 2005) ।

প্রধানত যে সকল কারণে একটি নারী যৌনকর্মীর পেশা গ্রহণ করে তা নিম্নরূপ –

নারী যৌনকর্মীদের এই পেশা গ্রহণ করার কারণ

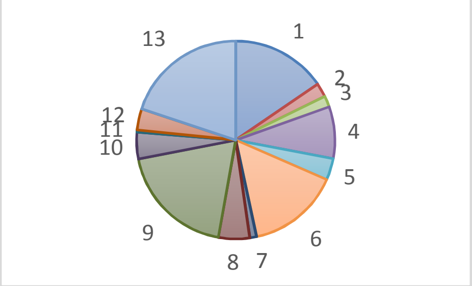

সূচক

1. ভালভাবে থাকার জন্য
2. বন্ধু নিয়ে এসেছে
3. বংশানুক্রমিক
4. বিক্রী হয়ে
5. পরিবার পাঠিয়েছে
6. পরিচিত কেউ জোর করে নিয়ে এনেছে
7. ঝি এর কাজ করতে এসে ধর্ষিতা হয়ে
8. প্রেমিক দ্বারা প্রতারিত হয়ে
9. চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে
10. স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে
11. পণ দিতে না পেরে পরিত্যক্তা হয়ে
12. পরিবার অথবা স্বামীর হাতে নির্যাতিতা হয়ে
13. নিজের অন্নসংস্থান করতে

কলকাতার যৌনপরিষেবার অবস্থা

কলকাতার ‘সম্ভবত প্রাচীনতম ও বৃহত্তম যৌনপল্লী হল সোনাগাছি। এই অঞ্চলে এই ব্যবসা প্রায় কলকাতা শহরের সমবয়সি অর্থাৎ প্রায় তিনশো বছরেরও পুরোনো। এই এলাকাটি উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে অবস্থিত। তবে শুধুমাত্র সোনাগাছি নয় কলকাতার অন্যান্য যৌনপল্লী যেমন – কালীঘাট অঞ্চল, ওয়াটগঞ্জ এলাকা, বৌবাজার অঞ্চল, ধর্মতলা অঞ্চল, এবং চিংপুর এলাকার চিত্রও সোনাগাছির তুলনায় পৃথক নয়। সোনাগাছি। অঞ্চলে প্রায় ৭০০০ যৌনকর্ম প্রতিদিন প্রায় ৩৫০০০ মানুষকে যৌন পরিসেবা প্রদান করেন। এই অঞ্চলে ৫ থেকে ২৫টি কামরাওয়ালা কয়েকশো বাড়ীতে যৌনকর্মীরা বসবাস করে। যৌনকর্মীরা একটি কামরা পার্টিশান ও দিয়ে ব্যবহার করেন। এই অঞ্চলে যৌনকর্মীদের আয়ের কতকগুলি স্তর লক্ষ্য করা যায় যা প্রধানত তাদের বয়স এবং তাদের সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে

সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে যৌনকর্মীদের আয়ের স্তর

যৌন পরিষেবায় আসার কারণ	বেশি আয়	মাঝারি আয়	কম আয়	খুব কম আয়
১। চরম দারিদ্র (49.1%)	32	127	62	221
২।স্বেচ্ছা	8	10	10	39
৩। পারিবারিক সমস্যা (21.56%)	17	40	40	97
৪। ভুল বোঝানো (15.56%)	19	21	30	70
৫। ঐতিহ্য (4.67%)	5	9	7	21

Table : 1.1

তথ্য-দুর্বার প্রকাশনী

সোনাগাছি অঞ্চলে কিছু হিন্দিভাষী যৌনকর্মীদের সন্ধান লাভ করা যায় যাদের ‘আগ্রাওয়ালি’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় (Nag,2006) । যদিও এই পরিসংখ্যান আপাত দৃষ্টিতে নাবালিকা ও শিশু পাচার চক্রের বিরোধী তথ্য প্রতিবেদন করে কিন্তু এক্ষেত্রে যেটি দ্রষ্টব্য বিষয় তা হল বর্তমানেও পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী পাচারচক্র যথেষ্ট সক্রিয়। প্রধানত এই চক্রের মাধ্যমেই নাবালিকা কন্যাদের যৌনপেশায় আনা হয় । বর্তমানে প্রায় 59.% (2001) শতাংশ যৌনকর্মী একটি সন্তানের জননী। বর্তমান এ অভিভাবক হিসাবে মায়ের স্বীকৃতি দান বহুক্ষেত্রে যৌনকর্মীদের মধ্যে মাতৃলাভের আকাঙ্খাকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করেছে (Nag,2006) ।

সোনাগাছি তথা পশ্চিমবঙ্গের অনন্য নিষিদ্ধ পল্লীতে নারীদের অত্যাচার পূরাণ-এর একটি অধ্যায় সূচিত হয় দালালদের হাত ধরে। এই সকল দালালরা মূলত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারবাসী। এদের কাজ খদ্দের এনে যৌনকর্মীদের ঘরে প্রবেশ করনো। বর্তমানে যৌনকর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন যৌনরোগ তথা এডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তারা বহুক্ষেত্রেই কন্ডোম ব্যবহার ছাড়া খদ্দের মনোরঞ্জন করতে না চাইলে অধীক আয়ের আশায় এই সকল দালালরা প্রায় জোর করেই খদ্দেরদের যৌনকর্মীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে। যৌনকর্মীরা যদি তাদের কথা না শোনে তাহলে তারা ঘরে খদ্দের আনা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। এই সকল দালালদের মধ্যে এতটাই একতা যে, কোন দালাল যদি কোন কারণে যৌনকর্মীর ঘরে খদ্দের না আনে তাহলে অন্য দালালরাও একই পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় অত্যাচারের অধ্যায় সূচিত হয় মালকিনেদের হাত ধরে। যদি কোন যৌনকর্মী খদ্দের নিতে অস্বীকার করে কোন কারনে, তাহলে মানকিনরা তাদের মারতে দ্বিধাবোধ করেন না। যদি কোন যৌনকর্মী নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য সিনেমা যায় তাহলে মালকিনকে ফাইন হিসাবে টাকা দিতে হয়। কোন কারনে বেশ্যালয়ের গেট বন্ধ হওয়ার পর অথবা ভোরবেলা কোন যৌনকর্মীর ঘরে খদ্দের এলে সেইসকল ক্ষেত্রে মালকিনদের গেট খোলা বাবদ টাকা দিতে হয়। শুধু তাই নয় যৌনকর্মীদের ৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালাতে, ডিম লাইটের ও পাখার জন্য প্রতিমাসে কারেন্ট ভাড়া মালকিনকে টাকা দিতে হয় (দত্ত,2005)।

সোনাগাছি অঞ্চলে 'বাবু' শব্দটির সঙ্গে সকলেই অধিক পরিচিত। শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই নয় পশ্চিমঙ্গের প্রায় প্রতিটি 'Red Light Area' তেই বাবুদের পাওয়া যায়। যদিও বাবু শব্দটির প্রচলন মোঘল আমল থেকেই তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর হাত ধরেই যৌনকর্মীদের প্রেমিকরা বাবু শিরোপা লাভ করেছে।যৌনকর্মীদের অন্দরমহল থেকে বাবু চরিত্রটিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষন করতে হলে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটি পাঠকের মনে আসে তা হল, কোন যৌনকর্মীর মনের মতন বাবু হতে গেলে কী কী করা প্রয়োজন, প্রধানত এই সকল ক্ষেত্রে যেটি বিবেচ্য বিষয় তা হল, যে সকল খদ্দেররা নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে থাকে তারাই বাবু হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মতামত	শতকরা হার
১। যৌনক্ষুধা মেটায় + দেখতে সুন্দর	১১%
২। চাহিদা অনুসারে পয়সা দেয়।	১৮.৮%
৩। সব সময় পাশে থাকে	২৩.৮%
৪। প্রচুর বুদ্ধিমান	৮.৮%
৫। যৌনকর্মীর সন্তানকে ভালবাসে	৪২%

Table : 1.2

তথ্য-দুর্বার প্রকাশনী

এই সকল বাবুদের জীবনচরিত আলোচনা করতে গেলে একটি চিন্তা সত্য ফুটে ওঠে তা হল, যাদের সবাই ঘৃণা করে বাবুরা তাদের ভালোবাসেন কেন? প্রকৃত অর্থে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন।

পেশাগত দিক থেকে এই সকল বাবুদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

পেশা	শতকরা
কুলী, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাচালক, মিস্ত্রি, দোকানের কর্মচারী	১৩,২%
ছোট ব্যবসায়ী, ড্রাইভার (মাসিক আয় ৩৫০০ টাকা	৩ ৭.৪%
বড় ব্যবসায়ী (মাসিক আয় ৩৫০০টাকার উপরে)	১৬.২%
কারখানার শ্রমিক	৫.৮%
ক্লার্ক	৮%
পিওন	৪.৮%
অফিসার (ব্যাঙ্ক, রেল প্রভৃতি)	৫.৮%
ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক	0.8%
বেকার, রিটায়ার্ড	৮.৪%

Table : 1.3

তথ্য-দুর্বার প্রকাশনী

পেশাগত দিক ছাড়াও বাবুদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় –

I. প্রথম দলকে যৌনকর্মীদের ভাষায় বলা হয় 'টাইমের বাবু'। এরা প্রধানত বাবু হওয়ার সকল অর্থ পূরণ করে না।

II. দ্বিতীয় দলটি হল 'সাহসী বাবু'। যারা বাবু হওয়ার পর মেয়েটিকে স্ত্রীর স্বীকৃতি প্রদান করে কখোনো বাড়ী নিয়ে যায় অথবা অন্য কোথাও ঘর ভাড়া করে থাকে।

III. তৃতীয় দলটি হল 'অ্যারিস্টোক্র্যাট বাবু'। এরা তাদের পছন্দের যৌনকর্মীর সকল চাহিদা পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শর্ত থাকে এরা অন্য কোনো খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করতে পারবে না।

IV. চতুর্থ দলটি হল 'খাওয়া মোছা বাবু'। এরা সাধারণত বেকার এবং এরা যৌনকর্মীদের সকল ধরণের ঘরের কাজ করে দিতে বাধ্য থাকে। (দুর্বার প্রকাশনী, 2005)

আপাত দৃষ্টিতে বাবুদের যৌনকর্মীদের এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসাবে মনে হলেও বহুক্ষেত্রে এই সকল বাবুদের হাতে যৌনকর্মীরা বহুক্ষেত্রেই নিগৃহীত হয়ে থাকে। বাবুদের ব্ল্যাকমেলিং এর পদ্ধতিও অভিনবত্বের দাবী রাখে। বিবিদের এক পয়সা না দিয়ে আয়েশ ও তার পয়সায় খাওয়া তো আছেই তার সাথে কাষ্টমার এর পয়সা কেড়ে নেওয়া, তাতেও অভাব না মিটলে নানা কারণ দেখিয়ে বিবির ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স শূণ্য করে দেওয়া সর্বোপরি তাকে ইচ্ছেমত পরিচালিত করা খুবই সাধারণ ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে যৌনকর্মীদের পরিবার গ্রামে বসবাস করলে তারা একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে গ্রামবাসীকে জানায় তাদের মেয়ে শহরে বিয়ে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাবু যদি একবার মেয়েটির গ্রামে স্বামী সেজে যেতে পারে তাহলে শহরে এসে মেয়েটিকে গ্রামের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা একটি চিরাচরিত চিত্র হয়ে দাঁড়ায় । সারা বছরের ক্লান্তি ও পরিশ্রমকে পিছনে ফেলে যৌনকর্মীদের মধ্যে কার্তিক পূজার অধিক প্রচলন দেখা যায়।এই পূজোর মাধ্যমে তারা উপভোগ করে নিতে চায় জীবনে হারিয়ে যাওয়া। পুত্র সন্তান লাভের আশায় এই পূজা যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রচলিত হলেও পরবর্তীকালে এই পূজা শুধুমাত্র নিখাদ আনন্দ উপভোগ করার একটি উপলক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে (দত্ত,2005) ।

বর্তমান এ যৌনকর্মীদের সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা হলো

সামাজিক অবস্থান	শতকরা হার
বিবাহিতা	৫৬.৫%
স্বামী বিচ্ছিন্না	৭ .৫ %
পতি পরিত্যক্তা	৩০%
অবিবাহিতা	৬%

Table : 1.4
তথ্য-দুর্বার প্রকাশনী

বর্তমান এ যৌনকর্মীদের স্বাক্ষরতার হার

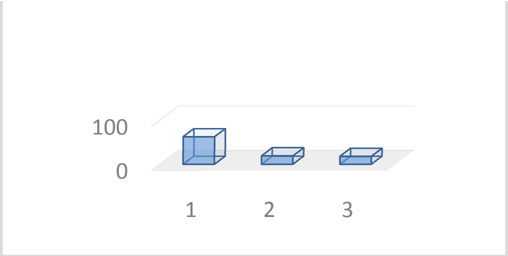

চিত্র:১.২
তথ্য-দুর্বার প্রকাশনী

সূচক

1. নিরক্ষর
2. প্রাথমিক শিক্ষিতা
3. মাধ্যমিক শিক্ষিতা

ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীদের পরিস্থিতি

ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীরা তাদের পেশা প্রধানত নির্ভরশীল যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলে। বেশীরভাগ ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীরা দাবী করে যে তারা তাদের কাষ্টমারদের সঙ্গে শুধুমাত্র পেশাদারীত্বের সম্পর্কই বজায় রাখে। এদের অধিকাংশের মধ্যেই মাদকাসক্তির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্থায়ী বসবাসরত যৌনকর্মীরা প্রধানত যে সামাজিক পরিস্থিতির চাপে এই পেশা গ্রহণ করে থাকে ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীদের পরিস্থিতি তার তুলনা এ কিছু অন্য নয়। তফাৎ শুধু এটুকুই যে তারা নিজেদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থেকেই এই পেশা চালিয়ে যায়। ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীরা তাদের ইচ্ছানুসারে কোন হোটেল, বাড়ি অথবা কাষ্টমারদের বাড়িকে তাদের কার্যক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। এই সকল ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীরা দিনে প্রায় ৭/৮ ঘণ্টা সকাল থেকে মধ্যরাতের মধ্যে কাজ করে। এদের কার্যক্ষেত্র প্রধানত রাস্তা, ষ্টেশন, সিনেমা হল বা অন্য কোনো খোলা জায়গা। এদের মাথাপিছু গড় সাপ্তাহিক আয় ১০০টাকা থেকে শুরু হয় । এদের মধ্যে কন্ডোম ব্যবহারের হার খুবই কম (৩%) এবং তাও অনিয়মিত। বর্তমানে শহরের বিভিন্ন স্থানে বেড়ে ওঠা বেআইনি মাসেজ পার্লারও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীদের কার্যক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে কাগজের এই সকল বিজ্ঞাপন দেখে কিছু আন্দাজ না করা গেলেও প্রাথমিক ভাবে ফোনের মাধ্যমে কাষ্টমারদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তারপর লোকচক্ষুর আড়ালে বেনামী তথা ঠিকানাহীন একটি স্থানে কাষ্টমারদের দালালের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এই স্থানেই চলে যৌনসুখ গ্রহণ। এই সকল যৌনকর্মীরা যে পরিবেশে বসবাস করে তা যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকর এবং দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবেশে বসবাস করার ফলে যৌনকর্মীরা সহজেই বহু রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে বিভিন্ন যৌনরোগ ছাড়াও হাম, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রধান। অধিকাংশ যৌনকর্মীদের মতে তাদের খদ্দেরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র ব্যবসায়িক এদের সঙ্গে অন্য কোনো ধরনের সম্পর্ক গড়তে এরা বাস্তবে রাজীও নয় । যৌন পেশা গ্রহণের পশ্চাদে যে সকল কারণ দর্শিয়েছেন সেগুলি হল –

- পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান – ৫৮%
- অন্য কোনো বাড়ির দ্বারা প্রতারিত – ২৭%
- স্বামী দ্বারা প্রতারিত হয়ে – ১৮%
- বংশানুক্রমিক – ১৫% (দত্ত,2005) ।

সমালোচনা:

ভারতে 3 মিলিয়নেরও বেশি বাণিজ্যিক যৌনকর্মী রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে।1 আনুমানিক 2.9 মিলিয়ন মহিলা, বা ভারতে 1.1% প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা বাণিজ্যিক যৌন শিল্পে কাজ করে। পুরুষ এবং ট্রান্সজেন্ডার যৌনকর্মীরা ভারতের যৌনকর্মী জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতে যৌনকর্মীরা স্বাস্থ্য খাতে পরিষেবা এবং সহায়তার সীমিত অ্যাক্সেস সহ একটি খারাপভাবে অনুন্নত জনসংখ্যার। উনিশ শতকে ভারত ব্রিটিশ

উপনিবেশে পরিণত হয়। যৌনকর্মীরা তখনও মূলধারার সমাজের অংশ ছিল এবং তাদের বৈধ অধিকার ছিল। উনিশ শতকে কলকাতায় যৌনকর্মীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক একক আদিবাসী পুরুষ কাজের সন্ধানে কলকাতায় পাড়ি জমাচ্ছেন।

এই পুরুষরা, যারা গ্রামে তাদের পরিবার ত্যাগ করেছিল এবং মহিলাদের সঙ্গ কামনা করেছিল, তারা শহরের যৌন ব্যবসাকে প্রসারিত করেছিল। যৌনকর্মীরা বর্তমানে তথাকথিত পরিশীলিত সংস্কৃতির মধ্যে তাদের জীবনযাত্রার মান এবং স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি অনুভব করছে। " দূর্বার সমন্বয় কমিটি " এই ব্যক্তিদের অন্যতম প্রধান সংস্থা, এবং তাদের ভারতীয় সমাজকে একই মাত্রায় রূপান্তর করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে যে এটি এত বৈচিত্র্যময় সামাজিক অঞ্চলে কাজ করবে কিনা।

উপসংহার

এই অধ্যায়টি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক সম্পর্কের স্থাপন করেছে। এই অঞ্চলে পুরুষতন্ত্র এবং সামাজিক সম্পর্কের আলোচনা বাঙালি সমাজে ব্যক্তিত্বের সামাজিক প্রকৃতি এবং কীভাবে এটি লিঙ্গ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তা তুলে ধরে হয়েছে । যেহেতু পরিবারে সামাজিক সম্পর্কের বিলুপ্তি নারীদের যৌনকর্মের পথ তৈরি করে সেই বিষয়ে এটি তাৎপর্যপূর্ণ, 19 শতকের বাংলায় নারীর কাজ এবং যৌনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে কীভাবে ভারতীয় সমাজের 'উপনিবেশিক প্রচেষ্টা'র প্রতিক্রিয়ায় এই অঞ্চলে সংঘটিত সামাজিক সংস্কারের ইতিহাসের মাধ্যমে যৌন কাজের জন্য সমসাময়িক পরিস্থিতির জন্ম হয়েছিল। অবশেষে, বিভিন্ন রাজ্য এবং কলকাতা শহরের যৌনকর্মের অদৃশ্য রূপগুলি দৃশ্যমান এবং, এটিকে ঘিরে থাকা সামাজিক কলঙ্ক এবং এই অঞ্চলে যৌনকর্মের উপর বিলুপ্তিবাদী মতাদর্শ প্রকাশের উপায়গুলির উপর আলোকপাত করেছে।

তথ্যসূত্র :

1. Joardar, Biswanath; Prostitution in Historical and Modern Perspective: Inter India Publication, New Delhi, 1984.
2. Nag, Moni, 'Sex workers of India, Allied Publishers Private Limited. New Delhi, 2006.
3. দাসী, বিনোদিনী ; নটি বিনোদিনী রচনা সমগ্র ;সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, 2014
4. Banerjee, Sunanta; Dangerous Outcast; Allied Publication Pvt Ltd; New Delhi, 2006
5. দত্ত, মৃণালকান্তি,যৌনকর্মীদের জীবন সত্য, দুর্বার প্রকাশনী, কলকাতা,2005
6. Punekar, S.D, Rao, Kamala, A study of Prostitution in Bombay: Allied Publication Pvt. Ltd. Mumbai 1962

ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক মুঠো আকাশ' : মধ্যবিত্তের জীবন জিজ্ঞাসা ও ব্যর্থ জীবনের আলেখ্য

প্রিয়াংকা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক চড়াই উৎরাই, উদ্বাস্তুস্রোত ও রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামি ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যার ভিত্তিস্তরে নির্মিত হয়েছে মধ্যবিত্তের মানবিক সংকট এবং ব্যক্তি চরিত্রের একাকিত্বের যন্ত্রণা। নাটকের নায়ক আপেক্ষিক বৈভবের আস্থায় আশ্রয় নিয়েছে মিথ্যাপন্থার। তবু নায়কের পক্ষে সম্ভব হয়নি প্রিয়জনদের আগলে রাখা। ফলত বঞ্চনার ব্যর্থ পরিহাস নায়ককে করে তুলেছে একাকিত্বময় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের নাগরিক। এখানে অবশ্য নাটককার তাঁর নাটকে কলকাতা শহরকে গ্রাস করে কিশোরপুর গ্রামকে বিকশিত করে তুলেছেন। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি নায়ক কেষ্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কিশোরপুরে পাড়ি দিতে চায়। কিন্তু বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেয়না। তাই নাটক শেষে পাঠকের মনে নায়কের ব্যর্থ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

সূচক শব্দ : ধনঞ্জয় বৈরাগী, এক মুঠো আকাশ, মধ্যবিত্ত জীবন, নিঃসঙ্গতা, টানাপোড়ন, ব্যর্থতা।

মূল নিবন্ধ :

স্বাধীনতা পরবর্তী নাটককারদের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রকৃত নাম তরুণ রায়। তিনি শুধু নাটককার নন; অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক হিসাবে নিজস্বী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আর্ট, বিশ্বরূপা ও রঙমহল থিয়েটারে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করেছেন। তবে দলগত দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক চক্রান্তের বশবর্তী হয়ে তিনি গ্রুপ থিয়েটারের মোহ ত্যাগ করেন। তিনি নিজের বাড়িতে স্থাপন করেন 'থিয়েটার সেন্টার' (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) নামে রঙ্গালয়। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর থিয়েটারে শুরু হয় একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছিল ভারতীয় নাট্যদলগুলি। শুধু তাই নয়, অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে তিনি বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরই প্রশিক্ষায় বিদেশিরা 'ইন্ডিয়ান বৃটিশ ড্রামা লিগে' রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'ডাকঘর' নাটকে অভিনয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এর মধ্যেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় সীমায়িত নয়, পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ডিন ছিলেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগী সমকালীন প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন বেশ কিছু নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প। তাঁর এই বিপুল সৃষ্টি সম্ভার সময়ের পাঠককে যতটা না স্পর্শ করেছিল, তৎপরবর্তী পাঠককে দিয়ে গেছে নিরন্তর সমালোচনার দিক দিগন্ত। তবে কথা না বাড়িয়ে, ধনঞ্জয় বৈরাগীর খ্যাতির মূলদন্ডে যাওয়া যাক। তাঁর রচিত নাটকগুলি হলো- 'ধৃতরাষ্ট্র' (১৯৫৭), 'রূপোলি চাঁদ' (১৯৫৮), 'এক পেয়ালা কফি' (১৯৬০), 'রজনী গন্ধা' (১৯৬০), 'আর হবে না দেরী' (১৯৬১) ও 'এক মুঠো আকাশ'। তাঁর নাটকে ভীষণ ভাবে আকর হয়ে উঠেছে সাধারণ মধ্যবিত্তের যন্ত্রণা। যার সাক্ষ্য দলিল দিতে গিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন-

"সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের পরিবেশ অবলম্বনেই তিনি তাঁহার নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন।"[১]

নাটকের অন্তর্নিহিত মূল নির্যাসকে টেনে বার করার আগে, নাটকের কিছু নিজস্ব শরীরী বৈশিষ্ট্য থাকে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'এক মুঠো আকাশ' নাটকটিতে দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে। একদিকে দেখা দিয়েছে উদ্বাস্তুদের অবক্ষয়িত রূপ; অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামি ও অসামাজিক কার্যকলাপ অবাধে ধরা পরেছে। এর নেপথ্যে বিরাট রকম ভাবে কাজ করেছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার চড়াই-উৎরাই। বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্বের সমস্যা ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, যাকে সঙ্গী করে মানুষ গুনেছে একাকিত্বের দ্বিপ্রহর। এই সময়ের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে নাটককার ধনঞ্জয় বৈরাগী রচনা করেছেন 'এক মুঠো আকাশ'। তাঁরই পরিচালনায় ১৫ই এপ্রিল ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রঙমহলে অভিনীত হয়। তবে প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, নাটকটিকে নিবিড় ভাবে পাঠ করলে, উপলব্ধি করা যায় রোমান্টিকতার ভিন্ন স্বাদ। যা দর্শকবৃন্দকে আপ্লুত করেছে এবং দর্শকদের অনুরোধে রঙমহলে টানা আট মাস অভিনীত হয়েছে।

নাটককার 'এক মুঠো আকাশ' নাটকটি অঙ্কন করেছেন তিনটি অঙ্কের দশটি দৃশ্যের পরিসরে। নাটকটির কাহিনি হলো এরূপ- নাটকের নায়ক কেষ্ট, স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক। পাড়ার আভিজাত্য ব্যক্তিদের কাছে নানা প্রলোভন দেখিয়ে টাকা আদায় করাই তার মতলব। সে এই কাজে লাগিয়েছে শ্যামল নামক এক স্কুল পড়ুয়াকে। রঘু ব্যানার্জীর মতো বিধানসভায় নির্বাচন প্রার্থীর ভোট কেনার নেতা হিসাবে কেষ্ট কৃত্রিম সঙ্গ দিয়েছে। এর বিনিময়ে রঘু ব্যানার্জীর মতো অসৎ ব্যক্তিদের টাকা হাতিয়েছে। কিন্তু কেষ্টর অন্য আর একটি দিক আছে, সে গৌরীর মতো অসহায় সম্বলহীন দুঃস্থ উদ্বাস্তু বস্তিবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। গৌরীর অসুস্থ ভাই এর ওষুধ কিনতে অধিক ব্যয় করেছে। আবার গৌরীকে কেন্দ্র করে বস্তিবাসীদের কানাকানি এবং জঘন্য সন্দেহাতীত দৃষ্টি এড়াতে না পেরে গৌরীকে নিয়ে উঠেছে এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখান থেকেই যেন নাটকের মূল কাহিনির শুরু হয়। গৌরী ভেবেছিল কেষ্ট তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু

কেষ্ট তাকে পরিয়ে দিয়েছে মিথ্যে সিদুঁর। তাকে ব্যবহার করে মিথ্যা রোজগারের পথ সুগম করেছে। যা কেষ্টর সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে –
"মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করে, বুদ্ধি যার নেই সে পৃথিবীতে বাঁচতে পারেনা। রাস্তায় যত বড় বড় বাড়ি দেখ, গাড়ী দেখ, এসব কাদের? যাদের খুব বুদ্ধি। যারা বোকা লোকদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে- তাদের।"[২]

গৌরীর অমত সত্ত্বেও কেষ্ট তাকে বাধ্য করেছে থিয়েটারে অভিনয় করতে। মানুষ অভ্যাসের দাস। গৌরীও তার ব্যতিক্রম না। এক সময় থিয়েটারকে সে পেশা হিসাবে বেছে নেয়। সম্পর্ক সৃজন হয়েছে ফিল্ম প্রযোজক বড়োলোক বিনোদের সঙ্গে। তাই গৌরী কেষ্টর মিথ্যা নাটকীয় সম্পর্ককে আকঁড়ে ধরে না থেকে নিজের মতো করে বাঁচার পথ সন্ধান করে নেয়। এত দিনে কেষ্টর সুপ্তিখো প্রেমের অঙ্কুরোদগম ঘটে। কিন্তু গৌরীর পক্ষে আর ফিরে তাকানো সম্ভব নয়। ফলে কেষ্টর ঘর বাঁধার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়না। সে তার অনৈতিক কৃতকর্মের আত্মশ্লাঘা উপলব্ধি করতে পেরে, শ্যামলকে সঠিক পথে ফিরে আনতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় শ্যমল পুলিশের হাতে ধৃত হয়। কিন্তু কেষ্ট নিজের অন্বিষ্ট কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত করতে শ্যামলের অন্যায়ের সব দায় নিজের কাধে নিয়ে নেয়। সে ধরা দেয় পুলিশের হাতে। এই সময় তার দোসর হয়ে দাঁড়ায় হতভাগিনী এক নারী চিনু। এখানেই নাট্য কাহিনির পরিসমাপ্তি।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটকে প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে উদ্বাস্তুদের ছিন্নমূলীয় জীবন সমস্যা, অন্নাভাব, অর্থাভাব বা রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু নাটককার সমকালীন সমস্যা সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে মূখ্য করে তুলেছেন মধ্যবিত্তের সহায়হীন জীবন যন্ত্রণার অলিখিত দলিল। এই নির্যাসকে টেনে বার করাই তো গবেষকের কাজ। নাটকে উল্লেখিত কেষ্ট মধ্যবিত্ত ঘরের অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক। শৈশব থেকেই মাতৃহারা, পিতার কাছে উপেক্ষিত, দাদার কাছে বঞ্চিত। অথচ দাদা বলরামের মতো তার জীবনেও সুখ সমৃদ্ধির বৈভব সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা তার জীবনে বহন করেছে ব্যর্থতা ও যন্ত্রণাময় ট্যাজিক সুর। যা তার সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে-
"কেষ্ট।। শ্যামাকে যত দেখি, নিজের কথা মনে পড়ে। ছোট বেলায় জন্মের পর থেকে বাড়িতে আমার নাম হল- অপয়া ছেলে। জন্মের সঙ্গে মা মারা গেছেন। কিছু দিন বাদে বাবার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সব দোষ আমার। দাদা যেখানে রাজপুত্রের মত মানুষ হতে লাগল, আমি সেখানে চাকর বই কিছু ছিলাম না। কি কষ্টের মধ্যেই যে প্রথম জীবনটা কেটেছে।
গৌরী।। বাবাও ভালোবাসতেন না?
কেষ্ট।। বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, বাড়ির অংশও আমি পেতাম না। উইল করলে সবই দাদাকে দিয়ে যেতেন।"[৩]

উল্লেখ্য শ্যামার প্রসঙ্গে দু-একটি কথা জেনে নেওয়া আবশ্যক। শ্যামা কেষ্টর দাদা বলরামের মাতৃহারা মেয়ে। বাবা ও সৎ মায়ের অযত্নে ও অবজ্ঞায় মানুষ হলেও সে ছিলো কেষ্টর পরম স্নেহের। শ্যামার জীবন যন্ত্রণা ও মানসিক নির্যাতনের আলেখ্য কেষ্টকে তার অতীত জীবনের চারণ ভূমিতে নিয়ে যায়। তবে শ্যামার জীবনের এক পক্ষ বঞ্চনার শিকার হলেও, তার বিবাহিত জীবন স্নিগ্ধ সুখে সম্পৃক্ত। কিন্তু কেষ্ট গৌরীকে পেয়ে অবজ্ঞা করেছে অবলীলাক্রমে। বরং বড়োলোক হওয়ার বাসনায় শ্যামল ও গৌরীকে শিখিয়েছে মিথ্যাচারের পন্থা। তাই শ্যামার দাম্পত্য জীবনের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতি মুগ্ধ হয়ে সে সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু মানুষ যখন যা চায় তা পায়না। সময়ের গতিধারায় তপ্ত লোহাও ঠান্ডা হয়ে যায়। সংসারের সমস্ত সুখ কিনতে হয় ভালোবাসার বিনিময়ে। সেখানে মিথ্যাচার বা বঞ্চনা চলে না। কেষ্ট তো সেখানে অর্থ উপার্জনের জন্য গৌরীকে কখনো পরিচয় দিয়েছে আইবুড়ো বোন, কখনো বান্ধবী, আবার কখনো বা স্ত্রী রূপে। এই নাটকীয়পনা গৌরীর জীবনের ইতিবৃত্তকে করে তুলেছে ক্লান্ত ও বিদ্ধস্ত। কেষ্টর এই খামখেয়ালিপনা চরিত্রের সঙ্গে আমরা ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের কুমুদ চরিত্রে সাদৃশ্য খুজে পাই। তাই গৌরী সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকটময় টানাপোড়েনকে অতিক্রম করে অন্য পথে হাঁটার অঙ্গীকার নিয়েছে। যা কেষ্টর জীবনচরিতকে অসহ্যময় জ্বালায় বিদ্ধ করেছে-

“কেষ্ট।। শুনে কষ্ট পেলে? আশ্চর্য্য, এখন মন বলে একটা জিনিস আছে? ওঃ- সমস্ত শরীরে কি অসহ্য জ্বালা। কি বোকা আমি, কার জন্যে সব কিছু ছেড়ে এইভাবে কাটিয়েছি। কার অপমান এক মুহুর্তে জন্যে সহ্য করতে পারিনি। কাকে নিজের দোসর বলে গ্রহণ করেছি, সেই তুমি আমাকে এভাবে ঠকিয়ে বোকা বানিয়ে চলে গেলে। কি লাভ হল তোমার।

গৌরী।। কি লাভ হল তা জানিনা- তবে এখান থেকে যে চলে গেছি, তার জন্যে দায়ী কে জানো?

কেষ্ট।। কে?

গৌরী।। তুমি নিজে।

কেষ্ট।। আমি?

গৌরী।। হ্যাঁ তুমি। তুমিই- তো টাকা চেয়েছিলে- এখন তো আমার অনেক টাকা- তবে আমার ওপর এখন রাগ করছ কেন?

কেষ্ট।। আমি তো তোমার সুখের জন্যে টাকা চেয়ে ছিলাম- তোমার যখন যা দরকার মনে হয়েছে।

গৌরী।। তোমার মধ্যে দয়া-অনুকম্পার– সব আছে- শুধু নেই ভালবাসা, বিনোদ আমাকে ভালবাসে, সে আমাকে নারীর সন্মান দিয়েছে।”[৪]

কেষ্টর জীবনে জমে থাকা ব্যর্থতার ইতিহাস তাকে একাকী করে তুলেছে। এই সময়ে তার ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ দিতে আসে কেষ্টর মতো ভিত্তিহীন অভাগী চিনু।

সে কিনা বিয়ের এক বুক স্বপ্ন নিয়ে পিনাকী নামক এক যুবকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু পিনাকী তাকে ঠকিয়েছে। উভয়ের জীবনের Error of Judgment ভ্রান্ত পথে চালনা করতে বাধ্য করেছে। ফলে উভয় নর-নারীর জীবন বিত্তান্তের কাহিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত ক্লেশ, গ্লানি, ব্যর্থতা মুছে ফেলে কেষ্ট চিনুকে নিয়ে নতুন পথ চলার শপথ নিয়েছে। যা কেষ্টর সংলাপে বিবৃত হয়েছে-

"না চিনু, আর আমি কলকাতায় থাকতে পারব না, এখানকার পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর- সব আমায় মনে করিয়ে দেবে গৌরীর কথা, শ্যামলের কথা। আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই। নতুন জীবনের স্বপ্ন, সেই এক মুঠো আকাশের স্বপ্ন। চিনু তুমিও চলনা কিশোরপুরে।"[৫]

নাটককার নাটকটিতে গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের মতো ধনঞ্জয় বৈরাগীও নাটকে কলকাতা শহরের বিপক্ষে কথা বলেছেন। কলকাতা শহরের জনরব, একঘেয়ে পরিবেশ জীবনের ছন্দময় পথকে গতিরুদ্ধ করে দেয়। তাই কেষ্ট বর্বর জীবন থেকে মুক্তি পেতে, সংকটের অচলায়তনকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। সে নতুন জীবনকে সুন্দরময় করে তুলতে চিনুকে নিয়ে গ্রামাভিমুখী হতে চায়। কেষ্টর এই মনোবৃত্তি শ্যামার স্বামী ব্রজ দুলালকে লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে আমরা অনুভব করতে পারি-

"আমার চিঠি পেয়ে আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন। ভাববেন, কলকাতায় না পৌঁছাতেই চিঠি লিখছি কেন? কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার কথাগুলো আমার জীবনের অনেকখানি বদলে দিয়েছে। সত্যি কলকাতার এই দমবন্ধ করা ঘরে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। কিশোরপুরের সেই উদার উন্মুক্ত আকাশ আমায় ডাকছে। আমি স্থির করেছি, আপনাদের কাছেই ফিরে যাব। যদি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি।"[৬]

মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। কেষ্টর অভিপথে বিঘ্নতা সঞ্চার করে শ্যামলের পুলিশের হাতে ধরা পড়ায়। স্নেহের শ্যামলকে সে বেপথুমান পথ থেকে চিরকালের জন্য উদ্ধার করতে চায়। তাই ভয়ে সন্ত্রস্থ শ্যামলকে মুক্তির আশ্বাস দেয় এবং শ্যামলের সমস্ত অন্যায়ের খেসারত দিতে সে অভিযুক্ত আসামীর খাতায় নিজেই দস্তখত করে। কারাজীবনে একাকী বেঁচে থাকার সম্বল হিসাবে সে এক মুঠো আকাশকেই সঙ্গী করে নিতে চায়। এখানে এই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় নিহিত রয়েছে কেষ্টর পাহাড় সমান জমে থাকা বেদনা ও ব্যর্থ পরিহাসের ইতিকথা। তাই তার জীবন ছন্দে উঠে এসেছে অবদমিত কল্পজগতের চারণভূমি। তবে কল্পনার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া গেলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হলো কেষ্টর চিনুকে নিয়ে সংসার বাধানোর স্বপ্ন আদৌও কি বাস্তবায়িত হবে। নাকি স্বপ্নই থেকে যাবে। যা নাটককার নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেখাননি। শুধুই ব্যঞ্জিত হয়ছে ব্যক্তি চরিত্রের বিচ্ছেদের বিলাপ রাশি। তাই সব শেষে নাটকের সংলাপ তুলেই নিবন্ধটির যবনিকা টানা যেতে পারে-

"আমার জন্যে ভেব না, যেখানেই থাকি ঐ এক মুঠো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকব। ফিরে এসে নতুন করে জীবন শুরু করব। আর চিনু, গৌরীকে বোলো, তার ওপর আমার কোন অভিমান নেই। সে যেন বিনোদকে নিয়ে সুখী হয়। চলুন ইনসপেক্টর সাহেব।"[৭]

তথ্যসূত্র :

১. ড. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৪০৬
2. ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'এক মুঠো আকাশ', নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১
৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৬, ৮৭
৫. প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯২

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. সুবোধ কুমার ঘোষ, 'বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক', প্রোগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০১৩
২. বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', প্যাপিয়াস, ১৯৭৭
৩. দর্শন চৌধুরী, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, ২০০৭

'বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন রেখা' : শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত

লিপিকা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ

সারসংক্ষেপ : বাংলা মঞ্চ ও অভিনয় সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ এটি। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৭০ সাল। প্রবন্ধস্থিত বিস্তারিত আলোচনাটি তাঁর একটি বক্তৃতামালা থেকে গৃহিত হয়েছে। 'মুম্বাই মারাঠি সাহিত্য সংঘ'এ তিনি এই বক্তৃতাটি উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সেই উপস্থাপনটি ছিল ইংরেজি ভাষায়। বর্তমান প্রবন্ধ সেই ইরেজি বক্তৃতামালার অনুবাদ। এটি অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক সুবীর রায় চৌধুরি ও শ্রীমতি মিনাক্ষী দত্ত। শুরু থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অভিনয়, মঞ্চ, থিয়েটার ইত্যাদি সংক্রান্ত যে পথরেখা নির্মিত হয়েছে, তার একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস আমরা পেয়ে যাই শম্ভু মিত্রের 'বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন রেখা' নামক আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। লেখকের অত্যন্ত মননশীল এই আলোচনাকে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা রইলো। তবে তাঁর এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির অংশবিশেষমাত্র এখানে বলা গেলো। সুযোগ থাকলে পরবর্তীতে বাকীটা বলার আশা রাখছি।
সূচক শব্দ : শম্ভু মিত্র, যাত্রা, নাটক, মধুসূদন, অমিত্রাক্ষর, মঞ্চ, অভিনয়, থিয়েটার

মূল আলোচনা :

কিছুকাল আগে পর্যন্ত 'থিয়েটার' বলতে আমরা বুঝতাম প্রসেনিয়ম্ মঞ্চে দৃশ্যিত কোনো নাটকের অভিনয়। এখন 'এরিনা থিয়েটার' বা 'থিয়েটার ইন দা রাউন্ড' বলতে বোঝায়, "অভিনয়ের জন্য একটি মঞ্চ, যেখানে ঝালর, পর্দা, পট---সবই থাকতে পারে, কিন্তু সব অভিনয়ে সবকিছু ব্যবহৃত নাও হতে পারে। আর যাত্রা বা ওই ধরনের অনেক নাট্যভঙ্গিকে আমাদের সরকারী/শিক্ষিত পরিভাষায় বলা হয় 'লোকনাট্য'। এতে একটি কৌতুকবাহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।"[১] আমাদের দেশের যাত্রা দর্শকদের মাঝখানে একটি আসরে অনেকদিন ধরে অভিনীত হয়ে আসছে। তবে প্রাবন্ধিক বলেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর নাম ছিল 'লোকনাট্য'। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, "খুব পুরোনো ও অমার্জিত একটি ফর্ম, যেটা আমরা, আধুনিক ও বিদগ্ধজনেরা, অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু হঠাৎ সাহেবরা যখন আবার এটাকেই 'থিয়েটার ইন্ দ্য রাউন্ড' নাম দিয়ে গ্রহণ করেন তখন আমরা হঠাৎ বিগলিত চক্ষে একেই আবার সবচেয়ে আধুনিক ও বৈপ্লবিক রীতি বলে স্বাগত জানাই।"[২] কিন্তু শম্ভু মিত্রের স্পষ্ট

বক্তব্য, 'আমরা আমাদের দেশের পটভূমিকাতেই আমাদের থিয়েটারকে বোঝবার চেষ্টা করি, কোনো পশ্চিম-থেকে-আমদানি-করা পরিভাষায় বিভ্রান্ত না হয়ে'।

বহু প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় নাটক অভিনয়ের প্রচলন ছিল। সেই নাটকের রূপ কেমন ছিল, যদিও সে বিষয়ে তেমন কিছুই জানা যায় না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ অভিনয়ের উল্লেখ আছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল প্রভৃতি স্থানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান বা 'পার্বণের মধ্যেই নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি'। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিনয় রীতিরও রূপ বদলেছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ, সেখানে নাচ-গান-অভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে নৃত্য-গীতি প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। 'জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী গীতে পারদর্শিনী ও নৃত্যে পটীয়সী ছিলেন'। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ-র পরে রচিত হয় মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলিও নৃত্য সহযোগে গীত হোত। তবে চৈতন্য যুগে এসে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়ও রয়েছে। এই সময় কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অবলম্বনে রচিত হয় কৃষ্ণযাত্রা। সেখানে কৃষ্ণের জন্ম, কালিয়দমন, কংসবধ ইত্যাদি যে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা জানা যায়। এছাড়াও রামযাত্রা, মহামারীর সময়ে শীতলযাত্রা বা ওলাবিবির যাত্রা, এগুলোও ছিল। চৈতন্যদেবের সময়ে যেমন উদার প্রেমধর্মের জয়গান প্রচারিত হয়েছিল, তেমনি আবার চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, সংকীর্ণতা গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল।

তারপর দেশে ইংরেজদের আগমন ঘটে। ১৬৯০ এ জব চার্নক কলকাতা নগরীর পত্তন করেন। ১৭৫৭তে পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৭০-এ 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এবং এসবের সঙ্গে ১৭৭৪ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী স্থানান্তরিত হোল কলকাতা। এই সময় বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোর, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যাত্রার প্রসার ঘটতে থাকে। প্রবন্ধ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরমানন্দ অধিকারী, শিশুরাম অধিকারী, লোচন অধিকারী প্রমুখের যাত্রাদল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাত্রাদলের মালিকদের 'অধিকারী' বলা হোত। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন নির্দেশক, পালার লেখক, সংগীতনির্দেশক, এবং কখনো কখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনেতা। তাঁরাই যাবতীয় ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতেন। এই পালাগুলির বিষয় ছিল কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন অথবা ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টি বিদ্যাসুন্দর।"

কলকাতা নগরীর 'গড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে একশ্রেণীর বড়লোকের সৃষ্টি হয়'। এই বড়লোকরা তাঁদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাত্রার আসর বসাতেন। এর বাইরে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের নিদর্শন মেলে ১৭৯৫ সালে। তথ্যানুযায়ী জানা যায়,১৭৯৫ সালে রুশ দেশীয় যুবক গেরাসিম লেবেদেফ্ ইংরেজি 'দ্য ডিসগাইজ' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' নামে মঞ্চস্থ করেন। এটাই প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের

নমুনা। এ নাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করেছিলেন এবং নাটকের প্রবেশ মূল্য ছিল চার টাকা ও আট টাকা। নাটকটির অভিনয় ভীষণভাবে সফল হয়েছিল। সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়েই লেবেদেফ দ্বিতীয়বার অভিনয়ের কথা ভেবেছিলেন। এই অভিনয়ের জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। প্রচুর অর্থ-মূল্যে ('এক স্বর্ণ মোহর দর্শনী' মূল্য) এর টিকিট বিক্রি হয়েছিল। পরে লেবেদেফ্ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় দর্শকদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। এছাড়াও লেবেদেফ্ জানিয়েছিলেন যে, এই নাটকটির পিছনে তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ হলো শ্রীগোলকনাথ দাস নামে শিক্ষকের মতো একজন ব্যক্তির সাহায্য লাভ। গোলকনাথ দাস এই নাটকের জন্য মঞ্চ নির্মাণ, দৃশ্যপট অংকন, অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় করে নিয়ে আসা, অভিনয়ের জন্য জোগাড় করে আনা ব্যক্তিদের যথাযথ ভাষা শেখানো---ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব তিনি পারদর্শিতার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

এরপর ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে থিয়েটারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুই থিয়েটারের মাঝে যে সময় সেখানে কিন্তু আর কোন থিয়েটারের অর্থাৎ প্রসেনিয়াম্ মঞ্চের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে,"লেবেদেফ্-এর একক প্রচেষ্টা এদেশে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কেননা বাঙালিরা তখনো রঙ্গমঞ্চসচেতন হয়নি। এবং পরবর্তীকালে যে-থিয়েটার পাই, তা ইংরেজদেরই অনুকরণ।"[৩] তবে বাংলা অভিনয়ের ক্ষেত্রে লেবেদেফ্-এর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। যদিও এই দুটি অভিনয়ের পরেই লেভেদেফ নিজের কাজ নিয়ে বিদেশে চলে যান। আর শ্রীগোলক দাস সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি আগে কোন্ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে কীভাবে বা কী কাজের মধ্যে দিয়ে, সেসব সম্পর্কে কোনোপ্রকার তথ্য মেলেনা। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন, এমন একজন গুণী মানুষের বিষয়ে "আমরা অন্ধকারে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।"[৪] তবে সেই সময়ে অভিনয়ের জন্য এত অ্যারেঞ্জমেন্ট একজন মানুষের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, আজ ভাবতে গেলে আমরা সত্যি অবাক হই। তখনকার দিনে এত কম সময়ের মধ্যে তিনি এত অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় করেছিলেন কোথা থেকে? প্রশ্ন জাগে। অহীন্দ্র চৌধুরী মনে করেন, 'অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করা হয়েছিল ভ্রাম্যমান সারী-জারী-কীর্তনীয়াদের দল থেকে'। এই অভিনয়ের যে প্রভাব প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন তা দেখা যাক।

প্রথমত, তখন যে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হোত, তার কোন অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন ছিল না। "দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এমনিই চলে যেতো। দ্বিতীয়ত, অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের কোনো রীতি ছিলো না। অভিনেতারা তাঁদের পার্ট বলা বা গান গাওয়া হয়ে গেলে আসরের মধ্যেই বসে পড়তেন, আবার পরবর্তী দৃশ্যে প্রয়োজন হলে উঠে পড়তেন। লেবেদেফ্ প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের প্রভাবে এই রীতির পরিবর্তন শুরু

হোল।...এই প্রভাবটা এসেছিল অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে এবং বোধহয় স্বয়ং গোলক দাসের কাছ থেকে।"[৫]

এই পরিবর্তনের প্রমাণ মেলে, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কলিরাজার যাত্রা'য়। 'কলিরাজের চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় গমন' এই নাটকের বিষয়। সেখানে "একজন বৈষ্ণব, একজন সাহেব, আর সপরিচারক তাঁর স্ত্রী। এই নাটকে অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করতেন, অভিনয় শেষে প্রস্থান করতেন।"[৬] আগে যেখানে মঞ্চে অভিনেতারা একসঙ্গে উঠে যেতেন, এবং মঞ্চেই তারা বসে থাকতেন। এই প্রথম মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানের রীতি অনুসরণ করা হোল। এই অভিনয়ে লেবেদেফের থিয়েটারের প্রভাব লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে 'নাটকটির অভিনয় বিশেষ সফল হয়েছিল এবং সেকালের পত্র-পত্রিকাতে প্রশংসিত' হয়েছিল। এসব থেকে বোঝা যায়, তখন থেকেই 'পুরনো যাত্রাকে নতুন রূপ' দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২২ সালে 'নলদময়ন্তী' নামে এরকমই আর একটি পালা অভিনীত হয়। তবে ধীরে ধীরে এরই সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবও অভিনয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, এবং ১৮৩১ এ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঐতিহাসিক পালাবদল। হিন্দু থিয়েটারে তখন 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের নির্বাচিত অংশ, উইলসন্-এর তত্ত্বাবধানে 'উত্তর রামচরিত'-এর অনুবাদ ইত্যাদি অভিনীত হতে থাকে। "হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সাহেবদের মতো অভিনয় করতে পারার জন্য বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন। বৈষ্ণবচরণ আঢ্য নামে এরকম একজন যুবক 'সাঁ সুসি' থিয়েটারে ওথেলের ভূমিকায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।"[৭] এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলতে ছাড়েননি যে, ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের 'সাঁ সুসি'র মতো ফরাসি নামকরণ থেকে বোঝা যায়, ইংরেজরা নিজেদের থেকে ফরাসিদের বেশি সংস্কৃতমনা ভাবতেন। এই ধরনের হীনমন্যতা সূচক ভাবনা থেকেই তারা থিয়েটারের ফরাসি নামকরণ করেছিলেন 'সাঁ সুসি'। আমরা ভারতীয়রা যেমন নিজেদের সংস্কৃতিকে নিজের না ভেবে পশ্চিমের জিনিসকে বেশি আপন করতে যাই, ঠিক সেরকম ব্যাপার আর কী।

এ সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার পাতায় লেখা হয়েছিল, 'বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য বাঙালিদের একটা মঞ্চ থাকা উচিত, যেমন আছে বোম্বাইতে গ্র্যান্ট রোড থিয়েটার'। একটা প্রেক্ষিত এমনিতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর এই ধরনের লেখা কিছু বাঙালিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করলো। আমরা দেখতে পাই ১৮৩৫ সালে ধনী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার নানা অঞ্চলে প্রসিনিয়াম মঞ্চ গড়ে উঠতে থাকে। আর সেই রঙ্গমঞ্চগুলির প্রেক্ষাপট ছিল আঁকা, এবং এখানে ব্যবহৃত 'পোষাক-পরিচ্ছদগুলিও খুব দামী ছিলো'। এই ধরনের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যে নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল, সেগুলি হোল--- ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নাট্যরূপ,

'সংস্কৃত নাটকের বাংলা তর্জমা, অথবা সংস্কৃত নাটকের রীতিতে রচিত কোনো পৌরাণিক নাটক'। এভাবেই বাংলা থিয়েটার পায়ে পায়ে চলতে শুরু করে।

পন্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলিনকুলসর্বস্ব' নামক নাটক ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটিই প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক, আবার এটিই প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ হয়েছিল, বিভিন্ন সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ, বাংলার মনীষীরা যার দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন---'সেই চিন্তাধারার প্রভাব থিয়েটারেও লক্ষ্য করা যায়'। সেসময় সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে আঘাত করার জন্য থিয়েটার সবচেয়ে শক্তিশালী একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। যাত্রার মধ্যে যে 'নাটকীয় তীব্রতা সৃষ্টির' একটা উদ্দেশ্য কাজ করতো, এই সময় থেকে ধীরে ধীরে তা 'অপেরার ধরন ত্যাগ করে সংলাপপ্রধান হয়ে উঠেছিল'। তবে এর 'নাটকীয় সংলাপের ভাষা' তখনও কিন্তু তৈরি হয়নি। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের যে সংলাপ তা কথ্যভাষা থেকে গৃহিত হয়েছিল, 'কিন্তু যে-তীক্ষ্ণতা কথ্য ভাষায় টেনশন সৃষ্টি করতে পারে', তা এখানে ছিল না।

নাটকীয় সংলাপে 'তীক্ষ্ণতা' ও 'টেনশন' সৃষ্টির অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল অনেক পরে, ১৮৫৯ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক থেকে। মধুসূদন কলকাতায় আমন্ত্রিত হয়ে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে বিস্মিত হন, এই নাটক দেখার জন্য লোকের এত উৎসাহ! ইংরেজি সাহিত্যের সুপাঠক মধুসূদন ইংরেজি নাটক সম্পর্কে জানতেন। তাই 'রত্নবলী'র মত নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। এই অভিনয় দেখে মুখ ফুটে তিনি বলেই ফেলেন, 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে'। বাংলা নাটকের অবস্থা দেখে তিনি সত্যই হতাশ হন, আক্ষেপ করে বলেন, 'রাজারা এই তুচ্ছ নাটকের জন্য কী বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন।' নাটক সম্পর্কে এইরকম মনোভাবের জন্য মধুসূদনের বন্ধুরা মধুসূদনকে একটি নাটক লিখতে অনুরোধ করেন। তিনিও লিখবেন বলে কথা দিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ওই বছরই তিনি লিখে ফেললেন।

ঠিক তার পরের বছর দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হোল। তৎকালীন 'নব্যবঙ্গ' এবং রক্ষণশীল সমাজ-প্রসঙ্গ প্রহসন দুটির বিষয়। দু'টো নাটকই 'ঝরঝরে কথ্যভঙ্গিতে লেখা' এবং নাটক দু'টি মধুসূদনের ভাষার গুণে আজও উপভোগ্য। 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ে যাত্রার ধরণ অনুসৃত হয়েছিল। নাটকটির অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সে সময় মধুসূদনের মনে হয়েছিল 'পদ্যাংশ অভিনয়ের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের দরকার'। পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'তে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটালেন। যেহেতু শম্ভু মিত্রের একটি প্রিয় ক্ষেত্র আবৃত্তি, তাই মধুসূদনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি 'পুরনো ছন্দ এবং নতুন ছন্দ থেকে বাংলায় আবৃত্তি করে' কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন---- "কাশীরাম দাসের মহাভারতের ছন্দ এইরকম ভাবে বলা হোত:

মহাভারতের কথা। অমৃত সমান।।
কাশীরাম দাস ভনে। শুনে পুণ্যবান।।

এই পাঠের ধরন অনুসৃত হোত পুরোনো যাত্রার রীতির মধ্যে---সুর করে অনেকটা গানের মতো করে বলা হোত। কিন্তু সাধারণ চরিত্রগুলোর অভিনয়ে বানিয়ে বলবার সময়ে একেবারে গদ্য ব্যবহার করা হোত। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতক থেকে এই ধারা বিবর্তিত হয়ে এমন একটা রীতির উদ্ভব হোল যেটা গদ্যের অনেক কাছাকাছি। মধ্য-উনিশ শতক থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক যেটা বলার ধরন একটু পৃথক:

কে হেরিল সরোরুহ হইয়া নির্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়।
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।"[৮]

কিন্তু মধুসূদন দত্ত যে কাজটি করলেন, তার 'প্রবহমানতা'ই আলাদা। মধুসূদন সৃষ্ট-নাট্য এক অন্যরকম গতি নিয়ে হাজির হোল বাংলা নাট্যসাহিত্যে। আমরা পূর্বের উদাহরণের সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে 'পদ্মাবতী' নাটকের ভঙ্গির সঙ্গে পূর্বোক্ত ধারার তফাৎটা লক্ষ্য করব। 'পদ্মাবতী' নাটকে যে 'প্রবহমানতা' মধুসূদন এনেছিলেন, তা দেখা যাক---

"একি? ওই না সে পদ্মাবতী
আয় লো কামিনী
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে।"[৯]

এই চমক লাগানো আধুনিক রীতির সূত্রপাত ঘটল 'পদ্মাবতী' নাটকে। পরবর্তী সময়ে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে এই রীতির চমৎকার অনুসরণ ঘটেছে, যা মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্য থেকে প্রাবন্ধিক একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেটি উল্লেখপূর্বক প্রাবন্ধিকের কথা দিয়েই আলোচনা এই পর্যন্ত সীমায়িত করছি----

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি
কোন বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধী
রাঘবারি?

বাংলা কাব্যের এই শক্তি, এই ঐশ্বর্য আগে কখনো লক্ষ করা যায়নি। আর অহীন্দ্রবাবু বলেন, মধুসূদনের ওপর থিয়েটারের দাবি তুলনায় বেশি, কেননা নাটককার রূপেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।"[১০]

তথ্যসূত্র :

১) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ৫৫
২) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ৫৮
৩) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ৫৯
৪) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬০
৫) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬০
৬) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬০
৭) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬০
৮) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬২
৯) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬২
১০) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৬২-১৬৩

সাহিত্যে অস্তিবাদের ভাবনা

তাপস দে
গবেষক, দর্শন বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রতিদিনকার টেলিভিশন, সংবাদপত্র বা যেকোনো গণমাধ্যম কিংবা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত ভেসে ওঠে সারা বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক দলাদলিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, বৃদ্ধাবাস কিংবা শ্রেণী অস্পৃশ্যতার বাতাবরণে কোথাও সোনার ভান্ডারে জমছে সোনার ডিম, কোথাও আবার বিজ্ঞাপনের বাহার 'অপুষ্টি ভারত ছাড়ো'। সারা পৃথিবী আজ ধর্মীয় অজুহাতে আপন আপন শক্তি প্রদর্শনে মেতে উঠেছে মৃত্যু-যজ্ঞে। জীবনটা এতটাই সস্তা যে, কবির ভাষায়-

> *"ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে মানুষ ছিল নরম কেটে ছড়িয়ে দিলে পারতো ।"*[১]
>
> কিংবা-
>
> *"সবচেয়ে সস্তা তো মানুষের মাংস সেটা খেলেই দামটা কমত... ।"*[২]

সবকিছু মিলিয়ে সভ্যতা ও সভ্যতার মানুষ আজ বিপন্ন--- অস্তিত্বের সংকটে। জীবন মানেই গতিশীল ঘটনা প্রবাহ, জীবনের ভাষা মানেই সাহিত্য-সংস্কৃতি, যা আমাদের প্রতিদিনের ঘটনাগুলিকে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে চলে। জীবনের অস্তিত্ব-বোধের বেদনা কিংবা আনন্দ মূর্ত রূপ পায় সাহিত্যের ভাষায়, রূপ পায় সাহিত্যের অলংকারে, তার যতি-চিহ্নে। সুতরাং দর্শনের উপলব্ধ চেতনা বোধ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। আবার সাহিত্যের শরীরে দর্শনের প্রাণ বাসা বাঁধে। তখন সাহিত্য হয়ে ওঠে জীবন্ত। দর্শন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই অর্থ–অর্থান্তরের, একে অপরের সাথে লীন হয়ে যাওয়ার। এইজন্য 'শ্রুতি' বা 'স্মৃতি' শাস্ত্র একদিকে যেমন দর্শনের গূঢ়-তত্ত্বে সজ্জিত, তেমনই সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি উপাদানগুলিও তার মধ্যেই নিহিত। সেইরূপ বাংলা সাহিত্যের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ থেকে পাশ্চাত্যের সার্ত্র, নীটসে, দেরিদা, ক্যামুও প্রমুখ ব্যক্তির সাহিত্য চর্চায় উঠে এসেছে দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব। অস্তিত্বের এই সূত্র ধরে এই পরিসরে- দর্শন ও সাহিত্য কীভাবে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে এবং দর্শন বা ফিলোসফির নির্যাস কীভাবে আমাদের প্রতিদিনকার মূর্ত বাস্তব জীবনের অস্তিত্বের ঘটনা প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের লক্ষ্য উত্তরণের পথে নিয়ে যায়, সে বিষয়ে একটি আলোচনার প্রয়াস।

মূল শব্দ : দর্শন, সাহিত্য, জীবন, জীবন-যন্ত্রণা, অস্তিত্ব, অস্তিত্ব-সংকট, সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতা, মুক্তি।

মূল আলোচনা :

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে 'অস্তিত্ব' বলতে ঠিক কি বুঝায়? তারও আগে জিজ্ঞাসা নিমিত্ত কৌতূহল জাগে 'অস্তিত্ব' সংকটের এবং আলোচনার বিষয় কেন? উত্তরে বলা যায় প্রতিমুহূর্তে আমরা অস্তিত্বের সংকটে– তাই। কেননা, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা মানুষকে তার নিজের জগতে, নিজের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা তথা অস্তিত্ব বিষয়ে প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। এই সকল অস্ফুটভাব ও বেদনা মূর্ত রূপ পায় দর্শন ও সাহিত্যে--- কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রেডক্রস সংস্থার একজন কর্মী গ্যাব্রিয়েল মারসেল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণে বলেন, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের শরীরে এবং শয্যার সাথে একটি নম্বর আঁটা থাকতো। যে সৈনিকটি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সকলের সুরক্ষার জন্য দেশের সেবা করতে গিয়েছিলো, কিন্তু এখন তার পরিচয় নিছক গাণিতিক সংখ্যা। তার ব্যক্তি-পরিচয়, আত্মীয়-স্বজন, স্নেহ-ভালোবাসা সমস্ত কিছুই যেন মুছে গেছে। সমগ্র পৃথিবীতে বিংশ-শতাব্দীর যন্ত্র শাসিত যুগের আগে একটা ছন্দ ছিল, একটা সুষম ঐক্য ছিল। কিন্তু, সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ, নানা যন্ত্র, ছোট-বড়ো নানা যুদ্ধ, পেশাগতবিভাগ সবকিছু মিলে মানুষকে একে অন্যের কাছ থেকে, সমগ্র পৃথিবীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। চ্যাপলিনের নির্বাক চলচ্চিত্র 'দ্য মডার্ন টাইম'এ আমরা দেখি যন্ত্রযুগের যান্ত্রিক মানুষকে; যে পেশার নিয়মে এতটাই যান্ত্রিক যে সামান্য কিছু অসামঞ্জস্য বা উঁচু কিছু দেখলেই তা আঁটতে বা টাইট দিতে ছুটে যায়- যেখানে বাদ যায় না মেম সাহেবের কোর্টের বোতামও। একই ছবি আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে, যেমন- 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'তে আধুনিক জীবনে যন্ত্রের ভয়াবহতা এবং তা কিভাবে মানুষকে মানবতাচ্যুত করে তোলে তা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের এই সকল হতাশা, বেদনা, লাঞ্ছনা, সন্দেহ, বিচ্ছিন্নতার ব্যথা, সব কিছু মিলিয়ে মানুষের অস্তিত্বের প্রকাশ। এখন আসা যাক অস্তিত্ব কি- এই বিষয়ে।

সাধারণভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে যারা যুক্তিবাদী দার্শনিক যেমন প্লেটো, দেকার্ত, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক প্রবর মনে করতেন মানুষের একটি সারধর্ম আছে যা মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সারধর্ম হল 'মনুষ্যত্ব'। আবার আধ্যাত্মিকবাদীদের মতে জীবন ও জগত সবকিছুই ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় ঈশ্বর বা সামান্য ধর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মানুষের স্বাধীনতার আর কোন মূল্য থাকে-না। তাই অস্তিবাদীরা বলেন সামান্য ধর্ম নয় বরং মূর্ত বাস্তবতাই মানুষের সারধর্ম- যা মানুষকে প্রতিনিয়ত জীবন নির্বাহের মধ্য দিয়ে, জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি, সংগ্রাম ও পরিণতির মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হয়।

পাশ্চাত্যের অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সোরেন কিয়েরকেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫), কার্ল ইয়াসপাস (১৮৮৩-১৯৭১), গ্যাবরিয়েল মারসেল (১৮৮৯–১৯৭৫), ফ্রিডরিশ নীটশে (১৮৪৪–১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯–১৯৭৬), জাঁ-পল-সার্ত্র (১৯০৫–১৯৮০) প্রমুখ ব্যক্তি। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক দেকার্ত'এর 'আমি চিন্তা করি অতএব, আমি আছি'- এই মতের ভুল ধরিয়ে কিয়েরকেগার্দ বলেন, আসলে ব্যাপারটা উল্টো 'আমি আছি বলেই আমি চিন্তা করি'।

অস্তিবাদী দার্শনিকদের মতে অস্তিত্ব দুই প্রকার- প্রাকৃত অস্তিত্ব ও যথার্থ অস্তিত্ব। প্রতিদিনকার জীবন-যাপনে ব্যক্তি যে কাজগুলি করে, যেগুলি অন্য সকলেও করে; বলা যেতে পারে মানুষ পরিবেশের কাছে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রীতি-নীতি ও প্রথার অধীনতা স্বীকার করে নেয় বিনা দ্বিধায়। এই কাজের মধ্যে ব্যক্তি যদিও কোন স্বাতন্ত্র্যবোধ উপলব্ধি করে না। তাই অস্তিবাদীরা দ্বিতীয় প্রকারের কাজের কথা বলেন। যে কাজ ব্যক্তির অস্তিত্বের সাথে জড়িত। যে কাজ সমস্ত রকম প্রাকৃতিক, সামাজিক পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তির নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখে। তখনই ব্যক্তির অস্তিত্ব যথার্থ হয়ে ওঠে। আর এই প্রকার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ব্যক্তি যখন কোন সংকটের মধ্যে পড়ে, যখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যে সিদ্ধান্তে সে সফল নাও হতে পারে। তখনই সে বুঝতে পারে সে 'আছে', সে একজন 'ব্যক্তি-মানুষ'। এইরূপ একটি সংকটের উদাহরণ দিয়েছেন জাঁ-পল-সার্ত্র তাঁর 'অস্তিবাদ একটি মানবতাবাদ' বক্তৃতায়। যেখানে তাঁর একটি ছাত্র তাঁর কাছে এসেছিল কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারায়- একদিকে অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য কোথাও যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, আবার প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান না করলে প্রতিবেশীরা তাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে। এইরূপ উদাহরণ আমরা পাই আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন পর্যায়ে। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনও এইরূপ সংকটের স্বীকার হন। এরূপ সংকটের মধ্যে পড়লে তবেই আমাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। আর এইরূপ উপলব্ধি আছে বলেই আমরা ব্যক্তিকে দেখি- সে একজন শিল্পী, সে একজন সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সৈনিক, শ্রমিক এবং আরও বিচিত্ররূপে।

হাইডেগার-এর কাছে 'অস্তিত্ব' বলতে মানুষ যখন নিজের চরম সম্ভবনাকে সফল করবার জন্য এগিয়ে যায় তখনই তার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয় একাকীত্বকে সে বুঝতে পারে। এই চরম সম্ভাবনা হাইডেগারের কাছে ব্যক্তির 'মৃত্যু'। কারণ মৃত্যুই ব্যক্তির জীবনকে পূর্ণরূপ দিতে পারে।[৩] আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। মৃত্যুই আমাদের জীবনের প্রধানতম সম্ভাবনা, কারণ এর সংঘটন অবশ্যম্ভাবী এবং এই একটিমাত্র কাজে একটি ছাড়া দুটি পথ নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আমরা পূর্ণ সত্তার উপলব্ধি করি। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত হলেও মৃত্যুর ক্ষণ অনিশ্চিত, এই অনিশ্চিত নিশ্চয়তা ব্যক্তির উদ্বেগের সৃষ্টি করে। তখন মৃত্যুর সম্বন্ধে সচেতনতাই ব্যক্তির মনে এই বোধ জন্মায় যে- যাকে আমরা সত্তা বলে মনে করি তা আসলে শূন্যতা।

মৃত্যুর ধারণার বেশ প্রভাব দেখা যায় অস্তিবাদী সাহিত্যিক আলবেয়ার ক্যামুর রচনায়। তাঁর মতে, জীবনের সবকিছুই অর্থহীন, অযৌক্তিক, কারণ শেষে মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। মৃত্যুকে গ্রহণ করার মধ্যেই ব্যক্তি নিজের স্বরূপ ও পূর্ণ স্বাধীনতার তাৎপর্য লাভ করে।[৪]

আবার সার্ত্রের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বাধীনতার উপলব্ধির মধ্যেই মানুষ তার প্রকৃত অস্তিত্বকে বুঝতে পারে। কেননা মানুষ অনুভব করে তার জীবনে উদ্দেশ্য আছে, সম্ভাবনা আছে। সে জানে এই অচল, অনড় বস্তুর থেকে সে পৃথক এবং তার অস্তিত্বকে যুক্তির ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যক্তি আরও উপলব্ধি করে, সে যে কাজ করে তারও কোন যুক্তি নেই, কেন সে একটা কাজ ঠিক না করে আর একটা করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতনতা, চারপাশের বাধা সৃষ্টি করা জগৎ সম্বন্ধে বিরক্তি, নিজের যুক্তিহীন জীবনের প্রতি ক্ষোভ, পৃথিবীতে পরিত্যক্ত অসহায় অবস্থার জন্য রিক্ততা বোধ, স্বাধীন সিদ্ধান্তের সফলতার অনিশ্চয়তা-অনুভুতি সমস্ত কিছু মিলিয়ে সার্ত্রের মতে ব্যক্তির অস্তিত্ব গড়ে ওঠে।[৫]

এক কথায়, অস্তিত্বের চরম প্রকাশ কোন কর্মপন্থা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কালেই ঘটে। শুধু জ্ঞানে অস্তিত্বকে জানা যাবে না, ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে হবে। ‘আমার অস্তিত্ব আছে’- এ কথার অর্থ- আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে উৎপাদন করি, আমি নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমার যথার্থ অস্তিত্ব আমার কাছে প্রদত্ত নয়; আমাকে তা অর্জন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অস্তিত্বের ভাবনা কেবল আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনেই নয়, আমাদের প্রাচ্যের দর্শনে এই ভাবনার প্রকাশ অনেক আগেই বিদ্যমান। যেমন ‘উপনিষদ’ তথা ‘ঈশোপনিষদ্’এর আলোচনা শুরু হয় কিছুটা অস্তিবাদের সূত্র ধরে- “ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ”।[৬] এখানে ‘ইদম্’ অর্থাৎ ‘সোহম্’ অস্তিত্বের নির্দেশক। আবার বিবেকানন্দের ‘Being’ থেকে ‘Becoming’-এর উত্তরণে অস্তিবাদী ভাবনারই প্রতিফলন। আর অস্তিবাদের মূল প্রত্যেয়টি পাওয়া যায় ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধ দর্শনে ‘ক্ষণিকত্ববাদ’ বা ‘ক্ষণভঙ্গবাদ’-এর আলোচনায়।

এখন দেখা যাক অস্তিত্বের এই ভাবনা কীভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক হয়। বাংলা সাহিত্যে যার প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম উঠে আসে অর্থাৎ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক লেখায় অস্তিবাদের প্রসঙ্গ দেখা যায়। যেমন, ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘ওরা কাজ করে’, ‘ছিন্নপত্র’, ‘বিসর্জন’, ‘রক্তকরবী’তে অস্তিবাদের আভাস স্পষ্ট। ‘রক্তকরবী’ নাটকে যে সমস্ত শ্রমিকরা সোনার খনিতে সোনা আহরণের কাজ করতো তাদেরও ছিল না কোন নাম, ছিল না কোন স্নেহ-পরিচয়, তারা যেন কেবলই যান্ত্রিক, কেবল কতগুলি বিমূর্ত গাণিতিক সংখ্যার প্রতীক। একই ছবি দেখা যায় সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিতে।

আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রভৃতি উপন্যাসে অস্তিবাদী-ঈশারা চোখে পড়ে; চোখে পড়ে একাকীত্ব, সংশয়, সাময়িক অর্থহীনতাবোধের মধ্য দিয়ে।

বিংশ-শতাব্দীর বাংলা ভাষায় 'হাংরি-আন্দোলন'-এর ঝোঁক ছিল প্রবল। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহে অস্তিবাদের বীজ নিহিত ছিল কবি জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, জয় গোস্বামী, তুষার রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের রচনায়। জীবনানন্দের 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর' কবিতায় অস্তিবাদী বিযুক্তি সংশয়ের অর্থশূন্যতার এক পরাবাস্তব জগৎ গড়ে উঠেছে। 'আট বছর আগে একদিন' এই কবিতায় অস্তিবাদের বাস্তবতা আরও প্রকট। যেখানে তিনি লেখেন-

"শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে"।[৭]

বা যখন তিনি বলেন—

"জানি-তবুও জানি
নারীর হৃদয়–প্রেম–শিশু–গৃহ-নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়-
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে;
ক্লান্ত ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে"।[৮]

এখানে একদিকে যেমন কিয়েরকেগার্দ-এর 'মৃত্যুর মুক্তি', তেমনই সার্ত্র-এর 'সত্তা ও শূন্যতা' সবকিছুই যেন একাকার হয়ে গেছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় কোন এক ফেলে আসা 'অবনী'র খোঁজ চলে নিরন্তর। তাঁর ভাষায়-

''অবনী বাড়ি আছো ?''[৯]

আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'জরাসন্ধ' কবিতায় অস্তিত্বের নিক্ষিপ্ততার উপলব্ধি ব্যক্ত হয়, যেখানে তিনি লেখেন-

"আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।
...

আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে
এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি”।[১০]

কিংবা বহু পড়িত সেই উক্তি-
“যেতে পারি কিন্তু কেন যাব ?”[১১]

- যেখানে কবির অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দোদুল্যতামান অবস্থা সহজেই ধরা পড়ে। এই নিরন্তর জিজ্ঞাসা শুধু কবির একার নয়; আমাদেরও।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘুণপোকা’, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’, সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ প্রভৃতিতে অস্তিবাদী চিন্তার প্রতিফলন সহজেই চোখে পড়ে।

নাট্যকার বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, নাবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’, ব্রাত্য বসুর ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ প্রভৃতি নাটকে অস্তিবাদের বলিষ্ঠ প্রত্যয় প্রস্ফুটিত হয়। যেমন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে বাদল সরকার লেখেন-

“আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই। পাহাড়ের ঐ চূড়োর কোন মানে নেই। ...তবু ঠেলতে হবে”। [১২]

কিংবা,

“ভুলে যাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার অস্তিত্ব একটা ধূলিকণার চেয়েও অর্থহীন”।[১৩]

যদিও বাদল সরকারের অস্তিবাদী ধারণা বেশিরভাগটাই রাজনৈতিক মতাদর্শগত। যেখানে সংকট, বেকারত্ব, পুঁজিবাদ, শ্রেণি-বৈষম্য ইত্যাদি প্রকট হয়ে ওঠেছে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে অক্ষয় কুমার বড়ালের কবিতায়-

“বৃথা আসি বৃথা যায়, কিছুই উদ্দেশ্য নাই”।[১৪]

কিংবা, ‘ফ্যাতাড়ু’ বা ‘কাঙাল মালসাট’ প্রভৃতি উপন্যাসে প্রতিপদেই বাস্তবতার বিনির্মাণ ঘটেছে।

ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘যুক্তি তর্ক আর গপ্পো’, মৃনাল সেনের ‘পদাতিক’ সত্যজিৎ রায়ের ‘কোরাস’, ‘আগন্তুক’, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ প্রভৃতি সিনেমাতে অস্তিত্বের সংকট আরও সাবলীলভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কবি বিনয় মজুমদারের ‘ফিরে এসো চাকা’ কাব্যগ্রন্থে মানব অস্তিত্বের অনিবার্য সারসত্তা-শূন্যতার কথা-

“মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়”।[১৫]

-বার বার ভেসে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় অস্তিবাদের এই ছাপ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

"দুপাশে গলি খুঁজি হোচট লাগে পায়
পলকা সংসার এখানে কার ?
জন্ম মৃত্যুর প্রগাঢ় কৌতুকে
হাসি ও কান্নার সারাৎসার।

এ যেন নিশিডাক, মৃতের হাতছানি
এ যেন কুহকের অজানা বীজ
এমন মোহময় কিছুই নয়
হৃদয়পুরে খুঁড়ে তোলা মায়া-খনিজ।

আমাকে যেতে হবে এখনো যেতে হবে
রয়েছে অশরীরী অপেক্ষায়
যেখানে ব্যাকুলতা ঢেউয়ের তালে দোলে
যেখানে ধ্বনিগুলি স্মৃতিকে খায়।"[১৬]

কিংবা, তুষার রায়ের 'মরুভূমির আকাশে তারা'য় জীবন ও অস্তিত্বের যন্ত্রনা প্রকাশ পায় তীব্রভাবে, যদিও অনেকটা তীর্যক ব্যঙ্গ সুরে। তাঁর ভাষায়-

"খুক খুক করে উঠছে কাশি, না না স্যার যক্ষা নয়
ডিসকলি করবেন না- বলুন স্যার কি করতে হবে
আপোস করতে করতে পাপোশ হতেও পারি এখন
এখন চাকরি যদি নাও দ্যান স্যার চারটে টাকা অন্তত দিন,
চিন চিনে এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা বলে ফলিডলের গুণপনা,
দরখাস্তের মাসল তুমি
চাকরি না হোক - চার বেহারার কাঁধে চেপে যাবে।"[১৭]

তেমনই 'জিরাফের ভাষা'য় ভাস্কর চক্রবর্তী বেঁচে থাকার প্রশ্নমালা গেঁথে দেন-

"বেঁচে থাকা কাকে বলে ?
মানুষ কি এভাবেই বেঁচে থাকে একা ?
খোপে বসে বই পড়ে ?
চিঠি লেখে? হাপায় ?
আচমকা মরে যায়?[১৮]

আবার অনস্তিত্বের বাসনা ও অস্তিত্বের অন্তহীনতা এক হয়ে যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লেখায়-

"এই ঘরে কতদিন আছি জানি না। জানি না আর কতদিন থাকব। শুধু জানি আমি আগেও এখানে ছিলাম না। আমার আগে যে ছিল সে মরে গেছে। তারও আগে ছিল কেউ। মরে গেছে। এই ঘরে আমার আগে যারা ছিল তারা সবাই মরে গেছে।"[১৯]

এভাবেই চলতে থাকে মৃত্যুর ছায়ায় বন্দী হয়ে থাকা মৃত্যুহীন বিড়ম্বনা, আর অস্তিত্বের যন্ত্রণা। যেখানে ৩৩টি বছর কাটিয়ে কবির দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়-

"৩৩ বছর কাটলো কেউ কথা রাখেনি,
কেউ কথা রাখে না।"[২০]

সুতরাং সংশয়-অবিশ্বাস-দ্বিধা-অপেক্ষা-নৈতিকতা-সিদ্ধান্ত সবকিছু মিলে জমা হয় অস্তিত্বের সংকট। অস্তিত্বের এই সংকট আছে বলেই ব্যক্তি বুঝতে পারে সে একজন অস্তিত্বশীল মানুষ। আর এই মনুষ্যত্ববোধ ব্যক্তির চেতনায় উদ্ভাসিত হয় বলেই আমরা ব্যক্তিকে দেখি একজন কবি রূপে, একজন সাহিত্যিক বা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কিংবা শ্রমিক অথবা আরও বিচিত্র রূপে।

এখন জিজ্ঞাসা, এইরূপ অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তির পথ কি? আলোচনার ব্যাপ্তি বিস্তৃত না করে অতি সংক্ষেপে দর্শন বা ফিলোসফির দৃষ্টি থেকে দুটি ভিন্ন উত্তর দেওয়া যায়- প্রথমত, ভাববাদী দর্শন অনুসারে 'ছোট-আমি'কে 'বড়-আমি'তে উত্তরণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর থেকে নির্গুণ ব্রহ্মের উত্তরণের মধ্য দিয়েই অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্ত হতে হবে ব্যক্তিকে। 'ঋকবেদ'এর ভাষায় "আত্মানাং বৃদ্ধি" কিংবা 'উপনিষদ'এর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে; যেভাবে অর্জুন অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক সত্তা যদি মূর্ত জগতের ব্যক্তিমানুষের রথের সারথী না-হন, তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় পথটির সন্ধান দেখাবেন জড়বাদী চার্বাক তথা মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন, যেখানে ব্যক্তির নিজের অস্তিত্বের সংকট ঐ ব্যক্তির আপন অন্তর-শক্তি জাগরণের মধ্য দিয়েই মুক্ত হওয়ার কথা বলে। যেমন, সর্বহারা মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গে মার্কস বলেন- *"শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, কিন্তু জয় করবার মতো আছে গোটা বিশ্ব"*।

আসলে অস্তিত্বের সংকটে পড়লে এবং তার প্রেক্ষিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কালেই আমরা নিজেকে একজন 'ব্যক্তি-মানুষ' রূপে উপলব্ধি করি। খুঁজে পাই নিজের মনুষ্য-সত্তাকে, খুঁজে পাই নিজের অস্তিত্বকে। সুতরাং আমার যথার্থ অস্তিত্ব আমার কাছে প্রদত্ত নয়; আমাকে তা অর্জন করতে হবে। আর এই সময়ে অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বের সংকট কালে যখন কোন এক অজানা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, যখন তার সমাধানের পথ আমাদের কাছে থাকে না, তখন আমাদের পথ দেখায় 'বেদ', 'উপনিষদ', 'বেদান্ত', 'মহাভারত', চার্বাক, মার্কস, বিবেকানন্দ সক্রেটিস কিংবা রবীন্দ্রনাথ। যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে"।[২১]

কিন্তু তারপরেই আমাদের উপলব্ধি হয়-
"তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে"।[২২]

অসীম-অনন্ত-আনন্দের বাসনা ও সম্ভবনা আমাদের সমস্ত রকমের জীবন-যন্ত্রণাকে ছাড়িয়ে আমাদেরকে অস্তিত্বের, আমাদেরকে মনুষ্যত্বের উত্তরণে এগিয়ে নিয়ে য়ায়।

সূত্র নির্দেশ :

১. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ-২০০৪, পৃ.-১৭১

২. সরকার, বাদল। *বাদল সরকার-এর রুদ্ধশ্বাস সাক্ষাৎকার* । কলকাতা: ঊনজান, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ.-প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা।

৩. ভদ্র, মৃণালকান্তি। *অস্তিবাদ; জাঁ-পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য* । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ.- ২৩।

৪. ঐ, পৃ.- ২৪।.

৫. ভদ্র, মৃণালকান্তি। *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ* । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ.-২১-২২।

৬. মুখোপাধ্যায়, গুরু শঙ্কর। *ঈশোপনিষদ* । কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০, পৃ.-৬।

৭. দাশ, জীবনানন্দ। *একালের কবিতা সঞ্চয়ন* । কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ.-১।

৮. ঐ।

৯. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ ২০০৪, পৃ.-৩৫।

১০. ঐ, পৃ.-১৭।

১১. ঐ, পৃ.-২১৪।

১২. সরকার, বাদল। *এবং ইন্দ্রজিৎ* । কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, চতুর্থ মুদ্রণ- ১৪২৪, পৃ.-৩১১।

১৩. ঐ।

১৪. সেন, নবেন্দু। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা* । কলকাতা: রত্নাবলী, 2009, পৃ.-৩৭৮।

১৫. মজুমদার, বিনয়। *কাব্য সমগ্র* । কলকাতা: প্রতিভাস, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৪, পৃ.-৩৫।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *স্মৃতির শহর* । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃ.-১০।

১৭. সেন, নবেন্দু। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা* । কলকাতা: রত্নাবলী, 2009, পৃ.-৩৭৪।

১৮. ঐ।

১৯. ঐ।

২০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *কবিতা সমগ্র* । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ 2000, পৃ.-১১৯।

২১. ঠাকুর, শ্রী রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান* । কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ.-১০৮।

২২. ঐ।

গ্রন্থপঞ্জী :

- গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *কবিতা সমগ্র* । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।
- ঘোষ, সঞ্জীব। *অস্তিবাদ ও বাংলা সাহিত্য* । কলকাতা: রত্নাবলী কলকাতা, ১৯৮৪।
- চক্রবর্তী, অরিন্দম। *ভাত কাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৪।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *মার্কসবাদ* । কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৮।
- চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।
- চট্টোপাধ্যায়, শিতাংশু। *অস্তিত্বের সংকট ও বিবিধ প্রবন্ধ* । কলকাতা: নচিকেতা প্রকাশন, ২০০৫।
- চাকমা, নীরুকুমার। *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা* । ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০।
- জানা, সুস্নাত। *পোস্টমর্ডানিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তরাধুনিক চেতনা* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।
- ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী (১-১৮ খন্ড)* । কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৩।
- দাশ, জীবনানন্দ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* । কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৪।
- বসু, প্রদীপ। *মননের সৃজনে নকশালবাড়ি* । কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১২।
- ভদ্র, মৃণালকান্তি। *অস্তিবাদ; জাঁ-পল-সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য* । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।
- ভদ্র, মৃণালকান্তি। *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ* । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

- ভট্টাচার্য, শৈলেশরঞ্জন। *অস্তিবাদ-এর মর্মকথা* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর। *জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর। *মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।
- মজুমদার, বিনয়। *কাব্যসমগ্র* । কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৪।
- মতিলাল, বিমল কৃষ্ণ। *নীতি, ধর্ম ও যুক্তি* । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১২।
- সরকার, বাদল। *নাটকসমগ্র* । কলকাতা: মিত্র ঘোষ, ১৪২৪।
- সেন, নবেন্দু। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা* । কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৯।
- স্বামী গভীরানন্দ (সম্পাঃ)। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* । কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮।
- Blackham, H.J. *Six Existentialist Thinkers.* London and New York : Routledge, 2002.

মহাভারতের ভিন্ন পাঠ : প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে'

অঙ্কিতা ঠাকুর
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।"[১]

সাহিত্য বিকাশের আদিলগ্ন থেকে অন্তত বিশ শতকের শেষ বা একুশ শতকের গোড়া পর্যন্ত আট থেকে আশি, অশিক্ষিত - অর্ধশিক্ষিত থেকে একেবারে সুশিক্ষিত বঙ্গ-সন্তানেরা এই অমৃত আস্বাদনে খুব একটা বঞ্চিত হয়নি বলেই মনে হয়। হ্যাঁ, 'একুশ শতকের গোড়া পর্যন্ত' বললাম, তার কারণ এর পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের কাছে কেমন করে যেন হরির বদলে হ্যারি পটার, কৃষ্ণের বদলে কৃশ, আর বৃকোদর ভীমের বদলে তার 'ছোটা' সংস্করণটিই হয়ে উঠল অতি পরিচিত জনপ্রিয় চরিত্র। ঠাকুমা, পিসিমার মুখে গল্পচ্ছলে শোনা সেই অমৃত সমান পুরাণ কথাগুলো ঠাকুরের সিংহাসনে লাল শালুতে মুড়িয়ে রাখা বই-এর কোনও এক গভীর অতলে যেন হারিয়ে গেল। তবে এই কথাগুলি অবশ্যই আপামর জনসাধারণ অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ সাহিত্যের অঙ্গ পুরাণ কথার চর্চা বা তার বিনির্মাণের ধারা কিন্তু আজও অব্যাহত রয়েছে। আসলে বাঙালি মাত্রেই এই নস্টালজিয়া দোষে দুষ্ট; শেকড়ের টানেই আমরা যে কোনো আলোচনাতেই শেষপর্যন্ত একাল-সেকালের চর্চায় এসেই পড়ি। আমার এই আলোচনাতেও দুই কালের কথা, দু'টি ভিন্ন সময়ের ভাবনার কথা উঠে আসবে। উঠে আসবে দুটি ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন মননের তুলনামূলক আলোচনাও। কিন্তু এক্ষেত্রে এই সেকালের সন্ধান পেতে হলে আমাদেরকে যেতেই হবে সেই বেদব্যাসের কালে বা নিদেনপক্ষে কাশীদাসের কালে। আর অন্যদিকে 'একাল'-এর যে ভাবনা তা মোটামুটি যুক্তিবাদী আধুনিক পাঠকের কাছে সেই উনিশ শতক থেকেই অনেকাংশেই গ্রহনযোগ্য হয়ে এসেছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যসম্ভারের শ্রেষ্ঠ রত্ন রামায়ণ, মহাভারতের মতো সেই অমৃত-সমান পুরাণকথাগুলি উনিশ শতকীয় আধুনিকতায় পুষ্ট, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সাধারণ বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে হঠাৎ কেমন যেন গরলসম হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। মূলত মাইকেল মধুসূদন দত্তই এই তথাকথিত বিদূষণটি প্রথম ঘটিয়েছিলেন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। মূল কাহিনিকে একপ্রকার অপরিবর্তিত রেখেই চিরায়ত নায়ক ও প্রতিনায়ক চরিত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটিয়ে যে আপাত স্থানবদলের এই

ধারা মধুসূদন শুরু করলেন, তাতে পরবর্তী সময়ে গা ভাসানোর চেষ্টা করেছেন অনেকেই। যার মধ্যে কেউ কেউ সফলতার মুখ দেখেছেন, আবার কেউ কেউ হারিয়ে গেছেন কালের অতলে। তবে একটা কথা অনস্বীকার্য, মধ্যযুগীয় দেব-নির্ভরতাকে কাটিয়ে উঠে পুরাণচর্চার এই নবতম দৃষ্টিভঙ্গিকে বাঙালি পাঠক সমাজ কিন্তু সসম্মানেই গ্রহণ করে নিয়েছে। আধুনিক কালের মহাকবি দর্শিত এই পথে পরবর্তীতে অনেক সাহিত্যিকই হেঁটেছেন, এখনও হাঁটছেন। আর সেই সূত্র ধরেই বিশ শতকের শেষার্ধে এসে একেবারে এক উলট পুরাণ কে আমরা পেয়েছি প্রতিভা বসুর কলমে। ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থে লেখিকা আমাদের চিরাচরিত মহাভারত কেন্দ্রিক ভালোমন্দের বিচার-বিশ্লেষণটিকে সম্পূর্ণ গুলিয়ে দিয়ে পাঠক মনে এক নতুন ভাবনার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। যেখানে একদিকে 'ধর্মাত্মা' বিদুর হয়ে উঠেছেন অধর্মের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে দুর্যোধন হয়ে গেছেন 'সূর্যধন'।

এ যেন এক উল্টো চশমা পরে আমাদের অতিপরিচিত মহাভারতের আখ্যানটিকে দেখা। এক কথায় বললে একে মাইকেলের মেঘনাদবধের একটি মহাভারতীয় সংস্করণ বলা যায়। একেবারে আধুনিক, যুক্তিবাদী, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাভারতের কাহিনিটির এই বিশ্লেষণ হয়তো মহাভারত কেন্দ্রিক প্রচলিত ধ্যানধারণায় সজোরে আঘাত করেছে, কিন্তু লেখিকা এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে মহাভারতের সর্বজনস্বীকৃত কাহিনিকে ভিত্তি করেই তাঁর নিজস্ব ভাবনা প্রবাহিত হয়েছে। 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থের প্রাককথন অংশে লেখিকা লিখছেন- "মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে গল্প উপন্যাস পড়বার নেশায় আমি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ে উঠেছিলাম"।[২] তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য পাওয়া সুশিক্ষিতা প্রতিভা বসু সেই কাহিনীর অলৌকিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে খুঁজতে চেয়েছিলেন যুক্তিযুক্ত বাস্তবিক ব্যাখ্যা। মহাভারতের ওপর থেকে ধর্মীয় পুস্তকের মোড়কটিকে খুলে রেখে নিছক একটি উপন্যাস হিসেবে পড়তে গিয়ে যৌবনের বিস্ময়বোধ গুলিকে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে লেখিকা যুক্তিসংগত ভাবে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর কথায়-

"মহাভারতের "মরাল" কী সেটা ভেবেও বিচলিত হলাম। কেবল এটাই মনে হতে লাগলো, এই গ্রন্থ যেন আমাকে এই শিক্ষাই দিলো যে যেমন ভালো বলে কিছু নেই, তেমনই মন্দ বলেও কিছু নেই।...ন্যায় অন্যায় বলে যা কিছু আমরা শিখেছিলাম, মহাভারতের মহারণ্যে সে দুটি ধারণার জন্মই হয়নি...ঊনত্রিশ বছর আশিতে পৌঁছেও যখন মহাভারত বিষয়ে একই বিভ্রান্তিতে পীড়িত হতে লাগলো, তখন নিজের মতটুকু লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করলাম"।[৩]

আর এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহাভারতে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের আড়ালে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মূলত তিনটি দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব আর্য-অনার্যের, বৈধ-অবৈধের,

সাদা-কালোর। এই তিনটি দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে প্রতিভা বসুর মহাভারত ব্যাখ্যা।

ব্যাসদেবের 'মনঃসাগর সম্ভূত অমৃত নির্বিশেষ' এই গ্রন্থে দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত যত গভীর তত্ত্বই থাকুক না কেন, লেখিকা এই মহাভারত নামক গ্রন্থটিকে নিছকই একটি বৃহৎ 'উপাখ্যান' হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। যে 'উপাখ্যান' একটি বিশেষ রাজবংশকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এবং সেই 'ভরত' বংশের সঙ্গে মহাভারত প্রণেতা বেদব্যাস স্বয়ং এক গভীর সংযোগসূত্রে আবদ্ধ। মূল কাহিনি অংশ পাঠ করতে গিয়ে লেখিকার ক্রমাগত উপলব্ধি হয়, এই সংযোগই মহাভারতের যাবতীয় দ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক একারণেই কোথাও যেন বিশেষ বিশেষ কিছু চরিত্রের প্রতি এক প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতবোধ ফুটে ওঠে বেদব্যাসের কলমে। এই পক্ষপাতিত্বই তাই হাজার হাজার বছর পেড়িয়ে এসেও মহাভারতকে নতুন করে দেখবার, ভাববার অবকাশ এনে দেয় আমাদের সামনে। যে কারণে বিংশ শতাব্দীতে এসেও 'মহাভারতের মহারণ্যে'-র লেখিকা পাঠকদের ভাবিয়ে তোলেন- কেন বারংবার অধর্মাচরণ করেও বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মের প্রতিমূর্তি? কেন অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও বেদব্যাস সর্বত্র স্বীকৃত, অথচ কর্ণ প্রত্যাখ্যাত? আর কেনই বা প্রথমাবধি তেমন কোনো গর্হিত অপরাধ বা অন্যায় আচরণ না করেও দুর্যোধন হয়ে ওঠে খলনায়ক? এই প্রতিটি 'কেন'রই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে সেই 'ভরত' বংশের সঙ্গে মহাভারত প্রণেতার সংযোগসূত্রে। মহামুনি বেদব্যাস সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত থাকলেও কিছু সম্পর্কের বন্ধনকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি; এই না পারার ঘটনা ইচ্ছাকৃত নাকি পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, তা পৃথক আলোচনার বিষয়। কিন্তু এই বন্ধনই যে মহাভারত কাহিনিকে বেশকিছু ক্ষেত্রে নিজের স্বাভাবিক গতিপথ বদল করতে বাধ্য করেছে, তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

বেদব্যাসের সঙ্গে ভরত বংশের এই সংযোগের কাহিনী অতিপরিচিত হলেও, আমার আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই সংক্ষেপে সেই কাহিনীটি বিবৃত করে দেওয়া প্রয়োজন। রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর সন্তান বিচিত্রবীর্যের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে, সত্যবতী বংশরক্ষার দায়িত্ব দেন তাঁর 'অবৈধ অনার্য পুত্রটিকে'। ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধা থেকে কুরুবংশের সর্বময়ী কর্ত্রী সত্যবতী হয়ে ওঠার আগেই তাঁর প্রথম যৌবনের সেই কানীন পুত্রটিই হলেন স্বয়ং মহাভারত প্রণেতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতেও জন্মসূত্রে বেদব্যাস যে অবৈধ সন্তান, এ কথায় কোনো মতবিরোধ হওয়ার কথা নয়। কারণ, এই একই পরিস্থিতিতে কুন্তী বাধ্য হন কর্ণকে ত্যাগ করতে। কিন্তু 'মহাভারতের মহারণ্যে'র লেখিকা যখন বেদব্যাসকে অনার্য হিসেবে পরিচয় করাচ্ছেন, খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে একটি বিতর্কের অবসর থেকেই যায়। কারণ

মূল মহাভারত অনুসরণ করলে এ কথা জানতে আমাদের অসুবিধা হয়না যে, সত্যবতী ধীবর রাজ দ্বারা প্রতিপালিত হলেও জন্মসূত্রে সে পুরু বংশীয় রাজা উপরিচর বসুর সন্তান এবং পরাশর মুনি শক্তি পুত্র। সুতরাং এ প্রশ্ন পাঠক মনে জাগতেই পারে যে, বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তে কোথাও অনার্য রক্তের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও কেন লেখিকা বেদব্যাসকে সত্যবতীর অনার্য সন্তান হিসেবে পরিচয় দিলেন? এক্ষেত্রে প্রতিভা বসুর স্পষ্ট যুক্তি— "দ্বৈপায়ণ নিজে কালো, তার মাতা কালো, তার পিতা কালো। সুতরাং এই তিনজনের একজনও যে আর্য নন, সে বিষয়ে কোনো তর্ক নেই"।[৪] অর্থাৎ মহাভারতকার সত্যবতী, পরাশর কিংবা বেদব্যাসের জন্ম বৃত্তান্তে আর্য সংযোগ ঘটালেও তাঁদের গাত্র বর্ণের উল্লেখেই আধুনিক কালের নৃতত্ত্ববিজ্ঞান সচেতন পাঠকের কাছে অনার্য রক্ত সংমিশ্রণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যাই হোক, বেদব্যাসের জন্মসংক্রান্ত যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এবারে আসা যাক পূর্বোক্ত সেই 'কেন'র উত্তর গুলিতে। প্রথমেই বলেছি সমস্ত উত্তরই লুকিয়ে রয়েছে বেদব্যাস ও 'ভরত' বংশের সেই যোগসূত্রে। যেই মাত্র সত্যবতী বংশরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন তাঁর সেই অবৈধ অনার্য পুত্রটির হাতে, তখন থেকেই মহাভারতের কাহিনি হয়ে উঠল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বংশের ইতিহাস বা আরও স্পষ্ট করে বলা যায় সত্যবতীর স্বীয় বংশের ইতিহাস। তাই নিজের পুত্র পৌত্রদের আখ্যান লিখতে গিয়ে মহর্ষি বেদব্যাসের কলম পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠাটা খুব একটা অস্বাভাবিক ঠেকেনি লেখিকার কাছে। সম্পর্ক যে সর্বদায় নিরপেক্ষতার অন্যতম অন্তরায়, তা আধুনিক লেখক বা পাঠক উভয়েরই অনুধাবন করতে কোনও সমস্যা হয়নি। দুর্যোধনের জন্মকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক করে তোলার ক্ষেত্রে বিদুরের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাই প্রতিভা বসুর কলমে অনায়াসে শোনা যায়, "যে কোনো ঘটনাবলীই কেউ লিখেই প্রকাশ করুন বা বলেই প্রকাশ করুন, নিজস্ব ইচ্ছে বা মতামতটাকেই রচয়িতা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না"।[৫] প্রতিবন্ধী পিতা এবং পিতৃব্যের পরবর্তী উত্তরসূরী স্বরূপ বংশে প্রথম সুস্থ স্বাভাবিক সন্তানের জন্ম সকলের কাছেই কাম্য ছিল, কিন্তু মহাভারতে দুর্যোধনের জন্মকে অস্বাভাবিক ভাবে নেতিবাচক, অশুভকর করে তোলার এক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন সরাসরি রাজভ্রাতা না হয়েও, রাজপরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য 'মহামতি' বিদুর। এখানেই লেখিকা প্রথমবার তাঁর পাঠকদের মনে সেই প্রথম প্রশ্নটি জাগিয়ে দেন। 'বিদুর'— মহাভারতের সবচাইতে শান্ত, ধীরস্থির, নির্বিবাদী, বিচক্ষণ, সর্বজ্ঞ এককথায় বললে মহানুভব অত্যন্ত ইতিবাচক একটি চরিত্র। সমগ্র মহাভারত জুড়ে যার মুখ থেকে বারংবার শোনা যায় ধর্মের বাণী, ন্যায়ের কথা, যিনি স্বয়ং ধর্মেরই অংশ। তাঁর জন্মের কাহিনিকে মহিমান্বিত করে প্রতিষ্ঠা দিতে, খানিকটা উপকাহিনিও জুড়ে দেন মহাভারতকার। যেখানে জানা যায়, অণীমাণ্ডব্যর অভিশাপে ধর্মরাজ স্বয়ং শূদ্র যোনিতে

'বিদুর' রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এহেন ধর্মের ধ্বজাধারী 'বিদুর'-এর একপেশে অন্যায় আচরণ শুধুমাত্র একবার নয়, বারংবার পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে তাঁর চরিত্রের ঘোষিত অবস্থান এবং প্রকৃত নৈতিক অবস্থানের পারম্পরিক দূরত্ব সম্পর্কে। দুর্যোধনের জন্মকে অমঙ্গলসূচক বলে প্রচার করা বা তার মৃত্যুকামনা করার মতো ঘটনা ছাড়াও কৌরবদের ছত্রছায়ায় থেকেও বারবার অন্যায় ভাবে পাণ্ডবপক্ষকে সমর্থন করা, বিভিন্ন কাজে সর্বসমক্ষে বা গোপনে পাণ্ডবদের সহায়তা করা, অকারণে দুর্যোধনের নামে কুৎসা রটানোর মতো বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে লেখিকা পাঠক মনের প্রশ্নটিকে আরও দৃঢ় করে তোলেন।

কিন্তু কেন বিদুরের প্রতি মহাভারত প্রণেতার এহেন পক্ষপাত? হিসেব মতো তো বিদুরের পাশাপাশি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুও বেদব্যাসেরই সন্তান। বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ কুরুবংশই একপ্রকার তার। তাহলে কেন শুধুমাত্র বিদুর এবং একই সাথে পাণ্ডবপক্ষের প্রতিই এই দুর্বলতা তাঁর? কেন একই পরিবারে, একই রক্ত সম্পর্কের মাঝে ভিন্ন নীতির প্রকাশ? এর উত্তর খুঁজতে 'মহাভারতের মহারণ্যে'র পাঠককে বিশেষ বেগ পেতে হয়না; যখন লেখিকা স্পষ্ট করে দেন— “এঁরা অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দ্বৈপায়ণের রক্তে জন্মালেও তাঁর কেউনা।... যে একটি মাত্র পুত্র তাঁর, তার নাম বিদুর”।[৬] সমীকরণটা এবার পাঠকের কাছে খুব সরল হয়ে যায়। জন্মসূত্রে একজন অবৈধ অনার্য ব্যক্তির প্রকৃত পিতৃত্ব বিকশিত হয়ে উঠছে তাঁর একমাত্র আত্মজকে কেন্দ্র করে। কারণ বাকি দুজনের ক্ষেত্রে কাজ করেছে শুধুই কর্তব্যবোধ। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ সন্তান। ব্যাসদেবের সঙ্গে তাদের পিতৃপরিচয়ের সম্পর্ক নই। একমাত্র বিদুর তাঁর নিজস্ব। শুধুমাত্র রক্তেই নয়, রানী অম্বিকার সেই অপরূপা দাসীর সাথে বেদব্যাসের মিলন ছিল সব অর্থেই আন্তরিক। তাই 'বিদুর' যথার্থই হয়ে উঠেছে তাঁর আত্মজ। তবে প্রাচীন নিয়োগ প্রথা অনুযায়ী ক্ষেত্রজ সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করা যায়না এবং শুধুমাত্র নিয়োগকার্য ছাড়া সন্তানের সঙ্গে কোনোরূপ সংযোগ থাকাও কাম্য নয়। কিন্তু মহাভারতে আমরা দেখতে পাই, অদ্ভুত ভাবে মহর্ষি বেদব্যাস হয়ে ওঠেন কুরু বংশের ভাগ্য নির্ধারক। বারংবার বিভিন্ন সময়ে তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হন তাঁর আখ্যানে, তাঁর বাক্যই হয়ে ওঠে চরম বাক্য। প্রতিভা বসুর কথায়— “অনেক সময়ে গ্রীক নাটকের বিবেকের মতো হঠাৎ হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তিনি সত্য উদঘাটন করেন”।[৭] যদিও এক্ষেত্রে বিবেক চরিত্র নিজেই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাই পাঠক ভাবতে বাধ্য হন, নিজ সন্তানটির প্রতি অপত্য স্নেহবশেই কি বারবার এই ফিরে আসা?

কিন্তু শুধুই যে স্নেহ নয়, এই সংযোগের পেছনে যে প্রচ্ছন্ন ছিল এক গভীর সুপ্ত প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্ষমতালাভের যত্নলালিত এক স্বপ্নও, তা লেখিকা স্পষ্ট করে দেন পরবর্তী কিছু ঘটনা পরম্পরার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যেখানে প্রথমেই আসে

বেদব্যাস এবং তাঁর পুত্র বিদুরের পাণ্ডবপক্ষকে অন্ধ সমর্থন। তা সে কৌরবদের জন্মবৃত্তান্তকে অকারণ অলৌকিক করে তুলে যুধিষ্ঠিরকে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ করতে চাওয়াই হোক বা নানাবিধ অন্যায় তথা অনৈতিক আচরণের পরও যুধিষ্ঠিরকে ধার্মিক এবং প্রায় অকারণেই দুর্যোধনকে দুশ্চরিত্র প্রতিপন্ন করাই হোক, মহাভারতে সর্বত্রই এহেন পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তি খুব সহজ— "আবার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অপেক্ষা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ নামধারী পুত্রদের প্রতিই তিনি বেশি আসক্ত ছিলেন। তার মধ্যে যেটি বড়, যার নাম যুধিষ্ঠির, সে ছেলে যে বিদুরের ঔরসে কুন্তীর গর্ভজাত অবৈধ পুত্র সেটা অন্যদের কাছে গোপন থাকলেও তিনি নিজে তা জানতেন বলেই মনে হয়"।[৮] অর্থাৎ তথাকথিত নিষ্কাম ও নির্মোহ (যদিও নিজের সম্পর্কে তৈরি করা সেই চিত্র তার নিজেরই অঙ্কিত) এই ঋষি তাঁর সুপ্ত ক্ষমতালিপ্সাকে সরাসরি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও পুত্র বিদুর ও তাঁর অবৈধ সন্তান যুধিষ্ঠিরের মধ্য দিয়েই ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাই পাঠকের আর বুঝতে অসুবিধে হয় না, কেন বহু ভুলের পরেও যুধিষ্ঠির সবসময়ই ভালো এবং বিশেষ কিছু না করেই দুর্যোধন বরাবরই মন্দ। তবে, মহাভারতের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ যে প্রকৃত অর্থেই কতটা ব্যক্তিগত, তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন লেখিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান 'কর্ণ' চরিত্রটির দিকে। কর্ণ, কুন্তীর কুমারী কালের সন্তান অর্থাৎ সে অবৈধ এবং একইসাথে তাঁর বেড়ে ওঠা এক নিম্নবর্ণের পালক পিতার কাছে। সুতরাং পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে যদি আমাদের মনে হয়ে থাকে যে, বেদব্যাসের দুর্বলতা শুধুমাত্র অবৈধদের প্রতি, তাহলে মহাভারতের কাহিনির দিকে একটু লক্ষ্য করলেই আশ্চর্য হতে হয়, যখন দেখি ধীবর সমাজে বেড়ে ওঠা অসিতাঙ্গ সত্যবতী সসম্মানে রাজপরিবারের অলিন্দে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, অবৈধ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বেদব্যাস হয়ে উঠছেন রাজপরিবার তথা সার্বিকভাবে সমাজের নিয়ামক, দাসীপুত্র হয়েও পাণ্ডব ও কৌরবদের প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠছেন মহামন্ত্রী বিদুর। অথচ সমস্ত রকম বীরোচিত গুণ থাকা সত্ত্বেও, বীরত্বে অর্জুনের সমকক্ষ কর্ণকে বারবার প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সূতপুত্র পরিচয়ের জন্য। কর্ণের প্রতি বেদব্যাসের কোনো করুণা নেই, তাঁর জন্ম কলঙ্ককে তাই তিনি ঘোচাতে চাননা কারণ জন্মসূত্রে কর্ণ অবৈধ হলেও সে অনার্য নয়। সে সূর্য পুত্র, তাই "..তাঁর বিধানে কর্ণ অপাঙক্তেয়। কর্ণকে তাঁর জন্মকলঙ্কের লজ্জা থেকে তিনি মুক্ত করেন না। পুত্রবধূ কুন্তীকে এ ব্যাপারে অভয়দান করেন না"।[৯] একথা খুবই স্পষ্ট যে মহর্ষি বেদব্যাসের যাবতীয় পক্ষপাতিত্ব তাঁর নিজ রক্তের প্রতি। তাই যে কোনো শর্তেই তিনি জিতিয়ে দিতে চান পাণ্ডবপক্ষকে। তাই নীতিমূলকগ্রন্থ মহাভারতে সততার পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে শঠতা, কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের প্রধান ভিত্তিই হয়ে ওঠে তাই অন্যায়, অধর্ম।

সমগ্র মহাভারতের এমনই বিভিন্ন ঘটনার ওপর আলোকপাত করে লেখিকা যখন স্বজনপোষণের সূত্রটিকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরেন, তখন পাঠক মনে এ প্রশ্ন আসতেই পারে যে, কেন এই স্বজনপোষণ? মহাভারত প্রণেতার এই মনোভাবের মূল শিকড়টি ঠিক কোথায়? যদি একটু নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে মহর্ষি বেদব্যাসের জীবনচিত্রটিকে প্রত্যক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাই– একটা নিষ্পাপ, নির্বোধ, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশুমনের হাহাকার যেন তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে ধ্বনিত হয়েছে। সব থেকেও যার কিছু নেই। বৈভব, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, প্রাপ্য সমস্ত কিছুর থেকে দূরে অরণ্যের নির্জনতায় একাকী বঞ্চনার জীবন কেটেছে তাঁর। তাই মনে এ প্রশ্ন জাগে, সমগ্র মহাভারত জুড়ে যে প্রতিহিংসা, যে স্বজনপোষণ– তার বীজ কি তবে প্রোথিত রয়েছে এই বঞ্চনার ইতিহাসে? যে বঞ্চনায় মিশে আছে অবৈধতার কলঙ্ক, অনার্যত্বের যন্ত্রণা। আর ঠিক তাই যেন, বেদব্যাস বারবার চেয়েছেন অবৈধকে বৈধতা দিতে, অনার্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে। মহাভারতের যাবতীয় ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডের মাপকাঠি তাই হয়ে ওঠে মহাভারতকারের একান্ত নিজস্ব।

এই মানদণ্ডেই মহাভারতের যে আর একটি চরিত্র সমস্ত রকম অন্যায়ের ছাড়পত্র পেয়ে যান, প্রতিভা বসু যাঁকে বেদব্যাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কাণ্ডারী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, তিনি কুরু রাজবংশের মহারানী সত্যবতী। লেখিকার কথায় “দ্বৈপায়ণ ওই একটি চরিত্রের উপর যথাসম্ভব কম আলো ফেললেও তিনি জানতেন ইনিই আখ্যায়িকার আসল নায়িকা, আর তিনি নিজে তার প্রধান পুরোহিত। নামত ভরত বংশের কাহিনী হলেও, আসল আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে সত্যবতী-দ্বৈপায়নই রয়েছেন”।[১০] তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের জননী এবং ধীবর কন্যা, সেই সূত্রে তিনি অনার্য। যদিও মহাভারত বর্নিত কাহিনী অনুযায়ী সত্যবতী জন্মসূত্রে আর্য কিন্তু অনার্য সমাজে প্রতিপালিতা। ঠিক এখানেই লেখিকা প্রশ্ন তোলেন মহাভারতের কিছু অলৌকিক কাহিনীর ওপর। যে কাহিনী সত্যবতীর জন্মের ক্ষেত্রেও শোনানো হয়েছে। পুরু বংশীয় রাজা উপরিচর বসুর স্ত্রীর কামনার্থে স্খলিত শুক্র গ্রহণ করে আদ্রিকা নামে এক মৎস্যরূপী অপ্সরা গর্ভবতী হলে, সেই গর্ভে জাত কন্যা ধীবর সমাজে মৎস্যগন্ধা হিসেবে প্রতিপালিত হতে থাকে। ঘটনা চক্রে কুরু বংশের কূলবধু হয়ে সেই মৎস্যগন্ধাই হয়ে ওঠেন সত্যবতী। তাই প্রতিভা বসু প্রশ্ন তোলেন “তখনকার সমাজে এই সব কন্যাদের প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত বলায় বাধা ছিলো বলেই কি তিনি অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কৌতূহল থেকেই যায়”।[১১] অর্থাৎ এখানেও যেন কোনো অবৈধতাকে বৈধ করারই প্রচেষ্টা। লেখিকার ভাবনায় অসিতাঙ্গ সত্যবতী আর যাই হোন, আর্য নন। আর শুধু সত্যবতীই নয়, মহাভারতে দ্রৌপদী বা শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়েও প্রায় একই প্রশ্ন তোলেন তিনি। কুরু রাজবংশের এই প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী, সাহসী ও অসামান্যা সুন্দরী সম্রাজ্ঞী তাঁর রূপের মোহে বশ করেছিলেন বৃদ্ধ রাজা শান্তনুকে।

যে কারণে কঠিন শর্তের বিনিময়েও সম্পন্ন হয়েছিল এই অসম বিবাহ। একই সঙ্গে সেই মোহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন যুবরাজ দেবব্রতও, আর তাঁকে ব্যবহার করেই সত্যবতী তাঁর স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনাটি করে নিয়েছিলেন। যে স্বার্থ রাজত্ব লাভের, কুরু বংশের রক্ত নিশ্চিহ্ন করে স্বীয় রক্ত প্রতিষ্ঠার। প্রতিভা বসুর কথায় "বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, এই কাহিনীর নায়িকা সত্যবতীর ইচ্ছা নামের তরণীটিকে যিনি অবিরাম অনুকূল বায়ুপ্রবাহে বাহিত হবার সুযোগ দিয়েছেন তাঁর নাম 'ভীষ্ম' আখ্যাধারী দেবব্রত"।[১২] অর্থাৎ ভীষ্মকে আজীবন কৌমার্য ব্রত পালনের শর্তে আবদ্ধ করা থেকে শুরু করে শান্তনু পুত্র বিচিত্রবীর্যের বংশরক্ষার দায়িত্ব নিজের কানীন পুত্রের হাতে দেওয়া, দাসীপুত্র বিদুরকে অত্যধিক প্রশ্রয় দান বা অন্যায়ভাবে পাণ্ডব পক্ষকে সমর্থন– এই সমস্ত ঘটনার মূলেই লেখিকা সত্যবতীর দূরদর্শিতা উপলব্ধি করেছেন। এক একটা ঘটনার সূত্র ধরেই সত্যবতী যেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন, আর তাঁর এই চলার পথে সহযোগী হয়ে উঠেছে বেদব্যাস, বিদুরের, মতো চরিত্রেরা। প্রতিভা বসুর কথায়, "মহাযুদ্ধের সূচনা তিনিই করে গেছেন। পৌত্র বিদুর গোয়েন্দার কাজ করে তা অব্যাহত রেখেছেন, দ্বৈপায়ণ পুরোহিত হয়ে তার প্রতিবিধান করেছেন, আর সত্যবতী তাঁর অসামান্য চাতুর্যে ঘুড়ির সুতোটি তাঁদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাটাইটা রেখেছেন স্বীয় হস্তে"।[১৩] সবমিলিয়ে একটা ছবিই বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যে ছবি অবৈধতা, বঞ্চনার ইতিহাস বুকে নিয়ে মহাভারত নামক মহারণ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বইতে লেখিকা সেই ছড়িয়ে থাকা ছবি গুলোর একটা কোলাজ তাঁর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

প্রতিভা বসুর ভাবনায়, মহাভারতকারের এই অনার্য, অবৈধ প্রীতির চিহ্ন বহনকারী আর এক চরিত্র দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদী। 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থে লেখিকা এই চরিত্রটির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে মহাভারতের কাহিনী আসলে আর্য শাসকদের বিরুদ্ধে অনার্য, কৃষ্ণ বর্ণের জাতিগুলির 'অন্তিম প্রতিশোধ'। এই কাহিনিই হয়তো ভারতবর্ষের ইতিহাসে রক্তের ভিত্তিতে জাত বিচারে ইতি টেনেছে। যে কারণে কৃষ্ণ বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদী ক্ষত্রিয় সন্তান। দ্রৌপদীর জন্ম বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, বিশেষ বর প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞবেদী থেকে জন্ম দ্রৌপদীর। মহাভারতে এ হেন অলৌকিক জন্ম উপাখ্যান কোনো নতুন বিষয় নয়। শকুন্তলা, সত্যবতী কিংবা দ্রৌপদী জন্মবৃত্তান্তের অলৌকিকতা বজায় থেকেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। প্রশ্ন ওঠে এই অলৌকিকতার মোড়ক কেন? লেখিকা প্রশ্ন তোলেন– " তখনকার সমাজে এইসব কন্যাদের প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত বলায় বাধা ছিলো বলেই কি তিনি অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন"।[১৪] অর্থাৎ প্রতিভা বসুর যুক্তি অনুযায়ী পাঠক এ কথা মানতেই পারেন যে, দ্রৌপদী অনার্য এবং জন্মবৃত্তান্তের এই অকারণ অলৌকিকতা কোথাও গিয়ে আভাস দেয় যে, সে অবৈধও। কিন্তু এখন প্রশ্ন ওঠে যে পূর্বে আলোচিত সেই মাণদণ্ডে

দ্রৌপদীও কি বিশেষ কোনও সুবিধা ভোগ করেছিলেন? এ বিষয়ে প্রতিভা বসুর বক্তব্য– “মুনিঋষিই হোন, আর ক্ষত্রিয় রাজা-মহারাজাই হোন, এমনকি তথাকথিত দেবতারা পর্যন্ত, সত্যবতী – দ্রৌপদীর মতো কৃষ্ণাঙ্গী, রূপযৌবনবতী, অনার্যা রমনীদের চরণে নিজেদের উৎসর্গিত করেছেন”।[১৫] মহাভারতের আখ্যানে এই কৃষ্ণাঙ্গী রমনীরা বিশেষ স্থান অধীকার করে থেকেছে সবসময়। গল্পের মূল সুতোটি সংযুক্ত থেকেছে এই অনার্য রমনীদের সঙ্গে, যে কারণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ হিসেবেই মনে করা হয় দ্রৌপদীর অপমান। কিন্তু 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী যখন দ্রুপদ রাজার অন্তঃপুর থেকে শুরু হয়; তখন সেই কাহিনী প্রবাহের বিশ্লেষণে পাঠকের এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়না যে, বেদব্যাসের পক্ষপাতের আয়নায় কৃষ্ণাঙ্গ এই রমনীটির ছবি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়নি। যেভাবে বিদুর ও যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডব ভ্রাতাদের প্রতি তাঁর নীরব সমর্থন এতক্ষণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এই চরিত্রটির ক্ষেত্রে কিন্তু তা দেখা গেলনা। দ্রৌপদীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করতে হয়েছিল তার পঞ্চ স্বামীকে, যদিও সে প্রকৃতপক্ষে ভালোবেসেছিল তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকেই। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই বেদব্যাস এই অন্যায় গর্হিত কাজ সম্পন্ন করিয়েছিলেন বলে মনে করেছেন প্রতিভা বসু। নিজের প্রকৃত প্রেমিককে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেও, নিছকই এক সত্য রক্ষার দায়ে তাঁকে অঙ্কশায়িনী হতে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও একে একে অন্য তিন জনের। সত্যরক্ষার দায়েই অর্জুনকে যেতে হয় বারো বছরের নির্বাসনে— “কে জানে কত নিঝুম রাতের অন্ধকারে চোখের জলে ভেসে গেছে দ্রৌপদীর হৃদয়ের সব স্বপ্ন... তার ওপরে অর্জুনকে এই নির্বাসন! এই নির্বাসন মেনে নিতে অর্জুনেরও কি কোনো কষ্ট হয়নি?”।[১৬] নিজ পৌত্রের স্বার্থ রক্ষার্থে আবারও অন্যায়কে ন্যায়ের তকমা দিতে সত্য রক্ষার অলৌকিক গল্প ফাঁদতে হয় বেদব্যাসকে, দ্রৌপদীর ইচ্ছাকে নূন্যতম গুরুত্ব না দিয়ে আবারও তাঁকে গল্প শোনাতে হয় পূর্ব জন্মের কাহিনি— “অবশ্য অর্জুনের নির্বাসন বা দ্রৌপদীর অর্জুনকে না পাওয়া নিয়ে ব্যাসদেব একটি লাইনও লিখে সময় নষ্ট করেননি। এটা ধরেই নিতে বলেছেন...পূর্বজন্মে দ্রৌপদী পাঁচবার বর চেয়ে এ জন্মে পঞ্চপতীর পত্নী হয়েছেন”।[১৭] মহাভারতের আখ্যান লিখতে বসে মহর্ষি বেদব্যাস যে সত্যিই নিজ রক্তের প্রতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন- লেখিকার এই ভাবনাকে আরও বেশি স্পষ্ট করে দেয় দ্রৌপদী চরিত্রটির প্রতি মহাভারতের কবির এই অন্যায় আচরণ। পাণ্ডবদের প্রয়োজনে দ্রৌপদীকে পরিণত হতে হয় নিছক একটি পদার্থে, যাকে নিজ নিজ প্রয়োজনে বারংবার শুধু ব্যবহার করে গেছে তারা। ঠিক যে ভাবে যুধিষ্ঠির তাকে ব্যবহার করলেন দ্যূতক্রিড়ায়; সর্বস্ব পণ রেখে শেষ পর্যন্ত পণ রাখলেন নিজ পত্নীকে। সমগ্র মহাভারতে দ্রৌপদী তার তেজস্বী চরিত্র গুণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে পরিচিতি পেলেও, বলিষ্ঠ এই নারী চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে

নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি, বরং তার তেজস্বীতার থেকে সহনশীলতাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি।

মহাভারতের আখ্যানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের যে আধিপত্য লেখিকা লক্ষ্য করেছিলেন, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ বা অবৈধ মানুষ মাত্রেই তাদেরকে 'ধর্মের বর্ম' পরিয়ে যে কোনও শর্তে জিতিয়ে দিতে চেয়েছেন মহাভারতের কবি; সেই চরিত্রদের মধ্যে যাঁর প্রভাব সমগ্র কাহিনী জুড়ে সবচাইতে বেশি, যাঁকে কখনও কখনও মহাভারতের মূল নায়ক বলেও মনে হতে পারে পাঠকের, যাঁর সমস্ত রকম অন্যায় কর্মকে মহাভারতকার অতিমানবিক রূপ দিয়ে সাদাকে কালো আর কালো কে সাদা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারত বিশ্লেষণের যে তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভা বসু গ্রহণ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে, সেখানে পার পাননি এই দেবতা চরিত্রটিও। তাঁর ভাবনায় কৃষ্ণ চরিত্রের এই দেবত্ব আসলে আরোপিত, এই সমস্ত অলৌকিকতা, অবাস্তবতার পেছনে আসলে লুকিয়ে আছে এক রূঢ় বাস্তব। এই বাস্তব ঘটনা কে ঢেকে ফেলার প্রয়াসেই এই রটনা বা অলৌকিকতার মোড়ক- "...আর কেনই বা চতুর কৃষ্ণের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হলো? সে কি কৃষ্ণ কৃষ্ণাঙ্গ বলেই?...রটনা দিয়ে ঘটনাকে বদলানো যায় সেটা আমরা সাম্প্রতিক রাজনীতিতেও দেখতে পাই"।[১৮] অর্থাৎ কৃষ্ণ কালো তাই লেখিকার বিচারে তিনিও অনার্য, একই সাথে তিনি চতুর এবং ছলনাপ্রিয়। যদিও মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী কৃষ্ণ গোপ সমাজে পালিত হলেও আসলে তিনি ক্ষত্রিয় বংশজাত। কিন্তু লেখিকার ভাবনায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বেদব্যাসের অতিরিক্ত সহানুভূতি বা নিঃশর্ত সমর্থন আসলে আর্যদের বিরূদ্ধে অনার্যদের ঐক্যবদ্ধ এক প্রচেষ্টা। তাই মহাভারতের কৃষ্ণাঙ্গ এই চরিত্রটি অনার্য সমাজে প্রতিপালিত এক মনুষ্য চরিত্র, যার কূটনৈতিক বুদ্ধিকে নিজ পুত্র পৌত্রদের স্বার্থে কাজে লাগাতে মহাভারতের কবি তাঁকে ঐশ্বরিক রূপদান করতে চেয়েছেন। তবে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সখ্যতার প্রয়োজন কখনই একতরফা নয়, দ্বিপাক্ষিক চাওয়া পাওয়া পূরণের উদ্দেশ্যেই আসলে এই সম্পর্ক। চতুর কৃষ্ণের ভয়ের কারণ ছিল জরাসন্ধ এবং শিশুপাল, এই দুই বীর রাজাকে পাণ্ডবদের সাহায্যে ছলনার আশ্রয় নিয়ে বধ করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। লেখিকার কথায় "মহাভারত নামের গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কিঞ্চিৎ অবহিত হয়ে পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় সবাই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কর্ম করে যাচ্ছেন।...সাতটি নদী কৃষ্ণরূপ সমুদ্রে এসে মিলিত হলো"।[১৯] নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে কৃষ্ণ দ্যূত ক্রীড়া থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত পাণ্ডবদের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে কাজ করে গেছে নিরন্তর।

আমাদের প্রাচীনতম এই মহাকাব্য চিরকাল আমাদের ধর্মের পথ দেখিয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে উঠেছে ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু একেবারে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে যদি সত্যিই বিচার করা যায় তবে, এ আখ্যান সর্বতোভাবে

কখনওই ধর্মের পথে বা ন্যায়ের অনুসরণে চলেনি। কুরুক্ষেত্রের মতো ন্যায় যুদ্ধেও বারংবার পাণ্ডবপক্ষকে দেখা গেছে ছলনার আশ্রয় নিতে। তাই আজকের এই যুক্তিবাদের যুগে দাঁড়িয়ে মহাভারতের তথাকথিত ভালোমন্দের এই নেতিবাচক সমালোচনাকে সহজে গ্রহণ করতে আজ আর হয়তো আমাদের খুব বেশি অসুবিধে হয়না। প্রতিভা বসুর সাজানো যুক্তিতে মহাভারত প্রণেতার পক্ষপাতের সূত্রটিও অনেকাংশেই গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। তবে এই পক্ষপাতের কাহিনী লিখতে বসে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো লেখিকার কলমও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়েছে বলেও মনে হয়। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর চূড়ান্ত লাঞ্ছনাকে অন্যায় বললেও, সেখানে তাঁর দুর্যোধনকে কোথাও একটা সঠিক প্রমাণ করার প্রচেষ্টা পাঠককে খানিকটা বিস্মিত করে। আধুনিকমনস্ক ‘মহাভারতের মহারণ্যে’র পাঠক যখন প্রায় প্রতিটি ব্যখ্যাকে সমর্থন করে পাশা খেলার দৃশ্যে পৌঁছায়, তখন লেখিকার বক্তব্য, “কিন্তু আশৈশব তিনি বিদুরের বাক্যদংশনে যে জ্বালায় জ্বলেছেন, বিদুরের পরামর্শে পাণ্ডব নামধারী পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে যে বৈরীভাব সৃষ্টি হয়েছে, যে গ্লানি, যে অপমান, অসম্মান, সতত সহ্য করেছেন, এতোদিনে সেই সব অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরে দুর্যোধনের মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলা আশ্চর্য নয়”[২০]— পাঠককে যথার্থই আহত করে। একই সঙ্গে কুরু বংশের রাজমহিষী সত্যবতীর সঙ্গে দেবব্রত ভীষ্মের যে সম্পর্কের ছবি প্রতিভা বসু আঁকতে চেয়েছেন; তাঁর যুক্তিতে সেই সম্পর্কে কাজ করেছে এক অসম্ভব 'মোহিনী মায়া'। যে মায়ায় হয়তো শান্তনুর পাশাপাশি তাঁর পুত্রও বাঁধা পড়েছিলেন সেই রহস্যময়ী নিষাদ রমণীর কাছে। কিন্ত যদি মহাভারতকে আমরা নিছকই সাহিত্যের বাইরে একটি সমাজের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গণ্য করি, তাহলে দেখব তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা যেমন ক্ষাত্রধর্মের মহিমায় মহিমান্বিত, তেমনই সত্যবতীর প্রতি তাঁর নীরব আনুগত্যও আসলে মাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যবোধ। তবে সামান্য কিছু জায়গায় মতবিরোধ ঘটলেও সমগ্র মহাভারতের কাহিনীর এহেন যুক্তি সঙ্গত উপস্থাপন সত্যিই প্রশংসনীয়। আর্য-অনার্য, বৈধ-অবৈধ, সাদা-কালোর যুক্তিপথে শেষপর্যন্ত যে পক্ষপাতের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিভা বসু তাঁর আখ্যানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা বিশ শতকীয় পুরাণ চর্চার ধারায় এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে।

প্রতিভা বসুর সঙ্গে 'মহাভারতের মহারণ্যে’—এমনই কত অনালোকিত পথ চিনতে চিনতে আমার মতোই কত পাঠক হয়তো আজও হঠাৎ খুঁজে পেয়ে যান কোনো গুপ্তধন। মহাভারতের এই মহা অরণ্যে সন্ধান জাড়ি থাকুক চিরকাল। তবে শেষ পর্যন্ত আমার খুঁজে পাওয়া সেই গুপ্তধনের হদিস আমি দিয়েই যাই। যে গুপ্তধনের চাবিকাঠি রয়েছে ‘মহাভারতের মহারণ্যে’ নামের মধ্যেই। কবি প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর ‘মহাভারতের কথা' গ্রন্থে 'এক অন্তহীন অরণ্য' শীর্ষক অধ্যায়ের নামকরণের সঙ্গে একটি ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে ‘মহাভারতের মহারণ্যে’ নামের। তবে নামের সাযুজ্য

থাকলেও ভাবনায় রয়েছে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য। বুদ্ধদেব বসুর রচনাটি অনেক বেশি মূলানুগ এবং তথ্যনিষ্ঠ, তার ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে প্রতিভা বসুর ভাবনা একেবারে তাঁর নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। লেখিকার এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই কার্যত বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতকেন্দ্রিক বিশ্লেষণকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। মহাভারতে বিদুর ও যুধিষ্ঠির সম্পর্কের বিতর্ক অবসান করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু যখন ধর্মাচরণের সংযোগসূত্রটিকে বড় করে দেখিয়েছেন, আর একদিকে তখন প্রতিভা বসুর অকপট মন্তব্য “'ধর্মাচরণ'-ই এ দু'জনের মধ্যে সংযোগসূত্র” বুদ্ধদেব বসু-র এই উক্তি মানা আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হইল যখন দেখি শুধুমাত্র সাম্রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে কতো চক্রান্তের সাহায্যেই বিদুর যুধিষ্ঠিরকে পরিচালনা করেছেন এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জন্মমুহূর্ত থেকেই নিরপরাধ শিশু দুর্যোধনের বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন অপপ্রচার চালিয়ে তাঁকে একটি নির্ভেজাল শয়তান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কের ভিত্তি ধর্মে নয়, শান্তনুর সাম্রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্তে”।[২১] লেখিকা তাঁর গ্রন্থের শুরুতে যখন বলেন, “প্রথমেই সবিনয়ে পাঠকদের নিকট নিবেদন করা প্রয়োজন, আমি পণ্ডিতও নই, বিদ্যাও সীমিত। তথাপি মহাভারত বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশে যে সাহসী হলাম তার প্রধান কারণ, এই মহাগ্রন্থ বিষয়ে চিন্তা করবার, আলোচনা-সমালোচনা করবার অধিকার, বিদ্বান-পণ্ডিতদেরও যতোটা আছে, সাধারণ পাঠকেরও ততোটাই”।[২২] তখন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় যেন নারী স্বাধীনতার জয়গান। উনিশ শতকীয় এবং বিশ শতকীয় নবজাগরণ পরবর্তী যুগে যে ভাবে মহিলারা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আলোয় উদ্ভাসিত হতে শুরু করেন সেখানে, “পণ্ডিত মনীষীদের বিপরীত মতামত পোষণ করা শক্ত না হলেও তা ব্যক্ত করা সহজ নয়”[২৩] এ সত্য উপলব্ধি করেও পণ্ডিত স্বামীর বিপরীতে নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিভা বসু হয়ে ওঠেন নারী স্বাধীনতার অন্যতম কাণ্ডারী। তাই বিশ শতকীয় সমাজে দাড়িয়ে এই ভাবনার বিশেষত্ব, নারীভাবনার উদ্ভাসন এবং তার স্বাধীন স্ফূরণে এই গ্রন্থ মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে যেমন এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তেমনই বিশ শতকীয় নারী স্বাধীনতা, নারী ভাবনা, নারী স্বাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. কাশীদাসী মহাভারত, কাশীখণ্ড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা.লি., ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯; পৃষ্ঠা- ১১

২. মহাভারতের মহারণ্যে, সপ্তম সংস্করণ; বিকল্প প্রকাশনী ১ বিধান সরণি, তিনতলা, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; ২০১২, পৃষ্ঠা- ১২

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮আ
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩
১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৮
২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪০
২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫
২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২

গ্রন্থপঞ্জী :

১. দত্ত মধুসূদন : মেঘনাদবধ কাব্য, পরিমার্জিত সংস্করণ; বামা পুস্তকালয় ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩; কালীপূজা—২০০৫।
২. দাস কাশীরাম : কাশীদাসী মহাভারত, কাশীখণ্ড (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ (ষষ্ঠ মুদ্রণ); সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০০৯; জানুয়ারি ১৯৯২।
৩. বসু প্রতিভা : মহাভারতের মহারণ্যে, সপ্তম সংস্করণ; বিকল্প প্রকাশনী ১ বিধান সরণি, তিনতলা, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; ২০১২।
৪. বসু বুদ্ধদেব : মহাভারতের কথা, প্রথম সিগনেট সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ); সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯; ডিসেম্বর ২০১৮।

৫. বসু রাজশেখর : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, চতুর্দশ মুদ্রণ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩; ১৪২০।
৬. সিংহ কালীপ্রসন্ন : মহাভারত, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত ; প্রথম খণ্ড, প্রথম শীল সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ; অক্ষয় লাইব্রেরী, ৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা– ৭০০ ০০৯; অক্টোবর, ২০০৫।

সুবালা : এক সমাজ বর্জিতার উপাখ্যান

চৈতালি ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবড়ি, অসম

সারসংক্ষেপ : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নারী সমাজ নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে দেশে ও বিশ্বে তার অবস্থান মজবুত করেছে। সমাজের মূল স্রোতকে সমৃদ্ধ করে সমাজকে গতিশীল করেছে এবং সমাজকে সক্রিয় করেছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে, অন্ধকার জগতে বসবাসকারি যে সমস্ত সমাজবর্জিতা, সমাজে পতিতা বলে পরিচিতা, যারা সমাজের স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। যারা অন্যের কামনা চরিতার্থ করার জন্য আত্মত্যাগ করে। কিন্তু এক সময় এই সামাজিক বর্জিতা, সামাজিক পতিতা শ্রেণী কালের পরিক্রমায় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে সমাজ ও সাহিত্যে তাদের পদচারণা তা প্রমাণ করে। সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের আধুনিক যুগের সাহিত্য, অর্থাৎ আসাম, বিশেষ করে কথাসাহিত্যে তাদের সহ-অবস্থান লক্ষণীয়। তাদের অন্ধকার জগতের সমস্যা জর্জরিত চিত্রায়ন, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, তাদের প্রান্তিকতা সেই সঙ্গে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রবল ইচ্ছা, সর্বোপরি নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা এ অঞ্চলের বিভিন্ন লেখকের লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এলোকেশী বেশ্যার কাহিনী গল্পে যে স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় তা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকের কথাসাহিত্যে বহুপল্লবিত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য গবেষণা পত্রটি বিশেষভাবে অসমের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি এর বিখ্যাত উপন্যাস 'সুবালা' কে নিয়ে আলোচিত হয়েছে।এখানে সুবালার জীবন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক বহিস্কৃত পতিতাদের সমস্যা, জীবন যাপন প্রনালীকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হযেছে । তাদের মূল স্রোতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস দেখা গেছে।

সূচকশব্দ : সমাজবর্জিতা, প্রতিবন্ধকতা, পতিতাবৃত্তি, জীবনযাপন প্রনালী ।

ভূমিকাঃ

আগার তাহার বিভীষিকাভরা, জীবন মরণময় !
সমাজের বুকে অভিশাপ সে জে - সে জে ব্যাধি, সে
যে ক্ষয়;
প্রেমের পসরা ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ছলনার কারাগারে
রচিঁয়াছে সে যে,দিনের আলোয় রুদ্ধ করেছে দ্বার।
সূর্যকিরণ চকিতে নিভায়ে সাজিয়াছে নিশাচর,
কাল নাগিনীর ফনার মতন নাচে সে বুকের পর ।
চক্ষে তাহার কালকূট ঝরে, বিষপঙ্কিল শ্বাস,
সারাটি জীবন মরীচিকা তার প্রহসন - পরিহাস ।
ছোঁয়াচে তাহার ম্লান হয়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের
যবনিকা !
সে যে মন্বন্তর, মৃত্যুর দূত, অপঘাত, মহামারী -
মানুষ তবু সে, তার চেয়ে বড় - সে যে নারী, সে যে নারী !” [১]

সামাজিক ব্যক্তি জানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক উন্নতি পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া সমাজের দেশের সর্বোপরি সম্পূর্ণ মানব সমাজের কল্যাণ অসম্ভব । কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত তথাকথিত সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের উন্নতি এবং প্রগতি নয়, তৃণমূল স্তরের মানুষের সঙ্গে- সঙ্গে সমাজ বর্জিত যারা, তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ উন্নতি সামাজিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সমাজের জয়যাত্রা । উল্লেখ্য যে নারী সমাজের ক্ষেত্রে একই কথা সমান প্রযোজ্য । জননী, কন্যা, জায়া রূপে সমাজ নির্ধারিত কর্তব্য পালনরতা এই নারী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্যা-সংকট সাহিত্যজগতে বহু আলোচিত বিষয় । কিন্তু বিশেষভাবে যখন পর্যন্ত সমাজের নিম্নবর্গের নারী, সমাজ বর্জিতা পতিতা শ্রেণি মানুষ হিসেবে নিজের প্রাপ্য লাভ করে না, তাদের সমস্যা সমাধান কল্পে সমাজ এগিয়ে আসে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে

যায় । সাম্প্রতিক বিশ্বে নারী প্রগতির যে ধারা সেই একই ধারায় অপাংক্তেয় বহু লাঞ্ছিত নারী সমাজ এক হয়ে যোগ দিতে পারলেই সমাজের উন্নতি ।

মুল আলোচনাঃ

সমাজে বহু প্রচলিত একটি কথা, "দুর্গাপূজার সময় দশধরনের মাটি প্রয়োজন হয় । তার মধ্যে বেশ্যার দরজার মাটি অপরিহার্য । বলা হয় বেশ্যারা নাকি পুরুষদের কাম (যৌনতা) নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে সমাজকে নির্মল রাখে বলে বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।"[২] পিতা, স্বামীর, পুত্রের রক্ষণীয়া নারী। কিন্তু বিবাহ সম্পর্ক বহিভুত বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী যখন বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিধানের মূল্য হিসাবে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে তখন সে গণিকায় পরিণত হয় । কোনো শিশুকন্যা জন্ম থেকেই গণিকা বা পতিতা হয়ে জন্ম নেয় না । সমাজ সেই কন্যাটিকে পতিতা, বেশ্যাতে পরিণত করে । এই বৃত্তির সৃষ্টি সমাজের জন্য, বিশেষভাবে পুরুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

সাহিত্য সৃষ্টির শুরু থেকেই বৈদিক যুগের সাহিত্যে আমরা বেশ্যা, গণিকা শ্রেণীর উল্লেখ দেখতে পাই । রাজা, বণিক, ধনীর প্রাসাদে গণিকা অংশ নেয় নানা কাজে। মহাভারতে গান্ধারী গর্ভবতী হওয়ার সময় ধৃতরাষ্ট্রর গণিকার প্রয়োজন হয়েছিল। রামায়ণেও বিলাসের উপকরণে গণিকা, বেশ্যার উল্লেখ রয়েছে । অন্যদিকে অসমীয়া সাহিত্যে মাধব কন্দলীর রামায়ণ, কালিকা পুরাণ ইত্যাদিতে বেশ্যার উল্লেখ আছে। মাধব কন্দলীর রামায়ণে ভরত তার মা কৈকেয়ীকে এভাবে ভৎসনা করেছে,

"যক্ষিণী ডাইনি তই স্ব স্বামী ভক্ষিনী ।
পিশাচিনী আবে ৰাণ্ডী ভৈলি আলখিনী ।।"[৩]

বিশ্বামিত্র মুনির থেকে আরম্ভ করে রাজা বিক্রমাদিত্য পর্যন্ত সকলেই পতিতাগমন করেছে বলে কালিদাসের কবিতায় উল্লেখ আছে।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, প্রাচীন যুগ থেকেই নানা সমস্যা নিয়ে আধুনিক যুগে পদার্পণ করা এই সমাজ পতিতাদের অবস্থান কিন্তু উন্নতি হয় নাই । সমাজের পতিতালয় যেখানে সেখানে ছিল। সমগ্রদেশের সঙ্গে অসমেও এই বৃত্তি অবসান করার চেষ্টা হয়েছে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। এই ব্যবস্থা নারীর সুস্থ জীবনযাত্রার সমস্ত পথকে রুদ্ধ করে। এই বৃত্তি গ্রহণের ফলে নারীর হৃদয়বৃত্তি এবং তার মনুষ্যত্ববোধের ও চূড়ান্ত অপমান ঘটে। "অসম্মান বঞ্চনা অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যেই যারা জীবন নির্বাহ করতো তাদের পুরোপুরি মানুষ বলে কখনো গ্রহণ করা হয়নি ।"[৪]

অসমের কথাসাহিত্যিকেরা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাজ সচেতন ছিলেন । বিশেষভাবে নারী সমাজ তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে, স্ত্রী শিক্ষা প্রসার, নারী জাগরণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন । বিভিন্ন উপন্যাসে উপন্যাসিকের কলমে তা প্রকট হয়ে উঠেছিল । উপন্যাসরচনার প্রথম দিকে পতিতা জীবনকে নিয়ে এ কে গার্নির, "এলোকেশীর বেশ্যার কাহিনী" এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । এলোকেশী বেশ্যার কাহিনীতে বিধবা এলোকেশীর জীবনের করুন কাহিনী বর্ণিত। বিধবা এলোকেশী ক্ষেত্রমোহনের রক্ষিতা বা উপপত্নী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল । এরপর এই ক্ষেত্র বাবুর মৃত্যুর পর তার জীবনে কষ্ট নেমে আসে । "এলোকেশী পুনৰ নিঠৰুৱা হ'ল । তাইৰ জীবিকাৰ উৎস বন্ধ হ'ল । গহনা -গাঁথৰি বেচি এনেকৈ কিছু দিন চলিল । কিন্তু শেষত যেতিয়া কোনো উপায় নোহোৱা হ'ল । তেতিয়া তাই বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হল।"[৫] যদিও কিছু দিন পরেই সে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, জীবনের শেষ সময় পবিত্র জীবন যাপন করে। মোটকথা অনেক হতভাগিনী নারী জৈবিক তাড়না, প্রলোভন, প্রবঞ্চনায় পড়ে সমাজভ্রষ্টা হয়েছিল, নতুবা দেহরক্ষার উপায় না পেয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর দণ্ডিনাথ কলিতার বিখ্যাত উপন্যাস 'সাধনা' য় রম্ভা বিলাস বাসনা চরিতার্থ করতে করতে নিজেও শেষ পর্যন্ত কলকাতার গণিকালয়ে আশ্রয় পায় । এখান থেকে রম্ভা আর বের হতে পারে না । ধীরে ধীরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে । যদিও সে একসময় ভেবেছে, "মই আজি জগতৰ ঘৃণনীয়া, তিৰোতাই কৰিব পৰা এনে কোনো কাম নাই, যি মই কৰা নাই । কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন ? - মোৰ শিক্ষা আৰু মোৰ অভিভাবক।"[৬] সে তার জীবনের করুণ পরিণতির জন্য তার অর্জিত শিক্ষা এবং অভিভাবকদেরকেই দায়ী করেছে।

তাঁর 'আবিষ্কার' উপন্যাসে পতিতা নারী প্রতিমা কে পাওয়া যায় । সেও ব্যভিচারিণী, উপন্যাসের নায়ক তাকে সুস্থ করে তুলেছে এবং সে তার উপর যথেষ্ঠ সহানুভূতিশীল ছিল । প্রতিমা একসময় বলেছে, "সমাজৰ দোষত তেও আজি পতিতা,

সমাজ আৰু ঘৰৰ পৰা বিতাড়িতা ।"[৭] পতিতা প্রতিমা তার মনের দুঃখ কথা মাধব কে জানিয়েছে, "যিবিলাকে দিনত মোৰ ঘৰত ভৰি দিলেও অপবিত্র হয় বুলি ভাবে, তেনেবোৰেই ৰাতিৰ আন্ধাৰত মোৰ ওচৰত প্রেম ভিক্ষা কৰিবলৈ আহে । কিন্তু কোনেও হ'লে বিয়াৰ নাম নলয়।... মৃত্যুৰ বাহিৰে এতিয়া মোৰ কাম্য বস্তু একো নাই।"[৮] মাধবের কথায় সে জনসেবার কাজে বিশেষ ভাবে নারী জাগরণের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছে। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি, সে আবার তার পুরনো ছন্দে ফিরে আসে এবং জীবনের করুণ পরিণতি ঘটায়।

দৈবচন্দ্র তালুকদারের 'ধুয়লি কুয়লী' উপন্যাসে নোমল গৃহত্যাগ করার পর রুগ্ন অবস্থায় তেজপুরে গণিকার দ্বারা শুশ্রূষা লাভ করে । কিন্তু এরপর গণিকার বীভৎস নৈশ অভিসার, ব্যর্থকামা গণিকার নোমলের উপর প্রতিশোধ ইত্যাদি ঘটনা গণিকার ভোগবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিচু প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ।

প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর 'কেচা পাতর কপনি'র মধ্য দিয়েও লেখকের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় । এখানে পরম্পরাগত পারিবারিক, সামাজিক চিন্তা ধারাকে, মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে লেখক যথেষ্ট সাহসিকতার নিদর্শন রেখে গেছেন। সমাজের চিরাচরিত প্রথা অন্ধ সংস্কারকে বাদ দিয়ে সংস্কারমুক্ত চরিত্র তিনি এঁকে গেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের খাসিয়া দেহোপজীবিনী কা- ড্রপ এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তার কাছে পুরুষ আর্থিক অবলম্বন মাত্র। সে স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবাদী, তাই সে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে নগ্ন করে বলেছে, "চৰম লাগে যদি আমাৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰে কিও ? ....আমি আটাইখিনি বিচাৰো- প্রবৃত্তিৰ খোৰাক, অথচ তাৰ কাৰণে জৰিমানা দিব নোখোজো । বেৰৰ আৰত, ভুৰাৰ আৰত, ভন্ডামিৰ আৰত, বিচাৰো প্রবৃত্তিৰ খোৰাক ।"[৯]

অসমীয়া উপন্যাস জগতে সৈয়দ আব্দুল মালিকের ছিলো জীবন এবং সমাজের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি । সভ্য সমাজের সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ অঞ্চলের নারীর জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার বহু উপন্যাসে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মাটির চাকি', এই উপন্যাসের শিল্পী হিরণ্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি পতিতা রাধা আকর্ষিত হয়। পেটের তারনায় রাধা এই বৃত্তি গ্রহণ করলেও সে দিনের বেলায় সেতার বাজায় । এই রাধার জীবনের একমাত্র সঙ্গী অনাথ এবং বিকলাঙ্গ শিশু সোণ । সেতারের করুন সুরের মধ্য দিয়ে উড়ে যায় তার রাতের অভিসারের সমস্ত পাপ, কষ্ট এবং বেদনা । হিরণ্য রাধার বৃত্তিকে ঘৃণা করে, কিন্তু তার সেতারের সুর তার অন্তর ছুঁয়ে যায়। হিরণ্য রাধার শিল্পী চেতনার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে । হিরণ্য বুঝতে পারে রাধা বেদনার এক মূর্ত প্রতীক । রাধা মুছে ফেলতে চেষ্টা করে এই ঘৃণ্য পরিচয় । মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা তারমধ্যে ফুটে উঠে।

এই লেখকেরই 'জীয়া জুরির ঘাট' উপন্যাসের চম্পা একজন দেহোপজীবিনী । সে রোগে আক্রান্ত হয়। সে জানে সে সমাজের ঘৃণার পাত্রী । কিন্তু সেই পরিচয় মুছে

ফেলার কোন উপায় তার সামনে নেই। পেটের খিদার থেকে চরিত্র বড় নয়। সে দেহের খিদা মেটানোর জন্য এই পথে আসে নাই, পেটের খিদা নিবারনের জন্য এই পথ নিয়েছে । চম্পার জীবনের করুণ কাহিনীর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক সমাজের এই অসহায় নারী সমাজের বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন।

তাঁর 'আধারশিলা' সর্ববৃহৎ একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে জুতি নামের একটি নারী চরিত্র দেখা যায়, যে দেহ ব্যবসা করে। সমাজে সে গণিকা, খারাপ মেয়ে। তার মনের খবর নেওয়ার কেউ নেই। ডাক্তার মহচিঁন তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। মহচিঁনের সান্নিধ্যে সে নতুন জীবন পায়।

এরপর আধুনিক অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যকে কথাসাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি প্রগতিবাদী চিন্তা-চেতনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। ড. নগেন শইকীয়া হোমেন বরগোহাঞি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সাম্প্রতিক কালৰ অসমৰ বৰগোহাঞি হল এগৰাকী গুৰুত্বপূর্ণ আৰু সৃষ্টিশীল, সমাজ সচেতন লেখক, সাংবাদিক, প্রখৰ, বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিবাদী, সাহসী, শক্তিশালী গদ্য লেখক আৰু এগৰাকী জাতীয় চেতনাসম্পন্ন আৰু একে সময় তে গভীর মানৱতাবাদী ব্যক্তি।' [১০]

তিনি আসামের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক, কবি, গল্পকার, সাংবাদিক, সমালোচক। 'পিতা-পুত্র','অস্ত-রাগ', 'হালধীয়া চড়ায়ে বাওধান খায়', 'আত্মানুসন্ধান', 'সুবালা', 'মৎস্যগন্ধা' ইত্যাদি উপন্যাস, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ সংকলন, গল্প সংকলন এবং যথেষ্ট সংখ্যক কবিতার স্রষ্টা। বিখ্যাত উপন্যাস 'সুবালা' তার চিন্তাভাবনার ফসল।

'মোৰ নাম সুবালা । কিন্তু মোৰ পৰিচিত বন্ধুবোৰে আৰু পুলিচে মোৰ নাম সুবালা বুলি কলে বিশ্বাসেই নকৰিব।...মোৰ যে কিমান নাম আছে, ...সোনালী, নয়নতৰা, চুকৰি, হৰিণী, বাসন্তী, বসন্ত সেনা ।'[১১] এই উপন্যাসে সুবালার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পতিতা, গণিকার বেদনাময় কদর্য জীবন খুব স্পষ্টভাবে রূপায়িত করা হয়েছে । "মই বেশ্যা হ'ব নোখোজোঁ, মই বেশ্যা হ'ব নোখোজোঁ ।"[১২] মোট কথা সুবালা বেশ্যা হতে চায়না । বেশ্যা হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা তার কাম্য। দারিদ্রতার গ্রাসে পড়ে তার মা তাকে বাধ্য করেছিল বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করার জন্য।

মা এবং নরেনের হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে, নরেনের দেওয়া উপহার সে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে। তার জীবনের এই প্রথম পর্বে তার মায়ের অত্যাচারে সে বিধ্বস্ত, বড় বোনের এক পাঞ্জাবির সঙ্গে বিয়ে, ভাইয়ের মৃত্যু সমস্ত কিছুই তার জীবনকে এক নিমিষে তছনছ করে ফেলেছে।

এরপর এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে অচেনা বুড়ির সঙ্গ সে নিয়েছিল, সেও তাকে বেশ্যালয়ে নিয়ে তুলেছিল। এই বুড়িমার বেশ্যালয়ের যে দুর্গন্ধময় বর্ণনা সুবালা দিয়েছে তা শুনে সর্বশরীর শিহরিত হয়ে উঠে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে সুবালা বেশ্যা হতে বাধ্য হল ।

এখানে সে নরেনের হাতেই লাঞ্ছিত, ধর্ষিত হয়। ধীরে ধীরে সে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে । বুড়ি তাকে বেশ্যাদের জীবনের কথা না না ভাবে বুঝিয়ে দেয়। 'বেশ্যাৰ জগত একেবাৰে এখন বেলেগ জগৎ। সেই জগতৰ আইন- কানুন, নীতি - নিয়ম সম্পূর্ণ বেলেগ। মানুহৰ জগতৰ বিচাৰ -বিবেচনা, দয়া-ধর্ম, নীতি-নিয়ম বেশ্যাৰ ক্ষেত্রত একেবাৰে অচল। এবাৰ যদি মানুহে তোক বেশ্যা বুলি চিনি পাইছে, তেন্তে সেই মুহূর্তৰপৰাই তই মানুহৰ চকুত এখন বেলেগ পৃথিবীৰ জীৱ। ধর্মই তোক আশ্রয় নিদিয়ে, আইনে তোক মানুহ বুলি না ভাবে, তোৰ দুখ-যন্ত্রণা, মান-সম্মান, অতীত-ভবিষ্যৎ একো থাকিব নোৱাৰে । আনকি জীৱনৰ যি সাধাৰণ ধর্ম বংশ-ৰক্ষা, যি ধর্ম ইতৰ পশুৰো আছে, বেশ্যা তাৰ পৰাও বঞ্চিত । .....বেশ্যাৰ কোন ক্ষমা নাই, সমাজত বেশ্যাৰ কোন ঠাই নাই।" [১৩] এই জীবনকে সে সহজ ভাবে নিতে পারছিলো না, সে বারেবারে আক্ষেপ করেছে উপন্যাস জুরে, 'মুই বেশ্যা হ'ব খোজা নাছিলো, বেশ্যা নহ'বৰ কাৰণে মোৰ শেষ বিন্দু শক্তি প্রয়োগ কৰি মই যুঁজ কৰিলো ।তথাপি আজি মই বেশ্যা।"[১৪] এরপর সে ব্রহ্মপুত্রের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়, আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানেও সে সফল হতে পারেনা। আবার সে নিজের আস্তানায় ফিরে আসে। এভাবেই দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় পর্বে সুবালা পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়েছে বেশ্যাতে । সুদীর্ঘ পাচঁ বছর সে এভাবে কাটিয়ে দেয়। এরই মধ্যে নিজের বাস্তুভিটায় গিয়ে সে সেখানেও নির্যাতিত হয়। ঘটনাচক্রে সে মাতৃত্বের স্বাদ অনুভব করে, যদিও সেই মাতৃত্বের শেষ রক্ষা করতে পারে না। এর কিছুদিন পর বুড়ির মৃত্যু ঘটে এবং সে আটগাঁও লাইনের অন্য একটি পতিতালয়ে গিয়ে ওঠে। যেখানে

"সন্ধ্যাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় পুৰুষ চিকাৰৰ অভিযান।....এজাক ক্ষুধার্ত কুকুৰৰ আগত কোনবাই মাংসৰ হাড় এডোখৰ দলি মাৰি দিলে তাৰ ওপৰত গোটেইজাক কুকুৰ কামোৰা কামুৰি কৰি জপিয়াই পৰাৰ দৰে বেশ্যাৰ দলে হিংস্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টিৰে মানুহটোক ঘেৰি ধৰে।....বেশ্যাবোৰৰ সম্মিলিত কলৰবত নাৰী দেহৰ বজাৰ গৰম হৈ উঠে ।' [১৫] কিন্তু সুবালা কিন্তু এদের থেকে আলাদা ।নরেন তাকে পাশবিক ভাবে বলাৎকার করার পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর সে নানা পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হলেও কোনদিনও বিন্দুমাত্র দৈহিক আকাঙ্ক্ষা সে অনুভব করে নাই। সে সবাইকে মৃতদেহর মতো নিজের দেহটিকে এগিয়ে দিয়েছে । মানুষ যখন তার দেহটিকে নিয়ে মিলনের উন্মাদনার মত্ত হয়ে উঠেছে, সেই মুহূর্তে সে নিজের এবং নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে অন্য চিন্তায় বিভোর হয়ে থেকেছে। বেশ্যা জীবনের অন্তহীন শুষ্কতা, পরস্পরের প্রতি পাশবিক প্রতিদন্দ্বিতা ইত্যাদিও এই পর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এই সুবালা বিয়ে করার, মা হওয়ার স্বপ্নও দেখে।

বেশ্যাদের দালাল কান্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তার ভিতর নারী সত্তা জেগে ওঠে কান্তির গৃহিনী হয়ে সে চিরদিনের জন্য বেশ্যালয় ত্যাগ করে যাওয়ার আশা

করে ।কিন্তু সেখানেও সে প্রবল ভাবে আহত হয় কান্তির বিশ্বাসঘাতকতায় এবং চতুর্থ পর্বে দেখা যায় সে আবার পুরোনো আস্থানাই ফিরে এসেছে। এক নির্মম ,ট্রাজিক উপলব্ধিতে শেষ হয়েছে সুবালা নিজে বর্ণনা করে যাওয়া তার জীবনকাহিনী ।'মই বুজিলো,মোৰ দোকান বন্ধ কৰিবৰ সময় আহিল। '[১৬]

বুড়িমা মৃত্যুর আগে সমাজের দিকে প্রশ্ন বান ছুড়ে দিয়ে গেছে, 'পেটৰ জ্বালাত আমি নিজৰ দেহ বিক্রি কৰি খাইছোঁ, কিন্তু পৃথিৱীত বেছিভাগ মানুহে নিজৰ আত্মা বিক্রি কৰি খায়। ঈশ্বৰ যদি সঁচাকৈয়ে আছে, তেওঁ নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব – কোনটো বেছি ডাঙৰ পাপ। ' [১৭] আজকাল ভদ্র ঘরের মহিলারাও চাকরির জন্য, প্রমোশনের জন্য, সমাজের উচ্চস্তরের অনুগ্রহ লাভের জন্য, সেই সঙ্গে নিজেদের অত্যাধিক বিলাসিতার জন্য এই পথে পা দিয়েছে, সে বিষয়েও এখানে উল্লেখ রয়েছে। সুবালা সমাজের কাছে একই ভাবে জানতে চেয়েছে, কুমারী অবস্থায় অবৈধ গর্ভধারণ করা মেয়েটিও তার গর্ভে থাকা সন্তানের বাবা কে জানে, কিন্তু বেশ্যা ? কিছুই জানতে পারে না। সেই সন্তান নর্দমার কুকুরের আহার হয়। ইচ্ছা করে কেউ বেশ্যা হতে চায় না । একাধিক পুরুষের সঙ্গে নারী উপায়হীন হয়ে দেহ বিক্রি করলে সে বেশ্যা, শরীরের যৌন চাহিদা পুরন করা সেই পুরুষকে সমাজ কি নাম দেবে? সে আরো বলেছে, "মোৰ ক্ষুদ্র ভাণ্ডাৰ পূৰ্ণ হৈ উঠে আপন মাংস বিক্রিৰ টকাৰে, কিন্তু শূন্য হৈ আহে যৌবনৰ পাত্র, জীয়াই থকাৰ উৎসাহ, হৃদয়ৰ সমস্ত অধিকাৰ । তথাপি মই জীয়াই থাকো। জীয়াই থাকো আত্মাহীন পশুৰ দৰে, অভিশপ্ত এক নিৰ্জন দ্বীপত চিৰ নির্বাসিতা বন্দিনীৰ দৰে।" [১৮]

লেখকের প্রখর সমাজচেতনাবোধ, মানবিক মূল্য বোধ , সমাজের মর্যাদা হীন নারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা ফুটে উঠেছে সুবালার মধ্যে দিয়ে। সুবেলা কে লেখক প্রতিষ্ঠা করতে করেছেন সংবেদনশীল মানবীয় মূল্যবোধ যুক্ত, সৎ হৃদয়ের এক নারী হিসাবে । জীবনের মধুরতম প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা সময়ে, পুরুষের কামনায় লালসার বলি সুবালার সুস্থ জীবনের প্রতি এক আকর্ষণ রয়েছে, সে ঘুমের মধ্যেও, অচেতন অবস্থায় মনে করেছে , নদীতে মাছ ধরা গ্রামের সেই মেয়েটির কথা, যার সহজ সরল জীবন ছিল একসময়।

এভাবে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অসমের সমাজ জীবনে পতিতা নারীর জীবন, সমাজবর্জিতাদের করুন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য এরা সমাজ আরোপিত কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকলেও, অন্তরের গভীরে সুস্থ জীবনবোধ, সজীব ছিল এবং সেই সুস্থ জীবনবোধ তাদের, সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করেছিল। অবশ্য এটাও উল্লেখ্য যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধাবাদী, ভোগলোলুপ, অর্থপিপাশু একশ্রেণীর নারী এই বৃত্তিকে কলঙ্কিত করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ পূরণের নিমিত্তে ব্যবহার করছে। ফলস্বরূপ সমাজ জীবনে তাদের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে, অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজ জীবন এদের প্রভাবে বিপর্যস্ত। বিভিন্ন দেশের প্রচুর শিশু

বাধ্যতামূলকভাবে এই পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে। সে সব মেয়ে শিশু লেখাপড়া খেলাধুলার কোন সুযোগ পায় না। পরিবর্তনের আজকের দিনে মেয়ে শিশুদের জীবন জীবিকা নিয়ে চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। আজকের সমাজকে তাদের অধিকার নিয়ে ভাবতে হবে। তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদেরকেও, নিজেদের অধিকার, প্রাপ্য মর্যাদা, সমাজে বিশেষ স্থান অর্জনের জন্য সজাগ হতে হবে, প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। অসমের কথাসাহিত্যিকেরা বিশেষভাবে হোমেন বরগোহাঞি যে চেষ্টা তার লেখনীর মধ্য দিয়ে হাতে নিয়েছিলেন তা আজও ফলপ্রসূ হয় নাই। অতএব সবাই মিলে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর নারী সমাজ তথা মানবসমাজের শ্রীবৃদ্ধিতে যোগ দিতে হবে। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়,

সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক, নারীরা ছিল দাসী। বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের
যুগ আজি, কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডনকা বাজি। (নারী)

তথ্যসূচী :

১। দাস, জীবনানন্দঃ পতিতা, ঝরা পালক, পৃষ্ঠা ৪৭
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাশীষঃ গণিকাবৃত্তিঃ সমাজ, সংস্কার এবং সমীক্ষা, সানন্দা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৯
৩। অজন্তা প্রকাশনঃ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, মাধব কন্দলী, শ্রী শ্রী শঙ্করদেব এবং শ্রী শ্রী মাধবদেব পৃষ্ঠাঃ ১৩১
৪। ভট্টাচার্য, সুকুমারীঃ প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৫
৫। শর্মা, সত্যেন্দ্রনাথঃ অসমীয়া উপন্যাসের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩৫
৬। জামান, ড° রফিকুজঃ দণ্ডিনাথ কলিতা রচনাবলী, প্রথম খন্ড, অসম প্রকাশন পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৬০
৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৪২৩
৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৪২৪
৯। দত্ত, ড° বীরেন্দ্রনাথ (সম্পা)ঃ প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী রচনাবলী, প্রথম খন্ড, অসম প্রকাশন পরিষদ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, পৃষ্ঠা ৮০২-৮০৩
১০। as.m.wikipedia.org/w
১১। বরগোহাঞি, হোমেনঃ চারিটা দশকর ফচলঃ উপন্যাস সমগ্র, ভারতী বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩

১২। বরগোহাঞি,হোমেনঃ চারিটা দশকর ফচলঃ উপন্যাস সমগ্র, ভারতী বুক স্টল প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮,পৃষ্ঠা ৩১
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৬
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১০২
১৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৭২
১৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১০২

নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত শিল্প উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা

আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ
অগ্রদীপ এস. সি. এস. নিকেতন

সারসংক্ষেপ ঃ বর্তমানে ভারতের তাঁত বস্ত্র শিল্প বলতে প্রধানত নদীয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত ও সিল্ক বস্ত্রকেই বোঝায়। ব্রিটিশ আমলে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নদীয়া নামে একটি স্বতন্ত্র জেলা তৈরি করা হয় এবং কৃষ্ণনগর কে সদর শহর হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে বাংলার মসলিনের চাকচিক্যের কথা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুলতানি যুগ থেকে শান্তিপুর ও ফুলিয়াই তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ঘটলেও মোঘল আমল থেকে সারা পৃথিবীতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। তাঁত শিল্পে ছেলেদের পাশাপাশি মহিলারা ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সুতার নলী পাকানো থেকে ড্রামিং পর্যন্ত সমস্ত রকম কাজই করতেন মহিলারা। শান্তিপুর এবং ফুলিয়ার মেয়েরা তাদের জীবিকা হিসাবে বস্ত্র বয়ন শিল্পকেই বেছে নিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতে আসার পর থেকেই বাংলার তাঁত শিল্পীদের ওপর অত্যাচার শুরু হয় এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র ভারতে আমদানি করা।

তবে মজুরীর দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রথম দিকে মহিলাদের মজুরী কম ছিল পুরুষদের তুলনায় কিন্তু ধীরে ধীরে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মজুরীর সমতা ফিরে আসে। বাড়ীর গৃহবধূরা আট ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করত, তারা জ্যাকার্ড পাড় কাপড় বোনার জন্য পুরুষদের সাহায্য করত। মহিলারা স্বনির্ভরতার জন্য বাইরের অনেক সমবায়ে যুক্ত হত।

তাঁত হচ্ছে একধরনের যন্ত্র যা দিয়ে তুলার সুতা দিয়ে কাপড় বানানো যায়, এই যন্ত্র হাতে বহন করা থেকে অনেক ওজনের হয়ে থাকে। আধুনিক বস্ত্র কারখানা গুলিতে স্বয়ংক্রিয়তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণ তাঁত যন্ত্রে সুতা, কুন্ডলী আকারের টান টান করে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। লম্বালম্বি সুতাগুলিকে টানা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলিকে উরান বলা হয়। তাঁত চালু করার পর নির্দিষ্টি সাজ অনুসারে সুতা টানা হয় এবং সেলাই করা হয়। বাংলা তাঁত যন্ত্রে ঝুলানো হাতল টেনে সুতা জড়ানো মাকু আড়াআড়ি ফুটানো হয়। মাযু ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্র গুলি হল সানা, দক্তি ও নরাজ। তাঁত বোনা শব্দটি এসেছে তত্ত্বাবধন থেকে, তাঁত বোনা যার পেশা তাকে বলা হয় তাঁতি। তাঁতের ওপর যারা বিশেষ কৌশল

ব্যবহার করে তাদের ফ্রেবরিক ইঞ্জিনিয়ার বলা হয়। আর এক ধরনের তাঁত হচ্ছে পাওয়ার লুম যেটা কারেন্টের মাধ্যমে চলে। পাওয়ার লুমে দুই ধরনের সুতা ব্যবহার হয়, এখানে ড্রপার ও বুয়ার ব্যবহার করা হয়। রাইনের সুতা গুলিকে পুরণ বলা হয়। উভয় তাঁতের সাহায্যেই লুঙ্গি গামছা শাড়ী তৈরি করা হয়। তাঁত হল পুরানো ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প।
সূচক ঃ তাঁত শিল্প, তন্তুবায়, মসলিন, শান্তিপুর, ফুলিয়া, মজুরী, শ্রমিক, মহিলা, জীবিকা।

মূল আলোচনা ঃ-
নদীয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত শিল্প সম্পর্কে স্থানীয় কিছু সাক্ষাৎকরগণের কাছ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। যেমন বীরেন কুমার বসাক একজন স্থানীয় তাঁতশিল্পী যার কাছ থেকে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে, জানা গেল তিনি রামায়ণ মহাভারতের মতো কাহিনী তিনি নিজের একক দক্ষতায় শাড়ীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ২০১২ সালে তিনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। গিনেস বুক অফ রেকর্ড -এ উনার নাম আছে, পদ্মশ্রী পুরস্কার ও তিনি পেয়েছিলেন ২০২১ সালে। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মায়ের জন্য ও উনি শাড়ি বানিয়েছিলেন, অন্য আর একজন উল্লেখযোগ্য তাঁত শিল্পী হলেন আশুতোষ দে যিনার বাড়ি ফুলিয়া গ্রামে। জানা গেল এরা ছয় জন মিলে একটি তাঁত শিল্পে কাজ করেন, দিনে এরা একটি শাড়ী বানাতে পারে। এদের বাড়ী কলোনী বসাক পাড়া, স্থানীয় শিক্ষক রমেশ বসাক, পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে জানা গেল যে, এখানকার তাঁত শিল্পীদের অর্থকষ্টের কথা। রেণুকা বসাক নামে এক তাঁত শিল্পী বলেন যে, যদি তাদেরকে সরকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করে, তাহলে তারা আরও ভালো ভালো শাড়ী বুনতে পারবে। বিজন রায় নাম এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানা যায় প্রচুর সংখ্যক মহিলারা এই তাঁত কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। হারাধন চ্যাটার্জী নামে এক শান্তিপুরের ব্যবসায়ী বলেন, বহু দেশীয় রাজ্য থেকে এমন কি বিদেশ থেকেও অনেকে এখানে তাঁতের শাড়ী কিনতে আসেন। রামলোচন ঘোষ নামে এক শিক্ষক বলেন আগে যে পরিমাণ তাঁত কারখানা দেখা যেত, এখন তা আর দেখা যায় না।

বাংলার তাঁত বস্ত্রের খ্যাতি দীর্ঘ দিনের। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে ৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্লিনি তাঁর বিবরণে বাংলার মসলিনের চাকচিক্যের উল্লেখ করেছেন। এই খ্যাতি পরবর্তীকালেও অটুট ছিল।[১] বাংলার বস্ত্র শিল্প বলতে প্রথমেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের উল্লেখ করা যায়। শান্তিপুরে বস্ত্র বয়ন বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে সঠিক সময় নিয়ে সংশয় থাকলেও এটুকু বলা যায় চৈতন্যদেবের বহু আগেই শান্তিপুরে বয়ন শুরু হয়েছিল। সম্ভবত সুলতানী যুগের সূচনা থেকেই।[২] কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীচ 'শান্তিপুর পরিচয়' গ্রন্থে পাওয়া যায় - ঢাকার ধামরাই থেকে লক্ষ্মণ সেনের সময় প্রধানত তারই আগ্রহে বয়নক্ষম ও সূক্ষ্মতন্তু শিল্প নিপুণ কয়েকঘর তন্তুবায় এবং তার

সঙ্গে কয়েঘর হিন্দু দরজী বা ওস্তাগর শান্তিপুরে আসে। তার আগে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ মোটা সুতোর বস্ত্র বয়ন করত। ধামরাই -এর তাঁতীরা প্রধানতঃ মসলিনেরই তাঁতী। শান্তিপুরে এসে তাঁরা মসলিন বয়নই শুরু করেন যা অনেক পরে নকশাদার পাড়ের শাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে 'শান্তিপুরী' নামে খ্যাত হয়। মসলিন থানের পাড়ে কালী করে হয় ধুতি। মোঘল আমলে এই মসলিনেরই খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। কোম্পানীর আমলেও শান্তিপুরে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিবাস ও সরকারী কতিপয় বৃহৎ বস্ত্র কারখানার স্থান ছিল বলে বস্ত্র ব্যবসা ক্রমশঃ শান্তিপুরেই কেন্দ্রীভূত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অষ্টাবিংশ বৎসরে সরকার ১,২০, ০০০ - ১,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের শান্তিপুরী মসলিন ক্রয় করতেন।[৩] এর পূর্বে ১৭৫৮ খৃঃ এর সরকারী রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) কিঞ্চিৎ আগে ও পরে সরকার গোমস্তাদের সহায়তায় শান্তিপুর থেকে তন্তুবায়দিগকে দাদন নিয়ে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে নিয়ে যয় এবং স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবতঃ এই কারণেই জোব চার্নক কোলকাতা নগরীর পত্তন করেন (১৬৯০)।[৪] শান্তিপুরের পাশেই ফুলিয়া গ্রাম। বয়সের দিক থেকে শান্তিপুরী শাড়ির তুলনায় টাঙ্গাইল শাড়ি নিতান্তই শিশু। শ খানেক বছর আগে বাংলার তেরশ সালের গোড়ায় তার উদ্ভব পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইল নামক স্থানে অবিভক্ত ভারতে বিশেষত বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর (ইংরেজ) অনুপ্রবেশ এবং ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাকার তাঁতীদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার বা শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বেশীর ভাগ চলে আসেন ঢাকার ধামরাই ও চৌহট্ট গ্রামে। পরে দেশদুয়ার, সন্তোষ ও খারিজার জমিদারের আমন্ত্রণে ধামরাই ও চৌহট্ট গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজন তাঁতী টাঙ্গাইল চলে আসেন। টাঙ্গাইলের তাঁতীদের পদবী বসাক। পরে দেশ ভাগের পর টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতীদের পুনঃস্থাপন করা হয় নদীয়ার ফুলিয়া অঞ্চলে। বর্তমানে ভারতের তাঁত বস্ত্র শিল্প বলতে প্রধানত নদীয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত ও সিল্ক বস্ত্রকেই বোঝায়। এই সামগ্রিক বস্ত্র শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ কিরূপ, তাদের মজুরীর স্বরূপ কি প্রকৃতির, এ বিষয়ে শ্রেণী বৈষম্য আছে কিনা - বিষয়গুলি আলোচনার দাবী রাখে।

নদীয়া জেলা সম্পর্কিত আলোচনায় জেলাটির ভৌগোলিক রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বল প্রয়োজন। নদীয়া জেলা ২২°৫৩ ও ২৪°১১ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৮°০৯ ও ৮৮°৪৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত গাঙ্গেয় সমভূমি। ব্রিটিশ আমলে, ভারতে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখের সভায়, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নদীয়া নামের একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং তার কালেক্টারের পদ সৃষ্টি করবার সিদ্ধান্ত নেন। তখন থেকেই কৃষ্ণনগর জেলার সদর শহর। নদীয়ার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন এফ্ রেডকার্ন। দেশ বিভাগের সময় (আগষ্ট ১৯৪৭) নদীয়া জেলাও বিভক্ত হয়। বর্তমানে এ

জেলার দুটি মহকুমা - কৃষ্ণনগর (সদর) এবং রানাঘাট। নদীয়ার আয়তন ১,৫১৪.৯ বর্গমাইল (৩,৯২৬ বর্গ কি.মি.)। বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর-পূর্বে কুষ্টিয়া জেলা (বাংলাদেশ), দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে চব্বিশ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভাগীরথীর অপর তীববর্তী বর্ধমান ও হুগলী জেলা।[৫]

ডঃ শমিতা সেন তাঁর গ্রন্থে দেখাচ্ছেন বড় বড় শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সংখ্যা খুবই কম। তিনি ১৮৯০-১১৪০ এই সময়টির উপর আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে নদীয়ার বস্ত্র শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বলা যায় মহিলারা এগিয়ে না আসলে হয়ত এই শিল্প শেষ হয়ে যেত। কারণ সুতার নলী পাকানো থেকে ড্রামিং পর্যন্ত সমস্ত রকম কাজই করছে মহিলারা। তবে ডঃ সেন প্রণীত সময়কালে নদীয়ার তাঁত শিল্পেও মজুরী প্রাপ্ত মহিলা শ্রমিক প্রায় ছিল না বললেই চলে। কারণ বস্ত্র শিল্প মূলত এখানে কুটির শিল্প। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বা নিচ্ছে ঘরের মেয়েরা। তবে বর্তমানে মহিলারা জীবিকা হিসাবে এই কাজকে বেছে নিচ্ছে। যেহেতু শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় জীবিকী হিসাবে বস্ত্র শিল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাই পরিবারে উন্নতির জন্য বাড়ির মেয়েরা তাদের গৃহস্থালির সকল কাজ করে পুরুষের প্রধান সহযোগী হিসাবে তাদের অবসর সময় অতিবাহিত করেছে তাঁতের কাজ করে। বাড়ির গৃহবধুরা এক একদিন আটঘন্টা কাজ করে এক একটি মাঠা কাপড় বুনছেন। এছাড়াও তারা জ্যাকার্ড পাড় কাপড় বোনার জন্য পুরুষদের সকল রকম সাহায্য করছে। আবার অনেক মহিলা তাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য বা নিজের স্বনির্ভরতার জন্য বাইরে সমবায়ে যুক্ত হচ্ছে। আবার ব্যক্তিগতভাবে কোন মহাজনের আড়ৎ -এ কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। এককথায় শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় বস্ত্র শিল্পে অংশগ্রহণকারী মহিলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বনির্ভর।

এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দিক অর্থাৎ মজুরীর দিকটি চলে আসে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমানে শান্তিপুর ও ফুলিয়া শ্রমিক ইতিহাসে কিছুটা ভিন্নধর্মী চরিত্র স্থাপন করত পেরেছে। গৃহে কাজ করার ফলে মহিলারা যে আলাদাভাবে কোন মজুরী পায় না - ডঃ সেন এই সামগ্রিকতার উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। নদীয়ার তাঁত শিল্পেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় এভাবে শ্রমিক হিসাবে যৌথভাবে পুরুষ ও মহিলা গৃহে কাজ করেছে। কেউই আলাদাভাবে মজুরী পায় না।[৬] ডঃ নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের মজুরীগত বিভেদের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। এক্ষেত্রে মহিলাদের শারীরিক দুর্বলতা ও দক্ষতা কম থাকায় বিষয়টি একটু অন্যভাবে প্রাধান্য পায়। কারণ শান্তিপুর ফুলিয়ায় শাড়ি বা কাপড় পিছু মজুরী। তাছাড়া ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মজুরীর বিভেদের জন্য গ্রাম বাংলার মেয়েদের অশিক্ষার বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন - শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় পুঁথিগত শিক্ষা যেভাবে মজুরীর উপর প্রভাব ফেলেনি। কারণ এই শিল্প পূর্ব

থেকেই ছিল কুটির শিল্প, বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা যৌথভাবে কাজ করায় মজুরী বা পৃথক মজুরীর প্রশ্ন এখানে ছিল না। তবে বর্তমান শান্তিপুর বা বিশেষত ফুলিয়ায় মহিলাদের কার্যগত দক্ষতা তেমন ভাবে পিছিয়ে না থাকায় মজুরীগত বিভেদ এখানে দেখা যায় না। ডঃ ব্যানার্জী ১৯৮১ এর রিপোর্ট উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন গ্রাম বাংলায় ২৮% মেয়ে অবিবাহিত। এক্ষেত্রে বিবাহিত জীবন ও সংসারের দায়িত্ব মহিলাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় আজও বিবাহিত শ্রমিকের তুলনায় মজুরী প্রাপ্ত অবিবাহিত শ্রমিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁত বুনছে বিবাহিতা মহিলারা। বিবাহিতা মহিলদের জীবনে বিনোদনই হল তাঁত বয়ন বা বয়নে সাহায্য করা। শান্তিপুরে বা ফুলিয়ায় মজুরী দিন পিছু, পুরুষ ও মহিলা পিছু নয়। এখানে একজন মহিলা শ্রমিক যদি পুরুষ শ্রমিকের সমান কাপড় বুনতে পারেন তবে তিনি পুরুষের সমান মজুরী পাবেন। যেমন - শান্তিপুরের অন্তর্গত কুটিরপাড়া সমবায় সমিতিতে এই বিষয়টি বিবেচ্য যে মহিলাদের কর্মদক্ষতা পুরুষের থেকে কম হওয়ায় বা অবিরত সমভাবে চার হাত পা ব্যবহার করতে না পারায় মেয়েরা জ্যাকার্ড পাড় কাপড় পুরুষের তুলনায় কম বুনছেন। কিন্তু বুনলে তাঁরা সম মজুরীই পাবেন।[৭]

মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সমবায় সমিতিগুলির সহায়তার কথা স্বীকার করা উচিত। শান্তিপুর বা ফুলিয়া যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহিত ও পাঠরতা মহিলারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেন তাই বাড়ির মত কাজের সময় নিয়ে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য সমিতির কাজ শুরু হয় দুপুর একটা থেকে। পুরুষরাও অবশ্য কাজ সেরে ঐ সময় এ কাজে যোগ দেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য নজরে পারে না।

উপসংহার ঃ-

পরিশেষে বলা যায়, ডঃ সেন ও ডঃ বন্দ্যোপাধায় তাঁদের গ্রন্থে শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার পুরুষদের তুলনায় কম, মহিলা শ্রমিকদের মজুরীগত সমস্যা, তাদের নানা রকম প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। নদীয়ার তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রেও একথাগুলি প্রযোজ্য তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এক্ষেত্রে মজুরী বা অন্যান্য সুবিধা দানের ব্যাপারে পুরুষ মহিলা বিভাজন দেখা যায় না বললেই চলে। তাছাড়া বর্তমানে কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কেবল নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মহিলারা নন, উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলারা কেবল অর্থ নয়, স্বনির্ভরতার জন্য একাজে এগিযে আসছে। অর্থাৎ উচ্চ ঘরের মহিলারা মহিলা শ্রমিক হিসাবে (Wage Labour) কাজ করার যে সংকীর্ণতা ছিল তা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এটি নারী সচেতনতার একটি বিশেষ নিদর্শন বলা যায়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) শান্তিপুর ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঃ ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

২) পশ্চিমবঙ্গ ঃ নদীয়া জেলা সংখা ১৪০৪

৩) শান্তিপুর পরিচয় ঃ প্রথম খণ্ড ঃ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, সম্পাদনা ঃ শান্তিপুর লোক সংস্কৃতি পরিষদ।

৪) শান্তিপুরের লোক সংস্কৃতি পরিচয় ঃ ডঃ অশোক কুমার দত্ত।

৫) পশ্চিমবঙ্গ ঃ নদীয়া জেলা সংখ্যা ১৪০৪।

৬) Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : The Bengal Jute Industry. Cambridge Studies in Indian History & Society.

৭) Nirmala Banerjee : Indian Women in a Changing Industrial Scenario / edited by Nirmal Banerjee, New Delhi - Sage - 1991.

স্থানীয় সাক্ষাৎকারগণ ঃ

১) বীরেন কুমার বসাক (তাঁত শিল্পী) শান্তিপুর।

২) আশুতোষ দে (তাঁতশিল্পী) ফুলিয়া।

৩) রমেন ঘোষ (স্থানীয় শিক্ষক)।

৪) রেণুকা বসাক (মহিলা তাঁতশিল্পী)।

৫) বিজন রায় (স্থানীয় ব্যবসায়ী)।

৬) হারাধন চ্যাটার্জী (ব্যবসায়ী), শান্তিপুর।

৭) রামলোচন ঘোষ (স্থানীয় শিক্ষক)।

৮) পঞ্চানন কর্মকার (স্থানীয় শিক্ষক)।

শংকরের 'জন-অরণ্য' উপন্যাস: যুবসমস্যার এক চিরন্তন দলিল

রুবিয়া বানু
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মণিশংকর মুখোপাধ্যায় ওরফে শংকরের জন্ম ১৯৩৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর, অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার বনগ্রামে। শংকরের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে ওপার বাংলা থেকে এপারে হাওড়ায় চলে আসেন। লেখকের প্রথম উপন্যাস 'কত অজানারে', যেটি ১৯৫৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এরপর তিনি একের পর এক 'চৌরঙ্গী', নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি', 'বোধোদয়', 'স্থানীয় সংবাদ' ইত্যাদি অনেক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'জন-অরণ্য' উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে প্রকাশ পায়। যেকোনো ব্যক্তি যখন তার কৈশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার চলার পথে স্বাভাবিক নিয়মে একটি শব্দ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে পড়ে, সেটি হল 'চাকরি' কিংবা 'কর্মসংস্থান'। চাকরি কিংবা কর্মসংস্থানের সন্ধানের জন্য বহু যুবসম্প্রদায়ের জীবনের অন্তরালে ঘটে চলেছে এক একটি নিঃশব্দ বিপ্লব। সেই বিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে মান-অপমান, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়গুলি। হাজার হাজার যুবসম্প্রদায়ের জীবনে ঘটে চলা এই নিঃশব্দ বিপ্লবেরই প্রতিফলন ওঠে এসেছে 'জন-অরণ্য' উপন্যাসে।

সূচকশব্দ : শংকর, জন-অরণ্য, যুবসম্প্রদায়, বেকার, চাকরি, কর্মসংস্থান, হতাশা।

মূল প্রবন্ধ :

১৯৭৩ সালে 'জন-অরণ্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের প্রায় ১৬ বছর পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই ষোল বছর ধরে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে চলছিল এক উত্তাল পরিস্থিতি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, দেশভাগকে কেন্দ্র করে এই সময় যে বিশেষ সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠেছিল তা হল উদ্বাস্তু সমস্যা। ১৯৪৭-৪৮-এ তো বটেই এমনকি এর পরের বছরগুলিতেও পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু স্রোতের প্রবাহ চলতে থাকে। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় দাঙ্গার পরিস্থিতি, ১৯৫১ সালে পূর্ববঙ্গে খাদ্যসমস্যা, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে পার্সপোর্ট ব্যবস্থার প্রচলন, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬২ সালে সংঘটিত ভারত-চিন যুদ্ধ, ১৯৬৪ সালে কলকাতাসহ আরোও কয়েকটি

জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এর পরের বছর ১৯৬৫ তে ঘটে ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ, ১৯৬৬ তে ঘটে খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর সি.পি.আই(এম) এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সংযুক্ত বামফ্রন্ট সরকার, এরপর নকশাল বাড়ির সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা। সেইসঙ্গে ১৯৭১ -এ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য শরণার্থী এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ এই সময় একের পর এক ঘটতে থাকা বিভিন্ন যুদ্ধ, দাঙ্গা ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত এক অর্থনৈতিক স্থবিরতার সূত্রপাত ঘটায়। শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট, বন্ধ কারখানা, পুরোনো আমলের যন্ত্রপাতির দরুন অ-লাভজনক অবস্থা, রাজ্যের বেশ কিছু পুরোনো কারখানা বন্ধ হয়ে যায় বা অন্যত্র সরে যায়। ফলত দেখা দেয় কর্মসংস্থানের অভাব এবং বাড়তে থাকে বেকারদের সংখ্যা। দেশের অসংখ্য যুবকদের মত শংকরকেও তাঁর প্রথম জীবনে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। লেখকের বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ১৪ বছর বয়সেই শংকরের কাঁধে এসে পড়ে বিধবা মা এবং সাতজন নাবালক ভাই বোনের দায়িত্ব। এইসময় সামান্য একটি কাজের জন্য তিনি কলকাতার রাস্তায় তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সংসার চালানোর জন্য তিনি একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন কাজ করেছেন -- কখনো দোকানের বেয়ারা, কখনো কাপড়কাচা সাবানের ফেরিওয়ালা, কখনো প্রাইভেট টিউশনি, কখনো বা বিবেকানন্দ স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকতা, কখনো টাইপিস্ট, কখনো টাইপ রাইটার ক্লিনার, কখনো জুট ব্রোকারের কনিষ্ঠ কেরানি, আবার কখনো কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিস্টারের বাবু। এইসব পেশায় থাকাকালীন তিনি যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, কিংবা কাজের সন্ধানে তিনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেসব বিষয়কেই তিনি ‘জন-অরণ্য’ উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে অঙ্কন করেছেন। এই বিষয়ে তিনি ‘জন-অরণ্যের নেপথ্য কাহিনী’ শীর্ষক অংশে লিখেছেন – “এই উপন্যাস লেখার প্রথম পরিকল্পনা এসেছিল আমার বেকার জীবনে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে বিরাট সংসারের বোঝা আমার মাথার উপর চাপিয়েছেন। যেমন তেমন একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ অফিসে অথবা কারখানার কাউকে চিনি না - চাকরি কী করে যোগাড় করতে হয় তাও জানিনা। এই অবস্থায় ডালহৌসি পাড়ার নতুন আপিসে গিয়ে লিফটে চড়তে সাহস পেতাম না – আমার ভয় ছিল বৈদ্যুতিক লিফটে চড়তে হলে পয়সা দিতে হয়।”[১]

নিজের বেকার জীবনের অভিজ্ঞতা, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে সীমাহীন ব্যর্থতা এবং অন্তহীন হতাশা থেকেই এই উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাত। উপন্যাসের নায়ক সোমনাথ। সোমনাথের পরিচয় – সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর প্রাপ্ত দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে এবং খড়গপুর এম ই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। সেইসঙ্গে সোমনাথের অন্য আরেকটি পরিচয় হল, সে বেকার। দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের দ্বিতীয় পাতা থেকে ‘কর্মখালি’র বিজ্ঞাপন অংশটি লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে

তারপর সেটি কেটে সোমনাথকে পাঠিয়ে দেন, সোমনাথ সেইসব বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় কাজের আর্জি জানিয়ে চিঠি লিখে তারপর দুপুরে সেগুলিকে ডাকবাক্সে ফেলে আসে, কোনোদিন বেরিয়ে পড়ে কোনো চাকরির পরীক্ষার জন্য কিংবা কোনো ইন্টারভিউ-এর জন্য, বি.এ পাশের পর গত আড়াই বছর থেকে এটাই তার দৈনন্দিন রুটিন। উপন্যাসের অন্য আরেকটি চরিত্র হল সুকুমার। যাদবপুরে একটি টালির ছাদের কাঁচা বাড়িতে সে থাকে। বৃদ্ধ পিতা মাতার বড় ছেলে এবং তিনটি আইবুড়ো বোন ও দুটি ছোট ছোট ভাইয়ের বড় দাদা সুকুমার। সুকুমারেরও অন্য আরেকটি পরিচয় - সে বেকার। সোমনাথ ও সুকুমার দুজনে একই কলেজ থেকে বি.এ পাশ করলেও দুজনের মধ্যে কোনো বন্ধুত্ব ছিল না কিন্তু চাকরির অরণ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুজনে একই বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াই বছর আগে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লাইনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় এবং তখন থেকেই দুজনে একসঙ্গে বহু ইন্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু দুজনেরই চাকরি হয়ে উঠেনি।

আড়াই বছর থেকে সোমনাথ ও সুকুমার দুজনেরই লক্ষ একটি 'চাকরি' কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য আলাদা। সোমনাথ এক সচ্ছল পরিবারের ছেলে, বাড়িতে তার থাকা ও খাওয়ার কোনো অভাব নেই। তার বাবা এবং দুই দাদার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে অথচ সেই বাড়ির ছেলে হয়েও সে এখনো বেকার – এই কথাটি একদিকে তার পরিবারের লোকেরা তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যেমন মনে করিয়ে দিচ্ছে তেমনি বাইরের সমাজের লোকেরাও তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে – তাই সোমনাথ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে চলছে একটি চাকরির, যাতে তার মাথায় লাগা 'বেকার'এর তিলকটি সে মুছে ফেলতে পারে এবং সমাজে তার পিতার মুখরক্ষা করতে পারে। অন্যদিকে সুকুমারের চাকরি সন্ধানের মুল উদ্দেশ্যই হল – দারিদ্রতা থেকে নিজের পরিবারকে রক্ষা করা। তার পরিবারে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট – দেড়খানা ঘরে আটজন প্রাণী কোনোরকমে মাথা গুঁজে রয়েছে, টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না তিনটি আইবুড়ো বোনের, কাউকে বসতে দেওয়ার মত একটি চেয়ারও নেই বাড়িতে। সুকুমারের মুখেই শোনা যায় তার পরিবারের করুণ অবস্থা – "সামনের মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। পরের মাস থেকে মাইনে পাবেনা। প্রতি সপ্তাহে আটটা লোকের রেশন তুলতে হবে আমাদের। বাড়ি ভাড়া আছে। মায়ের অসুখ। সুতরাং সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর আমাকে দিতে হবে। আমার যে একটা চাকরি চাই-ই।"[২] তাই নয়টি পোস্টের জন্য সাতাশ হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেবে – এই কথা শুনে সোমনাথ হতাশ হয়ে পড়লেও সুকুমার কিন্তু হতাশ হতে পারেনি, সে পুরোদমে প্রস্তুতি চালিয়ে গেছে। সে স্বপ্ন দেখে দুটো চেয়ারের, একটি টেবিলের কিংবা জানালার পর্দা কেনার। আবার মাঝে মাঝে তার ভয়ও হয় – "বড্ড ভয় করে মাইরি। আমাদের কলোনিতে আইবুড়ো দেঁতো পিসি আছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে করতেই পিসি বুড়ো হয়ে গেল –

বর আর জুটলো না। আমাদের যদি ওরকম হয়? চুল-দাড়ি সব পেকে গেল অথচ চাকরি হল না।”[৩]

কোনো বড়ো অফিসের ম্যানেজার বা বড়োবাবু হওয়ার স্বপ্ন নয়, তারা স্বপ্ন দেখে যেকোনো সামান্য একটি চাকরির। চাকরির জন্য হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ভরে এবং ইন্টারভিউ এর পর ইন্টারভিউ দিতে দিতে দুই বন্ধু হতাশায় ভেঙে পড়ে, তাই সামান্য একটা কেরানির চাকরি হলেও তারা খুশি। কিন্তু পরীক্ষায় বসে জেনারেল নলেজের নামে নাকাল হতে হয় দুই জনকেই, তাতে এমন সব প্রশ্ন করা হয় যার সাথে চাকরির কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বের সবচেয়ে ছোট প্রজাতন্ত্রের নাম কি? ভারতে বেকারের সংখ্যা কত? পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণীর নাম কি? – এর উত্তর না জানার আফসোসে সুকুমারের চোখে জল এসে যায়। সোমনাথও আত্মগ্লানিতে ভোগে। সুকুমারের মনে হয়, যারা চাকরি পেয়েছে তারা সবাই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। কথায় আছে “মেয়ের বিয়ে আর ছেলের চাকরির জন্য বাঙালিরা তো চিরকালই ধরাধরি করে এসেছে।”[৪] সুকুমারও তাই মাঝে মাঝে স্থানীয় এম.এল.এ-র কাছে যায়, যদি বলে কয়ে কিছু একটা চাকরির ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সেখান থেকেও সে পায় হতাশা আর অপমান। কোন কোন সময়ে তার মনে হয় ইংরেজের রাজত্বই বেশি ভালো ছিল, কারণ তখন ম্যাট্রিক পাশ না করলেও চাকরি হয়ে যেত, অথচ এখন হাজার হাজার যুবক গ্র্যাজুয়েট করেও বেকার হয়ে বাড়িতে বসে রয়েছে।

আসলে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও সমসাময়িক বিভিন্ন যুদ্ধ, দাঙ্গা, আন্দোলন এবং অসংখ্য উদ্বাস্তু এদেশে এসে আশ্রয় নেওয়ায় এমন এক উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, বেকারদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে থাকে। এক্ষেত্রে ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল- কর্মসুযোগ বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য তো দুরের কথা বরং হিতে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেহেতু ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি সেখানে কৃষির উপর কম গুরুত্ব দিয়ে শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষি উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে ফলস্বরূপ খাদ্যসংকট দেখা দেয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতার পরিমাণও বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে বাড়তে থাকে বেকারদের সংখ্যা। অধ্যাপক হরশংকর ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

“দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মোট ৮০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, ইহার মধ্যে কৃষির বাইরে ৬৫ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পুরানো বেকারির পরিমাণ হইল ৯০ লক্ষ। কমিশন আরও বলেন যে, ইহা নিতান্ত আন্দাজি হিসাব। এই হিসাবে পৌঁছিবার পদ্ধতি কিরূপ? প্রথমত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে বেকারের পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ, দ্বিতীয়ত, পূর্বের হিসাব অপেক্ষা শ্রমিক সংখ্যার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে (১৭ লক্ষ) এবং তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ হইতে প্রকৃত কর্মসংস্থানের পরিমাণ হইয়াছে কম (প্রায় ২০ লক্ষ)। উপরন্তু, যাহাদের

কিছু কাজ আছে কিন্তু অধিকতর কাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এইরূপ অপূর্ণ নিয়োগের পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভব নয়, তবে মনে হয় উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ হইবে।"[৫]

আসলে সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভিতরে ভিতরে যে কতটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল তা এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা এই লক্ষ লক্ষ বেকারদেরই প্রতিচ্ছবি যেন খুঁজে পাই সোমনাথ ও সুকুমারের মধ্যে। সুকুমারের কথার রসিকতার আড়ালে লেখক যেন লক্ষ লক্ষ বেকারদের করুণ অবস্থারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বেকারদের প্রকারভেদ সম্পর্কে সুকুমার সোমনাথকে বলেছে – "টুকে নে – বেকার দু'রকমের। কুমারী অথবা ভার্জিন বেকার এবং বিধবা বেকার। তুই এবং আমি হলুম ভার্জিন বেকার – কোনোদিন চাকরি পেলুম না। আর ছাঁটাই হয়ে যারা বেকার হচ্ছে, তারা বিধবা বেকার।"[৬] আসলে 'বেকার' জিনিসটা অনেকটা যেন ম্যালেরিয়া জ্বরের মত, যার সহজে মৃত্যু নেই অথচ তা যেন ক্রমশ জীবনকে শুষে নিয়ে তবেই দম ছাড়ে। সুকুমারেরও তেমনই অবস্থা হয়, চাকরির আশায় সে তার জেনারেল নলেজ বাড়িয়ে যেতে থাকে। আর এই জেনারেল নলেজের জন্য উপন্যাসে সুকুমারকে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যেতে দেখা যায়। রাস্তা-ঘাটে, যেখানে-সেখানে তাকে জেনারেল নলেজের বই পড়তে দেখা যায়, শুধু তাই নয়- রাস্তায় লোকেদের থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করতে দেখা যায়-"একটা আর্জেন্ট প্রশ্ন ছিল।... চাঁদের ওজন কত?"[৭]

অপরদিকে সোমনাথও কোনো চাকরি না পেয়ে ব্যবসায় নামার কথা ভাবে, কিন্তু এতেও তার হাত পা বাঁধা, কারণ ব্যবসার করার মত উপযুক্ত ক্যাপিটাল বা পুঁজি নেই তার কাছে। বৌদির কাছ থেকে দু-একবার টাকা নিয়ে লুকিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টাও করে সে, কিন্তু বার বার ঠকে যায়। অবশেষে বিশুদার হাত ধরে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজে নামে। এই কাজেও তাকে ঠোকর খেতে হয়, এক অফিস থেকে আরেক অফিসের গোলক ধাঁধায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, ঠকতে হয়েছে বিভিন্ন ধুরন্ধর ব্যক্তির কাছে। এরপর সে যখন একটু আশার আলো দেখতে পায়, তখনই তাকে পড়তে হয়েছে মানসিক দ্বন্দ্বে- একটি বড়ো অর্ডার সে পেতে পারে যদি সে ওই ব্যবসায়ীকে একজন দেহপসারিণীর মধ্য দিয়ে খুশি করতে পারে। বাধ্য হয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সোমনাথ পতিতালয়সহ বিভিন্ন স্থানে একজন দেহপসারিণীর খোঁজে নেমে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাকে বিভিন্ন দরজা থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয় কিন্তু তার পরিচয় হয় এমন সব মানুষের জন্য যারা অর্থের জন্য দেহপসারিণীর কাজে যুক্ত হয়েছে আর সবচেয়ে অবাক করার বিষয় এই কাজে তাদের পিছনে রয়েছে তাদের মা, তাদের স্বামী। এই কলুষিত জগতে সোমনাথের পরিচয় হয় এমনই এক চরিত্রের সঙ্গে যে নিজের মেয়ের কাজ কতক্ষণে শেষ হবে তা জানার জন্য নির্দ্বিধায় দরজার ফুটো দিয়ে ওদের দেখে আসেন।

সোমনাথ দেহপসারিণীর খোঁজে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে হতাশ হয়ে ফিরলেও অবশেষে সে একটি মেয়েকে পৌঁছে দেয় ব্যবসায়ী গোয়েঙ্কার রুমে, বিনিময়ে সে পায় অর্ডার সাপ্লায়ের চিঠি– "সোমনাথ এখন আর চাকরির ভিখিরি নয় – সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রতি মাসে একটা অর্ডার থেকেই হাজার টাকা রোজগার করবে সে। কারুর কাছে আর ভিখিরি হয়ে থাকতে হবে না সোমনাথকে।"[৮] গোয়েঙ্কার চিঠি হাতে পেয়ে সোমনাথ প্রথমত প্রচণ্ড উল্লাস অনুভব করলেও পরক্ষণেই তার সেই উল্লাস মিলিয়ে যায়, যখন সে জানতে পারে, যে মেয়ের শরীরের বিনিময়ে সে আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ছাড়পত্র হাতে পেয়েছে সেই মেয়ে আর কেউ নয় তার বন্ধু সুকুমারের বোন কনা ওরফে শিউলি। কনা অন্য কোনো পথ না পেয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে, নিজের এবং পরিবারের পেট চালানোর জন্য। সোমনাথ আর কোনো কথা বলতে পারে না, বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

আসলে আমাদের যুবকসমাজ প্রথমত সৎ উপায়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথকেই অবলম্বন করে কিন্তু বার বার হতাশা আর ব্যর্থতার পর ক্রমশ তারা যেন নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অনৈতিক পথকে অবলম্বন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে। তাই বেকারত্বের জ্বালা সোমনাথকে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ থেকে ধীরে ধীরে মেয়েছেলের দালালি করতেও শেখায়। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে এবং বেকারত্বের জ্বালা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে গিয়ে সোমনাথ যেন নিজের ভিতরের 'মানুষ সোমনাথ'কে হত্যা করে তার জায়গায় স্থান দেয় এক যান্ত্রিক সোমনাথকে, যে বাধ্য হয়ে নিজের মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে যন্ত্রের মতো গড়িয়া, নাকতলা, টালিগঞ্জ থেকে বৈষ্ণবঘাটাসহ সারা কলকাতায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে এক অল্পবয়সী স্লিম ফিগারের যুবতীকে। সোমনাথ কী কোনোদিন ভেবেছিলি তাকে একদিন নিজের বন্ধুর বোনের শরীর নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হবে? অন্যদিকে কনা কী ভেবেছিল তাকে একদিন কলগার্ল-এর কাজ বেছে নিতে হবে? তাই গোয়েঙ্কার সঙ্গে বিছানায় শুয়েও কনা সুকুমারের জন্য গোয়েঙ্কাকে অনুরোধ করেছে "একটা ছেলের চাকরি করে দিন"[৯]। সুকুমার যদি চাকরি পেত তবে হয়তো কনাকে এ কাজে নামতে হত না। কিংবা সোমনাথও যদি একটা চাকরি পেত তবে তাকেও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে দেহপসারিণীর খোঁজে বেড়োতে হত না। সোমনাথ, সুকুমার, কনা এরা আসলে সেইসব লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীর প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিয়েছে যারা বেকারত্বের সমস্যায় বাধ্য হয়ে অনৈতিকতার পথকে বেছে নিয়েছে অথবা সুকুমারের মতো পাগল হয়ে গিয়েছে। শুধু উপন্যাস রচনার সমসাময়িক সময়ে নয় এই সমস্যা এখনও ব্যাধীর মতো আমাদের সমাজে রয়ে গিয়েছে। সোমনাথ ও সুকুমারের মতো এখনও অনেক যুবক-যুবতীকে ফর্মের পর ফর্ম ভরে, বছরের পর বছর এক্সচেঞ্জ এমপ্লয়মেন্ট অফিসের লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে কিংবা একের পর এক ইন্টারভিউ দিয়ে এই বিশাল জন-অরণ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১) শংকর, 'স্বর্গ মর্ত পাতাল', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৭৩, প্রথম সংস্করণ- আগস্ট ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-২০৫।

২) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩।

৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৫২।

৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৩।

৫) অধ্যাপক হরশংকর ভট্টাচার্য, 'ভারতের অর্থনীতি', চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-জুলাই ১৯৬৪, পৃষ্ঠা- ৪১৭।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫।

৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫।

৮) তদেব, পৃষ্ঠা-২০২।

৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২০০।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) শংকর, 'সত্যজিৎ শতাব্দী', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৭৩, প্রথম প্রকাশ– ১৬ জুলাই, ২০২১।

২) শংকর, 'একা একা একাশি' দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৭৩, প্রথম প্রকাশ– কলকাতা পুস্তকমেলা ফেব্রুয়ারী ২০১৫।

৩) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭।

৪) হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৭৩, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৪২০।

৫) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা কথাসাহিত্যে জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৪।

জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতীক : ‘শনিবারের ছড়া’

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

‘শনিবারের ছড়া’ বইটি হাতে পেলাম। মঙ্গলবার ২৩.০৩.২০২১-এ। ছড়াকার অধ্যাপক প্রবীর ঘোষ রায়ের বিষয় বাণিজ্যবিভাগ জেনে কিছুটা বিস্মিতও হলাম যে, বাংলা সাহিত্য শাখার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়েও তিনি যেভাবে ছড়াচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তাতে তাঁর কবিসত্ত্বার প্রবণতাকে শুধুই প্রাগাঢ় করেনি মৌলিক বৈশিষ্ট্যে নিজের অবস্থানকেও স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন। ফেসবুকের ওয়েবসিরিজের ১৮০টি ছড়া নিয়ে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে ছড়াকার প্রতিটি ছড়ার আলাদা আলাদা ভাবে নামকরণ করেননি বরং ‘শনিবারের ছড়া-১’,‘শনিবারের ছড়া-২’ এইভাবে... ‘শনিবারের ছড়া ১০০’ সংখ্যার দ্বারাই চিহ্নিত। ছড়ার বইটিতে উপরিপাওনা যে কোনো ছড়ার পরিপ্রেক্ষিত কি, উপপাদ্যবিষয় কি তা ছড়া শুরুর আগেই ২-৩-৪ লাইনে ছড়াকার তা নিজেই বলে দিয়েছেন যা আমার মতো পাঠকে ছড়াটি বুঝতে সুবিধা করে দিয়েছে। বিগত ২ বছরে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা সামাজিক অবক্ষয় ও সংস্কৃতির ভাঙন তাঁর ছড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যে ঘটনাগুলি আমরা আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকাতে পেয়েছি কোথাও সাম্প্রদায়িকতার অসহিষ্ণু ক্ষোভ বিষেদ্‌গার সংঘর্ষ, ধর্মান্ধতার ব্যাভিচার নির্মম অত্যাচার, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, দলিতের আর্তনাদ, দায়িত্বশীলপদে বসে থাকা ব্যক্তিত্বের কাণ্ডজ্ঞানহীন বাক্যকেও কষাঘাত করেছেন তিনি, মাতৃত্বের লাঞ্ছনা, ষড়যন্ত্রকরে মামলা চাপিয়ে জেলে পোড়া, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা তাঁর কলমের লেখনীবাণে তীব্র কষাঘাতে শাণিত করেছেন তিনি। নজর এড়ায়নি করোনাতঙ্ক এবং গোময়, গোমূত্র নিয়ে রাজনীতিবিদের উদ্ভট্‌তত্ত্বের। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়েননি। শাসকের রাঙা চোখের চাহনিকে ভয় পাননি। বরং সাহসিকতা ও বুকের জোরে দম রখেছেন। গরু নিয়ে ঘটে যাওয়া বুলন্দশহরের নৃসংশ ঘটনা, ছদ্মজাতীয়তাবাদের দাঙ্গার পৈশাচিকতা “পুলওমামা সেনাদের রক্তাক্তলাশে আমরা মর্মাহত, স্তম্ভিত।”(২৩) শোকার্ত মায়ের ক্রন্দন। অসহায়তা দুই সম্প্রদায়ের হিংসার বলীদানের জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর ছড়ায়। গাড়ি বোঝাই বিস্ফোরক কী করে মিলিটারি কনভয়ে ঢুকে যায়। স্বেচ্ছাচারী শাসকের কুযুক্তির আশ্রয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি (৩৫/৩৯) ইতিহাস যাদের ক্ষমা করবে না কোনোদিন, ছড়াকারের কণ্ঠেগর্জে উঠেছে—‘স্বৈরাচারী নিপাত যাও, যুবসমাজ ছাত্রসমাজ জেগে আছে। স্বৈরাচারীর পতন অনিবার্য, ব্রিটিশ পদলেহনকারীদের বীরের সম্মান দেবার উগ্র বৃষ্টামি! জনগণের টাকালুট করে বিদেশে পালানো কুসন্তানেরা,

রাষ্ট্রের মদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবাদী নাকি গর্ভবতী রমণী। অগত্যা জেলে ঠাঁই তাঁর। বিগত কিছু সময় ধরে ঘটে যাওয়া সমাজের বীভৎস গভীর ক্ষত গুলির দিকে তিনি আলোকপাত করেছেন, রূঢ় বিদ্রূপে। বিশ্ব যখন মৃত্যু উপত্যকা করোনা বিধ্বংসী ছোবলে, মহামারীর বিষ প্লাবনের এই ভয়ংকর গ্রাসের দিশাহীন স্বরূপটি তথা লকডাউন এবং তার ফল পরিযায়ী শ্রমিকের করুণ অসহায়তা সবই উঠে এসেছে ছড়াকারের লেখনীতে। ছড়াকার উদ্বিগ্ন কে বেশি ভয়ংকর? রোগ না ক্ষুধা? কী বেশি দরকারী? ধর্ম না বিজ্ঞান? করোনার দিনগুলি কোন পথ দেখাবে শেষ পর্যন্ত? প্রেম না ঘৃণার! বিশেষত করোনা যে আমাদের গাহর্স্থ্য হিংসার প্রকোপকে বাড়িয়ে দিয়েছে যে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। করোনাকালে লকডাউনে মানুষকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। কিন্তু যার ঘর নেই ফুটপাতে যার রাত্রিকাটে খোলা আকাশতলে, কার্ফুতে বন্ধ নিজ দিন-আনা দিন খাওয়া মানুষের রুজি। তাদের পেটে আগুন জ্বলছে। যে কৃষক সব্জি ফলায় মাঠে, ইস্টিশানে মোট তোলে যে কুলি, ভ্যান ঠ্যালে যে, রিক্সা চালায়, চা-দোকানের ঝাঁপ খোলে, বারবাণিতাদের অন্ধ জগত, সবারই মর্মান্তিক জীবননষ্ট জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে! ছড়াকার' বলেছেন রামেই মারুক কি রাবণে— এদের মরণ যজ্ঞ ঘনিয়ে এসেছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও কিংবা মহামারীর বিষ-প্লাবনে তাদের জন্য মহামান্য কোনো নেতার মুখে মধুর ভাষণ বা বক্তৃতাশোনা যায় না। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। তাই তার আশ্রয়দানের পরিবর্তে কৌশলীপন্থা অবলম্বন করেন। গুরু যদি অন্ধ হয় তাহলে ভক্তের পথ খানাখন্দ ভরা হবেই। ছড়াকার বলেছেন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে তফাৎ ভালো মন্দে।

গরীব বলে কবির কথা বাসি হলেই ফলে,
ছদ্মবেশী ঘরভেদী-সব বাড়ছে দলে দলে।

করোনার কালে সর্বজ্ঞদেরও যে অসহায় দেখাচ্ছে ৮৫ নং ছড়াটি তার উদাহরণ। যারা নিজেদের এলেমে চলত এতদিন পাউডার লিপিস্টিক মেখে নিজেদের শিক্ষা দিক্ষার মাপকাঠিতে বিজ্ঞ বলে জানতো-অর্থ-সমাজ-রাজনীতি তারাও আজ দুর্গতদের মতো কেমন বোকাবাক্সের ভূত!

লকডাউনের জেরে আমাদের প্রত্যহিক জীবন যে কী ভীষণ বদলে গেছে। হাতে অবাধ সময় পেয়ে যাওয়ারটাও কোন গঠনমূলক কাজে লাগানো যাচ্ছে না, দৈনন্দিন একঘেঁয়েমি অসহ্য হয়ে উঠেছে। অতি প্রিয়জনের খুনসুঁটি ও এখানে (কবি পত্নীর) মনে হয় চিমটি! কোভিড আমাদের জনজীবনকে কেমন যেন রাতারাতি একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। তাই কবি বলে ওঠেন—"কোভিডের হাত ধরে ঘণা-অসূয়া পালাক।" (৮২)

দেশটা যখন পুরোপুরি আবোলতাবোলের প্রত্যক্ষ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের সকলের কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থা (৭০) ছড়াকার মহাকালের হাসির নিষ্ঠুরতাকে ও তুলে ধরেছেন— প্রকৃতির ক্রূঢ়তা আমফান ঝড়ের তাণ্ডব ও বিধ্বংসীলীলা

যখন বাতাস ভরে উঠে চেনা অচেনা বিষে—বিজ্ঞেরা বাঁকা হেসে বলেন ক্লিশে, তখন ছড়াকার প্রবীর ঘোষরায়ের প্রত্যয়—

'আসবে সে দিন, মানবতার সব অপমান
ঘুচিয়ে যখন সবাই হবে সবার সমনে।
চলতে পথে হাত ধরেছি, বন্ধু সবাই,
ক্ষুধার, মারীর সব অবরোধ পার হয়ে যাই।

শনিবারের ছড়া (৮৩)

পাশাপাশি তাঁর কবিতায় আরো একটি শান্ত স্রোতধারা বয়ে গেছে যা কিছু কল্যাণকর, শুভ সুন্দর তার জয়গান গেয়েছেন ছড়ায় ছড়ায়। (৩৪) ছড়াতে বউয়ের সঙ্গে দাম্পত্য, খুনসুটি, প্রেম, দাম্পত্য-কলহ আর পরকীয়া নিয়ে মজার রসাস্বাদন কবি প্রেমের অভিমান ধরা পড়ে— (৭৮) নং এ—

'আসবো বলেই যাওয়া আমার, যাবো বলেই আসা,
তুমি যাকে রাগ জানো তা আসলে ভালোবাসা।'

'যাবো বলেই আসা আমার, আসবো বলেই যাওয়া
যাকে তুমি শূন্য জানো, সে আমার সকল পাওয়া।

কালিদাসের কাল থেকে আষাঢ় ও মেঘদূতের বিশেষ সম্পর্ক-বার্তা।

ছড়াকার আজও উপলব্ধি করেন সত্যিই এদেশের বুকে আজ আঠারো নেমে আসা এবং দেশের হাল ধরা খুবই জরুরি।

a) রামরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও প্রেম সর্বকালেই সত্য (৯৯) মঙ্গল, তাও ধ্রুবসত্যই। কিচ্ছু ভালোলাগে না—মানসিক অবসাদ, বিষাদ, চারিদিকে শুধু মনখারাপ করা খবর। সত্যিই বড়ো গভীর অসুখ আজ পৃথিবীর (৯৬) চিরনতুনের জন্মকদিনে কবি মান-অভিমান মিটিয়ে প্রেমের দোলা ভ্যালেন্টাইন ডে ! (৭৪) ভালোবাসার জয় চান কবি। কৃষ্ণ রাধার প্রসঙ্গ তাই স্বভাবতই এসেছে ছড়ায়।

C ২১ গানওয়ালার গান যৌবনের ভালোবাসার সেতু-নবীনা কিশোরী এক পগলীর দুঃখ এবং হতাশার মধ্যে ও চারিদিকে হাসিতামাশার খোরাক মিলতেই থাকে, ছড়ায় উপপাদ্য বিষয় সেখান থেকে নিতে গিয়ে ছড়াকার সাধুদের (৩৫) সাবধান করে দিয়েছেন। ছদ্মবেশীদের সাবধান করে অশুভের বিনাশ চেয়েছেন তিনি। বিষাক্তসাপ ফণা বিস্তার করলেও গোকূলে কৃষ্ণ বেড়ে ওঠার মতো কবি জানেন অশুভ শক্তির ও ধ্বংস করার শক্তি আছে তাই তিনি হাল ছাড়েননি। জন্মাষ্টমী ভারতীয় পুরাণের অন্যতম সেরা কূটনীতিবিদের জন্মতিথি (৪৯) কবি তার মধ্যেও পেয়ে যান নিজের লেখনীর অর্থ।

সুদিনের দূরতম আশাও দুরাশা মনে হয়। ভোর হয় আর আলো ফোটবার আগেই-তো সবচেয়ে গাঢ় হয় অন্ধকার। রক্তে কলম ডুবিয়ে কবি আঁকেন দিন-বদলের ছবি।

ঠিক আর রাজনৈতিক ভাবে ঠিক এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝাতে ছড়াকারের বিচক্ষণতাও যথেষ্ট সুদৃঢ়। (১৫) মিথ্যার বেসাতি যারা করে মঞ্চের পিছনে তাদের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত থাকে সে সর্তক বাণী ও গর্জে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে। (৯৫) রাজনীতি বড়ো আজব জিনিস, ছরাকার সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত—নীতিহীনতাই রাজনীতির মূল কিনা ! (৪৩)

স্বার্থান্বেষী স্বার্থের কারণে কে কখন কার সাথে হাত মেলায় শত্রু-মিত্র বদলে যায় তাকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি—"আরে বাবা জানিরে, তোর হাতে ক্ষমতা,তোর পোষা তোতা পাখি তোর বুলি কাপচায়।"

C আবারশীতকালের অনুকূল জীবনচিত্রটি সুন্দরকরে এঁকেছেন— মেলায়-খেলায়-ছবিতে-নাটকে আহারে বিহারে (১৪)

প্রকৃতি ইছামতীর জল – মাঝিমল্লারের গান – দুর্গাবিসর্জন পাখীদের আনচান শরতের সুন্দর চিত্র ও পাঠকের মনকে করে তোলে সুখনীয়। শরতের আকাশে যে কালো মেঘের ভ্রূকুটি রয়েই যায় সেই অশুভের বিনাশচেয়ে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কবি।(৫৫) নির্বোধের কর্মকাণ্ড,বাঘের গলায় মালা পরানো ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি অন্যদিকে বোধিমানুষের হাসির উদ্রেগ, ভূতের অস্তিত্ব ও কাণ্ড কারখান নিয়ে মস্করা করতে তিনি ছাড়েননি। প্রকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ বড়ো বিপন্ন, অসহায়! ধনী গরিবের বিভেদ রেখার মধ্যে তা ধার ধারে না সে বক্তব্যই স্পষ্ট করেছেন (৮৮) সংখ্যক ছড়ায়। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা— এই প্রবাদ বাক্যটিতে সত্য হয়ে উঠেছে ছড়াকারের— (৮৭) নং ছড়ায়।

'জীবনের গান গাইতে জানে না মৃত্যুর পালাকার।' এই মৃত্যুউপত্যকাই আজ কবির স্বদেশ! তাই ভীষণ ঘৃণার উদ্রেগ করে বিদ্রূপ করেছেন— 'পাথর নিংড়ে রস চায় ওরা, ছেড়ে টসটসে ফল। (৮৬)

আবার সমাজমাধ্যমের কুফল বন্ধুত্বের বিজ্ঞাপন, মানুষের একাকীত্বের নিঃসঙ্গতার অবসাদের সুযোগ নিয়ে রঙিন স্বপ্নের হাতছানি—ফাঁদে পড়ে ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির শিকাড়, বিপন্নতার আবহ ঘুণ ধরা সমাজের পৈশাচিক বর্বরতা শিশু চুরির ঘটনা। আবার সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে লেখা বাস্তবের কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল ঘটে গেলে কাকতালীয় বলে কবি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন— (৯৭) 'শাক দিয়ে ঢাকা আছে মাছ'— (৯৪) এমন সব কাণ্ড কারখানাও জর্জরিত করেছেন তীব্র কষাঘাতে। রক্ষকই ভক্ষক, ঠগ যোচ্চদের স্বরূপও চিনিয়ে দিয়েছেন। (৯৪)। (৭৬) চোরে চোরে মাসতুতো ভাইদের নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন—

তোকে দেখে হাসি পায়, আমি ত জোকার,
দুনিয়ায় চলে রাজ যতেক বোকার।

তুই খাস চেটেপুটে, আমি খাই লুটে,
তুই খুব হিংসুটে আমি ও কুচুটে—।

আরো ভিন্ন ভিন্ন সুরে কিছু কিছু ছড়া স্থান পেয়েছে যা এক একটাএক এক স্বাদের। যেমন—কবিরা যেন নিজেদের ভালোটা বোঝার ক্ষমতা রাখেন, বেয়াদপ ভালো নয়। নিজের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, তার শুদ্ধিকরণের পন্থা ও দর্শন হয়েছে (২৪)। শুভবুদ্ধিবাদীদের ফড়েরা যে দাবিয়ে রাখতে পারে না তার পরিচয় ও ছড়ায় স্পষ্ট। (৫৩) যে মেঘ কখনো বৃষ্টি ঝরায় না সে সময়ে কবি খুঁজে চলেছেন তাঁর স্বদেশে, কিন্তু 'যে মানুষের কোন স্বদেশ নেই,/ কোথায় পাবে সে তার পরিচয়/....../এপারে মন, শরীর চলে যাচ্ছে ওপারে মায়ের ভিটে টুকরো করে কাঁটাতারের বেড়া,/ রিক্ত জীবন আগুন জ্বেলে রাখতে যদি পারে,/ একদিন ঠিক মানুষের পাশে দাঁড়াবেই মানুষেরা"—সম্প্রতি NRC NPR নিয়ে রাষ্ট্র তথা শাসকদের মধ্যে যে বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা, দেশ ছাড়া হওয়ার সন্ত্রস্ত ভয় একশ্রেণির মানুষের মধ্যে কাজ করে বেড়াচ্ছে। ছড়াকার স্পষ্টতই সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ভায়ের উঠোন যখন ভাইয়ের জমা লাশে ভরে ওঠে তখন একজন সত্যান্বেষী ই-তো উপলব্ধি করতে পারেন—'শাসকের বেশে পরিচয় ঢেকে ঘাতকেরা পথ চলে।' (৪৮) শাসক শক্তি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে সেনার হাতে অস্ত্র তুলে, যে শাসক তাদের মেনিফেস্টোর সবার শেষে স্থান দেয় শিক্ষা-অন্ন-বস্ত্র তারা যে উন্নয়নের কোনো জোয়ার-ই আনতে পারে না, তার বিলিষ্ঠ উচ্চারণ তার ছড়ার পংক্তিতে পংক্তিতে। দুঃখ এবং হতাশার থেকেও হাসিতামাশার খোরাক খুঁজে নিয়েছেন—

'বিবি তোকে তালাক দেবো, এ ছাড়া আর উপায় নাই,
যে-যা ভাবুক, আমার ঘরে শ্বেত ললসা চাই-ই-চাই।'

নেহাতই শিশুপাঠ্য ছড়াও অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে (৯৩) সংকলনে—(৪৫)। কখনো আবোল-তাবোল লিখে মনে হয় সপ্তাহত পপক্ষয় হল। (৪০)/৩৬

মৃত্যু উপত্যকাই কবির আজকের ভারতবর্ষ, তবু কেউ জানতে চাইলে ছড়াকার বলেন "ভালো আছি"! (৪১)

সাধারণ মানুষকে একেবারে বোকা ভাবাও ভুল! যা চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে থাকারই সামিল! তবু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি গণতন্ত্রের আশু জয় চানন। (৩৮)

ছড়াকার পিছুটানহীন নন, এ সংসার বর মায়াময়, সহজে কাটতে চায় না তাই প্রজ্ঞাবানকে বলেন— অভিশাপ টাপ না দিতে (৩২)।

সাম্প্রতিক আরো একটি ঘটনা লাভজেহাদি ভয়াবহ রূপনিয়েছে। রাষ্ট্রের তথা শাসকের সাম্প্রদায়িকতার ভাষায় ধীক্কার জানিয়েছেন—(৩০)

'লাভ-জেহাদি দেখাচ্ছে পথ, ভালোবাসায় পুড়ছে ঘর,
রাজার বচন না মানলে পস্তে মরণ জীবনভর।

কী খাবো আর কী পরবো সব তুমি দাও ঠিক করে,
ইঁদুর হয়ে গর্তে ঢুকি, লাল গগনে চিল ওড়ে।'

ব্রিটিশ শাসনে পরাধীনতার গ্লানি নির্মম অত্যাচার, বোঝা— বারুদের কাহিনি আর বর্তমান বিশ্বে জৈব ভাইরাসের আক্রমণ তথা আমাদের স্বদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক কাহিনিগুলি অস্তিত্বের সংকট কোনো অংশে কম বলে মনে হয় না। বইটি খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে দেখা গেছে সংকলনে একই গতের বা ধারার ছড়াগুলি পর পর সাজানো নয়, অবিন্যস্ত এলোমেলোভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভিন্ন স্বাদের ছড়াগুলি। একই গতের ছড়াগুলিকে যতটা পেরেছি একসাথে এনে আলোচনা করারই এখানে প্রয়াস পেয়েছি।

প্রেম (৯৯) ছড়াটি Imp

দুর্দান্ত প্রেমের ছড়া (২৭) সংখ্যক ছড়াটি। ছড়াকার বলেছেন এখন কাল মধুমাস, ফাগের দাস শরীর ও মনে। প্রেম দিয়ে গড়া এই ছড়ায়—

'ভালো চাও তো ওসব ছাড়ো,
এসো, আমার হাত ধরো,
লক্ষ্মী মেয়ের মতো আবার
এই মানুষের ঘর করো।'

শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় না পেয়ে দামাল কবি শাসককে হুঁশিয়ারি দিয়ে সতর্ক করেছেন—

ভুলোনা শাসক, জওয়ান কিন্তু—
চাষির ঘরের-ই ছেলে।
কী হবে হঠাৎ তোমার দিকেই—
নিশানাটা ঘুরে গেলে!

সাধারণ জনগণ সব দেখছে শুনছে এবং মনে ও রাখছে সবদেশের নামে যারা গরিবের রক্ত শুষছে। (৮৯)

দলিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার জয়গান শোনা গেছে তাঁর শনিবারের ছড়া-সাড়ে ঊননব্বুইতে যার সাথে জর্জ ফ্লয়েডের কালো মানুষদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ব্যক্ত। (P-৯৮)

(৯১) সেই সব দাঙ্গাবাজদের তীব্র ধীক্কার দিয়েছেন যে ঘাতক বিধর্মী ভ্রূণ গেঁথে নিয়েছে ত্রিশুলে এই স্ব-পৈশাচিক বর্বর উল্লাসের অসভ্যতা ভাষায় ব্যক্ত করতে কবি অপরাগ।

বর্তমান সমাজ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কবি ঘোষ রায় (৭৭) বিগত কবি সুকান্তের মতোই এদেশের বুকে আঠারো নেমে আসার প্রার্থনা করেছেন— "পলাশ ফুটেছে তবু বসন্ত হারিয়েছে পথ/আবার আঠারো এসে মুঠি তুলে নেবে কি শপথ?"

তবে পরিশেষে বলা যায় সংকলন গ্রন্থে ছড়াগুলির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে : হারমোনি (harmony)।

সংকলনের কথা মুখে ইমানুল হকের কথায় বলা যায়—"সময়কে শাসন করতে উদ্যত তাঁর লেখনী। ভারতের মর্মবাণী সংহতি, সম্প্রতি ও সহিষ্ণুতা। মিশ্র সংস্কৃতি তাঁর চলার পাথেয়। আমাদের সময়কে ব্যাখ্যা করতে প্রবীর ঘোষ রায়ের কলম উদ্যত তীক্ষ্ণতরবারি। ছন্দে ধ্বনিমাধূর্যে স্বর ও সুর যোজনায় ছড়াগুলি কালাতীতের মানোত্তীর্ণ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হক সাহেব ছড়াকার প্রবীর ঘোষরায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে খাঁটি কথাগুলি বলেছেন তা আমার মনে হয়েছে এ যেন আমার নিজেরই কথা, এই বৃত্তের পরিমণ্ডলে বাইরে বেড়িয়ে আমি অন্যভাবে বা ঘুরপথে কী-ই-বা বলতে পারি। তবু কবি ছড়াকার অধ্যাপক ঘোষ রায় বলেছেন, ছড়ার মাধ্যমেই যদি উত্তর দিই তিনি তাহলে খুবই খুশি হবেন : তাই আমার লেখনীর নবতম সংযোজন—

সম্প্রীতি

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা

কেন আজ মিছে হানাহানি কর
কেন গো রক্তক্ষয়
প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসা দিয়ে
করে গো বিশ্বজয়
হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, নয় ধর্মীয় যুদ্ধ
নীল আকাশের তলে এসো
প্রীতি অগ্নিতে হই শুদ্ধ
চেয়ে দেখো ওই অসীমশূন্যে
পারাবত পিকাসোর
শ্বেত ডানা মেলে উড়ে যায়
নিয়ে শান্তির বাণীডোর
নবীনতর সভ্যতা আনো গড় প্রজন্মদীপ্ত—
এসো, সবাইকে ভালোবাসো
হই সাম্যে মৈত্রে তৃপ্ত।

কবি মন স্বতঃই প্রেমিক। বাধা বিপত্তি ঝর পেরিয়ে শ্বাশত প্রেমেই আমি বিশ্বাসী। তাই কবি প্রবীর ঘোষ রায়ের প্রেমের ছড়ার উত্তরে রইল—

।। **নির্জনতার সঙ্গসুখ** ।।

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা

ধূপ ছায়া পাহাড়ের নিসর্গ নির্জনতা
কত কথা বলে,
এক চিলতে রোদ, আঁকা বাঁকা পথ...
তুলো তুলো মেঘ
কত কি ছবি আঁকে।
দর্পিত নীল ক্রোকাসফুল,
হাওয়ায় মাথা নাড়ে...
এ নদীর কলতান
এ মনে কত গান আনে।
হিজিলের ছপাত ছপাত স্রোতে ভেসে যায়,
তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সাথে
কত কি যে কথা হয়...
যা তোমার উপস্থিতিতে সম্ভব নয়।
এ সময় আমায় কেউ বাঁধা দেয় না,
এ আমার একান্ত নির্জনতা,
এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ভালোবাসা
এ সময়ে মনে কত ফাগুন আসে...
এ নদীর কলতান এ মনে কত গান আনে।

আশা করি কবি প্রবীর ঘোষ রায় তাঁর উত্তর কবিতায় পেয়ে খুশিই হবেন। বিশেষত এই কথাগুলি আমরাই নিজের এবং কবি ঘোষ রায়কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ইমানুল হকের কাছ থেকে এই কবিতার বর্ণ শব্দ, ভাব ধার নিইনি এখানেই আমার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বলেই ধরে নেব। এখানেই আমার নৈতিক জয়। কী বলুন কবি ও ছড়াকার প্রবীর ঘোষ রায় মহাশয়? ছড়ায় ছড়ায়তো পাঠকে প্রশ্ন করে গেছেন। কী হবে ঘুরে গেল সে প্রশ্ন আপনার দিকে গেলে?

ছড়াকার আশা রেখেছেন সকাল উন্মোচনের। কবি প্রত্যয়ী যে— 'ভুল স্বীকারে যান না মান'। পরিস্থিতি বিশেষে আপনি বাঁচলে বাপের নাম-ই হয় এই শেষ কথা বলে টা টা গুড বাই জানিয়ে শনিবারের ছড়ার আগাম প্রকাশিত হবার সম্ভাবনার বার্তা দিয়েছেন।

হ্যাঁ প্রবীরবাবু,

আপনি বলছিলেন ছড়াতে আপনাকে উত্তর দিলে আপনি বেশি খুশি হবেন। ছড়া পড়ার অভ্যাসবশত খুঁজে পেয়েছি আপনাকে জবাব দেওয়ার একটা উপযুক্ত ছড়া! থুরি শুধু আপনি বলছি কেন সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসকের জাতীয় ফুলের অবমাননার উপর আলোকপাত। আতস কাঁচটি বেশ খাসা!! ছদ্মনামে ছড়াকার পি হাঁড়ি পটার, ছড়ার

বই—"ছাল ছাড়ানো ছড়া"—এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত"সাম্প্রদায়ী" (পৃ. ১৭) ছড়াটি সত্যই যথোপযুক্ত তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরির ফলা—

সাম্প্রদায়ী

হায় ছিঃ ছিঃ
করলি একি
পদ্মফুলের জাত নিয়ে,
হরলি প্রাণ
ফুলের ঘ্রাণ
সম্প্রদায়ী গন্ধ দিয়ে।
ভারত কুল
জাতীয় ফুল
পদ্মে দিল অশেষ মনে,
আজকে তাই
অসম্প্রদায়
তোকে ছুঁড়ে দিয়েটান।।
দুর্গা দেবী
ভেবে সবি
ঠিক করেছে তার চরণে
চিরকালের
শতদলের
করবে ত্যাগ মনে প্রাণে।।
আজ পদ্ম
আচ্ছা জব্দ
সদ্য ভজে সম্প্রদায়
পুরোহিত
ভেবেহিত
চায়না দিতে দেবীর পায়।।
হায় ছিঃ ছিঃ
করলো একি
পদ্মফুলের জাত খেয়ে,
ছিলো নির্মল
হলো সিম্বল
দলের ধ্বজার নাম লিখিয়ে।।

দুর্গা দেবী
জেনে সবি—
পদ্মে হটায় জাতির ঘ্রাণে—
এমন ভুল
পদ্ম ফুল
করলো কেনো জেনে শুনে?
জাতীয় মানে
স্বসম্মানে
রাখতো যারে মাথায় তুলে,
সাম্প্রদায়ী
গন্ধে মাতি
কুল হারালো পদ্মফুলে।
এবার তাই।
অসম্প্রদায়
জোট বেঁধেছে হাতে-হাত
ধর্ম্ম যাক
কাটুক নাক
পদ্মফুলের— মারবেই জাত।

মিলন মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প বায়োস্কোপ : একটি আলোচনার প্রেক্ষিতে

সুদেষ্ণা সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

সারসংক্ষেপ : ১৯৭৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুখ চাই মুখ' উপন্যাসের মাধ্যমে বিষয় বা প্রকরণে, গুণ আর রূপের বিশেষত্ব নিয়ে পরিচিতি লাভ করেন মিলন মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটির বিষয় চিত্রশিল্পীদের বঞ্চনাজনিত দুঃখবোধ ও সংগ্রামের কাহিনি। নতুন মেজাজ ও ধরনের উপন্যাস বলে 'মুখ চাই মুখ'-এর স্বীকৃতি, কিন্তু মিলন মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি-অখ্যাতি দূরের কথা, তাঁর চারিদিকে এখনও অকুল জলধি। মিলন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস বা গল্পগুলো তেমন অবিকল প্রথাগত অথবা চমকপ্রদভাবে আকর্ষক নয় বলে, কিংবা তাঁর রচনাগুলোর সময়পর্বের মধ্যে দুরূহ ব্যবধানের ফলে তিনি বাংলা সাহিত্যে এখনও উপেক্ষিত। সাহিত্যিক মিলন মুখোপাধ্যায়ের রচনাপর্বের সময়কালে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল দোদুল্যমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের standard of living পরিবর্তন হতে থাকে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই বৈশিষ্টের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার কমবেশি সকলেরই। সাহিত্যিক মিলন মুখোপাধ্যায় তাঁর ব্যাতিক্রম নন। তাঁর 'ওড়াওড়ি' ছোটগল্প সংকলনের একুশটি ছোটগল্প বিচিত্র স্বাদের, নিত্যনতুন অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল। এই সংকলনের একটি গল্প 'বায়োস্কোপ'।
সূচক শব্দ : ছোটগল্প, সুবল, বায়োস্কোপ, নিঃসঙ্গতা, মধ্যবিত্ত মানসিকতা, প্রতীতির ঐক্য, সিনেমা।

গল্পটি আদ্যপ্রান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের ওঠাপড়া ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার। জীবনের মধ্যাহ্নলগ্নে পৌঁছে যাওয়া সুবলের পুরাতন একটি বায়োস্কোপকে ঘিরে করুণ একটা কাহিনি। ভূদেব চৌধুরী তাঁর বইতে Edger Allen poe র সূত্র ধরে বলেছেন- *'যে-কোন কিছুকে নিয়েই ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, জগতের সব কিছুই ছোটগল্পের বিষয়। আর সব-কিছুরই ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারার পক্ষে একমাত্র অপরিহার্য উপাদান হল স্রষ্টার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি-প্রেরণা'।* সুবল বোম্বে শহরের চম্পা নামক সিনেমাহলে কর্মরত। ছেলে, বৌমা ও নাতনিকে নিয়ে ছোট্ট সংসার তাঁর। ছেলে নন্দ উপার্জনশীল, তাই কায়-ক্লিষ্টে সংসার চালানোর মতো অসহনীয় পরিস্থিতি নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নিঃসঙ্গতায় ভরা সুবলের জীবন। এই প্রসঙ্গে লেখক লিখছেন-*'চুপ করে*

থাকল সুবল। সেই থেকে চুপ করেই আছে। রাত্রে শোয়াটুকু ছাড়া বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিচ্ছে সারাক্ষণ'।[২] গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, সুবল ভাবরাজ্যে বিভোর, তার প্রাণাধিক প্রিয় বায়োস্কোপটিকে নিয়ে। প্রতি মুহূর্তে তার কল্পনারাজ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে অনিয়মিত ও এলোমেলো ভাবনা। সেখানে দেখতে পাচ্ছে, বায়োস্কোপের মধ্যে প্রবল প্রাণশক্তি ও বলিষ্ঠ দুর্বার ব্যক্তিত্বের নায়ক তরোয়াল নিয়ে ধেয়ে আসছে শত্রুপক্ষের দিকে। নায়কের দুর্দান্ত প্রাণশক্তি নায়িকার প্রতি ও দৃশ্যনীয়; ঝরনার ধারে হাত ধরে গান গাইছে নায়ক-নায়িকা। পরবর্তী দৃশ্যে চলে আসছে বাইজির নাচ, মৃত্যুর সীন, তাজমহল ইত্যাদি। সুবলের ভয়ংকর নিঃসঙ্গ, নির্জন জীবনে একমাত্র বায়োস্কোপ মেশিনটি অজ্ঞাতসারে তার সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প-র ত্রিবিধ প্রবণতার কথা বলেছেন; ঘটনামুখ্যতা, চরিত্রমুখ্যতা, ভাবমুখ্যতা। প্রথম পর্যায়ে, গল্পগুলি কাহিনি নির্ভর হয় এবং ঘটনা বৈচিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, একটি বিশেষ ব্যক্তি-চরিত্রকে অথবা মানবচরিত্রের কোন একটি অপূর্বতাকেই পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করে। তৃতীয় পর্যায়ের গল্প অনেকবেশি অনুভুতি বা আবেগ নির্ভর[৩]। অর্থাৎ, এইগল্পটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুবল বিপত্নীক, জীবনের মধ্যগগনে পৌঁছে সুবল তার পুত্র ও পুত্রবধূর উপর রুষ্ট হওয়ায় সম্পর্কে শিথিলতা বিদ্যমান। প্রথম পুত্রবধূ মারা যাওয়ার পর, সুবলের ছেলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। মেয়েটি জাতে মারাঠি। প্রথমা পুত্রবধূর প্রতি ভালোবাসা বা স্নেহের দরুণ সুবল দ্বিতীয় পুত্রবধূকে গ্রহণ করতে পারেন নি। একমাত্র নাতনি ছাড়া কেউ নেই। ফলস্বরূপ, সুবল একা। এই অনিদ্রাকাতর মানসিক যন্ত্রণা, পারিবারিক সম্পর্কের বিপর্যস্ততা সুবলকে ধীরে ধীরে পুরনো স্মৃতির মুখাপেক্ষী করতে বাধ্য করেছ। তার নিঃসঙ্গ জীবনে খড়কুটোর মতো পড়ে থাকা একমাত্র বায়োস্কোপটা হচ্ছে অমৃতময় সান্নিধ্যলাভ।

সিনেমাহলে কর্মরত সুবলের তরুণ বয়স ঠেকেই সিনেমার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। পুরনো ফিলমের রিল নিয়ে নাড়াচাড়া, মেশিনের আলো ফেলা ইত্যাদি প্রথম থেকেই সুবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন-*'খোদ বোম্বাই শহরের অফিস পাড়ায়, রেলগাড়িতে ফেরি করেছে-কখনো কাটা কাপড়, কখনো ফল। বিলিতি ছাপ মারা দেশী কলম অথবা কালো চশমা। সময় পেলেই সিনেমায়, স্টুডিও-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছে। এখন, এই বয়সের শুরুতে সেইসব কথা ভাবলে কেমন অবাক লাগে সুবলের'।*[৪] আপাতদৃষ্টিতে, সুবলের নিস্প্রভতর জীবনে বায়োস্কোপটা শুধু নিঃসঙ্গতার অভাব মেটাতে প্রবৃত্ত নয়। বায়োস্কোপটাকে কেন্দ্র করে সুবলের যে নিগূঢ় মনোভাবনা সুপ্ত ছিল, পরিবেশ প্রতিকূল থাকায় তা পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে পরিবেশ প্রতিকূল মানে কী? সিনেমা কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া না মানায় তারা হরতাল শুরু করে। ফলস্বরূপ, সমস্ত সিনেমাহল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার সম্পূর্ণ সৎ-ব্যবহার করার

প্রয়াসী হতে চায় সুবল। বোম্বে Film Indrustry র জগতে এই হরতাল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাস উলটে দেখলে এর হদিস পাব আমরা।–

'In October 1986, the film industry came together to protest against the heavy taxation on film tickets imposed by the government. The film industry went on strike on October 10, demanding relaxation in the 177% state surcharge on tickets sold by Maharashtra's cinemas'.[৫]

[https://www.hindustantimes.com/entertainment/bollywood/when-raj-kapoor-anil-kapoor-and-entire-bollywood-took-to-streets-to-protest-against-heavy-taxes-watch-vintage-video-101618386728740.html]

সিনেমা বন্ধ হওয়ার সুযোগ নিয়ে সুবল বায়োস্কোপে ছবি বা দৃশ্য দেখিয়ে দু-চার পয়সা রোজগার করতে চায়। এই প্রসঙ্গে সুবলের টিপিকাল মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। সে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে পরেরদিন ভোরবেলার অপেক্ষাটুকু না করে আগেরদিন রাতেই দোমড়ানো মোচড়ানো তোরঙ্গ থেকে ধূলোভরা বায়োস্কোপটাকে বের করে আনে। এই বুদ্ধিপ্রধান উৎকেন্দ্রিকতা সুবলকে যতটা আন্দোলিত করতে পেরেছিল ততটা সফল করতে পারেনি। সুবল পরেরদিন সকালবেলা বায়োস্কোপটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পরে। কারন, সিনেমাহল বন্ধ থাকায় দর্শকদের বিনোদনে ঘাটতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বায়োস্কোপ হয়ে উঠতে পারে সিনেমার প্রতিস্থাপনযোগ্য (Replaceable) মাধ্যম। কিন্তু বিধি বাম। প্যাটেলের দোকানে গিয়ে জানতে পারে সিনেমার হরতাল বন্ধ হয়ে গেছে। এই খবরে সুবলের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পয়সা রোজগারের ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও ম্লান হয়ে যায়। তবুও সুবল শেষ চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। নির্ধারিত স্থানে পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও সুবল কলানগরের দিকে একটি অপরিচিত পার্কে বায়োস্কোপ প্রদর্শনী করবে বলে ঠিক করে। - *'ঘাসের উপর তেপায়া স্ট্যান্ডটা বসাল সুবল। তার উপরে বায়োস্কোপ। রেকর্ড বসিয়ে দিল কলের গানে। মেয়েলি গলার সুরে কয়েকটা নোংরা ছেলে এসে ভিড় করল চারপাশে। তারপর একে একে পার্কের প্রায় সবাই এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে। বৃষ্টির জন্যে খুব একটা ভিড় হয়নি আজ। তাহলেও, যারা এসেছে প্রায় সকলেই সুবলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল-ছেলের-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী আর আয়ারা'।*[৬] কিন্তু, এই পরিকল্পনা চরিতার্থে সে অকৃতকার্য হয়। এই অসফলতা আর কিছুই না সময়ের। সময় দ্রুত পরিবর্তনশীল। ভি.সি.আর এর যুগে বায়োস্কোপ কালের গর্ভে বিলীয়মান হয়ে গেছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে আসে, একে একে তাজমহল, শাদীর লড়াই, বিয়ের দৃশ্য বায়োস্কোপে চলতে থাকে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কোন দর্শক নেই। পথচলতি দর্শক একবার করে যন্ত্রটিকে দূর থেকে দেখে চলে যাচ্ছে। চার-আনা পয়সা খরচ করে

বায়োস্কোপ দেখবার মনোস্কামনা কেউ প্রকাশ করছে না। প্রবল ব্যর্থ হয়ে সুবল বাড়ি ফিরে আসে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত সুবল বাড়ি ফিরে আসলে যন্ত্রটির প্রতি সুবলের নাতনি পরী সিনেমা দেখবার আবদার করে। সুবলের মধ্যবিত্ত মানসিকতা আর একবার সাড়া দিয়ে ওঠে। নাতনির আবদারের সুযোগ নিয়ে সুবল শর্ত দেয় নাতনিকে- *'যা-তোর বাবার কাছ থেকে চার আনা পয়সা নিয়ে আয়। বায়োস্কোপ দেখাব'।*[৭]

অবশেষে, বহির্জগতের কাছে পরান্মুখ হলেও বাড়িতে এসে সুবল তার পরিকল্পনায় সফল হয়। পরী ও পুত্রবধূকে বায়োস্কোপ দেখিয়ে সে কিছু পয়সা অর্জন করতে পারে যার দ্বারা তার ইগো চরিতার্থ হয়।

সুবলের চরিত্র ও মনোভাবনা প্রকাশে একটি বায়োস্কোপের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাঞ্জনাধর্মী। বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ছোটগল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটা নিটোল গল্প বলা গল্পকারের সবথেকে বড় challenge এর কাজ। ছোটগল্পে নির্দিষ্ট একটা বক্তব্য থাকবে, অহেতুক বিষয়ের আলোচনা এখানে জায়গা দখল করবেনা। প্রয়োজনাতিরিক্ত চরিত্রর ঘনঘটা এখানে কাম্য নয়। তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার সংলাপ হবে ছোটগল্পের অন্যতম প্রানকেন্দ্র। যার মধ্য দিয়ে গল্পের ও গল্পকারের আসল ইঙ্গিত প্রকাশ পাবে। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক Brander Matthwes বলেছেন, *'A Short-story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotions called forth by a single situation'.*[৮] এই ছোটগল্পটি সুবলের গতিবিধি, কার্যকলাপ ও তার অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল। এই আখ্যানের অভিমুখ একটি নির্দিষ্ট লক্ষকে সামনে রেখে এগিয়ে গেছে। বিমল করের মতে, *'একটি বিশেষ প্রতীতিই ছোটগল্পের মূল অবলম্বন, সেই প্রতীতি সঠিকভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করা গেল কিনা সে ব্যপারে ছোটগল্পকারকে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয়'।*[৯] সুবলের কল্পনায় বায়োস্কোপের রঙিন দৃশ্যাবলী থেকে সংসারে ছেলে বৌমার সঙ্গে ব্যবধান, পরিকল্পনা রূপায়নে ব্যর্থ হওয়া এবং শেষপর্যন্ত সুবলের ঘরমুখী হওয়া সমস্তটাই গল্পের আবহকে একটা সুনির্দিষ্ট ঐক্য বা সমগ্রতার অভিমুখ করেছে। এই প্রতীতির ঐক্যতা বা Unity of impression সৃষ্টিই লেখকের প্রধান কাজ এবং একটি সার্থক ছোটগল্পের মূল সারমর্ম।

ছোটোগল্পের সূচনাকাল থেকে প্রায় অনেকটা সময় পর্যন্ত ছোটগল্প প্লট বা কাহিনি নির্ভর ছিল। এই প্রচলিত প্রথা বর্জন করে ছোটগল্প অন্য অভিমুখে যত্নশীল হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রবাদপ্রতিম সমালোচকেরা Plotless fiction বলে একটি অভিধা-র ব্যবহার করেছেন যা স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বপূর্ণ। plotless fiction হল- *'By contrast the plotless fiction is concerned with the realm of human probabilities. It does not deal with the avowedly strange or marvellous but tends to reveal that quality of marvellous which is hidden within the*

mundane, obsured by habit or by dullness of perception'.[১০] কাহিনির পরিবর্তে ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ় মনোভাবনা আখ্যানের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠবে। প্রথমেই বলা হয়েছে, এই গল্পটি চরিত্রমুখ্য প্রধান। কাহিনি এগিয়েছে সুবলের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে। গল্পে প্রতি ক্ষেত্রে সুবলের মনোভাবনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আখ্যানের সূত্রপাত শুরু হয়েছে সুবলের কল্পনাশ্রিত চিন্তাভাবনা থেকে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাপকাঠিও সুবলের দ্বারা নির্ণীত। সুবলের মানসপটে ঘটনাগুলো একে একে বিবৃত হচ্ছে। শেষ অবধি অন্যত্র বায়োস্কোপ দেখানোর পরিকল্পনাও সুবলের। আখ্যানের কোথাও মনে হবে না লেখক কাহিনির জালে সুবলকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। বরং সুবলের সিদ্ধান্তহীন মনোভাবের জন্যই কাহিনি গতিমুখ পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে কাহিনি গৌণ। একে ' অবজেক্টিভ করিলেটিভ'[১১] বলা হয়। ছোটগল্পের বৃত্তগঠনের দুটো ভাগ করেছেন সমালোচকগণ- Stair-step plot বা সোপানরোহ গঠন ও Rocket-plot বা চকিতন্নোত গঠন। গল্পে যাঁরা চমক সৃষ্টি করতে ভালবাসেন বা নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় যাঁরা আগ্রহী তাঁরা চকিতন্নোত গঠন পছন্দ করেন, যাঁরা এতে আগ্রহী নন তাঁদের পছন্দ সোপানরহ গঠন।[১২] বায়োস্কোপ গল্পটি দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থাৎ সোপানরহ গঠনের। এখানে প্রতীতির উন্মেষ জাগে ঈষৎ বিলম্বভাবে। এই গল্পটি মূলত মনস্তত্ত্ব প্রধান, কাহিনির চমক সৃষ্টি লেখকের কাম্য নয় বরং পরিণামপর্বে 'Singleness of effect' বা ব্যাঞ্জনাধর্মের প্রতীতি পাঠকের মনে সঞ্চার হল কি না সে বিষয়ে অবগত থাকা। কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার মাধ্যমে গল্পটি ক্রমশ অগ্রসর হয়। ক্রমাগত গ্রহন-বর্জন, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গল্পটি পরিণামমুখী হয়। ক্রমাগত এই ওঠা-পড়া, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গল্পে জটিলতার সৃষ্টি হয়, যাকে crisis বা সংকট বলে। জোসেফ কথিত complication বা জটিলতা বা দ্বন্দ্ব এবং ফরস্টার কথিত casuality বা ঘাত হল সংকট।[১৩] এ বিষয়ে অধ্যাপক ও সুনিপুণ গদ্যকার অতনু শাশমল মহাশয়ের 'ছোটগল্পের সংকট ও শীর্ষঃ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব' প্রবন্ধটি স্মরণ করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ছোটগল্পের সংকট বা crisis নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।–

- ক. ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সংঘাত নির্ভর জটিলতাঃ complication out of causality. ঘটনাগত বা ভাবনাগত।
- তার অস্তিত্ব সন্ধির স্থান-কাল-চেতনায়।
- গল্পে একাধিক সংকট থাকলেও তা মূলত ক্রমোচ এবং চরমমুখী বা পরিনামমুখী, তাই চরমস্বভাবী বা পরিনামস্বাভাবী।
- Crisis থাকে আদিতে বা মধ্যে চরমের পূব্বে; climax থাকে অন্তে অথবা আদি মধ্য শেষে কিন্তু অন্তের পূর্বে।
- কখনো কখনো crisis থাকে অন্তে, সেক্ষেত্রে climax আদিতে বা মধ্যে – যেমন বুধনী, ভস্মশেষ, হয়তো।

- Crisis হল complicatin যা কেন্দ্রীয় চরিত্রের সমস্যা সমাধানের অন্তরায়কেও বোঝায়।...[১৪]

বায়োস্কোপ গল্পটি এগিয়েছে ঘটনাপুঞ্জের ক্রমাগত বিবরণে। তবে ঘটনায় কোন একমুখী ধারাবাহিকতা নেই। সুবলের চিন্তায় কখনো বায়োস্কোপকে পুনরায় ব্যবহার্য করার মশগুল, কখনো ছেলে, পুত্রবধূর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে সচেতন। দুটো ঘটনাই পরস্পরবিরোধী। এখানে crisis বা সংকটের সৃষ্টি হয়। এই দুটো ঘটনাই গল্পে পরিণামমুখী। এরপর ঘটনা স্বাভাবিক পরম্পরায় এগোতে থাকে। সুবলের বায়োস্কোপ পরিস্কার, বায়োস্কোপকে নিয়ে নানাবিধ চিন্তা ভাবনা এবং শেষপর্যন্ত পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অফিস পাড়ায় বায়োস্কোপ সঙ্গে করে যাওয়া। কিন্তু তার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ লাভ করেনা। শুরু হয় আরেকটা ক্রাইসিসের। এই সংকট সুবলের মনোভাবকে অন্যপথে চালিত করে। এই ক্রাইসিস গল্পের চরমতর, এখান থেকে ঘটনার উপর কাহিনির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। এই ক্রাইসিসকে কেন্দ্র করেই গল্পের ঘটনাক্রম অনিশ্চিত পথে চলতে থাকে। আবার এই ক্রাইসিসকে কেন্দ্র করেই চরম মুহূর্ত বা climax এর পরিসর বেষ্টিত। সুবল পার্কে গিয়ে বায়োস্কোপ দেখাতে চাইলে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনা। সুবলের বাস্তব সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সে বাড়ি আসে এবং শেষপর্যন্ত নিজের আপনজন অর্থাৎ পুত্রবধূ ও নাতনিকে বায়োস্কোপ দেখান। অর্থাৎ, crisis - সুবলের বায়োস্কোপ প্রদর্শনী > ছেলে পুত্রবধূর প্রতি বিরাগ > বায়োস্কোপ উদ্ধার ও পরিস্কার > অফিস পাড়ায় প্রদর্শনীর মনস্কামনা ও ব্যর্থ হওয়া (crisis maximum)[১৫] = Climax – হঠাৎ কলানগড়ের মাঠে চলে যাওয়া, যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল না > মাঠেও প্রদর্শনী দেখাতে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আপনজনদের বায়োস্কোপ দেখানো। এভাবেই গল্পে প্রতীতির ঐক্যতা আভাসিত হচ্ছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জি:

১. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা ছোটগল্প ছোটগল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, নববর্ষ ১৩৭২, পৃ.২৯

২. মিলন মুখোপাধ্যায়, ওড়াওড়ি, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, পৌষ ১৪১৬, পৃ.১৮৯

৩. নারায়াণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সং শ্রাবণ ১৪০৫, অষ্টম মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২৫, পৃ.২০৬

৪. পূর্বোক্ত, ওড়াওড়ি, পৃ.১৮৮

৫. https://www.hindustantimes.com/entertainment/bollywood/when-raj-kapoor-anil-kapoor-and-entire-bollywood-took-to-streets-to-

protest-against-heavy-taxes-watch-vintage-video-101618386728740.html

৬. পূর্বোক্ত, ওড়াওড়ি, পৃ. ১৯৪=১৯৫

৭. তদেব, পৃ. ১৯৬

৮. Brander Matthews, The Philogaphy of the Short-story, Reprinted: May,1917, Longmans, Green and Co., Fourth Avenue and 30th street, New York, London, Bombay, Calcutta and Madras, p.16

৯. বিমল কর, সময় অসময়ের উপখ্যানমালা, সম্পাদনা. উজ্জ্বল মজুমদার, ঊর্মি রায় চৌধুরী, শচিন দাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বইমেলা ২০১৪, পৃ. ১৬০

১০. Clare Hanson, Short stories and short fiction, 1880-1980, The MACMILLAN press LTD, 1985, Houndmills, Basingstoke, Hamsphire, RG212XS, London p. 6-7

১১. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, সাহিত্যলোক, প্র. প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪০৪, পুর্নঃ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ১০

১২. পূর্বোক্ত, সময় অসময়ের উপখ্যানমালা, পৃ. ১৬০

১৩. অতনু শাশমল, ছোটগল্প সংকট ও সংকট-শীর্ষঃ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, বীরভূমি, শারদ সংকলন, ১৩৯২, অক্টোবর ১৯৮৫, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, বীরভূম, সং রমানাথ সিংহ, কিশোরীরঞ্জন দাশ, পৃ. ৩০

১৪. তদেব, পৃ. ৩২

১৫. তদেব, পৃ. ৩১

মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিস্মৃত দুই লোক-সংস্কৃতি- পটশিল্প ও ঢপ কীর্তন

নম্রতা দত্ত
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : 'মুর্শিদাবাদ' নামের সাথে পরাধীন ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের আঁশটে গন্ধ জড়ানো।যে ইতিহাসে রয়েছে সিরাজের আপন মাসিঘসেটি বেগমের সিরাজ বিরোধী মর্মঘাতি যোগসাযোগ যা কেবলরাজনীতি নয়, সম্পর্কের ভিত নাড়িয়ে দেয়।মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে ধর্ম, শিল্পকর্ম নিয়ে জনমানসে যেমন আগ্রহ রয়েছে তেমনি এই সংক্রান্ত বহু গবেষণামূলক কাজকর্ম অব্যহত। তবে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকসংস্কৃতি। কেননা যেকোনো জেলাঞ্চলের স্বরূপকে উদঘাটন করতে শিকড়কে ওরফে লোকসংস্কৃতিকে জানতে হবে।জেলার ভাদুগান, বোলান গান, খোজা উৎসব, আলকাপ-এর মত নানাপ্রকার লোকসংস্কৃতির মধ্যেবিশেষ উল্লেখ্য পটশিল্প ও ঢপ কীর্তন। যা কৃষিভিত্তিক মুর্শিদাবাদের আর্থিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে সহায়ক।

সূচক শব্দ : সাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতি, আকড়, আলকাপ, পর্যটক, অর্থনীতি।

মূল আলোচনা:

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণজেলা কৃষিনির্ভর মুর্শিদাবাদ ছিল একসময়ের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী, সম্পদের ভাণ্ডার। সাম্প্রতিক ফারাক্কায় 'ফিডার' খালখননের সময় ভাগীরথী-গুমানীর সংযোগস্থলে প্রায় চারহাজার বছরের অনার্য সভ্যতার আবিস্কৃত নিদর্শন জেলায় অনার্য সভ্যতার বিদ্যমানতাকে জাহির করে।[১]কিন্তু প্রকৃত মুর্শিদাবাদকে অবলোকন করতে তার শিকড়কে জানতে হবে। সেটি সম্ভব তার আকর অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির দ্বারা। বেশকিছু লোকসংস্কৃতি যেমন পটশিল্প, ঢপ কীর্তন প্রায় বিস্মৃতির পথে। যা ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত চিন্তনীয়। এই দুই বিস্মৃতপ্রায় লোকসংস্কৃতি কিভাবে মুর্শিদাবাদের সম্প্রীতি, অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তা আলোচনার প্রয়াস করা হবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যিক মুর্শিদাবাদ সাম্রদায়িক সম্প্রীতির চলমান দলিল। আলুগ্রাম, ভরতপুর-এর মত বিভিন্ন অঞ্চল শ্রীচৈতন্যর পদধূলিতে রিক্ত[২]এই জেলায় শুধুমাত্র পাশাপাশি থাকা মন্দির-মসজিদেএকই সময়েসন্ধ্যারতির ধ্বনি ও আজানের রব প্রতিধ্বনিত হয় না, দুর্গাপুজাতে মুসলিমদেরও নতুন জামাকাপড় কেনা, দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে উভয় সম্প্রদায়েরমহরমের মিছিল দেখা থেকে আপদে-বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়াতেও পিছপা হয় না। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের মূল পরিচয় তার সাম্প্রদায়িক

মেলবন্ধন। তেমনি লোকসংস্কৃতি জেলার অনন্য পরিচয়।লোকসংস্কৃতির বাস মননে-চিন্তনে। ধর্মীয়-সামাজিক বিশ্বাস, রীতিনীতি,আচার, শিল্প ইত্যাদির মধ্যেই পরিচয় লোকসংস্কৃতির। মুর্শিদাবাদের আকড়কে জানার আগে জেলার অর্থনৈতিক পরিবেশকে সামান্য অবলোকন করা আবশ্যিক।

অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ছিল সোনা-রুপা-তামার উৎপাদন কেন্দ্র। ১৯০.৭৭৩গ্রেণ ওজনের যে মোহর মোঘল দরবারে জমা পড়ত তার মূল্য বাংলার অন্যান্য অঞ্চলসহ পাটনা, কটক, দক্ষিণ ভারত, ঢাকার তুলনায় অনেকবেশি ছিল।[৩]মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের এই অহংকার সমহিমায় বজায় ছিল প্রায় ১৭৬০ পর্যন্ত।জেলার অন্যতম অংশ কাশিমবাজার ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাঁচা রেশম, রেশমিবস্ত্র থেকে সওদাগর-মহাজনদের প্রধান ঘাঁটি ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কুঠিকেন্দ্র।এই অঞ্চলের রেশম সম্পর্কে জন কেন বলেছেন,‘According as this silk in Agra, so the price of silk in Kasimbazar riseth and falleth. The exchange of money from Kasimbazar to Patna and Agra riseth and falleth as the said silk findeth a vent in Patna and Agra.’[৪] এইকাঁচা রেশম-রেশমি কাপড়ের ব্যবসা ও নানা নবাবী স্থাপত্যকর্মের জন্য প্রচুর মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। কাশিমবাজার ছিল পূর্বভারতীয় বাণিজ্যের রানী। আবার ১৭৫৭ সালের দিকে ওয়াটসন লর্ড ক্লাইভের নিকট কাশিমবাজার ফ্যাক্টরিকে ইংরেজদের প্রতিরক্ষা স্বরূপ দুর্গ করার পরিকল্পনার ব্যক্ত করেন। যদিও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও ক্রমবর্ধমান বাঘের উপদ্রপ এলাকার জনসংখ্যা ও বাণিজ্য তথা অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফ্যালে।যা পরবর্তীতে রাজা কৃষ্ণনাথ রায়-এর প্রচেষ্টাও এই অর্থনৈতিক নেতিবাচকতাকে কাটাতে পারেনি।[৫]১৮৩৯ সালেকাশিমবাজার রেলস্টেশনের নিকটবর্তি একসময়ের ‘সতীদাহ ঘাট’ কাটিগঙ্গা এলাকায় রাজা কৃষ্ণনাথ জাহাজ কারখানা গড়ে তোলেন।[৬]বর্তমানে এই জনবহুল এলাকায় কোনো অজানা বিষাদের ছায়া বিদ্যমান। অন্যদিকে খাগড়াই কাঁসা-পিতল-শোলা শিল্পের জগৎ-জোড়া খ্যাতির ডালপালা অতীত থেকে বর্তমান যুগেও বিদ্যমান।রেশমশিল্প ও মৃৎশিল্পের অন্যতম ঘাঁটিসৈয়দাবাদেরমৃৎশিল্পী আশু মিস্ত্রি, বিমল মিস্ত্রি, ঋষি মিস্ত্রির নাম ছিল বাংলা জোড়া। জেলার মৃৎশিল্পীদের খ্যাতি আজ বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। এই সমস্ত শিল্পের সাথে আমরা আজও অত্যন্ত সুপরিচিত এবং এসমস্ত শিল্পকেন্দ্রীক ব্যবসা জেলার আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক। কিন্তু জেলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান পটশিল্প ও ঢপ কীর্তন জেলার অর্থনীতির সহায়ক হতে পারে কিনা দেখা যাক।

মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ লোকসংস্কৃতিপটশিল্প। ‘পট’ কথার অর্থ চিত্র। মূলত কাপড়ের উপর কাদামাটি বা গোবর, বেলের আঠা দিয়ে জমি প্রস্তুত করে ইটের গুঁড়ো, লাল সিঁদুর, সাদা খড়ি, আলতা, কাঠ-কয়লার মত দেশজ রং ব্যবহার করে ১৫-৩০ ফুট দীর্ঘ ও ২-৩ ফুট প্রশস্ত পট নির্মাণ করা হয়। লম্বা গুটানো ও আয়তাকার বা চৌকা-এই

দু'প্রকার পটচিত্র হয়ে থাকে। প্রতিপ্রকার পটের দেহ কয়েকটি বিভক্ত।পটের জমি পশুর লোম বা পাখির পালক লাগানো তুলির সাহায্যে প্রয়োজন মত লাল, নীল, হলুদ, বাদামী, সাদা ইত্যাদি নানারঙ ও নানাকাহিনী রাঙিয়ে তোলা হয়। সেই কাহিনী পটুয়া নামক দক্ষ মানুষ দ্বারা গাওয়া হয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে বাসবাসকারি পটুয়ারা ছিলেন প্রধানত অহিতুণ্ডিক, ছানা প্রস্তুতকারী, জরিবুটি চিকিৎসক।[৭] পটুয়া সমাজের নারীরা চুড়ি ও নানা মনিহারী দ্রব্যফেরীকরতেন।[৮] জেলাঞ্চলে রামায়ণ,মহাভারত,মঙ্গলকাব্য, চণ্ডীকাব্য, চৈতন্যদেবের বাণী, সত্যপীর, গাজি পট থেকে রাজা-রানীর কাহিনী, চোর-ডাকাতের কাহিনী পটেফুটিয়ে তোলা হতো। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, হিন্দুধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মপ্রচারের নিমিত্তে একসময়ে এর চাহিদা ছিল বাংলাজোড়া। ১৮০০-১৮৫০সালের কলকাতার 'বাবু'সংস্কৃতিরসামাজিক ক্ষয়িষ্ণু রূপ দেখাতে পট অনন্য দলিল। কালীঘাটের পটের প্রভাব পিকাসোর চিত্রে বিদ্যমান বলে অনুমিত।কালীঘাটের পটশিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রমোহন ঘোষ, বলরাম দাস প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। এক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদও ব্যতিক্রমী নয়। জেলায় কান্দি ঘরানা ও গণকর ঘরানার পটচিত্র বিদ্যমান। গণকরের পট সবচেয়ে উন্নতধরণের। সিন্ধু পট, সাবিত্রী-সত্যবান,রাজা হরিশচন্দ্র, অহল্যা, যম পট জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পট বিদ্যমান। পটগানের ছোট একটি উদাহারণ-

'সিন্ধুবধ' পটের গান-

অজ রাজা পুত্র রাজা নামে দশরথ
সভা করে বসলেন লয়ে প্রজাগণ।
প্রজাগণে বলেন মনে শোনেন মহাশয়
শনির রাজাকে নিতে পারলে রথ যাত্রা হয়।[৯]

শুধু কান্দি বা গণকর নয়, মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের পাঁচথুপি, গোলাহাট ও কাতুরহাটে পটুয়াদের ব্যপক পরিমাণে উপস্থিতি একসময়ে দেখা যেত।[১০]

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে পটুয়ারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল? এর সহজ উত্তর-পটের বিষয়বস্তু যেখানে হিন্দু-ইসলাম ধর্মের মিশ্রিত রূপ সেখানে এর উদ্গাতারা নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক হবেন।পটুয়াদের মধ্যে নামাজ পড়া, রোজা রাখার রীতি,অন্ত্যেষ্টি-কবর যেমন প্রচলিত তেমনি বিবাহের সময় হিন্দুরীতিনুসারে গাত্রহরিদ্রা,বিবাহ মুহূর্তে ইসলামীয় রীতিনুসারে পাত্রপাত্রীকে কলমা পড়ানো, পাত্রীর নিকট 'ইজিন' নেওয়া, আবার হিন্দুরীতি মেনে পাত্রীর সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে তোলা প্রচলিত ছিল। সুতরাং জীবনযাত্রার এই চিত্র থেকে পটুয়াদের অসাম্প্রদায়িকতারপ্রমাণ মেলে, যা জেলার সৌভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ নজির। আবার পটচিত্র সমাজের নেতিবাচকতাকে তুলে ধারার মাধ্যমে যে জনসচেতনতামূলক কাজ করে তা নবসমাজ গড়ে তুলতে প্রেষিত করে।সুতরাং পটশিল্প সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও উন্নত সমাজ গড়তে এক শক্তিশালী হাতিয়ার বলা চলে।

এবার আসা যাক, পটশিল্পের সাথে জেলার অর্থনীতির সম্পর্ক আদৌ ছিল কি? মূলত পটুয়ারা তাঁদের পট নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে, শহরে ঘুরে বেড়াতেন। লোকজনের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম ছিল এটি। পট দেখার পর দর্শকরা তাঁদের সাধ্যমত দক্ষিণা দিতেন। যা দিয়ে পটুয়ারা তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করতেন। এক্ষেত্রে বাঁকু পটুয়ার নাম উল্লেখ্য। যিনি পথেপথে পটের গান গেয়ে ও পটচিত্র বিক্রি করেসামান্য আয়ে পাঁচ ছেলে, তিন মেয়েকে নিয়ে পরিবার চালাতেন। তাঁর পুত্ররাও একেকজন পটুয়া। কিন্তু কালের প্রবাহে বিভিন্ন বিনোদনমূলকসামগ্রী বাজারে এলেজনগণের নিকট পট বড্ড সেকেলে-একঘেয়ে হয়ে পড়ে।পটের চাহিদা হয় নিম্নমুখী। ফলে রুজিতে টান পড়ে পটুয়াদের। যার জলন্ত উদাহারণ বাঁকু পটুয়া। যিনি রুজিতে টান পড়লে ‘পট’ গাইয়ে থেকে যাত্রাদলের তবলা বাদকে পরিণত হন। এই ঘটনা জেলার পটশিল্পের হতশ্রী চেহারা ফুটিয়ে তোলে। এই হতশ্রী দশা থেকে জেলা পটশিল্পকে পুনঃর্জীবিত করতে ১৯৭৬সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির সাহায্যে কান্দিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পটচিত্রকলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন হলে সেখানে কিছু সাম্মানিকের বিনিময়ে বাঁকু পটুয়াকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হলে তাঁর আর্থিক চেহারা কিছুটা হলেও ফেরে।এমনকি জনসাধারণ মধ্যে পটশিল্পের প্রতি আগ্রহ গড়ে তুলতে প্রশিক্ষিতদের বৃত্তি দেওয়ার পাশাপাশি কান্দিতে ‘পটচিত্র-কলা কেন্দ্র’এক পট প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সেখানে শান্তিদেব ঘোষ, সুধী প্রধান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি জেলার মৃতপ্রায় পটশিল্পের নিকট অক্সিজেন স্বরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু পটশিল্পের ভাগ্যদেবী পুনরায় চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। ১৯৭৮-এর ভয়াবহ বন্যা কান্দির পটকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। এদিকে বন্যাবিধস্ত বাঁকুর জীবনে ভাগ্যদেবী হয়ে ওঠেন সুপ্রসন্না। কলকাতা-দিল্লীসহ লন্ডন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলে সেখানে তিনি নিজ শিল্পকর্ম নিয়ে উপস্থিত হন ও যোগ্যসম্মান লাভ করেন। এরপর কেটে গেছে বহু বসন্ত। জনসাধারণের নিকট পট বলতে কেবল মাটির সরার উপর অঙ্কিত লক্ষ্মীপ্রতিমা কিংবা দুর্গাপ্রতিমার চালার পিছনে অঙ্কিত পটচিত্র। যদিও এ নিয়ে আজকাল মানুষের মধ্যে তেমন কোন আবেগ-ভালবাসা নেই। ফলে রুজির অভাবে পটশিল্পীরা ধুঁকছে। আবার বহু শিল্পীপরিবারের নবপ্রজন্ম লেখাপড়াশিখে তাঁদের পছন্দসই পেশায় যুক্ত হয়ে পরিবারের আর্থিক হাল ফেরাতে সচেষ্ট। এমতাবস্থায়হাতেগোণা কিছুবছর আগে কর্ণসুবর্ণ এলাকায় পটশিল্পী মনসা, মহিষাসুরমর্দিনী প্রমুখ পট এনে হাজির করে তাঁদের সুরেলা কণ্ঠে তা জীবন্ত করে তুলতেন। আয় যৎসামান্য হলেও জীবিকার প্রতি ভালবাসার টানে বারবার আসতেন। কিন্তু অতিমারির পর কোথায় যেন তাঁরা নিরুদিষ্ট।বর্তমানে কাশিমবাজার ছোটরাজবাড়িতে ১৭৪০ সালে নির্মিত প্রায় একতলা সমান এক পটচিত্র দেখা যায়।[১১]মেদিনীপুর জেলা থেকে আনানো দশটি ভাগে বিভক্তএই পটে ঘোর বৃষ্টিস্নাত রাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রার কাহিনী সযত্নে রক্ষিত

আছে।[১২]তবে নেই কোনো সুরেলা কণ্ঠ। ফলে চোখের আরাম হলেও হয়না মনের আরাম ।

মুর্শিদাবাদের অন্যতম আকর্ষণীয় লোকসংস্কৃতি ঢপ কীর্তন। মহাপ্রভুর কীর্তন, রাধা-কৃষ্ণের অভিসার, প্রেমলীলা, জলকেলি, বিরহ,মিলন ইত্যাদি নানা বিষয়ককীর্তনের সাথে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু ঢপ কীর্তন কি? সাধারণত মুর্শিদাবাদের মাটির কাছের মানুষেরা'ঢপ' বলতে কখন 'বাক্স' কখনও বা 'ছোট দোকান' বা 'গুমটি' বোঝাতে ব্যবহার করেন। কিন্তু 'বাক্স' বা 'ছোট দোকান'-এর সাথে ঢপকীর্তনের কি সম্পর্ক? দেখা যাক।

প্রথমে কীর্তনের সাথে সামান্য আলাপ করা যাক। মূলত 'কৃৎ' ধাতু থেকে কীর্তন শব্দের উৎপত্তি। সাধারণত আরাধ্যা বা ঈশ্বরের মহিমা-লীলা নিদিষ্ট সুরে ছড়া কেটে বা আবৃত্তি করে তথা গানের মাধ্যমে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরাই হল কীর্তন।রূপ-গুণ-শৌর্য-বীর্য-জ্ঞান- সৎকর্মসহ যিনি যশস্বী, তেজস্বী এককথায় সমস্ত সুগুণের যিনি অধিকারী তাঁর যশগান গাওয়াই হল কীর্তন। তবে ঈশ্বর সাধনায় লিপ্ত নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন-এর সাথেই আমরা সুপরিচিত।এই লীলাকীর্তন গড়ান হাটা, মনোহর শাহী, রানী হাটি বা রেনেটি, মন্দারিনী, ঝাড়খণ্ডী এই পাঁচভাগে বিভক্ত।[১৩] এই ভাবময়ী ঐতিহ্যশালী কীর্তনের সাথে মুর্শিদাবাদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে জেলার হরিরাম আচার্য, রামকৃষ্ণ আচার্য,বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে হরিবল্লভ, নাসির মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা, নন্দকিশোর দাস, চাঁদ চট্টোপাধ্যায়, রাধারানী দেবী, মীরা দেবীর প্রমুখ কীর্তনীয়ার নাম স্মরণীয়।কীর্তনীয়াদের নামের মাধ্যমেই অনুমিত যে এই জেলার কীর্তন কোনো নিদিষ্ট জাত-ধর্ম-লিঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যাইহোক, মনোহরশাহী ঘরানার অন্যতম অঙ্গ হল 'ঢপ কীর্তন'। বৈষ্ণব কীর্তনের লৌকিক রূপ হল 'ঢপ কীর্তন'।মধ্যযুগে বৈষ্ণব কীর্তন তাঁর দিব্যভাব পরিত্যাগ করে লৌকিক ভাব বা রূপ অর্থাৎ 'ঢপ কীর্তন'-এর রূপলাভ করে।মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-এর সুপুত্র চাঁদ চট্টোপাধ্যায় ওরফে রূপচাঁদ অধিকারী 'ঢপ কীর্তন-এর প্রবর্তন করেন।[১৪]মনোহরশাহী ঘরানার কীর্তনের কাঠিন্য জনসাধারণের নিকট ছিল অবোধ্য। এমতাবস্থায় রূপচাঁদ সেই কাঠিন্যতাকে ভেঙ্গে সরল-সহজ রূপ দিয়ে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য করে তোলেন 'ঢপ কীর্তন-এর মধ্য দিয়ে।[১৫] তিনি ঢপ কীর্তনে দান, মাথুর দান, নৌকাবিলাস পালার প্রচলন করেন। তবে এসময়েই ব্রিটিশদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে মুর্শিদাবাদের সামাজিক, আর্থিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যা জেলাবাসীর পক্ষে সঙ্গীত বা বিনোদনচর্চায় মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে ছিল অনুপযুক্ত।তাছাড়া 'ঢপ কীর্তন'-এ সহজ-সরলতার পাশাপাশি ছিল চটুলতা। অর্থাৎ অনেক জায়গায় গানের কথার মধ্যে শ্লেষ, কখনও অশালীন কথা, কখনও ধনীদের প্রতি বক্রক্তি ধেয়ে এসেছে। পাশাপাশি এই'ঢপ কীর্তন'-এ গ্রাম-গঞ্জের লৌকিক দেবদেবতাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে

তথাকথিত শিক্ষিত-সাংস্কৃতিক মনোভবাপন্ন বাবু-সম্প্রদায়ের নিকট প্রাথমিক অবস্থায় 'ঢপ কীর্তন' পাতে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কেবলমাত্র সমাজের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ কাছে সমাদৃত ছিল। আবার যে ঢপ সঙ্গীতে চটুলতার পরিমাণ কম ছিল এবং সঙ্গীতের সাথে ইহলৌকিক-পরলৌকিক ভাবের যোগ ছিল সেসমস্ত 'ঢপ কীর্তন' আবার হিন্দু শ্রাদ্ধাবাসরে গাওয়া হত। তবে সমাজের উচ্চপর্যায়ের কাছে সমাদর না থাকা হেতু রূপচাঁদের সময় 'ঢপ কীর্তন' সমাজে ব্রাত্যই ছিল বলা চলে। ঠিক যেমন সমাজের সবচেয়ে ধনী চাঁদ সদাগরের হাতে মনসা পুজা না পেলে দেবীত্ব অর্জন করতে পারছিল না। অপরপৃষ্টে ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখা যায়, জগৎ শেঠ ও তাঁর বংশধররা যাঁরা তৎকালীন সময়ে জেলার সবথেকে ধনী-ব্যবসায়ী ছিল তাঁরা রূপচাঁদের গাওয়া 'ঢপ কীর্তন'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১৬] কেননা মুর্শিদাবাদের এই বণিক পরিবার 'ঢপ কীর্তন' গানকে তাঁদের বিনোদনের জন্য যারপরনাই পচ্ছন্দ করতেন। ফলত, তাঁরা রূপচাঁদের কীর্তনে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে বসত গড়তে জমি-জায়গা, টাকা-পয়সা দান করেন।কিন্তু রূপচাঁদের তুলনায় মধুকাণ-এর সময় 'ঢপ কীর্তন'-এর পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হয়। কেননা মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের ঢপ গান ছিল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভালবাসা সমর্পণের ভাষা। যা সমাজের বাবু-সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।[১২] যার সবথেকে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈশবে মধুকাণের ঢপ গান শুনে বিমুগ্ধ হন। মধুকাণ ছিলেন মান, মাথুর, অক্রুর সংবাদ,কুরুক্ষেত্র-এই চারটি ঢপ পালাগানের রচয়িতা রাধামোহন বাউলের সুযোগ্য ছাত্র। অন্যদিকেআলীদের প্রবেশ ঢপ কীর্তনকে নতুন মাত্রা দেয়। কে এই আলী? হজরত মহম্মদের মাতুলকুল বা খলিফাদের উত্তরসূরী ছিল আলীগণ। যাঁরা দেশ-দেশান্তরের ইসলাম ধর্মপ্রচারক বা ধর্মগুরু ছিলেন। এই আলী সম্প্রদায় ঢপ কীর্তনকে তাঁদের জীবনসংগ্রাম বা জীবনশৈলির প্রচার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিল।তাঁদের নজরে আসে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের উপনিবেশিক মুর্শিদাবাদে মুসলিম শাসনের পতনের ফলে জেলায় মুসলিম নিয়ন্ত্রণতলানিতে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় তাঁরা জেলাবাসীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে ঢপ কীর্তনকে বেছে নেয়। কেননা তাঁরা দেখে ঢপ কীর্তনে যে গ্রামবাংলার যে জীবনশৈলীর কথা বলা হয় যে লোক-লৌকিকতার কথা বলা হয়, যে সর্বশক্তিমানের কাছে সমর্পণের কাছে তথা বহুশ্বরবাদের কথা বললেও দিনের শেষে তা একশ্বরবাদকে তথা একজন পরম দয়াময়কে নির্দেশ করে। যার সাথে ইসলামের একেশ্বরবাদের মিল লক্ষণীয়। সুতরাং আলীরা জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে এই ঢপ কীর্তনের দ্বারা জেলাবাসীকে প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হয়। এবং তাঁদের সহজ ভাষা সমাজের সাধারণ মানুষদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মুর্শিদাবাদে ঢপ গান একদিকে রূপচাঁদ,মধুকাণ-এর দ্বারা হিন্দুদের প্রভাবিত করছে অন্যদিকে আলী সম্প্রদায়ের দ্বারা মুসলিমদের প্রভাবিত করছে। এককথায় 'ঢপ কীর্তন' সাম্রদায়িক ঐক্যর অনন্য নজির।

অষ্টাদশ শতক মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক আকাশে এক স্বর্ণ বলয়।এই অহংকারের আলোতে আঁধার নামে ১৭৫৭-এরপর পলাশী লুণ্ঠনের মধ্যদিয়ে। টাকার রাশি ক্লাইভের হাতধরে ইংল্যান্ডে পাড়িদিলে মুদ্রার ঘাটতি, মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, সাথে আসে আজন্মা। অতুল সুর-এর মতে,'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদসম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করেছিল বাঙলার জনজীবনকে। বর্গীয় হাঙ্গামার দুঃস্বপ্ন ছাড়া পলাশীরযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাঙলার জনজীবন মুখরিত ছিল সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যে।'[১৩] কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে। বর্তমানে এই জেলার খ্যাতনামা প্রকল্প সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বহুমানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হওয়ার পাশাপাশি ফ্লাই অ্যাশ দ্বারা ইট নির্মাণ করে নবভবন নির্মাণের দ্বারা আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি বর্জ্যপদার্থকে ব্যবহারযোগ্য করতে নবদিশা দেখায়। শিক্ষার জগতে জেলার সন্তানরা দেশবিদেশে অনন্য। রেশমশিল্প-কাঁসাশিল্প-শোলাশিল্পের খ্যাতি জগতজোড়া। শিক্ষা-শিল্প ও নানা প্রকল্প থেকে আগত মুনাফা জেলার আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক।কিন্তু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রীক প্রকল্পের কারণে আশেপাশের কৃষিজমি অনাবাদি জমিতে পরিণত হয়ে সাধারণমানুষের রুটিরুজি কেড়ে নিয়েছে। জেলার কুমোরপাড়ার দশা হতশ্রী। জেলার বিভিন্নপ্রান্তে জেলাবাসীর সুবিধার্থে সুউচ্চ অট্টালিকা ক্রমবর্ধমান, নিম্নমুখী মাছভর্তি পুকুরের সংখ্যা। যা মৎসচাষ ও আর্থিক ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক। শপিং মল বাড়ছে, সেখানে বাড়ছে কর্মসংস্থান। কিন্তু শিল্প-কারখানা আজ ডুমুরের ফুলে পরিণত। বিভিন্নক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস করা হলেও একশ্রেণীর মানুষ সরকারী সহায়তা নিয়ে তা শিক্ষা, ব্যবসায় বিনিয়োগের বদলে সেই দিয়ে আপন সজ্জা ও শৌখিনতা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত। যা হিংসা-কুটিলতা অপরাধ প্রবণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যা শিক্ষা-কর্মসংস্থান ও সৌভ্রাত্বের পক্ষে সর্বপরি জেলার আর্থিক মানচিত্রের পক্ষে নেতিবাচক এবং বাইরের জগতে মুর্শিদাবাদ আজও পিছিয়ে পড়া এক জেলা।পটশিল্প, ঢপ কীর্তন কেবল জেলার দুই লোকসংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। এই দুই লোকসংস্কৃতি জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরঅনন্য নজির রাখে। সেই সাথে জেলার আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হওয়ার দাবী রাখে।

বর্তমানে পটশিল্প ও ঢপ গান প্রায় বিলুপ্ত। এমতাবস্থায় একে তুলে এনে তার হৃত গর্ব ফিরিয়ে এনে গ্রাম-শহর-জেলা-দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরজন্য সরকারি সহায়তা আবশ্যিক। ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে নবদ্বীপ কীর্তন উৎসবে ঢপ কীর্তন পরিবেশন করার পাশাপাশি নবদ্বীপে কীর্তন গুরুকুল স্থাপনের মাধ্যমে ঢপ কীর্তন চর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দুই লোকসংস্কৃতির পক্ষে জনসচেতনতা বাড়ানোর সাথে এবিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর অর্থসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। জনসম্মুখে এই দুই লোকসংস্কৃতির পরিবেশনের উপযুক্ত পরিবেশ আয়োজন করতে হবে। শ্রোতা-দর্শকের নিকট

গ্রহণযোগ্যতা যত বাড়বে, তত বেশি আসবে মুনাফা। যা জেলার আর্থিক ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র :

১. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৪০

২. তদেব, পৃ-৪১

৩. অরিন্দম রায় (সম্পা), মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮ই ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮, মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, পৃ-১৩৩- ১৩৪

৪. সুশীলচৌধুরী, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ- ১১০

৫. জাহির রায়হান, মুর্শিদাবাদ, বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০২০, পৃ- ৬১

৬. জয়চাঁদ দাস, মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি, সহযাত্রী প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১৭, পৃ- ২১

৭. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ, প্রাগুপ্ত, পৃ-১৫৫

৮. তদেব, পৃ- ১৫৫

৯. তদেব, পৃ- ১৫৬

১০. আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার, ৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১২

১১. কাশিমবাজার ছোটরাজবাড়ির অলিন্দের উত্তর দেওয়াল গাত্র।

১২. ঐ

১৩. অরিন্দম রায় (সম্পা), প্রাগুপ্ত,পৃ-২৮১

১৪. তদেব, পৃ-২৮৩

১৫. বর্তমান, রবিবার, ৬ই জানুয়ারি, ২০১৯

১৬. অরিন্দম রায় (সম্পা), প্রাগুপ্ত, পৃ- ২৮৪

১৭. প্রাগুপ্ত, পৃ-২৮৫

১৮. অরূপ চন্দ্র (সম্পা), মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড), বাসভূমি প্রকাশন, বহরমপুর, ২০১৭, পৃ-২২২

রঙ্গালয়ে ‘প্লে রাইটার’ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সফিকুল ইসলাম
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের হাতেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের যথার্থ বিকাশ ঘটেছিল। তিনি একাধারে নট-নাট্যকার-নাট্যশিক্ষক-নির্দেশক-ম্যানেজার ও সংগঠক। মঞ্চের সমস্ত দিক একাই সামলে নিতে পারতেন। সেই সমকালীন তিনি যে থিয়েটারে গেছেন সেই থিয়েটারই রমরমিয়ে চলেছে। মঞ্চের প্রয়োজনে বিভিন্ন নাটকের অনুবাদ, উপন্যাসের নাট্যরূপ ও সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, হালকা প্রহসন ও অপেরা জাতীয় অজস্র নাটক রচনা করে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছেন। সমকালীন নাটকগুলি সবই থিয়েটারের ব্যবসায়িক কেন্দ্রিক। থিয়েটারের প্রয়োজনেই তিনি অজস্র নাটক রচনা করেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন আদর্শ প্লে রাইটার।
সূচক শব্দ: নট-নাট্যকার, পরিচালক, সৌখিন থিয়েটার, পেশাদারি থিয়েটার,প্লে রাইটার, ন্যাশনাল থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার।

মূলবক্তব্য:

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার ও অভিনেতা বললেই যে বাঙালির নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশের অভিনয় ও নাট্যগুণ এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সে সময় গিরিশচন্দ্রকে ছাড়া সকল পেশাদার থিয়েটার প্রায় অচল। তিনি একাধারে নাট্যকার- অভিনেতা- নাট্যশিক্ষক -নির্দেশক- ম্যানেজার ও সংগঠক। সমস্ত কাজ একাই করে দিতে পারতেন। তিনি যে থিয়েটারে গিয়েছেন, সেই থিয়েটার রমরমিয়ে চলেছে। তাই নাট্য সাহিত্যের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্ব কে 'গিরিশ যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

কলকাতার বাগবাজারের বসু পাড়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ১২৫০ সনের ১৫ ফাল্গুন (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ফেব্রুয়ারি) সোমবার অষ্টমি তিথিতে রোহিনী নক্ষত্রের শুভক্ষণে নীলকমল ঘোষ ও মাতা রাইমণি দেবীর অষ্টম সন্তান রূপে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বাল্যকালে গৌরমোহন আঢ্যের পাঠশালা এবং হেয়ার স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কবি ঈশ্বরগুপ্তের সংবর্ধনা দেখে কবি হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তাছাড়া সেই সময়টাতে যাত্রা, আখড়ায়, হাফ-আখড়ায়, খেমটা ইত্যাদি দেখে ছোট থেকেই মুখে মুখে গান রচনা করতে শিখে যান। ছোট বয়সেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে অভিভাবকহীন গিরিশচন্দ্র কে উদ্দাম ও উশৃঙ্খলতা গ্রাস করেছিল। পড়াশুনার প্রতি তাঁর এতটাই অনীহা জাগে যে একসময়

লেখাপড়া ছেড়ে দেন। ১৮৫৯ সালে শ্যামপুকুরের নবীন সরকারের মেয়ে প্রমোদিনীর সাথে তার বিবাহ হয়। পরে আবার পড়াশোনা শুরু করলেও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পরেন নি।

কৈশোর কালে কিছুদিন একটি হাফ আখড়ার দলে যোগদান করেন, এবং অভিনয় জগৎ ও সঙ্গীত জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন। কুড়ি বছর বয়সে এটকিনশন টিলকন কোম্পানীতে বুক কিপারের কাজ দিয়ে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। হাফ আখড়ায় দলে যোগদানের সময়কালে বাগবাজারের কয়েকজন বন্ধুদের সাথে এক হয়ে একটি নাট্য দল গঠন করেন, নাম দেন 'বাগবাজার থ্রিয়েটিক্যাল সোসাইটি' পরে এটি 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নামে পরিচিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই দলের প্রযোজনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির জন্য সংগীত রচনা করেন। গানগুলি 'মুকুটাচরণ মিত্র' ছদ্মনামে লিখেছিলেন । তিনি বাগবাজারের অ্যামেচার থিয়েটারের হয়ে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয় করেন।

আসলে ১৮৩১-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাবুরা সৌখিন নাট্যশালা চালাতেন। সেখানে সাধারণ জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। সেখানে তাদের দ্বারাই নাটক নির্বাচন ও অভিনয় হতো। সেখানে নাটক দেখতে আসতো তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন, কখনও আমন্ত্রিত ইংরেজরা। তাই সমাজের বড় একটা অংশ ছিল থিয়েটারের বাইরে। সে সময়ের কিছু সৌখিন থিয়েটার হল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার, নবীনবসুর নাট্যশালা, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, প্যারিমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) এর নাট্যশালা, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যুৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া নাট্যশালা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতি। সৌখিন নাট্যশালা গুলি গড়ে উঠেছিল অভিজাত ধনীর একান্ত ব্যক্তিগত উৎসাহে ও আর্থিক অনুকূল্যে। এরা সবাই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইংরেজদের তৈরি রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখেছে। তৎসময়ে প্রচলিত যাত্রাপালা, আখড়াই আর ভালো লাগতো না। তাছাড়া ইংরেজদের সহচর্য লাভের আশায় ইংরেজদের অনুকরণ করতে চেয়েছে।

তাই ইংরেজদের মতো নাট্যশালা স্থাপন করে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। আর এই সমস্ত থিয়েটারে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকায় 'বাগবাজার নাট্যসমাজের' সদস্যরা টিকিট বিক্রি করে নাটক অভিনয়ের কথা চিন্তা করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এতে সম্মতি জানায় তাই জনসাধারণের কথা মাথায় রেখে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এখানে প্রথমে এখানে উপস্থিত না থাকলেও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয়ের সময় এখানে যোগদান করে ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে অভিনয়ের সূত্রপাত, তার পরিণতি 'লীলাবতী'তে ললিতমোহন চরিত্রে, আর ব্যপ্তি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহের চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর গিরিশচন্দ্রকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয় নি। আজীবন নাটক কে সঙ্গে করে বেঁচে ছিলেন। থিয়েটার ছাড়া অন্য কোন জীবিকা গ্রহণ করেননি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রথমে পার্কার কোম্পানি একশত পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরি ছেড়ে প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' একশত টাকার মাহিনাতে যোগদান করেন। নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী “বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস” গ্রন্থে বলেছেন-
"ব্যবসায়িক থিয়েটার পেশাগত ভাবে পরিচালনার নিয়ম নীতি এখান থেকেই চালু হল। এখানেই অভিনয় করতে করতে নাটকের অভাবে একেবারে 'দায়ে পড়ে' গিরিশচন্দ্রকে নাটক রচনা শুরু করতে হয়। রঙ্গমঞ্চের শূন্য উদার পূর্ণ করতে নাটক রচনায় হাত দিতে গিয়ে বেতনভোগী গিরিশ পেশাদারী মঞ্চের 'প্লে-রাইট' হয়ে পড়লেন। থিয়েটারের অন্য কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটককার জীবনের অধ্যায়ও অব্যাহত ভাবে চলতে লাগল।"[১]

গিরিশচন্দ্রের কর্মজীবনে বেশিরভাগ সময়ই নাটক রচনা ও থিয়েটারের জন্য ব্যয় করেছিলেন। তার সমকালীন সময়ে প্রত্যেকটি কমার্শিয়াল থিয়েটারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। যেমন গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটার, এমারেল্ড, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার, ইত্যাদি প্রধান প্রধান থিয়েটারের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তার জীবিত কালে কোনো নট-নাট্যকারের থিয়েটারের প্রতি ব্যবসায়িক বুদ্ধি এতটা ছিল না। নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় থিয়েটারকে সফল ব্যবসায় দাঁড় করিয়ে দিতেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে থাকাকালীন সময়ে ‘মুকুটাচরণ মিত্র’ ছদ্মনামে নাটক রচনা করেন। এরপর 'অকালবোধন', 'আগমনী', 'দোললীলা' ইত্যাদি নাটক রচনা ও বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী' ইত্যাদি উপন্যাসের নাট্য রূপদান করেন। এছাড়া নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ', দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ইত্যাদির নাট্যরূপ দান করেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হয় প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'। এখানে তিনি চুক্তিবদ্ধভাবে নাটক লেখা শুরু করেন। এখানে রচনা করেন 'মায়াতরু', 'আলাদিন', 'মোহিনী প্রতিমা', 'আনন্দরহ', 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যু বধ', 'লক্ষণবর্জন', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', 'সীতাহরণ', 'মলিনমালা' 'ভোটমঙ্গল', ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি। এখানে পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক গুলি খুবই খ্যাতি লাভ করে বিশেষ করে 'রাবণবধ' ও 'সীতার বনবাস' ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। 'সীতার বনবাস' নাটকে সীতার দুঃখ কথা এবং লব কুশের গান দর্শকের মন জয় করে নেয়। এরপর 'অভিমুন্য বধ' নাটক লিখলেও তা তেমন সাফল্য লাভ করেনি। এখানে দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হলে, প্রতাপচাঁদ জহুরী যে কোন নাটকে মঞ্চে লব-কুশ

কে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। সুচাতুর ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ বুঝতে পেরেছিলেন ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটা।

এরপর গুর্মুখ রায়ের 'স্টার' থিয়েটারে গিরিশের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকটি অভিনীত হয়। এরপর তিনি লিখেছেন 'ধ্রুব চরিত্র', 'নল দময়ন্তী', 'কামিনী' 'বৃষকেতু', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'চৈতন্যলীলা', (দুই ভাগ) ‘প্রভাসযজ্ঞ', 'বুদ্ধদেব চরিত', বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', ‘বেল্লিকবাজার', 'রূপ সনাতন', 'নিমাই সন্ন্যাস'প্রভৃতি নাটক। এই সময় গিরিশচন্দ্র ছিলেন মঞ্চের সর্বেশর্বা। পৌরাণিক নাটক গুলি চারিদিকে ভক্তিবাদের প্লাবন বইয়ে দেয়। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্টারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে আসলে বিনোদিনীর 'চৈতন্যরূপ' অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে তিনি 'চৈতন্যহোক' বলে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। ফলে মঞ্চে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এসে হাজির হন। গিরিশচন্দ্রের জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে। এরপর শুধুই পৌরাণিক ভক্তিবাদ মূলক নাটক রচনা করেন। গিরিশ প্রতিভার অপমৃত্যু হয়।

তারপর গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস এবং তিনশো পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে যোগদান করেন। এখানকার প্রাপ্ত টাকার মধ্যে ষোলো হাজার টাকা তিনি নবনির্মিত স্টার থিয়েটার কে দান করেন। এখান থেকে স্ত্রী’র ছদ্মবেশে বেরিয়ে খাল পাড়ে বসে স্টারের জন্য 'নসিরাম' নাটকটি লিখেছেন সেবক ছদ্মনামে। পরবর্তী সময়ে স্টারের জন্যই লেখেন 'প্রফুল্ল', 'চন্ড', 'মলিনাবিকাশ', 'মহাপূজা', 'হারানিধি', 'কালাপাহাড়', 'পারস্যপ্রসূন', ও হালকা নৃত্যগীত সমন্বিত ছোট গীতিনাটক গুলি। এখানেই প্রথম সামাজিক ছোট নাটক লেখেন 'প্রফুল্ল'। তারপরে লেখেন 'হারানিধি', 'মায়াবসান', 'বলিদান' প্রভৃতি নাটক। 'বলিদান' পণপ্রথা কে কেন্দ্র রচিত হয়েছিল। পণপ্রথা ‘বাঙালির কন্যা সম্প্রাদন নয় – বলিদান’ এই ভাবনা ব্যক্ত হয়েছিল। নাটকটি খুব জনসমাদার পেয়েছিল। স্টারের পর মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন, এখানে তিনি ম্যানেজার নাট্যশিক্ষক ও নাট্যকার হিসাবে যোগদান করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকটি অনুবাদ করে অভিনয় করেন। নাটকটি প্রায় সাত মাস ধরে রিহার্সাল করার পর মঞ্চস্থ করান। আক্ষেপের বিষয় নাটকটি ভালো চলেনি। কয়েকদিন চলার পর থিয়েটারে জনসমাগম হয়নি। এতে গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেন -

"নাটক দেখিবার যোগ্যতা লাভে ইহাদের এখনো বহু বৎসর লাগিবে, নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও রঙ্গালয়ে তৈয়ারী হয় নাই। পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল- ইহাও তাহার একটি কারণ।"[২]

এরপর এখানে লেখেন 'মুকুলমঞ্জুরা' ও 'আবু হোসেন' নাটক দুটি। নাটক দুটি ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে। নাটকের ব্যবসায়িক দিকটা বুঝতে পেরে হালকা প্রহসন জাতীয় নাচ গানের নাটক লেখেন। যেমন 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বড়দিনের বকশিস', 'স্বপ্নের ফুল', 'সভ্যতার পাণ্ডা', 'ফনির মনি', পাঁচ কনে প্রভৃতি। মহাভারতের

কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন 'জনা' নাটকটি। পাঁচ অঙ্ক বিশেষ নাটকটি খুব খ্যাতিলভ করেছিল।

তিন বছরের চুক্তিতে ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক ও নাট্যাচার্যরূপে এখানে বছরে চারটি নাটক লিখে দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের 'নল দময়ন্তী' ও 'বেল্লিক বাজার' দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। এরপর ক্লাসিকের জন্য রচনা করেন 'দিলদার', 'অভিশাপ', 'অশ্রুধারা', 'আয়না', 'মনের মতন', প্রভৃতি নাটক। দুটি বড় নাটক হল 'পান্ডবগৌরব' ও 'সৎনাম' নাটকটি। মুসলিম দর্শকের আপত্তিতে সৎনাম নাটকটি বন্ধ করে দিতে হয়।

পুনরায় দ্বিতীয় দফায় (১৮৯৮-১৯০৭) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই কাটান। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা এ থিয়েটারের জন্যই। যেমন 'মনিহরণ', 'নন্দদুলাল', 'হরগৌরী', 'বাসর', 'জাইসা কি ত্যাইসা', প্রভৃতি নাটকগুলি। বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে দেশপ্রেম মূলক জাতীয়তাবাদী নাটকগুলি রচনা করেন। যেমন 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি। ১৯০৮- ১৯১১ পুর্যন্ত লিখেছেন 'শাস্তি কি শান্তি', 'অশোক', 'তপবন' ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্রকে নাটক লিখতে হয়েছে সমকালীন থিয়েটারের ব্যবসায়িক দিককে কেন্দ্র করে। যে সমস্ত নাটকগুলি ব্যবসায়িক দিকে সফল হয়েছে সে জাতীয় নাটক রচনা করতে তিনি মঞ্চের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া মঞ্চের সমস্ত দিক যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা, নৃত্য শিল্পী, সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, সমস্ত কিছুর কথা মাথায় রাখতে হয়েছে। তিনি সমকালীন লোক চাহিদার জন্যই পৌরাণিক ভক্তিবাদ মূলক নাটক গুলি রচনা করেছিলেন। তাছাড়া সমকালীন সময় কেন্দ্রিক নাটকগুলি রচনা করেছেন, যেমন- দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, দোল, বড়দিন, ভোট, মজাদার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি। এ সমস্ত নাটকগুলি সবই রঙ্গমঞ্চের চাহিদার জন্যই রচনা করা হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যু হয়।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে দর্শন চৌধুরী তার 'বাংলা থিয়েটার ইতিহাস' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন-

"অভিনয়,অভিনয় শিক্ষাদানে, মঞ্চাধ্যক্ষের কাজে, থিয়েটারের ম্যানেজারিতে এবং নাটক রচনায় গিরিশ বাংলা থিয়েটার কে বাঁচিয়ে রাখেন। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় ও নাটকের প্রথম পঞ্চাশ বছর তাই গিরিশ নামাঙ্কিত হয়েছে শুধু তাঁর অবস্থানের জন্য নয়, হয়েছে তাঁর কার্যগুণাবলীর জন্যই।"[৩]

তথ্যসূত্র:

১) দর্শন চৌধুরী, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

২) তদেব, ৩০১ পৃষ্ঠা।

৩) তদেব, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব অনিস্বীকার্য

মধুরিমা ভৌমিক
গবেষক, দর্শন বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ: সুখ মানব জীবনে আকাঙ্খিত হলেও, দুঃখ মানব জীবনে অনাকাঙ্খিত। যদিও জীবন দুঃখ বিচ্ছিন্ন নয় বরং তারা পরস্পর পরিপূরক। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় হল মানব জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব অনিস্বীকার্য এবং দুঃখ হল মানব জীবনের অপ্রিয় সত্য। ভারতীয় দার্শনিকরা দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তার থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। শুধু ভারতীয় দার্শনিকরা নন, পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

মূল শব্দ: দুঃখ, জীবন, জন্ম, অবিদ্যা, বন্ধন।

মূল আলোচনা:

দুঃখের ইংরেজি অনূদিত হল- suffering, pain, stress etc. *দুঃখ* (Dukhha) শব্দের বিন্যাস করলে *দু* (du) + *খা* (kha), *দু* অর্থাৎ 'খারাপ' বা 'কঠিন 'আর *খা* অর্থাৎ 'খালি'। দুঃখ উপনিষদ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে (ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত সকল সম্প্রদায়েই দুঃখের আলোচনা দেখা যায়) পাওয়া একটি শব্দ যার অর্থ হল অপ্রীতিকর, ব্যথা, বেদনা ইত্যাদি। মানুষ দুঃখের চিহ্নিতকরণ সাধারণত সুখের বিপরীত হিসেবেই করেন। দুঃখ এতটাই অপ্রিয় সত্য যে মানুষ তার অস্বীকার করেননি বরং তা সহ্য করার ক্ষমতা বারংবার প্রার্থনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির ৩৬ সংখ্যক কবিতা উল্লেখিত, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভুর কাছে সুখকে যেমন সইবার শক্তি চেয়েছেন, ঠিক তেমনি জীবনে সুখের সঙ্গে দুঃখকে সহ্য করার প্রার্থনা করেছেন।

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন -
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিতমুখে
পারে উপেক্ষিতে।

This is my prayer to thee, my lord-strike, strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.
(Rabindranath Tagore, Gitanjali- 36)

দুঃখের নানা প্রকারভেদ থাকতে পারে কিন্তু দুঃখ সাধারণত দুই রকম- একটি হল শারীরিক দুঃখ, অপরটি মানসিক দুঃখ। জীবনে দুঃখের আগমন নানাভাবে হতে পারে। কখনো সমাজ দ্বারা, কখনো প্রকৃতি দ্বারা, আবার কখনো আপনজন দ্বারা ইত্যাদি। সব দুঃখের তারতম্য কিন্তু এক নয়। এখানে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে যে ঠিক কতটা দুঃখ পেলে একটি জীবনকে দুঃখময় জীবন বলা যেতে পারে বা দুঃখ মাপার মাপকাঠি কি? এটি একটি আলোচনার জায়গা কেননা কারো কাছে তার প্রিয় খাবারটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে না পেলে দুঃখী হতে পারেন আবার কেউ হয়তো খাবারই পাচ্ছেন না তাই তিনি দুঃখী। তবে দুঃখ জীবনেরই একটি অংশ ঠিক সুখ যেমন জীবনের অংশ।

দর্শনে দুঃখ শব্দটি খুবই প্রচলিত। ভারতীয় দর্শনকে অনেকে দুঃখবাদী দর্শন বলে। এ কথা ঠিক, ভারতীয় দর্শন দুঃখের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেছে কিন্তু এর থেকে এটা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী দর্শন। দুঃখের বাস্তবতা এবং জীবনে দুঃখের অবস্থানকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। তাই ভারতীয় দর্শন দুঃখের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং এর থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

জীবনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা যেতে পারে - একটি দুঃখ বা নৈরাশ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং অপরটি সুখ বা আশার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেসব দার্শনিক জীবনকে দুঃখের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন তাদের দুঃখবাদী দার্শনিক (pessimist philosophers) বলা হয়। আর যারা জীবনকে সুখের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন তাদের আশাবাদী দার্শনিক (optimist philosophers) বলা হয়। যেমন পাশ্চাত্য দর্শনে জার্মান দার্শনিক শোপেনআওয়ার (Schopenhauer) দুঃখবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত। কেননা তিনি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, জীবনে দুঃখই একমাত্র বাস্তব অনুভূতি, সুখ বলে বাস্তবে কিছু নেই। শোপেনআওয়ার তার *On the Suffering of the World* গ্রন্থে বলেছিলেন- দুঃখই জীবনের সার কথা। সুখ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। সুখ প্রসঙ্গে একটি folk song খুবই প্রাসঙ্গিক তা হল -

তারে ধরি ধরি মনে করি
ধরতে গেলাম আর পেলাম না
দেখেছি রুপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।

(Song written by Nabanidas Khayapa Baul)

আসলে সুখ হল অধরা মাধুরী। যখনই একে ধরতে যাওয়া হয় তার অস্তিত্বের সংকট ঘটে। তবে শোপেনআওয়ার গৌতম বুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজেকে বুদ্ধিস্ট বলতেন। গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে শোপেনআওয়ার এর দার্শনিক আলোচনায় মিল যেমন রয়েছে তেমনি অমিল রয়েছে। গৌতম বুদ্ধের মতে, 'সর্বং

দুঃখম'। জগতে সবই দুঃখ অর্থাৎ জন্ম দুঃখ, রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ ইত্যাদি। দুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে Heinrich Heine এর একটি quote খুবই প্রাসঙ্গিক তা হল- "sleep is good, death is better; but of course, best thing world to have never been born at all" অর্থাৎ ঘুম জাগরণ থেকে ভালো, কেননা নিদ্রা ভঙ্গ হলেই আবার সেই দুঃখময় জীবন। জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় কেননা জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই দুঃখময়। তাই এই পৃথিবীতে না জন্মানো সবথেকে ভালো। জন্ম মানেই সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ আর বন্ধন মানেই দুঃখ। শোপেনআওয়ার এর মতেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবই দুঃখ এবং দুঃখ মুক্তি সম্ভব নয়, এখানেই গৌতমবুদ্ধের সাথে শোপেনআওয়ার এর বিস্তর পার্থক্য। গৌতম বুদ্ধ জগৎকে দুঃখময় বললেও দুঃখের মুক্তি সম্ভব এবং তার পথ তিনি দেখিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনে দুঃখের আলোচনা: ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় গুলি দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবার একে একে দুঃখ সম্পর্কীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মতবাদ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

বৌদ্ধ দর্শন: বুদ্ধমতে, 'সর্বং দুঃখম'। জগতের সবকিছুই দুঃখ। জন্ম থেকে মৃত্যু মধ্যবর্তী যা কিছু সবই দুঃখ যেমন অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, রোগ, জরা, সবই দুঃখ। দুঃখ সত্য এবং এর থেকে চরম বাস্তব জগতে আর কিছুই নেই। মনুষ্য ইতিহাসে কোন জীবন আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আসেনি যে জীবনে দুঃখ নেই। আসলে দুঃখ বিহীন জীবন - এটি যেন মিথ্যাচার। তবে গৌতম বুদ্ধের আসল লক্ষ্য ছিল- দুঃখতাপে জর্জরিত মানুষের মুক্তি। বুদ্ধদেব তার জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা চারটি সত্য লাভ করেন, যা আর্যসত্য (Four Noble Truths)[১] নামে পরিচিত। এগুলি হল-

ক. দুঃখ (There is suffering)

খ. দুঃখ সমুদয় (There is a cause of suffering)

গ. দুঃখ নিরোধ (There is a cessation of suffering)

ঘ. দুঃখ নিরোধ মার্গ (There is a way leading to this cessation of suffering)

মনে রাখতে হবে বুদ্ধদেব কিন্তু দুঃখ এবং দুঃখমুক্তি এই দুইয়ের কথাই বলেছেন। বুদ্ধমতে, জগত যেমন দুঃখময় সেই দুঃখের কারণও আছে। কেননা কারণ ছাড়া কোন কার্যই বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। দুঃখ নামক কার্যেরও কারণ আছে এবং কারণ যদি জানা যায় সেই কারণের উচ্ছেদ থেকে কার্যের উচ্ছেদ সম্ভব অর্থাৎ দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভব। দুঃখের এক এক করে কারণ দেখলে মূল কারণটি যা তা হল 'অবিদ্যা' সুতরাং অবিদ্যা বিনাশে দুঃখ মুক্তি সম্ভব। এবার প্রশ্ন হল এই অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে সম্ভব? অবিদ্যা বিনাশের জন্য তিনি মার্গ দেখিয়েছেন যা বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ নিরোধ মার্গ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করলে এটি

পরিষ্কার যে বৌদ্ধ দর্শনে জগতকে দুঃখময় বলা হলেও তিনি দুঃখমুক্তির পথ দেখিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই দুঃখ কোন স্থায়ী বস্তু নয়। বুদ্ধমতে, "সর্বং অনিত্যম" অর্থাৎ সবকিছুই অনিত্য। সুতরাং দুঃখও অনিত্য।

জৈন দর্শন: জৈন দর্শনে অবিদ্যাকে দুঃখের কারণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ জৈন দর্শনে দুঃখ স্বীকৃত। এবার আবারো সেই প্রশ্ন অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে চন্দ্রধর শর্মা বলেছেন - "Passions attract the flow of karmic matter into the souls. And passions are due to ignorance. So ignorance is the real cause of bondage. Here Jainism agrees with Sankhya, Buddhism and Vedanta. Now, ignorance can removed only by knowledge."[২] অর্থাৎ অবিদ্যার ফলে মানব জাতি জগতে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে আর এই বন্ধনই হচ্ছে দুঃখের কারণ। জ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যার নাশ সম্ভব। মুক্তির পথ হিসাবে জৈনরা তাদের দর্শনে ত্রিরত্নের উল্লেখ করেছেন। তা হল -

ক. সম্যক দর্শন (Right faith)

খ. সম্যক জ্ঞান (Right knowledge)

গ. সম্যক চরিত্র (Right conduct)

সাংখ্য দর্শন: এবার সাংখ্য দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সাংখ্য দর্শনে প্রথম কারিকায় দুঃখের উল্লেখ রয়েছে। তাই সাংখ্য কারিকার প্রথম কারিকা উল্লেখ করে তারপর আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ঠীকরণ হবে। সাংখ্য কারিকার প্রথম কারিকায় বলা হয়েছে -

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ।।১।।[৩]

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকাটি দুঃখকেন্দ্রিক। মানব জীবনে দুঃখ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এই কারিকায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুঃখকেন্দ্রিক কারিকা দিয়ে সাংখ্য দর্শনের শুরু হলেও আসলে দুঃখের অপঘাতক বা নিবর্তক হেতু কি তা নিয়েই জানতে চাওয়া হয়েছে এই করিকায়। এবার প্রশ্ন হল এই ত্রিবিধ দুঃখগুলি কি? এবং এই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব কি? দুঃখসমূহের দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধ দুঃখ হল- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার- শারীরিক ও মানসিক। আধিভৌতিক দুঃখ বাহ্যিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ। আধিদৈবিক দুঃখের কারণ ও বাহ্যিক, তবে 'দৈব' শব্দের অর্থ এখানে অপদেবতা কে বুঝানো হয়েছে। সাংখ্য মতে, জন্ম থেকেই জীব এই দুঃখত্রয়ের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত। এই ত্রিবিধ দুঃখের বন্ধন থেকে উচ্ছেদ কি সম্ভব বা কিভাবে দুঃখত্রয়ের নিরোধ সম্ভব? ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকার দু নম্বর কারিকায় দুঃখ-নিবৃত্তির বিধি দিয়েছেন তা হল-

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।২।।[৪]

সুতরাং দুঃখের নিবারণ সম্ভব এবং তার তিন প্রকার উপায় রয়েছে। যথা -
ক. দৃষ্টবৎ বা লৌকিক উপায়
খ. আনুশ্রবিক উপায় যথা বেদ বিহিত যাগযজ্ঞাদি
গ. সাংখ্য শাস্ত্রবিহিত উপায়- তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান

দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক উপায় যেহেতু একই তাই দুঃখ নিবারণের অনেকেই দুরকম উপায়ের কথা বলেছেন। তবে দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে দুঃখত্রয়ের ঐকান্তিক বা অত্যান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তাহলে প্রশ্ন হল বিবেকজ্ঞানের দ্বারা কি দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হবেই। সাংখ্য দর্শনের উপরের উল্লেখিত কারিকা সবিস্তার অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ (একান্ত ও অত্যন্ত) নিবৃত্তি সম্ভব। এবার প্রশ্ন হল বিবেকজ্ঞান কি? বিবেকজ্ঞান হল 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান' অর্থাৎ 'ব্যক্ত' হচ্ছে প্রকৃতির পরিনাম, 'অব্যক্ত' হচ্ছে প্রকৃতি, আর 'জ্ঞ' হচ্ছে পুরুষ। এককথায় পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান হচ্ছে বিবেকজ্ঞান।

যোগ দর্শন: আমরা জানি সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র দর্শন। তথাপি এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সাংখ্য এবং যোগ উভয় দর্শনে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে বিবেকজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু যোগ দর্শন বিবেকজ্ঞানের সঙ্গে যোগসাধনাকেও মুক্তির উপায় বলেছেন। Chandradhar Sharma তার গ্রন্থ *A Critical Survey of Indian Philosophy* তে বলেছেন - "There are five kind of sufferings (*klesha*) to which it is subject. These are: (1) ignorance *(avidya)* (2) egoism *(asmita)* (3) attachment *(raga)* (4) aversion *(dvesa)* (5) clinging to life and instinctive fear of death *(abhinivesha).* The bondage of the self is due to its wrong identification with the mental modifications and liberation, therefore, means the end of this wrong identification through proper discrimination between *purusha* and *prakriti* and the consequent cessation of the mental modifications. It is the aim of yoga to bring about this result."[৫] অর্থাৎ যোগ দর্শনে পাঁচ প্রকার ক্লেশের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম প্রকার অর্থাৎ অবিদ্যা হচ্ছে অজ্ঞান যা ক্লেশের মূল কারণ। অস্মিতা হচ্ছে অহং অভিমান, রাগ হচ্ছে সুখজনক বস্তুর প্রতি আসক্তি, দ্বেষ হচ্ছে দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অভিনিবেশ হচ্ছে মৃত্যুভয়। সুতরাং যোগ দর্শনেও দুঃখের স্বীকৃতি যেমন রয়েছে, তৎসহিত দুঃখমুক্তির মার্গ ও উল্লেখিত রয়েছে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন: ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে প্রমেয় পদার্থে দুঃখ স্বীকৃত। এই দর্শনে জীব জন্মের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর কর্মের দ্বারা সুখ ও দুঃখের ফল ভোগ করে। ন্যায়বৈশেষিক মতে, অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। আবারো প্রশ্ন হল অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে সম্ভব? তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে প্রমেয় পদার্থের (প্রমেয় পদার্থ বারটি যথা - আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ) জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে বিনাশ করে। এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হলে জীব জন্ম ও দুঃখে জর্জরিত হন না। আসলে মিথ্যাজ্ঞান নামক কারণের ফলে দোষ নামক কার্যের উৎপত্তি। দোষ থেকে উৎপত্তি হয় প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি থেকে উৎপত্তি হয় জন্ম। আর জন্ম নামক কারণ থেকেই দুঃখ নামক কার্যের উৎপত্তি। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকৃত। যদিও তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখমুক্তি সম্ভব।

মীমাংসা দর্শন: মহর্ষি জৈমিনি কর্মকে সর্বপ্রধান বলে স্বীকার করেন। মীমাংসা দর্শনে স্বর্গের ধারণা অধ্যয়ন করলেই স্পষ্ট হবে যে এখানেও দুঃখ স্বীকৃত হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হল স্বর্গ কি? স্বর্গ হল সুখ বা যাতে দুঃখের লেশমাত্র নেই, যা উৎপত্তির পরক্ষণেই ধ্বংস হয় না। এই স্বর্গলাভ বা দুঃখ মুক্তি হল জীবের পরম অভীষ্ট।

বেদান্ত দর্শন: মীমাংসা দর্শনের মতো বেদান্ত দর্শনেও অবিদ্যাজনিত জীবনকে দুঃখময় বলা হয়। অবিদ্যা থেকেই বন্ধনভ্রম হয় (আত্মার বন্ধন বা মুক্তি নেই, আত্মা নিত্য মুক্ত)। এই অবিদ্যার বিনাশেই মুক্তি। জ্ঞান হল জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান। আর এই প্রকার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শঙ্করের মতে, বিশুদ্ধ জ্ঞানই মুক্তি (শঙ্কর দুই প্রকার মুক্তির উল্লেখ করেন যথা - জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তি)। রামানুজ মনে করেন মুক্তির জন্য জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিরও প্রয়োজন (রামানুজ জীবনমুক্তি স্বীকার করেন না)।

দুঃখের অনুভূতি হল মানব জীবনের সবচেয়ে তীব্র ও কষ্টকর অনুভূতি। শুধু ভারতীয় দর্শনে নয়, পাশ্চাত্য দর্শনেও দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকৃত। যেমন গ্রীক দার্শনিক পাইরোনিজমের (Pyrrohonism) মতে, দুঃখের মূল কারণ হল গোঁড়ামি (dogmas)। এপিকিউরাস (Epicurus) এর দর্শনের দিকে তাকালে দেখা যাবে তিনি একটি গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেটি হল - *ataraxia* অর্থাৎ 'freedom from worry'. এপিকিউরাসের মতে, দুশ্চিন্তা সুখী জীবনের জন্য উপযোগী নয়। তিনি একজন সুখবাদী দার্শনিক এবং সুখের সংজ্ঞায় বলেছেন "the absence of pain in the body and trouble in the soul"[৬] অর্থাৎ সুখ হচ্ছে শরীরে ব্যথার অনুপস্থিতি এবং আত্মায় কষ্টের অনুপস্থিতি। প্রথমেই গৌতম বুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শোপেনআওয়ার এর আলোচনা উল্লেখিত হয়েছে। Nietzsche প্রথম শোপেনআওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিও দুঃখের বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন এবং মানব জীবনে দুঃখ বা দুর্ভোগকে ছদ্মবেশে একটি আশীর্বাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পরিশেষে, বলা যায় যে দুঃখ হল মানব জীবনের চরম বাস্তবতা। মানুষ দুঃখে যত অশ্রু বর্ষণ করেছেন হয়তো তার কাছে সমুদ্রের জল ও হার মানবে। জীবনে দুঃখকে অস্বীকার করার বদলে এর অস্তিত্ব স্বীকার করা শ্রেয়। তৎসহিত আমাদের সহ্য ক্ষমতাকে অধিক থেকে অধিকতর করা উচিত যাতে দুঃখ এক নামমাত্র বিষয় হয়ে উঠে জীবনে। মানব ইতিহাসে এমন কোন জীবন নেই যে জীবন দুঃখহীন। তাই দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার এক হাস্যকর বা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের জন্ম থেকে, মানুষ যতদিন জন্মাবে দুঃখ ততদিন জন্মাবে। অনেকে বর্তমান জীবনের দুঃখের জন্য ভাগ্যকে দায়ী করেন। এটি একটি সবিস্তার আলোচনার জায়গা কেননা ভাগ্য নির্ধারিত হয় কর্মের দ্বারা এবং আমরা পূর্বজন্মের কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন ভোগ করি। অনেকে পূর্বজন্ম বা পরজন্ম এই ধারণায় বিশ্বাসী না ই হতে পারেন, তবে কর্ম দ্বারা জীবন অতিবাহিত হয় এটি সবাই বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ ভালো কর্মের ভালো ফল এবং খারাপ কর্মের খারাপ ফল। কাজী নজরুল ইসলাম তার *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস যেটি প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে রচিত। তৎকালীন দারিদ্র, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনীর বিকাশ। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন তার জীবন অতি দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে, (উপন্যাসের প্রথম অংশ কৃষ্ণনগরের এবং শেষাংশ কলকাতায় রচিত।) এই উপন্যাস তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই উপন্যাসে তিনি বলেছেন "কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই! এতে কপাল যথেষ্টই ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না।" যাই হোক সাধারণত মানুষ বিশ্বাস করেন, মানব জীবনের শারীরিক বিলুপ্তিতে একমাত্র দুঃখের বিলুপ্তি সম্ভব কিন্তু দর্শনে প্রমাণিত শারীরিক বিলুপ্তির পূর্বেও দুঃখমুক্তি সম্ভব।

উৎসের সান্ধানে :

১। Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey Of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD. Delhi, 1987, p. 71.

২। Ibdi, P. 65

৩। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (আনুবাদক), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণি কলি ৬, তৃতীয় প্রকাশকঃ ১৪০৬, পেজ নং, ৮।

৪। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (আনুবাদক), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণি কলি ৬, তৃতীয় প্রকাশকঃ ১৪০৬, পেজ নং, ২২।

৫। Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey Of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD. Delhi, 1987, p. 171.

৬। Epicurus: “In Waking or in Dream” Source: Baronett, Stan: *Jounney into Philosophy: An Introduction with Classic and*

Contemporary Readings, Routledge, New York and London,2012, p. 645.

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি।

২। Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey Of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD. Delhi, 1987.

৩। Chatterjee, S. & Datta, D. *An Introduction to Indian Philosophy*, Rupa Publications India Pvt. Ltd 2007.

৪। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (আনুবাদক), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণি কলি ৬, তৃতীয় প্রকাশকঃ ১৪০৬।

৫। রজত ভট্টাচার্য (আনুবাদক), *সাংখ্যকারিকা সম্পূর্ণ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

৬। Baronett, Stan: *Jounney into Philosophy: An Introduction with Classic and Contemporary Readings*, Routledge, New York and London, 2012.

৭। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস।

বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক

গোলক সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে যে বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ। নাটকের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠেছে। একটি লিখিত নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে। নাটকের প্রতি দর্শকদের চাহিদা কিরূপ। যুগীয় পরিবর্তন, সভ্যতার বিকাশ, আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার নাটককে কিভাবে প্রভাবিত করে, বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নাটক সমাজের চাহিদা পূরণে কতটা সমর্থ এবং লোকশিক্ষার দিক থেকে সমাজে নাটকের গুরুত্ব কতটা। যুগে যুগে দর্শকসমাজ নাটককে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাংলা নাটকের সঙ্গে সমাজের এই সম্পর্ক কতটা ফলপ্রসু হয়েছে। প্রথম বাংলা নাটকের রচনা, নাটকের বিকাশ এবং বিবর্তন। তৎকালীন(১৮৭২) বাঙালি সমাজে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রভাব। বিনোদনের জগতে যাত্রা, কবি, আখড়ায়, বুলবুলির লড়াই থেকে বাঙালি সমাজ নাটক ও নাট্যশালাকে কিভাবে গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ে টিভি, সিরিয়াল, সোশ্যাল মিডিয়া বাংলা নাটককে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো এই আলোচনায়।

সূচক শব্দ: সমাজ, সাহিত্য, সভ্যতা, নাট্যশিল্প, জীবনবোধ, সমাজমানসিকতা, দর্পণ, ইতিহাস, অভিনয়, সমাজবদ্ধমানুষ, দর্শক, সাধারণ রঙ্গালয়, বিনোদন।

মূলবক্তব্য:

আমরা জানি শিল্প সাহিত্যের যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে সমাজ ও সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য মাধ্যম হলো নাট্যশিল্প। নাটক সমাজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত শিল্পমাধ্যম।

> ‘সাহিত্যের অন্য যে বিভাগগুলি আছে সেগুলিতে মানুষের সমাজসত্তা গৌণ ও অস্ফুট হয়ে চলে। কারণ গল্প উপন্যাস কবিতা প্রভৃতি একক মানুষের উপভোগ্য সামগ্রী। ওইসব সাহিত্য উপভোগের সময় পাঠকের সমষ্টিগত চেতনা সক্রিয় থাকে না। ....গল্প, উপন্যাস ও কবিতার বিষয়বস্তু মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে গোচরীভূত থাকে না, থাকে তার কল্পনাদৃষ্টিতে।.... কিন্তু নাটকের রস মানুষ গ্রহণ করে সম্মিলিত ভাবে। এখানে তার সমষ্টিগত চেতনা ক্রিয়া করে।.... নাটক উপভোগের সময় মানুষের সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তি অপেক্ষা তার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-চোখ ও কানই বেশি সক্রিয় থাকে।’[১]

আসলে সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সমস্যা-সম্ভাবনা, ঘটন-অঘটন, বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, মতবাদ, সমাজের গভীরতর জীবনবোধ ও সূক্ষতর উপলব্ধি সবকিছুই নাটকে যতটা সহজভাবে ধরা দেয় শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় ততটা সহজভাবে ধরা দেয় না। নাটক সমাজের গভীরতম সত্য উদঘাটন করে তীক্ষ্ণতর বিচার শক্তির দ্বারা সমাজ-মানসিকতাকে চেতনা জাগায়, যার ফলে সেই সূক্ষ্ম সমস্যা তীক্ষ্ণবিচার শক্তির মাধ্যমে একটি মঙ্গলময় মীমাংসিত রূপ লাভ করে। তাই নাটক হল সমাজের সবচেয়ে মসৃণ এবং সচ্ছ মাধ্যম। এই কারণেই নাটককে সমাজের দর্পণ বলা হয়। নাট্যশিল্প সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে আদিম এবং পুরাতনশিল্প মাধ্যম, যা বর্তমানকালেও সমানভাবে সঞ্চরমান। সৃষ্টির আদিলগ্নে মানুষ যখন ভাষা শেখেনি তখন একে অপরের মধ্যে ভাব বিনিময় করত বিভিন্ন নাটকীয় ভাব-ভঙ্গিমা, আকার-ইঙ্গিত, নৃত্য এবং অভিনয়ের মাধ্যমে। একটি সদ্যোজাত শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবার পর পিতা-মাতা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার অনেকটাই এই নাটকীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই নাটকীয়তার মাধ্যমেই তার দীর্ঘ জীবন প্রবাহ সম্পন্ন করে।

অদ্য আলোচনার বিষয় হলো বাংলা নাটক ও সমাজের সম্পর্ক বা যোগসূত্র। আসলে নাটক ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের দিকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, নাটক বা থিয়েটার একদিকে যেমন সমাজকে বিশেষভাবে আলোড়িত বা প্রভাবিত করেছে ঠিক তেমনি সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নাটককে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলানোর দরুন নাটকের গঠনশৈলী পাল্টেছে। দর্শকের রুচি ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে তার চাহিদা অন্য পথে বাঁক নিয়েছে, ঠিক সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নাটকের বিষয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সভ্যতার উন্নতি, বিজ্ঞানের প্রভাব নাট্যশিল্পেও রেখে গেছে, তার অম্লান এবং অবশ্যম্ভাবী ছাপ। বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক তার ব্যতিক্রম নয়।

নাটক তখনই সমাজের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যখন সেই নাটকটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। আর এই সমাজ বলতে সার্বিকভাবে সমাজবদ্ধ মানুষকে বোঝায়। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, রুচিশীল, রুচিহীন সবাইকে নিয়েই তৈরি হয় সমাজ। তাই বাংলা নাটক ও থিয়েটারের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র খুঁজতে গেলে প্রথমেই বাংলা নাটক ও থিয়েটারের ইতিহাসটি একটু লক্ষ্য দরকার।

প্রথম বাংলা নাটক রচিত হয় ১৮৫২ সালে, যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। কিন্তু এই নাটক দুটি কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায় না। তাই বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক দিক থেকে নাটক দুটির মূল্য থাকলেও মঞ্চায়নের দিক থেকে এর গুরুত্ব কতটা তা আলোচনা সাপেক্ষ। ১৭৯৫

সালে 'বেঙ্গলি থিয়েটার' বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা রঙ্গালয়। এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত, এমনকি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাঙালির বৃহত্তর জনসমাজ তাদের আভিনয়ীক বিনোদনের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করে এসেছে যাত্রা, কবি, আখড়ায়, খেউড়, ইত্যাদির মাধ্যমে। এদেশে ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে আগত ইংরেজরা নিজেদের বিনোদনের প্রয়োজনেই ইংল্যন্ডীয় মডেলে থিয়েটার চালু করে। কিন্তু সেখানে একদিকে যেমন ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয়েছে অন্যদিকে কোন বাঙালির (কতিপয় ধনী শিক্ষিত বাঙালি ব্যতীত) প্রবেশাধিকার ছিল না। ইংরেজদের বিলিতি থিয়েটারের নেশায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং হঠাৎ নব্যবাবু সম্প্রদায়ের একদল কৌতূহল পরায়ণবশত এবং জাতে উঠে ইংরেজদের সমকক্ষ হওয়ার তাগিদে বিলিতি থিয়েটারের মডেলে শখের নাট্যশালা নির্মাণ করে। এই শখের নাট্যশালাগুলির দর্শক ছিল মঞ্চ মালিকের দ্বারা নির্বাচিত এবং নিয়ন্ত্রিত। তাই সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রঙ্গালয়গুলিতে ইংরেজি নাটক, এমনকি সংস্কৃত নাটকেরও ইংরেজি অনুবাদ অভিনীত হত। দেশের গরিষ্ঠ জনতা কানাঘুষো থিয়েটারের ব্যাপারে শুনলেও থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় দেখার করার সুযোগ তাদের ছিল না। ফলে এইসব থিয়েটারে অভিনীত নাটকের দ্বারা বৃহৎ সামাজিক মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার বা তাদের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাঙালি সমাজে বাংলা নাটকের প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায় ১৮৫৭ সালে। এই বছরে একসঙ্গে তিনটি নাট্যশালা বাংলা নাটকের অভিনয় করে। ছাতুবাবুর বাড়িতে 'শকুন্তলা', রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এবং বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বেনীসংহার' নাটকের অভিনয় হয় বছরে। এইগুলির মধ্যে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক রচিত এবং অভিনীত প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক হিসেবে পরিচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' যা তৎকালীন কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের উপর কঠিন চাবুকাঘাত মারতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর থেকে বাঙালিরঙ্গালয় ও বাংলা নাটক কিছুটা একই সমান্তরালে চলতে থাকে।

১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক একে অপরের পরিপূরক হয়ে চলতে থাকে। যেহেতু ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের বৃহত্তর জনতার আবেদনে, তাই সেখানে অভিনীত নাটকও নির্বাচিত হয়েছে, সেই জনগণের কথা মাথায় রেখেই। তাই ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' রচিত হলেও নাটকটি কোন বাবুদের শখের নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি, হয়েছে ১৮৭২ সালে সাধারন রাঙ্গালয়ে। বাবুদের শখের নাট্যশালায় নাটক নির্বাচিত হয়েছে মঞ্চমালিক ও তার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা। সেখানে দর্শক ছিল আমন্ত্রিত ও নির্বাচিত। আর দেশের বৃহত্তর জনগণ তখনও অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা নিবারণ করছে যাত্রা, কবি, আখড়াই ইত্যাদির মাধ্যমে। এই গরিষ্ঠ জনতা নতুন বিদেশি থিয়েটারের ঢঙে বাংলা নাটকের অভিনয় দেখা থেকে দূরে রয়েছে।

মধ্যযুগের পৌরাণিক ও ভক্তিবাদ নিয়ে পরিবেশিত যাত্রাভিনয়কে কিছুটা পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে, বিদেশি থিয়েটারের উপাদানকে কিছুটা গ্রহণ করে, থিয়েটারের স্বাদ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় বহুবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়ের বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু প্রমুখের পরিবেশনায় ও মনমোহন বসুর নির্দেশেঅপেরা জাতীয় গীতাভিনয়ের শুরু হয় এইসময়। থিয়েটারের সঙ্গে গীতাভিনয়ের মূল পার্থক্য হল থিয়েটারের মতো এতে কোন দৃশ্যপট থাকবে না এবং নৃত্যগীতের ভাগটা বেশি থাকবে। এই গীতাভিনয় যাত্রার জন্য মনমোহন বসু নাটক লেখেন 'রামাভিষেক', 'হরিশচন্দ্র'ইত্যাদি। থিয়েটারের পাশাপাশি এই অপেরা জাতীয় গীতাভিনয় তৎকালীন বাঙালি সাধারণের মানসে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছিল। থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয় একই সমান্তরালে বহমান হতে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই গীতাভিনয় নাট্যশালাকেও ছাপিয়ে যায়। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত শখের নাট্যশালায় যে নাট্যআন্দোলন গড়ে ওঠে সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ হলেও বাঙালি সমাজের সঙ্গে নাটকের যোগসূত্র তৈরি হয় এই পর্যায় থেকেই। ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়া 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয়, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রচিত হওয়া নাটক, যা বাঙালি সমাজকে ধীরে ধীরে নাট্যশালা অভিমুখী করে তোলে।

পরাধীন ভারতবর্ষের জনজাতি যখন ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের শিকার, মানুষ দিশেহারা, ঠিক তখন ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিল। পরাধীন বাঙালি জাতির মধ্যে স্বাধীনতা আহরণের আকাঙ্ক্ষা চরমভাবে জেগে উঠলো। ১৮৭২-৭৬ পর্যন্ত একের পর এক স্বদেশাত্মক নাটক অভিনীত হতে থাকে সাধারণ রঙ্গালয়ে। 'নীলদর্পণ' ছাড়াও এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন' হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার' অমৃত লালের 'হীরকচূর্ণ' উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী'। একটি দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে পরাধীন জনজাতির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কতটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, তারা কতটা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, সেটা ইংরেজরা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই থিয়েটারের তথাকথিত 'টিনের তলোয়ার' দেখে ভয় পেয়ে ১৮৭৬ সালে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ' আইন প্রণয়ন করে নাটকের স্বাধীনসত্তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কারণেই বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে মারণঅস্ত্রের থেকেও একজন নাট্যকারের কলম অনেক বেশি ধারালো এবং তীক্ষ্ণ। ১৮৭২ সালের পর বাংলা নাটক ও নাট্যশালা সেটাই প্রমাণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার দ্বারা এই আইন প্রণয়নের মূল কারণগুলি ছিল—

"উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবজাগ্রত বাঙালি মানসে নানান চিন্তাভাবনার উন্মেষ তার কর্মে, আচরণে ও কথায় প্রকাশ পেতে থাকে। এই ভাবনার

জাগৃতিতেই স্বাদেশিকতার প্রেরণা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বাঙালিকে ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সভা সমিতি করা, বক্তৃতা ও আলোচনা, অ্যাসোসিয়েশান গড়ে তোলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রেরণার কর্মজাত প্রকাশ, এবং কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে চিন্তার বিকাশ।..... একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ; অন্যদিকে জাতীয় রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গদর্শনে তৎকালীন বঙ্গমনীষীর মানসিক চিন্তার দাবি এবং রঙ্গালয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উল্লাস।"[২]

১৮৭৬ এর পরে যখন নাটকের স্বাধীন ভাবনাকে কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হল, তখন থিয়েটারে জাতীয় ভাবোদ্দীপনা মূলক স্বদেশী নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। এরপরে শুরু হলো 'গিরিশ যুগ'।এই যুগে নাট্যশালাগুলি পৌরাণিক ভক্তিভাব ও দেববাদে ভরে উঠল, তার সঙ্গে সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত হলো অজস্র নাটক। প্রখ্যাত নট-নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনয় শিক্ষক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, বাঙালি জাতি চিরকাল গম্ভীর ট্রাজেডি ও উপদেশাত্মক বিষয় অপেক্ষা তরল ভক্তিভাব ও 'অসংযম আবেগের অপরিমিত উচ্ছ্বাস' বেশি পছন্দ করে। তাই এই পর্যায়ে গিরিশের পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকগুলি সবচেয়ে বেশি নাট্যশালায় আদ্রিত হয়েছে। এই সময় নাট্যশালা পুরোপুরি পেশাদারী রূপ নেয়। পেশাদারী থিয়েটারে মঞ্চমালিক অর্থ বিনিয়োগ করেন মুনাফা অর্জনের জন্য। তাই দর্শক সেখানে লক্ষ্মী, আর সেই লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে পারলে তবেই রঙ্গশালা রমরমিয়ে চলবে। সামাজিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে 'শিল্পের সরস্বতীকে'ও প্রয়োজনে বিসর্জন দিতে হয়েছে নাট্যকারদের। এই সময় রঙ্গশালায় অভিনীত নাটকগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তৎকালীন বাঙালি সমাজের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ও বিনোদনের কথা মাথায় রেখেই। পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারা পুষ্ট শেক্সপিয়রীয় নাটকের অনুসরণে গম্ভীর ট্র্যাজাডী নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে বাঙালি সমাজের মনে সেই জাতীয় নাট্যবোধ গড়ে তোলা যেত কিনা সেটা প্রশ্নের বিষয় কিন্তু মঞ্চমালিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'প্লে-রাইটার'দের সেটা করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু জনতার আবেদনকে স্বীকার করেই অজানা জগতের সুর শুনিয়ে যাওয়া গিরিশচন্দ্রের মতো বড় বড় নাট্যকারদের পক্ষে কিছুটা সম্ভব হয়েছিল।

'যথার্থ প্লে-রাইট তাই সমসাময়িক যুগের চিন্তাভাবনা, তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চের বিধিব্যবস্থা সে যুগের 'ক্রেজ'— এসব কিছুকেই তার নাটকে গ্রহণ করেন। সমকালীন মঞ্চব্যবস্থাকে মেনে না নিলে তিনি বাতিল হয়ে যাবেন। কিন্তু এসবকিছুর মধ্যে থেকেও দর্শকের নাট্যবোধ ও চিন্তা গড়ে তোলার দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। জানা জগতের ভাবনার মধ্যে শুধুই ঘুরপাক না খেয়ে সতর্ক মুহূর্তে নাটককার দর্শককে নতুন ভাবনার তীরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন। এবার নাটককারের চিন্তায় দর্শক নিজেকে তৈরি করতে থাকে। এই যে দর্শকের

কাছে ধরা দিয়েও তাদের দূরজগতের ভাবনার অজানা অশ্রুত সুর শুনিয়ে দেওয়া, এইখানেই শক্তিশালী নাটক রচয়িতার কৃতিত্ব।”[৩]

তাই গিরিশ চন্দ্র সহ অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকগুলি একদিকে যেমন ভাবরসে পুষ্ট বাঙালির মানসিক চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়, ঠিক অপরদিকে জনশিক্ষার জন্য প্রকৃত ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলতে, মানুষে মানুষে মারামারি-হানাহানি বন্ধ করতে, সমাজের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে এই নাটকগুলি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছিল। আমরা জানি স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিরিশের বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়েছিলেন(১৮৮৫,১০ই জানুয়ারি)। যখন থিয়েটারে বারাঙ্গনাপল্লী থেকে আনীত রমণীগণ অভিনয় করার কারণে সমাজের শিক্ষিত রুচিশীল সম্প্রদায়ের কাছে নাট্যশালা একটি অপবিত্র স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই সময় থিয়েটারে রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণ একঝটকায় থিয়েটারের তথাকথিত ধারণাকে বদলে দিয়েছে। তারপর থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় যখন তৎকালীন গভর্নর লর্ড কার্জনের অশুভ অভিসন্ধি বাঙালিসমাজ বুঝতে পারে এবং স্বদেশী আন্দোলনে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে তখন বাঙালির নাটক-থিয়েটারও সামিল হয়। ১৮৭৬ এর ‘নাট্যনিয়ন্ত্রণ’ আইন উপেক্ষা করে নাট্যকারেরা জাতীয় ভাবনার নাটক লিখতে শুরু করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এই সময় তাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করেন।

সাধারণ রঙ্গালয় যখন পুরোপুরি পেশাদারী, ব্যবসায়ীক ভাবনায় পুষ্ট হয় তখন মঞ্চের মালিকের মর্জি মতো দর্শকের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে তোয়াক্কা না করে মুনাফা অর্জনের বিষয়কে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১৮৭৩ সালের পর থেকে মঞ্চে অভিনেত্রী রূপে পুরোপুরিভাবে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ঘটে। এইসব মেয়েরা তৎকালীন নিষিদ্ধপল্লী থেকে আসতো। ফলে শিক্ষিত রুচিশীল দর্শক সম্প্রদায় মঞ্চ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন মঞ্চে আগত দর্শকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল যাত্রারসে পুষ্ট, হালকা আমোদে প্রমত্ত, সুখ-দুঃখ, বেদনায় ভারাক্রান্ত কারুণ্যের অশ্রুসিক্ত ধারায় প্লাবিত। তাই এই সময় একদিকে স্থূলরুচি সম্পন্ন মানুষের কথা মাথায় রেখে রচিত হয়েছে অজস্র পঞ্চরং, গীতিনাট্য অন্যদিকে ভক্তিরসে আপ্লুত, দেবদেবীর অলৌকিকতায় বিশ্বাসী দর্শক সমাজের জন্য লেখা হয়েছে পৌরাণিক নাটক।

বর্তমানে দর্শকের বিনোদনের মাধ্যম প্রসারিত হয়েছে। টেলিভিশন, সিনেমা, অতি-সাম্প্রতিককালে টিভি, সিরিয়াল, সোশ্যাল-মিডিয়া নাটকের পরিধি ও বিষয়কে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছে। আগে নাটক হতো ৬ ঘন্টা ধরে। রাত আটটা-নটায় শুরু হতো ভোরবেলায় শেষ হত। তখনকার দিনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দর্শকের কথা মাথায় রেখেই নাটকের পরিবেশনাকে দীর্ঘায়িত করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল নাটকের

পরিসর কম হলে সঙ্গে একটি করে প্রহসনের অভিনয় করানো হতো। কিন্তু বর্তমান বাঙালি সমাজ আগের তুলনায় অনেকবেশি ব্যস্ত এবং বিনোদনের অজস্রমাধ্যম তাদের কাছে সহজলভ্য। ফলে ৬ ঘন্টার নাটক এখন হয়েছে ২ ঘন্টা থেকে ২:৩০ ঘন্টা। একদিকে সভ্যতার উন্নতি অন্যদিকে বাঙালি জাতির আন্তর্জাতিকতার প্রসারের ফলে এখন আর আগের মতো পৌরাণিক ভক্তিবাদ বা নৃত্যগীত বহুল পঞ্চরং নাটকের আবেদন রাখে না বাঙালি সমাজ। এখনকার নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংকটের মায়াজাল ছড়ানো ব্যক্তিগত ও সামাজিক গভীরতার রহস্য উন্মোচন। বর্তমান সময়ের নাটক আর আগের মতো অশিক্ষিত স্থূলরুচি সম্পন্ন দর্শকের মনোতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করতে পারেনা।

বর্তমান সময় দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক সংকট, ওঠানামা, বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যম, প্রযুক্তির বিকাশ, সভ্যতার আধুনিকীকরণ এইসবের পাশাপাশি নাটক এবং বাঙালি সমাজের একটি যোগসূত্র বাহিত হয়ে চলেছে অতীত থেকে বর্তমানে। কখনও দর্শকসমাজ দ্বারা নাটক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কখনো নাটক সমাজকে, সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দর্শক সমাজের চাহিদা ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়েছে নাটকের আঙ্গিক, ভাষা, উপস্থাপন রীতি। বিভিন্ন সময়ে নাটক ও নাট্যশালা সমাজবদ্ধ মানুষকে বিনোদনের পাশাপাশি দিয়েছে নৈতিকতার শিক্ষা, জাগিয়ে তুলেছে মানুষের ভেতরের মঙ্গলময় চেতনাকে। আসলে নাটক জীবন্ত পারফরম্যান্স, এখানে দর্শক এবং কলাকুশলীদের যোগাযোগ সরাসরি, যার ফলে একটি নাটক মঞ্চস্থ হলে দর্শকের মধ্যে যে, অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তা অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। আর এভাবেই নাটক, সমাজ তথা বাঙালিসমাজকে শুভবোধের জাগরণ ঘটিয়ে তাকে পূর্ণতার অভিমুখে প্রেরণ করেছে যুগ যুগ ধরে। ভবিষ্যতেও এই ধারা বজায় থাকুক এবং বাংলা নাটক শত সংকটের মধ্যেও বেঁচে থাকুক বাঙালির মধ্যে, এই প্রত্যাশা রেখে আলোচনার ইতি টানছি।

তথ্যসূত্র:

১। নাটকের কথা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যলোক, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, শপ নং এ-২২, কলকাতা-৭৩ (সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ ১৪২০) পৃষ্ঠা-১১১

২। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, দর্শন চৌধুরী, পুস্তক বিপনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, (ষষ্ঠ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬) পৃষ্ঠা-১৪৮

৩। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, দর্শন চৌধুরী, পুস্তক বিপনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, (ষষ্ঠ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬) পৃষ্ঠা-২২

রবীন্দ্র নাটকে সাহিত্যগুণ : রক্তকরবী

প্রিয়াঙ্কা পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নাটক নিছক মঞ্চের সামগ্রী নয়। পাঠকের পড়া ও দর্শকের দেখা, এই দুই মিললেই তবেই তৈরি হয় সার্থক নাটক। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের গুণ যখন আলোচনার বিষয়,তখন তা নাট্যগুণ ও সাহিত্যগুণ উভয়ই খুঁজে বার করতে হয়। আর এই গুণ যদি খোঁজা হয় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের তাহলে তা হবে মণি,মুক্ত,হীরে খোঁজা। এ নাটক তার সাহিত্যগুণ ও নাট্যগুণের জন্য পাঠকের সাথে সাথে দর্শকেরও চিত্ত জয় করে নিয়েছে। কালিদাস কিম্বা শেক্সপিয়রের নাটকগুলি মূলত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচনা করা হতো এবং সে উদ্দেশ্য সফলও হতো। কিন্তু একটু খোঁজ নিলে জানা যাবে এসব নাটকের একটা বড় পাঠক গোষ্ঠীও আছে। এবং এই পাঠক সংখ্যা কখনো কখনো দর্শক সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গেছে। এবং অবশ্যই তা নাটকের সাহিত্যগুণের জন্য। নাট্যবোধ না থাকলে যেমন নাট্যকার হওয়া যায় না,ঠিক তেমনি সাহিত্যবোধ সব নাট্যকারের থাকে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে এক এবং অদ্বিতীয়। এবং তাঁর অমর সৃষ্টির মধ্যে 'রক্তকরবী' নাট্যগুণ ও সাহিত্যগুণে ভরপুর একটি নাটক। প্রচলিত মাপকাঠিতে তার বিচার করা চলে না।
সূচক শব্দ: রক্তকরবী,নাট্যগুণ, সাহিত্যগুণ, মঞ্চ সামগ্রী নাটক,পাঠকগোষ্ঠী।

মূল আলোচনা :
যে কোন নাটকে নাটকের নাট্যগুণ অবশ্যই দর্শকরা প্রত্যাশা করে থাকে। এবং তা দর্শকদের মিলেও যায়। কিন্তু নাটকে সাহিত্যগুণ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আর যদি নাটকে নাট্যগুণ ও সাহিত্যগুণ একসাথে মিলেমিশে সমন্বয় স্থাপন করে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এবং তাতে নাটকের কদরও বেড়ে যায়। তখন নাটক আর শুধুমাত্র মঞ্চের সামগ্রী থাকে না, পাঠকের হৃদয়ে জমিয়ে রাজ করে। কোন নাটকের দর্শকের সংখ্যাকে যখন পাঠকের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় তখন জোর গলায় বলা যায় তা ঘটেছে শুধুমাত্র সাহিত্যগুণের জন্যই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের সংখ্যা নেহাত কম নয় এবং সেগুলির সাহিত্যমূল্যও অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে তার ‘রক্তকরবী’-নাটকের নাট্যগুণ ও সাহিত্যগুণ উভয় দিক থেকেই উপভোগ্য। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ সেটাই এই নাটকে মূল দ্বন্দ্বের স্থান করে নিয়েছে।

'রক্তকরবী' নাটকের বারোটি পাণ্ডুলিপির পরিচয় আমরা পেয়েছি। প্রতিটি পাণ্ডুলিপিতে লক্ষ্য করা গেছে নানানতর পরিবর্তন। পরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা গেছে যে এই পরিবর্তন নাটকের সাহিত্যগুণকে অনেক মাত্রায় বাড়িয়ে তুলেছে। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে, যেমন- এই নাটকের প্রথম পাঠে যার নাম ছিল খঞ্জন/খঞ্জনা। পরবর্তী যে খসড়া প্রকাশিত হয় সেখানে প্রথমে সে হয়েছে 'সুনন্দা' এবং তার ওপরে সংশোধন করে হয়েছে 'নন্দিনী'। নায়িকার নাম পরিবর্তনেও এক অসাধারণ আধুনিকতা লক্ষ্য করা গেছে। সুনন্দা ও নন্দিনী নামের মূল অর্থ এক, অর্থাৎ আনন্দদায়িনী। কিন্তু নন্দিনী অনেক বেশি শ্রুতি মধুর। নন্দিনী নামের মধ্যে আছে এক অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আনন্দহীন পরিবেশে সে যে এক বিপুল পরিবর্তনে এনেছে, তাতে নন্দিনী নামটি সার্থক হয়ে উঠেছিল। নাটকের নামকরণেও সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের প্রথমে নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। চতুর্থ খসড়ায় নাম হলো 'নন্দিনী'। পরবর্তীকালে 'রক্তকরবী', রক্তকরবীর প্রথম প্রকাশ প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩১ -এর আশ্বিনে, এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ -এ, (১৯২৬ -এর ডিসেম্বরে)। প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন,

"যক্ষের ধন মাটির নিচে পোঁতা আছে, এখানকার রাজা পাতালে সুরঙ্গ খোদাই করে সে ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমজদার লোকেরা যক্ষপুরি বলে।"[১]

যক্ষপুরি হলো পাতালপুরী সেখানে অত্যাচার আর উৎপীড়নের শেষ নেই। এই ভয়ংকর রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ তো পাতালপুরীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেননি, বরং সেখানে সম্পদের লোভে মানুষের উপর মানুষের অমানবিক অত্যাচারের নিন্দায় করেছেন। মাটির উপরে পাকা ফসলের ঘ্রাণ আর গানকেই তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। সেখানে রয়েছে আনন্দ হাসি ও প্রাণের অফুরন্ত মেলা।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-র যক্ষপুরী আসলে এক যন্ত্রপুরী। সেখানে মাটির নিচে সুরঙ্গ খুঁড়ে সোনা সংগ্রহ করা হয়। সে কাজের সাথে যুক্ত আছে অসংখ্য খনি শ্রমিক। তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। না আছে কথা বলার স্বাধীনতা, না আছে কাজকর্মের স্বাধীনতা, না আছে চলাফেরার স্বাধীনতা। তাদের আছে শুধু এক একটা সংখ্যা যা দিয়ে তাদের চেনা যায় । 'রক্তকরবী' রচনার কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ, আমেরিকায় ভ্রমণকালে যন্ত্র সভ্যতার যে দানবীয় রূপ দেখেছিলেন তাতে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। পুঁজিবাদী সমাজ ও ধনবাদী সভ্যতার শোষণ পীড়নের ভয়াবহতা তাঁর চোখের এড়িয়ে যায়নি। একটি রচনায় কবি তাঁর মনের কথাটি জানিয়েছেন-

"আমেরিকায় অবস্থানকালে যন্ত্রসংঘ সমূহ ব্যক্তিগত মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে প্রকাণ্ড পদ্ধতিপিন্ডের মধ্যে সঙ্গত করিয়া, প্রচন্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল। এবং সে সম্বন্ধে দু একটি কথা আমি কয়েকবার বলিয়া ছিলাম- মানুষের সঙ্গে মানুষের

সম্পর্ক, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং মানুষ ধীরে ধীরে এই যন্ত্রেরই অংশ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রান শক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জনশক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে। কারণ জড়শক্তি অন্য সকল বিচার বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনে দ্বিধাহীন নির্মম গতিতে অগ্রসর হয়।”[২]

কবি ‘রক্তকরবী’-তে ও উল্লেখ করেছেন যে যন্ত্রের কাছে মানুষের কোন মূল্য নেই। এই যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ। তার শাসন ব্যবস্থা অতি কঠোর। আর সেই শাসন ব্যবস্থাকে ছিদ্রহীন করতে সে বড় সর্দার, মেজো সর্দার, ছোট সর্দারকে নিযুক্ত করেছে। তাদের নিচে রয়েছে মোড়লেরা। এই মোড়লদের সাথে রয়েছে শ্রমিকদের সরাসরি যোগাযোগ।এবং যক্ষপুরীর চারিদিকে রয়েছে রাজার গুপ্তচর। যক্ষপুরীর এই বৃত্তান্তটিকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যগুণান্বিত ও সাহিত্য গুণান্বিত করে তুলেছেন।

গ্রামের শান্ত শীতল ছায়া ছেড়ে চাষিরা মুনাফা লোভীদের গ্রাসে পড়ে নামহীন, পরিচয়হীন মজুরে পরিণত হলো। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন প্রাণোচ্ছল নন্দিনী ও যৌবনের দূত রঞ্জন জাল ছেড়ে আত্মপরিচয়হীন মানুষের সামনে মুক্তির দিশা দেখাতে পারবে। এবং পরিশেষে বন্দিশালা ভেঙে শুরু হল মানুষের ছোটাছুটি। সে যেন এক মিছিল। সবার মুখে একটাই আওয়াজ। ‘জয় নন্দিনীর জয়’। নাটকের রাজা এখানে একজন মানুষ। যার একদিন যৌবন ছিল, আজ নেই। তার কষ্ট রাগ উদ্ভ্রান্তি এসব নিয়ে তাকে একটা মানুষের রূপের মধ্যে ধরেছেন নাট্যকার। একবার যদি বোঝা যায় যে যক্ষপুরীর আজকের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি সম্ভব হয়েছে এই রাজার জন্য এবং তাই সে যক্ষপুরীরর রাজা, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। পৃথিবীর বুক চিরে তো এখানে সোনা আনা হয় না, এখানে আনা হয় এমন জিনিস যা পৃথিবী বহুদিন ধরে কবর দিয়েছে। সেই সম্পদকে লোভের বসে, প্রকৃতির জিনিস কেড়ে নেওয়া তো এই যন্ত্রযুগের প্রধান লক্ষণ। তবুও যে যৌবনের জোরে রাজা একদিন এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিল হয়তো এই জন্যই নন্দিনীর তাকে ভালো লাগে। কিন্তু নন্দিনী চাই রাজার এই শক্তি সোনা তোলার কাজে নয়, নতুন সভ্যতা গড়ার কাজে লাগুক। এক্ষেত্রেও নাটকের পরতে পরতে নাট্যগুণের সাথে সাহিত্যগুণেরও ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক যখন আমরা পড়ি অর্থাৎ আমাদের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি তখন দেখি যে সংলাপ গুলো একইসঙ্গে দুটো স্তরের দিশা দেখায়। এক,আজকের বাস্তবকে একেবারে কাছ থেকে দেখা, আর দুই, একটু দূরত্ব এনে তাকে যেন প্রতীকের আভাসে দেখা। রবীন্দ্রনাথের আঁকা চরিত্রগুলি ও ঠিক তাই। বিশু পাগল, নন্দিনী, এরা সব জীবন্ত মানুষও বটে। কিন্তু মাঝে মাঝে এরাই সব কোথায় যেন আমাদের ভাবনায়, অনুভবের মধ্যে এসে আর একটা দরজা খুলে দেয়। যেখান দিয়ে আমরা দর্শকরা পাঠকরা জীবনের সত্যের আর একটা পথ খুঁজে পায়।

'রক্তকরবী' প্রাণের প্রতিক। যে যক্ষপুরীতে প্রাণের কোন মূল্য নেই, সেই যক্ষপুরীতে সকলের অগোচরে একান্তে প্রস্ফুটিত হয় রক্তকরবী। যেখানে মূল্যহীন প্রাণেরও জয় ভূষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখেছিলেন -

"হাজার বাঁধনে বেঁধেও শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহা লক্কর জাতীয় আবর্জনার স্তুপ ছিল। তার নিচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময় দেখতে পায়নি। পরে লোহা গুলি সরিয়ে আর চারা টুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ওই লোহার জাল- জঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো সে বললে, ভাই মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? এখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রবল বেদনা ছিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী', 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার তৃপ্তি হয়নি। তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যে পরিষ্কার যে, কেন 'রক্তকরবী' তার কাছে এতটা প্রাসঙ্গিক।

সাহিত্য শিল্পকলায় একমাত্র আমাদের আপাদমস্তক সর্বাগ্রে জাগিয়ে তুলতে পারে যাতে আমাদের মনকে সবসময়ই জাগিয়ে রাখতে পারে আমাদের মনকে আরো গভীর করে তুলতে পারে। আমাদের অনুভবকে প্রখর করে দিতে পারে কিন্তু আমাদের চারপাশে যে সমাজ ব্যবস্থা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং যে প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থা চলছে তাতে আমাদের এই জাগ্রত ভাবনার বিস্মৃতি খর্ব হচ্ছে মানুষের ভাববার চেষ্টা কে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যাতে কারোর মনে কোন নীতির প্রতি কোন মর্যাদা বোধ না থাকে যাতে স্বার্থের ওপরে কোন মহৎ কিছুতে কারোর কোন বিশ্বাস না থাকে, সবটাই চলবে যন্ত্র দ্বারা, যান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যস্ত হব আমরা সেই চেষ্টা আজও চলছে। কিন্তু 'রক্তকরবী' কত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আজকের সমাজ ব্যবস্থার কথা সাহিত্যের মাধ্যমে জানিয়ে গেছেন এও এক আশ্চর্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে একটি পত্রিকায় শাঁওলী মিত্র তার একটি লেখায় লিখেছেন-

"সংগঠিত শক্তির সামনে ব্যক্তিগত মানুষের অবমাননা রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তার যক্ষপুরীতে। তিনি আশা করেছিলেন যে মানুষের অদম্য প্রাণশক্তিই তাকে বাঁচাবে।"[৪]

আমাদেরও সেই আশা আছে বলেই আজও 'রক্তকরবী' সমান প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও দর্শক ও পাঠকের হৃদয়ের অন্তরে বাস করছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির ধারা যেমন কেবল বদলাতে বদলাতে চলে তার মূল পরিণতির দিকে, ঠিক তেমনি তিনি তার সৃষ্টির মতো তার রচনাকেও বদলেছেন বহু ক্ষেত্রে বহুবার। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের প্রচলিত বর্তমান সংস্করণের পিছনে রয়েছে নানা সংস্কার অথবা সংযোজনের ইতিহাস। বারবার বদলে

লিখেও যেন তৃপ্তি হয় না নাট্যকারের। সে প্রমাণও দিচ্ছে 'রক্তকরবী'। নামকরণে রক্তকরবীকে বহু লোকে বহু জায়গায় রূপক সাংকেতিক নাটক বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এসবের পরে স্বয়ং নাট্যকার এই নাটককে সত্যমূলক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। রঞ্জন নন্দিনীর প্রেমিক, ভালোবাসা তার অহংকার, প্রেরণা। রঞ্জন দুরন্ত যৌবনের প্রতিক। রবীন্দ্রনাথ রঞ্জন কে রাজার যোগ্য প্রতিযোগী করে তুলেছেন এই নাটকে। যা রঞ্জনের স্পর্ধা বাড়িয়ে তুলেছে। এবং সাহিত্যের কৌশল অনুযায়ী রঞ্জন রাজার থেকে সাহসী, উজ্জ্বল, শক্তিমান। রঞ্জনকে ঘিরে পাঠকের মনে নানান কৌতূহল তৈরি হয় আর এখানেই নাট্যকার তার শিল্পী মনের কাজ দেখিয়েছেন যা রবীন্দ্রনাথের আলাদা বৈশিষ্ট্য, বিশেষ গুণ।

নাটকের নন্দিনীর আবির্ভাবের পর যক্ষপুরীতে তার ভূমিকা নাট্যকার ক্রমশ প্রকাশ্য করেছেন। সে যে সবার থেকে আলাদা তা বোঝা যায় প্রতিমুহূর্তে। প্রাণহীন যক্ষপুরীর অভ্যস্ত জীবনে নন্দিনী ঘা মেরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফলে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব। সাহিত্য গুনে পরিপূর্ণ হতে গেলে যে সাহিত্য কৌশল অবলম্বন করতে হয় তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। নাটকের রাজা ও নন্দিনীকে নাট্যকার অন্য তুলি দিয়ে এঁকেছেন। নন্দিনী মুক্ত পাখি। অন্ধকার যক্ষপুরীতে সে আলোর বার্তা বহন করে এনেছে। রাজা মহাশক্তিমান। বিপুল সম্পদের অধিকারী। কিন্তু তার জীবন আনন্দহীন। সর্বনাশা সোনার নেশায় আচ্ছন্ন। নন্দিনীর প্রতি রাজার উক্তিতে যে বেদনা নাট্যকার প্রকাশ করেছেন তা মনে দাগ কেটে রয়ে যাবে বহুকাল।

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে চলাচলে বাধা পায় তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রণার প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ নিজের সৃষ্টি করা আঘাতে কেবলই পীড়া দেয় ,পীড়িত হয়। পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে নিষ্ঠুর সংগ্রহকে চেষ্টার তাড়নায়। প্রাণের মাধুর্য, সৌন্দর্য সেখান থেকে বিতাড়িত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি, মানুষ ভুলেছে যে প্রতাপের মধ্যে কোন পূর্ণতা নেই। পূর্ণতা আছে প্রেমের মধ্যে। সেখানে মানুষকে দান করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে বারবার। সম্পর্কে এইরকম ব্যাখ্যা অনেকেই নিজেদের প্রয়োজনে যখন যার যেরকম মনে হয়েছে রক্তকরবী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন এটা যন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃতির লড়াই, কেউ বলেছেন শিল্প বনাম কৃষির লড়াই, কারো কারো মতে লড়াই টা মূলত শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের। এটাই ঘুরিয়ে আবার কেউ কেউ দেখিয়েছেন শোষকের সাথে শোষিতের সংঘাত।

যে নাটকে সত্য অনুভব নানা রঙে, নানা ছন্দে বর্ণিত সেই নাটকে নতুন করে আবিষ্কার করবার পরিসর ও সময় সীমাবদ্ধ নয়। আজও এখনো 'রক্তকরবী' থেকে অমূল্য রত্নরাজি আবিষ্কার করে চলেছে পাঠককুল। এই নাটকে সমাজের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যে বর্ণনা আছে তা কোন বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের সমাজের বর্ণনা নয়। ১৯২৪ সালের রচিত এই নাটক যে কোন যুগের, যেকোনো কালের কাহিনী। আজ অর্থাৎ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও এ কথার সত্যতা যেন আরো বেশি করে অনুভব করতে পারি আমরা। ‘রক্তকরবী’ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালেও বহু কথা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, আজ তারপরও বহু বছর কেটে গেলেও হয়তো আজকের প্রজন্মও এই নাটকটির সূত্র ধরে নতুন কোন দিগন্তের সন্ধান করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। হয়তো তারাও ‘রক্তকরবী’ পড়ে আবিষ্কার করেছে যে রবীন্দ্রনাথ আজও কত আধুনিক। এই নাটককে আধুনিক করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হবার কোন প্রয়োজনই পড়ে না । মূল্যবান এ আকরগ্রন্থ ‘রক্তকরবী’ সারা জীবনের সেরা সময়ের অভিজ্ঞতার দলিল হয়ে রয়ে যাবে। সংগঠিত শক্তির সামনে ব্যক্তিগত মানুষের অবমাননা রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তার যক্ষপুরীতে তিনি আশা করেছিলেন যে মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি তাকে একদিন ঠিক বাঁচাবে। এবং সেই আশাতে বেঁচে আছি আমরা আজও।

সমালোচকরা যতই নাটকটিকে রূপক সাংকেতিক অভিধা দিয়ে থাকেন না কেন, নাট্যকার নাটকটিকে সত্যমূলক বলেই অভিহিত করেছেন, যা আমরা আগেও বলেছি। নাটকটি সমাজ ও বাস্তব আশ্রয়ী নাটক। আজ যে বিশ্ব পুঁজির জোরে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে যদি কোন একটি নন্দিনী থাকে তবে সেখানে অন্ধকারে আলোর সঞ্চার হবেই। রবীন্দ্র নাটকে জীবনের স্পন্দন তো পাওয়া গেছে কালের মাত্রায় ও প্রতিনিয়ত বদল হওয়া সামাজিক চর্চায়। আসলে যে ধারাবাহিকতাকে আমরা একমাত্র পথ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছি, রবীন্দ্রনাটকের স্রোত সেখানেই পথ বদল করতে চেয়েছে বারবার।এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় - “তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপর দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।”[৫] রক্তকরবী নাটকটি নিঃসন্দেহে নাট্যগুণান্বিত। সেই সাথে সাহিত্যগুণান্বিতও বটে। তাই এই নাটক মরীচিকার মতো ভুলিয়ে নিয়ে বেড়ায় নিজেকে আর খুঁজে পেতে দেয় না। পরিশেষে এটুকুই বলার, এ নাটক বারবার পড়তে হয়, পড়তে ভালো লাগে, পুরনো হয় না।

তথ্যসূত্র:

১) ‘রক্তকরবী’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৩৩, প্রস্তাবনা পৃষ্ঠা:১।
২) ‘রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক’ - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা:২২৩।
৩) ‘রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ’ - প্রমথনাথ বিশী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা:২৬০।
৪) ‘রক্তকরবী, মানুষের বাঁচবার স্বপ্ন’- শাঁওলী মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ, মে সংখ্যা, পৃষ্ঠা:৭৪।
৫) ‘রক্তকরবী’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৩৩,পৃষ্ঠা:৪৬।

জীবনের বহুমাত্রিক বর্ণমালায় যাযাবর সম্প্রদায় এবং কয়েকটি বাংলা উপন্যাস

তনিমা দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারাংশ: যাযাবর শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'নিয়ত ভ্রমণকারী' বা ভবঘুরে এক সম্প্রদায় যারা নির্দিষ্ট এক জায়গায় বসবাস করেনা, নানা স্থানে, দেশে ঘুরে বেড়ায় আর বেছে নেয় বিচিত্র সব পেশা, অর্থাৎ নিরন্তর ছুটে চলা এক জীবনের পথিক হলো যাযাবর।বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির বেশ কিছুটা জুড়ে আছে এই যাযাবর সমাজ। কিংবদন্তী বলে দেবতাদের অভিশাপেই নাকি এরা হয়েছে উন্মূল।যাযাবর জীবনেই এদের পরিচয়। আজ এখানে, কাল ওখানে, আজ এ ঘাটে, তো কাল অন্য ঘাটে। যাযাবর জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি। রয়েছে নিজস্ব জীবনবোধ ও স্বকীয়তা।তবে এখন এদের জীবিকায় লেগেছে টানাপোড়েন।আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ধারা থেকে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই ধারাটি।কিন্তু তাই বলে এদের নিয়ে কমেনি কৌতূহল।তাই এই লেখার উদ্দেশ্য বাংলা কথাসাহিত্যে গৃহহীন যাযাবরদের যাপিত জীবন এবং জীবনের বহুমাত্রিক বর্ণমালা।
সূচক শব্দ: যাযাবর, নিয়ত ভ্রমণকারী, ভবঘুরে সম্প্রদায়, উম্মূল, গৃহহীন, জিপসি, বেদে, বাজিকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি, বিলুপ্ত, বহুমাত্রিক বর্ণমালা।

মূল আলোচনা:

উপনিবেশোত্তর কালে আধিপত্যবাদী বর্গের চাওয়া-পাওয়া নিয়েই আবর্তিত হয় সাহিত্য-শিল্প। কিন্তু স্রোতের মধ্যেই প্রতিস্রোতের মতো জন্ম নেয় আধিপত্যের দর্পকে চূর্ণ করার বাসনা। আদিতে নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের মিলিত উপস্থিতি যে লক্ষ্য করা যায়নি তা নয়। ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে হলেও বিশাল গণ-জীবনের এক নিখুঁত সার্বিক চিত্রাঙ্কন আমরা চর্যাপদের মধ্যে খুঁজে পাই। আর মধ্যযুগের সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনাচরণ ধর্মের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর পর্ব থেকে ‘মঙ্গলকাব্য’-এর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চৈতন্যদেবের ‘মানবধর্ম’-এ অভিষিক্ত হয়ে লোক সাহিত্যের সপ্তরঙা জীবনের বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ হয়ে সময় ও সমাজের অনিবার্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁক ফেরায় আধুনিক কালের কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবনের অজস্র বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের পালা অতিক্রম করে আসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্য দিয়ে আমরা ব্রাত্যজনের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম চৌধুরী প্রমুখ জেলে-জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখার মধ্য দিয়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-য় 'কাহার' নামে প্রান্তিক মানুষদের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তেমনি 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে ক্রোশ ক্রোশ বিস্তৃত হিজল বিলে ছড়িয়ে থাকা বেদে সমাজকে নিয়ে তাদের বিশ্বাস ও জীবনচর্যা অনুপুঙ্খভাবে অঙ্কন করেছেন। সুবোধ ঘোষের 'শতকীয়া', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞিের জীবন ও মৃত্যু', 'অরণ্যের অধিকার' 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর', দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃতান্ত', প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নীচে মানুষ', বুদ্ধদেব গুহর 'কোজাগর', ভগীরথ মিশ্রের 'তস্কর', 'আড়কাঠি', 'চারণভূমি'-র ভরকেন্দ্রে রয়েছে প্রান্তিক মানব; সমাজের মূল স্রোতের বাইরের মানুষজন। অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর গোষ্ঠীকে নিয়ে লেখা। এছাড়াও রয়েছে বেদে, নলুয়া, পাখমারা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে নানা ধরনের উপন্যাস যেখানে তাদেরকেই কেন্দ্রে রেখে দেখতে চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির একটি অংশ হয়েও তারা বিধিবদ্ধ সমাজ থেকে অনেকটাই দূরে। এই বিশাল জনতাকে সমাজে মূলত 'অসভ্য' বলে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। এই অস্তিত্বহীনতার ও নৈঃশব্দ্যের পরিসরে আবর্তিত হতে থাকে 'অচ্ছুৎ' তথা অস্পৃশ্যদের জীবন। জনজীবনের মূল ধারা থেকে যাদের যোজনব্যাপী দূরত্ব। এই পর্যায়ে অস্থায়ী-ভাসমান-গৃহহীন-যাযাবর সম্প্রদায়ও পড়ে।

এক রহস্যময় জাতি হল জিপসি। দেশে-দেশে বা অঞ্চলভেদে তাদের এক এক নাম, আর বেঁচে থাকার জন্য বিচিত্র সব পেশা। উত্তর আমেরিকার যে ধরনের জীবনধারার শরিকদের জিপসি বলে, সেই জিপসিদের স্পেনে বলে গিটানো, ফ্রান্সে বলে জিটান।আসলে এরা কারা?"A Member of a wandering race(by themselves called Romany),of Hindu origin,which first appeared in England about the beginning of the 16th Century and was then believed to have come from Egypt."[১]

পৃথিবীময় এই যাযাবর জাতি ভবঘুরে জীবনের শিকলে আবদ্ধ হয়ে দুর্বিষহ গতিধারার ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে। সেই আদিকাল থেকেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এদের বিচরণ। এভাবেই কাটছে এদের দিন-মাস-বছর ও যুগ।তবে ভারতীয় যাযাবর আর ইউরোপ,আমেরিকার জিপসি এক নয়।ভারতীয় ভাষা সমূহের সমীক্ষক গ্রিয়ারসন তাঁর সমীক্ষার একাদশ খন্ডটির নাম দিয়েছিলেন 'জিপসি ল্যাঙ্গুয়েজস্'[২] সেখানের ভূমিকায় তিনি বলেছেন-শব্দটার চল আছে বলেই ব্যবহার করা হলো।তার অর্থ এই নয় যে,ইউরোপের জিপসি দের সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ রয়েছে।

আমাদের দেশেও যাযাবর সম্প্রদায় রয়েছে। এই শ্রেণির মানুষরা বেদে নামেই পরিচিত। অনেকে মনে করেন ‘বেদে’ কথাটি ‘বৈদ্য’-এর বিবর্তিত রূপ। ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ওয়াকিল আহমেদ বলেন বেদে শব্দটি ‘বাদিয়া’ থেকে এসেছে। জেমস ওয়াইজ-এর মতে সংস্কৃত ‘ব্যাধ’ থেকে বেদে শব্দটি এসেছে। আবার অনেকে বলেন ‘বেদুইন’ থেকে ‘বেদে’ শব্দের উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে বেদুইনদের কথা স্মরণযোগ্য।

আসলে এই যাযাবর হল একদল রহস্যময় মানুষ। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এরা। দেশে-দেশে বা অঞ্চল ভেদে তাদের একেক নাম, আর বেঁচে থাকার জন্য বিচিত্র সব পেশা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটো গল্প ‘বেদেনী’-তে বেদে সম্প্রদায়কে বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

‘বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসাপূজা করে, মঙ্গল চণ্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। হিন্দু-পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। বিবাহ আদান প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়।’

আশুতোষ ভট্টাচার্য সাপুড়েদের সম্পর্কে বলেন -"হিন্দু সমাজে এরা পতিত,মুসলমান সমাজেও এদের ঠাঁই নেই।"(৩)

বেদেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি নৃ-গোষ্ঠী। সাপ এবং সর্পজ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদের কারবার। নিজেদের মধ্যে জাত-পাতের তেমন কোনো বিভাজন নেই, তবে পেশাগত কারণে কিছু বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির অনেকটা জুড়ে আছে এই বেদে সমাজ। গল্প, কবিতা, উপন্যাস থেকে শুরু করে সেলুলয়েডের পর্দায় কত রূপে বেদে-বেদেনি উপস্থিত রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। বেদেদের ফেলে আসা রোমহর্ষক দিনগুলি এতদিন পাঠকের পড়ার টেবিলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বেশ কিছু সাহিত্যিক সাহিত্যের অতীতের সেসব শাশ্বত বেদে-কাহিনীকে নিয়ে আবার উপন্যাস লিখছেন এবং নাট্যকার পরিচালকরা তাদের নিয়ে আবার ভাবতে শুরু করেছেন। এমনকি তা নাটকের মঞ্চেও বেশ সমাদৃত হচ্ছে।

যাযাবরদের জীবনধারায় রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি। রয়েছে নিজস্ব জীবনবোধ ও স্বকীয়তা। আমার আলোচনার বিষয় এখানে সেই সমস্ত উপন্যাস যেখানে এই অস্থায়ী, ভাসমান, গৃহহীন যাযাবরদের যাপিত জীবনের প্রতিফলন রয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে যে-উপন্যাসগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল অভিজিৎ সেন-এর ‘রহু চণ্ডালের হাড়’। উপন্যাসটিতে এক শ্রেণির যাযাবর গোষ্ঠী বাজিকরদের পাঁচ পুরুষব্যাপী দেড়শো বছরের জীবন সংগ্রাম এবং একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়ের ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় টুকরো টুকরো ভাবে উঠে এসেছে। উপন্যাসের বিষয়ের মধ্যেই আছে নিরীক্ষা। পশুচুরি, দখল,

জাদু, ভানুমতীর খেল প্রভৃতিকে নিয়ে প্রতিকূলতার সঙ্গে জীবন রক্ষা ও ভবিষ্যতের আশা, স্বপ্নের পথে যাত্রা বাজি ধরারই নামান্তর।

উপন্যাসের বাজিকর হয়তো জাত যাযাবর, তবুও পুরোনো রক্তের স্মৃতি ও দোষে গেরস্থালি নিয়ে স্থায়ী বসবাসের স্বপ্ন অবচেতনে হলেও বাজিকরের আছে। উত্তরবঙ্গের কোনো এক যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠীর জীবনযাপনের প্রামাণ্য ইতিহাস চিত্র নয়। বরং এই উপন্যাসে উন্মোচিত জীবন-কাহিনী মানব সমাজ ও সভ্যতার রূপ-রূপান্তরের রূপক কাহিনী হয়ে ওঠে। উপন্যাসের পাঁচ পুরুষ বা দেড়শো বছরের বিস্তৃত সময়ে বিনাশহীন, ভূমিহীন, গৃহহীন, ধর্মহীন মানব গোষ্ঠীর এক অংশের যাত্রা; যাত্রার লক্ষ্য ঠিকানা খোঁজা ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা। এ-যাত্রায় আছে পরিশ্রম, কৌশল, লোক-ঠকানো, চুরি, আছে প্রেম, প্রেমে ব্যর্থতা, খুন, সরকার, প্রশাসন, জোদ্দার, লাঠিয়াল, কৃষক—কত মানুষ।

'বাজিকর' বিষয়টাও যথার্থ দ্ব্যর্থময়। প্রতিকূলতার মধ্যে জীবন রক্ষা, আশা ও স্বপ্নের ভবিষ্যতের পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা—একরকম বাজি ধরাই। জীবনকে বাজি রেখেই জীবনকে বয়ে চলে এরা। যাযাবর বাজিকরদের আধার করে আবহমানের গল্পই ঔপন্যাসিক লিখেছেন এ-উপন্যাসে।অভিজিৎ সেন রহু ও তার উত্তরসূরিদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা, তাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-দৈন্য ও সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন এই উপন্যাসে। শিকড়বিহীন যাযাবর গোষ্ঠীর থিতু হওয়ার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যায় রহু চণ্ডালের হাড়। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসে সাঁওতালরা। তারা জমির স্বপ্ন দেখায়—কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় বারবার। দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদেরকে টেনে নিয়ে আসে পুবে, আরো পুবে। কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কখনো মানবসৃষ্ট সমস্যা তাদের দিশেহারা করে দেয়। মানুষ যখন সান্ত্বনা খোঁজে—কেউ ভগবানের কাছে, কেউ আল্লার কাছে তখন বাজিকররা তাকিয়ে থাকে অতীতের পানে। কেননা তাদের তো কোনো আশ্রয় নেই—না ভগবান, না আল্লা, না যিশু। রহুই তাদের আরাধ্য। তাদের পিতৃপুরুষ। তারা সান্ত্বনা খুঁজেছে কেবল রহুর হাড়ের কাছে। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ সাধারণ মানুষের অলিখিত ইতিহাসের সন্ধান যেমন মেলে তেমনি ভৌগোলিক সম্প্রসারণও নজরে আসে। বাজিকরদের কোনো স্থিতি নেই। গোরখপুর থেকে আরো পুবে পাঁচবিবি পর্যন্ত তাদের কেবল স্থান বদল হয়। প্রতিবারই তাদের মনে হয় এটা তাদের দেশ; এই তো তাদের স্বপ্নের নিকানো উঠান। কিন্তু হায়! সেই স্বপ্ন প্রতিবারই অধরা থেকে যায় দনু, পীতেম কিংবা লুবিনিদের কাছে।'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ এই আক্ষেপ আমাদের সামনে স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলোকে কত গভীরভাবে দেখেছেন তার পরিচয় পাই 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে। প্রত্ন প্রাচীন এই বেদে সমাজের বাস চম্পাই নগরের সাঁতালী পাহাড়ে। ওঝাগিরি, মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক এসব করে তারা। 'নাগিনী কন্যা'র কোনো প্রথা বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নেই। এ

কাহিনী কাল্পনিক। উপন্যাসে মনসামঙ্গলের সাঁতালী আর হিজল বিলের সাঁতালীর মধ্যে আশ্চর্য যোগ তৈরি হয়। চাঁদ সওদাগরের যুগে বিষবেদের পূর্ব পুরুষরা ছিল বিষবৈদ্য। শিববৈদ্য ছিল চাঁদ সখাধন্বন্তরী। ধন্বন্তরীর ওপর দায়িত্ব ছিল লখিন্দর বেহুলার বাসর ঘর পাহারা দেওয়ার। কিন্তু ধন্বন্তরী ব্যর্থ হয়। চাঁদো বেনের অভিশাপ মাথায় নিয়ে বিষবৈদ্যরা পতিত ও অস্পৃশ্য হয়ে বিষবেদে হয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখায় নাগকন্যা।–'চাঁদের আজ্ঞায় তোমাদের বাসভূমি গিয়েছে, মা বিষহরির আজ্ঞায় তোমরা পাবে নতুন বাসের ঠাঁই। ... তোমরা জাতি নিলে, কুল নিলে চাঁদ, মা বিষহরি তোমাদের দিলেন নতুন জাত, নতুন কুল। ... আর, আমি... ঝাঁপিতে থাকা নাগিনী মূর্তিতে,... তোমার ঘরের সত্যিকারের কন্যে হয়ে জন্মাব।'[৪] এরপর বেদেদের সেই নাগিনী কন্যাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ভাগীরথীর কূলে, এই হিজল বিলে—মা মনসার স্থানে।

মিথের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বেদে জনগোষ্ঠীর চিরায়ত রূপটি তুলে ধরেছেন লেখক। বেদে সমাজে সর্দার প্রথা প্রচলিত। সর্দারগণ একছত্র ক্ষমতার অধিকারী। নাগিনী কন্যার কাহিনিতে মহাদেব-গঙ্গারাম গোষ্ঠীপ্রধান। নিম্নবর্গের বেদে সমাজের সমাজপতি শিরবেদের যুগ যুগ ধরে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে তারই সমাজের অধস্তন নারীকে। সত্যিকার ইতিহাসটুকু তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। নাগিনী কন্যারা এখানে বেদেনির প্রতিভূ।

প্রফুল্ল রায়-এর 'নাগমতী' উপন্যাসে আছে বেবাজিয়া সম্প্রদায়ের কথা। যারা তাদের অজানা পূর্বপুরুষের যাযাবর জীবনকে নিজেদের আশায়, ভরসায়, গ্লানি-বেদনায় এখনও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রাখে। ময়ূরপঙ্খী নৌকায় তারা আসে, কিন্তু কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই বালিহাঁসের ঝাঁকের মতো কোনো ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশে উধাও হয়ে যায়। এই যে ভাসমান বেদে-বহর, প্রাক্-পুরুষের ক্ষয়িত একটি অংশের মতো এই বেবাজিয়া মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

সাত্যকী হালদারের 'বনপরব' ও শুভঙ্কর গুহ-র 'বিয়োর' উপন্যাসগুলি এ আলোচনায় অবশ্যই অপরিহার্য উপাদানের জোগান দেয়। পাখমার ও মাগান্তা ক্ষীয়মাণ হতে হতে দুটি পেশাই আজ অবলোপনের পথে। হারাতে বসা এ-পেশা দুটি এই সাহিত্যিকদের লেখায় আবার সামনে এসেছে। ক্রমশ সমাজ যত নাগরিক হয়েছে, দূরত্ব কমেছে নাগরিকতা-গ্রামীণতায়। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। পেশাজীবী মানুষগুলি বেঁচে থাকার তাড়নায় পেশান্তরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কখনো বা গিয়েছে স্বেচ্ছায়।

'বনপরব' উপন্যাসটিতে প্রাত্যহিক নাগরিকতার বাইরে এমন এক জীবনকে দেখানো হয়েছে, যে জীবন নিজেই বয়ে চলে। সে কারো অপেক্ষা করে না। লালমাটির দেশে সে জীবন টুসু গান গায়, জঙ্গলে পাখি ধরতে চায় আবার কখনো দেশ ছেড়ে ভিন দেশে কাজের খোঁজে চলে যায়। বাঁকুড়া জেলা ও তারই সংলগ্ন পুরুলিয়া, মেদিনীপুর—এই বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে তৈরি এই আখ্যান। জঙ্গলের ভেতর ছড়ানো-ছেটানো দশ-বারো ঘর পাখমারার বাস। ভোটার লিস্ট-এ যাদের নামের পাশে লেখা থাকে দশ-

বারো ঘর পাখমারার বাস। ভোটার লিস্ট-এ যাদের নামের পাশে লেখা থাকে 'নোলে'। তারা গোলাকার সরু করে কাটা বাঁশের নল পর পর গেঁথে পাখি ধরত। অবিরত নানা সময়ের মধ্য দিয়ে এ-গ্রাম পালটাতে থাকে।লেখক দেখেছেন এই পাখমারা বা নোলেদের সংগ্রামী জীবনকে খুব কাছ থেকে। চাষবাসের কাজে মজুর হিসাবে নোলেদের তখনও লাগাতে চায় না অনেকে। জয়পুর-বেলেশুলে যে অল্পস্বল্প জমি সেখানেও কাজ পায় না এরা। ফলে আড়কাঠি মারফত দূরে যাওয়ারও প্রশ্ন থাকে না। এলাকায় জমিজিরেতের মালিক যারা, এমনকি অন্যান্য লোকও এদের খানিকটা ঘুরে বেড়ানো যাযাবর গোছের মানুষ হিসাবে দেখে। এক-দেড় পুরুষ আগেও এরা ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যখন পাখি ধরতে আসত ছোটোখাটো কাজের কথা বললে এড়িয়ে চলে যেত। যারা দু-একজন পরের দিকে চাষের কাজে দিনমজুরি করতে এসেছে, তাদের নিয়ে দেখা গেছে মাঠের কাজে এরা মোটেই পটু নয়। ধানবাছা, ধানরোয়া বা ঝাড়াইয়ের মতো চেনা কাজেও কোনো গোছানো ভাব নেই। এক কাজ করতে এসে গুলিয়ে ফেলে অন্য কাজ করে বসে। পাশাপাশি কাজ জানা অন্যান্য লেবারদের থেকে তাই সরে আসতে হয় এদের।

যদিও তারপরে ঘরে ফেরেনি এরা। জঙ্গলে ফেরত আসেনি। গোঁফের দাগ ফুটে ওঠা বা আরও খানিক বড়ো ছেলেরা কাজ খুঁজতে কোথায় কোথায় চলে গেছে তার কোনো দিকদিশা নেই। অনেকের খবরও নেই অন্যদের কাছে। কেউ শোনা যায় বিষ্ণুপুর স্টেশনে মুটেগিরি করে, আবার কেউ কোতুলপুরে গিয়ে কানা পাঞ্জাবির দোকানে নাইট শিফটে প্লেট ধুয়ে দেয়। কেউ জয়পুর বাস স্ট্যান্ডের কোণায় নড়বড়ে চায়ের দোকান খোলে, যদিও কাজের অগোছাল ভাবের জন্য তেমন লোকজন সেখানে আসে না। এভাবেই চলে নোলেদের জীবন।

সাপুড়িয়াদের জীবনদর্শন, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণেই তৈরি হয় 'বিয়োর' উপন্যাস। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামের বেদে-পাড়া লেখককে অভিভূত করে। তিনি ভূমিকায় লেখেন—সাপ নয়, সাপুড়িয়াদের জীবনদর্শনই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সাপুড়িয়াদের অনন্ত যাত্রাই এই উপন্যাস রচনার উদ্দীপক। এই মাগান্তারা বিচরণ করতে করতে সাপ খোঁজে, সাপের বাঁচা-মরার সন্ধান নেয়। বেদেদের এই অন্তহীন যাত্রা ও তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া টানাপোড়েন নিয়ে সমৃদ্ধ হয় এই উপন্যাস। ভাগ্যের খোঁজ পেতেই যাযাবর জাতি পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। স্থিতির স্বাদ নেওয়ার অমোঘ আকর্ষণে যাযাবরদের যে অন্তহীন সংগ্রাম তার বিরাট ক্যানভাস 'কাঁচামাটির বিগ্রহ'। মোসাদ্দেক আহমেদ বিন্দী নামক ক্ষুদ্র যাযাবর গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনাচার নিবিড়ভাবে দেখেছেন। সেই দেখার ফল এই সাহিত্য। এসব প্রান্তিক মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির ডিটেল ছবি আছে এই উপন্যাসে; সেই সঙ্গে আগ্রহ তৈরি করে যাযাবর জীবনের শিকড় সন্ধানের।

ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' উপন্যাসে আছে যেমন ভেড়িয়া ভকতদের যাযাবর জীবনযাত্রার কথা, তেমনি 'ঐন্দ্রজালিক' উপন্যাসের প্রথম পর্বে আছে শল্লর জীবনকথা। যেখানে দেখা যায় জীর্ণ পটবাসের মধ্যে শতছিন্ন শয্যায় শুয়ে শল্ল। পাশাপাশি রয়েছে ঐন্দ্রজালিক বাজিকর, সর্পহার, পক্ষীমার, ধনুকার, বানর, ভল্লুক প্রশিক্ষকের দল। আর কয়েকদিনের মধ্যে পটবাস তুলে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা ওদের। কোনদিকে যাত্রা করবে তা স্থিরীকৃত নয়। সে-যাত্রা খুব কঠিন ও বিপজ্জনক। এই পথের হাড়-কাঁপানো অভিজ্ঞতার কথা শুনে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় শল্লদের।

বাংলাদেশের বেদেদের নিয়ে খুব সম্ভবত আত্মজীবনীমূলক প্রথম উপন্যাস 'বেদের নৌকোয়'। উপন্যাসটি কিশোর উপন্যাস হলেও এখানে পূর্ববাংলার জল-বেদেদের নানারকম রীতিনীতি উঠে এসেছে; যা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এখানে বিবেচ্য। একটি কল্পনাপ্রবণ দুঃসাহসী বালক, হঠাৎ সুযোগ পেয়ে জল-বেদেদের নৌকায় উঠে পড়ে। পূর্ববাংলায় এই বেদেরা আজীবন নদীতে নদীতে ভেসে বেড়ায়। একটি মাস এদের সাথে কাটাতে পেরেছিল কিশোরটি। সে যা দেখেছে, যেভাবে থেকেছে তারই অতি-মনোরম এবং রোমাঞ্চকর এই কাহিনী নিয়েই এই উপন্যাস।

অমিয় ভূষণ মজুমদার-এর 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি যেমন বিস্তৃত, তেমনি এতে এর বহু চরিত্র এবং তাদের বিচিত্র ডায়মেনশন দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ববাংলার পাবনা জেলার পদ্মা তীরবর্তী চিকন্দি, বুধেডাঙ্গা, চরণকাশি, সানিকদিয়ার গ্রাম এবং বন্দর দিঘার পটভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত। চারটি সমান্তরাল কাহিনী নিয়ে একটি সমগ্র বৃত্ত কাহিনী গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে শান্দার বেদের কথা আছে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে। এই শান্দারদের উৎপত্তির যে ইতিহাস পাই তা কনকের কল্পনাজাত। সেখানে সে লিখে রেখেছে নিজের গন্তব্য।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে রিক্ত ও নিঃস্ব মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগে বিপর্যস্ত নিম্নবর্গের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে আশ্রয় করে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে। এটি 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' বা 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর মতো গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই উপন্যাসে ভিড় করেছে। আছে মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, জমিদার, পুলিশ, দারোগা, বিপ্লবী, চাষী, খেতমজুর, শ্রমিক, চালের চোরা কারবারি শান্দার সম্প্রদায়।

দেশের এক বিপর্যয়ের মুহূর্তে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সৎ-অসৎ যে পথেই হোক রোজগারের চেষ্টাই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই বাঁচার সংগ্রামে কখনো তারা লড়াই করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কখনো মানুষের সৌখিন খেয়ালের খেলার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের বিরুদ্ধে। উপন্যাসে এই সংগ্রামে শামিল হতে দেখি গরিব চাষী, খেতমজুর, শাঁখারি, শ্রমিক ও শান্দার গোষ্ঠীকে। এই শান্দাররা বৃত্তিহীন, ভূমিহীন, নিঃস্ব যাযাবর, স্বভাব অপরাধী এরা শ্রমিক, রেল

স্টেশনের খালাসি। শান্দার সম্প্রদায়টি নিজেদের বেদেদের মধ্যে উঁচু জাত বলে মনে করে।

চিত্তরঞ্জন মাইতি-র 'কালের রাখাল' উপন্যাসে প্রথম থেকেই আমাদের নজরে আসে এক যাযাবর জাতির জীবনযাত্রার কথা। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা একটি সাদা বক্‌রির নধর বাচ্চাকে টিলার ওপর দেখতে পাই। শতরুণ্ডীর ল্যাসে ফেড় আর বক্‌রির পাল নিয়ে গত সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছে হরিচন্দ্‌। সঙ্গে দশ বছরের ছেলে অম্‌রু। এই প্রথম অম্‌রু বাবার সঙ্গে ফেড় বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে পাঙ্গী চলেছে। সামনেই সাচ জ্যোৎ (পাশ)। বেলা বেড়ে ওঠার আগেই ওদের জ্যোৎ পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। শেষ রাতে মক্‌কির রুটি পাকিয়ে খাওয়ার কাজ সেরেছে বাপ-বেটা। তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হরিচন্দ্‌ মা-মরা অমরুকে দেখে আর ভাবতে থাকে অবিকল মায়ের মুখ বসানো দশ বছরের অমরুর বাড়-বাড়ন্তের কতাহ, আর গঙ্গার মুখটা মনে পড়তেই হুঁকোর টান থেকে বুকখানা মুচড়ে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।কিন্তু নিরন্তর ছুটে চলাই যাদের জীবন তাদের তো থেমে থাকা চলেনা।তাই তাদের চলতেই হয়।

আসলে জগতে কোনোকিছুই স্থির নয়, আর এই চলার কোনো বিরাম নেই, কিন্তু নিরন্তর গতিতে চলা যাযাবর সম্প্রদায়ের এই বিচিত্র সব পেশা আজ অবলুপ্তির পথে। ক্রমশ সমাজ যত আধুনিক হচ্ছে পেশাজীবী মানুষগুলি বেঁচে থাকার তাড়নায় পেশান্তরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসে এই বদলে যাওয়া জীবনের কারণ খুঁজেছেন। তাঁদের উপন্যাসগুলিতে তেমনভাবে জীবনের সমগ্রতা ফুটে উঠেছে, যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হয় মানুষের মুখ, আলো, ছায়া, দাগ, গর্ত ও সৌন্দর্য নিয়ে। তাই আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে এখানে সেই সমস্ত উপন্যাস উঠে এসেছে যেখানে এই বিধিবদ্ধ সমাজ থেকে সরে গিয়ে অন্য একটি জীবনের খোঁজ পাওয়া যায়।

গ্রন্থ সূত্র:

১. Oxford English Dictionary(1993)

২. SIR GEORGE ABRAHAM GRIERSON Linguestic Surveyof India Vol. Xl: Gipsy Languages

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য,'বাংলার লোকসাহিত্য '১ম খন্ড

৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়:'নাগিনী কন্যার কাহিনী' চতুর্থ সংস্করণ:জুন, **১৯৬১**

দেশ বিভাগোত্তর বরেন্দ্র অঞ্চলের উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা প্রসঙ্গ রাজশাহী

সলোক হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
রাজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল ঐতিহাসিক ভাবে সংগীত সমৃদ্ধ। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভিন্ন ভিন্ন পটপরিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে বরেন্দ্র ভূমির আয়তনের তারতম্য ঘটেছে। প্রাচীনকালে কখনো বৃহত্তর অঞ্চল আবার কখনো সীমিত অঞ্চল বরেন্দ্র ভূমির বা বরেন্দ্রী নামে পরিচিত হয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ এলাকসহ গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, জলপাইগুড়ি, পূর্নিয়া ও কোচবিহারের আংশিক এলাকা প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষের উপস্থিতি, প্রতিভাবানের জন্ম রাজা-বাদশা ও শাসকদের সংগীত পৃষ্ঠপোষকাতা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংগীতপ্রিয়তা বরেন্দ্র অঞ্চলে সংগীত চর্চার পথকে সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির সংগীত চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সুলতান, রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলে সংগীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পরে এ অঞ্চলে সংগীতের উত্থান পতনের নানাবিধ ঘটনা ঘটেছে। যার অনেক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি তাই দেশ বিভাগোত্তর বরেন্দ্র অঞ্চলের উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এই পরিপেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের পর বরেন্দ্র অঞ্চলের তথা রাজশাহী মহানগর ও জেলার উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চার নানা দিক তুলে ধরার প্রয়াস রাখা হলো।

বরেন্দ্র অঞ্চল পরিচিতি

বিভিন্ন জনপদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ। বরেন্দ্র অঞ্চল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ছিল। বরেন্দ্র ভূমির গঠন নিয়ে বেশ বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ পন্ডিতের মতে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে প্লিস্টেসিয়ান (Plistocene) যুগে শুরু হয়ে প্রায় ১০ হাজার বছর আগেকার হলোসিন যুগে ভূ-গাঠনিক আন্দোলন জনিত কারণে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু অংশ উত্তোলিত হওয়ার ফলে এ ভুমির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গৌড়ের অনেক এলাকা বরেন্দ্র ভূমির মধ্যে ছিল। ঐতিহাসিক মতে ৫৯৩ থেকে ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শশাংকের নেতৃত্বে গৌড় অঞ্চল একটি স্বাধীন জনপদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ষষ্ঠ শতকেরও প্রথমার্ধে

পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় পৃথক অস্তিত্ব পরিচিতি লাভ করেনি। ঐ সময় পর্যন্ত গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধনের আওয়াতাধিন ছিল। মনে করা হয় অশোকের রাজত্বকালে বরেন্দ্র বরিন্দ নামের জনপদ হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক উত্থান পতনের ডামাডোলে ব্যাপকভাবে বিখ্যাত গৌড় নামের আড়ালে হারিয়ে যায় বরেন্দ্র বা বরিন্দ নামটি।[১] বরেন্দ্র অঞ্চলের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকগণ নানারকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। বরেন্দ্র কুলাচার্যগণ বলে থাকেন যে তথাকথিত শুর বংশীয় রাজা বরেন্দ্র শূর রাজশাহীর পশ্চিমে বরিন্দা নামক স্থানে রাজত্ব করতেন, সেই স্থানের বরিন্দা নাম থেকে বরেন্দ্র নাম এসেছে।[২] ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যুগে যুগে যে কোন জনপদ নদীর পাশ ঘিরেই জনবসতি গড়ে উঠত। যেহেতু এই অঞ্চল নদীমাতৃক অঞ্চল তাই নদী মানে এখানে নদী ভাঙনের একটি প্রশ্ন থাকে। এভাবেই যুগে যুগে জনপদ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। বরেন্দ্র অঞ্চলের সীমানা প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস'গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

> "পূর্বোক্ত পুরাভূমির একটি রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুরের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ঐ নদীর দুই তীরে বিস্তৃতি হইয়া আসামের শৈলশ্রেণী স্পর্শ করিয়াছে। এই পুরাভূমি রেখার মাটি পার্বত্য গৈরিক স্থুল বালিময় রংপুর গোয়ালপুর কামরুপেই এই রেখার বিস্তৃতি বেশি রেনেলের নকশায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গের রাঙ্গামাটি প্রসঙ্গ আগেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া বগুড়া- রাজশাহীর উত্তর দিনাজপুরের পূর্ব এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করিয়া এই রেখার একটি বিস্তৃত স্ফীতি উচ্চ গৈরিক ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় ইহাই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রবিন্দু।"[৩]

সংগীতের সংজ্ঞা ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধারণ ধারণা

পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে সংগীত মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে চলে আসছে। মানুষ যখন তার মনের ভাব বা অনুভূতি সুর তাল বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করে তাহাই সংগীত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যদি বলি, "কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে।"[৪] অর্থাৎ সুরকে আশ্রয় করে শব্দ বা বাণী এবং তালের উপস্থিতিতে মনের ভাব প্রকাশই মূলত সংগীত। মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে এলো, তখন প্রকৃতির কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং ক্ষুধা নিবারণের নানা রকম কৌশল পর্যায়ক্রমে শিখে নিলো। পরবর্তীতে মানুষ জীবন চলার পথে মনের ক্ষুধার প্রয়োজন অনুভাব করলো এই প্রয়োজনের তাগিদেই এক স্বর দুই স্বর পর্যায়ক্রমে সাত স্বরের সৃষ্টি করলো। সেটাও ঐ প্রকৃতির কাছ থেকেই। এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দেশ বিভাগ উত্তর বরেন্দ্র অঞ্চলের উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা। এই উপমহাদেশের সংগীত সিন্ধু সভ্যতা থেকেই শুরু। ভারতীয় রাগ সংগীত হচ্ছে এই

উপমহাদেশের উৎকৃষ্টমানের পরিশিলিত সংগীত যা যুগ যুগ ধরে প্রবহমান। ইতিহাসবিদ ও সংগীতজ্ঞগণ সংগীতের যুগকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন।

"প্রাক বৈদিক বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ (খ্রী: পূ: ৩০০০- খ্রী: পূ: ২০০০)
বৈদিক যুগ (খ্রী: পূ: ২০০০- খ্রী: পূ: ১০০০)
বৈদিকোত্তর যুগ (খ্রী: পূ: ১০০০- খ্রী: ১১০০)
মধ্যযুগ যুগ (খ্রী. ১১০০- ১৮০০ খ্রী.)
আধুনিক যুগ (খ্রী.পূ. ১৮০০- থেকে বর্তমান)"।[৫]

প্রত্যেক যুগই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। ভারতীয় রাগ সংগীত পরিপূর্ণ ও পরিশীলিত রূপ পেতে উক্ত যুগের সম্পৃক্ততার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আদিম ভাষা জন্মবার সাথে সাথে আদিম গান জন্মেছে। আদিম গান ছিল সরল প্রকৃতির। সংগীত বিশ্বসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। পৃথিবীর নানা দেশের গবেষক পন্ডিতেরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম সভ্য দেশের সংগীত সেইসব দেশেরই আদিম নাচ- গান- বাজনার ক্রমবিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছু না। [৬]

প্রাকবৈদিক যুগে আর্য জাতিরা আনুমানিক খ্রী: পূ: ৩০০০ থেকে খ্রী: পূ: ২০০০ অব্দের মধ্যে ভারতে প্রবেশ করেন। এই সময় রচনা করেন বেদ সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের পাশাপাশি সংগীতের উন্নয়ণ করেন তাঁরা। বৈদিক যুগে ঋকবেদ এর সাথে স্বর সংযোগ করে বিভিন্নভাবে সামবেদ বা সামগান পরিবেশ করা হতো। পন্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এই সামগান- ই ভারতীয় রাগ সংগীতের মূল উৎস। সুনির্দিষ্ট সাংগীতিক কিছু নিয়মে আবদ্ধ স্বরবিন্যাসের প্রয়োগে যখন একটি ভাবের আবির্ভাব ঘটে তখন তাকে রাগ বলা হয়।[৭] অর্থাৎ স্বর বা সুরের মাধ্যমে সাংগীতিক নিয়ম মেনে মনের ভাব প্রকাশই হচ্ছে রাগ। রাগ সংগীতকে কেন্দ্র করেই উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিষ্ঠিত। আর এই উচ্চাঙ্গ সংগীতে মূল দুটি ধারা হচ্ছে ধ্রুপদ ও খেয়াল।

রাজশাহী অঞ্চলে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা

বাংলাদেশে বরেন্দ্র অঞ্চলে যে জেলাগুলো, রাজশাহী ছিল তার প্রান কেন্দ্র। রাজশাহী জেলার নাটোর, পুঠিয়া, কানসাট, মহাদেবপুর, তাহেরপুর এই সকল অঞ্চলে ঊনিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন মহারাজাদের আশ্রয়ে অনেক সংগীতজ্ঞ ছিল। রাজশাহী শহরের বেশ কিছু ছোট বড় জমিদার তারা সংগীতকারদের ব্যাপক ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাজশাহীর সিরোইলে জমিদার বাড়ী, তারিনী বাবুর বাগান বাড়ী, তালন্দের মৈত্রবাড়ী, হেতেম খাঁ চৌধুরী বাড়ী। ১৯৪৭ এর দেশবিভাগের পর ১৯৬২ সালে তারিণী বাবুর বাগান বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাজশাহী মহিলা কলেজ'।[৮] একটি জনপদের সাংগেতিক বিষয় আলোচনা করতে গেলে পূর্ববর্তীর ইতিহাস সামনের দিকে চলে আসে। কারণ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রত্যেক মানবিক

জনগোষ্ঠী তার পূর্ববর্তীর তৈরি পরিশীলিত সাংগীতিক বিষয়গুলো ধারণ করে যুগোপযোগি ধারায় সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে সুলতান, রাজা, জমিদারদের কাছ থেকে। এদেশের ইতিহাস সৃষ্টির কাল থেকে দেখা গেছে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীতজ্ঞগণ উক্ত অঞ্চলের রাজা ও জমিদারদের দরবারে আশ্রয়ে থাকতেন। যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে সংগীতের ইতিহাস সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু। সুতরাং বরেন্দ্র অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা-জমিদার এর আশ্রয়ে বিভিন্ন সংগীতজ্ঞগণ আশ্রিত ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবে এ অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে সংগীত চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মালেক খান তাঁর রাজশাহী মহানগরীর সংগীত চর্চা অতীত ও বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

> “রাজশাহী মহানগরীর সংগীত চর্চাকে ইতিহাসের পাতায় তুলে আনতে গিয়ে রাজশাহী জেলার সংগীতচর্চার কথা কিছুটা অবশ্য বলতে হয়। এ অঞ্চল বরেন্দ্র অঞ্চল নামে খ্যাত। এ অঞ্চলের সংগীত চর্চার ইতিহাস অতি- প্রাচীন। এখানে মূল প্রবন্ধে যাবার আগে প্রায় পাঁচশত বছরের অতীতের কথা কিছুটা উল্লেখ করতে হয়, ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশে রাজশাহীতেই প্রথম বৈষ্ণব মেলা যা মূলত মহাসংগীত (লীলাকীর্তন গানের) উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী শহরের পশ্চিমে প্রেমতলী খেতুরে। ওই মহোৎসবের আয়োজন করেন বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগত জমিদারপুত্র পরম বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুর (নরোত্তম দাস), তিনি সপ্তাহব্যাপী সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।” [৯]

নরোত্তম দাস (১৫৩১-১৫৮৭) চৈতন্যেত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বর্তমান রাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ির খেতুরী গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি সংগীত প্রেমি মানুষ ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা নেন। বৃন্দাবনে সেই সময় ধ্রুপদ সংগীতের ব্যাপক চর্চা ছিল। নরোত্তম দাস শৈশব কাল থেকে সংগীতানুরাগী হওয়ায় ধ্রুপদ সংগীতে ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামী হরিদাসের কাছে নরোত্তম সঙ্গীতাভ্যাস করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] নরোত্তম দাস এই সকল শিক্ষা দিক্ষা গ্রহণ করে বাঙ্গালীর লোকসাহিত্যের সাথে রাগ সংগীতের মিশ্রন ঘটিয়ে নতুন এক গীতশৈলীর প্রবর্তন করেন, যা কীর্তন নামে পরিচিত। বিগত চারশত বছর পূর্বে এই ধরনের একজন সংগীত প্রবর্তক সংগীতজ্ঞ এই বরেন্দ্র ভূমিতে সংগীতের বীজ বুনে গেছেন বলেই তো এখানে সংগীতের ধারা অব্যাহত রয়ে গেছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের এই মাটিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর রাজা- বাদশা তাদের শাসনকার্য সম্পন্ন করেছেন। নদীমাতৃক এ অঞ্চলকে পলিমাটি ও জলবায়ু যেমন

উর্বর ও শস্য-শ্যামলা করেছে, তেমনি অন্যদিকে চিন্তাশীল প্রতিভাবান মনিষীদের উপস্থিতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ২০০৬ সালে 'রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ' কতৃক আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে বিশিষ্ট সংগঠক ও শিক্ষাবিদ ড. তসিকুল ইসলাম রাজা তাঁর "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন- সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

> "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষত সংগীত রচনার ও চর্চার ক্ষেত্রে উজ্জল নক্ষত্রের মতো একটি নাম কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) তিনি কবি, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে রাজশাহীসহ সমগ্র বাংলার প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের জীবনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।"[১১]

বাংলা গানের পঞ্চকবির একজন রজনীকান্ত সেন। কবির পাবনা জেলায় জন্ম হলেও শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন এবং সাংগীতিক কর্মকান্ড রাজশাহীতে। স্বদেশ পর্যায়ে বেশ কিছু গান বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালী জাতীকে ব্যপকভাবে উজ্জিবিত হতে অন্যরকম এক প্রাণ জুগেয়েছিল। রাগ সংগীতে তাঁর স্বচ্ছ এক প্রকার ধারণা ছিল যা কবির সুরারোপিত গানগুলি শুনে অনুমান করা যায়। রজনীকান্ত সেনের স্বদেশ পর্যায় উদ্দীপনামূলক গান, ভক্তিগীতি, হাস্যরস এবং প্রেম এই প্রভৃতি পর্যায়ের গান রচনা করে বাংলা গানের ধারাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছেন।

ঊনিশ শতকের চল্লিশ ছিল রাজশাহী অঞ্চলের শুভ দশক। এই অঞ্চলের ছোট বড় জমিদার ছাড়াও আরো অনেক সংগীত রসিক সংগীতজ্ঞ ছিলেন যাঁরা সংগীতকে ব্যাপক ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার চরমে পৌছে দিয়ে ছিলেন। কৃতজ্ঞতার সাথে যাঁদের নাম স্মরণ করতে হয় তাঁরা হলেন জমিদারপুত্র কুমার ভবাণী রায় চৌধুরী, উকিল রেবুতি বাবু এবং এই সকল ব্যাক্তিবর্গের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন অক্ষয় কুমার মৈত্র। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে সম্মুখে থেকে যিনি পরিচালনা করতেন তিনি হচ্ছেন কুমার ভবাণী রায় চৌধুরী। যিনি সংগীতকে জমিদারদের জলসাঘর থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন। শোনা যায় কুমার ভবাণী রায় চৌধুরী এক দক্ষ বংশীবাদক ছিলেন। রাজশাহীতে এই ধরনের সংগীতে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন বলেই এই অঞ্চল সংগীতের জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। রাজশাহী অঞ্চলের সাংগীতিক পরিমন্ডল প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কলামিষ্ট কামাল লোহানী বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

> "জেলা রাজশাহীতে সঙ্গীতের চর্চা বেশ ছিল। জমিদার নন্দন ওস্তাদ রাধিকা মোহন মৈত্র ও হাবু মৈত্র এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজাশাহী সঙ্গীত ভবন গড়ে উঠে। এখানে প্রাথমিকভাবে সঙ্গীত শিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ভবানী চৌধুরী নামে এক সঙ্গীত পিপাসু ভদ্রলোক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আষাঢ়ে ক্লাব'। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে কলকাতা থেকে নামি- দামি শিল্পীরা এসে

রাজশাহী মাত করে দিতেন। আরেক সঙ্গীত রসিক তারিণী বাবুর বাড়ীতে বসতো ধ্রুপদের আসর। সংগীত ভবনে ঠুমরীর চর্চা হতো। সুধীর ভাদুড়ী ও বৈদ্যনাথ ভাদুরী গাইতেন সুললিত কণ্ঠে; এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আখড়া জমে উঠেছিল। তাতেও সঙ্গীতের বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রসারের ক্ষেত্রে এঁাদের অবদান অপরিসীম।"[১২]

রাজশাহী অঞ্চলে সংগীতের সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তালন্দ ভবন অর্থাৎ মৈত্র পরিবার, ওস্তাদ আমীর খান সরোদীয়াকে নিজ বাড়ীতে সংগীত গুরু রেখে সরোদ তালিম গ্রহণ করেছেন শ্রী ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র শ্রী রাধিকা মোহন মৈত্র (১৯১৭-১৯৮১) সেই পরম্পরায় এই উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত সরোদিয়া হিসেবে নাম করেছেন। ১৯৬২ সালে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এই সকল সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ও সংগীত গুণিরা ভারতে চলে যান। মূলত ভারতে গিয়ে রাধিকা মোহন মৈত্র বিখ্যাত সরোদিয়া হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ধর, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, অবনীন্দ্যো মৈত্র, সমরেন্দ্রনাথ সিকদার প্রমূখ অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর সর্বকালের সেরা সরোদবাদক ছিলেন রাধিকা মোহন মৈত্র। পন্ডিত রাধিকা মোহন মৈত্র প্রসঙ্গে পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তার তহজীব এ মৌসিকী গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

> "এই সঙ্গে একটা কথা না বলে পারিনা যে, রাধু বাবু সরোদ বাজনাতে ওঁর ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের শেখানো রীতিপদ্ধতির পথ ছাড়া আর কোন রীতির সঙ্গে মেলামিলি করে দিশে হারায়ে ফেলতেন না। অর্থাৎ খানদানি সরোদের যাবতীয় আঙ্গিকের বিশুদ্ধ প্রয়োগ ছাড়া কোনও স্বপরিকল্পিত এবং পরম্পরা বর্হিভুত ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। বলা যেতে পারে যে, এদিক দিয়ে তিনি গোঁড়া সনাতন পন্থী ছিলেন। অর্থাৎ ভারত বর্ষের যন্ত্র সংগীত বাদনে যাঁরা প্রতিভূ ছিলেন সরোদের সেই সনাতন ধারার সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ সংযুক্ত থাকতেন- সনাতন সঙ্গীতের নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করায় তাঁর আপত্তি ছিল না কিন্তু আধুনিক প্রবণতাকে তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। ব্যাক্তিগত জীবনে উনি যা করেছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গীতের কোনও তুলনা আমি করছিনা। কিন্তু দুটোর একটা যোগাযোগ থাকবেই। উনি একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যাক্তি; শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ঠ মেলামেশা।"[১৩]

পন্ডিত রাধিকা মোহন মৈত্র ১৯১৭ সালে রাজশাহী তালন্দ গ্রামের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতির জন্য এই জমিদার পরিবারের বিশেষ পরিচিতি ছিল। দেশবরেণ্য সংগীতজ্ঞরা এই জমিদার পরিবারে থাকতেন এবং সংগীত পরিবেশন করতেন। এই সকল গুণি সংগীতজ্ঞদের সংগীত পরিবেশন শুনেই রাধিকা মোহন মৈত্র শৈশব কাল থেকেই সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিখ্যাত সরোদ বাদক মুরাদ আলী খাঁ ও ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর চাচা সরোদ বাদক আমীর খাঁর দীর্ঘ

ত্রিশ বছর তালন্দ জমিদার বাড়ীতে ছিলেন। মূলত আমীর খাঁর সরোদ বাদন রাধিকা মোহন এর শৈল্পিক চেতনা জাগ্রত করে একজন প্রথিতযশা সরোদ শিল্পী হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেন। আমীর খাঁর শিষ্যত্ত্ব গ্রহণ করেন। পড়াশোনা ও সংগীত সাধনা দুটোই সমান তালে চালিয়ে গেছেন রাধিকা মোহন। সাত বছর তালিম নেন আমীর খাঁর কাছে। পরবর্তীতে ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছে তালিম নেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছন। ১৯৩৪ সালে এলাহবাদে নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা ও অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগিতায় সরোদে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় তাঁর সংগীত যাত্রা। পন্ডিত রাধিকা মোহন মৈত্র এমন একজন সরোদ শিল্পী ছিলেন সারা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁর বাজনায় ছিল যথেষ্ট আন্তরিকাতা, রাগের রসবোধ, ভাব, লয়জ্ঞান রাগদারি এবং রাগের গভীরতা এতসব বৈশিষ্ট্য একসাথে একজন শিল্পীর মধ্যে সচারচর পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক অস্থিরতায় এই ধরনের সংগীত বোদ্ধা মানুষগুলো প্রাণের ভয়ে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন। যা পরবর্তীতে রাজশাহী অঞ্চল শিল্পী রসিক ও সংগীত শিল্পী শুন্য হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর রাজশাহীর সংগীত চর্চার ইতিহাস যে দুটি সংগীত ধারা প্রবর্তন হয়, তার একটি ধারায় নেতৃত্বে ছিলেন প্রায়াত সংগীত সাধক উস্তাদ মোজম্মেল হোসেন (১৯০৭-১৯৭৬) অপর জন ছিলেন প্রয়াত সংগীত সাধক পন্ডিত হরিপদ দাস (১৯১০-১৯৮১)। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ঠ কলামিষ্ঠ কামাল লোহানী বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন।

> “বিভিন্ন পরিবারের এই সংগীত চর্চা সেকালে অত্যন্ত সনমানীয় বিষয় বলে বিবেচিত হতো। এক প্রচেষ্টায়ও সঙ্গীত সাধণা অব্যাহত ছিল রাজশাহীতে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ওস্তাদ হরিপদ দাস, ওস্তাদ মো. মোজাম্মেল হোসেনের নাম উল্লেখ করতে হয় সবার আগে। ওস্তাদ আব্দুল আজিজ বাচ্চু, আব্দুল মালেক খান, আব্দুল জাব্বার, মঞ্জুশ্রী রায় এঁদের নাম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অবশ্য উচ্চারিত। আর এঁদের সাথে যুক্ত হয়েছে অমরেশ রায় চৌধুরী, রবিউল হোসেন প্রমুখ। বাদল মাস্টার অর্থাৎ বজলার রহমান এর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত। সুদীর্ঘ কাল থেকে তিনি নৃত্যকলা চর্চা করে চলেছেন এ অঞ্চলে। যন্ত্র সঙ্গীতে বেহালায় পন্ডিত রঘুনাথ দাস, বাঁশীতে শিবনাথ দাস, তবলায় সারোদাকিঙ্কর মজুমদার, ইয়াসিন আলী, মোটা বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।”[১৪]

উস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন সংগীতে তালিম নেন সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ মহাশয়ের কাছে পরবর্তীতে খলিফা বাদল খাঁর কাছে। হঠাৎ হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারের পরামর্শে কণ্ঠ সংগীত চর্চা বন্ধ রাখাতে হয়। পরবর্তীতে উস্তাদ গোপাল প্রামানিক মহাশয়ের কাছে তবলায় তালিম নেয়া শুরু করেন। উস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন এর জন্ম যেহেতু নবদ্বীপে এবং বেড়ে ওঠা সেখানেই। তাঁর এতদিনের সঞ্চিত সংগীতের

অভিজ্ঞতাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে নবদ্বীপে শুরু করেন সংগীতের শিক্ষকতা। নিজ অভিজ্ঞতাকে শিষ্যদের নিয়ে ১৯৪২ সালে নবদ্বীপে গড়ে তোলেন 'সুরসংঘ' নামে একটি সংগীত সংগঠন। যদিও এটি ছিল মূলত: অর্কেস্ট্রা বাদনের সংগঠন তবুও এখানে কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত শিক্ষা দিতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে রাজশাহী এসে সেই সংগঠনকে আবার পুনসংগঠিত করেন। ১৯৫৮ সালে উস্তাদ মোজাম্মেল হোসেনকে কেন্দ্র কের গড়ে ওঠে 'সুরবাণী সংগীত বিদ্যালয়' এবং ১৯৬৭ সালে তাঁকে কেন্দ্র করে 'কাকলি ললিতকলা' একাডেমী নামে আরো একটি সংগীত বিদ্যালয় ছাড়াও একক ভাবে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী তালিম দেন। তাদের মধ্যে আব্দুল মালেক খান, আব্দুল আজিজ বাচ্চু, আব্দুল আলিম, রবিউল হোসেন (পুত্র), ড. হারুন আর-রশিদ, ইসমত-আরা-নার্গিস প্রমূখ। পরবর্তীতে এই সকল ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা আরো কিছু স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী তালিম প্রাপ্ত হন বিশেষ করে আব্দুল আজিজ বাচ্চু তাঁর তত্ত্বাবধানে এণ্ড্র কিশোর, রিজিয়া পারভিন, এম.এ. খালেক প্রমূখ শিল্পীগণ আধুনিক গানের শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরম্পরায় ধারক হিসেবে পুত্র রবিউল হোসেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা, প্রচার- প্রসার এবং পিতার সাংগীতিক জীবন স্মরণীয় করার লক্ষে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'। রবিউল হোসেন সংগীতে হাতে খড়ি বাবা ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন এর কাছে। পরবর্তীতে পিতৃশিষ্য ওস্তাদ আব্দুল আজিজ বাচ্চু, ওস্তাদ অমরেশ রায় চৌধুরী এবং পশ্চিম বঙ্গের ওস্তাদ এ. দাউদ ও ওস্তাদ সগীরুদ্দিন খাঁ এর কাছে তালিম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরে সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতা দর্শকদের মাঝে বিশেষ স্থান করে নেন। এছাড়াও তাঁর কাছে তালিমপ্রাপ্ত অনেক কৃতি শিল্পীরা দেশের সংগীতাঙ্গনে সুনাম অর্জন করে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে আফরিন হক, সুমনা বর্ধন, পপি মোস্তারি চৌধুরী, বাবর আলি, শায়লা তাসমীন, সলোক হোসেন (পুত্র) আরো অনেকে। হিন্দোল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্যেক বছর উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। ১৯৮৫ সালে হিন্দোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী- রাজশাহী এবং শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী- ঢাকা যৌথ উদ্দ্যেগে 'জাতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন' এর আয়োজন করেছিল, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজশাহীতে এত বড় পরিসরে উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান প্রথম বারের মত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আখতার সাদমানী, সৈয়দ জাকির হোসেন, নিলুফার ইয়াসমিন, মঞ্জুশ্রী সরকার,গোপাল দত্ত, ফজর আলী, রামকানাই দাস,মোশাররফ হোসেন,অমরেশ রায় চৌধুরী, শাহাদাত হোসেন খান,কিরিটি ভূষণ অধিকারী, মদন গোপাল দাস, সমীর দাস, আজিজুল ইসলাম, রঘুনাথ দাস, শিবনাথ দাস, অনুপ কুমার দাস, আরো অনেকে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সাল থেকে ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন স্মৃতি পদক ও উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করা হত। এই

উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেছেন।বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বেশকিছু উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন।যেমন: ভি.জি.করনার, ওস্তাদ এ.দাউদ,গৌতম চট্টোপাধ্যায়, তুষার দত্ত,সমীর আচার্য, আরো অনেকে। হিন্দোল ছাড়াও শিল্পাশ্রম ললিতকলা একাডেমী উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন করত। কয়েক বছর করার পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা ও প্রসারে অমরেশ রায় চৌধুরীর ভুমিকা ছিলো উল্লেখ করার মতো। যদিও তিনি জন্মসূত্রে ফরিদপুর জেলার মানুষ কিন্তু বিবাহ সূত্রে রাজশাহীতে অবস্থান শুরু করেন। অমরেশ রায় চৌধুরী সংগীতে তালিম গ্রহণ করেন সুধীরলাল চক্রবর্তী, হরিহর শুক্লা এবং তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরে সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতা দর্শকদের মনে বিশেষ স্থান করে নেন। বাংলাদেশ ছাড়াও কোলকাতার বেশ কিছু সংগীত আসরে সংগীত পরিবেশন করে তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন| অমরেশ রায় চৌধুরী উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নিজ বাড়িতে স্বরসতী পুজায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান করতেন। দীর্ঘদিনযাবৎ তিনি এই অনুষ্ঠান চলমান রেখেছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৮৭ সালে সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'সংগীতাশ্রম'। অমরেশ রায় চৌধুরী তাঁর সংগীত জীবনে অনেক সুযোগ্য শিষ্য তৈরি করেছেন। উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে ডা. জগদানন্দ রায়, শুভ্রত সরকার, বিপুল কুমার আরো অনেকে। এই সকল শিষ্যরা গুরুর দেখানো পথ ধরে এখোনো উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধনায় রত।

১৯৪৭ সালের পরে রাজশাহীর সংগীত চর্চার অপর আরেক জন প্রবর্তক হচ্ছে প্রয়াত সংগীত সাধক ওস্তাদ হরিপদ দাস (১৯১০-১৯৮১)। শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশিষ্ট রূপকার আগ্রা ও সেনী ঘরানার এক মহান উত্তরসুরী ছিলেন। হরিপদ দাস সংগীতে প্রথম তালিম নেন শ্রী অতল রায় চৌধুরীর কাছে। পরবর্তীতে ওস্তাদ হরিনারায়ন সিং, হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায় এবং আবতাব এ মৌসেকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে সংগেিত তালিম নিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে ওস্তাদ জাকির হোসেন খাঁ, রবীন্দ্র মোহন মৈত্র এবং শ্রী রথীন চ্যাঠার্জীর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহন করেন। সর্বশেষে শ্রী রাধিকা মোহন মৈত্র- এর কাছে সরোদ তালিম গ্রহন করেন। ১৯৪৩ সালে রাজশাহী শহরে গড়ে তোলেন সংগীত শিক্ষা ভবন। পন্ডিত হরিপদ দাসের শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন, আব্দুল জব্বার, রঘুনাথ দাস, শিবনাথ দাস (বাঁশী), মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী, সিরাজ উদ্দীন, শ্রী অনুপ কুমার দাস (পুত্র) প্রমূখ।

সংগীত পরম্পরায় পণ্ডিত হরিপদ দাসের ধারক হিসেবে আব্দুল জব্বার সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। অপর শিষ্য রঘুনাথ দাস ছিলেন উত্তরাঞ্চল তথা বাংলাদেশের প্রখ্যাত বেহালায় উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীত শিল্পী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা, প্রচার ও প্রসারে রঘুনাথ দাসের অবদান ছিল অপরিমেয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানে বেহালায় উচ্চাঙ্গ সংগীত

পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতার মন জয় করেছেন এবং রাজশাহীর নাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খুব নিষ্ঠার সাথে তিনি সংগীত সাধনা করে গেছেন।গুরু শিষ্য পরম্পরায় রেখে গেছেন শিষ্য- তপন কুমার দাস (পুত্র), আনোয়ারা হোসেন, প্রফেসর ইকবাল মতিন আর অনেকে। গুরু হরিপদ দাসের অপর একজন শিষ্য শিবনাথ দাস বাঁশীতে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে বেশ কয়েকটি দেশে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরে বাঁশীতে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে রাজশাহী সহ বাংলাদেশের গৌরব ও সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন।তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার পাশাপাশি বেশ কিছু শিষ্য তৈরী করেছেন।তাঁর উল্লেখ্য শিষ্যদের মধ্যে আব্দুস সালাম, শরৎচন্দ্র পাল আরো অনেকে।হরিপদ দাসের অপর এক শিষ্যা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী।সান্নিধ্য পেয়েছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত ওস্তাদ নাজাকাত আলী এবং সালামত আলীর।পরবর্তী ওস্তাদ এ দাউদ এবং ওস্তাদ সগীর উদ্দীন খানের কাছে বেশ কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন। মঞ্জুশ্রী রায় উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা ও প্রসারের লক্ষ্যে **১৯৮৭** সালে "শ্রী সংগীত নিকেতন" প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিক্ষার্থীদের সংগীতে তালিম দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিল্পীর গৌরব বয়ে আনেন। পণ্ডিত হরিপদ দাসের কনিষ্ঠ পুত্র অনুপ কুমার দাস ছিলেন এক বিস্ময়কর সংগীত প্রতিভার অধিকারী। অনুপ কুমার দাস পিতার কাছেই মূলত সংগীতে হাতেখড়ি পেয়েছিলেন।তিনি একাধারে গীতিকার,সুরকার, গায়ক ও যন্ত্রশিল্পী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে সরকারের নির্দেশে তৎকালীন প্রশাসন রাজশাহী মহানগরীতে "পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বছরে একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করত। সেই সাথে রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পীদের দিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত, লঘু সংগীত, গজল ও লোকসংগীত Open air অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। শিল্পী হিসেবে থাকতেন ওস্তাদ নাজাকাত আলী, সালামত আলী, গজল শিল্পী ওস্তাদ মেহেদী হাসান, রওশন আরা বেগম আরো অনেকে। রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী থাকা অবস্থায় এখানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান ব্যাপক পরিসরে না হলেও স্বল্প পরিসরে প্রচার হতো। পরবর্তীতে **১৯৭১** সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলা গানের অন্যান্য ধারা সহ উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চায় বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী আজ অবদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে বলে অনেক সংগীতজ্ঞ গণ মনে করেন। বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী সপ্তাহে দুইদিন সকাল এবং রাতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার করে থাকে। যা উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের সংগীত চর্চায় কিছুটা হলেও উৎসাহিত করে। ব্যাক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও এ অঞ্চলে যে সংগীত শিক্ষা দেয়া হত সে প্রসঙ্গে কামাল লোহানী বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থে আরো উল্ল্যেখ করেন।

> "দেশ বিভাগের পূর্বে সঙ্গীত চর্চা ব্যাপক হতো তবে সমন্বিত ছিল না। পরে প্রাতিষ্ঠানিক রুপও নিতে শুরু করে। ওস্তাদ হরিপদ দাস ও উস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন নিজস্ব চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলে এবং তাতে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে থাকেন। তাই ছোট হলেও 'সঙ্গীত শিক্ষা ভবন' ও 'সুরবাণী' দুটি প্রতিষ্ঠান উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার বিপুল অবদান রেখেছে বলে সঙ্গীত রসিক জনের ধারণা।"

দেশ বিভাগের পূর্বে সংগীত চর্চা ব্যাপক হতো কিন্তু তা সমন্বিত ছিল না পরবর্তীতে সংগীত চর্চা প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিতে শুরু করলে তা সমন্বিত হওয়ার প্রয়াস চোখে পড়ে। আর এর রূপকার ছিলেন যথাক্রমে ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন এবং ওস্তাদ হরিপদ দাস। এছাড়াও এই অঞ্চলর উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চায় যারা বিশেষ ভাবে অবদান রেখেছিলেন তাঁরা হলেন সেতারে লক্ষীকান্ত দে, তবলায় ইয়াসিন আলি, সারোদা কিংকর মজুমদার, অতিন্দ্র গুপ্ত ভায়া, জয়নাল আবেদীন, গোপাল দাস আরো অনেকে।

রাজশাহী অঞ্চলে বিগত সময় ধরে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার যে ধারাবাহিকতা ছিল তা পর্যায়ক্রমে একাডেমিক পর্যায় পৌছে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ সালে নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ খোলা হয়। দুটো পৃথক বিষয় শুরুতে একটি বিভাগ ছিল পরবর্তীতে স্বতন্ত্র বিভাগ রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। সংগীত বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশাপাশি এম.ফিল/পিএইচ.ডি. ডিগ্রী চালু করা হয়। পরবর্তীতে এক বছর মেয়াদী কালিন সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগ থাকলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের পঠিত সিলেবাস মুলত উচ্চাঙ্গ সংগীতকে কেন্দ্র করে গঠিত।উচ্চাঙ্গ সংগীত হচ্ছে সংগীতের মূল ভিত্তি, এই বিষয়টি অনুধাবন করেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সিলেবাস তৈরী করা হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি বাংলা গানের অন্যান্য ধারা যেমন লোকসংগীত, রবীন্দ্র, নজরুল সংগীত এছাড়াও যন্ত্রসংগীত তবলা বিষয়ে পড়ানো হয়।

উপসংহার

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই বলা যায় যে, বরেন্দ্র অঞ্চলে যেমন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক ভাবে সমৃদ্ধি ছিল ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতাতে লক্ষণীয় ছিল। বিশেষত এ অঞ্চলের সংগীত চর্চা উল্লেখ করার মত ছিল। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চায় কিছুটা ভাটা পড়লেও বিভিন্ন সংগীত সাধকের ব্যাক্তি উদ্যোগ, প্রতিভার সমাহার, শাসকগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য সাংগেতিক চর্চা এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মালম্বীর সহ অবদান সেই ভাটাতে জোয়ার আনতে হয়েছিল। তারিণী বাবু, কুমার ভবাণী রায় চৌধুরী, উকিল রেবুতি, অক্ষয় কুমার মৈত্র, ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র, পন্ডিত রাধিকা মোহন মৈত্র, হাবু মৈত্র, ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন, পন্ডিত হরিপদ দাস, লক্ষীকান্ত দে, ইয়াসিন আলি, সারোদা কিংকর মজুমদার, আব্দুল জব্বার, রঘুনাথ দাস,

অমরেশ রায় চৌধুরী, আব্দুল মালেক খান, আব্দুল আজিজ বাচ্চু, রবিউল হোসেন মঞ্জুশ্রী রায় আরো অনেকের অবদান এই অঞ্চলের সংগীত চর্চার অনস্বীকার্য পরবর্তীতে সমন্বিত সংগীত চর্চা এ অঞ্চলে খুব সহজেই চোখে পড়ে এবং ফলস্বরূপ ব্যাক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক সংগীত চর্চার সূচনা ঘটে।

তথ্য নির্দেশ :

১. রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৬ষ্ঠ, এপ্রিল ২০১২-পৃ. ২০৮।
২. তদেব- পৃ. ২১০
৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব- নীহাররঞ্জন রায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০০, পৃ. ১৬৩।
৪. সংগীত চিন্তা-বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ^ভারতী সংগীত সমিতি, বৈশাখ- ১৩৭৩, পৃ. ৪।
৫. সংগীতের ইতিবৃত্ত- শম্ভুনাথ ঘোষ, মীরানাথ, ৪ঠা শ্রাবণ (পূর্ণ যাত্রা), ২০শে জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৬. সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা (১ম খন্ড), ড. উৎপলা গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাডেমী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকতা- ৭০০০৩৬, পৃ. ২০।
৭. সংগীত অন্বেষা, ড. অসিত রায়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ডিসেম্বও ২০১৯, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, পৃ. ৫৫।
৮. রাজশাহী মহানগরীর অতীত ও বর্তমান ১ম খন্ড- আব্দুল মালেক খান, ইসস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রা.বি. প্রকাশ ২০১২, পৃ. ৫২৬।
৯. তদেব- পৃ. ৫২৭।
১০. সংগীত কোষ- করুণাময় গোস্বমী, ১৯৮৫ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪০০।
১১. রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ ৫ম প্রকাশনা- ড. তশিকুল ইসলাম রাজা, প্রকাশকাল ১৫ই ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ২৫।
১২. বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস ১ম খন্ড- কামাল লোহানী, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৮, গতিধারা ৩৮/২ক, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ১২৫০।
১৩. তহজীব-এ-মৌসিকী- জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, বউলমন প্রকাশন ২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা, পৃ. ৯১।
১৪. বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস ১ম খন্ড- কামাল লোহানী, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৮, গতিধারা ৩৮/২ক, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ১২৫৩ ।
১৫. তদেব- পৃ. ১২৫৪।
১৬. শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী এবং হিন্দোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ১৯৮৫ সালের সুভেনিয়র।
১৭. সংগীত শিক্ষা ভবনের ১৯৯৮ সালের সুভেনিয়র।

উদ্ভ্রান্ত সময় ও সত্যসন্ধানী আদর্শের 'ঘূর্ণি'

অঙ্কিতা মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়,কোচবিহার

সারসংক্ষেপ:
বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র (২২ আগষ্ট, ১৯১৫ – ১৮ মে, ১৯৯৭) স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সূচনাকার।আপোসহীন ভাবে মৌলিক নাট্যচিন্তাকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যেই তাঁর নাট্যানুশীলন।শম্ভু মিত্র রচিত মৌলিক নাটকগুলি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে ভাষা দান করেছে।শম্ভু মিত্র রচিত আটটি মৌলিক নাটকের মধ্যে 'ঘূর্ণি' অন্যতম।এই নাটকের কাহিনি ও সংলাপের ব্যঞ্জনায় তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বিভ্রান্ত সময়ের ঘূর্ণিপাকে অবিচল আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে হয়।চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে ভয়াবহ দেশীয় ও রাজনৈতিক সংকট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নাটকটি রচিত। বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার ও সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র যেমন এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলির দ্বিচারিতা, মানুষের বিভ্রান্তি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আদর্শের জন্য লড়াই, সব কিছুই উঠে এসেছে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে। এই নাটকের নাট্যবস্তুতে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে সময় ও সমাজের গভীর ক্ষত, মানব সম্পর্কের গূঢ় অন্তর্দেশ, তেমনই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সামান্য মানুষের অসামান্য প্রতিবাদ এবং সত্ সংখ্যালঘু মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের বলিষ্ঠতা।
সূচক শব্দ : শম্ভু মিত্র - মৌলিক নাটক - 'ঘূর্ণি'–দেশীয় – রাজনৈতিক – আন্দোলন - বিভ্রান্ত সময় – স্খলিত নৈতিকতাবোধ - আদর্শ - সংগ্রাম – মূল্যবোধের লড়াই – মানব জীবন – সম্পর্কের সংকট ।

মূল আলোচনা :
স্বাধীনোত্তর কালের বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র(২২ আগষ্ট, ১৯১৫ – ১৮ মে, ১৯৯৭)স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সূচনাকার। অবাণিজ্যিক যথার্থ শিল্পনির্ভর ভারতীয় নাট্যনির্মাণই শম্ভু মিত্রের লক্ষ্য ও সাধনা। আপোসহীন ভাবে মৌলিক নাট্যচিন্তাকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যেই তাঁর নাট্যানুশীলন।শম্ভু মিত্র রচিত মৌলিক নাটকগুলি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে ভাষা দান করেছে। নাটকগুলির কাহিনি, সংলাপ ও বিষয়গত গভীরতাকে অবলম্বন করে শম্ভু মিত্র দ্বন্দ্বময় জীবনের উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন, মানবমনের গভীরতর অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন।তাঁর নাটকে নাট্যবস্তুতে যেমন উপস্থাপিত হয়েছেসময় ও সমাজের গভীর ক্ষত, মানব

সম্পর্কের গূঢ় অন্তর্দেশ, তেমনই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সামান্য মানুষের অসামান্য প্রতিবাদ এবং সত্ সংখ্যালঘু মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের বলিষ্ঠতা। শম্ভু মিত্র রচিত নাটকের সংখ্যা বারোটি। এর মধ্যে আটটি তাঁর মৌলিক রচনা, যার মধ্যে 'ঘূর্ণি' অন্যতম।এই নাটকের কাহিনি ও সংলাপের ব্যঞ্জনায় তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বিভ্রান্ত সময়ের ঘূর্ণিপাকে অবিচল আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে হয়।

ঘূর্ণি নাটক রচিত হয় ১৯৫০ সালে (মতান্তরে ১৯৫১)। নাটকটি 'বহুরূপী' পত্রিকার ২৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৩ সালে। 'ঘূর্ণি' নাটক দীর্ঘদিন অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিল এবং প্রকাশের সুযোগ পায়নি। প্রচারের অভাবও এই নাটকের প্রকাশের পথে অন্তরায় হয়। ১৯৫০ সালে 'ঘূর্ণি' নাটক যখন লেখা শুরু হয় তখনও শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘের ভাবনাচিন্তা থেকে পুরোপুরি দূরে সরে আসেননি। তাঁর গড়ে তোলা দল 'বহুরূপী' তখন 'পথিক' প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব ধরণকে চিনিয়ে দিচ্ছে। শম্ভু মিত্র পল রির্ভসের 'আওয়ার ইন্ডিয়া' ছবিতে অংশগ্রহণ করবার জন্য মুম্বাইতে রয়েছেন। সেই সময় নির্জন হোটেলের ঘরে বসে তিনি লিখতে শুরু করেন 'ঘূর্ণি' নাটকটি। পরবর্তীকালে এই নাটকটির অনেক রূপপরিবর্তন হয়েছে। এই বিষয়ে শম্ভু মিত্র নিজেই জানিয়েছেন–

> "ঘূর্ণি লেখা শুরু হয়, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৫০ সালের শুরুতে, বোম্বের এক হোটেলের নির্জন ঘরে, এবং যথানিয়মে কিছুটা লেখার পর পড়ে থাকে। কলকাতায় ফিরেই বহুরূপীর নানা কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। তারপরে 'চার অধ্যায়ে'র মঞ্চরূপের ছবি মনের মধ্যে জাগতে থাকে। যে কথাগুলো বলবার জন্যে মনের মধ্যে অস্থির লাগছিল তারই এক গভীর চিত্র ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় আখ্যানে। তার পরের বছর বোধহয় একটা কঠিন ব্যাধিতে শয্যাগত হবার পর এ নাটক শেষ হয়। কিন্তু যে প্রয়োগ–কৌশল মনের মধ্যে আসছিল তা ঠিকমতো রূপ পাচ্ছিল না। তাই অপরের কথা শুনে অনেক বদলানোও হয়েছে সাহিত্যপত্রে বা বহুরূপীতে ছাপা হবার সময়ে। এবারে সেসব বাদ দিয়ে আমার নিজস্ব হিসেবেই (হিসেবটা ১৩৭৩ সালে প্রথম বই বেরোবার সময়ে) ছাপা হল। এখানে সেই পাঠই অনুসৃত"[১]

চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে ভয়াবহ দেশীয় ও রাজনৈতিক সংকট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নাটকটি রচিত। বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার ও সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র যেমন এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলির দ্বিচারিতা, মানুষের বিভ্রান্তি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আদর্শের জন্য লড়াই, সব কিছুই উঠে এসেছে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে। এই নাটকের বিষয়বস্তু ও রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায়

যে ১৯৫০ সালে যখন এই নাটক লেখার শুরু হয় তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বঙ্গদেশ বিভাজিত। তখন রাজনৈতিক খেলা শুরু হয়েছে ধর্মান্ধ মানুষদের নিয়ে এবং বাংলার মানুষ অভাব ও অনটনে বিপর্যস্ত। সদ্য স্বাধীন দেশটিতে সেই মুহূর্তে দেশ গড়ার বদলে দেশ ভাঙার এবং মূল্যবোধ অবলুপ্ত করার অসাধু প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক দলগুলোর বিপুল আয়োজন লক্ষ করা যায়। সেই দেশীয় পরিস্থিতি এবং তার পাশাপাশি বাঙালি সমাজ ও একক মানুষের ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের স্পষ্ট ছবি এই নাটকে তুলে ধরেছেন নাটককার। নাটককার স্বয়ং এই নাটকটির পটভূমি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন–

> “... তারপর এক ভয়ঙ্কর মন্বন্তর হল। মানুষের তৈরি সেই মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে শহরের রাস্তায় মারা গেল। ’৪৩ সালে। আমাদের চোখের সামনে। – তারপর ’৪৬ সালে বীভৎস দাঙ্গা হল হিন্দু-মুসলমানের। '৪৭ সালের ১৪-ই আগষ্টে কলকাতার অলিতে গলিতে নাকি কোলাকুলি হয়েছে, আতর ছড়ানো হয়েছে – হিন্দু-মুসলমানে মিলে। মনে হয়েছিল রাত বুঝি কেটেই গেল। কিন্তু কোথায়?হিন্দু- মুসলমানের সেই আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থেকেছে। আজ পর্যন্ত। প্রথমেই শোনা গেল এ আজাদী সত্য নয়, এটা মিথ্যা। দলে দলে ছিন্নমূল লোকেরা এসে পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প পরিসরকে ভরিয়ে রেখেছে, এবং এখনো রাখছে। তখন সকলে মিলে মানুষের দুর্দশা দূর করার চেষ্টার বদলে রাজনৈতিক দলেরা ছিন্নমূলদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। গড়া নয়, ভাঙা – এই যেন হল স্পর্ধিত প্রগতির কথা। ট্রাম জ্বালানো, ট্রেন ওড়ানো, পুলিশের গুলি চালানো, – সব যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠল। পার্লামেন্টরি ডিমোক্র্যাসির প্রাথমিক সভ্য নিয়মগুলো দেশের লোক বোঝাবার আগেই এসেম্বলিতে চটি ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল। লোকে শিখল যেমন করে পারো মেরে নাও। তখন কাকে না গালি দেওয়া হয়েছে?রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে?এরই পটভূমিকায় এবং নাট্যপ্রযোজনায় একটা নতুন ভঙ্গি আবিষ্কারের চেষ্টা – ঘূর্ণি লেখবার কষ্টকর প্রচেষ্টা।”[২]

‘ঘূর্ণি’ নাটকটি তিন অঙ্কের এবং প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যান্তর রাখা হয়েছিল সময়ান্তর নির্দেশ করার জন্য, স্থানের ভিন্নতা বোঝানোর জন্য নয়। প্রথম অঙ্কটি সংঘটিত হয় দেবেন্দ্র মুখার্জীর বাইরের ঘরে এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি পার্কে অভিনীত হয়। নাট্যকাহিনি বিকাশ ও অবিনাশের পৃথক ঘরের দৃশ্যে দেখানোর পর পার্কে সংঘটিত হয়। তৃতীয় অঙ্কটিতে এক পুরনো নবাবী আমলের বাড়ি দেখা যায়। কাহিনি শুরু হতে দেখা যায় এক রবিবারের সকালবেলা। মূল কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে দেবেন মুখুজ্যের পরিবার। সেই পরিবারে রয়েছেন দেবেনবাবু, তার স্ত্রী বীণা দেবী, ছেলে প্রণব এবং দুই মেয়ে খুকু ও সুমি। দেবেনবাবুর প্রকাশনার ব্যবসা করেন। সেই ব্যবসার

মন্দা অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেবেনবাবুর শ্যালক অবিনাশ লাভবান হবার কৌশল করে। দেবেনবাবু প্রগতিশীল বামপন্থী চেতনা সম্পন্ন যুবক বিকাশের বিপ্লবীতত্ত্বের বই ছাপতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও অবিনাশ তাতে সম্মতি দেয় না। দেবেনবাবুর মেয়ে খুকু ও বিকাশের সম্পর্ক অনুরাগের সূত্রবন্ধে আবদ্ধ। অন্যদিকে সুমি ও সমীর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। সমীর একুশখানা গাড়ির মালিক এবং ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ভক্ত। কাহিনিতে খুকু এবং সুমিকে প্রেম সম্পর্কে একনিষ্ঠ থাকতে দেখিনা আমরা। কেননা বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজবাদে বিশ্বাসী বিকাশ পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিকাশ তৎকালীন যুবকদের মত অসহায় ও অনিশ্চিত জীবনের ঘূর্ণিপাকে বন্দীদশা প্রত্যক্ষ করে চুপ করে বসে থাকতে পারে নি, সে লেখালিখি করে। সে প্রত্যক্ষ করে বিপর্যস্ত সময়ের ঘূর্ণিতে অসহায় দরিদ্র শিক্ষক অবস্থার বিপাকে পড়ে তার মেয়েকে পরপুরুষের দিকে লেলিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। সে সময়ের স্রোতে গা ভাসাতে পারে না। তাই অবশেষে তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাপুরুষতা বা ক্লীবতা নয়, জীবনাদর্শের অনুগত হয়। অন্যদিকে খুকু একদিন সমীরের সঙ্গে পালিয়ে দূর পাড়াগাঁয়ে আদিবাসীদের মাঝখানে বাস করতে থাকে। সেখানে গিয়ে খুকু আবার এক আদিবাসী যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। খুকুর স্বামী সমীর তারই দেওয়া বিষে মৃত্যুবরণ করে। খুকুর গর্ভে জন্ম হয় আদিবাসী কুরলার সন্তান। ঠিক তখনই খুকুর সঙ্গে বিকাশের পুনর্বার যোগাযোগের মুহূর্ত তৈরি হয় এবং বিকাশ তখন অন্ধ। বিকাশ খুকুর গর্ভস্থ সন্তানকে গ্রহণ করতে চায় এবং তাদের ভালোবাসার অভিজ্ঞান স্বরূপ নিজের আদর্শের অনুগ করে সেই সন্তানকে গড়ে তুলতে চায়। শম্ভু মিত্র নাটকের শেষে গভীর সমাজ বিশ্লেষণে এক বাঞ্ছিত মুক্তির ইশারাকে জাগিয়ে রাখেন।

এই নাটকের প্রেক্ষিতে যে সময় তা ক্রমশ জটিল আবর্তে ঘূর্ণমান হয়। অবিনাশ রাজনীতির স্বার্থসন্ধানী রূপটি প্রকাশ করে। প্রথম অঙ্কেই ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে এক অন্ধকার। দেবেনবাবুর ছেলে প্রণবের টিকে থাকার তাগিদে বিকিয়ে যাওয়া, বিকাশকে ভালবেসেও সমীরকে প্রলুব্ধ করে অভীষ্ট পূরণের লক্ষ্যে খুকুর এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা সময়ের ঘূর্ণিকে চিনতে পারি। সময় ভাঙন সহ্য করতে না পেরে দেবেনবাবুর স্ত্রী বীণা মারা যায়, প্রথম অঙ্কেই। প্রথম দৃশ্যেই খুকুর অস্থির আবেগ বিপর্যস্ত সময়ের সারণী বেয়ে 'শুধু অকারণ পুলকে' কবিতার পংক্তি অতিক্রম করে পৌঁছে যায় 'রাত্রি অন্ধকার। মৃত দানবের অক্ষিকোটরের মতো' অনুভবে। 'উলুখাগড়া' থেকেই শম্ভু মিত্র চরিত্রের নামকরণে যে প্রতীকী আভাস রচনা করেন 'ঘূর্ণি'তে তা আরও স্বচ্ছতায় প্রতীয়মান হয়। 'খুকু'র ছেলেমানুষি এবং সমাজের অবিনশ্বর, নিরাপত্তালোভী রোমান্টিক মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে অবিনাশ ব্যবহার করে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নিজের মোহে সমীরকে ভুলিয়ে নিয়ে খুকু পালিয়ে যায় সারিন্দা গ্রামে। তারপর রোমান্টিক আবেগে আদিবাসী যুবক কুরলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, উদ্ভ্রান্তের

মত খোঁজে তার স্বপ্নের পুরুষকে। ঘটনার পরিণতিতে খুকু সমীরকে খুন করে। অন্যদিকে ভ্রষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতেও বিকাশের মন থেকে বিপ্লবের আশা তিরোহিত হয় না। পৃথিবী থেকে সে বাঁচার মন্ত্র নেয়, আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে বাঁচার আশা খোঁজে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ব্যক্তি ও সমষ্টির বিপ্লবকে মিলিয়ে দিয়েছেন শম্ভু মিত্র। বিকাশ নিজের মধ্যবিত্ততার আত্মদ্বন্দ্ব খসিয়ে দেশসেবার বিলিয়ে দেয় নিজেকে। উদার মানবিক বোধে তার একান্ত ভালোবাসার জন খুকুর নষ্ট জীবনকেও সার্থক করবার জন্য তার গর্ভের অবৈধ কিন্তু যথার্থ মানবসন্তান, কুরলার ঔরসজাত সন্তানকে মানুষ করার ব্যাকুলতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। নাটকের উপান্তে পৌঁছে নতুন করে একটি অসমাপ্ত সংগ্রাম গড়ে উঠবার ইঙ্গিত নির্দেশ করেছেন নাটককার।

নাটকের প্রথম থেকেই নাটককার চরিত্রসমূহের নিজস্বতাকে চিনিয়ে দিয়েছেন। খুকুর শিশুসুলভ খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতা, সুসির সুবিবেচনা বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান, প্রণবের মেকি শিল্পপ্রাণতা, দেবেনবাবুর সনাতন আদর্শবোধ, অবিনাশ চাটুজ্যের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও বীণার ব্যক্তিত্ব, সবই নাটককারের সযত্ন সৃষ্টি। প্রথম থেকেই বিকাশ চরিত্রটিকে নাটককার সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। বিকাশ আদর্শের প্রতি সত্, ভালোবাসার প্রতি সত্। কোনও অসত্ উদ্দেশ্যের কাছে সে নতিস্বীকার করে না। সমীর ও তারিণী মাষ্টারমশাই দুজনেই শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধিস্থানীয়।সমকালের প্রতিনিধি–স্বরূপ নাটকে এসেছে জগবন্ধু, চাষীরা প্রমুখ।

নাট্যঘটনার সূত্রপাত অভাব ও দেনার দায়ে দেবেন মুখুজ্যের ছাপাখানা বিক্রিকে কেন্দ্র করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেই ছাপাখানা ক্রয় করবেন অবিনাশ চাটুজ্যে। সেই সূত্র ধরেই আমরা অবিনাশবাবুর শঠ ব্যবসায়ী মানসিকতার পরিচয় পাই। ঠিক হয় অবিনাশবাবু ছাপাখানা ক্রয় করবার পর দেবেনবাবু সেখানেই কাজ করবেন। এতদিন যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে দেবেনবাবু ছাপাখানা চালিয়েছেন সেখানেই কর্মচারী হিসেবে আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে আদর্শবিচ্যুত হয়ে কাজ করতে হবে বুঝতে পেরে অদ্ভুত এক দ্বিচারিতা অনুভব করেন। অবশেষে মনস্থির করে ফেলেন যে অবিনাশদের চাকর হয়ে তিনি ঠিক সেই সব কাজই করে যাবেন, যা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী। লোকে তাঁর সততাকে শ্রদ্ধা করলেও অর্থাভাবের কাছে তা মূল্যহীন। সময়ের বিপাকে পড়ে আদর্শের সঙ্গে আপোস করে তিনি নিজের মূল্যবোধ থেকে চ্যুত হন।অবিনাশের প্রস্তাবকে তার ঠিক বলে মনে হয়, কেননা অর্থহীনের পক্ষে আদর্শকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

সুসি চরিত্রের মধ্যে এক বিপরীতমুখী অনুভূতি দেখা যায় বাস্তব আর রোমান্টিক কল্পনা বিলাসিতার দ্বন্দ্বে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে আদর্শকে অনুসরণ করেছে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েই। সামাজিক অন্ধকার 'মৃতদানবের অক্ষিকোটরের মতো' তাকে জীর্ণ করতে পারে না, কারণ সে আলোর প্রত্যাশী। খুকু বিকাশকে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীর অন্ধকার থেকে বাঁচতে চাইলেও প্রবৃত্তির জৈবিক অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আপাত সুখ ও

অর্থই তার কাম্য। তাই নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে কিংবা চারিত্রিক পদস্খলনেও সে পিছুপা হয় না। বিকাশের ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে সে সমীরের ঘনিষ্ঠ হয় এবং তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে মেরে ফেলে। আদর্শবাদী, সাম্যবাদী ও স্পষ্টবাদী বিকাশের বই অবিনাশবাবু ছাপতে চাননি। কেননা তিনি জনরোষের কবলে পড়তে চান না। শাসকবিরোধী সমালোচনাযুক্ত গ্রন্থ ছেপে ব্যবসার ক্ষতি তিনি করতে চান না।কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকাশ তার আদর্শ থেকে সরে আসেনি।সে খুকুকে স্পষ্ট জানায় যে এমন বই সে লিখতে পারেনা যা সহজে ছাপা হয় এবং পারলেও সে লিখবে না। খবরের কাগজে চাকরি করে অনেকে বেশ্যাবৃত্তি করে কিন্তু সে তা করবে না। আদর্শকে আঁকড়ে থাকার নেশাকে ফাঁকি সে দেবে না। তার লেখা বই যত ছাপবে না এবং যত নিষিদ্ধ হবে, ততই বোঝা যাবে যে সে ঠিক পথে আছে। বিকাশ নিজের অবস্থান সম্পর্কে খুকুকেও জানিয়ে দেয় এবং তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলে।খুকুও জানে যে বিকাশ সত্যিকারের পুরুষ এবং তার জীবনের লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে। সে বোকা বলেই সুযোগসন্ধানী নয়। আসলে সাহিত্যকে হাতিয়ার করে এবং আদর্শকে সামনে রেখেই বিকাশ বেঁচে থাকতে চায়। বিকাশ দেবেনবাবুর সঙ্গে কেবল সন্তান সম্পর্কে অন্বিত নয়, সে তাঁর আদর্শেরও অন্যতম আশ্রয়।

সে অনুভব করেছিল যে যৌবন ও দুঃসাহসকে সঙ্গী করেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও আদর্শের জন্য লড়াই করা যায়। আর তা না পারলে সমষ্টি মানুষের ভ্রষ্ট মানসিকতার স্রোতে ও উন্মত্ত স্বার্থপরতার আগুনে বলি দিতে হয় মূল্যবোধ। লালিত আদর্শের সমাধির ওপর দণ্ডায়মান হয়ে ছিনিয়ে নিতে হয় বাঁচার সুখ। তাইতো খুকু টিকে থাকার আনন্দে মোহন্মত্ত হয়। আর বিকাশ ভালবাসাহীন পৃথিবীতে এক বিস্তৃত ভালোবাসার বোধে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে আদর্শকে সঙ্গে নিয়েই। সুসি তার বাবার সঙ্গী হয়ে ওঠে শুধু তার সন্তান হিসেবেই নয় বরং তার বিবেক হিসেবে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ছিন্নমূল তারিণী মাস্টারমশায়ের অভাব ও তার মেয়েকে চারিত্রিক স্খলনের পথে স্বেচ্ছায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে সমকালের অনিবার্য সত্য চিত্রিত হয়েছে–

> “আজ্ঞে হাঁ। পূর্বে দালালি করছি যত মিথ্যাবাদী মরা মানষের, আর অখন দালালি করি মাইয়াডার, –বন্ধ্যা জীবনের। (হেসে) বাবুমশয় আমাগোর কথায় সাহিত্য দেইখ্যা অবাক হয়েন না। ইস্কুলমাস্টার ছিলাম। পোলাগুলায় শিখাইছি plain living high thinking।বুনা রামনাথের কথা শিখাইছি, বিদ্যাসাগর মহসীনের কথা শিখাইছি। – আর আজ সেই পোলাগুল্যানরে রাস্তা থিক্যা নিয়া যাই মাইয়াডার কাছে। জীবনের চাহিদা মিটাই। কিন্তু ভিক্ষুক না। Honest labourকরি।”[৩]

সেকালে মানুষের মূল্যবোধের ভাঙন, স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক দলের আদর্শহীনতা মাঝে মাঝেই বিকাশকে সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করায়, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করে।জীবনের

অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে বিকাশ অনুভব করে সুসি ও সে নিজে একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে। তারা যেন আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকা পচা কলা আর পচা বেল। কেননা সময়ের আবিলতার সঙ্গে তারা মিশে যেতে পারে নি। খুকু ও সমীরের চলে যাওয়া সে কষ্ট করে হলেও মেনে নিয়েছে। সে দেখেছে ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গের মাস্টার তার মেয়ের জন্যে দালালি করতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনের নানা ঘটনা পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বিকাশ মানুষ হিসাবে নিজের শ্রেণিকে সনাক্ত করতে চায়। নিজেকে সে মধ্যবিত্ত ঘরের লোক, প্রগতিশীল লেখক কিংবা বুদ্ধিজীবী কোনও শ্রেণির সমগোত্রীয় বলেই চিহ্নিত করতে পারে না, কারণ তাদের চারিত্রিক স্খলনের রূপ তার চেনা। জীবনে নিজের ভুলকেও বিকাশ চিনতে পারে। সে রোমন্থন করে ১৯৪৬–এর দাঙ্গার সঙ্গে তার জড়িয়ে থাকা স্মৃতি। সে অনুভব করে মানুষ বিশ্বাস করে এক জিনিস কিন্তু ভালোবাসে আর এক জিনিস। আর এই দুইয়ের বিরোধেই জীবনে ব্যর্থতা আসে। বিকাশের এই আত্মগ্লানির মধ্যে দিয়ে গল্পকার আমাদের গভীর জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন।বিকাশের বোন বাণীর চরিত্রভ্রষ্টতার কথাও নাটককার তুলে ধরেছেন স্মৃতির রেখা বেয়ে। সমকালের সত্যদর্শনের এই নগ্ন বাস্তবের চিত্রায়ণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তেভাগা আন্দোলনে চাষীদের নেতৃত্ব দিয়ে বিকাশ একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করে। মুসলমান ডিমওয়ালাকে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে গণপিটুনি ও নানারকম হেনস্তা সত্ত্বেও বিকাশ একটুও না দমে গিয়ে তার আদর্শকে সে কর্মের মধ্যে মুক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। সমকালের দাঙ্গাবিধ্বস্ত দেশীয় পরিবেশে জীবনের আদিম স্বার্থপরতার রূপ যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি খুকু চরিত্রে, তেমনি তারিণী মাস্টারের কথার মধ্যেও উঠে আসে এক নির্মম বাস্তব–

> “টাকার দাম নি আরো কইমব, মনুষ্যত্বের দাম আরো কইমব, বাপে মায়ে নিজের পোলার মুখের থিক্যা খাবার কাইড়্যা খাইব, – আর পোলাগুল্যান একটা সিগ্রেটের লোভে নিজের মায়েরে বেইচ্যা দিব। চিতার আগুন জ্বইলব।বাবুমশয়। হেই আগুনে আপনাগো মতো ভালোমানুষ – আর যত শয়তান সব জ্বইল্যা পুইড়্যা মইরব। হেই আগুনে এ সভ্যতার এই মানব সভ্যতার – সংক্রান্তির তর্পণ হইব। হিঃ হিঃ হিঃ – বাবুমশয়, আমি তারিণী মাস্টর হেই যজ্ঞের একজন হোতা। আর আমার মাইয়াডার মতো যত নি দুর্ভাগা মাইয়্যা আছে, সব হইল হেই যজ্ঞের কাষ্ঠ, – সমিধ।”[৪]

কালের সত্যস্বরূপও উঠে এসেছে তারিণী মাস্টারের উক্তিতে। কর্কট রোগের মত সভ্যতার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা গভীর ক্ষত কিভাবে মানুষের বেঁচে থাকার অর্থকে মিথ্যে প্রমাণ করে সেই নিগূঢ় বাস্তব উঠে আসে এই সংলাপে–

> “প্রকৃতির টান একদিকে, আর এই সভ্যতার টান উল্টা দিকে। প্রকৃতি প্রয়োজন হইলে দেহে লোম দেয়, আর মাইনষে ভব্যতা কইরা পিরাণ পরে। আর তাই ঘোড়ারে কুত্তারে উলঙ্গ মনে হয় না, কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটা

লোক উলঙ্গ হইলে দেখা যায় না। হিঃ হিঃ হিঃ বাবুমশয়, ক্যানসার হয়, দেইখছেন?এই সভ্যতাটা হইল মানুষ–জানোয়ারের ক্যানসারাস গ্রোথ। তাই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আর জীবনের অর্থ নাই। অর্থ হইল মাত্র এক একটা ক্ষণে। কতদিন আগে ফুলশয্যার রাতে যখননি নূতন বউয়ের গায়ে হাত দিছিলাম, হেই একটা ক্ষণ। হেই বউ বুড়ি হইল, কদাকার হইল, মারা গেল, – সব মিথ্যা। হেই ফুলশয্যার রাতে দুইজনার – হেইটাইএকমাত্র সত্য।”[৫]

আসলে জীবনের সেই উপলব্ধিগুলোই নিরেট যেখানে কোনও স্বার্থ নেই। তাই বিকাশ অনুভব করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র হচ্ছে এই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ এবং সেই মানুষের কেন্দ্র সে নিজে। কেননা জীবনের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েও সে উদ্ভ্রান্ত সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায় নি। অটুট আদর্শের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়নি।

সত্য ভালোবাসার সুকুমার অনুভব আজীবন বিকাশ লালন করেছে খুকুর প্রতি, তার গোপন আঘাতের মত।তাই সমীর, আদিবাসী যুবক কুরলার বা অন্য পুরুষের প্রতি খুকুর আসক্তির কথা জেনেও যখন খুকু তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছে তখনও বিকাশ তার প্রতি অমলিন ভালোবাসার বোধ প্রকাশ করতে পেরেছে। কিন্তু যখনই খুকু জানতে পারে যে তার জীবনের ইতিবৃত্ত সবই বিকাশের নখদর্পণে তখন সে পালাতে চায়। কেননা নিজের কদর্য ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে ভয় পায়। অথচ বিকাশ কুরলা ও খুকুর সন্তানকে তার কাছে রেখে যেতে বলে তার আদর্শ ও ভালোবাসার উত্তরাধিকারী করবে বলে। এই বৃহত্তর ভালোবাসার বোধেই বিকাশ তার ভালোবাসার মুক্তি খুঁজেছে। খুকুর প্রতি অমলিন ভালোবাসা, নিজের আদর্শের প্রতি সত্ থাকাই বিকাশের বেঁচে থাকার রসদ। স্বার্থমগ্ন নয়, স্বার্থবিবর্জিত হয়েই জীবন অতিবাহন করেছে বিকাশ। অপ্রাপ্তির আনন্দেই জীবনের মুক্তি পেতে ও বৃহত্তর ভালোবাসার বোধেই অবিচল থেকেছে বিকাশ। বিভ্রান্ত সময়ের ঘূর্ণিপাকে অবিচল আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছে বিকাশ। সত্ উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা আসলে নাটককার শম্ভু মিত্রের জীবনদর্শনেরই গূঢ় অনুভব। রাধার মতই জীবনাদর্শের প্রতি এবং ভালোবাসার সত্য উপলব্ধিতেই অবিচল আস্থা ও নিষ্ঠা ছিল নাটককার শম্ভু মিত্রের। নাট্যশিল্পের প্রতি এই অবিচল সত্যনিষ্ঠা তাঁকে সৎনাট্য সাধনায় করেছিল।তাই এই নাটক সময়ের ঘূর্ণিপাকে আদর্শকে ভাসিয়ে না দিয়ে চাঁদ বণিকের মতই অবিচল সত্যকে সঙ্গী করে পাড়ি দেবার সাহস যোগায়।

তথ্যসূত্র :

১। শাঁওলী মিত্র (সম্পা), ‘শম্ভু মিত্র রচনাসমগ্র ১’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৪৭

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬০

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৪
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৬
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৯

॥ আকর ও সহায়ক গ্রন্থ এবং সহায়ক পত্রপত্রিকা॥

১। শাঁওলী মিত্র (সম্পা), 'শম্ভু মিত্র রচনাসমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা৯ -, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪।

২। মিত্র শম্ভু, 'সন্মার্গ সপর্যা', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড .সি., কোলকাতা৭৩-, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০২।

৩। মজুমদার স্বপন, 'বহুরূপী ১৯৪৮ '১৯৮৮ –, বহুরূপী, কোলকাতা৭৩ –, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

৪। মিত্র শাঁওলী (সম্পাদিত-সহ) ও রায় অনিত (সম্পাদিত), 'শম্ভু মিত্র ধ্যানে ও : 'অন্তর্ধানে, নান্দনিক, কলকাতা৯ -, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৫। মিত্র শাঁওলী, 'তর্পন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা৯ -, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮।

৬। মিত্র শাঁওলী, 'ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট .সি. লিমিটেড, কোলকাতা৭৩ -, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬।

৭। মিত্র শাঁওলী, 'শম্ভু মিত্র ১৯১৫ -১৯৯৭ বিচিত্র জীবন'পরিক্রমা-, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।

৮। 'নাট্যচিন্তা', সম্পাদকরথীন চক্রবর্তী -, শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭।

৯। '৩নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জানুয়ারি ১৯৯৩।

১০। নাট্য আকাদ'েমি পত্রিকা ৬', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা, ১৯৯৯।

১১। 'বহুরূপী পত্রিকা', ১ থেকে ১০২ সংকলন, ১৯৫৫ ।২০০৪ –

১২। 'পশ্চিমবঙ্গ', শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা১-, বর্ষ ৩৪, সেপ্টেম্বর ২০০০।

১৩। 'দেশ', ৬৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় ১৪০৪, ২৮ জুন ১৯৯৭।

Kant's philosophical system and the idea of peace

Paramita Datta
Assistant Professor, Department of Philosophy
J.K College , Purulia

Abstract : Kant's is an in-depth study of peace . His peace tract 'Toward Perpetual Peace: A philosophical Project' published in 1795. It is an integral part of his philosophically system. According to him a philosophical system is built upon the foundation of metaphysics . He speaks of two types of metaphysics- metaphysics of nature and metaphysics of morals. First contains all the principle of pure reason concerned with our a-priori principles. according to him pure reason as to major dimensions – theoretical and practical. Pure theoretical reason must postulate the ideas of soul , the whole world and God. The validity of these ideas practically established by pure practical reason which prescribes its principles dogmatically in the form of imperatives to the will. As Kant states the fundamental principle of imperative "Act so that thou canst will that thy maxim should be a universal law , be the end of thy action what it will." If the end of perpetual peace is a duty, it must be necessarily deduced from this general law. Peace is the creative essence of human existence. It lies in achieving harmony among different states of individual and collective existence. Inequalities among states, causing conflicts in the forms of violence, are factual and realistic. But the real truth of man is to explore the humanistic way of overcoming. Realization of Kant's peace lesson by the U.N.O. and inclusion of his many articles in the U.N.O. constitution are a green signal to the end of perpetual peace. But the world is not yet war free. We have to go a long way which Kant has shown .And thus his ideal of perpetual peace is neither a denial of war irrespective of causes or conditions. It is the only answer to the problem of humanity's survival. His theory paves the way of solving global crises like terrorism.

Keywords: Pure reason , A-priori, Perpetual peace and Right.

Kant's life (1724-1804)spanned almost the entire eighteenth century. His philosophical project "Toward Perpetual Peace- A Philosophical Project"

is a reflection of his thought about man's duty towards society. Kant's is an in -depth philosophical system . His philosophical works constitutes this system. By a system Kant understands the unity of the manifold modes of knowledge under one idea . A philosophical system as Descartes explained is like a tree whose roots are metaphysics , trunk is physics and branches are all other sciences . According to Kant A philosophical system based on the foundation of metaphysics.

Kant thinks, metaphysical questions are very natural and human nature can not ignore those questions. Moral sciences like ethics, religion, politics etc. depends upon metaphysics for guidance and leadership. Kant speaks of two types of metaphysics – metaphysics of morals and metaphysics of nature. Metaphysics of morals is concerned with a- priori principles. On the other hand metaphysics of nature contains all the principles of pure reason. Kant uses the term 'reason' in several senses, explains the different functions of reason and builds a grand philosophical system. The term 'reason' is used by him in two broad sense – pure reason which is theoretical in character and concerned with knowledge. Practical reason is concerned with our actions. On this basis Kant makes a bifurcation philosophy into two distinct branches – theoretical and practical philosophy. It is due to practical reason that metaphysics of morals is possible. Practical reason works by imposing imperatives upon it. Kant speaks of two kind of imperatives- hypothetical and categorical. On the otherhand if the action is good in itself the imperative is categorical. Kant regard peace as a duty. According to him man must desire peace not only as a material good but also as a state of things resulting from our recognition of the precepts of duty.

Kant's peace study has politico- moral flavour. He was inspired by the French Revolution. He felt that the nations of Europe were being bound by commercial interests. He clearly realized that the spirit of commerce was the strongest force in the service of maintenance of peace and that in it lay a guarantee of future union. Thus the scheme of a federation of nations of the world in accordance with principles which would put an end to war between them was one whose interest for Kant seemed to develop during the last twenty years of his life. Kant's attention is how to unite the various individual wills into one general will

without abrogating the autonomy of each separate will. Kant is convinced that all men are entitled by nature to equal rights. But they must accept some limitations of his rights and liberty for the co-existence of equally well founded freedom of his fellow citizens. According to him statutory freedom , legal equality and civil independence are necessary condition of citizenship. Kant opines true politics to conform to justice. Justice can never be made to fit politics. Politics must bend the knee to justice.

Kant's 'Idea for a Universal History from a Cosmopolitan point of View' was published in 1784. Here we find that realization of perpetual peace is ethical and political summum bonum, for here the aims of moral and politics coincide. There are two conditions of peace treatise - negative and positive conditions. Kant calls them preliminary and definitive articles. There are six preliminary articles.They are based on the principle that anything which threatens the peaceful co-existence of nations must be demolished. They may be stated as follows:

1. No treaty of peace shall be regarded as valid, if made with secret reservation of material for a future war.
2. No state having an independent existence – whether it be great or small-shall be acquired by another through inheritance, exchange or donation.
3. Standing armies shall be abolished in course of time.
4. No national debts shall be contracted in connection with the external affairs of the state.
5. No state shall violently interfere with the constitution and administration of another.
6. No state at war with another shall countenance such modes of hostility as would make mutual confidence in a subsequent state of peace.

Kant divides these articles into two. According to him article 1,5and6are of strict kind which hold regardless of circumstances. Others (2,3 and 4) though they are not exceptions from the rule of law,are subjectively broader in respect to their observation. Kant thinks these articles are meant for eradicating the proximate causes of war.

Kant thinks these articles are meant for eradicating the proximate causes of war. He adds three definitive articles for eradicating the remote

causes of war. They are-1. The civil constitution of each state shall be republican,2.the law of nation shall be founded on federation of free states,3. The rights of men ,as citizens of the world, shall be limited to the conditions of universal hospitality.Hospitality does not mean the right to be accompanied as a guest in a foreign country, but only the right to visit and reside in it. This is not a question of philanthropy, but of duty imposed by rights. In this way far distant territories may enter into peaceful relationswith one another.These relations may at last come under the control of law, and thus the human race may be brought nearer the realization of a cosmopolitan constitution.

According to Kant democracy is necessarily despotism for it established an executive power in which 'all' decide for or even against one who does not agree. He speak's of league of peace. It tries to end all wars for ever. The idea of federation gradually spreading over all states, leads to perpetual peace. Both morals and politics are two enterprises of Kant's practical philosophy. And it is the system of morals which is his prime concern therein. There can be a conflict between moral and politics. If they can be completely brought into concord , then the thought of contrariety, is absurd. He expressly states his own hope of a moral politician who understands the principles of statesmanship to be such as do not conflict with morals. Kant opines that right must be held sacred by people, however great its cost and sacrifice to the ruling class may be. Kant thinks all politics must bend the knee to the principle of right and may in this way hope to reach toward perpetual peace.

<u>Books and Reference</u>

Action, H.B. Kant's Moral Philosophy (London; Macmillan, 1970)

Allen, W. Wood Kant's Ethical Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

Aune, Bruce Kant's Theory of Morals (Princeton: Princeton University Press, 1979)

Bird, G. Kant's Theory of Knowledge (London: Routledge and Kegan Paul, 1962)

Bourke, John 'Kant's Doctrine of "Perpetual Peace"', Philosophy, 1942

Broad, C.D. Kant — An Introduction,
Ed. C. Lewy (London: Cambridge University Press, 1978)

Caird, Edward The Critical Philosophy of Kant (New York: Kraus Reprint Co., 1968)

Croce, B. Aesthetic, tr. Douglas Ainslif
(Calcutta: Rupa and Co., [n.d.])

Women Negotiating Facets of Patriarchy and Political Violence in Easterine Kire's novel : *A Terrible Matriarchy*

Jahira Hossain
Assistant Professor, Department of English,
Surendranath College, Kolkata
Sharmistha Chatterjee
Professor, Department of English
Language Teaching, Netaji Subhas Open
University, Kolkata

Abstract: The present paper will make an attempt to look into the specificities of gendered negotiation with the shifting paradigms of identity in the process of secessionist state formation in North East India. To understand how literary imagination refracts such kind of negotiation, I propose to refer to the novel *A Terrible Matriarchy* by Easterine Kire from Nagaland. The gendered negotiation of the multi-faceted layers of violence, in the scope of the novel, has been presented in a strictly patriarchal social structure that is being appropriated otherwise under the apparent veil of a matriarchal set up. Kire's novel unravels the experience of three generations of women and how they come to terms with their experience of violence and formation of identity in Nagaland. Kire in her narrative has recorded the experience of three generations of women who have been trying to grapple with the idea of a nation state and the violent political uprisings that had taken a toll on the normal flow of their lives since the time of the Second World War. The novel under study encapsulates many layers of negotiation with the sense of belongingness to a sub-national state that is going through constant changes and violent political uprisings.
Keywords: Gendered violence, Conflicts, Sub-nationalism, Patriarchy/Matriarchy, Identity.

The prevalence of patriarchal hegemony in the national and post-national imagination of state formation has mostly been responsible for most of the gendered violence that the Indian sub continent has experienced

during the partition and other major post-independent sub-national movements in India. A gaze at the conflict torn regions of North East India also unveils the same pattern. Though there can be no homogenous pattern of experience in North East India and the identity itself calls for a negotiation and appropriation of diverse socio-political, ethnic, linguistic subjectivities, it can be broadly said that the violent uprisings in North East India since 1960s have altered the patterns of existence a lot. The period since the 1960s have been one of intense socio political turbulences, armed rebellions and state supported armed repressions in large parts of North East India.

The politics of postcolonial state formation in North East India is largely a masculinised project. In this discourse of sub-national state formation in a postcolonial context, women hardly figure anywhere with much agency. Conversely, there is copious evidence that attest to the unprecedented gendered violence that resulted from the conflicts and political uprisings of secessionist policies. Women have been mostly the victims of insurgency, standing at the receiving end of the corporeal and psychological violence perpetrated both by armed rebels fighting against the Indian state as well as by the state's armed machinery.

In the post-colonial context, the integration of the nation states in North-East India becomes one of the most debated political changes. Post-colonial thinkers like Sanjib Baruah, while deliberating on the problematic of the assimilation and integration of nation states in post-colonial scenario, advocated the ideological contentions of sub-nationalism. The emerging sub-national identity in Nagaland was framed along the lines of ethnicity, like most other regions of North East India. The ethnic conflicts resulting from the sub-national assertions remained unresolved perpetually as the centre never paid any substantial attention to resolve the issue.

Nagaland is one of the most conflict torn regions of North East India. It is a region surrounded by China on the northwest, Myanmar on the east, and India on the southwest. A look at the colonial history of Nagaland reveals that commercial interests and the discovery of the tea plantations in "Assam" (then) led to the colonization of the region. The Nagas underwent unprecedented political, social and cultural change with the process of colonization (Thong 16). The most significant political conflict that has stirred most of the political uprisings in Nagaland since

the independence of India is the Naga conflict. The Naga conflict started right after the independence of India in 1947. The Naga leaders refused to be a part of independent India and the clash between the centre and the Naga leaders soon turned into armed conflicts. The result was materialised into the declaration of Nagaland as an independent state of the Indian Union in 1963. Leading to further conflicts, however the Indo-Naga conflict remains unresolved perpetually. The dimensions of the Naga insurgency can be summed up in the words of Sanjib Baruah:

> Since the formation of Nagaland many Nagas have participated in the Indian political process while the independentists have remained opposed to it. But the line between the independentist and the integrationist factions in Naga politics have remained blurred, and the armed conflict has persisted with two interruptions prior to the current one: a failed peace process in the mid 1960s and an accord signed in 1975 – between the Indian government and a few individual leaders – which was interrupted as a sell-out by many and as a result, it re-energized the rebellion. (Baruah 98)

The long-standing Indo-Naga conflict posed serious threat to the integral structure of the society. The violent armed conflicts had a gnawing impact on women as the political violence was largely gendered in nature. Nagaland, the sixteenth state formed within the union of India, on December 1, 1963, survived the agony perpetrated by the persistent Indo-Naga conflict over the claims of an autonomous state.

The Naga society is a patriarchal society. The patriarchal structure of the Naga society, which is further dealing with never-ending socio-political conflicts, widened the chasm of insecurity and lack of agency among women. The mechanisms of patriarchy get an impetus through the practice of warfare and political conflicts. Reeling under the impact of political unrest, women are rendered more vulnerable. Cynthia Enloe through her work has deliberated on the linkage between nationalism and masculinity that render women as vulnerable with an exclusivist method from the political affairs of nation-formation. She states,

> [It is] because they see women as the community's or the nation's most vulnerable possessions; the principal vehicles for transmitting the whole nation's values from one generation to the next; bearers of the community's future generations- crudely,

> nationalist wombs; the members of the community most vulnerable to defilement and exploitation by oppressive alien rulers; and most susceptible to assimilation and co-option by insidious outsiders. (Wilford 15)

The early phase of writings from Nagaland was infused with the agony of political strife and violence that had held the normal Naga life in its strong grip for so many decades. The initial literary representations were authentic expressions of the suppression and violence that the Nagas had been subjected to, right from the first British invasion in 1832 to the Japanese invasions of the Nagas during the second world war, the violent clash between the Nagas and the British during the Kohima war (1944), their struggle for freedom and its repression by Indian Army during 1955 and the long sustaining turbulence resulting from these conflicts that perpetrated the normal Naga life throughout these years.

Easterine Kire, the celebrated Naga writer was born on 1959 to an Angami Naga family in Kohima. Growing up in Kohima in the 1960s she very closely experienced the conflict fought close to the Naga village and that is why her account of the Naga experience remains one of the very authentic records of the conflict and violence. Her works have been translated into German, Croatian, Uzbek, Norwegian and Nepali. In 2011 she was awarded the Governor’s medal for excellence in Naga literature.

Kire’s novel *A Terrible Matriarchy* showcases the various cultural and social aspects of the Naga people, especially the Angami Nagas. The novel narrates the coming of age story of a young girl, Dielieno and the otherisation she faces while growing up. This novel is greatly inspired by Kire’s personal experience and how she has observed the society. The novel starts as Dielieno is sent off to live with her grandmother, the “matriarch” of the family, and under her strict supervision, Dielieno is subjected to all sorts of prejudices that the Grandmother herself has grown up facing. As Dielieno grows up, she starts to develop a sense of disrespect and resentment towards her grandmother. The relationship of the grandmother with this young female member of the family speaks volumes about the cultural beliefs of a patriarchal society that even under the garb of matriarchy appropriates the male supremacy and advocates for the suppression of women in a family set up. In the preface of the novel Kire states her intention to negotiate with the subverted forms of patriarchy that is perpetuated through the

apparent forms of matriarchy. She contends that the apparently visible structure of the novel is “patriarchal and seems focused on bringing out the misuse of the patriarchal system, the less visible under-structure is matriarchy and how it abuses the patriarchal structure resulting in gender abuse within the same gender”(Kire ix).

The three generations of women in the novel whose experience of violence differs widely from each other weave a larger narrative of a long saga of conflict that marks the region. The youngest of the three generations, Dielieno’s experience is the most startling. As she grows up in a land that reminiscence of war and dislocation, her identity is shaped through the stories of the horrors of war from her mother and the patriarchal injustices that had been meted out to her grandmother. Kohima, the city where she has grown up, in her imagination becomes a distant land upholding tales of war and dislocation through her mother’s tale. The irony of such kind of projection is that, Mesanuo’s childhood is crafted with the images of violence of militancy in the region and the tales of dislocation from her mother’s generation seems to have an alienating effect on her psychology:

> She described a Kohima I had never known, trees and houses bombed out till only black ruins and stumps were all that were left. Before the war, she said For mother, life was divided into these two phases, before the war and after the war, and life, in her opinion, had always been better before the war. (Kire 170)

The Second World War remains one of the most devastating factors for Nagaland. The War and the presence of armed agents of the war had caused serious damage to the survival pattern on women. Looking through the gendered prism, the experience and connotations of spatial and sub-national identity gets a new paradigm shift. Kire in her narrative has recorded the experience of three generations of women who have been trying to grapple with the idea of a nation state and the violent political uprisings that had taken a toll on the normal flow of their lives since the time of the Second World War. The novel under study encapsulates many layers of negotiation with the sense of belongingness to a sub-national state that is going through constant changes and violent political uprisings. The gendered experience in the novel reveals the many layered nuances of vulnerability of women and subtle ways of negotiation with perpetration of violence as a normalised pattern of lives.

Life is so entrenched in violence that the memories of violence is a normal pattern of looking back for the women characters in the novel. Dielieno's mother has her share of experience of violence. She has witnessed the debilitating impact of the Second World War and Dielieno has a strange negotiation with the memories of the War:

> Mother had many memories of the war. Of being evacuated from Kohima and travelling to Dimpur in an army convoy with her parents and brother and baby sister, returning home in June only to find that their home was too ruined by the shelling to live in, huddling in a neighbour's hut while her father and uncle quickly made them a shelter with sheets of tin from the British Government. (Kire 169)

The formation of identity itself is a part of the vivid memories of the violence of war. The contour of the configuration of a state that is reeling under the threats of the Second World War, Kohima, during the Second World War itself was undergoing unprecedented changes during the Second World War. The impact of the vivid descriptions of violence is not only psychological, it is metaphorical and the vividness makes it appear to be tangible as well. As every form of boundary of the state was redefined, the cultural and social sense of belongingness also got transformed.

Roshmi Goswami, in one of her papers on women in armed conflict very aptly states: "Women experience greater violations being caught between different violators and in view of the fact that in such situations patriarchal values are manifested by both state and non-state violators" (Goswami 2000). The North eastern region of India has been a hotbed of ethnic conflicts for the past several decades. The conflicts have had serious ramifications on the resources of the region, rupturing the communal harmony and creating fissures amongst the once peaceful ethnicities. In all of this, women have been the worst sufferers as women play multiple roles in these societies. Their suffering is manifold as they have had to suffer immense untold misery as mothers, sisters, daughters, caregivers and victims in conflict, which has till date brought about great destruction and despair amongst the people.

The novel reveals layers of nuances of armed violence as experienced by three generations of women. Even the social norms and roles are ascribed to different genders based on the nature of the hunting

tradition of the tribal people. The patriarchal norms hold such a strong grip on women that they don't even consider the possibilities of countering such practices. Instead, elderly women members of the family become advocates to propagate such norms "to teach you to become a good woman" (Kire 249). The gender biases run so deeply in the society that Dielieno resents as she says about her grandmother, " I know that she held it against me that I was a girl and not a boy. I used to feel I was being punished for being born a girl. For many years, I hated it so much I wished that I was not a girl" (Kire 249).

The matriarch of the novel, the grandmother inhabits a sense of non-belongingness to the nation state and inherits a sense of lack and all her resentments against her female heir spring from such deep-seated anxiety in a conflicting social structure. Lack of agency and authority in a patriarchal social structure at the backdrop of violent state conflicts makes her appease her grandsons to get validation and security. The lack of agency of women who do not have much control over the larger conflicts of the society led to such kind of otherisation and insecurity within the family setup. The women in the post-colonial scenario are the worst sufferers. They have grown up with the images of violence as well as soft violence that lingered in every sphere of the society.

Grandmother's such deep prejudices against Dielieno is rooted in her own childhood experience of growing up in a society where women neither had any agency, nor any claim over property rights. Naga society is a typically patrilineal society and the Nagas derive their social identity and inherit their land from their fathers. Women do not have any share in the inheritance of the lands. Women, nevertheless, carry out the most difficult job of working in the fields and other sectors.

Grandmother's experience of growing up resonate the same status of otherisation as stated above. When Grandmother was young she had experienced the evils of patriarchal norms and the injustices meted out to women, "In the village, widows without sons lost all their husband's property to other male relatives. So she understood that it was very important for a married woman to produce as many male offspring as she could" (Kire 250). She had experienced the social injustices perpetrated on her own mother, so all the women across generations are tied with a shared experience of victimisation. The experience of watching her own mother face the patriarchal bias and exclusion from

every aspect of the society due to the lack of a male member in the family made her realise the true exploitative nature of patriarchy. Standing at the receiving end of the violence and patriarchy, she becomes the matriarch who appropriates and substantiates the norms of patriarchy desperately.

These narratives of gendered violence opens up a completely new discourse to address the indigenous experience of political violence which upholds a counter stance to the notion of a meta-narrative that was imposed by the project of colonial modernity. Such a call for the identification of the generations of experience of violence is very essential for the reading of secessionist violence. It becomes a part of a new discourse where the indigenous sensibility is not conformed to any existing parameter of acceptance. The gendered negotiation of the multi-faceted layers of violence, in the scope of the novel, has been presented in a strictly patriarchal social structure that is being appropriated otherwise under the apparent veil of a matriarchal set up. Kire's novel unravels the experience of three generations of women and how they come to terms with their experience of violence and formation of identity in the conflict torn Nagaland.

Works Cited

Barua, Sanjib. *Durable Disorder: Understanding the Politics of Northeast India.* New York: Oxford University Press, 2005.

Das, Nigamananda. *Matrix of Redemption : Contemporary Multi- Ethnic English Literature from Northeast India.* New Delhi: Adhyayan Publishers and Distributors, 2011.

Goswami, Roshmi. "Women in Armed Conflict Situations- The Need for a Human Rights
Framework", *Journal of Women's Studies.* Dibrugarh University: 2000.

Hutton, J.H. *The Angami Nagas: With Some Notes on Neighbouring Tribes.* 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1969.

Kire, Easterine. *A Terrible Matriarchy.* New Delhi: Zubaan, 2007.

Misra, Tilottama. *The Oxford Anthology of Writings from North- East India: Fiction.* Oxford University Press, 2011.

Sanyu, Visier. *A History of Nagas and Nagaland (Dynamics of Oral Tradition in Village Formation).* New Delhi: Commonwealth Publishers, 1996.

Thong, Tezenlo, *Colonization, Proselytization and Identity: The Nagas and Westernisation in Northeast India.* USA: Palgrave Macmillan, 2016.
Wilford, Rick., and Robert E. Miller. *Women, Ethnicity and Nationalism: The Politics of Transition.* London and New York: Routledge, 1998.
Zama, Margaret Ch. *Emerging Literatures from Northeast India: The Dynamics of Culture, Society and Identity.* Delhi: Sage Publishers, 2013.

EMPLOYMENT GENERATION PROGRAMMES IN SERAMPUR SUBDIVISION-A GEOGRAPHICAL REVIEW

Sourav Das
Assistant Professor, Dept. of Geography,
Asutosh College, Kolkata

ABSTRACT: Employment generation is a natural process of social development. Human beings bring with them into the world an array of needs that present employment opportunities for others to meet. Employment generation refers to the process of creating new job opportunities within a given economy or society. It involves the creation of work opportunities for individuals, leading to increased employment rates and reduced unemployment. Employment generation can occur through various means, such as the establishment of new businesses, expansion of existing industries, government initiatives and policies, foreign investments, and entrepreneurship. It is a crucial aspect of socioeconomic development, playing a significant role in poverty reduction, economic growth, and overall welfare improvement. Unemployment is a burning problem which persists both in urban and rural areas of different districts of West Bengal.To solve unemployment problem employment generation is one of a way-out but because of the failure of proper employment generation strategies level and magnitude of unemployment problem increased day by day. In the context of increasing poverty and unemployment governments have launched special employment generation programme. This paper deals with the different employment generation programmes in Serampur Subdivision of Hugli District in West Bengal.Attempt has been made to evaluate the performance level of different government plans and other initiatives taken by the proper authority to overcome the unstable situation of unemployment related issues in the study area.

2. KEYWORDS: Employment generation, Underemployment, Self-help group, Employment strategy.

3. INTRODUCTION: Creating jobs is a keystone of any economic recovery program. Many activities can fall under the rubric of job creation, including immediate short-term opportunities that yield quick impact, or the development of more enduring livelihoods in the civil service or private sector. Progressive reduction of unemployment has been one of the principal objectives of economic planning in India. It has been envisaged that the growth of the economy would not only increase production but also provide the capacity for absorbing the backlog of unemployment and under-employment and a substantial proportion of the additions to the labour force. The solution to the problem of unemployment-and the poverty that goes with it-has to be found ultimately through a high rate of overall economic growth. It is, therefore, necessary to have supplemental programmes for specific target groups/areas for employment creation, income generation and poverty alleviation. These have taken the form of direct employment programmes for providing seasonal employment to the agricultural labourers on rural capital works and infrastructure creation.

4. THE STUDY AREA: The study area covers Serampur subdivision of Hugli District. Serampur subdivision is located in the southern part of the Hugli district between 22° 39’ 32” N and 23° 01’ 20” N latitude and 87° 30’ 15” E and 88° 30’ 20” E longitude.The subdivision consists of four C.D blocks namely Serampur-Uttarpara with headquarter at Serampur, Chanditala-II with headquarter at Chanditala, Chanditala-I with headquarter at Masat and Jangipara with headquarter at Jangipara.Serampur is the headquarter of the subdivision. Serampur subdivision covers 354.07 km².

5. OBJECTIVES:

The main objectives of the study are as follows-

1. To examine the different employment generation programmes in the study area.
2. To know the success and failure of different job schemes in Serampur Subdivision.

6. ANALYSIS AND FINDINGS:

Employment generation as an objective does not mean the adoption of static technology. It is not advisable to insulate the economy from the world trends in technological changes. Technological up gradation, modernization and scientific advance in production process constitute the essence of growth of productivity whether it is in organized industry, agriculture or small industry. A clear view of efficiency and employment effects downstream should be formulated before setting about the management of technological change. There must be suitable arrangements and adjustment policies in terms of education, training and retraining and re-orientation of workers in order to avoid dislocation effects and make the process of technology adoption smooth.

In formulating the employment strategy, a key role has to be assigned to the growth of the agricultural sector. A steady growth in agricultural production through the expansion of irrigation, increase in cropping intensity and the extension of new agricultural technologies to low productivity regions could create a large volume of additional employment. However, the agricultural sector alone cannot be expected to eliminate the backlog of unemployment and absorb the additions to the labour force. The rate of industrial growth must be accelerated. However, as experience has shown, even a high rate of industrial growth would not be able to create additional employment to absorb more than a fraction of unemployed and under-employed labour force in the organized industrial sector. Therefore, programmes of rural development and, in particular, massive rural capital formation in the form of construction become necessary. This strategy would also help to raise the rate of growth of agriculture. Further, it would increase the income of the weaker segments of the population and thereby provide the demand support to the growth process.

The problem of the educated unemployed raises special issues. It has to be tackled through proper educational planning and schemes of training, skill formation and entrepreneurial development.

The expansion of employment that ensures adequate livelihood security and decent conditions of work ought to be the bottom line in the pursuit of economic development in a country like India dominated by what is called the informal economy.

Serampur subdivision is economically not so strong because of its critical unemployment status. From household survey, it has been identified that majority of the population mainly lives in rural part and they do not even get job for 180 days in a year, which is not adequate for sustaining their livelihood. Even then, they do not get minimum wages envisaged in minimum wages act. Employment generation and poverty alleviation are one of the main objectives of plan programmes. Steps are being taken to provide opportunities for the poor and weaker section to participate in the greater process. There are good numbers of Government schemes for employment generation, poverty alleviation and social sector programmes which are also to be harnessed to yield optimal benefit for the poor and weaker sections of the population.

These programmes need to be strenghen and restructured basing on the local needs with special plan covering the following objectives.

A. Government Plans/Schemes:

- To implement coverage of community structure like CDS, SGH etc.
- To create livelihood opportunities of the Thrift and Credit Groups.
- To improve the existing institutional structure for implementation of government schemes specially directed to the economically weaker section of population of the area.
- To maintain poverty data bank at the UPE level and regular inter action among them.

B. Non Plan/Other Initiatives:

- To provide support for individual livelihood opportunities for economically backward community including informal squatters and informal settlers deprived of getting benefits of government schemes.

The following data were collected from the available Municipal records. This phase involved a review of existing documents and information through discussion with stakeholders at municipality level.

1. SwarnaJayatiSahariRozgarYojana (SJSRY)
2. Bangla Swanirvar karma SansthanPrakalpa (BSKP)
3. Prime Minister RozgarYojana(PMRY)
4. Annapurna Anna Yojana
5. Annapurna AntodayaYojana
6. Udiyaman Karma SansthanPrakalpa (UKSP)

7. Special component plan for SC (SCP)
8. State Assisted Scheme of Provident Fund for Unorganized Workers (SASPFUW)
9. Special component plan for ST (STP)
10. Disability Programme
11. IGNOAPS
12. NFBS
13. Widow Pension
14. Mahila Samriddhi Yojana
15. Minority Development Programme

i. Swarnajayanti Sahari Rojgar Yojana (SJSRY): One of the most important Government sponsored Self-Employment programmes i.e. Swarnajayanti Sahari Rojgar Yojana (SJSRY)**,** a Govt. of India sponsored poverty alleviation scheme since 1st December, 1997. It is primarily an employment generation programme. The basic objective of SJSRY is to make improvement in the quality of life of urban people living below the poverty line (BPL). Implementation of this scheme is required to be organized through ULBs and community structures. The SJSRY programme is funded by the Government in the following schemes:

- Self-employment Programme
- Thrift and Credit Groups
- Wage and Employment Programme.

SJSRY programme is not yet started in the municipal level of the study area.

Prior to the implementation of S.J.S.R.Y Scheme, Urban Basic Services for the Poor scheme (U.B.S.P. scheme) were in vogue in this Municipality, wherein basic needs of the people living below poverty line were essentially required to be fulfilled.

After the discontinuance of U.B.S.P. scheme S.J.S.R.Y. Scheme was introduced in the different municipalities of Serampur subdivision. The main aspect of this scheme is to accelerate the economic development of the poor people living in slum areas and other different indigent areas of the Municipalities.

ii. Maintenance grant for SC/ST students: The scheme is operated in the municipal level of Serampur subdivision which is sponsored by District Backward classes Department– the scheme

coverage includes payment of Rs. 480 per student as maintenance SC/ST grant to 100 students of the Municipalities, reading in class V to Class VIII.

iii. **State Assisted Scheme of Provident Fund for Unorganized Workers (SASPFUW):** This is a scheme initiated by Govt. and being operated in the Municipalities to provide insurance coverage for accidents illness etc. for the employees aged between 18-55 years in the unorganized sectors. Here employees pay Rs. 20.00 per month and state Govt. will pay 20.00 per month and the combined amount is deposited in the bank which will refund the amount with interest. Loans required can also be obtained by the insured person. In Dankuni Municipality persons covered are more than 5000.00.

iv. **Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (previously NOAPS):** This is a scheme targeted to provide social security to persons of more than 65 years of age in the BPL families. Under this scheme, so far 415 persons of beneficiaries of all the Municipalities have been included.

Initiatives would be taken up by the municipalities of Serampur-Uttarpara block to implement the following Government sponsored Schemes:

i. Bangla Swanirvar Karma SansthanPrakalpa (BSKP)
ii. Udiyaman Karma SansthanPrakalpa (UKSP)
iii. Disability Programme
iv. MahilaSamriddhiYojana
v. Swarna Jayati Sahari Rozgar Yojana (SJSRY)
vi. Minority Development Programme.
vii. Mahila Samriddhi Yojana.

Role of employment generation schemes in the study area is not up to the mark. Most of the government Schemes has not yet started. Employment exchange is not functioning well. Government of West Bengal has introduced Employment Bank which is primarily a State-owned job-portal and is a unique e-governance initiative of the Labour Department, Government of West Bengal opens window of job-opportunity for job seekers of the State. Employment Bank aims primarily at enhancement of placement opportunities of the job-seekers and secondarily at removing the skill mismatch. The main skill development initiatives are

* Scheme for Skill Development for the Registered Job-seekers.
* Skill Training for the Domestic Workers
* Skill Development for the Workers in the Locked Out Industries
* Special coaching for the aspirants of the Defence jobs
* Self Employment Promotion Initiatives like UdiyamanSwanirbharKarmasansthanProkolpo (USKP), Self-Employment Motivation – cum- Awareness camp.

7. **RECOMMENDATIONS:**

The following remedial measures should be taken to overcome the existing problems related to the study.

- Appropriate macro policies are important for employment generation.
- Improvement of skill and vocational training are needed.
- The area should adopt modern method of agriculture.
- It is necessity to arrange special employment programme.
- Proper planning for utilization of human resources is urgently suggested.
- Implementation of MGNREGS and promotion of 100 days work programme more effectively.
- Enhancement of self-employment scheme.
- Women empowerment.
- Positive role of SHG's
- Proper maintain of employment bank – a web based job portal established and owned by Government of West Bengal.

8. CONCLUSION:

Serampur subdivision is economically not so strong because of its critical unemployment status. From household survey, it has been identified that majority of the population mainly lives in rural part and they do not even get job for 180 days in a year, which is not adequate for sustaining their livelihood. Even then, they do not get minimum wages envisaged in minimum wages act. Employment generation and poverty alleviation are the main objectives of plan programmes. Steps are being taken to provide opportunities for the poor and weaker section to participate in the greater process. There are Government schemes for employment generation, poverty alleviation and social sector programmes which are alsoto be harnessed to yield optimal benefit for the poor and weaker sections of the population. Role of employment generation schemes in the study area is

not up to the mark. Most of the government Schemes has not yet started. Employment exchange is not functioning well. Government of West Bengal has introduced Employment Bank which is primarily a State-owned job-portal and is a unique e-governance initiative of the Labour Department, Government of West Bengal opens window of job-opportunity for job seekers of the State. Employment Bank aims primarily at enhancement of placement opportunities of the job-seekers and secondarily at removing the skill mismatch. But primary survey reveals that most of the inhabitants are not aware about this employment bank and they have not registered their name in government employment exchange also.

REFERENCES:

- Godfrey, M. (2003): "Youth Employment Policy in Developing and Transition Countries-Prevention as well as cure", World Bank Social Protection Discussion Paper, 320, Washington, DC, The World Bank.
- Hardey, Stephen and Upex, Robert. (2006): "Employment Law for Business Students", Sage Publications, London, pp. 12-19.
- Harvey, Charles. Jacob, Jake. Lamb, Geoff and Schaffer, Bernard.(1979): " Rural Employment and Administration in the Third World- development Methods and Alternatives Strategies", Saxon House, England.

Significance of the Myths of Folk Deities in N.D. Rajkumar's Selected Poems

Sudhakar Sardar
Assistant Professor, Department of English,
Acharya Jagadish Chandra Bose College

Abstract: The rituals surrounding folk deities are parts of folk culture. N.D. Rajkumar hasretrieved the myths of folk deities of his community (Dalit kaniyan caste). The poet here subscribes to the perception of B.R. Ambedkar—"The real remedy [for annihilation of caste] is to destroy the belief in the sanctity of the shastras"[1]. Destroying the sanctity of the shastras is next to destroying the religion giving sanction to casteism.With this mission in mindRajkumar, in his anthology of poems *Give Us This Day a Feast of Flesh* (2010)[2]brings in the deities, very much known to the dalits. The deities do not appear to be as dispensers of justice; rather they represent a world that is chaotic in nature, having little association with the definitive perception of good and evil. The chaotic characteristicscomplements the chaos in which the caste victims operate. The deities have temples and stones in the rural areas of Tamilnadu even though not recognized even as minor deities by the mainstream religious culture. They appear only in folklore. Within the purview of religion itself the poet is to offer an antithesis to the prevailing brahminical religionwith which the upper caste people have been enjoying cultural hegemony, a necessary preliminary to political hegemony.

Keywords: myth, deities, folklore, anthology, hegemony.

Introduction: The organic dalit writers like have a tendency to annihilate the concerned religion nourishing casteism. Other dalit writers become involved in iconoclasm. They break the images of the iconic deities like Rama or Durga (in the anthology of essays *Mahishasur: A People's Hero(2016)*, edited by Pramod Ranjan, Krishna, Arjuna, Bheem (in Manohar Mouli Biswas's *Poetic Rendering: As Yet Unborn,* 2010). Even, certain minor characters like Hidimba, Ghatotkach etc. are treated as protagonists, as in Biswas's anthology. But, N.D.

Rajkumar'sprimary objective, as to be found in his anthology of poems *Give Us This Day a Feast of Flesh*, is not to recreate or reconstruct the prevailing brahminical myths. Rajkumar does not want to annihilate his target people's religious orientation. In its stead, he wants to supplant the Brahmin-created mythical deities with the folk deities, known to the lower caste people and, in the process, wants to strike at the root of the cultural hegemony of the dwijas or the twice-born castes.While Biswas does not hint at any substitute religion, the essays in Ranjan lean a bit towards Buddhism, though the main objective is to break down the images of the iconic Hindu deities. But, Rajkumar is to provide the Bahujans (SC/ST/OBC) with alternative regional myths to counter the hegemony of the brahminical version of myths advocating the supremacy of the Brahmins and legitimizing the exploitation of the lower caste people by those belonging to the upper echelons of the caste hierarchy.

The statement*Give Us This Day a Feast of Flesh* appears in Poem 29 where we see the God of the Forest, the very own god of the dalits, praying to the women to "Give us this day/ A feast of flesh/ For all of us,/ The ancient gods/ Living in the stones". This is how the folk deities can only be appeased. The poems translated by Anushiya Ramaswamy are from *KalVilakkugal* (2004) and *Odakku* (1999) both originally published in Tamil. And, the poems come from the pen of an organic Dalit writer, that is, a writer who himself is a Dalit. Rajkumar'sprimary objective is to hold out one antithesis to the prevailing majoritarian religious culture that is to subsume all the folk-centric religious culture based on the concept of equality or equity only to project its own discriminatory religious culture, propagating the divinity of caste.

Content: In the anthology one pagan religion is desired to be replaced by a more pagan one, bordering on something, as if, anarchic with the clear cultural and political objective of dismantling the brahminical hegemony. Rajkumar's repetitive use of invocation, dancing, howling, screaming etc. is to make the presence of the avenging deities felt in the minds of the upper caste people. It is, as if, "to achieve the dismantling of hegemonic Hinduism and the assertion of Dalit identity too easily" (Tellis)[3]. Rajkumar is to counter the Sanskritized brahmanical religion with the folk-based religion with which they have an empathetic relationship. Some such folk deities are Madurai Veeran, Nallammai, Kannathal, Munniyandi, Kuruppu, Karrupannan,

and other such regional gods, having temples and stones in the rural areas of Tamilnadu even though not recognized even as minor deities by the mainstream religious culture. Such deities are given an "aura of divinity and power with the suffixes of "saamy' (a colloquial form of "swamy" or god) if a male, or "amman" ("mother") if female"[4]. Rajkumar is in the mission of establishing the vengeful, rather than passive, forms of his goddesses. The issue can be verified by the fact that in a Kalli (Kaali) temple neighbouring the residence of Rajkumar, the deep black stone of the Kalli idol was covered with yellow sandal paste by the Brahmin priests. The exploiters are not ready to see Kaali as a goddess of vengeance. Like Lakshmi or Sarasvati the hegemonizers want Kaali also to remain passive towards the atrocities on the dalits and who is to project aestheticism through her appearance sans anything (like her bloodshot eyes, dishevelled hair, protruding teeth) signifying vengefulness.

As if the dalit girls, the victims of the lust of the Brahmins, take birth as certain deities to take revenge upon the submissive society, if not the oppressor himself. In Poem 1 we see the sheer derision in the expression of the poet regarding the power of the Brahmins to let one family gain religious merit in the next life. One non-Brahmin,though non-Dalit, family has brought in one Brahmin priest to let themselves "gain religious merit/ in the next life". One 'kollathi girl', a woman belonging to blacksmith community, working in the backyard of the house becomes the victim of the lust of the priest and the family has full consent to this rape. The Brahmin leaves the house "sated on rice and woman". There is sheer derision in the statement that even this sinful priest is eligible to bless the members of the family. The dalit womancommits suicide and comes back in the form of "Kollangottu Amman", one female goddess. Unlike the traditional portrayal of dalits, Rajkumar's dalit victims, as if, die with the pledge to avenge their sufferings.

Then, in the same poem we see another woman, a dancer, usually belonging to the lower caste, whom one upper caste person marries with false promise of love. But, a few days later she is stoned to death in the field, full of cactus. The woman keeps the cactuses as

her witness, gets the birth of "The Dark Blue Goddess of the Cactus Field", Goddess Isakki, demanding "blood-soaked rice". Rajkumar has quite consciously and intentionally made his deities anarchic and restless, hardly to be domesticated.

In Poem 2 the Goddess Isakki, as if, challenges its erstwhile oppressors to read the present manuscript containing extremely violent portrayal of other goddesses who are actually violated and reborn dalit girls. The objective of destabilizing the status quo can be perceived in the claim of the persona that after a reading of their manuscripts "Heads will roll/ Hearts will burst/ Brains will curdle/ All that has been learnt/ Will be lost". The amorality of the world of this pantheon of goddesses can be gauged from the fact that they are not in a mood to be forgiving or clement.

The objective of annihilation of the prevailing religion sometimes becomes so clear as can be found in Poem 6 where a binary is created between "Your god" and the gods of "mine". The persona does not even hesitate to include Jesus Christ in her pantheon of deities to counter the prevailing Hindu hegemony. The perception of threatening is an ever-present issue in the anthology. Whoever is killed out of violence, out of betrayal like Christ or Mudipuram Devi, wander forever like unsatiated or insatiable spirits, demanding blood or lives.

In Poem 9 too the persona is in the same mood of going against the prevailing concerned religion that, under the garb of a benevolent and forgiving portrayal of goddesses actually wants to tame the fury, anger of the victims of the religious rules and regulations. Here too we see the persona to be cherishing the desire to be born "As a devil, / A ghost,/ As Kaali [of original version with gory look]/ And Isakki". Its objective is to, as "vengeful furies" to "terrorise" its oppressor. The refrain of violence is here to destabilize the existing form of religion.

The myths of the daemonic or lesser gods, as appearing in the pre-Christian Greek mythologies, can be found in Poem 13 where the protagonist is seen to be remaining absorbed in the rituals getting performed in high pitch with "villupattu", an ancient form of musical

story-telling method, with the performer having “The burning torch in one hand, /Wearing a loin-cloth” before the folk god SudalaiAandi “Filled with age-old anger”. As they are not religiously entitled to experience “The Brahmam” they feel quite comfortable in joining hands with their “Jungle Gods” like SudalaiAandi.

In Poem 19 again we see their empathetic relationship with SudalaiAandi. The persona reminds the other character about his duty to take revenge when one sympathizer like Sudalai is here with him. In such a situation he should not keep his “sword and shield lie low”. Then, the mood to get the prevailing religion annihilated is revealed through the exhortation of the persona to go and get rid of all the statues “that have/ Sneaked their way in”. Their own gods like Sudalai are replaced quite surreptitiously with the Hindu deities.

In Poem 41 we see SudalaiAandi to be averse to the kind of vegetarian offering as is usually offered to the Hindu deities. “His tongue withered with a steady diet/ Of butter and boiled vegetables”. Being utterly disgusted with such offerings the disgruntled god is claimed to have left his abode and joined the group of people who are to sacrifice “The black male goat”. He is offered the meat “spiced with love”. The god is so pleased with the offering that he expresses his “gratitude” and he also promises “to protect/ When called with such love”. A glaring difference between the formal ritualistic nature of the presentbrahminical religion and the informal sincerity and love displayed through the non-vegetarian rituals of the dalits is presented with an intention to negate the brahminicalreligion.

In Poem 21 we have the same binary of the so-called “greater gods” and the lesser gods or goddesses like Sudalaimaadan, Isakkiamman, UchimahaKaali, Neeli, Sooli, etc. The song addressed to the gods, as can be heard now, is not that of the marginalised people. Their song has been pushed “To the outskirts of the village”. All through the poem we see the mood of denigrating whatever is considered to be belonging to mainstream religious rituals. Naturally enough, annihilation of the prevailing religion is also considered here to be the necessary preliminary for the annihilation of caste.

In Poem 27 weagain see how the folk culture is being subsumed by the authoritative brahminical culture. Under the influence of the cultural aggression the dalit women too are ready to start worshiping the

holy cow of Hinduism. Here the poetic persona lodges grievances against the cultural aggressors regarding the wiping out of the spot where the pork-eating goddess of the dalits stayed. The persona imagines the folk goddess Kaavilammai to be coming to him as queen bee to sting him to consciousness regarding the condition they are dwelling in.

The original inhabitants have been deprived of their very resources—their jungle, their herbs, pigs, folk gods and goddesses, etc. In Poem 29 we see the poetic persona, in retaliation, wishing to get the cow, the very holy animal of the Hindus, to be sliced. And, their own god, the God of the Forest, also, in a very empathetic mood, asks the women to "Give us this day/ A feast of flesh". We see how these folk deities are used to be adjusting to the living condition of the dalits. We see the prevailing vein of getting the so-called mainstream religion annihilated and the folk-deities reinstalled.

In Poem 44 we have the reference to the myths of Kaali and that of Isakki who have been believed to be quite approachable for the Bahujans. The poetic persona here states the anomaly that was caused with the marriage of the persona's son with the daughter of anupper caste father. In the marriage the boy's side had to sacrifice a lot to settle the inter-caste marriage. But, the boy had to submit to the caste-violence and the spirit of the boy demandsthe survivors to avenge his death. It is felt necessary to build a temple for Isakki and also to "Give all your property to Isakki". The reference to the paying of tribute to Kaali or Isakki can be considered to be a clear indication towards the denial of the prevailing religion, as we have seen earlier.

Poem 51, the concluding poetic piece, ends in a note concomitant to the prevailing tone of the anthology. We see the same leaning of the poet towards whatever is unusual. In the very beginning the poetic persona makes it quite clear that he feels rejuvenated only when his "preferred moment/ Of darkness comes". Darkness appears to be preferable to light. Here we see the kudumbi caste people, lying at the strata of the caste hierarchy, lower to the privileged casted but higher to the Dalits, mainly engaged as farm labour, in agricultural activities, inflicting physical oppression and ravaging the properties of the Dalits. The persona wants to avenge the breaking of the canine tooth from his statue, the uprooting of the coconut trees, palmyra trees, destruction of the "Sweet smelling toddy pots". And, in this mission he wants to "Bind

him [the sun] in a sack/ … Drown him" and to "tie the moon to the end/ of my stick". He wants to turn everything upside down whatever is considered to be holy and divine in the prevailing brahminical religion. The objective behind this type of projection is to negate the religion only to negate the concept of caste, rather to annihilate caste with the ultimate objective of annihilating the hegemony of the dwijas.

Conclusion: Thus, in the mythology, as perceived by Rajkumar, we see the folk deities representing extreme collocation of violence. They are 'amoral, aggressive, cruel and bloodthirsty, appeasable only by way of blood and tears'[5]. The deities here embody freedom and unfettered power. The repressed desire to be aggressive and volatile—both socially and sexually—find expression in the behaviours of the goddesses who can hardly be stereotyped. The tension of the marginalized caste people also can be felt in the portrayal of Isakki in such a way as to question the upper caste tendency of homogenizing everything with their recognized deity. The goddess Isakki, coming from the folk culture of the dalits, is in the danger of being co-opted into the Hindu pantheon of mainstream goddesses like Kaali whose gory appearance people have become used to. To keep its hegemony intact militant Hinduism has the tendency of engulfing anything that may pose any possibility of threat to its existence. Hence, it does not let anything stay focussed or grow in its own course. And, Rajkumar's objective is to stem this homogenizing process to counter the hegemony of the upper castes.

Thus, in the anthology, the obvious objective is to get the prevailing brahminical religion destroyed. The only difference of Rajkumar with other organic dalit writers is that whereas writers like Manohar Mouli Biswas only intend the annihilation of the concerned religion propagating casteism Rajkumar appears to be more pragmatic to suggest the resurrection of the myths of folk gods and goddesses, folk religionthat can replace the prevailing brahminicalreligion. Accordingly, almost unknown folk deities are raised to the status of protagonists who are here to replace those occupying premiere places in the whole pantheon of the Hindu deities, certainly with a mission to hit at the cultural hegemony, the basis of their political hegemony, as enjoyed by the upper caste people.

To state again, Rajkumar has quite rightly appreciated the fact that human beings have a natural longing to belong to religion. He has accordingly taken the initiative not to go outrightly against religion. He has tried to suggest an alternative to the prevailing religion as embraced by the dalits today so that the target people do not feel confused regarding the rejection of a religion in which they are born and brought up. Within the purview of religion itself the poet is to offer an antithesis to one of its branch. N. D. Rajkumar suggests a substitute for the prevailing religion and its concerned gods and goddesses that is meant for only a stopgap measure, desired to continue for a certain period for getting the victims of casteism adjusted to the new situation. In course of time they may either be atheist or may embrace, to put in oxymoron, the atheist spiritualism of the Buddha who did not believe in the God or soul, as suggested in Pramod Ranjan's *Mahishasur: A People's Hero*.

References:

1. Ambedkar, B.R. *Annihilation of Caste: The Annotated Critical Edition*. New Delhi: Navayana Publishing Pvt. Ltd, 2014.p. 287
2. Rajkumar, N.D. *Give Us This Day a Feast of Flesh*. New Delhi: Navayana Publishing, 2010
3. Tellis, Ashley. Book Review: *Give Us This Day a Feast of Flesh*. Source: https://www.dnaindia.com/lifestyle/review-book-review-a-poetic-response-to-genocide-1530160. Retrieved on 17.07.2022
4. Ramaswamy, Anushiya. "Afterword". *Give Us This Day a Feast of Flesh*.N.D.Rajkumar. New Delhi: Navayana Publishing, 2010.p. 84
5. Ibid

Humanism in *ShrimadBhagavatGita*

Debasree Sadhu
Assistant Professor, Department of Sanskrit
Mrinalini Datta Mahavidyapith

Humanism is a rational philosophy informed by science, inspired by art and motivated by compassion. Humanism recognises the value or dignity of a man and it inspires him to take the right measurement of all aspects of life including human nature and other things created by the Supreme Being. The definition of humanism is a belief that incorporates the needs and values of man and this is the most important aspect which overshadows any other religious belief for the sake of human needs and values. An example of humanism is the belief that the person creates his own sets of ethics.

Human values about the virtues guide us to take into account the human element when we interact with other human beings. Human values are our respect, acceptance, consideration, appreciation, listening, openness, affection, sympathy, love towards other human beings truth, peace and honesty loyalty etc. Humanism is one of the important theory that has been used in both teaching and learning. Humanism is a belief that individuals control their own destinies through the application of their intelligence and learning.

But now in the present time we face lack of humanism in every sector of our life. Our modern decentralized lifestyle is the result of lack of understanding of the world. The lack of this consistent portrayal of the world divides humanity for thousands of years. Mutual understanding will lead to more universal perceptions of nature than anything else. It is believed that mutual relations between nature and universe are important in nomadic culture and reflected in every aspect of its traditional life. People work together to survive; everything depends on teamwork and their own skills; this is the humanistic healthy work atmosphere. But society has gone through many changes over the last two thousand years, including the periods where our humanity or compression has declined. Today almost everyone wants to achieve something and in this race we have lost our humanity somewhere. We do not take time to be kind and considerate towards others as it does not seem beneficial to us. More

greed for wealth and lavish life, unhealthy competitive mentality, materialistic lifestyle somehow makes us more inhuman.

Human society cannot sustain without human values. But in the modern society we are ignoring our human values. So it is necessary to discuss the subject and bring about awareness. In this article I have discussed that the *ShrimadBhagavatGita* teaches us about humanism and human values for the benefit of entire human society which is now troubled and divided in world characterized by the war for supremacy over one another in the name of religion, caste, ethnicity, language, colour etc.

Sanskrit literature has given much importance to human values. The Sanskrit literature has a clear vision about the life which is undisturbed and pious. Life without human values is waste, meaningless and sinful – "*dharmo hi tesam adhiko dharmena hinah pasubhih samanah*" (Sharma, 0.25).This is why Sanskrit writers have filled their works with human values like truth, charity and service to humanity, self-control, patriotism, respect for elderly people etc. Not only in the Vedic Samhita to classical Sanskrit literature has talked of values and virtues but also the battles in ancient India were based on values such as the war of Kurukshetra which was fought for values.

The *Bhagavat Gita* encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty, kindness and integrity in order to find our purpose and to live it fully. Most definitely the *Gita* is timeless. It is not only relevant in the past, it is also relevant in modern times and will be in the future also. In the present scenario the modern life is so much engrossed with materialistic aspirations and its worst effects which call for immediate attention to the humanistic preaching of *Gita* for the greater good of human life. The *Gita* is the solution of the way of how to live life with ethical views and humanism. This is the book of humanity and for humanity. It underlines the basic principles of leading a life as a good human.

It might be sung in the battlefield. But is not our life ie a battlefield? It is the guide for people to torn between 'mine' and 'yours' for people who are confused between one's duties and responsibilities. It tries to teach us what the purpose of life is; and what is there after life, the truth of life, meaning, values of life. Radhakrishnan writes, "we have in the *Bhagavat Gita* a thing which is rational, ethical and spiritual. Every

side of human nature is answered by it, is fulfilled by it" (*The Bhagavadgita*) The true nature of man is described with the help of appropriate similes in different slokas of the *Gita* – "*na jayate mriyateba kadasin nayam bhutwa bhabita ba na bhuyah ajo nityah sasvato 'yam purano na hanyate hanyamane sarire*" (*Gita*- 2/20), "It is not born, nor it is even mortal and having been, will not pass from existence; ancient, unborn, eternally existing, it does not die when the body perishes." "*Ja enam betti hantaram jaschainam manyate hatam ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate*." (2/19- *Gita*)–it has been said – "when a killer thinks that he is killing and the killed things he is being killed, neither of them verily knows for the soul is neither killed never killing."

At a great crisis of life of man and religion, for the survival of humanity, and to save honesty, the poet of *Gita* makes God incarnated into a human. Krishna is the avatar who was struggling against sin and evil, death and destruction. Krishna is looked upon as a saviour of man and manifest whenever the forces of evil threatened to destroy human values. It is stated in the *Gita* (4/7) "*Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata/ abhyutthanamadharmasya tadatmanam srijamyaham*" meaning "Whenever righteousness languishes and unrighteousness is on ascendant. I create myself. I'm born as after as, for the protection of the good, for destruction of the evil doers and the establishment of law."

The *Gita* starts with an inspiring note to Arjuna - a common man with all common human weakness, and it ends with the highest human possibilities. Human life is full of struggle and conflict. Body, life, mind, intellect and spirit—these things fight with each other, this is the human nature. Sometimes man becomes confused in the life as to what to do and what not to do. We find in the Gita that Arjuna represents the human race and Krishna represents human conscience. In the Kurukshetra, at the critical time Arjuna tries to abstain from action and get out of the battle of life. He wants to get out and not to participate in the struggle. He wants to become a Sanyasi. In this juncture, Krishna comes and tells him, "it is unworthy of you" – " *kutastva kasmalamidam visame samupasthitam anaryajustamasvargyamakirtikaramarjuna.*" (*Gita*-2/2). The philosophy of the *Gita* is rooted in the world and life affirmation.

Long ago *Gita* depicts ethical humanism. The message of the *Gita* is "good for all". It is obviously an ethical treatise and a yoga

shastra. *Gita* speaks of universal religion. It attains a spiritual synthesis which could support life and stimulate right conduct. The *yoga shastra* of the *Gita* is rooted in "*Bhramhavidya*" or knowledge of the spirit. *Brahmavidya* suggests man a rational approach. A metaphysical moral rational approach gives men the idea that there is a Supreme Being. The *Gita* holds that the reality is one; but it is made of twofold *Nara* and *Narayana*. *Purushottama* is not separated from man. It becomes different then whether we say God limit himself in the form of man or man rises to God walking through his nature. According to *Gita*, *Brahmasamsparsam*—touching the eternal is the absolute value. *Gita* maintains a balance between the phenomenal and spiritual world by admitting both war and renunciation of desire. It does not deny humanism because-"true humanism seeks to keep a balance between the material and spiritual tendencies in man."

The *Gita* did match to undermine in human practices. The religious view of the *Gita* laid stress on the spirit of tolerance. The concept of tolerance is the fundamental unity of all religious beliefs of mankind, and therefore, of the possibility of universal religious peace. *Gita* establishes humanism through religious tolerance. *Gita* also expressed liberal attitudes towards all religions. *Gita* establishes the selfless services on the basis of oneness of all, and thus establishes religious humanism. The doctrine of non-violence is prominent in the *Gita*. Gandhi himself says, "The overall teaching of the *Gita* is not violence but nonviolence is evident from the argument which begins in the chapter II and ends in the chapter XVIII."

The '*swadharama*' concept of the *Gita* is the motto of recent humanism. The *Gita* presents the path of '*niskama karma yoga*' in which knowledge, devotion and action attain their highest culmination. The *Gita* says, "*karmanye va'dhikaraste ma phaleshu kadachana*" (2/47). The karmayogiof the *Gita* is stitapragya, "*duhkhesu anudvignamanah sukhesu vigatasprhah*"(2/56)… (He who is unperturbed in misery and free from desires amidst pleasure). The exaltation of our freedom is another major theme of the philosophy of the *Gita.* Man is free to do anything with his power of Viveka. In the *Gita* Krishna teachers Arjuna the whole philosophy of life and he also shows the right and wrong but Arjun is always free to do as he chooses. This is stated in the sloka – "*yathaicchasitathakuru*" (18/63). The *Gita* contributed to the spiritual

freedom of self awareness. The massage of knowledge has shown the way to real freedom.

The *Gita* insists on equality-“*samatva yoga*”. Any deed governed by ego gives rise to human conflict which is the root of inhumanity. Ego is the enemy of humanism. *Gita* has transformed the ego centric person to a theocentric whole. It has extended the limit of human understanding by uniting ego and divine true love and devotion. Love of man is essential for love of God. Who does not love man does not love god.

The spirit of harmony, the unity in diversity is the fundamental note in the philosophy of the *Gita.* In the *Gita* all the human contradictions of human life are resolved. All the messages of Krishna is a suggestion for those who are indifferent to duties, ignorant of own self, inexperienced of own life. The *Gita* is a necessity when there is a practical crisis in the application of ethics and spirituality to human life.

Works Cited:

Bhavaghanananda, Swami, editor. *The Srimadbhagavad Gita. Udbodhana Karyalaya*, Jan. 2003.

Flood, Gavin, and Charles Martin, translators. *The Srimadbhagavad Gita*. edited by Gavin Flood, W. W. Norton & Company, 2015.

Radhakrishnana, S. *The Bhagavadgita*. Harper Collins Publishers, 1998.

Sharma, Narayan. *Hitopadesah*. edited by Srimad Gurunath Bidyanidhi, Swadesh Prakashini, 1411 (Bengali Year).

Local Roots of Revolutionary Terrorism in India: A Case Study of Simla Bayam Samity (1926 - 1947)

Avirup Sinha
Assistant Professor, Department of History
Deshapran Mahavidyalaya

Abstract: In this essay we would try to construct history of Simla Bayam Samity between 1926 and 1947.This study will focus on the point of the nature of anti-British resistance at the grass-root level in the period of our survey. From this study we could understand how melas and public ceremonies in colonial India were used as a forum of building networks among several revolutionaries and to make common people aware of revolutionary ideology and British oppressions and exploitations. This study will also focus on the point how National leader like Subash Bose was working at the grass-root level to unite freedom fighters and strengthen national movement. Finally this article will show nature of sarbojanin durga puja in the colonial period.

Key Words: Durga Puja, Revolutionary Terrorism, Aitendranath Bose, Patriotism

This essay is dedicated to Simla Bayam Samity, a club of North Kolkata. The period of our study is 1926 to 1947.This study will help us to understand two points-first of all, nature of anti-British revolutionary activities in India in the period of our survey. This study will also help us to understand how anti-colonial struggle in India in the period of our study was getting a popular character from the standpoint of people's participation in it. Secondly; this study will help us to understand nature of Sarbojonin Durga puja in the colonial period.

The club was established by Late Aitendranath Bose on 2nd April 1926.[1]This was the first club of India to organize *Sarbojonin Durga Puja*.[2]Prior to this; *Durga Puja* was celebrated in *zamindar*s' houses and houses of rich families. This was an occasion of celebration to these people. Aitendranath Bose felt that *Devi Durga* is for all sections of the society. Her worship brings good-luck for entire mankind. Then what the

logic is behind confining *Durga Puja* within houses of a few rich people? This inspired Aitendranath Bose to establish Simla Bayam Samity.

The club was founded for the sole motive of promoting revolutionary terrorism.[3]Aitendranath Bose wanted to organize the young generation and motivate them for fighting against the colonial rulers. According to Sridhar Kundu, an associate member of the club, “the Durga Puja was just a show or eye-wash. This club was established for the sole motive of training the young generation in terrorist activities.”[4]

Aitendranath Bose, the founder of Simla Bayam Samity was himself a great revolutionary leader. He was a close associate of Jatindranath Mukherjee also known as Bagha Jatin.[5]Because of his revolutionary activities Aitendranath Bose was put behind the bars for several times.

If we made a study of the ideology of revolutionary terrorists then we can find that the revolutionary terrorists believed in developing the muscle power. They believed that body is temple and one should increase the bodily strength. Now the question arises, why revolutionary terrorists believed in such an ideology? Primary reason is that revolutionary terrorists depend on bodily strength and it was natural for them to think to increase their muscle power. Secondly, Partha Chatterjee in *The Nation and Its Fragments* showed that nationalism separated the domain of culture into two spheres-the material and the spiritual. Western ideas were most prominent in the material sphere while it was believed that the spiritual domain represented true spirit of the East and it was superior to the West. The world (*bahir*) is external; the domain of material, while home represented one’s true identity. In the entire phase of Nationalist struggle the crucial need was to protect, preserve and strengthen the inner core of the national culture, its spiritual essence.[6]An essential feature of the ideology of the East is to worship the body as a temple and it was natural, revolutionary terrorists believed in such an ideology. Thirdly, Utilitarian like James Mill, Grand and Duff criticized Hindu society and civilization. According to them Hindu civilization was in degenerating condition.Utilitarians held the view that only good government could only save the Indians. In this way Utilitarian philosophers tried to legitimize the British rule in India. Another aspect of Utilitarian criticism was the “effeminacy” of Hindu men who were unfit to rule.[7]Colonial rulers and authors tried to portrait Indian men particularly Bengalis as

coward persons with a pot-belly figure. The nationalists always criticized such an approach towards Indian men by Colonial rulers. Revolutionary terrorists by actively involving themselves in body -building activities like wrestling, *lati* playing etc. try to prove colonial projection of "effeminate" men as wrong notion and try to project them as brave, courageous and manly.

Aitendranath Bose was not an exception. He believed that in order to fight against colonial masters, youths must develop their bodily strength. He made this club a centre for developing physical health of youths. The club members encouraged wrestling, playing with '*latis*' and participation in sports like football, volleyball etc.Aitendranath Bose made arrangements for giving military training to youths. In an article published in *Calcutta Municipal Gazette* it was said that,

> "We would like to take the opportunity of offering our sincere congratulation to the authorities of Simla Bayam Samity on the splendid work they are doing for the improvement of the physique of the boys and young men of North Calcutta...... Calcutta must covered by gymnasium like Simla Bayam Samity before we can hope to see our young men stand with their heads erect and walk with their chest forward."[8]

Simla Bayam Samity played an important part in the anti-imperialist struggle. In 1916 Aitendranath Bose and his son Amarendranath Bose were put behind the bar for this reason. They were released in 1920.[9]In 1921 Non Co-operation movement broke out. Members of Simla Bayam Samity actively participated in this movement. Several members of this club went to jail during this time. Many freedom fighters like Jotindramohan Sengupta,Netaji Subash Chandra Bose,Sarat Chandra Bose, Suresh Chandra Mazumdar,Makhanlal Sen,Dr.Bhupendranath Dutta,Bankim Mukherjee,Rajen Deb,Hemanta Basu,Radharaman Mitra,Bidhan Chandra Rai and others were actively involved and/or visited in this club.[10]Female members of this club like Urmila Debi,Mohini Debi,Jyotirmoy Ganguly,Illa Sen, Santi Das,Ashalata Das,Indira Debi,Bina Das,Kalpana Das(Jyoshi)etc.were also actively involved in anti-British struggle.[11]Netaji became the Club President in 1939.[12]Owing to its involvement in anti-government terrorist activities the Club was banned between 4th January 1932 and 7th October 1934.[13]

Simla Bayam Samity always played a part in social services. Club members distributed cloths among poors, provided relief to flood affected people and every year organized an "*anna-court*" where people from different sections came and ate together. During the time of communal violence in 1947 members of this club showed a secular attitude and came forward to help members of both communities.[14]

Now we would deal with another side of the coin. This club was first in India to organize '*Sarbojonin' Durga Puja*. Priest of this first *Durga Puja* was Late Dr.Chapalakanta Bhattacharya.[15]Late Nitai Chandra Paul was in charge of decorating the idol in the first year.[16]Initially *Puja* was '*akchala'* type and '*hogla'* leaves were used to decorate the pandal.In 1939 '*akchala'* style was abandoned and separate idols of *Devi Durga,Lakshmi,Saraswati,Ganesh* and *Kartik* were worshipped.[17]This step was important on the ground that at that time mode of worship was '*akchala'* type and this was definitely a break from the tradition. Late Mahendranath Dutta, the brother of Swami Vivekananda supported this step.[18]Later on members of Tagore family too praised this style of worshipping separate '*pratimas'*.

Initially '*khadi'* cloths were used to decorate the *Durga pratima*.Through this act Aitendranath Bose tried to inspire people to use *swadesi* goods. Mainly for the reason of decorating *Durga Pratima* with *swadesi* cloths *Durga pratima* of Simla Bayam Samity at one time was regarded as "*Swadesi Thakur*".[19]

Now the question arises, how Aitendranath Bose tried to use *Durga Puja* as a platform to strengthen anti-imperialist movement in Bengal? First of all, centering *Durga Puja* a fair was organized. In that fair many revolutionary terrorists and nationalists came. An attempt was also made to strengthen connection with members of Indian National Congress. Secondly, puppet shows were organized. Mainly patriotic stories were themes of such puppet shows. Apart from puppet shows several exhibitions were organized in which themes like Revolt of 1857,War of *Bales war* of Bagha Jatin,Couragious act of Matangini Hazra,Chittagong Armory Case etc were displayed.[20] In this way an attempt was made to generate patriotic feeling among common people.Thirdly,on the occasion of Durga Puja several pamphlets were distributed which were full of anti – British seditious messages.Finally,posters having seditious messages like – "*If You Live*

‚*Live Dangerously*", "*Samay Hoyche Nikate Akhon Badhan Chirite Hobe*" etc. were displayed.[21]

In conclusion we can say that anti – British movement in India had many trends. Indian National Congress was following the path of non-violent constitutional resistance against the British Raj. An alternative path i.e. the path of revolutionary terrorism was selected by persons like Barindra Kumar Ghosh, Brahmabandhab Upadhyay, Khudiram Bose, Prafulla Chaki, Aurobindo Ghosh, Hemchandra Ghosh, Masterda Surya Sen and others. Aitendranath Bose was follower of the second path. He established the Club as a centre of body-building activities mainly with the motive of manufacturing good solders who would fight for the freedom of their country. This club was first in India to organize Sarbojonin Durga Puja. But Durga Puja was practically an eye-wash and under the screen an attempt was made to foster nationalist feeling among common people and perform revolutionary terrorist activities against the British government.

Another dimension apart from strengthening revolutionary movement in Bengal, for which this club deserves special mention, was that centering the *Durga Puja* people from different sections of the society came to this club and participated in several activities. In one hand people from respected families of Calcutta like Dutta family of Swami Vivekananda, Tagore family of *Jorasako Thakurbari* etc.participated during Durga Puja on the other hand proletariats from streets of Calcutta joined in this Puja occasion. The club authority organized '*annakot*' every year .People from different sections of the society sat and ate together.Netaji on one such occasion joined this '*annakot*'.[22]This was really a unique event.

References

1. Sanat Ganguly and Ashok Das "*Simla Byayam Samity O Sarbojonin Durgotsober Sankhipta Itibritta"* (Printed pamphlet, n.p.n.d.) *passim.*
2. Ibid.
3. Interview of Rabindranath Dah (An Associate Member of Simla Bayam Samity) on 15.05.2012.
4. Interview of Sridhar Kundu (An Associate Member of Simla Bayam Samity) on 15.05.2012.

5. Sanat Ganguly and Ashok Das *op.cit*
6. Partha Chatterjee, 1989 "The *Nationalist Resolution of the Women's Question"* in Kumkum Sangari and Suresh Vaid ed. *Recasting women (*Kali for women) p.244.
7. Mrinalini Sinha, 1986.Colonial *Political and the Ideal of Masculinity,* Indian Association of Women's Studies, the Third National Conference of Women's Studies, Chandigarh, Oct-1-4.
8. *Calcutta Municipal Gazette* dated 20th April 1929.
9. Sanat Ganguly and Ashok Das *op.cit*
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Interview of Sridhar Kundu. *op.cit.*
13. Sanat Ganguly and Ashok Das *op.cit*
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Interview of Sridhar Kundu. *op.cit.*

LEARNING STYLES OF COLLEGE STUDENTS; AN ENQUIRY TOWARDS INDIVIDUAL PREFERENCE

Kazi Masud Hossain
Research Scholar, Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Anujit Patra
State Aided College Teacher
Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Swami Divyagunananda
Professor
Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Howrah, W.B.

Abstract: This research paper explores the different learning styles among college students. The study aims to investigate how students preferred learning styles influence their educational outcomes and performance. The study employed a descriptive survey research design and collected data from a sample of 270 college students in humanities and science disciplines. The participants were selected using stratified random sampling from five different colleges in the Hooghly district of West Bengal, India. The learning styles of the students were assessed using the Learning Style Inventory. The findings indicate that the majority of students suggesting moderate proficiency in their preferred methods of learning. The analysis of specific learning style dimensions revealed variations among different styles. For instance, a significant number of students demonstrated moderate to high abilities in the enactive learning style, highlighting the importance of experiential learning approaches. Similarly, the majority showed moderate to high abilities in the figural learning style, indicating the effectiveness of visual aids and spatial representations. Furthermore, approximately three-fourths of the students demonstrated moderate to high abilities in verbal learning, suggesting the relevance of incorporating verbal instructional methods. In contrast, a considerable proportion showed moderate to poor abilities in the constructive learning style, indicating a need for interventions that promote critical thinking and information synthesis.

Keywords: Learning Styles, College Students, Teaching Strategies.

Introduction: There is no right or wrong way when it comes to learning something stated by Masutimath & Surapur (2023). They also found significant effect of different learning styles on the academic achievement of students. Recognizing one's learning style is crucial for effective education and personal development. Over the years, researchers and educational theorists have delved into the concept of learning styles, resulting in the development of various models and theories that aim to categorize and identify different learning preferences. This introduction offers an overview of learning styles, drawing on diverse citations to emphasize the significance of acknowledging and accommodating the diverse ways individuals learn. According to Fleming and Baume (2006) generally teaching habitually reflects the preferred teaching style of the teacher rather than the preferred learning styles of the students. Jakhar & Sihag (2018) stated that learning style refers to the learning behaviour of an individual and it points to the fact that each student learns differently. The concepts of learning styles have steadily gained importance (Pashler et al., 2008). Learning style pertains to an individual's preferred approach to acquiring and processing information, encompassing their distinct ways of perceiving, organizing, and retaining knowledge. Nanaware & Baviskar (2023) stated that the role of learning styles in the teaching-learning process plays a significant component within the classroom. Ha (2021) confirmed that a preference for learning styles is positively correlated with academic achievement of the student. Academic achievement and learning style of higher secondary students helps to make their performance better in future (Vincey & Pugalenthi, 2016). Raina (2013) reported that both a fixed learning style in addition to variation in it exists among students depending on the nature of the learning task given to them. Students are multimodal learners, and every student uses a different learning style that is personally unique to them (John et al. 2016). Awareness of learning styles always stimulated students to adjust to other learning strategies and use mixed methods for their learning (Bhagat et al. 2016). Allock & Hulme (2010) acknowledged that learning styles theory without accurate testing should think about whether it is truly essential to detect student learning styles. If students recognize their learning styles and approach they can get part purposively in the learning method (Magulod, 2018). Nirjesh & Sharma (2018) found gender is a significant factor to control the learning style of

higher secondary students. However, educational anxiety is not influenced by the learning style of the students (Sarita & Kavita, 2016). A positive relation between learning styles and leadership styles was found by Panwar et al. (2021).

According to Kolb's experiential learning theory, individuals exhibit unique learning styles characterized by their favoured methods of comprehending and transforming information (Kolb, 1984). Kolb proposed a four-stage learning cycle consisting of concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. Moreover, Fleming and Mills developed the VARK (Visual, Aural, Read/Write, and Kinesthetic) model, which focuses on individuals' preferences for receiving and processing information (Fleming & Mills, 1992). The VARK model suggests that some learners prefer visual aids, while others respond better to auditory input, reading and writing, or hands-on, kinesthetic activities. As argued by Othman and Amiruddin (2010) VARK learning style can produce an interesting learning atmosphere for students and stimulate students' senses towards learning. In addition, knowing the individual learning styles of the students is helpful for instructors to overcome their weaknesses towards the learning process (Naqvi & Naqvi, 2016). Students of Arts have similar learning styles to the students of Sciences, whereas the choice of learning styles of Commerce students is quite different mentioned by Bhatti et al. (2020). Teachers must distinguish learning styles to facilitate the students to learn as these approaches are the most useful (Kaur & Kaur, 2022).

In this study, the present researchers used the learning style inventory of Mishra (2012). This study attempted to measure six learning styles i.e. enactive reproducing, enactive constructive, figural reproducing, figural constructive, verbal reproducing and verbal constructive. These learning styles, clubbed form, are known as reproducing and constructive learning styles. Enactive Learning Style is a learning style in which the performers absorb the information through all the senses of the body. In this style, knowledge is gained through motor skills and physical actions. Figural Learning Style refers to the student's preference for visual experience related to making diagrams and visual representations. Verbal Learning Style is related to verbal information, written and spoken information in the form of ideas, words and

expressions. Reproducing Learning Style refers to the learner's preference for imitation and practice, memorizing the content and reproducing the information through reading aloud or writing or telling to oneself silently or through listening to others; seeing many figures related to content and making the figure in mind for reproducing the requisite information. Constructive Learning Styles are those styles in which students preference comparing, relating and analyzing the content; reorganizing information and adding new idea's to it, constructing diagrams related to any activity and drawing out differences and similarities between figures; emphasizing self-efforts in performing activities; comparing and relating new experiences to old one for constructing the requisite information. In the present study, all the above learning styles are measured.

Rationale of the Study: Understanding learning styles is crucial in education as it recognizes that individuals possess unique methods of acquiring and processing information. The need for learning styles stems from the desire to provide individualized instruction, enhance learning outcomes, and differentiate teaching approaches. By identifying learners' preferences, educators can tailor instruction to align with their preferred styles, promoting engagement, motivation, and personalized learning experiences. Furthermore, recognizing and accommodating diverse learning styles creates an inclusive environment where all students can thrive. It allows for optimal resource allocation, utilizing instructional materials and technologies that suit different styles, while also fostering meta-cognition and self-awareness, empowering students to become lifelong learners capable of adapting to various learning situations. Overall, understanding learning styles is vital for effective education, enabling educators to create personalized, engaging, and successful learning environments.

Research Question: What are the levels that exist in learning styles among college students?

Objective: To study the level of several Learning styles (i.e. Enactive, Figural, Verbal, Reproducing and Constructive) of college students.

Methodology: *Research Design:* Descriptive survey method of research was used in the execution of the present study. *Participants:* The population of the present study consists of students who are studying in undergraduate humanities and science colleges in Hooghly district specifically from the Sadar subdivision of West Bengal, India. In the

present study, the sample was 270 college students selected from five different colleges by the method of stratified random sampling technique from the target population constituted the sample for the present investigation. *Materials:* To carry out the present study, Learning Style Inventory, Mishra (2012) was used. Learning Style Inventory was adopted by the researchers as per the situation of college-level students in West Bengal. All the statements were translated into the Bengali language to ease the situation. The questionnaire comprises forty-two items, rated on a five-point Likert-type scale (i.e. very much, much, average, less, very less). Internal consistency of the Bengali language items was very high reliability. The reliability coefficient is 0.95 using Cronbach's alpha coefficient method, and the content was also validated by the subject expert.

Findings and Discussion: Researchers observed that 47.78% students came under the category of Average level of Learning Style. Further, 31.48% fall under the category of Low level of Learning Style and 20.74% of students have a 'Low' level of Learning Style. This is supported by Sultana and Kundu (2022) study which provides evidence that the highest percentage of students belongs to the 'Average' and 'below average' levels of learning style.

The study reveals that out of the total sample of 270 students, 33.33% demonstrated a high level of proficiency in learning through the enactive learning style, while 41.48% exhibited an average level of proficiency, and 25.19% showed low level of proficiency. This indicates that the majority of the students (74.81%) possess either moderate or high abilities in learning through the enactive learning style. These findings emphasize the importance of recognizing and accommodating the enactive learning style in educational practices to cater to the needs and preferences of the majority of students. A study conducted by Agarwal and Suraksha (2017) shows that female students prefer enactive and constructive learning styles.

The study indicates that out of the 270 students surveyed, 35.18% displayed a high level of proficiency in learning through the figural learning style, while 38.15% exhibited an average level of proficiency, and 26.67% demonstrated a low level of proficiency. Consequently, it can be concluded that the majority of the students (73.33%) showed moderate to high abilities in learning through figures. This finding is supported by

Miller (2001), who explained that approximately 29% of the students are more inclined towards the figural learning style.

The study reveals that out of the 270 students examined, 17.04% demonstrated a high level of proficiency in verbal learning, 45.92% exhibited an average level, and 37.04% displayed a low level. Consequently, it can be concluded that approximately three-fourths of the students (around 74.96%) showed moderate to high abilities in verbal learning. The study's findings are supported by Babu (2015), which showed that 18% of participants had good verbal learning abilities, 57% demonstrated moderate abilities, and 25% had poor verbal learning skills. The study suggests that among the 270 students surveyed, 37.41% demonstrated a high level of proficiency in the reproducing learning style, 29.26% exhibited an average level, and 33.33% displayed a low level. Overall, it can be concluded that the majority of students (66.67%) showed significant proficiency or moderate abilities in retaining information through repetition. This finding gets supported by a study conducted by Misra (2018) which also revealed that undergraduate students give more preference to reproducing specially verbal reproducing learning styles.

The study indicates that among the 270 students surveyed, 14.44% displayed a high level of proficiency in the constructive learning style, 49.63% exhibited an average level, and 35.93% demonstrated a low level. Overall, it can be concluded that the majority of students (85.57%) showed moderate to poor abilities in constructing and reorganizing new information obtained from different sources. The finding of the study gets supported by Kausar & Topno (2021) who revealed that constructive learning style was found to be a more prevalent Learning Style among undergraduate learners.

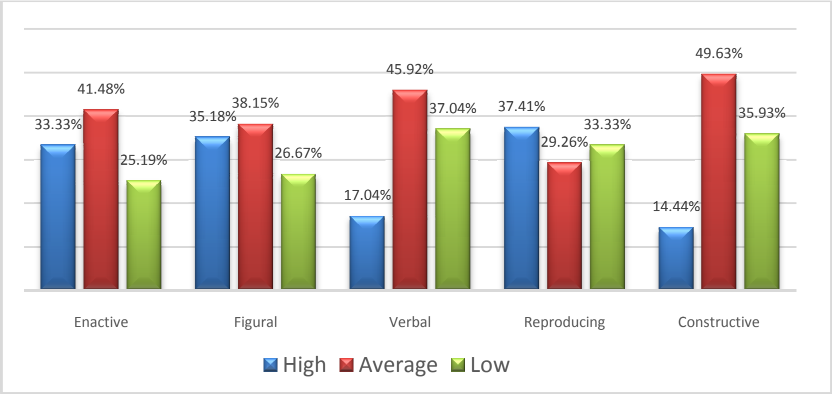

Figure: Different learning styles of the Students with specific levels

Conclusion: Findings highlight the diversity in learning styles among the surveyed students. The majority of students were categorized as having an average level of learning style, indicating moderate proficiency in their preferred learning methods. However, specific learning style analyses revealed variations among different styles. For the enactive learning style, a significant portion (74.81%) of students demonstrated moderate to high abilities, emphasizing the importance of incorporating experiential learning methods in education. Similarly, the figural learning style showed that the majority (73.33%) had moderate to high abilities in learning through figures, suggesting the effectiveness of visual aids and spatial representations. Verbal learning style findings indicated that approximately three-fourths (74.96%) of the students possessed moderate to high abilities in learning through verbal means, underscoring the significance of incorporating effective language-based instruction. In contrast, the reproducing learning style revealed that a significant proportion (66.67%) of students exhibited significant proficiency or moderate abilities in retaining information through repetition, highlighting the benefits of repetitive learning techniques. Lastly, the constructive learning style findings indicated that the majority (85.57%) of students showed moderate to poor abilities in constructing and reorganizing new information obtained from various sources, suggesting the need for additional support and guidance in this area.

Overall, these findings emphasize the importance of recognizing and accommodating diverse learning styles in educational practices. By tailoring instructional approaches to cater to students' preferred learning styles, educators can enhance engagement, motivation, and overall learning outcomes.

Acknowledgement: This research work was a part of the Maulana Azad National Fellowship scheme under the Ministry of Minority Affairs, Govt of India.

References

Agarwal, S., & Suraksha, P. (2017). Study of learning style of male and female students with reference to their emotional intelligence at senior secondary level. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS),* 22(6), 76-82.

Allcock, J. S., & A. Hulme, J. (2010). Learning styles in the classroom: Educational benefit or planning exercise? *Psychology Teaching Review*, *16*(2), 67–79.

Allen, K., Sheve, J., & Nieter, V. (2010). *Understanding Learning Styles*. Shell Education.

Andy, F. (2012). *Discovering Statistics Using SPSS* (3ed.). SAGE Publications.

Awla, H. A. (2014). Learning Styles and Their Relation to Teaching Styles. *International Journal of Language and Linguistics,* 2(3), 241-245. doi: 10.11648/j.ijll.20140203.23

Babu, M. R. (2015). Learning Styles of Secondary School Students. International Journal of Scientific Research, 4(6), 766-767.

Bhagat, A., Vyas, R., & Singh, T. (2015). Students awareness of learning styles and their perceptions to a mixed method approach for learning. *International Journal of Applied and Basic Medical Research*, 5(1), S58-S65. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/848d/9b39c301f73665c3ca7a2f46204774b0cdbe.pdf

Bhatti, A. M., Abas, F., & Rana, A. M. K. (2020). An Empirical study of learning styles used by undergraduate English learners in public sector colleges in Pakistan. *Elementary Education Online*, 19(3).

1864-1875 http://ilkogretim-online.org doi: 10.17051/ilkonline.2020.735342

Chianson, M. M., Aligba, S. O., & Jimin, N. (2015). Prevalent learning style among secondary school mathematics students and its influence on gender and age in Benue state, Nigeria. *British Journal of Applied Science & Technology,*8(4),389-399. Retrieved from, http://www.journalrepository.org/media/journals/BJAST_5/2015/Chianson842015BJAST16781.pdf

Dunn, R., & Dunn, K. (1992). *Teaching students through their individual learning styles: A practical approach.* Prentice-Hall.

Fleming, N., & Mills, C. (1992). Not another inventory, rather a catalyst for reflection. *To Improve the Academy*, 11, 137-155.

Fleming, N., and Baume, D. (2006) Learning styles again: VARKing up the right tree!, Educational Developments, SEDA Ltd, 7(4), 4-7.

Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2015). *Educational Research* (10th ed.). Pearson.

Ha, N. T. T. (2021). Effects of learning style on students achievement: experimental research. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 329-339. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1515

Hossain. K. M. (2022). Metacognition and learning style of college students in relation to their academic achievement [Unpublished MPhil Dissertation]. Ramakrishna Mission Sikshanamandira

Jakhar, L. R., & Sihag, P. (2018). Adolescent's learning style as determinant of problem solving ability. *Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects*, *12*(3), 526–530.

John, A., Shehzadi, G., & Khan, K. I. (2016). Students' preferred learning styles & academic performance. *Sci.Int.,* 28(4): 337-341. Retrieved from www.ijmcer.com

Kaur, B., & Kaur, P. (2022). Study of learning style preference among undergraduate students of punjab. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, *9*(5), 341–349. www.jetir.org.

Kausar, T., & Topno, I. (2021). An investigation on the learning styles of B.Ed. trainees. *International Journal of Advanced Research*, 9(06), 82-87

Kinjari, K., & Ram Gopal, C.N. (2020). Learning style preference among adolescent school students. *The International Journal of Indian Psychology*, 8(1), 944-955.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development.* Prentice-Hall.

Magulod, C. Jr., G. (2019). Learning styles, study habits and academic performance of filipino university students in applied science courses: implications for instruction. *Journal of Technology and Science Education*, *9*(2), 184–198. https://doi.org/https://doi.org/10.3926/jotse.504

Magulod, G.C., Jr. (2019). Learning styles, study habits and academic performance of Filipino university students in applied science courses: Implications for instruction. *Journal of Technology and Science Education,* 9(2), 184-198. https://doi.org/10.3926/jotse.504

Mangal, S. K., & Mangal, S. (2019). *Psychology of Learning and Development*. PHI learning Private Limited.

Masutimath, J. & Surapur, A. B. (2023). A study influence of learning style and academic achievement of secondary school students. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR).* 10(2). 615-621, Retrieved from https://www.jetir.org/papers/JETIR2302569.pdf

Masutimath, J., & Surapur, A. B. (2023). A study influence of learning style and academic achievement of secondary school students. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, *10*(2), 615–621. www.jetir.org.

Miller, P. (2001). *Learning styles: the multimedia of the mind*: ED 451340. Unpublished. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED451140.pdf

Misra, K. S. (2012). *Learning Style Inventory*. National Psychological Corporation. Agra, India

Misra, K. S. (2018). Learning styles of undergraduate and post-graduate students. *Techno LEARN: An International Journal of Educational*, 8(2), 39-45.

Nanaware, R. B., & Baviskar, C. (2023). A Study on Academic Achievement in Relation to Learning Styles of Senior Secondary School Students. *MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices*, *13*(1), 180–192. https://doi.org/10.52634/mier/2023/v13/i1/2357

Naqvi, A., & Naqvi, F. (2016). A study on learning styles, gender and academic performance of post graduate management students in India. *International Journal of Economics & Management Sciences*, *06*(01). https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000398

Nirjesh, & Sharma, R. (2018). Gender difference in learning styles among senior secondary school students. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, *5*(3), 1723–1725. http://ijrar.com/.

Othman, N., & Amiruddin, M. H. (2010). Different perspectives of learning styles from VARK model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *7*, 652–660. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.088

Panwar, P., Negi, P., & Bhandari, A. (2021). Influence of learning styles on leadership styles among adults. *Elementary Education Online*, *20*(4), 4113–4119. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.04.448

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, *9*(3), 105–119.

Raina, J. (2021). An empirical study of learning styles of student-teachers in a preservice teacher education degree programme at University of Delhi. *International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER). 3(3). 184-190.*

Reid, G. (2005). *Learning Styles and Inclusion*. SAGE Publications.

Sarita, & Kavita. (2016). Learning style, gender and locality of secondary school students: A comparative study on the basis of educational

anxiety. *International Journal of Applied Research*, *2*(10), 443–447.

Sims, R. R., & Sims, S. J. (1995). *The Importance of Learning Styles*. ABC-CLIO.

Sultana, S., & Kundu, U. (2022). Learning Style of Secondary School Students. *American Journal of Multidisciplinary Research & Development (AJMRD)*, 04(04), 11-19.

Vaishnav, R. S. (2013). Learning style and academic achievement of secondary school students. *Voice of Research*. 1(4). 1-4. Retrieved from http://www.voiceofresearch.org/doc/mar-2013/Mar-2013_1.pdf

Vincey, D. and Pugalenthi, N. (2016). A study of learning style and academic achievement of the student at standard XIth level. *Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities.* 3(4). 126-131. Retrieved on 22.12.2022 from https://www.shanlaxjournals.in/pdf/ASH/V3N4/Ash_V3_N4_018.pdf

Woolfolk, A. (2017). *Educational Psychology* (13ed.). Pearson.

Zhang, L., & Sternberg, R. J. (2014). *Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles*. Taylor & Francis.

Discrimination against women's Rights in India: A critical analysis

Jyoti Mitra
Assistant professor, Department of Political Science,
Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya,
Bhupatinagar, Purba Medinipur

Abstract : The most important matter of personality development in aspect of National and International perspective is rights. Men and women are both social being. A society is grown and developed through both men and women and while if they develop their personality and demand various opportunities and avenues. So Rights of the citizens are the pillars of democracy. Without rights the women cannot developed their full potential. Through many historic movements and blood-shed, the human beings have been able to acquire their rights. India too has made provisions for certain fundamental rights in the constitutions. In the third schedule of the Indian constitution there are right to equality (Articles 14-18), rights to liberty (Articles 19-22), rights against exploitation (Articles 23-24), religious rights (Articles 25-28), cultural and educational rights (Articles 29-30) and rights to constitutional remedies (Articles-32). All these are enforceable by the court. There are certain other legal provisions to ensure the interest and rights of weaker sections like SC, ST, women, children minorities etc. the fundamental condition of protecting their rights is to save them from gender discrimination. But in the present social set up; it is very often found women are still neglected, deprived and oppressed in the society.
Keywords: Personality, Blood-shed, Discrimination, Empowerment, Protecting. *Corresponding author: jyoti Mitra*

Introduction: - The paper will study the various rights of women in India and how they are being discrimination, although special rights are being given to women as compared to men, yet they are least beneficial women rights in India. In article-1 of the Universal Declaration (1948, 10^{th} December) says that all human beings (men and women) are born free and equal in dignity and rights. There are so many kinds of women rights in India, like- right to equality, right to education, right to liberty,

right to politics, right to property, right to equal opportunity for employment, right to free choice of profession, right to livelihood, right to work in equitable condition, right to get equal wages for equal work, right to protection gender discrimination, right to social protection in the eventuality of retirement, right to protection from inhuman treatment, right to protection of health, right to protection from society, state and family system. But it is very often seen women are still deprived in whole Indian society.

Here are some of my key objectives for the success of the dissertation and its successfully implementation. Such as- i) The main objective of the study is to discuss the discrimination against women's Rights in India. ii) Discuss what steps have been taken to protect women in India. iii) How successfully women are able to reflect their rights through research discussion. iv) The laws that have been made to protect the rights of women will be highlighted through discussion. v) The main aim of the study is to highlight the violence that is occurring in the society against women and to highlight how active the administration is in preventing this violence.

In this situation there have been so many provisions in the Indian constitutions to safeguard the women's rights, such as- equal pay for equal work, equality of opportunities, equality before law and also political equality. For maintaining such rights, the Indian parliament has legislation such laws as, 'The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act.'(1986); 'The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act,' (1956); 'The Dowry Prohibition Act' (1961); 'The Child Marriage Restraint Act.' (1978); 'The Criminal Law Amendment Act' (1983); and 'National Commission of Women' (1990) etc. A National Commission of women was formal to look into whether the safeguards in the Indian constitution are being adequately implemented under the 'National Commission Women Act,' 1990.[1] For women's welfare, the central government established this National Women's Commission, the activities of which are - (1) To amend or add to the Acts concerning women; (ii) To formulate ways and means against problems arising out of gender discrimination; (iii) For participation and to advice women in the process of Socio-economic and political development of women; (iv) To evaluate the women's development measures taken by the centre and the states. For women's right and

protection, West Bengal Commission for women was established. Again by 73rd and 74th constitutional amendment, 1992 and reservation of 33% seats for women in panchayats and civic bodies (Municipalities) has been made. Presently there have been demands for 50% seat reservation for women in such bodies. In West Bengal also this reservation of 50% has been done in panchayat system.[2] The women's endeavor to establish their rights and status has duly been rewarded with the establishment of such organizations like 'women's Indian Association' (1917). 'National Council of Indian Women's (1926) and 'All India Women's Conference' (1928). Thus it is clear that in the post Independent India, there have been many steps towards safeguarding and protecting women's rights. But unfortunately, no sign of discrimination against women in the male dominated society has been seen, despite such laws, reservations and organizations. Such organizations like the 'Human Rights Watch Asia' have thought of women's rights discrimination as most dishearten.[3]

Indian Women's Protection bills : So Many laws have been promulgated for women's rights protection. Now the 1986 'Women Protection bill' has been duly amended on 19 marches, 2013. Some proposals were accepted in the amended bill in the Loksabha.[4] Here (i) the age of consent has been kept at 18 as was earlier; (ii) In case of acid attack on women the penalty has been raised to 20 years imprisonment, not life imprisonment; (iii) In case of voyeurism the penalty has been a bail able offence in the first instance, but the second instance it has been made non- bail able; (iv) Incase child abduction, the punishment has been 7 years of imprisonment; (v) In case of proved rape the punishment has been enhanced to imprisonment till death and in case of rape and murder it has been fixed at death penalty. Despite all the legislations, the discrimination of women's rights is very often seen.[5]

Women empowerment refers to increase of economic, social and educational strength. The inequalities between men and women are well-known and age old issue in the world. Regarding gender inequality the first ever world conference on women was held in Mexico in 1975 and the second world conference on women at Copenhagen in 1980 and a third in Nairobi in 1985. Women's vital role in achieving sustainable development has been accepted at the UN Conference on Environment and Development in Rio-de Janiero (1992) by the world leaders. At the World Conference on Human Rights in Vienna (1993), governments

acknowledged that women's rights are human and headed the evidence of widespread violence against women. At the International Conference on Population and Development in Cairo (1994), women's empowerment was recognized as a cornerstone for effective population policies. At the World Conference for Social Development in Copenhagen (1995) and also Beijing Declaration on the rights of women (1995), gender equality was recognized as a prerequisite for the achievement of productive employment, social integration and poverty eradication. The fourth world conference on women took place in Beijing in September 1995.[6] From these global conference it has been clear that women in all over the world can plays crucial role in not only in sustainable development and protecting the environment, they can take active participation for the human rights of women, violence against women, health, maternal care and family planning facilities, and of access to education and information.

Problems to be investigated : The question which rouses our curiosity in the state i.e. national political level for previous few decades is about the decentralization of power and women's participation in politics under panchayat system. At present, decentralization of power and political participation in the grass-roots level under panchayat system. There are three stages of participation- i) voting stage; ii) Decision making stage; iii) The ability to implement political decision. That means political participation does not end with the voting process only. It refers to the process of implementation in various political activities. Political participation refers to those action which the members of the society performs voluntarily and through which they elect ruler, directly and indirectly take part in the process of policy making and affect it. In 1978 the first elections were held in West Bengal. Since then election are held once, in every five years. State panchayat department conducts this election. In these three levels women representation is very low in direct election. Women in this election were a big part of the voters, half or somewhere more than half. But in the case of competition or success, they are absolutely behind. In lower level of the panchayat, two or three women are elected by contest, but the list of elected members in the district council and their names are very few in number. In the development of women education in society and political consciousness, But West Bengal unable brings women forward for public

representation.[7] Moreover, the reason for women participation in panchayat institution are not as good as expected – i) Their extensive illiteracy and conventional system ii) It is found in research that influence of political parties becomes barrier in the free work of women in panchayat related work iii) The West Bengal government offers training to the representatives of panchayat after every election. But in some cases they are unable to make out the speeches of the trainers iv) Like the whole world in our state also till today the social approach towards women is-either they are mother or sister or housewife v) Bureaucracy approach is a great barrier of women empowerment vi) The women political organization is politically divided in West Bengal. I shall try through my research how these problems can be solved.[8]

Here we have to see whether the participation of panchayat has been increased as a result of growth of the rate of education, i.e. if the women have become aware of their own right and duty and participated in the activities of their country and society coming out of the boundary of their lives. Thus, if it is seen that as a result of the growth of rate of education the participation of women in politics has been increased, then it will be considered as matter of success. As the cause of this, it is said that the women being educated have become conscious of social and political matters. Again if it is seen that as a result of the growth of rate of education the participation of women in politics is not increased then we can say that it is cause is the lack of consciousness among women.

The second plan has increased the level of participation of economically independent women in politics. This matter can be analyzed with reason that the women for being economically and socially independent, they are participating in politics. To eradicate this difference, the power of politics will be needed. For the independence in economics, the women's participation is gradually increasing and they can frankly express their opinions. But our society is unequal not only in terms of caste and class, but also in terms of gender. In male dominated society, women suffer from many kinds of discrimination. Women's participation in public activity, in particular, is discouraged and opposed.[9]

According to a survey of Indian government in 1974, despite women's participation in political sphere, they are still guided by males in respect of political power and prestige. In lower house in Indian parliament the number of female members is below 10%. Again the

women have not got leadership political organization also. If the political scenario in West Bengal is duly analyzed it is seen women turn out in adult Franchise is always lesser to male ones. In West Bengal legislative assembly elections, the percentage of women candidates has never been more than 10% of the total seats. Women are not so much interested in political supremacy than they are in managing house hold matters. The male supremacy is seen in most of political party organizations. Many believe, the ideal place of women is her home, not its outside.[10] So in this sphere male supremacy acts as deterrence to acquiring political rights. Through women's reservation in the panchayats have risen to 50% from 33%, yet it may be said that political leaders did not approved to it willingly or with spontaneity, rather than for votes. Despite women's participation at panchayat level has been done, yet much disparity exists in respect of distribution of power.[11] Reservation of 50% of posts in favor of female candidates not arbitrary. Very often women are not invited in political discussion or decision–taking matters. Despite voting rights is very important, but till present time's supremacy of males or other family members is seen in respect of exercising voting right by women. Thus women's rights establishment is still a long way to go for prevention on political rights.[12]

There are also so many reasons for the discrimination of women's rights in India is given below: -- (i) Poor implementation of legal provisions and social welfare programmed relating to rights of the weaker sections. (ii) Lack of transparency and accountability in the administrative system. (iii) Discretionary powers of the security forces and irresponsible behavior of police forces. (iv) Long delays and costly judicial process. (v) Lack of awareness, education and human rights culture in society. (vi) Lack of poor growth of civil society organization in the field of human rights and political insensitivity among the ruling classes about right issues. (vii) Male dominated Indian society which paves way to male dominance over females; sexual authorities' is the most significant of them. It is also the greatest reason of torture to women. (viii) Still existence of caste and religion based superstition customs and wrong beliefs in India. (ix) Poverty, unemployment, lack of education etc. are primary reason of women's exploitation. Such incidents as physical torture, trafficking of women to foreign lands or forcing game to work as sex workers in brothels taking advantage of their

poverty are very often reported. (x) Physical weakness is another reason to exploitation on women. Taking advantage of their debility, very often women are being exploited by men. It is very often seen that women are force abduct and are compelled to engage in sexual acts. (xi) Most of the Indian women who are exploited take these as a matter of ill fate and do not take the help of law against the oppression of the members in the matrimonial home.[13]

Education rights and disparity: --- According to the schedule 21 of the Indian constitution, there is right of every citizen to live with popper respect. But because of discrimination in Socio-economic sphere, women and children are being deprived of this right. Female feticide is violating girl's rights to born. Even after birth they are mercilessly killed, given marry at pre-matured age depriving their right to education. In the forty fifth schedules of the Indian constitutions there is directive of free compulsory education to all Indian children up to age of 14.[14] But through research, it is seen, the dropout rate is much higher than that of boys. The situation is far worse among the Dalits and scheduled tribes. Statistically seen, 65% children among the Dalits and scheduled Tribes do not attend school, most of them are girl children. Only one percent of Tribal girl children pass matriculation. Socio- economic disparity is the primary hindrance to their development in education sphere. But it is an established fact that right to education is principle to rights. Because of their lagging behind in education sphere, their dreams of economic self reliance remain unfulfilled. As a general rule in social and familial sphere, women are thought to be only machines to child production and bearing. Despite their right to development in social, political and economic sphere, women are still victim to socio- economic and political exploitation and disparty.[15]

This mainly because illiteracy has made them stick to traditional values. Lack of courage prevents them from taking initiative for a bold step. The literacy rate of women has gone up from about 10 per cent in 1951 to 29.75% in 1981, 39.29% percent in 1990, and is estimated to have gone up to 39% at the beginning of 1999.The literacy rate of females among SCs in India is 23.76 % while among STs it is 18.19%.[16] While speaking education of girls has made strides and today many faculties and departments of universities, more girls than boys are to be seen. But rural residence, low caste, and low economic standing

definitely tend to deny opportunities of education to girl.[17] So without education; women's equality cannot be attained. At least 60 million girls lack access to primary education in India. Due to large percentage above 65% of uneducated women in India, they are not even aware of their basic rights and can never fight for them. The National Policy on Education, 1986 also laid emphasis on education for attaining women's equality which will foster the development of new values. India is welfare state. The government has launched various specific programmed and policies for protecting weaker section like women, children etc.

Women in India are part of weaker section of society. Their rights are violated in many parts of the country. There are mainly three types of violence of women's Rights, namely, - (I) criminal violence; (ii) domestic violence; (ii) social violence. Indian women are the worst victim of criminal violence; rape is one of them --- (a) **Rape: ---** It is one of the worst criminal violence against women and is reported in almost all over the world, yet its magnitude in India is far lower as compared to western countries. For example, according to government report, entitled 'Crime in India', the incidents of rape per 1lakh people is 26, 08 and 5.5 and in U.S.A., Kanada, UK, and India respectively. Now in Indian about 7500 women are raped annually, corresponding to three women per four hours.[18] It is not that only poor women are raped, women of the middle class are also raped in work places by their higher authorities. Even women under trials are raped while in custody by police, women patients by hospital workers, maid servants by house holders and day laborers constructions. Even deaf dumb, blind, and innocent and beggar women are raped. Women coming from lower income group have to bear the brutality unprotected because of their poverty. According to 1992-93 report of 'Human Resource Development Department' the incidents of rape have considerably been increased.[19] According to the report one woman in 54 minutes is raped in India. Such kind of crime on women is not only a scheme of women, but also to a whole of Indian society. According to the latest amendment to IPS sec 376 attracts to death penalty, which was life imprisonment before amendment. In spite of all these atrocities on women are not at low ebb.

(b) **Abduction and kidnapping**: --- In whole of India, at least 42 women a day or 15000 in a year are abducted with such evil design in mind.[20] The two reasons cited behind such abduction are, -- (I)

appeasement of carnal desire; (ii) marriage. Economic reason is also seen behind such abduction, in such cases sexual exploitation is seen too much. There are legal provisions towards such women abduction and illegal flesh like 'Prevention of Immoral Traffic Act' despite the existence of legal provisions the incidents women exploitation are still reported.

(c) **Murder: --** Family feud, illegal relationship, cornice female illness-normally these three are closely linked with murder. Again, it is seen the murderers very often belong to baser occupations and lower income groups. Also seen, males are directly linked with such heinous murders. Every year nearly 27-28 thousand murder incidents are reported in India, of which 10-15% is women.

ii) Domestic Violation: --- The ramification of domestic violence is as follows: ---- (a) **Dowry Deaths**: -- With the enactment of dowry prohibition Act, 1961 given or taking dowry has been prohibited, yet the magnitude of this menace is nothing less in Indian society. This custom is contrary to human rights. The Indian are subjected to many kinds of physical or mental oppression in case of their parents' failure to meet the demands of the bridegroom party during marriage. Before marriage the girls' parents or guardians promise to pay cash, ornaments or other domestic gadgets, but when they fail to pay those during marriage because of their financial instability, such kinds of brutal torture come upon the newly married bride. Consequently the bride opts for the extreme path of suicide or is murdered by her in-laws. On an average 4000 women are murdered annually in India as dowry deaths. Despite the enactment of 'Dowry Prohibition Act'' social awareness is yet to come, as a result of which, many girls are not get married because of their parents' inability to meet dowry demands of the prospective in laws' families. Even there is no life security of the bride. There is provisions of sec 498 (A) under IPC to provide life security of a married women. The husband and all the in-laws of tortured women are given punishment of various sorts, if the alleged torture is established through evidence. One year religious punishment or fine or both has been provided in the IPC. In case of unnatural death of a married woman within 7 years of her marriage, and alleged torture on the deceased is proved beyond doubt, the in-laws family members are convicted to life imprisonment.

(b) **Wife battering**: -- In Indian society, wives are better halves to their husband and all their wishes and desires circle round their husbands. But the husbands do not hesitate to wife battering even on trivial issues. The women are subjected to inhuman torture leading to senseless, fracturing of bones or even murder. Very often the drunkard husbands torture upon their wives upon the impact of liquor. Yet the wives do not leave their husbands or go elsewhere, or lodge complaints to police, rather they only blame their ill fate shedding tears.

(c) **Maltreatment of widows and elderly women**: --- The widows after the death of their husbands have to go through lots of social stigma. The Indian widows are normally differentiated into three categories:--- namely (i) Issueless – who have been widowed within one or two years of marriage; (ii) having one or two children and have been widowed within 5 or 10 years marriage; (iii) widows above the age of 50 years. All these women more or less have to go through social, economic mental sufferings. But those falling third category have more responsibilities in comparison to the former two categories, because they also have to play the role of 'Father.' This third category widows though suffer less in their matrimonial and their acceptability there, is much more than to bathe former two. What is more is that this third category widow's do not have any carnal desire. But their dependence on financial matters to other family members is to some extent below their dignity.

Social Rights and disparity: --- This category of rights includes: --- (a) Right to marry and found a family. (b) Right of the family to full protection of society and state. (c) Right to mother and children for special care and assistance. (d) Right to primary education. Some of these rights have been incorporated within the Fundamental Rights to life and personal liberty under the constitution of India. If should be noted that the right to Elementary education up to 14 years of age was recognized as the Fundamental Rights in India vide the 86th constitutional amendment passed in 2002.[21]

iii) Social violence: -- This violence has it's ramification in so many ways as- **(a) Female Feticide**: --- The foremost principle of human rights is too born and to survive. But its matter of grave concern and sorrow that female fetus are murdered in their mother womb. In Indian society, male children are taken care of in a better way than to the female ones. The birth of a male child in a family brings greater joy and

excitement than to a female child's birth Very often, by use of ultra-Sonography, the sex of an embryo is determine and the female fetus are killed in mother womb. Such heinous deed is done without the women's consent such an act is nothing, but assault on women's motherhood and interference to their liberty. Here also is an example of violation of women's rights to self development. Through the way of protecting women's rights to born and life security, has come Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Technique (Prevention and regulation) Act, 1955. Through this Act, any kind of sex determination with the help of ultra sound is considered a punishable offence. If the crime established the license of both the diagnostic centre and doctor's is cancelled, even there is a provision of the doctor's imprisonment and fine. But such kinds of heinous deed find no sign of decrease by evil collusion between the medical practitioners and diagnostic centers. The only remedy is growing of social awareness. [22]

Economic Rights and disparity: --These rights include: -- (a) Right to own property (b) Right to social security under adverse conditions. (c) Right to work and protection against employment and equal pay for equal work. (d) Right to standard of living which is adequate to health and well being. (e) Right to rest and leisure including reasonable hours of work holidays. (f) Right to form and join trade unions in India, these rights have been incorporated under the directive principles of state politics. [23]

(b) **Eva-teasing**: --- The women in India metro cities are teased which is nothing but the breach of women's violation of rights. The women are teased by using indecent language or gestures. Such kinds of acts are nothing but grave disgrace of them. Even they become target to indecency by using filthy language or words relating to their private parts. The role of television, radio or films is no less insignificant towards the increase of such Acts. The supreme court in Bishaka vs. Rajasthan government case has opined the issues of sexual harassment are,--- (i) Trying to have physical relation; (ii) Demanding sexual favor; (iii) commenting on sexual matters; (iv) Exhibiting of indecent picture, books etc.; (v) Verbal or physical use of any indecent gestures.[24]

(c) Existence of disgraceful social or religious customs towards women: --- There are still some religious or social customs in Indian society which downgrade the women's social position, like enslaving the

women after marriage. Despite the abolition of 'Sati' so long back this social stigma still exists in some backward places, even some Hindu fundamentalist organizations are in favor of bringing the customs back. Even 'The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act,' (1956) has been in acted to give effect to it. But human trafficking is still existent in Indian society.[25]

In spite of whole hearted effort of some human rights organization like, Amnesty International, The Human Rights Watch Asia and International Commission of Jurists which play a role towards establishing political and civil rights, torture and exploitation of women , wage disparity between men and women are still violating the human rights.

So there have been many women's movements in Indian society in course of establishment of women's rights within 1975-85, on international women's decade, social discussion have developed much on women's movement. But in the 19 century women's welfare movements had been organized. Raja Rammohan Roy was Started movements for abolishing the barbaric custom' Sati' in this decade. Vidyasagar had taken in significant steps to prevent child marriage and to spread women's education. Then the British Government passed such legislation as 'Abolition of Sati Act', Widow Remarriage Act', and 'Child Marriage (Prevention) Act'. Women themselves took part of 'Civil Disobedience Movement' in 20th century. After independence Gandhiji and Congress party pledged for equal right to both men and women. Equal right to men and women and equal right to voting have been established in the eye of law in Indian constitution. Towards the beginning of this country the organization 'All Indian women's conference' took leading role to women's welfare. Women also took part in Indian freedom movement. Many women took courageous roles in Tebhaga Peasant movement and Telegana movement.[26] Though the subject matter of these movement varied all these were for establishing rights of oppressed, tortured and humiliated women.

Conclusion: -- From the above debate, discussion, we may conclude by saying that like other global countries, discrimination against women's Rights in India is considered to be a malady in social life. The women's rights will only be established if this malady is uprooted from society. Constitutional laws and provisions are not the only remedy

towards protection of rights. Again the women's dreams of establishing rights can only be fulfilled when some aspects as establishment of administrative body, is taken to be acceptable. For materializing women's rights police and Para-military forces have to be trained. Also human rights groups and committee have to be formed at School, College and University level to the student aware of rights, especially women's rights strong punitive measure should be adopted for offences like rape, bride murder or abduction. Again such social customs or laws shall immediately to be banned violating human rights. Again such customs like 'Debdasi' or 'Sati' that still exist some Indian societies shall be declared illegal. Government and private organizations working in the field of rights protection will have to be more vigilant towards protecting rights, especially women's rights. Again administrative bodies should act promptly if any incidence of rights discrimination is reported from anywhere. Though mass media like radio and television, people should be made aware of their rights by proper regular programmers, debates and discussion. Through these only mass consciousness is grown and people shall be able to stand in arms whenever any incidence of discrimination rights is reported. Poverty is one of the principal reasons of violation of human rights of women and to dispel poverty the only remedy is to establish women training centers. Employment opportunities to women irrespective of literates or illiterates should be made. The magnitude of torture and exploitation on women will decrease only when they shall be economically self dependent. If these essential conditions are truly fulfilled in course to rights establishment, this research paper will get true significance.

REFERENCES:

1. Pramanik, Nimay, Samajik O Rajnaitik Dharana O Bicharchya Bishaysumohar Ruprekha, Chaya Prakashani, Calcutta-73, September, 2001, p. 198.
2. Chakraborty, Biswanath, Paschimbanger Panchayat Byabasthar Ruprekha, Progatishil Prashak, Calcutta-73, April, 2008, pp. 232--233.
3. Roy, Guha, Siddhartha, Manabadhikar O Ganatantrik Adhikar: Aitihasik Prekashapot, Mitram Prakashak,Calcutta-73, September, 2007, pp. 13-15.

4. Chattergee, Dr., Subrata, Globalization and Human Rights, Khejury College, Purba Medinipur, January, 2014, pp. 86-87.
5. Bartaman Patrika, 11th March, 2013, p. 4.
6. Pramanik, Nimay, Samajik O Rajnaitik Dharana O Bicharchya Bishaysumohar Ruprekha, Chaya Prakashani,Calcutta-73, September, 2001, p. 200.
7. Chakraborty, Satyabroto, Rastro, Samaj o Rajniti, Akuse 59 Badrinath Temple Street, Kolkata, 2002. P. 396.
8. Dutta, Prabhat. 1993. Prasanga Panchayat, National Book Agency Private Limited. Calcutta-73, 1993, pp. .33-35.
9. Bhattacharya, Mohit, Contemporary Decentralization Discourse, Mitram Publishers, Kolkata-7, November, 2011, pp. 218-219.
10. Sen, Sujit, Jatpat O Sangrakshan Bhartiya Prekshapat, Granthamitram Prakashak, Calcutta-9, April, 2008, pp. 112-114
11. Mukhopadhyay, Soma, Adhikar Theke Kshamatayan, Mitram Prakashak, Calcutta, April, 2008, pp.77.
12. Ghosh, saswati, Samatar Dikai Andoloana Nari, Progressive Publishers, Calcutta-73, June, 1999, pp.117-118.
13. Debbarman, Ranjit, Nari: Ekti Samajtatwik Samiksha, Reader Service, Calcutta, 2004, p. 175.
14. Sharma, Sanjeev Kumar, United Nations and Human rights, Radha publication, New Delhi, 2002, p. 35.
15. Chattopadhyay, Suhas, Bipanna Manabadhikar: Ei Samyer Bhavana, Progatishil Prashak, Calcutta-73, August, 2007, pp. 52-58.
16. Ahuja Ram, Society in India: Concepts, Theories and Recent Trends, Jaipur, Rawat Publication, 2011,, pp. 232-234.
17. Geore, M.S. Education and Modernization in India, Rawat Publication, Jaipur, 1982, p.36.
18. Debbarman, Ranjit, Nari: Ekti Samajtatwik Samiksha, Reader Service, Calcutta, 2004, p. 175.
19. Thialagaraj, R. Human Rights and Criminal JusticeAdministration, New Delhi, A.P.H. Publishing Corporation, 2002, p.11
20. The Telegraph patrika, 2010, p. 5.
21. Mahapatra,Kumar, Anadi, Bharater Sasnbabastha O Rajniti,’Suhid Publication, Calcutta-73, March, 2009, p.1207.

22. Levin, Liya, ed. Sourin Bhattcharya, Manab Adhikar, National Book Trust India, New Delhi, 1998, pp. 29-32.
23. Bandyopadhyaya, Kalyani, Rajneeti O Nareeshakti, Progressive Publishers, June, 2009, pp. 135-138.
24. Bandhyopadhyaya, kalyani, Narira Aaj Jekhane Dnariye: Andhakare Alore Disha, Grantha Mitra Prakashak, Calcutta-9, August, 2012, pp. 32-35.
25. Mani, Lata, Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India', Recasting Women: Essays in Colonial History, New Delhi, Kali for Woman, 1989, pp. 92-94.
26. Gupto,Suparna, Itihase Nari : Siksha, Paschimbanga Itihase Samsad, Progressive Publishers, Calcutta, January, 2001, pp. 147-149.

Land Devolution and Demographic Changes of Darjeeling-Terai Region in Colonial Period : A Historical Review

Rudrani Bhattacharya
Assistant Professor, Department of History
Acharya Brojendra Nath Seal College (Govt.), Cooch Behar

Abstract : The foot-hills of the Himalayas are known as Terai whereas the plain land of Darjeeling has come to be known as Darjeeling Terai. It is found that before the advent of the British, this area was ruled by the Sikkim and Nepal subsequently. In this area population were meager, only the people of some tribes namely, Lepcha, Mech,Dhimal and Rajbanshi lived there in an intolerable situation and distressed climate. But after the occupation of this area by the British in 1835 by the treaty of Tetulia after Anglo Nepal war situation was going to be changed gradually. For economic interest, Britisheres utilized this area introducing their economic policy in the field of agriculture, land revenue, trade, and commerce as a result of which demographic patterns and socio-economic conditions of this area changed rapidly. The arrival of the outsiders not only heralded the overpopulation of the region. Rather it brings economic and moral changes in the lives of these agricultural-dependent people. On the other hand, when various Jotdars started selling their land to the owner of the tea garden at a higher price, the condition of the agricultural labourers like Adhiars under him started to become critical. This paper tries to understand how the land devolution changing demographic pattern of the Terai region in Darjeeling district during colonial period and attempt to find out the various land related problems of the region.
Key Words : Terai, Jotdars, Mech,Lepcha, Raiyat, Jhum, Thikadar

The Terai region, the foothills of the Himalayas, was formerly known as ‘East Morang’. Later during the British rule, the region was named ‘Terai’. Before the British acquisition in 1850, the Terai region was at various times under the control of Nepal, Kochbehar, and Sikkim. In 1780 AD, due to the weakness of Sikkim, the Terai or ‘Sikkim Morang’

region was occupied by Nepal. At the end of the Anglo-Nepalese War in 1816, the British occupied the entire Terai region from the east bank of the Mechi River to the Teesta River following the terms of the Tetulia Agreement signed between the East India Company and Nepal and handed it over to the King of Sikkim.[1] At the early nineteenth and early twentieth century, the region was covered with dense forests, wild animals and insects. The area is completely unhealthy and unsuitable for human habitation. However, ignoring these adversities, most of the primitive tribes living here were Mech, Dhimal, Tharu, and Rajbanshi. But later realizing the political and economic importance of the region, the British occupied the Terai permanently from Sikkim in 1850. Since then, the land revenue system in the Darjeeling Terai region has undergone a radical change. Due to the lack of clear governmental rule; no cohesive land settlement has been developed in this region. In the seventeenth and eighteenth centuries, the agricultural system in the Terai region was considerably distinct from that in the other parts of Bengal. Most of the people of Terai were farmers. After the annexation of the Terai in 1850, it was at first decided by Government that the southern portion of the tract should be placed under the Purniah Collector, and the northern portion attached to Darjeeling. But, apparently, in consequence of the extreme dislike shown by the inhabitants of the southern Terai to the transfer to Purniah, the Government decided in the same year to attach the whole tract to Darjeeling. Before this was done, however, a settlement for three years of the land revenue had been affected by the Collector of Purniah with the Rajbansi and Musalman inhabitants of the lower Terai. Meanwhile, Dr. Campbell had made a settlement for three years of the upper Terai, which at the time seems to have been chiefly inhabited by Mech.[2] After 1850 entire region was governed as a non-regulated district and hence Company's regulations did not apply to that area except Regulation III of 1828. Based on that regulation, the Government was the owner of all lands and there was no intermediary between the Government and the ordinary tenant in the matter of settlement of land. During this time the Colonial Government made five settlements, i.e., first in 1853-1862 or ten years, the settlement which was extended up to 1867; second from 1867-1877 which expired in 1878;

third, in 1879 a fresh settlement for ten years was made though it was extended up to 31st March 1895 by the Government Order No. 3791-1545 L.R, dated 30th November 1888; fourth, in 1897 the Settlement was renewed for a period of twenty years, and last, the next settlement took place in 1919-1925 [3]. Dr. Campbell had made the first regular settlement, there were 544 *jotedars* or persons with whom land had been settled. The gross revenue was then Rs. 19507 and net Rs. 17630. Dr Campbell considered that these jotedars renewed their *jotes* every year but in fact, they had hereditary rights which could not be refused. He, therefore, allowed the *Chaudhuris* over 10 percent for collection charges. Five-year rent-free grants were also made to encourage clearance of land under the jungle which was called pal [4]. In 1853 the cultivated portion of the Terai was resettled for 10 years exclusively with *jotedars*. There were 595 *jotes* assessed and the *jama* on them was fixed at Rs. 30730 is 36 percent more than the previous *jama.* Sashibhusan Dutta stated, "In 1895 Survey and Settlement, Jotedars were treated as 'raiyats' having a right of occupancy".[5] In 1925, Jogesh Ch. Mitra spoke about this-"In 1925 Settlement, however, Jotedars who had sublet over 50 percent of their lands were recorded as under-tenants or 'tenure holders with the meaning of Section 3 of Act VIII of 1879". [6]

Before the 18th century, it is unlikely that there was any human habitation worth the count in this region. The earliest settlers presumably were the Dhimals and the Meches followed by the Koches. The Meches and Dhimals were settled in the upper reaches of the Himalayan foothills and the Koches or Rajbanshis in the lower part of the Terai region with some peasant castes who came here from the adjoining state of Bihar before the Colonial Rule.[7] Dr. Campbell, who became the first Superintendent of Darjeeling pointed out that during the pre-British period there, were huge cultivated lands in Terai and any person could plough the land with complete freedom. He said that "the people of the Morung, who have free use of the forest for firewood, ploughs and sapling for hut building; grass for roofing is also free**."** [8] Regarding the tax it is to be noted that there was no tax paid by any individual to Sikkim Raja. Taxes were paid by the community to Raja. Besides the methods of cultivation, it is important to understand the system of land revenue,

taxes, measurement, and productivity of the land. [9] As a part of their agrarian reforms the Britishers divided the lands into three categories according to the quality and necessity of the land namely- 1) Lands for agricultural purposes, 2) Lands for Tea- cultivation and, 3) Lands for reserve forest. In the field of agriculture, they introduced jotdari system in a new form differing from other parts of North Bengal. A jote in Terai or Morung was a portion of unmeasured land, though there was no definite land measure in use. The owner of the jote was a jotedar. Regarding the owner of the land, Campbell says, "The Jotedar holds it by a pottah which has never been granted for a long period than 4 years. He cannot sell or mortgage the land; such a proceeding has never been affected and would not have been allowed by the former (Sikkim) Government, if he desires to quit the Jote, it reverts to the Government. [10] After each settlement a large number of jotes were created and these were given to the jotdars by agreement or lease. Most of the jotdars did not cultivate the land directly; therefore, further devolution of land was necessary. Other than the Jotdars in the British-occupied land system, other people were intimately connected with the land. They were known as 'Thikadar', Dar-Thikadar.etc. Ashok Mitra says, "In Terai, the only agricultural or other labourers who live entirely by wages are immigrants from other districts."[11] Other districts means Chhotonagpur and Madhyapradesh district. Although they became tea workers, they liked agriculture and the wages were better than tea plantations.

In the land of the present Siliguri sub-division, the subject of peasant farmers came to the fore during the British period. But who are these people? Ashok Mitra says," The Prajas are nearly identical with the agricultural labourer in the South Bengal. They cultivate the land of others on a metayer tenure, receiving an advance of seed or money." [12] Various middlemen emerged in the British introduced the land system and land settlements introduced at different times. So Jogesh Chandra Mitra says, "that instance of middlemen holding between the jotedars and the tiller of the soil are not wanting and we have got services of sub-infeudatari's ranging from 'Thikadar's to 'Dar-thikadars, Dardar-thikadars, Nimdaradar-thikadars and so on down to the fifth or sixth degree till the actual cultivator is reached."[13] Where there was a

permanent settlement in 1793, there were matters of 'selami','abwab' etc. But these have not been introduced in this region. But for tillage, the jotdars used oxen free of charge to Adhyars, and provided plough, seeds, and other things. But slowly the adhyars began to be deprived of this opportunity. There is a good deal of spare land in the Darjeeling - Tarai, some of it is held by lessees under the Waste Land Rules, and a great portion is made up of forests, which are either private property or are under the administration and supervision of the Forest Department. These forests are in many cases full of wild beasts, whose ravages because much of the surrounding land to lie waste, although otherwise fit for cultivation. The Deputy-commissioner, in his report, states that the great hope for the Tarai consists in the fact that the lands are being rapidly taken up by European planters, who will soon buy up –many of the private forests and fell them for clearings. Measures might perhaps be taken by the Forest Department for preventing its tracts from being left as an undisturbed resort for wild animals. There is no zamindar in the District; the *Jotdar* or grantee under the Waste Land Rules, holds his land directly from the Government and lets it out in parcels either to a *praja* or a *thikadar.* There is also a large extent of available spare land in the hills division of the District. [14] Actually, no land would be a wasteland or worthless on the earth if we can utilize them in a modern way using a scientific method of modern technology. If we go through the past of history, even today, we can follow that the people of different tribes lived in the deep jungle, keeping them out of civilized society or culture they subsisted depending on the jungle doing *jhum* cultivation and hunting. It is followed in deserts and mountains also. Actually, there was political, and imperialism behind the declaration of wasteland to occupy all the lands and natural resources refusing the authority of the community on the jungles, deserts, mountains, or any kind of wasteland.[15] So, Prof. Misra pointed out that, no land can be a waste land if natural principles of land use are adopted and land resources are treated as trust property to be equitably accessible to all in conformity with their basic needs of food, shelter, clothing, education, health, and security at an increasingly higher level in quality. In, fact, no natural resource should be treated as private property. It should not be owned by individuals. It should belong to the

community as a whole.[16] Darjeeling- Terai, being a non-regulated area; provisions of the Permanent Settlement Act of 1793 were not applicable here in respect of granting settlement of land to the tenants. In fact, Company's Waste Land Rules which were applied in other parts of India also come enforced in Darjeeling Terai. Though, the fifteen mouzas under Siliguri Police Station and three mouzas under Phansidewa Police Station were governed under the Permanent Settlement Regulation of 1793.[17] The SiliguriSubdivision has an area 22 per cent, of the District area and a population of 24 percent of that of the District. The density of the population here (349) is thus slightly higher than that of the District. The population is evenly distributed throughout the Subdivision, density varying from 342 in the Siliguri to 366 in the Phansidewa. The Subdivision has only small areas of forest and although there is waste land, large areas are well cultivated, much being under tea. As it lies almost wholly in the plains, a much higher density of population might have been expected the neighboring Sadar Subdivision of the Jalpaiguri District with many points of similarity carries a population of 540 persons to the square mile. One of the causes may be, the unhealthiness of the Terai which was given in the past as the reason for low population development, rendering necessary the importance of aboriginal tribes from Chota Nagpur and the SantalParganas to develop and work tea gardens.[18]

In early times the Terai was sparsely populated by aboriginal Koches and Meches and the hills by aboriginal Lepchas. All had animistic religions and practised primitive methods of agriculture (jhum cultivation). Exploitation followed which radically altered the racial composition of the population as well as increased it enormously. First, some Mussalman conversion of Koches in the Terai probably occurred and an increase of Tibetan (including Bhutanese) influence from the north began a process of domination over the Lepchas. Warfare between the Nepalis and Tibetans and Chinese resulted in further regression of the aboriginals and placed the Nepalis in a position to exploit when the British intervened politically.British Exploitation was mainly in the development of tea, engineering, trade, and education and did not result in any appreciable permanent British population. It brought in its train

two large immigrants in the hills, of Nepalis who were more useful as labourers in tea gardens and more efficient and thrifty as cultivators than the aboriginal Lepchas in the Terai, of tribes from Chotanagpur. As a consequence, Lepcha and Tibetan influence in the hills declined. Development and communication and trade brought further exploration by Marwari, Behari, and Bengali traders and professional men. Economically these completely dominate the Nepali despite his strong numerical position. The result is a very mixed population of Nepalis, Lepchas, Bhitias, Tibetans, Bengalis, Marwaris,andBiharis in the hills and of Bengalis, Muslims, Marwaris, Beharis, Rajbangshis, Santals, Oraons, and Mundas in the plains.[19] British introduced agriculture and land system and all the regulations were abolished on 15th April 1955. Before the arrival of the British, there were only bhumiputras in the region. After 1850 came groups of Christians, Muslim, Hindus,Nepali , Bihari, Punjabi,Marwari and Madhesi. Most of the Marwaris in this region were Agarwal and Oswals. Among Biharis came Hazam and Benia.In 1840, Campbell planted tea trees in the Darjeeling hills. However, after that, there was a rush to take up land for tea everywhere in the mountains. By 1856, tea production began on a commercial basis in the hills. The owners and employees of the Darjeeling tea plantations are all Europeans. All the tea workers here are Nepalese. The poor of eastern Nepal, Bhumidas Limbu, Rai, and other Nepalese all left eastern Nepal and took shelter in the tea plantations of the Darjeeling region. After six years, i.e. in 1862, an initiative was taken to cultivate tea in the Terai region. After 1860 there was no more land left for tea production in the hill areas. Then tea cultivation started in the plains. At this time of the nineteenth century, the forest land and khas land of the Terai were all leased for thirty years. People from different tribes such as Munda, Orao, Kheria, Sauria, Malpaharia, Ghasi, Turi etc. come from Santhal Pargana to work in the tea plantations of the Siliguri sub-division. All the garden workers are Chhotonagpuri. So, it may be concluded that after the coming of the Britishers and introductions of their new economic policies in the field of agriculture, trade and industry, different types and classes of people immigrated in the Terai as a result of which population increased gradually and a new demographic structure was formed. For introducing

the new economic policy and systems in the land, and immigration, the tribal people lost their ethnicity or ethnic life where they habituated with shifting cultivation and Governed by themselves out of so called civic society.[20]

References :

1. A.J. Dash, Bengal District Gazetteer: Darjeeling, Government Press, Alipore, Calcutta, 1947 P-37
2. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol- X, Trubner & Co, London, 1876, P-101
3. A.J. Dash, op. cit. P- 227.
4. W.W. Hunter, op. cit. P-117-118
5. Sasibhusan Dutta, Final Report on the Darjeeling Terai Settlement, Calcutta, 1898. P-11
6. Babu Jogesh Chandra Mitra, Notes on Land System in Terai, an unpublished document of Settlement Department Coochbehar, P-15
7. W.W. Hunter, op cit. P-72
8. A. Campbell, ESQ. M.D; Papers on The Sikkim Morang, No. 214 of 1851, Dated Darjeeling, 23rd May 1851, P- 15. (D.C.O.D)
9. Ibid. P- 15.
10. Ibid. P-15.
11. Ashok Mitra- Census 1951. Darjeeling District Handbook. 1954, P-CXXIII
12. Ibid
13. Babu Jogesh Chandra, op. cit. P-14
14. W. W. Hunter, op. cit. P-87-88
15. Kartik Ch. Sutradhar, Land and Livelihood: A Study on the Agro-Political Movements of a Bengal District, Jalpaiguri (1869-2004), N L Publisher, 2013, P-11
16. S C Sharma, Utilisation of waste land for Sustainable Development of India, Concept Publishing Company, New Delhi 1990, P-43
17. B.H. Baden Powell, A Short Account of the Land Revenue and its Administration In British India, With a Sketch of Land Tenures, op. Cit. P- 59-60

18. A.J. Dash, op. cit. P- 53
19. Ibid, P-55
20. Kartik Chandra Sutradhar, op. cit. P-XXII

India-Israel Relations : Exploring Opportunities and Complexities in a Changing Global Landscape

Albert Mondal
Post Graduate, Dept. of Political Science
University of Kalyani

Abstract: India and Israel have a long and complex history, dating back to the early 1950s when India was one of the first countries to recognize Israel. However, full diplomatic relations between the two countries were not established until 1992. In recent years, India-Israel relations have grown rapidly. The two countries have signed a number of agreements in areas such as defence, agriculture, and technology. India is now Israel's largest arms customer and Israeli companies are investing heavily in India. There are a number of factors that have contributed to the growing relationship between India and Israel. Both countries share a common interest in countering terrorism and promoting regional stability. They also have a strong economic and technological partnership. However, there are also some challenges to India-Israel relations. One challenge is the complex political situation in the Middle East. Israel is a controversial country in the Arab world, and India has traditionally maintained close ties with many Arab states. Another challenge is the growing Hindu nationalism in India. Some Hindu nationalists have expressed anti-Semitic views, which have strained relations with Israel. Despite these challenges, India-Israel relations are likely to continue to grow in the years to come. The two countries have a lot to offer each other, and they are both important players in the global economy and security landscape.
Key Words: India, Israel, Economy, Defense, Science, Technology, Trade.

Introduction:

India and Israel, both countries have a long and rich history. India was one of the first countries to recognize Israel, and the two countries have enjoyed close relations ever since. In recent years, these relations have grown even stronger, as both countries have faced common challenges and opportunities in the changing global landscape.

This paper will explore the opportunities and complexities of India-Israel relations in the 21st century. It will first provide a brief overview of the history of these relations. It will then discuss the key areas of cooperation between India and Israel, including defence, agriculture, water, and technology. Finally, it will consider the challenges that India and Israel face in maintaining their close relationship in a changing global landscape.

Objectives:

a) To critically analyse the historical context of India-Israel relations and its impact on the contemporary dynamics.

b) To assess the economic opportunities and challenges in trade and investment between India and Israel.

c) To examine the evolving defence cooperation between the two nations, including military technology transfer and joint defence projects.

d) To investigate the role of innovation and technology partnerships in fostering collaboration in sectors such as agriculture, water management, and Technology.

e) To identify potential areas of growth and cooperation in a rapidly changing global landscape.

History of India-Israel Relations:

India and Israel established diplomatic relations in 1992. However, the two countries have had a long history of interaction dating back to the early 20th century. In the 1920s, India was one of the first countries to provide financial assistance to the fledgling Jewish state. In the 1950s, India voted in favour of Israel's admission to the United Nations. And in the 1960s, India provided Israel with military assistance during the Six-Day War (Srivastava, 1970).

Despite these early ties, India's relations with Israel were often strained due to India's close ties with the Arab world. In the 1980s, India supported the Palestinian cause and voted against Israel in several United Nations resolutions. However, India's relations with Israel began to improve in the 1990s, following the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War (Hadass, 2002).

In 1992, India and Israel established full diplomatic relations. Since then, the two countries have enjoyed close relations in a number of areas, including defence, agriculture, water, and technology.

Key Areas of Cooperation:

India and Israel have a wide range of areas of cooperation. Some of the key areas include:

Defence:

India and Israel have a long and growing defence relationship. India is the largest buyer of Israeli military equipment, and Israel is the second-largest supplier of military equipment to India after Russia. The two countries have a wide-ranging defence cooperation agreement, which covers everything from arms sales to joint military exercises and technology sharing.

In recent years, the defence relationship between India and Israel has deepened significantly. This is due in part to the growing strategic convergence between the two countries. Both India and Israel face common threats from terrorism and radical Islam, and they are both looking to develop their military capabilities to meet these challenges (Rajagopal, 2018-19).

The defence relationship between India and Israel is also driven by a shared interest in technological innovation. Israel is a world leader in defence technology, and India is looking to acquire Israeli technology to boost its own defence capabilities. The two countries have a number of joint defence R&D projects underway, and they are also working together to develop new defence technologies (Naha, 2020).

The defence relationship between India and Israel is a key pillar of their overall bilateral relationship. The two countries are strategic partners, and their defence cooperation is essential for their security and prosperity.

Here are some specific examples of India-Israel defence cooperation:

In 2017, India and Israel signed a $5 billion deal for the purchase of Israeli air defence systems.

In 2018, the two countries conducted their first joint military exercise, code-named “Varuna” (S Samuel, 2023).

In 2019, India and Israel signed a Memorandum of Understanding on defence technology cooperation.

In 2020, India and Israel agreed to jointly develop a fifth-generation fighter aircraft.

In 2021, India and Israel signed a $2 billion deal for the purchase of Israeli medium-range surface-to-air missile (MRSAM) systems.

In 2022, the two countries held their first joint air force exercise, which involved fighter jets from both countries flying together over the Mediterranean Sea.

The India-Israel defence relationship is a significant development in the global security landscape. It is a partnership that is based on shared interests and common values. The two countries are working together to develop their military capabilities and to counter the threats they face. The India-Israel defence relationship is a force for good in the world, and it is likely to continue to grow in the years to come.

Agriculture:

India and Israel have a long and fruitful history of cooperation in the field of agriculture. The two countries have been working together to develop and implement innovative agricultural technologies, with the goal of improving food security and productivity (Hafeez, 2009).

In recent years, India has become one of Israel's largest agricultural partners. In 2021, India imported $520 million worth of agricultural products from Israel, making it the country's third largest agricultural supplier (S Samuel, 2023).

Israel has a strong track record in developing innovative agricultural technologies, such as drip irrigation, precision farming, and greenhouse cultivation. These technologies have been particularly beneficial to India, which is a water-stressed country with a large and growing population (Pate, 2014).

India and Israel have also been working together to develop new agricultural products. In 2021, the two countries signed an agreement to jointly develop a new variety of wheat that is resistant to pests and diseases.

The cooperation between India and Israel in the field of agriculture is mutually beneficial. Israel has access to India's large and growing market, while India has access to Israel's innovative agricultural technologies. This cooperation is helping to improve food security and productivity in both countries.

Here are some specific examples of India-Israel cooperation in the field of agriculture:

In 2008, the two countries signed an agreement to establish the India-Israel Agricultural Research and Development Center. The centre is located in New Delhi and it is focused on developing new agricultural technologies that can be used in both countries.

In 2015, the two countries signed an agreement to establish the India-Israel Innovation Center for Agriculture and Food. The centre is located in Bangalore and it is focused on developing new agricultural technologies that can be used to address the challenges of climate change and food security.

In 2020, the two countries signed an agreement to establish the India-Israel Water Partnership. The partnership is focused on developing new water technologies that can be used to improve water efficiency in both countries.sed to help India meet its growing water needs (S Samuel, 2023).

Water:

India and Israel have a long history of cooperation in the water sector. The two countries have signed several agreements on water sharing and management, and they have also worked together on water research and development.

One of the most important agreements between India and Israel is the 2006 Memorandum of Understanding on Water Cooperation. This agreement provides a framework for cooperation in a wide range of water-related areas, including water resources management, water quality protection, and water-related disaster management.

In addition to the Memorandum of Understanding, India and Israel have also signed several bilateral agreements on specific water projects. For example, in 2015, the two countries signed an agreement to jointly develop the National Water Grid in India (Group, 2016).

India and Israel have also collaborated on water research and development. In 2016, the two countries established the India-Israel Water Technology Center (IIWTC) at the Indian Institute of Technology Bombay. The IIWTC is a joint research centre that focuses on developing innovative water technologies to address the water challenges facing both countries.

The cooperation between India and Israel in the water sector is a mutually beneficial relationship. India benefits from Israel's expertise in

water management and technology, while Israel benefits from India's large water resources and its experience in dealing with water scarcity.

Here are some of the key benefits of India-Israel water relations:

Increased water availability: India and Israel have agreed to cooperate on the development of water resources in both countries. This cooperation could lead to increased water availability for both countries.

Improved water quality: India and Israel have agreed to cooperate on the protection of water quality. This cooperation could lead to improved water quality in both countries.

Reduced water-related disasters: India and Israel have agreed to cooperate on water-related disaster management. This cooperation could help to reduce the impact of water-related disasters in both countries.

Increased water efficiency: India and Israel have agreed to cooperate on the development of water-efficient technologies. This cooperation could help to increase water efficiency in both countries.

Technology:

India and Israel have had a long-standing relationship in the field of technology. In recent years, this relationship has only strengthened, with both countries collaborating on a number of cutting-edge projects.

One of the most notable examples of this collaboration is the development of the BrahMos missile. The BrahMos is a supersonic cruise missile that is jointly developed by India and Russia. It is the world's fastest cruise missile, and it has been used by both countries in military exercises (Abhishek Tyagi, 2021).

Another example of India-Israel technology collaboration is the development of the Heron drone. The Heron is an unmanned aerial vehicle (UAV) that is used for surveillance and reconnaissance. It has been used by both countries in a number of military operations (Anil Golani, 2022).

In addition to these military projects, India and Israel have also collaborated on a number of civilian technology projects. One example is the development of the Chandrayaan-2 lunar mission. The Chandrayaan-2 mission was launched by India in 2019, and it made history by becoming the first mission to successfully soft-land on the Moon's South Pole (Essa, 2023).

India and Israel have also collaborated on a number of other civilian technology projects, such as the development of solar energy

technologies, water desalination technologies, and agricultural technologies.

The strong technology relationship between India and Israel is a testament to the close ties that exist between the two countries. This relationship is likely to continue to grow in the years to come, as both countries work together to develop new and innovative technologies.

Here are some additional details about the India-Israel technology relationship:

In 2020, the two countries signed a $5.2 billion deal for Israel to provide India with advanced military technology, including drones, missiles, and radar systems.India and Israel have also been collaborating on the development of artificial intelligence (AI) and quantum computing technologies (Essa, 2023).

In 2021, the two countries launched the India-Israel Innovation Bridge, a program that aims to promote collaboration between Israeli and Indian startups.

In 2022, India and Israel announced a joint project to develop a quantum computing research centre.

In 2023, India and Israel signed an agreement to cooperate on developing artificial intelligence (AI) technologies for defence and security purposes.

Challenges:

Despite the close relations between India and Israel, there are a number of challenges that the two countries face in maintaining their relationship. Some of the key challenges include:

The Palestinian issue: The Palestinian issue is a major source of tension between India and Israel. India has traditionally supported the Palestinian cause, while Israel has been unwilling to make any significant concessions to the Palestinians. This has created a dilemma for India, which wants to maintain its close ties with Israel but also wants to be seen as a friend of the Palestinians (Saranya, Jan 2023)

The Arab world: India has close ties with the Arab world, and many Arab countries are opposed to Israel. This has made India somewhat cautious in its relationship with Israel, as it does not want to alienate its Arab allies.

The rise of China: The rise of China is another challenge that India and Israel face. Both countries are concerned about China's growing

military and economic power, and they are working together to develop closer ties. However, there is also some competition between India and Israel for Chinese investment and technology.

Conclusion:

India and Israel have a long and complex relationship. In recent years, the two countries have had ties. Both countries face common threats, such as terrorism and climate and enjoy close relations in a number of areas. However, there are also a number of challenges that India and Israel face in maintaining their relationship. These challenges include the Palestinian issue, the Arab world, and the rise of China.

Despite these challenges, India and Israel have a strong mutual interest in maintaining close change. They are also both major players in the global economy. As the world becomes increasingly interconnected, India and Israel will need to work together to address the challenges and opportunities of the 21st century.

Reference:

Srivastava, R. K. (1970). India - Israel Relations. *The Indian Journal of Political Science*, 238 - 264.

Hadass, J. (2002). Evolution of Relation between India and Israel. *Indian Quarterly*, 15 - 32.

Rajagopal, S. (2018-19). INDIA'S DEFENCE COLLABORATION WITH ISREAL. *Proceeding's of the indian histry congress*, 719-727.

Naha, A. (2020). India - Isreal Relations: Opportunity and Complexities. *Social Inquiry: Journal of Social Science Research*, 81-102.

S Samuel, C. R. (2023). *India - Israel Strategic Partnaship.* New Delhi: Pentagon Prees.

Hafeez, M. (2009). India-Israel relations. *Institute of Strategic Studies Islamabad*, 65-83.

Group, W. B. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends.* New York: The World Bank Press.

Abhishek Tyagi, S. M. (2021). *International Relations India and World.* New Delhi: Net Shop.

Anil Golani, A. s. (2022). Indo-Israel Defence Cooperation: Strengthening Bonds. *Air Power and Space Studies*, 145 - 164.

Essa, A. (2023). *Hostile Homelands: The New Alliance Between India and Israel.* London: Pluto Press.

Saranya, A. A. (Jan 2023). *India-Israel Relations: The Palestine Factor and De-Hyphenation Approach.* Hyderabad: IUP Journal of International Relations.

Pate, T. (2014). Re-(Modi)fying India's Israel Policy: An Exploration of Practical Geopolitical Reasoning Through Re-representation of 'India', 'Israel' and 'West Asia' Post-2014. *Journal Asian Security and International Affairs*, 7 - 35.

Effect of Social Media towards Political Campaign and Public Motivation : A Review

Mithun Biswas
Assistant Professor, Dept. of Political Science,
Kabi Nazrul College, Birbhum

Abstract : India is among top ten in term of number of users for most used social media platform in the world with 200 Million users on WhatsApp, 7.65 Million users on Twitter, 300 Million users on Facebook, and on YouTube 41 Million users using on monthly basis. According to Reuters, 52 per cent of Indian social media users use Facebook and 18 per cent use Twitter as a source of news. However, Hootsuite's Digital 2019 report, reported unlike other social media platforms usage of Twitter is decreasing at the rate of 2.2 per cent per quarter. The basic objectives of this study is to know the present position of social media in India. And second is to review the application of social media for political participation and campaign in Indian politics. This present study is based on secondary data in nature. The secondary data have been collected from books, different articles, journals and e-journals related to social media, and political participation and electoral campaign performed by Indian political parties. The review also took in consideration social media especially Facebook, Twitter, WhatsApp and YouTube for political purpose. The conceptual framework which guides the study was critically looked at. Explanations and definitions were professed to the various constructs and their elements in the framework. Based on the thorough review, linkage between various construct has been established and gaps were identified which formed the bases of framing the politics in India.

Keywords: Facebook, Twitter, WhatsApp and YouTube, Political Participation and Political Campaign.

Introduction

According to World Stat, India has left behind the United States and is able to secure second position after China in terms of internet users. According to IAMAI (Internet and Mobile Association of India) 2019,

India had 451 Million monthly active internet users in the first quarter of the year 2019 where 65 per cent of internet users are between the age of 12 to 29 years and 72 per cent of them use internet on daily basis. Overall 7 per cent growth i.e. from 24 per cent to 31 per cent is projected in terms of access to internet by Indian users from 2018 to 2023. These reports depict internet penetration in India is growing at fast pace and is expected to grow with much faster rate.

Furthermore, India is among top ten in term of number of users for most used social media platform in the world with 200 Million users on WhatsApp, 7.65 Million users on Twitter, 300 Million users on Facebook, and on YouTube 41 Million users using on monthly basis. According to Reuters, 52 per cent of Indian social media users use Facebook and 18 per cent use Twitter as a source of news. However, Hootsuite's Digital 2019 report, reported unlike other social media platforms usage of Twitter is decreasing at the rate of 2.2 per cent per quarter. As per Socialbakers, official profile of Narendra Modi on Facebook and Twitter are most followed. Moreover, amongst all states of India, West Bengal is among top 5 states having highest internet penetration and all political parties in India are trying to leverage this growth in the number of internet users.Approximately 65 per cent population in India is youth which may be the reason for such popularity of social media. It is observed in previous elections that youth is less interested in politics but social media usage has made youth more interested in getting political knowledge online through social networking sites. According to IAMAI Report 2016, 90 per cent of social media users were following state assembly elections on social media.

Adopting new phenomena of social media has changed the paradigms of politics as it has the ability to shape new messages and contact large masses which were not experienced in customary media. From multiple points of view, individuals moved from keeping up particular site to building up different accounts on different SNS. As individuals are moving to the Internet, resulting into establishment of new culture in politics. There is a saying regarding social media that 'Traditional media's like Television and Newspaper acts as a watchdog but social media is like a watchdog over watchdogs'.

Table 1.1: Changes in Political Use of Social Media between 2014 and 2019

Year 2014	Year 2019
Total eligible voters were 814.5 Million people. Only 17 per cent of total population had access to internet.	Approximately 900 Million eligible voters, and an estimated half-a-billion have access to the Internet. The fastest growth in users on any major social-media platform is in India.
Only few politicians and political parties had official pages on social media platforms"	Almost all political leaders and parties have their official pages and accounts on social media platforms
Facebook, Twitter, YouTube were most prominently used	WhatsApp is now considered as a major social media tool along with Facebook, Twitter and YouTube
155 Million mobile users were reported and use of hashtags on Twitter were more prevalent.	450 Million mobile users were reported wherein Video is considered as most popular source of information and entertainment.

The Indian General election, 2014 was recognized as world's largest democratic election till now and is also known as #twitter election (Lu et al., 2014), and campaigning was primarily conducted online by major political parties like AAP, BJP and INC etc. for engagement and seeking votes. Hence, the use of social media for elections purpose is quite prevalent in India and is followed by all the parties. According to media strategists, during General Election 2019, BJP and AITC has spent more than its 50 per cent of their budget on online campaigning including social media as it is inexpensive as compared to traditional media (Roy and Amin, 2019). This inexpensive platform facilitates the citizens participation directly in political process of sharing and disseminating information with each other. However, political parties and leaders can

also use it as call to action platform to connect and mobilize supporters by using social media strategically.

Political Attitude and participation

Attitude is defined as "psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor". Authors have studied the association of attitude and political participation and one such researcher Lane (1965) emphasizes the importance of political attitudes in a larger segment of attitudes and beliefs. He connects political attitudes of respondents directly to psychological factors. Positive political attitude leads to high political participation and has more probability to vote. In some studies, researchers found the strong association between media use and political attitude as well as political behavior which is due to the motivation people have to get political information or political knowledge. Carpini and Keeter (1996) describes "political knowledge as the series of actual political information that becomes stored in long-term memory". They guarantee that more proficient and educated voters will probably be interested to legislative issues, joined to vote, and are more committed for political participation. Formal training, news, interaction at office or with friends, social media and so on are the various tools to get political knowledge. It is observed that people having higher political knowledge including party, leader and process have higher tendency of political participation. As social media has been used for seeking and disseminating political information by majority of people, higher probability to enhance political knowledge. Similarly, people who are more interested in political affairs have the greater tendency to show their political participation. Studies also observed that social media usage has increased the political interest and political knowledge due to media exposure.

Objectives and methodology

The basic objectives of this study are to know the present position of social media in India. And second is to review the application of social media for political participation and campaign in Indian politics. This present study is based on secondary data in nature. The secondary data have been collected from books, different articles, journals and e-journals

related to social media, and political participation and electoral campaign performed by Indian political parties.

Impact Of Social Media On Indian Politics

Use of Facebook in Politics

In 2004, Facebook was launched by Mark Zuckerberg, which allows the users to express, share user-generated content, to connect with friends and family, and to retrieve and share information about the latest happenings in the world. Facebook provides numerous features to increase interaction and online communication. Users can share information in the form of text, images, videos or links, stay interconnected by sending a friend request, like or follow public pages. Once they are connected, users can like, share, comment, a social event they attend, their present location, track all the information shared by a connected friend, which will appear on the section called News Feed. All such activities performed by users on Facebook to get and share political information is referred to as political use of Facebook People tend to share political information on an online platform like Facebook among their peer group (Stroud, 2008, 2010[i]; Iyengar and Hahn, 2009[ii]; Heatherly et al., 2017[iii]). Even if users do not deliberately engage himself in getting political information from these SNS, they may incidentally get exposure through the content shared by their online friends and family (Semaan et al., 2014[iv]). Therefore, the political use of Facebook is receiving or sharing political discussion either in favour of against the political candidate or party on Facebook (Wojcieszak and Mutz, 2009 and Brundidge, 2010[v])

Use of Twitter in Politics

Twitter is a popular microblogging platform, launched in 2006 by Jack Dorsey that assists the account holders to publish short messages, called as Tweets, having maximum 280 characters. In India, more than 7.9 Million users are present on Twitter. According to Reuters, 52 per cent of Indian social media users use Facebook, and 18 per cent use Twitter as a source of news. However, Hootsuite’s Digital 2019 report, reported unlike other social media platforms decreasing the usage of Twitter at the rate of 2.2 per cent per quarter. As per Socialbakers, the official profile of Narendra Modi on Facebook and Twitter are most followed profiles of a

political leader. Twitter enables the users to create a profile for sharing user-generated content in the form of text, picture, link, the video, either public or private (Hargittai and Litt, 2011). Also, Twitter allows live streaming of messages for promotion of activities, messages and ideas (Naaman, Booase, and Lai, 2010). Geere (2010) studies the use of twitter by political candidates to promote themselves or their ideology on online platforms.Twitter has the power to stimulate electoral participation either online or offline (Zhang, Seltzer, and Bichard, 2013[vi];) along with voter's decision to vote (Towner, 2015[vii]). Moreover, tweets posted by a political candidate or party can motivate the general public to retweet, share or retrieve information and attend political campaign (Parmelee and Bichard, 2012). Such activities on Twitter may shape political attitude of voters and as a result, may influence their decision to vote.

Use of WhatsApp in Politics

In 2009, "personal real-time messaging service" known as WhatsApp was launched by Brian Acton and Jan Koum which was later acquired by Facebook in 2014 and become most popular messaging application in 2015. "It offers features like sending or receiving text and voice messages, images, documents, links videos and other media with other users. If voters do such activities for political purpose on WhatsApp, it is considered as political use of WhatsApp. Although political parties in India have invested huge money in creating WhatsApp groups to disseminate their messages and ideas (Hitchen, Fisher, Hassan, and Cheeseman, 2019[viii]), influence of WhatsApp is less researched as compared to Twitter and Facebook. Though WhatsApp, among the most used social media platforms (Statistica, 2018) is worth to study for political attitude and political participation wherein WhatsApp acts as interaction platform that bridge interstice between political actors and voters (Sumartias, 2017). Valenzuela, Bachmann, and Bargsted (2019) examined the information sharing practices of WhatsApp users and found a significant influence on gaining knowledge about political processes, protests, and issues prevailing in politics. Gil de Zuniga et al. (2019) found positive impact on electoral discussion via WhatsApp on political participation which varies among generation X, Millennials and Boomers. Further, researchers also identified the sharing of text message

higher in a political groups than in other social groups (Caetano et al., 2018).

Use of YouTube in Politics

In 2005, a video-sharing site called YouTube was launched by Chad Hurley, Steve Chen and Jawed Karimin and managed by Google. This website facilitates the users to upload, view and share the content in the form of video (Smith, Fischer, and Yongjian, 2012). Further, it allows the users to show engagement in the form of likes, dislikes, comments (Möller, Kühne, Baumgartner, and Peter, 2019[ix]). In the US, YouTube use for political communication started in the year 2006 (Gueorguieva, 2008). In western countries, several researchers have investigated the impact of YouTube usage in political context (Robertson, Vatrapu and Median, 2010 and Vergeera and Hermans, 2013[x]). YouTube found to be an influential platform for online political campaigning when used in interactive way (Ricke, 2010; Towner and Dulio, 2011 and Kruikemeier, 2014[xi]). Likewise, seeking information from YouTube boosts voters to show their offline and online political participation (Zhang et al., 2013 and Zhang et al., 2010). Also, Gibson and McAllister (2006)[xii] concluded positive impact of online campaigning in gaining voters supports by political leaders and parties. Further, they revealed online campaigning using such websites has positive influence on voter's decision to vote in favour or against a particular party or leader (Gibson and McAllister, 2011).

Social Media, Political Attitude and Political Participation

In several studies, researchers postulated that strong correlation among media use, political attitude and political behavior is due to the motivation people have to get political information or political knowledge. The use of news media and interpersonal discussion boosts electoral knowledge and observed positive correlation between interpersonal debate and political participation. The increased social media usage has to lead to provide various opportunities to get and share political knowledge on social networking sites (Dimitrova et al., 2014[xiii]). Wang (2009)[xiv] assessed influence of SNS on attitude and participation keeping in mind the socio-economic status and interpersonal discussion related to electoral process. He demonstrated that political reviews on

social networking sites have a positive association with civic participation and political attitude. Another critical factor that may help to build a positive political attitude and political behavior is political interest. People with a higher electoral interest have the greater likelihood to participate in electoral activities . Boulianne (2011)[xv] conducted a study using penal data and found the positive correlation of digital news use with electoral interest. The study concluded that consumption of online media arouses interest in already politically interested people by engaging them, which results in more civic participation. Holt et al. (2013)[xvi] suggested that youth shows higher interest in electoral activities on social media. Also, researchers conclude that social media bridges the gap among different generations regarding interest and participation. Hoffmann and Lutz (2019)[xvii]studied mediating effect of self-efficacy in the relationship of internet use with political participation wherein they observed positive relationship among variables. Consequently, not much work has been done on whether the political social media usage influences political attitudes or not.

Conclusion

These studies concluded significant social media's influence on political knowledge and participation, political attitude (De Marco, Robles, and Antino, 2017), political interest (Boulianne, 2011; Holt et al., 2013), political efficacy (Ahmad, Alvi, and Ittefaq, 2019). Furthermore, Abdu, Mohamad, and Muda (2017) postulated a positive correlation of Facebook use with political interest, political participation (Chan and Guo, 2013; Schmiemann, 2015), political attitude (Papagiannidis and Manika, 2016; De Marco, Robles, and Antino, 2017). The extensive review of the literature mentioned above theorized the different dimensions of social media consumption, political attitude and participation separately.

This study focused on entire reviews related to the study. Definitions of various concepts espoused by several authors have been mentioned empirical studies using different media. The review also took in consideration social media especially Facebook, Twitter, WhatsApp and YouTube for political purpose. The conceptual framework which guides the study was critically looked at. Explanations and definitions

were professed to the various constructs and their elements in the framework. Based on the thorough review, linkage between various construct has been established and gaps were identified which formed the bases of framing the politics in India.

Reference

i Stroud, N. J. (2008). Media use and political predispositions: Revisiting the concept of selective exposure. Political Behavior, 30(3), 341-366.

ii Iyengar, S., & Hahn, K. S. (2009). Red media, blue media: Evidence of ideological selectivity in media use. Journal of communication, 59(1), 19-39.

iii Heatherly, K. A., Lu, Y., & Lee, J. K. (2017). Filtering out the other side? Crosscutting and like-minded discussions on social networking sites. New Media & Society, 19(8), 1271-1289.

iv Semaan, B. C., Robertson, S. P., Douglas, S., & Maruyama, M. (2014, February). Social media supporting political deliberation across multiple public spheres: towards depolarization. In Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing, 1409-1421.

v Brundidge, J. (2010). Encountering “difference” in the contemporary public sphere: The contribution of the Internet to the heterogeneity of political discussion networks. Journal of Communication, 60(4), 680-700

vi Zhang, W., Seltzer, T., & Bichard, S. L. (2013). Two sides of the coin: Assessing the influence of social network site use during the 2012 US presidential campaign. Social Science Computer Review, 31(5), 542-551.

vii Towner, T. L. (2016). The Influence of Twitter Posts on Candidate Credibility: The 2014 Michigan Midterms. In Communication and Midterm Elections,145- 167. Palgrave Macmillan, New York

viii Hitchen, J., Fisher, J., Hassan, I., & Cheeseman, N. (2019). Whatsapp and Nigeria's 2019 Elections: Mobilising the People, Protecting the Vote.

ix Möller, A. M., Kühne, R., Baumgartner, S. E., & Peter, J. (2019). Exploring user responses to entertainment and political videos: An automated content analysis of YouTube. Social Science Computer Review, 37(4), 510-528.

x Vergeer, Maurice and Liesbeth Hermans. (2013). Campaigning on Twitter: microblogging and online social networking as campaign tools in the General Elections 2010 in the Netherlands in the Netherlands. Journal of ComputerMediated Communication, 18(4), 399-419.

xi Kruikemeier, S. (2014). How political candidates use Twitter and the impact on votes. Computers in human behavior, 34, 131-139

xii Gibson, R. K., & McAllister, I. (2006). Does cyber-campaigning win votes? Online communication in the 2004 Australian election. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 16(3), 243-263.

xiii Dimitrova, V., Shehata, A., Stromback, J., and Nord, W. (2014). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence from Panel Data. Communication Research. 41(1), 95–118. doi:10.1177/0093650211426004

xiv Wang, A. (2009). Advertising disclosures and CSR practices of credit card issuers. Management Research News.

xv Boulianne, S. (2011). Stimulating or reinforcing political interest: Using panel data to examine reciprocal effects between news media and political interest. Political Communication, 28(2), 147-162.

xvi Holt, K., Shehata, A., Strömbäck, J., & Ljungberg, E. (2013). Age and the effects of news media attention and social media use on political interest and participation: Do social media function as leveller?. European journal of communication, 28(1), 19-34.

xvii Hoffmann, C. P., & Lutz, C. (2019). Digital Divides in Political Participation: The Mediating Role of Social Media Self-Efficacy and Privacy Concerns. Policy & Internet.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-